

# ভৌতিক অমনিবাস

মানবেন্দ্র পাল



দীর্ঘ পঁচিশ বছরের ওপর বিচিত্র এবং রোমাঞ্চকর ভৌতিক কাহিনি লিখে শুকতারা পাঠক-পাঠিকাদের মুগ্ধ করে রেখেছেন লেখক মানবেন্দ্র পাল গল্প লিখেছেন, উপন্যাস লিখেছেন, অভিশপ্ত প্রাচীন সংগ্রহের গল্প লিখেছেন, ভাস্কর্য্যের কাহিনি লিখেছেন, কিন্তু যাঁই লিখেছেন একবারে রুদ্ধশ্বাস পড়বার মতো এবং পড়তে পড়তে গানের লেনম খড়া হয়ে ওয়ে পিঁয়সির এত সব উপন্যাস এবং রোমহর্ষক গল্প থেকে একটি সংকলন প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব বাপস। অনেক চিন্তাভাবনা করে বইশীট উপন্যাস এখানে উপহার দেওয়া হল তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসই এমন রুদ্ধশ্বাস যে কোনটি ছেড়ে কোনটি দেওয়া হবে সেটাই মুশকিল। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বেঙলি সম্পর্কে প্রচুর চিঠিপত্র পেয়েছি আমরা—‘ভর’, ‘কালো মুখ সান চামড়া’, ‘অভিশপ্ত ৩৭’, ‘আতঙ্ক যখন হিলিতে’, ‘ছত্রিশগড়ের ভাঙা গড়’, ‘ডোডো’, ‘বামনের কঙ্কাল’, ‘মড়ার খুলি ও মামা’, ‘পাথরমহল’, ‘ম্যাকবেরথের তরোয়াল’—এইরকম বাছা বাছা উপন্যাস দেওয়া হয়েছে এখানে। এ ছাড়াও অবশ্য প্রচুর উপন্যাস তিনি লিখেছেন। গল্প লিখেছেন আরো অনেক। একটিমাত্র গল্প এখানে আছে, ‘পাশের ঘরেই সে আছে’।

দুর্ভাগ্য মানবেন্দ্র পাল আর আমাদের মধ্যে নেই। প্রয়াত সাহিত্যিকের একদা রোমাঞ্চকর ভৌতিক কাহিনিগুলি যদি পাঠক-পাঠিকাদের আগের মতোই মুগ্ধ করতে পারে, সেই হবে তাঁর প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি।



মানবেন্দ্র পাল

কথাসাহিত্যিক মানবেন্দ্র পাল (১৯২৬-২০১১) একদা ‘যুগান্তর’ ও অন্যান্য পত্রিকায় একের পর এক অবিস্মরণীয় গল্প লিখে পাঠকদের মুগ্ধ করেছিলেন। আসলে এমন কোনো পত্রিকা নেই বোধহয় যেখানে তিনি লেখেননি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের প্রকাশন শাখার ডেপুটি ডিরেকটর।

নবকল্লোল পত্রিকার নিয়মিত এই লেখক ছোটদের জন্য ভৌতিক উপন্যাস ও গল্প লিখতে শুরু করেন শুকতারা পত্রিকায়। বড়োদের লেখার মতোই ছোটদের লেখাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বিশেষত ছোটদের জন্য লেখা ভৌতিক গল্প ও উপন্যাসে তিনি যেন তাদের মনমুগ্ধ করে রেখেছিলেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের ওপর কত যে রুদ্ধশ্বাস কাহিনি তিনি তাদের উপহার দিয়েছেন তার শেষ নেই। তাঁর প্রত্যেকটি লেখারই বৈশিষ্ট্য এই যে একবার শুরু করলে তা শেষ না করে ছাড়া অসম্ভব।

বড়োদের জন্য লেখা গল্প-উপন্যাস নিয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ তাঁর প্রকাশিত হয়েছে। ছোটদের রোমাঞ্চকর ভৌতিক উপন্যাসও দেব সাহিত্য কুটীর থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে, যেমন—জীবন্ত কঙ্কাল, আতঙ্ক, অশরীরী আতঙ্ক প্রভৃতি। কিন্তু শুকতারায় প্রকাশিত তাঁর গল্প-উপন্যাস থেকে একটি অমনিবাস ভলিউম প্রকাশের চেষ্টা এই প্রথম। আশা করা যায় গ্রন্থটি পাঠকরা রুদ্ধশ্বাসে উপভোগ করবে।

# ভৌতিক অমনিবাস

মানবেন্দ্র পাল



---

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

**BHAUTIK AMNIBAS**

**Manabendra Paul**

( A Collection of Bhautik Rahasya Galpa & Upanyas )

CODE NO. 93 B 26

ISBN : 978-93-5060-004-7

Dev Sahitya Kutir Pvt. Ltd.

21, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009

Tel : 2350-4294/4295/7887

**প্রথম প্রকাশ :** বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৪, মাঘ ১৪২০

দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ২১, বামাপুকুর লেন,

কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে শ্রীঅরুণ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক

প্রকাশিত এবং বি. সি. মজুমদার কর্তৃক বি. পি. এম'স

প্রিন্টিং প্রেস, রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর, উত্তর ২৪

পরগনা থেকে মুদ্রিত। বর্ণ সংস্থাপন :

প্রদ্যুৎ সাহা, ৭, কামারডাঙ্গা রোড,

কলকাতা-৭০০ ০৪৬

**প্রচ্ছদ :** গৌতম দাশগুপ্ত

**দাম :** ২২৫.০০ টাকা





## প্রকাশকের কথা

কথাসাহিত্যিক মানবেন্দ্র পালকে শিশুসাহিত্যের ভোজে রোমাঞ্চকর গল্প পরিবেশন করতে আমরাই আমন্ত্রণ জানাই। সে আহ্বান সাড়া দিয়ে পঁচিশ বছরের ওপর ছোটদের জনপ্রিয় পত্রিকা গুণকতারা তিনি নিয়মিত রোমহর্ষক উপন্যাস ও গল্প লিখে এসেছেন। এগুলি ছোটদের কাছে এত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল যে আজ কথাসাহিত্যিক মানবেন্দ্র পালকে চিনতে যদি সামান্য অসুবিধাও কারো হয়, গা-ছমছম গল্প-উপন্যাসের লেখক মানবেন্দ্র পালকে অনেকেই এক কথার চিনে নিতে পারবেন—ছোটরা তো বটেই, ছোট পাঠকের বাবা-মা-রাও, কারণ এ পত্রিকা ছোটদের কাছ থেকে কাড়াকাড়ি করে নিয়ে তাঁরাও যে পড়তেন এ কথা আমরা জানি। পঁচিশ বছরের ওপর লেখা এই প্রচুর গল্প-উপন্যাস নিয়ে একটা বড়োসড়ো বই করার কথা আমরা অনেক দিন ধরেই ভেবেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, জীবিত অবস্থায় তাঁর এই বই আমরা বার করতে পারলাম না। সাধুনা এই যে, প্রয়াত সাহিত্যিকের স্মৃতির উদ্দেশে এই বইটি নিবেদনের সুযোগ অন্তত আমরা পেলাম।

গুণকতারা পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলিকে এক কথায় ভৌতিক বা অতিপ্রাকৃত গল্প বলা গেলেও মানবেন্দ্র পালের গল্প যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন এইসব ভৌতিক গল্পেরও কত রকমফের আছে। সেখানে যেমন আছে অভিশপ্ত আত্মার গল্প, তেমনি আছে ভ্যামপায়ারের গল্প, আছে অ্যান্টিক বস্তুর সঙ্গে জড়িত পিশাচের গল্প। যে গল্পই হোক তাকে রুদ্ধশ্বাস সাসপেন্সের মোড়কে মুড়ে ফেলার ক্ষমতা তাঁর ছিল। ফলে গল্পই হোক বা উপন্যাস, তাঁর এ জাতীয় কাহিনি একবার পড়তে শুরু করলে—পড়তে পড়তে যতই গা ছমছম করুক, যতই গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠুক, বুকের ধক ধক শব্দ যতই বেড়ে যাক, সে গল্প শেষ না করে উঠবার সাধ্য নেই কারো। ভৌতিক গল্পের রোমাঞ্চকর পরিবেশে এইভাবে টেনে রাখবার ক্ষমতা ক'জন লেখকের আছে, জানি না।

১৩৯০ থেকে ১৪১৬ সন পর্যন্ত প্রচুর গল্প-উপন্যাস লিখেছেন মানবেন্দ্র পাল। ইচ্ছে ছিল সবগুলিকেই সাজিয়ে দেব একসঙ্গে, কিন্তু কাজে এগিয়ে দেখা গেল সেটা মোটেই সম্ভব নয়, তাহলে সে বই ছোটরা ভুলতেই পারবে না। এই কারণে ইচ্ছা যা ছিল তার চেয়ে অনেক কম সংখ্যার কাহিনিই এখানে রাখা গেল—মোট একুশটি উপন্যাস আর একটা গল্প। শুধু উপন্যাস রাখাই স্থির হয়েছিল, কিন্তু গল্পেও উনি কেমন সিদ্ধহস্ত সেটা বোঝাবার জন্য একটি গল্পও সঙ্গে দেওয়া হল।

এরকম একটা কাজ করতে গেলে বহু মানুষকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। তাঁদের সবাইকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কিন্তু বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শ্রীকৃষ্ণ চট্টরাজকে। যাদের জন্য এত পরিশ্রম করে এই বই প্রকাশ করা হল, তারা খুশি হলেই আমাদের সকলের যত্ন ও চেষ্টা সার্থক হয়েছে মনে করব।

## সূচীপত্র

১. আতংক যখন হিলিতে	.....	৯
২. কালো মুখ সাদা চামড়া	.....	৪৪
৩. পাশের ঘরেই সে আছে	.....	৭৭
৪. রহস্যময় আলমারি	.....	৮৩
৫. ডোডো	.....	১০৪
৬. মড়ার খুলি ও মামা	.....	১১০
৭. খুনী	.....	১১৮
৮. ওরা চলেছে নিঃশব্দে	.....	১২৬
৯. ভর	.....	১৬০
১০. গভীর রাতের ভয়ঙ্কর	.....	১৭৭
১১. লোহিত সাগরের আতঙ্ক	.....	২০৭
১২. পাথরমহল	.....	২৩১
১৩. রহস্যময় রোগী	.....	২৬৫
১৪. ভৈরব	.....	২৯২
১৫. বামনের কঙ্কাল	.....	২৯৯
১৬. সুলতানের কবর	.....	৩২০
১৭. গভীর রাতের আগন্তুক	.....	৩৪২
১৮. ভয়	.....	৩৬৩
১৯. অলৌকিক জন্মাদ ও জীবন্ত কঙ্কাল	.....	৩৮৪
২০. ছত্রিশগড়ের ভাঙা গড়	.....	৪১০
২১. ম্যাকবেথের তরোয়াল	.....	৪৩৭
২২. অভিশপ্ত ৩৭	.....	৪৬৯

# অতিরিক্ত সংযোজন

## উপন্যাস

অশরীরী আতঙ্ক

.....

১

## গল্প

আতঙ্ক

রহস্যময়ী

অলৌকিক ক্যালেন্ডার

বাইসনের শিং

নিষেধ

অন্ধকার সিঁড়ি

ভয় পেয়েছিলাম

নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে

# আতংক যখন হিলিতে

॥ এক ॥

পাহাড়ি রাস্তায় হাজার ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি চালাতে হয়। খুব অভিজ্ঞ ড্রাইভার না নিলে বিপদের সম্ভাবনা। তা আমাদের ড্রাইভার বিক্রম থাপা ভালোই গাড়ি চালাচ্ছে। ‘শার্প কার্ড’-এর মতো বিপদসংকুল জায়গাগুলোও গৌয়ার ড্রাইভারের মতো ফুল স্পিডে না চালিয়ে স্পিড কমিয়ে খুব সাবধানে চালায়। এতে আমরা খুশি। শিলিগুড়ি থেকে ওঠার সময় থেকেই আমরা ওকে বলেছি—তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আমরা স্রেফ বেড়াতে বেরিয়েছি। এই সময়ে পাহাড়ে ফুলের শোভা—বিশেষ করে রডোডেনড্রনের সমারোহ দেখবার মতো।

বিক্রমের অবশ্য এসব কথায় কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, নিজের ইচ্ছেমতো যেমন স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছিল তেমনি চালিয়ে যেতে লাগল।

গাড়িটা আমরা ভাড়া করেছিলাম শিলিগুড়ি থেকে। আমরা বার্সে যাব শুনে গ্যারেজের মালিক একটু চুপ করে ছিলেন। শাস্তনু জিগ্যেস করেছিল—কী ভাবছেন? কোনো অসুবিধে আছে?

গ্যারেজের মালিক বলেছিলেন—আর কিছু নয়, অত উঁচুতে—

উঁচু আর এমন কী? ৯০০০ ফুট।

মালিক হেসে বলেছিলেন—‘হিলে’ই তো ৯০০০ ফুট। তারপর চার কিলোমিটার ঢাল। গাড়ি যাবে না। হাঁটতে পারবেন তো?

শাস্তনু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব পারব।

ওখানে ভালো হোটেল-টোটেল আছে তো? মানে বেশ আরামদায়ক। মাংকিক্যাপ থেকে শুধু ঠোঁট দুটি বার করে প্রশ্ন করেছিলেন বরুপাক্ষদা।

হোটেল? পাশের দুজন ড্রাইভার শ্রেণির লোকের দিকে তাকিয়ে হাসলেন গ্যারেজের মালিক।

হোটেলের আশা করে যাবেন না, স্যার। পথে সরাইখানা যদি দু-একটা পান তাহলে ভাগ্য বলতে হবে।

তা হলে শাস্তনুভায়া, আমি ফিরে চললাম।

সে আবার কী? আপনারই উৎসাহে—

হ্যাঁ, পাহাড়ে সমতলে বেড়াতে ভালোবাসি বলে এই দুর্ধর্ষ শীতে হোটেল পাব না! নিউমোনিয়ায় পৈত্রিক প্রাণটা এই পাহাড়ের রাজ্যে হারাব নাকি?

অবস্থা বুঝে গ্যারেজের মালিক ভরসা দিয়ে বললেন—হোটেল নিশ্চয় পাবেন তবে বার্সেতে নয়। বার্সেতে পৌঁছাবার আগেই। সেখানেই রাতটা আরাম করে কাটিয়ে পরের দিন সকালে ফের রওনা দিয়ে বার্সেতে পৌঁছে যাবেন।

এ কথায় বিরপাক্ষদা তখনকার মতো শান্ত হলেও ড্রাইভারকে নিয়ে ঘটল বিপত্তি।

ভালো ড্রাইভারের কথা বলতে গ্যারেজের মালিক বিক্রমকে দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু বিক্রম গোড়া থেকে সেই যে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল তখনও তেমনি রইল।

কি রে যাবি? জিগ্যেস করলেন মালিক।

বিক্রম মাথা নাড়ল। যাবে না।

কেন?

তার উত্তরে ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথা বলল যা থেকে বোঝা গেল ও যেতে চায় না এটাই আসল কথা।

তারপর আমরা বেশি টাকার লোভ দেখালেও ও যখন যেতে রাজি হল না তখন আমরা মুশকিলে পড়লাম। কেন যাবে না তার কারণ কিছুই বোঝা গেল না। শুধু বিক্রমই নয়, সংক্রামক ব্যাধির মতো ‘না’ কথাটা ছড়িয়ে গেল সব ড্রাইভারের মুখে।

অনেক অনুরোধে গ্যারাজের মালিক আমাদের আড়ালে বিক্রমকে বোঝাতে লাগলেন। একটু পরে ফিরে এসে বললেন, এক কাজ করুন। আপনাদের তো উদ্দেশ্য এই সময়ে পাহাড়ের ফুলের শোভা দেখা। তাহলে ‘সোমবারিয়া’, ‘হিলে’ হয়ে ‘বার্সে’ না গিয়ে জোংরি হয়ে ইয়ক্সম পর্যন্ত গাড়িতে যান। তারপর কিছুটা হাঁটা পথ। এই পথ দিয়ে যেতে সব ড্রাইভার রাজি। এখানেও প্রকৃতির অফুরন্ত শোভা। যে দিকেই তাকাবেন দেখবেন সবুজের সমারোহ। এত সবুজ সমতল কোথাও নেই।

শান্তনু ঠোঁটের ফাঁকে হেসে বলল, সবই তো ঠিক। কিন্তু আসল কথাটাই চেপে গেলেন। ঐ যে বললেন ‘কিছুটা পথ’—সেটা কি সঠিক জানেন কতটা?

মালিক মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, না, ঠিক জানি না, তবে—

তবে-টবে নয়, আমি জানি পাক্ষা ছাব্বিশ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হবে। আর সে পথ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। রীতিমতো নির্জন।

মালিক লজ্জিত হয়ে বললেন—তা হবে।

শান্তনু বলল, শুনুন, আমরা বুঝতে পারছি না কোনো ড্রাইভার ঐ পথ দিয়ে যেতে চাইছে না কেন। তবে ঐ পথ দিয়েই আমরা ‘বার্সে’ যাব। আমাদের যেমন প্রোগ্রাম করা আছে তেমনিই থাকবে। দেখি তাহলে অন্য কোনো গাড়ি পাওয়া যায় কিনা।

আমরা ফিরে যাবার জন্যে উঠতেই মালিক বললেন, দাঁড়ান, আর একবার কথা বলে দেখি। আবার কথা বলতে উঠলেন। এরপর কাজ হল।

বিক্রম থাপা রাজি। তবে সন্দের আগেই বার্সের অনেক আগে ‘হিলে’ পৌঁছাতে চায়। তার বেশি যাবে না।

শান্তনু বলল, পাহাড়ে রাস্তায় এমনিতেই তো সন্দের সময় গাড়ি চালানো নিষেধ।

বিক্রম বলল, তা তো সকলেরই জানা, আমি বলছি পথে কোথাও হস্ট করা চলবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ‘হিলে’ পৌঁছতে হবে।

বেশ, তাই হবে।

আর একটা কথা, স্যার। পথে যদি কেউ এমনকি পুলিশও গাড়ি দাঁড় করিয়ে ন্যাকামি করে জিগ্যেস করে আজ কী বার? বলবেন, সরি, খেয়াল নেই। কিছুতেই যেন বলে ফেলবেন না—আজ শনিবার! প্লিজ স্যার, একথাটা মনে রাখবেন।

জিগ্যোস করলাম, কেন?

আমাকে থামিয়ে দিয়ে শান্তনু বিক্রমকে বলল, ঠিক আছে। রাজি।

থ্যাক ইউ, স্যার! বলে বিক্রম এবার চটপট গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল।

নিচু গলায় বললাম, হঠাৎ বার নিয়ে লুকোচুরি?

ফিসফিস করে শান্তনু বলল, এসব অঞ্চলে কত রকমের কুসংস্কার।

এই সময়ে বিরূপাক্ষদা বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, সবই কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিলে হবে না, ভায়া। আমাদের যাত্রাটাই অপয়া। আমি তো গোড়া থেকেই বলছি, ফুল দেখতে হিমালয়ে! এমন কথা কে কবে কস্মিনকালে শুনেছে! তাও গরমকালে নয়, মার্চ মাসের গোড়ায়! মার্চ মাস তো ওখানে ভরা শীতের সময়। জানলার কাচটা ভালো করে ফেলে দাও না। শীতে মলাম যে!

বললাম, কাচ তো ফেলাই আছে।

তা হলে ঠান্ডা ঢুকছে কোথা দিয়ে?

কাচের শার্সিটা ঠিকমতো লাগেনি বলে শান্তনু খানিকটা কাগজ গুঁজে দিয়ে বাতাস আটকে দিল।

কী ঝকঝকি রে বাবা! ফুল দেখতে পাহাড়ে! কেন আমাদের দেশে কি ফুল নেই? গোলাপ, বেল, জুই, গাঁদা, রজনীগন্ধা, টগর, ডালিয়া—

শান্তনু রাগাবার জন্য বলল, কিন্তু ম্যাগনোলিয়া, ম্যাপল, পাইন, ওক, ফার, আরও কত কী!

বললাম, আসল নামটাই তো বললে না—‘রডোডেনড্রন’?

ওটা না দেখলে বোঝানো যাবে না।

বিরূপাক্ষদা এসব কথা বুঝতে চান না। তিনি যেন কোনো ভালো প্রস্তাবেও প্রথম থেকে বিরূপ। উৎসাহ করে কোনো প্রস্তাব দিলে উনি প্রথমই বলে উঠবেন, ‘পাগলের প্রলাপ’। তাই আমরা ওঁকে ‘বিরূপাক্ষ’র বদলে ‘বিরূপ’দা বলে ডাকি। ভালো কথাতেও উনি বিরূপ। অন্তত প্রথমটা। তবু কোনো দূরপথে যেতে গেলে ওঁকে না পেলে যেন মন ভরে না। ঐ যে ওঁর মাংকিক্যাপ, ঐ যে মাংকিক্যাপের উপর দিয়ে মাফলারটা ভালো করে জড়ানো, ঐ যে গলার সবচেয়ে ওপরের বোতামটাও আটকানো, ঐ যে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঝুল সেকলে অলেস্টার—এমন অদ্ভুত পোশাকে মোড়া মানুষের যেন তুলনা নেই। তিনি সাধারণত ধুতি পরেন। প্যান্ট পরার অভ্যাস নেই। কিন্তু যেহেতু পর্বত আরোহণ করতে চলেছেন, অতএব তাঁকে ফুল প্যান্ট পরতেই হয়েছে। কথায় বলে, ‘অনভ্যাসের ফাঁটা কপাল চচ্চড়’—তাঁরও সেই দশা। প্যান্ট তাঁর পেট থেকে নেমে নেমে যাচ্ছে—ঢলঢল করছে। আর উনি প্রতিনিয়তই—থাক সে কথা।

এঁকে না হলে যেমন আমাদের চলে না তেমনি আমাদের না হলে ওঁরও চলে না। আসলে তিনি নিজেও ভ্রমণ করতে ভালোবাসেন। তা বলে তাঁর সমবয়সীদের সঙ্গে নয়, আমাদের মতো ছোকরাদের সঙ্গে।

শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে গাড়ি ক্রমশই ওপরে উঠছে। আবার তিস্তা। টানা দেখা দেয় না। মাঝে মাঝে অন্তর্ধান করে। আবার ক্ষণেকের জন্যে দেখা মেলে। এ যেন লুকোচুরি খেলা। একটু পরে পাওয়া গেল রংগীতকে। যেন তিস্তার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। দূরে ঢেউ খেলানো

পাহাড়ের সারি। উইন্ডস্ক্রিনের মধ্যে দিয়ে দেখছি। প্রকৃতির এই রূপ তো শস্যশ্যামল সমতলদেশে মেলে না।

ও বিরূপদা, আপনি ঢুলছেন!

বিরূপাক্ষদা অর্ধনিমীলিত চোখে একবার তাকালেন—ঢুলব না তো কী করব? তোমাদের মতো শুধু পাহাড় আর খাদ দেখব? কী দেখবার আছে? বলেই মাংকিক্যাপটা ঠিক করে আবার চোখ বুজলেন। চোখ বুজিয়েই বললেন, ও ড্রাইভার-ভায়া, চায়ের দোকান দেখলে একটু থামিও। তুমি যে পক্ষীরাজ ঘোড়া ছোটচ্ছ!

বিক্রম থাপা উত্তর দিল না।

বললাম, এখানে চায়ের দোকান নেই, বিরূপদা। আপনি ঘুমোন।

কিন্তু—

সত্যিই তো! বড়ো জোরে চালাচ্ছে গাড়ি। আমরা তো বারণ করেছিলাম। তবু—কিসের এত তাড়া?

ভেবেছিলাম বিরূপাক্ষদা বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু না, হঠাৎ তিনি চোখ বুজিয়েই সেই একই কথা নিয়ে বকবক করে চললেন।—পাগল! পাগল না হলে কেউ এই প্রচণ্ড ঠান্ডায় ফুলের বাহার দেখার জন্যে পাহাড়ে পাহাড়ে ছোট্টে!

বিরূপদা, কিছু বলছেন?

বলব আর কী! তোমাদের পাল্লায় পড়ে এই বয়েসে আমার ‘লাইফ’ খতম হতে চলেছে।

কিন্তু আপনি তো পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে ভালোবাসেন।

হ্যাঁ, এক্সকারশান, অ্যাডভেঞ্চার আমি ছোটবেলা থেকেই ভালোবাসি। তবে তা ফুলের শোভা কিংবা নদীর কুলকুল গান শোনার জন্যে নয়। হ্যাঁ, বুঝতাম যদি বৃহৎ শিকারের জন্যে কোথাও গেলাম—

‘বৃহৎ শিকার’ জিনিসটা কী, দাদা?

যা নিছক পাখি, খরগোশ মারা নয়। যা লেপার্ড, হিমালিয়ান ব্ল্যাক বিয়ারের পিছু পিছু চেজ করতে করতে গুলি করে মারা।

অবাক হলে গেলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠল বহুদিনের পরিচিত তাঁর সেই গোল মুখ, ভারী গাল, মোটা বেঁটেখাটো, থপথপে চেহারা যা কোনোরকমেই শিকারীর উপযুক্ত নয়।

শাস্তনু বলল, কিন্তু আপনি কি জীবনে কোনোদিন বন্দুক ধরেছেন? গুলি ছোড়া তো পরের কথা।

এইবার বিরূপদা চোখ মেলে তাকালেন, বললেন, আমি বন্দুক ধরতে যাব ফেন? ‘হান্টার’দের সঙ্গে থাকব। বাহবা দেব। সেটাও একটা কাজ। ফুটবল খেলায় দেখ না প্লেয়ারদের চেয়ে চাঁচাবার লোক অনেকগুণ বেশি। এও তেমনি।

হান্টার!—হাসলাম আমরা। কথায় জোর দেবার জন্যে বিরূপদা মাঝে মাঝেই প্রচলিত সহজ বাংলার বদলে ইংরিজি বললেন। যেমন একদিন বললেন, ‘নো নো, আমি ওর মধ্যে নেই।’ আর একদিন বললেন, ‘আমার ‘ফাদার’ ছিলেন অহিংস প্রকৃতির মানুষ।’ ইত্যাদি।

হান্টারদের সঙ্গে থাকলে তো শুধু থাকাই হবে। শিকার করা হবে না।

তা না হোক এনজয় তো করা হবে।

এ যাত্রায় শিকারে যাওয়া হল না। তাহলে?



পারের বার অন্য কিছু ভাবব। তবে কিছুতেই ফুল দেখতে কিংবা পাহাড়ে সূর্য ডোবা দেখতে যাব না। এই দুটো ছাড়া যে কোনো অ্যাডভেঞ্চার করতে—

মানে—যেখানে ভয়-ভয়, গা-ছমছমে কিছু—

বুঝেছি, যেখানে ভয় থাকবে কিন্তু বিপদ থাকবে না। তাই তো?

বিরূপদা যেন ধরা পড়ে গেলেন। দাঁতের ফাঁকে একটু হাসলেন।

হঠাৎ বিক্রম গাড়ির স্পিড কমিয়ে হাত পিছনে ফিরিয়ে সবাইকে কম কথা বলতে ইঙ্গিত করল।

আমরা তো অবাক। এতখানি পথ। রহস্য-রসিকতাও করা চলবে না? কিন্তু কারণ জিগ্যেস করতে ভরসা পেলাম না। গাড়িতে উঠে পর্যন্ত যা গম্ভীর হয়ে আছে! গম্ভীর হয়ে থাকাই কি বিক্রম থাপার স্বভাব, না কোনো বিপদের আশঙ্কা করছে ও! ঈশ্বর জানেন!

আমরা এখন আরও ওপরে উঠে এসেছি। রংগীত নদীর তীরে জায়গাটার নাম জোরথাং। দক্ষিণ সিকিমের একটি বড়ো ব্যবসাকেন্দ্র।

জায়গাটা ভালোই মনে হল। ঠিক করলাম এখানে নেমে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। কারণ পথে কোথাও এরকম জায়গা পাওয়া যাবে কি না কে জানে! গাড়ি থেকে নেমে একটা মোটামুটি রেস্টুরেন্ট গোছের চায়ের দোকান পাওয়া গেল। আমরা চারটে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম।

বিক্রম থাপা কিন্তু এখনও কোনো কথা বলছে না। একপাশে বসে খেতে খেতে কেবলই আকাশের দিকে তাকাচ্ছে।

আশ্চর্য! কী আছে আকাশে? এমন রৌদ্রোজ্জ্বল বেলা এগারোটায়?

হঠাৎ এই সময়ে বিক্রম এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসল।

ও যেখানে বসেছিল তার সামনেই হাত দু-একের ব্যবধানে হোটেলের ম্যানেজারের টেবিল। টেবিলে একটা প্লেটে কিছু মশলা, ক্লিপ করা কতকগুলো ফর্দ আর সরু একটা খাতা। আর একটা ডেস্ক-ক্যালেন্ডার! ড্রয়ারটা খোলা। এইমাত্র একজন খন্দের পয়সা দিয়ে গেল। ড্রয়ারটা খুলে রেখেই ম্যানেজার কিচেনে ঢুকলেন বোধহয় তদারকি করতে। বিক্রম তার চেয়ার থেকে বডিটা তুলে এক মুহূর্তের জন্যে হাত বাড়াল। তার পরেই হাত গুটিয়ে চুপচাপ নিজের চেয়ারে বসে কফির পেয়ালায় চুমুক দিল।

কিছু বোঝবার আগেই বিরূপদা নিঃশব্দে আমার গায়ে আঙুলের খোঁচা দিলেন। চাপা গলায় বললেন, দেখলে আমাদের গুণধর মৌনীবাবা বিক্রমের খেলা? কিছু একটা হাতসাফাই করল।

শান্তনু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, কিছুই হাতসাফাই করেনি। ডেস্ক-ক্যালেন্ডারের বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপা SATURDAY কথাটা উন্টে দিয়ে চোখের আড়াল করে দিল।

কেন?

শান্তনু যথাসম্ভব নিচু গলায় বলল, তা বলতে পারব না। হয়তো ঐ কথাটায় ওর এলার্জি হয়। বলে হাসল।

এ আবার কী রহস্য রে বাবা! গজগজ করে উঠলেন বিরূপাক্ষদা।

॥ দুই ॥

চা আর টুকটাক কিছু খেয়ে নিয়ে আমরা একঘণ্টার মধ্যে গাড়িতে গিয়ে বসলাম। পেটে খিদে ছিল। কিন্তু বিরূপাক্ষদা বারবার সাবধান করে দিয়েছিলেন, ভারী কিছু খাবে না ভায়ারা। পথে-ঘাটে হালকা খাওয়াই উচিত।

তাঁর এই সাবধানবাণীটা শিরোধার্য করে নিয়েছিলাম আমরা।

গাড়িতে উঠেই বিক্রম স্টার্ট করে দিল। তার যেন একমুহূর্ত বিলম্ব সহ্য হচ্ছিল না। কীসের যে এত তাড়া বুঝতে পারছিলাম না। পাহাড়ের গা বেয়ে নুড়ি বিছানো আঁকাবাঁকা পথ ক্রমশ উঠে গেছে ওপরের দিকে। এই ভেবে আশ্চর্য হই যে, পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা এই দুর্গম জায়গায় কে তৈরি করেছিল এই পথ! কী করে তাঁরা জেনেছিলেন এই পথের শেষ ঠিকানা কোথায়? সত্যি, ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে যাই।

এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়। প্রকৃতি যেন খেয়ালের বশে পর পর পাথর, গাছপালা দিয়ে দুর্লভ্য প্রাচীরের পর প্রাচীর সৃষ্টি করে রেখেছেন। মনে হচ্ছে পাঁচিল টপকালেই অজানা রহস্যময় কোনো জগৎ খুঁজে পাওয়া যাবে।

ওপরে উঠতে উঠতেই দেখা যাচ্ছিল পাহাড়ের ঢালে অনেক নীচে ছোটো ছোটো ঘরবাড়ি। সবুজের পটভূমিতে আঁকা যেন অপরূপ ছবি। কিন্তু—ওগুলো কী?

এত ওপর থেকেও দেখা যাচ্ছি প্রায় প্রত্যেক বাড়ির ওপরে বাঁশে বেঁধে ওড়ানো হয়েছে রঙ-বেরঙের লম্বা কাপড়ের পতাকা। দূর থেকে ভারী সুন্দর লাগছে দেখতে।

আমি বিক্রমকে জিগেস করিনি। (জিগেস করে লাভ নেই। কারণ ও তো কথাই বলছে না)। কিন্তু ওই হঠাৎ উত্তর দিল—‘প্রয়ার ফ্ল্যাগ’। বলেই দু’হাত তুলে কারও উদ্দেশে বার-কয়েক নমস্কার করল।

বিরূপাক্ষদা চোখ বন্ধ করেই ছিলেন, এবার চোখ খুললেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে জিগেস করলেন, কীসের প্রয়ার? কার কাছে?

এবার উত্তর দিল শান্তনু। বলল, অশুভ শক্তি তাড়াবার জন্যে নানা জায়গায় বিশেষ করে নির্জন জায়গায় ধর্মপুস্তক থেকে কোনো অমৃত বাণী লিখে লিখে টাঙিয়ে দেয় এখানকার মানুষ। এরা এমন অনেক কিছু বিশ্বাস করে যা আমরা ভাবতে পারি না। ‘অশুভ শক্তি’ মানে বুঝতে পারছেন তো, বিরূপদা?

বিরূপদা উত্তর দিলেন না। মুখ আরও গম্ভীর করে বসে রইলেন।

একটু হেসে শান্তনু বলতে লাগল, কলকাতায় একজন ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল— ডাঃ দাস। কিছুকাল ভুটানে ছিলেন। সাউদার্ন ভুটানের ডিস্ট্রিক্ট টাউন সরভং। সেখানে সরকারি হাসপাতালে ডাক্তার (M.O) হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলতেন এইসব পাহাড়ি অঞ্চলের সাধারণ দরিদ্র মানুষজন ভূতে শুধু বিশ্বাস করাই নয়, প্রচণ্ড ভয় পায়। এরা তাই বাড়ির আনাচে কানাচে লাল-সাদা পতাকায় বুদ্ধের বাণী লিখে টাঙিয়ে দেয়। তাদের বিশ্বাস পতাকাগুলো যত নড়বে বুদ্ধের বাণী ততই অভয়বার্তা নিয়ে ছড়িয়ে পড়বে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে।

বিরূপাক্ষদা হাঁ করে শুনছিলেন। বলে উঠলেন, ও বাবা এখানেও ভূত! তবে কি আমরা ভূতের রাজ্যের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি? কোথাও আর নিস্তার নেই। বলে মাংকিক্যাপের উপর দিয়ে গরম চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিলেন। যেন কোনো ফাঁক দিয়ে ভূতের নিঃশ্বাসটুকুও ঢুকতে না পারে।

হাসতে হাসতে বললাম, কোনো ভূতের গল্প-টল্প?

শান্তনু বলল, বলেছিলেন বৈকি! একেবারে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। শুনবে?

বলেই শান্তনু শুরু করল, দাস সাহেবের কোয়ার্টারটি পাহাড়ের ওপর। বেশ সুন্দর। কিন্তু ওখানে থাকতে না থাকতেই ছন্দপতন। রুগি থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য ডাক্তাররাও বলতে লাগলেন, দাস সাহেব, একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন। সন্ধ্যার পর যেন মোটেই বেরোবেন না। বিশেষ করে পাহাড়তলিতে। জায়গাটা নাকি খারাপ। তারপর একদিন—

হঠাৎ বিরূপাক্ষদা রেগে-মেগে বলে উঠলেন, জায়গাটা যখন খারাপ বলে জেনেছ তখন ওসব নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ কী?

শান্তনু হেসে বলল, ভয় পাচ্ছেন নাকি?

বিরূপাক্ষদা বললেন, স্থান-কাল ভেদে সব মানুষই ভয় পায়। ভয়ের কারণ যেখানে থাকে সেখানে তার ভয় না পাওয়াটা স্বাভাবিক নয়।

বললাম, তবে যে বললেন, ‘বৃহৎ শিকারে’ যেতে চান—হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার, রেডপান্ডা, আরো কত সব বৃহৎ জন্তু?

বিরূপাক্ষদা বললেন, ওদের কথা আলাদা। ওদের রক্ত-মাংসের শরীর আছে। বন্দুক ছুড়লে গায়ে লাগে। মরে। আর এরা? নাও আর কথা বাড়িও না। ও বাবা! থাপা সাহেব যে গাড়িটা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে! এবারে খাদে ফেলবে আর অশরীরীদের দলে আমাদেরও নাম লেখাবে।

সত্যি বিক্রমের আবার কী হল? জোরে চালাচ্ছিলই, এখন বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছে আর গাড়ির স্পিড বাড়াচ্ছে। পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি ছুটছে—নুড়িগুলো চাকার ধাক্কায় ছিটকে যাচ্ছে—যেন গুলি বৃষ্টি করছে! কেবলই মনে হচ্ছে এইবার বুঝি গাড়িটা উন্টে গড়িয়ে পড়বে পাশের গভীর গর্তে।

সত্যিই পাহাড়ের আবহাওয়ার মর্জি বোঝা দায়। এই মিষ্টি রোদ—তারপরেই হঠাৎ মেঘলা হয়ে গেল চারিদিক। শুরু হল টিপ টিপ বৃষ্টি। আবার একটু পরেই রোদ্দুর। এইজেনেই ভ্রমণকারীরা ইংরেজিতে একটা কথা বলে থাকেন, ‘হিমালয়ের আবহাওয়া আনপ্রেডিক্টেবল।’

এতক্ষণ দূরে দূরে কারু, র্যাটং, নরসিং প্রভৃতি যে পর্বতশিখরগুলি দেখা যাচ্ছিল হঠাৎ সেগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। চারিদিক থেকে রাশি রাশি ভাসমান তুলোর মতো কী যেন এগিয়ে আসতে লাগল। আমি আতংকিত হয়ে পড়লাম। মনে হতে লাগল একটু পরেই ঐ ভাসমান তুলোর মতো ভয়ংকর জিনিসগুলো গাড়ির মধ্যে ঢুকে আমাদের দম বন্ধ করে মেরে দেবে।

এদিকে থাপা প্রাণপণে এক্সেলারেটারে ক্রমাগত চাপ দিয়েই যাচ্ছে। গাড়ি কখনও হেলতে দুলতে চলেছে—কখনও ঘটং ঘটং করে লাফাতে লাফাতে। বিক্রমের চুলগুলো মাথার ওপর খাড়া হয়ে উঠেছে। সে এক ভয়ংকর দৃশ্য।

এইবার বিরূপাক্ষদা হাঁকড়ে উঠলেন, ড্রাইভার, গাড়ি সামলে চালাও। কী পেয়েছে আমাদের? খাঁচায় আটকানো কতকগুলো ইঁদুর। তোমাকে পুলিশে দেব।

বিক্রম উত্তর দেবার দরকার মনে করল না। হঠাৎ ও উইন্ডস্ক্রিনের দিকে ঝুঁকে পড়ে চোখ ছোটো করে কী যেন লক্ষ করতে লাগল। গাড়ির স্পিড কমাতে লাগল। হঠাৎ থাপার এ আবার কী হল? ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম ও কেমন যেন মিইয়ে গেছে। সেই অবস্থাতেই ও চট করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে একটা দোলানি দিয়ে গাড়িটাকে বাঁ পাশে নিয়ে এল।

আমরা চমকে উঠলাম। সামনে অল্প দূরে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল একটা বলদে-টানা গাড়ি। একটাই বলদ। খুবই হস্টপুষ্ট। কুচকুচে কালো রঙ। তার শিঙ দুটোতে সিঁদুর মাখানো। দু'দিকে তীক্ষ্ণ ফলা লাগানো একটা লম্বা শিক বলদটার নাক এঁফোড়-ওফোড় করে দু'দিকে বেরিয়ে পড়েছে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে। আর—

সেই ছাউনিহীন গাড়িতে চালকের আসনে বসে আছে যে, সাক্ষাৎ যমদূতের মতো তার চেহারা। এই প্রচণ্ড ঠান্ডায় তার গায়ে শুধু একটা চাদর আর মাথায় পাগড়ি। দু'চোখ লাল। কপাল জুড়ে সিঁদুর মাখা। একেবারে আমাদের গাড়ির সামনে এসে কোমরে দু'হাত রেখে দাঁড়াল।

বিক্রম গাড়ি থামিয়ে নীচে নেমে হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসল। আমরা তো অবাক! তারপর চলল দুজনের পাহাড়ি ভাষায় তর্ক-বিতর্ক। না, তর্কও নয়, বিতর্কও নয়। একজন ক্রমাগত চোখ গোল গোল করে ধমক দিয়ে যাচ্ছে আর আকাশের দিকে আঙুল তুলে কী দেখাচ্ছে। অপর দিকে আমাদের থাপা বাহাদুর হাত জোড় করে মুখ কাঁচুমাচু করে কিছু একটা উত্তর দিচ্ছে। বারকয়েক পাহাড়ি ভাষায় 'শনিবার' কথাটা শোনা গেল। হাবেভাবে যতটুকু বোঝা গেল তা হচ্ছে যমদূত সদৃশ লোকটি বিক্রমকে ধমকাচ্ছে, কেন সে আজ এই পথে এল? বলছে, আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো। তুমি কি জান না এর পরিণতি কী? তুমি কি ভুলে গেছ আজ কী বার?

শান্তনু নিচু গলায় বলল, ও বোধ হয় এ অঞ্চলের একজন গুরু—মাতব্বর। এরা পাহাড়িদের কাছে পূজো পায়। দেবতার মতোই। এমন শুনেছি সেই ডাক্তার দাসের মুখে। সহজে এদের মতো উচ্চস্তরের মানুষের নাকি দেখা পাওয়া যায় না।

তবে এ লোকটা ভালো। সে সাবধান করে কী যেন বলল, অমনি বিক্রম সভয়ে পিছনে তাকিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল। আর আশ্চর্য! বলদের গাড়িটা সামনে তো এগোলই না যদিও থেকে এসেছিল সেদিকেও গেল না। পাশের ঢাল দিয়ে দ্রুত নামতে লাগল—চাষের ভূঁই তছনছ করে।

আমরা তো হতবাক! ব্যাপারটা কী হল? কেন মাতব্বরটি সামনে গেল না, কেনই বা ফিরেও গেল না? যেন কোনো কিছুর আভাস পেয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি নেমে গেল!

আমরা যেন নিজেদেরকেই প্রশ্ন করলাম! নিজেরাই উত্তর খুঁজলাম। শেষ পর্যন্ত নিজেরাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে চুপ করে গেলাম।

কেবলই শুনছি স্যাটারডে, স্যাটারডে—ব্যাপারটা কী হে!—গলার স্বর উঁচু করেই জিগ্যেস করলেন বিরূপাক্ষদা।

শান্তনু চাপা গলায় বলল, কিছু একটা ঘটনা আছে, যা আমরা জানি না। জানতে চাই এটাও হয়তো চায় না কেউ। বলে ইশারায় বিক্রমকে দেখিয়ে দিল। তারপর ফিসফিস করে বলল, আমাদের একেবার চুপ করে থাকাই উচিত।

‘ভয় পেয়ে বিরূপাক্ষদা বললেন, ও বাবা! ফুল দেখতে বেরিয়েও স্পিকটি নট!

হ্যাঁ, অন্তত ‘হিলে’ পৌঁছানো পর্যন্ত।

এমনি সময়ে গুড় গুড় করে কয়েকবার মেঘ ডেকে উঠল। বিদ্যুৎচমকে পাহাড়ের ওপর গাছগুলোকে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিল। তারপরই প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। গগনচুম্বী পাহাড়ের শ্রেণিতে বজ্রপাত দেখেছ তোমরা? না দেখে থাকলে ভালোই। সুন্দরও যে সময়ে সময়ে কত ভয়ংকর হয় তা না দেখলে বুঝতে পারবে না।

বাজের শব্দে বিরূপাক্ষদা ওঁর ভারী শরীরটা নিয়ে প্রায় আধ হাত লাফিয়ে উঠেছিলেন। পড়ে যাচ্ছিলেন, কোনো-রকমে ড্রাইভারের সিটটা আঁকড়ে ধরে সামলে নিলেন। তারপর দু'কান চেপে ধরে জিগ্যেস করলেন, বাজটা কোথায় পড়ল হে? খুব কাছেই মনে হচ্ছে?

শান্তনু আঙুল দিয়ে একটা বিশাল উঁচু পাহাড়ের শৃঙ্গ দেখিয়ে দিল। দেখিয়ে দিল পাহাড়ের ওপর ছোটো ছোটো গাছপালা বাজের আওনে দাউ দাউ করে জ্বলছে। মনে হচ্ছে যেন—পাহাড়টা আগুনের মালা মাথায় জড়িয়ে ম্যাজিক দেখাচ্ছে। দেখতে দেখতেই চোখে পড়ল আগুনের কয়েকটা স্ফুলিঙ্গ পাশের পাহাড়ের গাছে গিয়ে পড়ল। যেন অগ্নিবৃষ্টি করছে।

চমকে উঠলাম সবাই। কী সর্বনাশ! দাবানল হয়ে যাবে নাকি?

হয়নি। রক্ষে, এই সময়ে নামল বৃষ্টি।

আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল ড্রাইভার বিক্রমের ছটফটানি। গাড়ি চালাতে চালাতেই সে ফিরে ফিরে কাচ লাগানো স্ক্রিন দিয়ে দেখছিল। বৃষ্টি জোরে হচ্ছিল না। তাই বাইরের জিনিস মোটামুটি দেখা যাচ্ছিল।

বিক্রম সেই গাড়িতে ওঠার পর থেকে কেবল আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল। এখন তাকাচ্ছে পিছনের দিকে। কী যেন বারবার দেখার চেষ্টা করছে। ও যেন নিশ্চিত জানে আজ যখন শনিবার আর আকাশ থেকে যখন জল পড়েছে বজ্রপাতের সঙ্গে তখন কিছু একটা দেখা যাবেই। না ভালো নয়—ভালো নয়—মোটাই ভালো নয়। তবু যদি ওর একান্তই আবির্ভাব ঘটে তাহলে আগে থেকেই প্রস্তুত হতে হবে।

হঠাৎ বিক্রম অতিমাত্রায় সতর্ক হয়ে উঠল। ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

শান্তনু চৈঁচিয়ে উঠল, এ কী করছ? অ্যাকসিডেন্ট হবে যে!

ও কোনোরকমে অদ্ভুত কায়দায় গাড়ি সামলে বাঁ হাত তুলে পিছনের রাস্তাটা দেখিয়ে দিল। আমরা ঘাড় ঘোরালাম। স্ক্রিনের ভিতর দিয়ে বাইরে তেমন কিছু দেখা গেল না। সেই পাথর ছড়ানো উঁচু-নিচু পথ, পথের একপাশ থেকে মাথা উঁচু করে উঠেছে পাহাড়, অন্য পাশে গভীর গর্ত বা খাদ। তার পিছনে ঘন কুয়াশা। কিন্তু বিক্রম এরই মধ্যে দিয়ে কিছু দেখতে পেয়েছিল। তাই মুহূর্মুহ তার মুখের ভাব বদলাচ্ছিল।

কই হে, কিছুই তো দেখছি না। অনেক কষ্টে বিরূপাক্ষদা তাঁর দেহভার উত্তোলন করে কোনোরকমে ঘাড়টা ফিরিয়েছিলেন। তারপরেই তিনি যেন চমকে উঠলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কী যেন আসছে!

কী আসছে?

আমি আর শান্তনু ফের ঝুঁকে পড়লাম। হাঁ, পিছনে অনেক দূরে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে কী যেন—বৃষ্টির মতোই নেমে আসছে—

কী ওটা?

বিক্রম না দেখেই বলল, কুকুর।

কুকুর! ও কীরকম কুকুর?

দেহের তুলনায় মুখটা বীভৎস রকম বড়ো ও ছুঁচলো। ছুটে আসছে। লক্ষ আমাদের গাড়িটা।

চোখে ধাঁধা লেগে যাচ্ছিল। বিক্রমকে উদ্দেশ্য করে বললাম, ওটা তো কুকুর মনে হচ্ছে না।

তা হলে দেখুন বোধহয় বানর।

সে আবার কী? বিরূপাক্ষদা বললেন, ম্যাজিক না কি? এই বলছ কুকুর, তার পরই বলছ বানর! তাজ্জব!

আপনিই দেখুন না।

বিরূপাক্ষদা বললেন, আমার নজর কি অতদূরে পৌঁছাবে?

শান্তনু হঠাৎ গভীর গলায় বলল, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কুকুর নয়, বানরও নয়, কুচকুচে কালো কিছু একটা দু'পায়ে ভর দিয়ে হাঁটছে। লম্বা হাত দুটো পাশে ঝুলছে। ঠিক যেন ওরাং ওটাং!

হিমালয়ের পাহাড়ে ওরাং ওটাং!

তার চেয়ে অবাক কাণ্ড চেয়ে দ্যাখো কী জোরে ছুটে আসছে। ...

বিক্রম তখন ভয়ংকর কিছু বুঝে স্টিয়ারিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে মরিয়া হয়ে স্পিড তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

ও শান্তনু, আমার তো মনে হয় বানরও নয়, ওরাং ওটাংও নয়, একটা মানুষ—

তাই তো। হাঁটুর নীচে পর্যন্ত ঝোলা ঢিলে ওয়াটারপ্রুফ গায়ে ঢলঢল করছে। মাথায় কানে ওয়াটারপ্রুফ টুপি। ছুটে আসছে এই দিকে।

কী ওটা?

একবার মনে হল কুকুর, একবার মনে হল বানর। আবার পরক্ষণেই মনে হল ওরাং ওটাং। আর এখন মনে হচ্ছে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছে বর্ষাতি জড়ানো লম্বা একটা মানুষ! এ তো একটা রহস্য! আর কেনই বা উঁচু পাহাড়ের পথ দিয়ে ছুটে আসছে? কেনই বা ওর লক্ষ আমাদের গাড়িটা?

এসবের উত্তর একমাত্র দিতে পারে আমাদের ড্রাইভার বিক্রম থাপা। কিন্তু ও তো গাড়িতে উঠে পর্যন্ত মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। তারই বা কারণ কী? ও কি জানে এই পথে বৃষ্টি পড়লে এই অদ্ভুত পাহাড়ি জীবটির আবির্ভাব হয়? সেই জনেই এই পথে আসতে চায়নি। আর এও জানে ঐ যে বছরপী জীবটি গায়ে ওয়াটারপ্রুফ জড়িয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে সে নিশ্চয় কলা, শাঁকালুভোজী প্রাণী নয়। আর আমাদের সঙ্গে নিছক আলাপ করার জন্যে ছুটে আসছে তাও নয়।

ও ভাই থাপাজি, কিছু একটা বলো। পেছনে ধাওয়া করে আসছে ওটা কী?

থাপাজি উত্তর দিল না। বাঁ হাতটা তুলে শুধু কথা বলতে বারণ করল।

দেখতে দেখতে ওয়াটারপ্রুফওলা ঢ্যাঙা লোকটা হুড়মুড় করে কাছে এসে পড়ল। একটা ছুটু গাড়িকে ধরে ফেলে আর কি! এও আশ্চর্যের কথা! একটা মানুষ কী করে দৌড়ে একটা গাড়ির নাগাল পায়—যে গাড়িটা পাহাড়ের রাস্তাতেও অ্যাকসিডেন্টের ভয় তুচ্ছ করে ছুটছে দুর্দান্ত গতিতে!

আমরা বুঝতে পারলাম এসব রহস্য বিক্রম ভালো করেই জানে। আর হিংস্র লোকটার নাগালের মধ্যে এসে পড়লে কী পরিণতি হবে তাও তার অজানা নয়। অথচ পালানো ছাড়া পরিত্রাণের উপায় আর কী হতে পারে তা বোধহয় থাপাজি জানে না। এ অবস্থায় আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম। একবার বিরূপাক্ষদাকে দেখলাম। চোখ বুজিয়ে শুধু ইষ্টনাম জপ করে যাচ্ছেন।

আকাশে এখন জমাট মেঘ তেমন নেই। তবু মেঘ আছে। টিপিটিপ বৃষ্টিও পড়ছিল।

মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমকানি। বিক্রম আগের মতোই আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। আর বিভিড় করে কিছু যেন প্রার্থনা করছে।

হঠাৎ মনে হল পিছনে যেন একটা ঝড়ের আভাস। অথচ আশেপাশে ঝড়ের চিহ্নমাত্র নেই। ঘাড় ঘোরাতেই চমকে উঠলাম। এখন আর পায়ে হেঁটে নয়, দু'পা শূন্যে তুলে ভেসে আসছে মানুষটা। এখন প্রায় দশ হাতের মধ্যে এসে পড়েছে। বোঝাই যাচ্ছে একবার নাগালের মধ্যে পেলে ঐ মানুষের আকারবিশিষ্ট জীবটা কী করবে।

এই সময়ে বৃষ্টিটা যেন প্রায় থেমে এল। আর তৎক্ষণাৎ অসাধারণ তৎপরতায় বিক্রম স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়িটাকে নিয়ে গেল পাহাড়ের কোল দিয়ে অন্যদিকে। সেখানে পৌঁছতে— কোথায় বৃষ্টি —কোথায় ঝড়—কোথায় বা মেঘ ডাকা! একেবারে দুপুরবেলার সোনা গলানো রোদ!

পিছনে তাকিয়ে দেখলাম কোনো জীবজন্তুর চিহ্নমাত্র নেই। শুধু পাহাড়ের পর পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে একরাশ চাপা রহস্য বৃকে নিয়ে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। সবচেয়ে নিশ্চিত হয়েছি যেন বিক্রম। বার বার পিছনে ফিরে সেই পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে মাথা নত করতে লাগল। যেন কোনো অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানাল।

কিন্তু এতক্ষণ ধরে ব্যাপারটা কী ঘটল বুঝতে পারলাম না।

শান্তনু বলল, আমিও ঠিক জানি না। দেখি বিক্রম যদি এখন কিছু বলে!

গাড়ির স্পিড বিশেষ না কমিয়ে বিক্রম গাড়ি চালাচ্ছে। 'হিলে' এখনও প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। বিক্রমকে খুশি করার জন্য শান্তনু এবার ভাঙা ভাঙা পাহাড়ি ভাষায় জিগ্যেস করল, এখানে যা ঘটল সে বিষয়ে কিছু বলো। আমরা তো শুধু ভয়ই পেয়ে গেলাম। কিছু বুঝলাম না।

উত্তরে বিক্রম কোনো কথা না বলে স্টিয়ারিং থেকে বাঁ হাতটা তুলে শুধু একবার কায়দা করে ঘুরিয়ে দিল। তার অর্থ কী তা ঠিকমতো বুঝতে না পারলেও এটুকু বোঝা যায় যে, হয় সে নিজেও জানে না, নয় তো সে বলতে পারবে না।

অগত্যা আমাদের চুপ করে থাকতে হল। বিরূপাক্ষদা শুধু অধৈর্য হয়ে গজগজ করতে লাগলেন। বললেন, এ তো আচ্ছা রহস্য!—বলে যেন অনেকটা নিশ্চিত হয়ে শার্সি বন্ধ জানালায় মাথা ঠেকিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলেন।

গাড়ি এখন চলছে অনেকটা স্বাভাবিক গতিতে। তবু বিক্রম গাড়ি চালাতে চালাতেই মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছে। এতেও আমার ভয়—না জানি আবার কী হয়।

আমি ইশারাতে শান্তনুকে জিগ্যেস করলাম, এত ঘড়ি দেখার ঘটা কেন?

শান্তনু বললে, বাঃ! মনে নেই আমাদের সঙ্গে তো কথাই ছিল বেলা থাকতে থাকতেই এসে পৌঁছতে হবে 'হিলে'তে।

তার মানে এখনও যথেষ্ট ভয় আছে।

শান্তনু একটিপ নসি নিয়ে বলল, ভয় পেয়েছি ঠিক। কিন্তু বিপদে পড়িনি এখনও। একটুর জন্যে মৃত্যুর ছোঁওয়া থেকে বেঁচে গিয়েছি।

হ্যাঁ, বেঁচে গিয়েছি বিক্রমের তৎপরতার জন্যে। কিন্তু ওকে ধন্যবাদ জানিয়েও লাভ নেই। ও তো কথাই শুনবে না। আচ্ছা, বিক্রমের রহস্যটা কী বলে মনে হয় তোমার?

কী করে বলব? তুমিও যেখানে আমিও সেখানে। হয়তো আমি হিমালয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরেছি কয়েকবার, তা বলে এমন রহস্যময় ঘটনা কখনো ঘটতে দেখিনি। শুধু বিক্রম

কেন, জানতে ইচ্ছে করে কেন কোনো ড্রাইভার আসতে চায় না? কেন শনিবারটা যাত্রা করা নিষেধ? ঐ যে বহুরূপী মূর্তিটা—কে ও? কেন, কী করে কখনও কুকুর, কখনও ওরাং ওটাং, কখনও মানুষের রূপ ধরছিল? বিজ্ঞানের যুগে একি সম্ভব? তা যদি না হয় তাহলে বলতেই হয়, সবটাই চোখের ভুল। পাহাড়ের মায়া।

কিন্তু এও তো গৌজামিলের কথা। আমরা তো সম্পূর্ণ দেখলাম শেষ মুহূর্তে মনুষ্যমূর্তি জীবটি গাড়ির দিকে ওয়টারপ্রফটা ছুড়ে দিয়ে আমাদের আটকাতে চেয়েছিল। এ তো চোখের ভুল হতে পারে না। তাই না?

শান্তনু বলল, মনে হয় এসবের উত্তর আমরা পেতে পারি বার্সে পৌঁছে, ওখানকার কেউ না কেউ হয়তো জানতে পারে।

বললাম, হয়তো তাই, ও—আচ্ছা, আমাদের বার্সে পৌঁছে দিয়ে বিক্রম আমাদের নিয়ে ফিরবে তো? নাকি ফেলে পালাবে? তা হলেই তো চিন্তির!

শান্তনু বলল, আমাদের নিয়ে ফিরতে না পারে। সেটা তার ইচ্ছে। কিন্তু আজ হিলে পৌঁছে ওকে নাইট হন্ট করতেই হবে। রাত্রে পাহাড়ি রাস্তায় যাবে না। ফিরলে কাল সকালে। তবে এ কথাও ঠিক—এ পথ দিয়ে ফিরবে না। আর আমাদের না নিয়ে ফিরলে ওর লাভ কী?

বিরূপাক্ষদা হঠাৎ অর্ধৈক্য হয়ে বলে উঠলেন, এই ড্রাইভার সাহেব, গাড়িটা একবার রোখো। লং জার্নি—একটু নামার দরকার হয় তা কি তুমি বোঝ না?

কিন্তু থাপা শুনতেই পেল না। এবার শান্তনু ওকে একটু ঠেলা দিয়ে পাহাড়ি ভাষায় গাড়িটা একটু দাঁড় করাতে বলল। বিক্রম যেন বিরক্ত হয়েই একধারে গাড়িটি দাঁড় করাল।

বিরূপাক্ষদা দরজা খোলবার জন্যে ব্যস্ত হলেন। কিন্তু দরজার কলকল ঠিক বোঝেন না। শুরু করলেন ধাক্কাধাক্কি। বিক্রম ইশারায় বিরূপাক্ষদাকে নিরস্ত করে পিছু না ফিরেই ডান হাত বাড়িয়ে লকটা খুলে দিল। সবাইকে উদ্দেশ্য করে এতক্ষণে বিক্রম মাত্র আধখানা করা বলল, 'Ten minutes only.' বলে দশটা আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল।

ঠিক আছে। বলে এ দরজা দিয়ে আমি আর শান্তনু নেমে পড়লাম। আঃ! কী মুক্ত প্রকৃতি! এতক্ষণ বন্ধ গাড়ির মধ্যে থেকে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, এখন বেরোতেই শীত ধরে গেল। হাত-পা একটু খেলিয়ে নেবার জন্যে আমরা প্রথমে আলিসিয়া ভেঙে তারপর জোরে জোরে পা ফেলে খানিকটা হাঁটলাম। একবার পিছনে ফিরে দেখলাম বিরূপদা আপাদমস্তক গরম কম্বল মুড়ে গুটি-গুটি এদিকে আসছেন। কিন্তু বিক্রম কোথায় গেল? ও কি নামেনি? আশ্চর্য! এতখানি জার্নি করেও কি একবার মাটিতে পা রাখার দরকার ওর হয় না?

যাই হোক, বিক্রমের জন্যে ভাবার দরকার নেই। এসব অঞ্চলে আগে ঘুরেছে। বিরূপাক্ষদাকে নিয়েই যত ভাবনা। এই যে আমরা ওঁকে ফেলে এগিয়ে এসেছি তাতে উনি আমাদের প্রতি বিরূপ।

খাস হিমালয়ের গোটা পাহাড়ের একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে এর আগে আমরা কখনো নগ্ন পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখার সুযোগ পাইনি। আজই দেখলাম, পাহাড়ের গায়ে যে জমা শ্যাওলা তারও মধ্যে যেন একটা বিশেষত্ব আছে। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে কতরকম গাছের চারা। একেবারে শীর্ষে বড়ো বড়ো গাছ যেন আকাশকে ধরতে চাইছে। তাছাড়া আছে হরেকরকমের ফুল। বেশির ভাগই ভায়োলেট কালার। কোনো কোনো সাদা ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে রঙের শোভা। কোথাও থোকা থোকা লাল টকটকে ফুল। আর সেইসব ফুলে



উড়ে এসে বসছে কতরকমের প্রজাপতি। আমরা তন্ময় হয়ে দেখছিলাম। শান্তনু উত্তেজিত হয়ে বলল, আরে ঐ তো রডোডেনড্রন! দ্যাখো কেমন থোকা থোকা লাল ফুল। এই ফুল দেখে আর কোথায় কোনো ফুল মনে পড়ে বলো তো!

বললাম, আমাদের গরমকালের পলাশ। বসন্তে বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় যেন আগুন ধরিয়ে দেয়।

রাইট! সিকিমিরা রডোডেনড্রনকে নাকি ‘গুরাস’ বলে। গুরাস ফুটলে গ্রামের সিকিমিরা আনন্দে মেতে ওঠে।

গুরাসও কি এমনি লাল?—বোকার মতোই প্রশ্ন করি।

শান্তনু হেসে বলল, লাল তো বটেই। যখন বলছি রডোডেনড্রন—এরই আর এক নাম ‘গুরাস’।

লজ্জিত হয়ে বললাম, স্যরি!

তবে এক রকমের সাদা গুরাসও নাকি হয়। দারুণ সুন্দর। আরে! ঐ তো সাদা গুরাস! কতো বড়ো! দ্যাখো দ্যাখো। চলো, ফুলটা তুলে আনি। যে ক’দিন পারি অচেনা পাহাড়ি বন্ধুর স্মৃতি হিসেবে রেখে দেব।

আমরা এগিয়ে গিয়ে ফুলটা তুলতে যাচ্ছি। হঠাৎ ভুইফোঁড়ের মতো জঙ্গলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল সেই বলদে টানা গাড়ির অদ্ভুত দর্শন লোকটি। যাকে দেখেছিলাম অনেক দূর পিছনে। চমকে উঠলাম। সেই সিঁদুর লেপা চওড়া কপাল। সেই খালি গা। হাতের ইশারায় ফুলটা ছুঁতে নিষেধ করল। তারপর সে একটি মাত্র কথা বলেই উধাও হয়ে গেল। কথাটার অর্থ আমি সঠিক বুঝতে না পারলেও শান্তনু বুঝতে পেরে বলল, ভয়ানক বিষ। কোনো-রকমে ঠোটে ঠেকালেই মৃত্যু। এমনকি হাত দিয়ে ছুঁলেও তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে ফেলতে হয়। নইলে ভুলে মুখে ঠেকিয়ে ফেললে আর রক্ষে নেই।

তা না হয় হল। কিন্তু ভোজবাজির মতো ব্যাপারটা কী হল? শান্তনুও বড়ো আঙুল দিয়ে গাল চুলকোতে চুলকোতে ঐ একটা কথাই বলল, তাই তো। ব্যাপারটা কী হল?

উত্তর তখনই পাওয়া গেল না। রিস্টওয়াচের ওপর চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। দশ মিনিট কখন হয়ে গেছে! চলো—চলো।

আমরা ছড়মুড় করে গাড়ির দিকে চললাম। পাহাড়টা ঘুরতেই যে জায়গাটা সেখানেই তো গাড়িটা থাকার কথা। কিন্তু—

তাহলে আমরাই জায়গা ভুল করেছি। শান্তনু বলল।

বললাম, না, আমরা কিছু ভুল করিনি। ঐ দ্যাখো বিরূপাক্ষদা দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল কী ভাবছেন।

বলিহারি যা হোক! আমাকে একা ফেলে কোথায় গিয়েছিলে তোমরা? গাড়িটাও নিয়ে গেলে?

গাড়িটা নিয়ে গেলাম মানে?

মানে তো আমিই জানতে চাই। এই সরু রাস্তায় গাড়ি নিয়ে যাবার কী এমন দরকার পড়ল?

আমরা আবার গাড়ি নিয়ে কোথায় যাব? আমরা কি গাড়ি চালাতে জানি?

তোমরা চালাতে যাবে কেন? ড্রাইভারকে নিয়েই গেছ।

আমরা অবাক হয়ে দুজনের দিকে তাকালাম। নিশ্চয় বলতে পারতাম এই মায়াবী পাহাড়ি

রাস্তায় এতক্ষণ ধরে ঘুরতে ঘুরতে বিরূপাক্ষদার মাথা গোলমাল হয়ে গেছে। কিন্তু এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলাম গাড়িটা সতিই নেই।

বাঃ রে মজা! ড্রাইভার সুদু মোটর গাড়ি উধাও!

এবার আমাদের দুর্ভাবনা হল। কী সব হচ্ছে!

ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন তো বিরূপাক্ষদা!

খুলে আর বলব কী? প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঐ যোপটার দিকে গিয়েছিলাম। উঠে দাঁড়িয়ে আলিস্যি ভাঙলাম। দেখলাম অজস্র টকটকে লাল ফুল—থোকা থোকা লাল ফুল। শুনেছিলাম রডোডেনড্রন নাকি লালফুল। ভাবলাম এগুলোই যদি রডোডেনড্রন হয় তাহলে তোমাদের ডেকে দেখিয়ে দিই। ব্যাস এখানেই যদি নয়ন সার্থক হয়ে যায় তাহলে আর এগোবার দরকার কী? এই ভেবে ডাকতে গিয়ে দেখি তোমারও নেই গাড়িও নেই। আমি তো ভয়ে কাঁটা। এই জনমানবশূন্য জায়গায় আমি একেবারে একা! ভাবো তো কী অবস্থা!

শান্তনু বলল, এ ব্যাপারটা পরে গাড়িতে বসে ভাবলেও চলবে। এখন আরও গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার কথা হচ্ছে—থাপা আমাদের না জানিয়ে গাড়িটা নিয়ে গেল কোথায়?

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, আমাদের ফেলে রেখে পালাল নাকি?

শান্তনু বলল, পালাবে? কেন পালাবে? আমাদের জঙ্গ করার কারণ তো কিছু ঘটেনি। তাছাড়া ভাড়ার মোটা টাকা হাতছাড়া করবে বিক্রম এমন বুদ্ধ নয়।

আমি ইতস্তত করে বললাম, তবু লোকটাকে তো ঠিক স্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

বিরূপাক্ষদা চোখ গোল গোল করে একবার আমার দিকে একবার শান্তনুর দিকে তাকাচ্ছিলেন আর সভয়ে আমাদের কথা শোনবার এবং মানে বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। এবার আর চূপ করে থাকতে পারলেন না। বলে উঠলেন, পালাবার কথা কী সব বলছ তোমরা একটু স্পষ্ট করে বলো।

দেখছি গাড়িও নেই, বিক্রমও নেই। এর মানে কী হতে পারে তাই আলোচনা করছিলাম।

বিরূপাক্ষদা একেবারে আঁতকে উঠলেন—অ্যাঁ! এসব কী কথা! বিক্রম যদি চলে গিয়ে থাকে তাহলে আমরা যাব কী করে? আর থাকবই বা কোথায়? এ তো মানিকতলা থেকে শ্যামবাজারের মোড় পর্যন্ত কিংবা বাড়ি থেকে বাজার যাওয়া নয়। হায় হায়! শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে মরতে হবে! আমার তো আবার বেজায় ঠান্ডার ধাত! ও শান্তনু, তুমি অমন গোমড়া হয়ে থেকো না।

শান্তনু বলল, না, আমি অন্য কথা ভাবছি।

কী? ভয়ে ভয়ে বিরূপাক্ষদা তাকালেন।

ভাবছি, আমরা শীতে মরব, না হিংস্র প্রাণীদের উদরপূর্তির সহায়ক হব?

আঁতকে উঠলেন বিরূপাক্ষদা—আবার হিংস্র জন্তু-টন্তুর কথা কী বলছ? এই ঘোর বিপদের একেবারে মধ্যখানে দাঁড়িয়ে তোমরা কি মজা করছ? আমায় ভয় দেখাচ্ছ?

শান্তনু মাথা নাড়ল—না বিরূপদা, আমরা অমন বেরসিক নই। চেয়ে দেখুন। এই ছাপগুলো কোন জীবের বলতে পারেন?

চমকে লাফিয়ে উঠে দু'পা পিছিয়ে এসে চশমাটা ঠিক করে নিয়ে ঠাওর করলেন বিরূপাক্ষদা। এ তো কুকুরের পা। ও বাবা এ তো দেখছি অনেকগুলো। এত কুকুর—একসঙ্গে!

কাছাকাছি গেছেন। কিন্তু ফুল মার্কস পেলেন না। এগুলো কুকুরের থাবা নয়। কুকুরের থাবা অন্যরকম। আপনি নেকড়ের থাবা দেখেছেন?

নেকড়ে'র থাবা! কলকাতায় ঘোরাঘুরি করে একটা গোটা নেকড়েই দেখলাম না তো নেকড়ে'র থাবা! কী বলতে চাও তুমি?

শান্তনু গভীর গলায় বলল, এইসব অঞ্চলের পাহাড়ে এক ধরনের নেকড়ে আছে যারা আসল নেকড়ে নয়, তবে নেকড়েদের জাতভাই। ওরা সাধারণত কুকুরের চেয়ে বেশ ছোটো। মাটি শূঁকতে শূঁকতে, সামনের দিকে শরীর ঝুঁকিয়ে, ক্ষিপ্ৰগতিতে ছোটো। নেকড়ে'র চেয়ে আকারে ছোটো। কিন্তু ঢের বেশি হিংস্র। একটা বিদেশী বইয়ে পড়েছিলাম এরা একাই একটা পূর্ণবয়স্ক মানুষকে খেয়ে ফেলতে সময় নেয় আট থেকে দশ মিনিট। মারাত্মক কথা হচ্ছে, এরা থাকে পাহাড়ে। এক জায়গা থেকে বেরিয়ে যখন অন্য জায়গায় যায় তখন দলবদ্ধভাবে ছুটতে ছুটতে যায়। সামনে কেউ পড়লে তার রক্ষা থাকে না।

বিক্রমপাক্ষদা বললেন, ও বাবা, তুমি এতও জান। গোয়েন্দাকেও হার মানাও দেখছি। তা এতগুলি নেকড়ে-শাবক একযোগে গেলেন কোথায়? 'পুনরাগমনায় চ'— ফিরে আসার জন্যে যায়নি তো?

মনে হয় ফিরবে আর এই পথ দিয়েই। আমি যতদূর পড়েছি তাতে জেনেছি এদের স্বভাবই এই—দিক পরিবর্তন করে না।

এমনি সময়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। আর মিনিট তিনেকের মধ্যেই পাইন বনের মধ্যে থেকে আমাদের গাড়িখানাকে আসতে দেখা গেল।

শান্তনু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল—আরে বিক্রমজি, কাঁহা গিয়া থা?

বিক্রম তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে দিল।

জলদি স্যার!

কোনোরকমে আমরা ঢুকতে ও গাড়ি স্টার্ট দিল। সংক্ষেপে যা বলল তা এই—

গাড়ি থেকে আমরা নেমে গেলেও বিক্রম নামেনি। কারণ সে জানত শনিবার দিনটা এখানে বড় অশুভ দিন। অনেক অঘটন ঘটে। সে এও জানত এইরকম কোনো জায়গায় এইরকম সময়ে উত্তরের পাহাড় থেকে দলবদ্ধ হয়ে নেমে আসে এক ধরনের জীব। তাদের সামনে পড়লে কারোর রক্ষা নেই। সে জন্যে সে ভাবছিল কী করবে?

গাড়িটা রাস্তা জুড়ে রাখা ঠিক নয়। ওদের জন্যে পথ ছেড়ে রাখতে হবে। কিন্তু ঠিক কখন কোন পথে ওরা নামবে সেটাই বুঝতে পারছিল না। আর তখনই চোখে পড়ল দূরে উত্তরের একটা পাহাড়ের দিকে। দেখল ছাই রঙের কী একদল জন্তু পাহাড়ের গায়ে গা মিলিয়ে সার বেঁধে নেমে আসছে। তখনই বিক্রম বুঝতে পারল আর একমুহূর্ত দেরি করা যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি নিয়ে সে পথ থেকে পাশের গভীর ঝোপের দিকে চলে এসেছিল।

ওরা কি দক্ষিণের পাহাড়গুলোর দিকে গেল?

হ্যাঁ।

আবার ফিরবে কখন?

তার ঠিক নেই। ফিরলে এই পথ দিয়েই ফিরবে। কথা শেষ করতে না করতেই বিক্রম হঠাৎ স্পিড বাড়িয়ে দিল।

কী হল?

ঐ দেখুন। ওরা নেমে আসছে।

যাক কী ভাগ্যি, ওরা এদিকে এল না। চলে গেল উত্তরের পাহাড়ের দিকে। যে পথ দিয়ে এসেছিল।

## ॥ তিন ॥

অতঃপর একঘণ্টার মধ্যেই অর্থাৎ বিকেল তিনটে বাজবার আগেই আমরা ‘হিলে’ এসে পৌঁছলাম। পাহাড় ঘেরা ৯০০০ ফুট উঁচুতে ছোট্ট জায়গা। না গ্রাম, না পাহাড়। এখানে পৌঁছানোর পরই বিক্রম একেবারে অন্য মানুষ। মনের মধ্যে যেন একটা চাপা ভয় ছিল সেটা চলে গেছে।

যেখানে গাড়ি থামল সেটা গাড়ির স্ট্যান্ড। নানা দিক থেকে বাস আসে। কোনোটা আসে জোরথাং থেকে, কোনোটা সোমবারিয়া থেকে। তবে হুড়মুড় করে আসে না। তিন চার ঘণ্টা অন্তর। তার কারণ পাহাড়ি রাস্তা। সন্দের ঢের আগেই বাস চলাচল বন্ধ করে দিতে হয়। আরও যে সব জায়গা থেকে আসে তার নাম জানা নেই।

বিক্রম নেমেই চলে গেল কাছেই যে চায়ের দোকানে ড্রাইভাররা বসে সেখানে। অনেকক্ষণ গল্প করতে পারেনি। মন-প্রাণ আনচান করছিল।

আমরাও গাড়ি থেকে নেমে পড়েছি। বিরূপাক্ষদা মাটিতে পা দিয়েই বলে উঠলেন, রাতে থাকব কোথায়? ভালো হোটেল-টোটেল....

হেসে হুড়া কেটে বললাম, ‘মোটো মা রাঁধে না, তপ্ত আর পাস্তা!’ ভালো হোটেল মাথায় থাকুক, একটা মাথা গাঁজার মতো সরাইখানা পেলেই ভাগ্যি বলে মানব।

বিরূপাক্ষদা কথাটা শুনেও যেন শুনলেন না। বললেন, ওহে শাস্তনু, থাপা গেল কোথায়? ভাববেন না, বলেই শাস্তনু ডাকল, বিক্রমজি—

বিক্রম এসে দাঁড়াল।

তোমার ভাড়া কি মিটিয়ে দেব?

মিটিয়ে দেবেন? মানে ছেড়ে দেবেন? তারপর ফিরবেন কার গাড়িতে?

শাস্তনু তাড়াতাড়ি বলল, না—না, ছেড়ে দেব কেন? আসলে আমরা বুঝতে পারছি না আমরাই বা থাকব কোথায়? আর খাবই বা কোথায়?

বিক্রম বলল, আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু আপনারা কী করবেন দেখুন।

আমরা কাল বার্সে যাব। চার কিলোমিটার পথ। দরকার হলে হেঁটেই যাব। (এ কথা শুনে বিরূপাক্ষদা মুখ কিছু না বললেও আঁৎকে উঠলেন) এসেছি তো বেড়াতে। এখন রাস্তিরে থাকার ব্যবস্থা কোথায় করব?

বিরূপাক্ষদা বললেন, কোথা ফাইভ স্টার মার্কা হোটেল-টোটেল—বেড়াতে এসেছি, টাকার মায়া করলে কি হয়?

খুব ঠান্ডা বলে এখন বিক্রম কাশ্মীরিদের মতো টুপি পরেছে। তার ফর্সা চ্যাপ্টা মুখে মানিয়েছে ভালো। টুপিটা ঠিক করে বসিয়ে নিয়ে চিস্তিত মুখে বলল, তেমন হোটেল তো এখানে নেই।

না না, ‘তেমন’ হোটেলের দরকার নেই। যেমন-তেমন পেলেই হল। বলল শাস্তনু।

চলুন দেখি। বলে বিক্রম আমাদের নিয়ে চলল। দু-তিনটে হোটেল দেখাল। প্রথমটা খুব নোংরা। দ্বিতীয়টা ছোটো বলেই চার-পাঁচজন বোর্ডারের বেশি জায়গা দিতে পারে না। বলল, এঁরা আগেই ‘বুক’ করে এসেছেন।

এইটুকু শুনেই হতাশ হয়ে বিরূপাক্ষদা বলে উঠলেন, তাহলে কি পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—

শান্তনু ধমক দিয়ে বলল, অল্পেতেই এত হতাশ হয়ে পড়েন কেন? চেষ্টা তো করা হচ্ছে। ছোট্ট জায়গা। কটাই বা হোটেল থাকতে পারে?

তারপর শান্তনু বিক্রমকে বলল, যা হোক কোনো ব্যবস্থা তো তোমাকেই করতে হবে। বিক্রম নিরুপায় হয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। বাসের একজন খালাসিকে দেখতে পেয়ে ডাকল। পরিচিত লোক। বিক্রম তাকে আড়ালে অবস্থা বুঝিয়ে বলল, একটা থাকার ব্যবস্থা কি করা যায় বলো তো!

লোকটা চিন্তা করে বলল, হোটেল আর নেই। তবে ‘সুইট হোমে’ একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

শান্তনু উৎসাহিত হয়ে বলল, তাই চলুন।

বিক্রম একটু চিন্তা করে বলল, ওটা কোনো হোটেল নয়। প্রাইভেট বাড়ি। পেয়িং গেস্ট হিসেবে যতদিন খুশি থাকতে পারেন।

তা খারাপ কী? চার্জ কি খুব বেশি?

না, মডারেট। কিন্তু মালিক একজন চিনা মহিলা।

চিনেম্যান!—দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন বিরূপাক্ষদা।

বললাম, ‘চিনেম্যান’ নয় বিরূপদা, ‘চিনা ওম্যান’।

ও-ই হল। কিন্তু চিনে খানা—মানে—আরশোলা, টিকটিকি খেতে পারব না। একটা টৌকি আর লেপ কি মিলবে?

খাবার কথাটা শুনে বিক্রম আর তার সঙ্গী দুজনেই হাসল।

শান্তনু বলল, আরশোলা, ব্যাঙ, সাপ খেতে হবে না। হাতরুটি আর তরকারি পাওয়া যাবে তো, বিক্রম?

অনেক। বুঝিয়ে দিল বিক্রম। সঙ্গে মাংস।

কীসের মাংস ভাই? আতংকিত বিরূপাক্ষদা বুঁকে পড়ে জিগ্যেস করলেন।

যে মাংস খেতে চাইবেন। দরকার হলে রেস্টোরাঁ থেকে আনিয়ে দেবে।

তবে চলো। এখন কিছু খেতে হবে। তারপর লেপমুড়ির ব্যবস্থা। হাত দুটো জমে গেছে।

কিন্তু বিক্রম যেন কিছু চিন্তা করছে।

এনি প্রবলেম? আর কোনো সমস্যা?

জায়গাটা কিন্তু একটু দূরে। আর—

মুখ শুকিয়ে গেল আমাদের। যদি বা আশ্রয়ের একটা সন্ধান পাওয়া গেল তাও দূরে। আর এই অবেলায়!

তবু কতদূরে?

বিক্রম মনে মনে হিসেব করে বলল, তা দু-কিলোমিটার তো বটেই। ঐ যে পাহাড়টা দেখছেন ওর ঢালের মুখে। জায়গাটা অবশ্য খুবই ভালো লাগবে আপনাদের। খুব কাম অ্যান্ড কোয়ায়েট।

বুঝতে পেরেছি। অর্থাৎ নির্জন—জনমানবশূন্য—

ভয়ংকর। বলে উঠলেন বিরক্ত বিরূপাক্ষদা। ‘কিন্তু আর’—বলে কী বলতে যাচ্ছিলে, ভাই বিক্রম?

না, কিছু নয়। দাঁড়ান, গাড়িটা আনি—বলে চলে গেল।

‘সুইট হোমের’ সামনে গিয়ে যখন বিক্রম গাড়ি দাঁড় করাল তখন পশ্চিম দিকের আড়ালে

সূর্য নেমে গেছে। পাহাড়গুলোর চূড়া যেন অন্তসূর্যের রাঙা আলোয় ঝলমল করছে।

কোথায় তোমার সেই চিনে গেস্ট হাউস? জিগ্যেস করল শান্তনু!

বিক্রম হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল, ঐ যে সাইনবোর্ড।

তাকিয়ে দেখলাম সাইনবোর্ডে ইংরিজিতে লেখা 'SWEET HOME'। তার নীচে অপেক্ষাকৃত ছোটো অক্ষরে ইংরিজিতে লেখা—প্রোঃ—জো—অ্যান্ড—চিয়াং।

বললাম, একজন চিনা মহিলার প্রাইভেট হোটেলের ইংরিজি নাম!

শান্তনু বলল, বুদ্ধিমতীর পরিচয়। এখানে চিনা ভাষা কে কত বুঝবে? তাই অতিথিশালার নাম দিয়েছে ইংরিজিতে। আর এ অতিথিশালা তো গতানুগতিক নয়, অন্যস্বাদের খাবার পাওয়া যাওয়া সম্ভব সেটা বোঝাবার জন্য প্রোপাইটার নিজের চিনা পরিচয়টুকুও প্রচার করে দিয়েছে।

বিরূপাক্ষদা তাড়া দিলেন, ঠান্ডায় মরে গেলাম। চলো চলো ভেতরে চলো।

বিক্রম জিগ্যেস করল, তাহলে কাল কখন আসব? কালই তো ফিরবেন?

শান্তনু বলল, একটু দাঁড়াও। আগে থাকার ব্যবস্থা করি।

চলে আসছিলাম—বিক্রম থামিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলল, অচেনা জায়গা তো। রাতে ঘর থেকে না বেরোনোই ভালো। বলেই গাড়িতে গিয়ে উঠল।

'হোম'টি লম্বা একতলা। সামনে অনেকখানি জায়গা ঘিরে কম্পাউন্ড। কম্পাউন্ডের মাঝখানে পানপাতা আকারে সিমেণ্টে বাঁধানো একটু বসার জায়গা। সামনেই অফিস ঘর। তার দু'পাশে টানা বারান্দা। বারান্দার ধারে ধারে কয়েকটি ঘর। বোঝাই যাচ্ছে এগুলিতে বোর্ডাররা থাকে।

অফিস ঘরের মেঝেটা কাঠের। কার্পেট বিছানো। ঘরটা মাঝারি সাইজের। আসবাবগুলো খুবই পুরোনো আমলের। কাজেই দামি। ঐরকম কাঠ এখন সচরাচর দেখা যায় না। টেবিলে রয়েছে পোর্টেবল টাইপ মেশিন, একটা টেলিফোন। আর একটা পাথরের কালভেরবের ভয়ংকর মূর্তি। মহিলাটির অল্প দূরে অপেক্ষাকৃত ছোটো একটা টেবিল যেন আগলে বসে আছে এক বৃদ্ধ চিনা। তার মাথায় টুপি, গায়ে কালো কোট, খুতনিতে পাকা দাড়ি। বাদামের মতো দুটো চোখে নিজীব দৃষ্টি। টেবিলে একটুকরো কাচের ফলকে লেখা RECEPTION। পাশেই পর্দা ফেলা একটা ছোটো ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে টাইপরাইটারের টকটক শব্দ।

বিশাল অর্ধবৃত্তাকার একটা টেবিলের সামনে বসে আছেন একজন সুন্দরী চিনা মহিলা। হলদেটে রঙ, সাদা ব্লাউজ গায়ে, নীচে নীল রঙের চাপা স্কার্ট। চকচকে কালো চুলে একটা বিনুনি। মহিলাটি একমনে নখে রঙ মাখাচ্ছিলেন, হঠাৎ অনেকগুলো জুতোর শব্দ শুনে উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের ক্লান্ত মুখ, ধকল-সওয়া জামা-প্যান্টের অবস্থা আর পিঠে ঝোলানো স্যাক দেখে অনুমান করে নিলেন আমরা কী জন্য এখানে এসেছি।

নমস্কে, ওয়েলকাম বলে হেসে হাত জোড় করে নমস্কার করে অভ্যর্থনা করলেন। টেবিলের সামনেই খানকতক গদি-মোড়া চেয়ার ছিল। তাতেই বসলাম।

From Kolkata?

Yes.

সঙ্গে সঙ্গে চিনা মহিলা হেসে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন, বাংলাতেই বলুন, মহাশয়েরা। আমি কুছ কুছ বাংলা বুঝি।

বাংলা বোঝেন জেনে আমরা স্বস্তি পেলাম। বললাম, ধন্যবাদ। শান্তনু প্রথমেই বলল, রুম পাওয়া যাবে তো?

Oh! Yes!

বিক্রপাক্ষদা তবু ইংরিজিতেই (সম্ভবত তিনি ইংরিজি বলতে পারেন জানাবার জন্যেই) বললেন, May we have each a cup of coffee? Hot coffee!

Oh sure! কিন্তু এখানেই থাকেন, না আপনাদের ঘরে গিয়ে আরামসে—হেসেই উত্তর দিলেন মহিলাটি। এবার হাসবার সময়ে তাঁর একটি সোনা বাঁধানো দাঁত দেখা গেল।

ফার্স্ট রাউন্ডটা এখানেই হয়ে যাক।—উৎসাহে বলে উঠলেন বিক্রপাক্ষদা।

O.K. বলে মহিলাটি সেই বুদ্ধকে ডেকে তিন কাপ কফি দেবার কথা বলে দিলেন। কফি খাওয়া হয়ে গেলে চিনা মহিলা টেবিলে লাগানো অদৃশ্য কোনো বোতাম টিপলেন বোধ হয়। দু'মিনিটের মধ্যে একজন ভৃত্য গোছের লোক ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। পরনে চেক চেক লুঙ্গি। গায়ে ভেড়ার লোমের ময়লা সোয়েটার। কণ্ঠনালীটা বেজায় উঁচু। যেন গলার চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

মহিলাটি হিন্দিতে বললেন, ইস্কাইন, এঁরা তিনজন থাকবেন। স্পেশাল কোন ঘরটা দেবে? চার।

ঠিক আছে—বলে মহিলা ড্রয়ার থেকে এক থোকা চাবি বের করে দিলেন।

ইস্কাইন খালি কাপ তিনটে ট্রেতে তুলে নিল। মহিলাটি ইশারায় আমাদের ওর সঙ্গে যেতে বললেন।

এক নজরেই ঘর পছন্দ হয়ে গেল আমাদের। নিতান্ত ছোটো ঘর নয়। পাশাপাশি তিনটে বেড। তাছাড়াও আর একটা উশ্টো দিকে। ঘরটা বেশ গরম। পায়ের কাছে ফর্সা ওয়াড় পরানো পুরু লেপ। লাগাও বাথরুম। বেসিনে সব সময় জল। গরম জলের ব্যবস্থা আছে। বড়ো কথা—ঘরটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বিক্রপাক্ষদা জানলার ধারটা বাদ দিয়ে অন্য দিকে শুলেন। শার্সি লাগানো সব জানলাই শীতের দাপটের জন্য বন্ধ।

থাকার ব্যবস্থা করে আমরা বিক্রমকে জানিয়ে দিলাম। কালই যাব কিনা সকালে জানিয়ে দেওয়া হবে।

রাতের খাওয়াও মন্দ হল না। লুচি আর মুরগির মাংস। তবে অনেক উৎসাহ নিয়ে যেতে বসলেও বিক্রপাক্ষদা ভালো করে যেতে পারলেন না। বললেন, মাথাটা বেজায় ধরে আছে। বলে কপাল টিপে ধরলেন।

বললাম, এবার আপাদমস্তক লেপমুড়ি দিয়ে একটা টানা ঘুম লাগান।

কাল তো আবার কোথায় যেন যেতে হবে। চার মাইল পথ?

শাস্তনু বলল, কালই যেতে হবে তার কোনো মানে নেই। একদিন এখানে রেস্ট নিয়ে—ঠিক আছে। তোমরাও এখন শুয়ে পড়বে?

না, ম্যানেজার মহিলা যদি থাকেন তাহলে খাতা-পত্রে সই-সাবুদগুলো সেরে নেব।

বলে আলো নিভিয়ে বেরোতে যাচ্ছি, উনি হাঁ হাঁ করে উঠলেন—আলো জ্বালা থাক।

ঘরের আলো জ্বলে রেখেই আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। মনটা বেশ ফুরফুরে। সারাদিন শরীর আরে মনের ওপর দিয়ে ধকল গেছে। এখন নিশ্চিত একটা ডেরা পেয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। কিন্তু হঠাৎ পা দুটো যেন আটকে গেল।

ওটা কী? ঐ যে—

শাস্তনু আমার হাতটা চেপে ধরে গতি রুদ্ধ করে দিল।

প্যাসেজের বাল্‌বটা বোধ করি ফিউজ হয়ে গেছে। তাই অন্ধকার। তবু অফিস ঘরে

যে আলো জ্বলছিল ওরই কিছুটা এসে পড়েছিল বারান্দার একদিকে। একটা ছোট্ট বাঁক ফিরলেই অফিস ঘর। আমরা নিশ্চিতই এগোচ্ছিলাম হঠাৎ কুকুরের চেয়ে আকারে কিছু ছোটো কোনো জন্তু চক্ষের নিমেষে ছুটে পাঁচিল টপকে পিছনের ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

কী ওটা?

শান্তনু বলল, বুঝতে পারলাম না। তবে কুকুর নয়, ভাম বা খটাসও নয়, বনবেড়ালও নয়—

আমরা অফিস ঘরে গিয়ে দেখলাম মহিলাটি একটা খাতায় যেন কী লিখছেন। সামনে বসে আছে সেই বৃদ্ধ চিনাটি। বোধহয় সেদিনের হিসেব বুঝিয়ে দিচ্ছে।

আমাদের দেখেই মহিলাটি হেসে অভ্যর্থনা করলেন, আসুন। খাওয়া হল?

বললাম, হ্যাঁ। ভালোই।

আপনাদের সিনিয়ার পার্টনারটি কি শুয়ে পড়েছেন? খাওয়ার কোনো অসুবিধা—  
না, তবে বয়েস হয়েছে তো, ক্লান্তি—

আপনারা কি কালকেই বার্সে চলে যাচ্ছেন?

দেখি! ভাবছি একটা গোটা দিন যদি হিলেই কাটানো যায়—

সেটাই ভালো।

বৃদ্ধ চিনা কী একটা রেজিস্টার নিয়ে এসে দাঁড়াল।

মহিলাটি বললেন, এঁরা কাল থাকবেন। সকালে করলেই হবে।

বৃদ্ধটি চুপচাপ গিয়ে নিজের চেয়ারে বসল।

মহিলাটি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, ওয়ন, আপনি যেতে পারেন।

ওয়ন তখনই খাতাপত্র তুলে রেখে মহিলাটিকে অভিবাদন করে বেরিয়ে গেল।

এবার মহিলাটি আমাদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। যেন জানতে চাইলেন আমরাও এখন শুতে যাব কিনা।

আন্দাজে প্রশ্নটা ধরে নিয়ে উল্টে আমরাই জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি সাধারণত কতক্ষণ অফিস ঘরে থাকেন?

উনি বললেন, যতক্ষণ না বোর্ডাররা সবাই খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ছেন ততক্ষণ থাকি।

একটু থেমে নিজেই বললেন, ক'জনই বা বোর্ডার! এগারোটার মধ্যেই হোম নিস্তর হয়ে যায়।

আপনার এখানে বোর্ডার বেশি নেই বোধহয়।

ঠিকই বলেছেন। আসলে যতই যত্ন-আশ্রি করি, ভালো খাওয়াই, হিলের বাজার থেকে অনেকটা দূরে বলে লোক আসতে চায় না। আবার কখনও কখনও বেশ ভিড় হয়।

আপনি এখানেই থাকেন তো?

হ্যাঁ, এটাই আমার ঘরবাড়ি। আমার মাতামহই সেই কবে নানা জায়গা ঘুরে বহু বিপদ মাথায় নিয়ে হংকং থেকে এখানে আসেন। এই জায়গাটাকেই খুব নিরাপদ মনে করেছিলেন।

শান্তনু বিনীতভাবে বলল, কিছু যদি মনে না করেন তাহলে জিগ্যেস করি বিপদটা কী ধরনের!

উনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, অনেক কিছুই আমার জানা নেই। কারণ, তখন আমি নিতান্তই শিশু। পরেও বাবা-মা আমাকে সব ঘটনা বলত না। তবু যতদূর মনে আছে



সে সময়ে রেড চায়না থেকে অনেককেই পালিয়ে যেতে হচ্ছিল। আমরাও সে দলে ছিলাম। কখনও পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, কখনও বোটে করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। আমার দাদু ছিলেন খুব ষ্ট্রং, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। বিপদে ঘাবড়ে যেতেন না। বাবা জোয়ান হয়েও যা পারত না, দাদু বুড়ো হয়েও তাই করে ফেলতেন।

একটু থেমে বললেন, একদিনের কথা আমার মনে আছে। বিদেশি পুলিশ আমাদের পুরো দলকে তাড়া করেছে। ঠিক কী কারণে রেড চায়না থেকে আমাদের পালানো হয়েছিল জানি না, কেন পুলিশ তাড়া করেছিল তাও আজ পর্যন্ত জানি না। এইটুকু শুধু জানি অন্যদের মতো আমাদেরও কোনো সরকারি কাগজপত্র বা পরিচয়পত্র ছিল না। শেষে সেবার আমরা নৌকা নিয়ে ঐ অঞ্চলের জেলেদের নৌকোর মধ্যে ভিড়ে গিয়েছিলাম। মনে আছে আমাদের নৌকোর ছইটা ছিল ফুটো। বৃষ্টি পড়ছিল। টপটপ করে গায়ে জল পড়ছিল। শীতে খুব কাঁপছিলাম। মা একটা লাল রঙের টুপি মাথায় পরিয়ে দিয়েছিল।

মহিলাটি একটু থামলেন।

শান্তনু জিগ্যেস করল, তারপর?

তারপর অনেক ঘুরে, অনেক বাধা কাটিয়ে আমরা হংকং-এ একটা উদ্বাস্তু কলোনিতে এসে পৌঁছালাম। ভেবেছিলাম এখন নিশ্চিন্ত। কিন্তু তা হল না। একজন বিদেশী পুলিশ অফিসার দাদুর কাছ থেকে মোটা ডলার ঘুষ খেয়েও পেছনে লেগেছিল—আরও টাকা দিতে হবে। যেখানেই পালাই সেখানেই দুশমন হাজির।

সেই বিদেশী পুলিশটা খুবই নিষ্ঠুর ছিল। দাদুর ভালোমানুষির সুযোগ নিয়ে যখন-তখন পিছু পিছু ধাওয়া করে আসত। তার সঙ্গে থাকত একটি ভয়ংকর কুকুর। কখনও থাকত পোষা ওরাং ওটাং জাতীয় বিদেশী হিংস্র পশু। আমাদের পিছনে লেলিয়ে দিত।

তখন বাধ্য হয়ে দাদুকে অন্য ব্যবস্থা করতে হল। সেদিন সঙ্গে থেকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছিল। দাদু পুলিশ অফিসারকে ডেকে আনলেন একটা নির্জন বারে কী কী শর্তে আরও ডলার দেবেন তাই নিয়ে আলোচনা করার জন্যে। তারপর গোপনে মদের গেলাসে বিষ মিশিয়ে মেরে দিয়ে পালিয়ে এলেন। সেদিনের তারিখ আর বার SATURDAY!

এই পর্যন্ত বলে মহিলাটি একটু থামলেন। তারপর বলতে লাগলেন, অনেক খুঁজে শেষ পর্যন্ত এই হিলেতেই পাকাপাকিভাবে আশ্রয় নেন দাদু। কিন্তু তবু—

তবু কী?

এখানেও সেই পুলিশটি—

মানে? সে তো তখন মৃত!

পরে বলব।

শান্তনু বলল, ম্যাডাম, আপনি কি এখুনি উঠবেন?

হাসলেন মহিলাটি। বললেন, কেন? গল্প করবেন?

শান্তনু বলল, কিছু জানবার ছিল। যা আমাদের জ্ঞানের বাইরে।

বাবা! আপনাদের জ্ঞানের বাইরে! তা আমার মতো সামান্য একটা হোটেল-গার্লের পক্ষে—যতটুকু পারেন।

বেশ। কী জানতে চান বলুন।

প্রথমেই জানতে চাই আপনার নাম। টাইটেল। নইলে কথা বলার অসুবিধে হবে।

আমার নাম! উনি একটু অবাক হয়ে তাকালেন। জানেন না? তারপর ড্রয়ার থেকে

একটা কার্ড বের করে দিলেন। তাতে লেখা 'SWEET HOME'। নীচে প্রোপাইটারের নাম ছাপা।

তাই তো! এই নামই তো বাইরের সাইনবোর্ডে জ্বলজ্বল করছে।

ধন্যবাদ মিস চিয়াং। আপনার নামটা আগেই আমাদের মনে করা উচিত ছিল।

উত্তরে চিয়াং হাসলেন একটু।

বলুন, এবার কী জানতে চান?

তার আগে কি আমরা শুনে নেব আপনার দাদুর বাকি কথা?

মিস চিয়াং বললেন, সেটা পরে বলব। আপনিই শুরু করুন মিস্টার রায়। আপনার কি ঘুম পাচ্ছে?

না না, আমি যখন চোখ বুজিয়ে থাকি তখন জানবেন আমি কিছু ভাবছি।

তাই নাকি? বাঃ! বেশ তো! তাহলে কী ভাবছেন বলুন। যদি দুর্ভাবনা হয় তাহলে ফ্যাসলা করবার চেষ্টা করব। বলে তাকালেন আমার দিকে।

বললাম, পৃথিবীর এমন কি কোথাও কোনো হোটেল, বোর্ডিং বা গেস্ট হাউস আছে যেখানে কোনো একজন বোর্ডারেরও সাড়া পাওয়া যায় না?

লক্ষ করলাম মিস চিয়াং-এর মুখটা যেন শুকিয়ে গেল।

আপনি কি আমার এই 'হোমের' কথা বলছেন?

ঠিক তাই।

মিস চিয়াং দুঃখমাথা গলায় বললেন, সে তো আমি আগেই বলেছি যতই যত্ন করি না কেন বাজার থেকে দূরে বলেই এখানে লোক আসে না। কিন্তু কী করব? ইচ্ছে করলেই তো নিজেদের বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারি না। এই 'হোম' আমার দাদুর তৈরি। এর প্রতিটি পাথরে দাদুর স্মৃতি জড়িয়ে।

বললাম, সেটা বুঝি। কিন্তু বোর্ডার যেখানে নেই বললেই হয় সেখানে খরচ চালান কী করে? আপনার কর্মচারীদের মাইনেও দিতে হয়—তা যত কমই হোক।

মিস চিয়াং মাথা নিচু করে রইলেন। দেখে মায়া হল।

এখন ক'জন বোর্ডার আছে? আমাদের বাদ দিয়ে?

মিস চিয়াং নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন। যার অর্থ একটিও না। তৎক্ষণাৎ বললাম, আমার মনে হচ্ছে আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে।

মিস চিয়াং অবাক হয়ে তাকালেন।

আমি নিশ্চিত যে, একটু আগে পর্যন্ত আরো কেউ ছিল।

কী বলছেন মিঃ রায়?

ঠিকই বলছি, আমি নিজে কানে কারো পায়ের শব্দ শুনেছি।

পায়ের শব্দ!

হ্যাঁ।

কোথায়?

আমাদের পাশের ঘরে।

তাহলে আরও বলি মিস চিয়াং, একটু আগে যখন আপনার অফিস ঘরে আসছিলাম তখন হঠাৎ দেখলাম কুকুরের চেয়ে ছোটো আকারের নেকড়ে জাতীয় কোনো জন্তু ছুটে ওদিকের পাঁচিলে উঠে পাহাড়ের দিকে মিলিয়ে গেল।

একথা শুনেই মিস চিয়াং চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কিছু যেন বলতে চাইলেন। কিন্তু বলতে পারলেন না। উদ্ভ্রান্তের মতো একবার এদিক-ওদিক তাকালেন। তারপর ক্ষমা চেয়ে বললেন, আমি আর বসতে পারব না। বলে উঠে দাঁড়ালেন।

ঠিক আছে। বলে আমরাও উঠে পড়লাম।

চলুন, আপনাদের রুমে পৌঁছে দিই।

তার দরকার হবে না।

কিন্তু কথাটা তাঁর কানে গেল না। তিনি আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন—আসুন আমার সঙ্গে। বলে ড্রয়ার থেকে কতকগুলো চাবি নিয়ে এগিয়ে চললেন। চার নম্বর ঘরের সামনে এসে বললেন, এটাই তো আপনাদের রুম?

হ্যাঁ, ম্যাডাম।

ভেতরটা একবার দেখে আসবেন?

দেখবার কিছু ছিল না। বিরূপাক্ষদা নিশ্চিন্তে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছেন।

ম্যাডাম আমাকে বললেন, আপনি কোন ঘরে পায়ের শব্দ পেয়েছিলেন?

আমি হাত দিয়ে পাশের ঘরটা দেখিয়ে দিলাম। ঘরটা তালাবদ্ধ ছিল। উনি নিজেই তালা খুললেন। নিজেই সবার আগে ঢুকে গেলেন অন্ধকার ঘরে। সুইচ টিপলেন। আলো জ্বলল। বললেন, দেখুন ভালো করে।

দুজনেই দেখলাম। কেউ কোথাও নেই।

তাহলে সত্যিই এদিকে আপনারা তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই। তাই তো?

খুব জোরের সঙ্গে মিস চিয়াং নিজের কথাটা যে ঠিক তা বোঝাবার চেষ্টা করলেন বটে কিন্তু গলায় যেন তেমন জোর ছিল না।

## ॥ চার ॥

ভালোভাবেই রাতটা কেটে গেল। ভোরবেলা প্রথমেই ঘুম ভাঙল আমার। নতুন জায়গা বলে প্রথমটা ঠিক ঠাहर করতে পারিনি কোথায় আছি। একটু পরেই সব মনে পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। তখনও শান্তনু ঘুমাচ্ছে। আর লেপের ওপর দু'খানা কস্মল চাপিয়ে গুটিগুটি হয়ে শুয়ে আছেন বিরূপাক্ষদা।

পুরু সোয়েটারের ওপর একটা গরম চাদর জড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

তখন ভোরের আলো সব ফুটে উঠছে। বাড়ির পিছনেই পাহাড়টা। কাল সন্ধ্যাবেলায় ভালো বোঝা যায়নি। আজ দেখে রীতিমতো ভয় করল। পাহাড়টা যেন কেমন অস্বাভাবিকভাবে ঝুঁকে আছে মিস চিয়াং-এর হোটেলের ওপর। কুচকুচে কালো পাথর। আর আশ্চর্য, পাহাড়ের গায়ে গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই। বলা যেতে পারে ন্যাড়া পাহাড়। আর সেই পাহাড়ের পিছনেই ঘন অরণ্য। রহস্যঘেরা।

এবার একটু ঘরে দাঁড়াতেই অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম হোটেলের গায়েই অজস্র লাল ফুলের সমারোহ। এত লাল ফুল! রডোডেনড্রন নয় তো? তাহলে তো ভালোই!

শান্তনুকে দেখাবার জন্যে ডাকতে যাব ভাবছি, দেখি শান্তনু ঘুমচোখে এসে দাঁড়িয়েছে, লাল ফুল দেখে সেও চমৎকৃত। বলল, আমারও মনে হচ্ছে এটাই প্রকৃত রডোডেনড্রন!

তারপর হঠাৎ জিগ্যেস করল, কাল যে মিস চিয়াংকে বললে পায়ের শব্দ শুনেছিলে সেটা সত্যি?

অবাক হয়ে বললাম, কী বলছ তুমি! মিথ্যে বলতে যাব কোন দুঃখে?

শান্তনু আমতা আমতা করে বলল, আয়্যাম স্যরি! আসলে, কাল অনেক রাত পর্যন্ত ভেবেছি। বিশ্বাস করতে পারিনি। লোক নেই, জন নেই তবু পায়ের শব্দ! আচ্ছা সে কি হেঁটে বেড়াচ্ছিল?

ঠিক যে বেড়াচ্ছিল তা নয়। তুমি যখন অফিস ঘরে মিস চিয়াং-এর সঙ্গে গল্প করছিলে তখন একটু বিশেষ দরকারে আমি আমাদের রুমে ফিরে এসেছিলাম। দরজা ঠেসানো ছিল। ঘরে আলো তো জ্বলাই ছিল। বিরূপাক্ষদা নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। হঠাৎ মনে হল পাশের ঘরে কেউ যেন আছে। তারপরেই শুনলাম তার পায়ের শব্দ।

শব্দটা কীরকম?

ভারী থপথপে পা ফেলে কেউ যেন ঘর থেকে বেরোবার চেষ্টা করছে। মোটেই স্বাভাবিক মানুষের মতো স্টেপ ফেলা নয়। অনেকটা খোঁড়া মানুষের মতো পা ঘষটে হাঁটা।

সে কি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল?

সেইরকমই মনে হল। পায়ের শব্দটা ঘর থেকে বেরিয়ে ঐ পাঁচিলের দিকে গেল। অর্থাৎ পাহাড়ের দিকে?

তাই হবে। তারপরেই মিলিয়ে গেল।

শান্তনু জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। মুখে বলল, হুঁ। বুঝলাম।

এমনি সময়ে হাসিমুখে ঢুকলেন মিস চিয়াং।

গুড মর্নিং!

গুড মর্নিং—গুড মর্নিং! বলে আমরা দুজনেই সানন্দে অভ্যর্থনা জানালাম তাঁকে।

কেমন ঘুম হল নতুন জায়গায়?

বললাম, ফাইন। চমৎকার।

কিন্তু আপনাদের সিনিয়ার ফ্রেন্ড তো এখনও ঘুমোচ্ছে। শরীর ভালো তো?

না-না, মোটেই ভালো নয়। বলে বিরূপদা চোখ বুজিয়েই পাশ ফিরলেন।

কী হল আপনার? বলে মিস চিয়াং ঝুঁকে পড়লেন।

বিরূপাক্ষদা কোনোরকমে বললেন, জ্বর। পাহাড়ে জ্বর। এবার বোধহয় এই বিদেশ-বিভূঁয়ে প্রাণটাই রেখে যেতে হবে।

মিস চিয়াং নিঃসংকোচে বিরূপদার কপালে হাত রেখে জ্বর কতটা বুঝে নিলেন। মুখে বললেন, কোনো ভয় নেই। আমাদের জানা ডাক্তার আছে। ডাকলেই চলে আসবে। এখন একটু চা খাবেন?

না পরে। বলে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

মিস চিয়াং বললেন, ওঁকে ঘুমোতে দিন। চলুন, আমার অফিস ঘরে। ওখানেই ব্রেকফাস্ট সারা যাক।

আমরা জিনজনেই ব্রেড, বাটার, এগ পোচ আর গরম কফি নিয়ে বসলাম। কাল যে মহিলাটিকে দেখেছিলাম আজ মনে হচ্ছে ইনি যেন তিনি নন। আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কাল রাত্তিরে তাঁর মুখের ভাবের যে পরিবর্তন ঘটেছিল, যে দৃষ্টিস্তার ছাপ তাঁর মুখে কাল ছায়া ফেলেছিল, আজ সকালে তার আর বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। একেবারেই স্বাভাবিক।

মিস চিয়াং কথা শুরু করলেন এইভাবে—মিস্টার রায়, কাল রাত্তিরে বলছিলেন কার পায়ের শব্দ শুনেছিলেন, সারা রাতের মধ্যে আর কি কোনো শব্দ—

না না, তেমন কিছু নয়। আমি লজ্জিত হয়ে বললাম।

তাহলে ভুল শুনেছিলেন স্বীকার করছেন তো?

হ্যাঁ, তা করছি।

যাক, নিশ্চিন্ত হলাম।

শান্তনু মিস চিয়াং-এর দৃষ্টি এড়িয়ে কটমট করে আমার দিকে তাকাল। আমি হেসে চোখ টিপে বুঝিয়ে দিলাম যা আমি শুনেছি তা ভুল কখনই নয়।

মিস চিয়াং আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন, দরজায় জুতোর শব্দ শুনে তাকালেন।

কাকে চাই?

আগন্তুক ইশারায় আমাদের দেখিয়ে দিল। আমাদের উদ্দেশ্যে বিক্রম সেলাম করল। বুঝলাম আজ আমরা শিলিগুড়ি ফিরব কিনা জানতে এসেছে।

শান্তনু বলল, বিক্রম, আজ আর ফেরা যাবে না। দাদাজির তবীয়ত খারাপ।

তবে কাল?

মিস চিয়াং আধা হিন্দি আধা চিনা ভাষায় বললেন, সন্ধ্যাবেলা এসো। তখন জানিয়ে দেওয়া হবে।

বিক্রম ফের সেলাম করে চলে গেল। মনে হল আজ যেতে হবে না বলে যেন খুশিই হয়েছে। এখানে অনেকে তার জানাশোনা আছে। তাছাড়া একদিন থেকে যাওয়া মানাই ভালো টাকা লাভ।

বিক্রম চলে গেলে আমিই প্রথম কথা বললাম।

আপনার হোটেলের পিছনে বিস্তর লাল ফুল দেখলাম। এগুলো কি রডোডেনড্রন?

খুশিতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মিস চিয়াং-এর। বললেন—একেবারে আসল রডোডেনড্রন। রঙটা লক্ষ করলেন?

করেছি বৈকি!

শান্তনু বলল, এখানেই যখন আসল রডোডেনড্রনের দর্শন লাভ হয়েই গেল তখন আর বার্সে গিয়ে কী লাভ?

মিস চিয়াং বললেন, যদি শুধু ফুল দেখতে যাওয়াই উদ্দেশ্য হয় তাহলে ওখানে গিয়ে আর লাভ নেই।

তাহলে তো কালকেই আমরা এখান থেকে ব্যাক করতে পারি।

তা পারেন। অবশ্য কাল আপনাদের সিনিয়ার পার্টনারের শরীর কেমন থাকে তার ওপরই আপনাদের যাওয়া নির্ভর করছে। আর এককাপ করে চা হবে নাকি?

শান্তনু বলল, একটু পরে।

তাহলে এখন বলুন কাল কী কথা জানতে চাইছিলেন। আমার যদি উত্তর ঠিক জানা থাকে তাহলে সবই বলব।

শান্তনু বলল, দেখুন রহস্যটা গোড়া থেকেই। আর টানা অনেকক্ষণ ছিল।

মিস চিয়াং বললেন, আর একটু পরিষ্কার করে যদি বলেন। আপনারা কি কোনো অলৌকিক ব্যাপারের অভিজ্ঞতা বলতে চাইছেন?

বললাম, এক কথায় তা বলে বোঝানো যাবে না। দেখুন পাহাড়ে বেড়াতে ভালোবাসি

বলেই আমি আর শান্তনু বেরিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ এসে জুটলেন বিরূপাক্ষদা—যাঁকে আপনি বলেন আমাদের সিনিয়ার পার্টনার।

মিস চিয়াং হাসলেন একটু—তারপর?

বিরূপাক্ষদা আমাদের চেয়ে বয়েসে অনেক বড়ো। ভ্রমণের নেশার কাছে উনি বয়েসকে পাত্তা দিতে চান না। তাই সহজেই মিশে আছেন আমাদের সঙ্গে।

তবে ফুল-টুলের মর্ম বুঝতে চান না। সামান্য ফুল দেখার জন্য শিলিগুড়ি থেকে পাহাড় ডিঙিয়ে সিকিমের বার্সে যাওয়াটা তাঁর ভালো লাগেনি। তাঁর মতে এটা পাগলামো।

মিস চিয়াং একটু হাসলেন। তারপর বললেন, রহস্যটা শুরু কোথা থেকে হল?

রহস্য শুরু হল শিলিগুড়ি থেকেই। কোনো ড্রাইভারই হিলের পথে যেতে রাজি হয় না। বিশেষ বারটা যখন শনিবার।

দেখলাম মিস চিয়াং কিছু নোট করলেন।

বললাম, আমাদের প্রথম প্রশ্ন—শনিবারে যেতে এত আপত্তি কীসের?

একটু থেমে বললাম, যাই হোক, অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে, বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে ঐ ড্রাইভারটিকে রাজি করানো হল। কিন্তু কিছুদূর যাবার পরই শুরু হল ড্রাইভারের ছটফটানি। ভয় পেতে লাগল। কীসের যেন আতংক।

এটা কোনখান থেকে?

আমার হয়ে শান্তনুই উত্তর দিল, জায়গাটার নাম জোরথাং। রংগীত নদীর কাছে।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। বিক্রম হিলে যেতে রাজি হলেও এই পথ দিয়ে কিছুতেই আসবে না। আমাদেরও জেদ এই পথ দিয়েই যেতে হবে। শেষে রাজি হল বটে কিন্তু এখন মনে হচ্ছে না এলেই ভালো হত।

মিস চিয়াং টুকটুক করে কিছু নোট করে নিয়ে সকৌতূহলে জিগ্যেস করলেন, তারপর?

তারপরের ঘটনাগুলো (হিলে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত) সব আমরা বলে গেলাম। উনি নোট করে নিলেন।

তার মানে আপনারা বলতে চাইছেন মেঘ ডাকা, বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে ঐ কালো সুটপরা ওয়াটারপ্রুফ গায়ে লোকটির একটা সম্পর্ক আছে।

হ্যাঁ অবশ্যই।

তবে সবচেয়ে অবাক হচ্ছি যখন রাস্তার একদিকে পাহাড় থেকে দলে দলে নেকড়ে বাচ্চাগুলো নেমে অন্যদিকের পাহাড়ে গিয়ে উঠল। এত নেকড়ে দেখা যায়?

মিস চিয়াং একটু হাসলেন। বললেন, ওগুলো নেকড়ের বাচ্চা নয়।

তাহলে? অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম।

কিছুই না। চোখের ভ্রম। দুর্গম পাহাড়ে এইরকম চোখের ভুল হয়। খুবই বিপজ্জনক। এইভাবেই পাহাড়ের অশুভ শক্তি অসহায় মানুষকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দেয়। খুব বেঁচে গেছেন।

না হয় তর্কের খাতিরে মেনেই নিলাম চোখের ভুল। কিন্তু কাল সন্ধ্যাবেলাতেই আপনার এই হোটেলে যে জীবটিকে মুহূর্তের জন্য দেখা গিয়েছিল সেটাও কি চোখের ভ্রম? এ তো আর পাহাড় নয়। আপনার সাজানো-গোছানো ‘হোম’!

মিস চিয়াং এবার চট করে উত্তর দিতে পারলেন না। মুখটার ওপর একটা ছায়া নেমে

এল। একটু চুপ করে থেকে বললেন, বুঝতে পারছি না। অন্য কেউ হলে বলতাম চোখের ভুল। কিন্তু আপনাদের সে কথা তো বলতে পারি না।

শান্তনু বলল, আপনি হয় তো জানেন শুধু ইন্ডিয়াতে নয়, ইন্ডিয়ার বাইরেও প্রায় সব দেশেই ভূতের ওপর অনেক ঘটনা আছে। তার সবই যে কাল্পনিক এমন ভাবার কারণ নেই। বেশির ভাগই যে সত্য তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। আর এই সব সত্যি-মিথ্যে কাহিনির সঙ্গে দেখা যায় একটি হিংস্র পশুকে। সে পশু বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক নয়। নেকড়ে। প্রায় প্রতিটি কাহিনিতে নেকড়ে কী করে এল তার সঠিক তথ্য আমার জানা নেই।

তাই যদি হয়, অর্থাৎ আমাদের দেখা সেই নেকড়ের বাচ্চাগুলি যদি চোখের ভুলই হয়, তবে তো স্বীকার করে নিতেই হবে, শিলিগুড়ি থেকে হিলে পর্যন্ত আমরা পথে যা দেখেছি — যা কিছু ঘটল তা সমস্তই চোখের ভুল। কিছু মনে করবেন না মিস চিয়াং। একথা আমরা মানতে পারব না। বিশেষ করে আমরা স্বচক্ষে যা দেখেছি। আচ্ছা, আমাদের কথা না হয় বাদ দিন। কিন্তু আমাদের ড্রাইভার বিক্রম থাপা। ও তো আজ সন্ধ্যায় এখানে আসবে। তখন আপনিই ওকে জিজ্ঞাসা করবেন।

মিস চিয়াং একটু হাসলেন, বললেন, আপনাদের ধারণাকে না হয় সত্য বলে মেনে নিলাম। তা বলে নেকড়ের বাচ্চা এ বাড়িতে দেখার দুঃস্বপ্ন দু'চোখে নিয়ে বসে থাকলেও যেন ভেবে বসবেন না আমার এই হোমে ঘোস্ট জাতীয় কিছু আছে। আজ পর্যন্ত বহু বোর্ডার এখানে থেকে গেছে। তারা কেউ তেমন কথা বলেনি।

তারা কেউ বলেননি কেন তা জানি না, জানবার ইচ্ছেও নেই। আমরা এখানে ভূতের গল্পের প্লট খুঁজতে আসিনি। তবে যা দেখেছি যা শুনেছি তা অস্বীকার করতে পারব না।

মিস চিয়াং মুখ লাল করে বললেন, সেটা আপনাদের ব্যাপার।

আমি আড়ালে শান্তনুকে বললাম, তর্ক কোরো না। মিস চিয়াং রেগে যাচ্ছেন। এখনও আমরা কিন্তু ওঁর আশ্রয়েই আছি।

শান্তনু একটু সামলে নিয়ে সহজ গলায় বলল, যাই হোক, ও প্রসঙ্গ থাক। আপনি কি আমাদের রহস্যটার ব্যাপার বুঝিয়ে বলবেন? আপনার কথামতো আমরা কিন্তু সব ঘটনা খুলে বলেছি। এখন আপনার ইচ্ছা।

মিস চিয়াং একটু ভেবে বললেন, বেশ বলুন কী জানতে চান?

শান্তনু বলল, প্রথমেই জানতে চাই শনিবারটা ড্রাইভারদের কাছে অপয়া কেন? কেন তারা এই পথ দিয়ে আসতে চাইছিল না? কে ঐ ওয়াটারপ্রুফ পরা লোকটা?

মিস চিয়াং একটুক্ষণ চোখ বুজিয়ে কী ভাবলেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন। ঠিক আছে। আমি উত্তর দেবার চেষ্টা করছি। শেষ থেকেই শুরু করব।

আপনাদের আমি যে লোভী অত্যাচারী বিদেশি পুলিশের কথা বলেছিলাম সেই হচ্ছে, যাকে আপনারা পাহাড়ের রাস্তায় ওয়াটারপ্রুফ গায়ে দিয়ে দাপাদাপি করতে দেখেছিলেন। ঐ পাহাড়ি রাস্তায় বৃষ্টির সময়েতেই অমনটিই ঘটে। বৃষ্টি পড়ে বলেই ওয়াটারপ্রুফ। ওর নাম গর্ডন। দিনের পর দিন লোকটা দাদুকে ভয় দেখিয়ে টাকা নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত দাদু আর সহ্য করতে পারলেন না। ঠিক করেন সময়মতো সাহেবকে সরিয়ে দেবেন।

কিন্তু সেও তো যে-সে লোক নয়। হাতে প্রচুর ক্ষমতা। তখন দাদু মতলব ভাঁজতে

লাগলেন। পুলিশ অফিসারটিকে আরও বেশি ডলারের লোভ দেখিয়ে হিলে ডেকে আনলেন। তারপর নানা অছিলায় নিয়ে গেলেন একেবারে জোরথাং। সেখানে একটা ছোটো রেস্টুরেন্টে আগে থেকেই ভালো ভালো খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন দাদু টাকা ছড়িয়ে। শুধু খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থাই নয়, খাবার ঘরটির এক কোণে ভালো পর্দা, সুন্দর সুন্দর ফুল দিয়ে ফ্লাওয়ার ভাস সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন। তাছাড়াও রেস্টুরেন্টের মালিকের সঙ্গে পরামর্শ করে অনেক টাকা দিয়ে জনা দশেক গাড়ির ড্রাইভার আর স্থানীয় পাহাড়ি লোকের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

সাহেব টাকার লোভে দাদুর ফাঁদে পা দিলেন। আর তাঁকে ফিরতে হল না।

মৃত্যুর পর ঐ বিরাট দেহটার ব্যবস্থা কী করা হবে তাও ঠিক করা ছিল। একটু অন্ধকার হতেই সবাই ধরাধরি করে দেহটাকে পাশের খাদে ফেলে দিল। শত্রুর শেষকৃত্য এইভাবেই দাদু সম্পন্ন করে আমার কাছে ফিরে এলেন।

এই পর্যন্ত বলে মিস চিয়াং থামলেন।

শান্তনু জিগ্যেস করল, ঐ ড্রাইভারদের মধ্যে আমাদের বিক্রমও ছিল কিনা কে জানে?

মিস চিয়াং বললেন, গাড়ি চালাতে চালাতে ও যেরকম ভয় পাচ্ছিল বলছিলেন, তাতে মনে হয় ও-ও এসবের দলে ছিল। খুব বেঁচে গেছে।

আচ্ছা, এ ঘটনা কত বছর আগের মনে করেন?

বছর কুড়ি তো বটেই। আমার বয়সই দেখুন না। খুব বুড়িয়ে গেছি কি? বলে হাসলেন।

তারপর?

তারপর দাদু কিন্তু শান্তিতে থাকতে পারলেন না। কী এক দুশ্চিন্তায় ক্রমশই ভেঙে পড়তে লাগলেন। যতই জিগ্যেস করি, ‘দাদু, কী হয়েছে তোমার?’ দাদু বলেন, ‘না, কিছু হয়নি।’ আগে রোজ সকালে-বিকালে হিলের বাজারে বেড়াতে যেতেন। আস্তে আস্তে বিকালে বেরোনো বন্ধ করে দিলেন। তারপর একদিন দেখলাম সকালেও বেরোচ্ছেন না। সর্বক্ষণ শুয়ে থাকছেন। বললাম, ‘আজ একেবারেই বেরোলে না?’ দাদু আমাকে ইশারায় কাছে ডাকলেন। তারপর এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে নিচু গলায় বললেন, ‘আমার মনে হচ্ছে বিদেশি পুলিশটা ঠিকমতো মরেনি।’

‘ঠিকমতো’ মরেনি মানে কী? মরা তো মরাই। না মরলে বেঁচে থাকা।

দাদু অস্পষ্টভাবে কী বলতে চাইলেন প্রথমে কিছু বুঝতে পারিনি। তারপর অনেক কষ্টে বুঝলাম। দাদু বোঝাতে চাইছিলেন পুলিশটা গভীর খাদে পড়েও বেঁচে আছে।

শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। অত গভীর খাদে যাকে পাঁচ-ছাঁজন মিলে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল সে কখনও বাঁচতে পারে? আর সত্যিই যদি ভাগ্যক্রমে বেঁচে থাকে তাহলে তো দাদুকে শেষ করে দেবে?

তারপর দাদু এক-এক দিন এমন সব কাণ্ডকারখানার কথা বলতে লাগলেন যা থেকে বুঝলাম পুলিশটা ‘ঠিকমতো’ মরে গেছে বলেই আরও শক্তি নিয়ে ফের জেগে উঠেছে। এখন তাকে ঠেকানো মানুষের অসাধ্য। মৃত্যুভয়ে দাদু অস্থির। ‘হিলে’ থেকে একটু ওপর দিকে উঠলেই দেখা যাবে তাকে। পাহাড়ি জায়গায় বৃষ্টি প্রায় সব সময়েই লেগে থাকে। আর বৃষ্টি পড়লেই তার আবির্ভাব। ইউনিফর্মের ওপর ওয়াটারপ্রুফ জড়িয়ে হু হু করে তেড়ে আসছে। ...এরই মধ্যে একদিন ঘটল একটা ঘটনা।



আমরা একটু নড়ে-চড়ে বসলাম।

... হিলেতে সবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জোর বৃষ্টি নয়। ঝিরঝিরে বৃষ্টি। কনকনে বাতাস যেন গায়ে ছুঁচ ফোটাচ্ছে। আমার হোটেলে এমনিতেই বোর্ডার কম। বৃষ্টি পড়লে তখন কোনো বোর্ডার আসবে এমন আশা করিনি। দরজা, জানলা বন্ধ করে ঘরে আলো জ্বেলে এইখানে এঁ চেয়ারটায় বসে আছি।

হঠাৎ কে যেন দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। অকারণেই আমি ভয় পেয়ে চমকে উঠলাম। বাইরের আলো জ্বালতে গেলাম। আশ্চর্য, জ্বলল না। অথচ ভেতরে আলো জ্বলছে।

আবার দরজায় ধাক্কা। এবার উঠতে হল। দরজার কাছ এগিয়ে ভারী পর্দাটা সরিয়ে দিলাম। তারপর কাচের দরজা দিয়ে যা দেখলাম তাতে শিউরে উঠলাম। দেখলাম দাদু যে বিদেশি পুলিশটার কথা বলেন, যে আমার এখানে বারকয়েক এসেছিল, যাকে জোরথাং-এর রেস্টুরেন্টে দাদু মেরে ফেলেছিলেন, যার দেহটা পাঁচ-ছ'জন মিলে গভীর খাদে ফেলে দিয়েছিল সেই 'গর্ডন' সাহেব সশরীরে এসে দাঁড়িয়েছে। তার ওয়াটারপ্রুফের হুডটা নেমে এসেছে কপাল পর্যন্ত। কপালের নীচে ভুরুশূন্য, পলকশূন্য দুটি লাল গর্তের মধ্যে ঝকঝক করছে দুটো হিংস্র চোখ। সে কথা বলার জন্য একবার হাঁ করল। অমনি বেরিয়ে এল কালো কালো দাঁত। দু'পাশের কষে কাদা।

আমি কাঁপা কাঁপা গলায় জিগ্যেস করলাম, হুম ডু ইউ ওয়ান্ট?

সে ফ্যাসফ্যাসে গলায় কী বলল বুঝতে পারলাম না। তবে যখন দরজার কাচের ওপর 'হপ হো' নামটা আঙুল দিয়ে লিখে দিল তখন বুঝলাম দাদুকেই খুঁজছে। এও বুঝলাম দাদুর আর রক্ষে নেই।

তখনই দরজার ওপর পর্দা টেনে দিয়ে ভেতরে ছুটে এলাম দাদুর কাছে। দেখি দাদু কীভাবে বুঝতে পেরেছেন। ভয়ে মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ করে শব্দ করছেন আর চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, আমি দাদুকে দু-তিন বার বললাম, ভয় পেও না। যে এসেছিল বুদ্ধের নাম করতাই সে চলে গেছে। দাদু দুই কাঁপা কাঁপা হাত তুলে বুদ্ধের উদ্দেশে প্রণাম করলেন।

তারপর?

এবার মিস চিয়াং বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর চোখের জল সামলে বললেন, এরপর তিনি আর বাঁচতে চাননি। শেষের দিকে বলতেন, আমার বডি সাবধানে সমাধিস্থ করো। যত কম লোক সঙ্গে নিতে পারো, ততই ভালো। অন্ধকারে নিয়ে যাবে নিঃশব্দে। ও যেন জানতে না পারে কোথায় আমার বডি আছে। আমার বডির হৃদিস পেলে নানাভাবে উপদ্রব করবে তা জানি। সাবধান!

তারপর সেদিন ভোরবেলায় উঠে দাদুকে কফি দিতে গিয়ে দেখি দরজায় খিল দেওয়া নেই। অন্যদিন ঘড়ির কাঁটায় ছ'টা বাজতেই দাদু দরজা খুলে দিতেন। আমি কফির পেয়ালা নিয়ে ঘরে ঢুকতাম। বলতাম... ওড মর্নিং গ্র্যাভ!

হেসে দাদু উত্তর দিতেন, ইয়েস! ভেরি ওড মর্নিং!

আজ দেখলাম দরজা ঠেসানো। ঠেলে ঘরে ঢুকতেই কাপ থেকে খানিকটা কফি চলকে পড়ে গেল। দেখলাম দাদু সিলিং থেকে ঝুলছেন! বলতে বলতে মিস চিয়াং দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন।

তারপর?

কিন্তু—

ওখানে কি কেউ দাঁড়িয়ে আছে?

না, দাঁড়িয়ে নেই। কালো কোট, কালো টুপি। কেউ যেন অন্ধকারে গা মিশিয়ে আমাদের ঘরে ঢোকান চেষ্টা করছে।

আমি তখনই নিঃশব্দে মিস চিয়াং-এর চেয়ারে ফিরে এসে চাপা গলায় শান্তনুকে ডাকলাম, শিগগির।

শান্তনু চটপট উঠে আমার পিছনে পিছনে আসতে লাগল। আমাদের হাবভাব দেখে মিস চিয়াং নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। নইলে তিনিও ব্যস্ত হয়ে আমাদের পিছু পিছু আসবেন কেন?

কিছু যেন দেখলাম।

কী দেখলে? কোথায় দেখলে?

আমাদের ঘরে ঢুকেছিল—ঐ যে ঐ যে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মিস চিয়াং হয় তো দেখতে পাননি। কেননা তিনি তখনও দূরে ছিলেন। আমরা দুজনেই দেখলাম একটা চলন্ত প্যান্ট আর একটা কোট—আর একটা টুপি। দেহ নেই, কোনো অস্তিত্বই নেই। স্ত্রেফ ভাসতে ভাসতে বাইরের পাঁচিলের দিকে চলে গেল। যেখানে মাত্র গত সন্ধ্যায় সেই নেকড়ের শাবক তার ছায়াশরীর নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। সব শুনে মিস চিয়াং হতাশ সুরে বললেন, কই, আমি তো কিছুই দেখতে পেলাম না।

দুঃখের সঙ্গে কথাগুলো বললেও গলায় যেন ছিল আর একটা চাপা বেসুর।

শান্তনু ইশারা করে আমায় বলল, কী দেখলাম তা যেন চিয়াংকে না বলি।

কেন?

আমাদের ধারণা ও সব জানে। সব জেনেও না জানার ভান করছে। কেন?

কী উদ্দেশ্য?

আবার আমরা চেয়ারে গিয়ে বসলাম। মিস চিয়াং আগের মতোই যেন গল্প করতে মন দিলেন। কিন্তু গল্প যেন জমছিল না। আমরা তিনজনেই কেমন অন্যমনস্ক।

এইভাবে ঘণ্টা দেড়েক চলল। এরই মধ্যে আমরা গিয়ে বিরূপদার সঙ্গে কথা বলে এসেছি। জুরটা অনেক কমে গেছে। একটু উঠে বসেছেন।

এই তো গুড বয়ের মতো ভালো হয়ে উঠেছেন। চলুন, বাইরের ঘরে গিয়ে বসবেন।

ওখানে বসে কী হবে? ওখানে তো যত অনাস্থি 'ইয়ের' গল্প। সন্ধ্যাবেলায় ওসব গল্প করা ঠিক নয়। বিশেষ এইরকম বাজে জায়গায়।

তাহলে আমরা যাই?

হ্যাঁ, তা যাও। আমি আর একটু ঘুমোবার চেষ্টা করি।

মিস চিয়াংকে এই খবর জানালে তিনি বললেন—বয়েস হয়েছে। তার ওপর জুর গেল। শরীরটা দুর্বল হয়ে গেছে। উনি কথা শেষ করেছেন, আর তখনই দরজায় জুতোর শব্দ। স্পষ্ট লক্ষ করলাম সামান্য জুতোর শব্দতেই..... উনি চমকে উঠলেন।

কে? কে ওখানে?

আমি ম্যাডাম। আসব?

আমরাও তাকলাম। বিরূপ থাপা।

ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বিক্রম বলল, আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে।

বললাম, তাতে কোনো অসুবিধে হয়নি। হ্যাঁ, আমরা কালই যাব। এখনও পর্যন্ত এইরকমই ঠিক।

কাল কখন গাড়ি আনব, স্যার?

ব্রেকফাস্ট করে বেরোব।

ঠিক আছে। বলে বিক্রম যাবার জন্য ঘাড় ঘোরাল। কিন্তু এরপরই তার ঘাড়টা যেন শক্ত হয়ে গেল। ওর দৃষ্টি তখন ঘরের জানলার ভেতর দিয়ে বারান্দার দিকে যেখানে একটা ইউক্যালিপটাস গাছ অন্ধকারে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে।

মনে হল বিক্রমের চোখ দুটো যেন ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠল। আর সেই চোখের ভাষায় শুধু বিস্ময়—ভয়!

বিক্রম কি কিছু দেখেছে? অমন করে তাকাচ্ছে কেন?

বিক্রম!

বিক্রম উত্তর দিল না। তখনও ওর একটা পা দরজায় আর ঘাড়টা বেঁকিয়ে বিস্ফারিত চোখে সেই ইউক্যালিপটাস গাছের নীচে। ঠোট দুটো কাঁপছে অস্বাভাবিকভাবে।

বিক্রম! ধমকে উঠল শান্তনু, কী দেখছ অমন করে?

কে ওখানে? কে ও? একজন বুড়ো—সাদা দাড়ি—ক্রমশই লম্বা হচ্ছে! ... চললাম স্যার। এখানে আর একদণ্ড নয়। যদি বেঁচে থাকি তাহলে কাল ঠিক সময়ে গাড়ি নিয়ে আসব। বলতে বলতে বিক্রম যেন মরিয়া হয়ে অন্ধকারে ঝাঁপ দিল।

শান্তনু আর আমি মিস চিয়াং-এর অনুমতি না নিয়েই বাঁ দিকের সেই ইউক্যালিপটাস গাছটার দিকে ছুটলাম। গাছটার পিছনেই পাহাড়। তারই গায়ে একটা গুহার মতো। তখন কোনো মূর্তি দেখা গেল না। শুধু সাদা খানিকটা ধোঁওয়া গুহার মুখ দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে।

আশ্চর্য! মিস চিয়াং-এর কিন্তু ব্যস্ততা নেই। অনেক পিছনে তিনি হস্তদন্ত হয়ে আসছেন। মুখে ভয়ের ছাপ—কিন্তু কৃত্রিম। তাঁর মুখে ভয় কিন্তু অন্তরে নয়।

কী ব্যাপার, মিস্টার রায়? কিছু কি দেখতে পেলেন?

আমরা যতটুকু দেখেছি তাতেই যা বোঝবার বুঝে নিয়েছি। মুখে বললাম, কই? কিছুই তো নেই।

আমি জানতাম। এসব আমার 'হোম'-এর বিরুদ্ধে বদনাম রটানোর চেষ্টা। বলে আর এগিয়ে না এসে ফিরে গেলেন নিজের চেয়ারে।

এই অবসরে শান্তনু চাপা গলায় বলল, আজই আমাদের সুবর্ণ সুযোগ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস চিয়াং-এর দাদুকে এ বাড়িতেই রাখা আছে। আজ তার গোপন ডেরা থেকে বেরোনের কথা বোধ হয় ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় তিনি অস্বস্তিতে পড়েছেন। তবু দেখা করতেই হবে। তাই আমার বিশ্বাস আজ কিছু একটা ঘটবে। সজাগ থেকো।

মিস চিয়াং-এর চেয়ারে এসে বসলাম। এতক্ষণে লক্ষ পড়ল বৃদ্ধ চিনা ওয়ন একমনে খাতাপত্র নিয়ে ঘাড় গুঁজে বসে কাজ করেই যাচ্ছে। এত যে কাণ্ড ঘটে গেল তা কি ওর কানে যায়নি? না কি গুরুত্ব দেয়নি? আশ্চর্য!

ঘরে ঢুকতেই বিরূপাক্ষদা জিগ্যেস করলেন, কাল আমরা ফিরছি তো?

শান্তনু বলল, তাই তো ভাবছি।

অমন হেঁয়ালি করে কথা বল কেন? এই তো বললে কালই যাওয়া হবে। তাহলে—

শান্তনু হেসে বলল, আমি তো বলিনি কাল যাওয়া হবে না।

তাহলে?

আগে রাতটা নিরাপদে কাটুক।

বিরূপাক্ষদা যেন চুপসে গেলেন। বললেন, ওরে বাবা!

অনেক রাতে শান্তনুর খোঁচা খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। চমকে উঠতেই শান্তনু আমাকে চুপ করে থাকতে বলল, কিছু শুনতে পাচ্ছ?

বললাম, এ তো বিরূপাক্ষদার নাক ডাকা।

দূর! ভালো করে কান পেতে শোনো।

এবার শুনতে পেলাম। কাছেই কোথাও কেউ শাবল দিয়ে কোদাল দিয়ে পাথর সরাচ্ছে।

হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি।

তাহলে আর দেরি নয়। চটপট বেরিয়ে পড়ো।

তাই করলাম। কোনোরকমে পাজামার উপর পাঞ্জাবি চড়িয়ে দরজা বাইরে থেকে ঠেসিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়লাম।

মনে মনে বললাম, বিরূপদা, এইরকম বিপদের সময়ে আপনাকে কিছুক্ষণের জন্যেও একা রেখে যাচ্ছি। উপায় নেই। তার জন্য ক্ষমা করবেন। ঈশ্বর আপনার সহায় হোন।

আবার সেই অন্ধকার প্যাসেজ। এখন যেন আরও বেশি অন্ধকার মনে হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে এই বুঝি কেউ ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে।

রাত বলেই মিস চিয়াং-এর চেম্বারে একটা হাক্সা আলো জ্বলছে। সেই আলোয় আমরা সাবধানে চেম্বারের বাঁদিকের প্যাসেজ ধরে এগিয়ে চললাম।

চাপা গলায় বললাম, নিরস্ত্র অবস্থায় এইভাবে কি যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে?

শান্তনু বলল, তাছাড়া উপায় কী? আমরা করো সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না। শুধু রহস্যভেদ করতে যাচ্ছি। তবে যদি কেউ আক্রমণ করে তাহলে শক্তি পরীক্ষা দেব।

শান্তনুর অভয়বাণী শুনলাম বটে, কিন্তু সাহস পেলাম না। এই তো সেই জানালা। যে জানালা দিয়ে পিছনের বারান্দাটা দেখা যায়। কিন্তু এখন সব অন্ধকারে লেপা। আমরা আমাদের এদিকের বারান্দা দিয়ে পাঁচিল পর্যন্ত গিয়েছি। কিন্তু এদিকটা আসার সুযোগ হয়নি।

সাবধানে টর্চ জ্বালব?

বললাম, না—না!

আঃ! পেঙ্গিল টর্চটা আনলে হত।

সাবধানে হাঁটতে হাঁটতে কোদালের শব্দ অনুসরণ করে আমরা আরও খানিকটা এগিয়ে এসেছি। হঠাৎ শব্দটা থেমে গেল। আমরাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তারপর অন্ধকারের মধ্যে সেই ইউক্যালিপটাস গাছটার নীচে থেকে যেন একটা মূর্তি উঠে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুজনের হাতের টর্চ একসঙ্গে জ্বলে উঠল।

সেই জোরালো আলোয় কালো গাউন পরা মিস চিয়াং স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত থেকে শাবলটা পড়ে গেল।

এ কি আপনারা? এখানে কী করছেন?

আপনাকে জানতে চেষ্টা করছি।

মিস চিয়াং কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এসে দু'চোখ তুলে বললেন—কী জানতে চান বলুন? এর আগে তো সব বলেছি।

না, সব বলা হয়নি। সেইটুকুই শুনব।

বেশ বলুন কী জানতে চান। এখানে কী করছিলাম?

তা জানি। আপনি পাথর সরিয়ে কোনো সুড়ঙ্গপথের দরজা খুলছিলেন।

মিস চিয়াং বললেন—হ্যাঁ তাই।

এখানে কী আছে?

অনেক গোল্ড অনেক—আমার সারা জীবনের সম্পদ।

গোল্ড!

শান্তনু এবার মিস চিয়াং-এর চোখের ওপর টর্চ ফেলল।

মিথ্যে কথা।

মিস চিয়াং চুপ করে রইলেন।

গোল্ডের চেয়ে ঢের মূল্যবান কিছু।

একটু থেমে শান্তনু বলল, আমরা কিন্তু জানতে পেরেছি কী আছে।

মিস চিয়াং আঁতকে উঠে বললেন, কী? কী জানতে পেরেছেন, বলুন।

শান্তনু বলল, ওখানেই শোয়ানো আছে আপনার দাদুর দেহ। ঘাঁর মাথার চুল পাকা, ঘাঁর বুক পর্যন্ত লম্বা সাদা দাড়ি। যিনি এখন বাতাসের চেয়েও হালকা।

একটু থেমে শান্তনু আবার বলল—এও জানি সেই শয়তান লালমুখো পুলিশের প্রেতাশ্বার ভয়ে দাদুর বডি আপনি অন্য কোথাও সমাধিস্থ না করে বাড়িতেই করেছিলেন।

মিস চিয়াং চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন। তারপর ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, তাহলে আর আমার বলার কিছু নেই। এখন কী করতে চান? লোকাল পুলিশকে জানাবেন—আমার দাদুর আত্মঘাতী হওয়ার কথা? জানাবেন বেআইনিভাবে একটা ডেড-বডি আমারই হেফাজত থেকে লোপাট করে পাহাড়ের সুড়ঙ্গে লুকিয়ে রেখেছি। তাই যান। থানায় যেতেই বা হবে কেন? চলুন আমার অফিস ঘরে। ওখানে টেলিফোন আছে। বলতে বলতে মিস চিয়াং উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

আসুন আমার অফিস ঘরে। বলে আমাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ঘরের আলো জ্বেলে দিলেন।

অনুগ্রহ করে বসুন।

আমরা বসতেই উনি টেলিফোনটা এগিয়ে দিলেন।

এই যে পুলিশ স্টেশনের নাম্বার। ওদের আসার অপেক্ষায় থাকব। আমায় আরেস্ট করুন। আমি রেডি।

শান্তনু ফোনটা সরিয়ে দিয়ে বলল, আপনি দয়া করে শান্ত হন, মিস চিয়াং। আমরা তদন্ত করতে আসিনি। দাদুর কাছ থেকে সরিয়ে আপনাকে থানাতে পাঠাতেও নয়। যে রহস্যকে সঙ্গে নিয়ে এতদূর এসে পড়েছিলাম সেই রহস্যের সমাধান আজই হয়ে গেল। এখন কালই চলে যাব। কিন্তু একটা কথা—সেই পুলিশের প্রেতাশ্বা আপনার দাদুর বডি খুঁজতে খুঁজতে আপনার হোম পর্যন্ত চলে এসেছে। জানেন তো?

জানি।

এখন বডিটাকে বাঁচাবেন কী করে?

জানি না। সপ্তাহে একদিন-দু'দিন বডিটাকে দেখে আসি। একটা তেল মাখাই। তবু দাদু মাঝে মাঝে কফিন থেকে বেরিয়ে পড়ে। যেমন আজ হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছিল। বোধহয় বুঝতে পেরেছে তার শত্রু কাছেই এসে পড়েছে। আমাকে সাবধান করতে চায়।

কিন্তু—

কিন্তু আমি আর কী করে সাবধান হব? বলুন—আপনারা বলুন—

বলতে বলতে মিস চিয়াং-এর দু'চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ল।

বললাম—ভয় নেই। আপনি পারবেনই। কারণ আপনার দাদুর দেহই বলুন আর আত্মাই বলুন আপনার ভালোবাসা পেয়ে অজেয় হয়ে উঠেছে। কোনো অশুভ শক্তির সাধ্য নেই সেই পবিত্র দেহের ক্ষতি করতে পারে।

কথা শেষ করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম।

ভোরের আকাশ তখন ফর্সা হয়ে আসছে।

শারদীয়া ১৪১৫

# কালো মুখ সাদা চামড়া

বগলাবাবুর আবির্ভাব

এখানে এসে পর্যন্ত গত কয়েক দিনের মধ্যে এমন দুটো জিনিস চোখে পড়ল যা খুব আশ্চর্যজনক বা ভয়ঙ্কর কিছু না হলেও অস্বাভাবিক।

যে জায়গাটায় আমরা দুজন রয়েছি সেটা যে নির্জন হবে এটা তো জানা কথাই। কারণ নির্জন জেনেই আমরা এখানে এসেছি।

পাঁচিলঘেরা অল্প খানিকটা জায়গায় দুখানা ঘর। কাঠের গেটের বাইরেই মাঠ। মাঠের দক্ষিণে কিছু গাছ-গাছালি।

বন্ধু বাসুদেবকে একটু চমকে দেবার জন্য বললাম, পরশু দিন বিকেল বেলা একটা বিরাট শেয়াল দেখলাম হে! ধীরে সুস্থে গেল।

শেয়াল!

হ্যাঁ।

কোন দিকে গেল?

উ গাছ-গাছালির দিকে।

কথাটা শুনে বাসুদেব অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বললাম, অবাক হচ্ছ কেন?

বাসুদেব বলল, না, এখন তো শেয়াল বড় একটা দেখা যায় না। এখানে হঠাৎ এল কোথা থেকে? তাও আবার বলছ ‘বিরাট’ শেয়াল।

বললাম, শেয়াল এখন দেখা যায় না ঠিক। তা বলে একটুও শেয়াল দেখা যাবে না এমন কথা জোর করে কেউ বলতে পারে না।

বাসুদেব চুপ করে রইল। তারপর যেন গভীর চিন্তা করে বলল, তা হয় তো ঠিক। কিন্তু ঐ যে বলছ ‘বিরাট’ শেয়াল। খটকা ওখানেই।

বললাম, হ্যাঁ, তা বেশ বড়সড়। অত বড় শেয়াল আমি দেখিনি।

বাসুদেব বলল, ওটা শেয়াল বটে তো? ঠিক দেখেছ?

হাজার বার ঠিক দেখেছি। তখন সবে বিকেল। দিব্য রোদ। কাজেই শেয়াল চিনতে আমার ভুল হয়নি।

বাসুদেব চুপ করে রইল।

সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। তালগাছের মাথার উপর দিয়ে অন্ধকার হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মাঠের ওপর, উঠে গিয়ে আলো জ্বলে দিলাম।

কী ব্যাপার বলো তো? একটা শেয়াল নিয়ে এত কী গবেষণা করছ?

বাসুদেব চেয়ারে গা ছড়িয়ে বলল, তা গবেষণারই ব্যাপার বটে। দ্যাখো বিকাশ, শেয়ালটার কথা শুনে পর্যন্ত আমার মনে নানা প্রশ্ন উঠছে।

যেমন?

যেমন ধরো, অত বড় শেয়ালের কথা কখনও শুনিনি। দ্বিতীয়ত, শেয়াল সাধারণত সন্ধেবেলায় বেরোয়। আর শেষ প্রশ্ন হচ্ছে—শেয়াল কখনও ধীরে সুস্থে, হেলতে দুলতে যায় না। যায় দৌড়ে।

বললাম, বেশ তাই না হয় হল—তাতে কী? তোমার সন্দেহ হচ্ছে আমি সত্যিই শেয়াল দেখেছি কিনা?

বাসুদেব বলল, প্রথমে সেরকম সন্দেহ হয়নি। তারপর তুমি যখন জোর দিয়ে বললে, ওটা শেয়ালই, অন্য কিছু নয়, তখন মেনে নিলাম ওটা শেয়ালই। কিন্তু শেয়ালটা কোথা থেকে এসে কোথায় গেল তা তো বলতে পারছ না।

বললাম, ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি। হঠাৎ দেখলাম একটা শেয়াল যাচ্ছে। সেটা গিয়ে ঢুকল ঐ ঝোপ-জঙ্গলে। ব্যস্। আমার কৌতূহলেরও শেষ।

ঠিক আছে বাবা। এখন বলো তো দ্বিতীয় অস্বাভাবিক জিনিসটা কী?

সেটা শুনে তুমি হাসবে। তবু বলছি গতকাল ঠিক ঐ সময়েই অর্থাৎ নির্জন দুপুরে দেখলাম একটা লোককে—

কী হল? থামলে কেন?

ইশারায় চুপ করতে বলে দরজার দিকে তাকলাম। মনে হচ্ছে কেউ আসছে।

এই সন্ধেবেলায় অচেনা অজানা জায়গায় কে আবার আসবে?

চাপা গলায় বললাম, চুপ। ঐ যে—এসে গেছে।

কেন যে অমন ভয়ে ভয়ে চুপ করতে বললাম তা নিজেও জানি না। কেউ না কেউ তো আসতেই পারে! তখনই দরজার বাইরে অপরিচিত গলা পাওয়া গেল, এই যে বাবুমশাইরা, খুব ব্যস্ত নাকি?

কে? একটু রাগ-রাগ গলায় জিগ্যেস করল বাসুদেব।

যদি অনুমতি করেন তো ভেতরে ঢুকি।

এবার আমিই তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানালাম, অনুগ্রহ করে ভেতরে এসে বসুন।

বাঁ হাতে লঠন, ডান হাতে মোটা লাঠি, হাঁটু পর্যন্ত তোলা ধুতি, গায়ে চাদর জড়িয়ে যে লোকটি ঢুকলেন তাঁর বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। গায়ের চাদরটা দিয়ে এমন ভাবে মাথা-মুখ ঢেকে রেখেছেন যেন ভদ্রলোক নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইছেন।

উনি হাসলেন একটু। গোল কালোমুখে সাদা দাঁতগুলো এমনভাবে প্রকট হল যে রীতিমতো ভয় ধরিয়ে দিল। মনে হল, কোনো অশুভ ঘটনার আগাম জানান দিতেই তিনি এসেছেন।

আমার নাম বগলা মজুমদার। এ অধমকে আপনারা চিনবেন না। তবে কাছাকাছি তিন-চারটে গ্রামের লোক আমাকে মান্য করে। যদি জিগ্যেস করেন কী এমন তালেবর মানুষ আপনি যে এত লোকে মান্য করে, তাহলে তার সঠিক কারণ বলতে পারব না। এইটুকু বলতে পারি আমাদের তিন পুরুষের বাস এই গ্রামে। পাশাপাশি পাঁচখানা গ্রামের জমিদারি স্বত্ব কিনেছিলেন আমার পিতামহ করালিচরণ মজুমদার। দুর্ধর্ষ জমিদার ছিলেন মশাই। তাঁর দাপটে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খেত। তারপর ইংরেজ আমলে আমার পিতাঠাকুর নীলকর সাহেবদের যে সাহায্য করেছিলেন তাতে ইংরেজরা খুশি হয়ে—ঐ দেখুন ভাই, আমিই



বকে যাচ্ছি। এলাম আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করতে—আমার ঠিক করে দেওয়া বাসাটা কেমন লাগছে?

বললাম, ভালোই।

কোনো অসুবিধে নেই তো?

নাঃ, দুজন তো ঝাড়া হাত-পা মানুষ। তা ছাড়া সপ্তাহ দু-একের তো মামলা।

বগলাবাবু সে কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, তা আপনারা তো কলকাতা থেকেই আসছেন?

বললাম, হ্যাঁ।

বাঃ, খুব ভালো। বসিরহাটের গগন কুণ্ড যখন এখানে একটা ছোটো বাসা ভাড়ার জন্যে বললে তখন খুব অবাক হয়েছিলাম। কলকাতা থেকে এখানে কেউ বাসা ভাড়া করে থাকতে আসে নাকি? তাও মাত্র দিন পনেরোর জন্যে। গগনের সঙ্গে একসময়ে বারাসতের ইস্কুলে পড়তাম। ইস্কুল ছাড়ার পরও যোগাযোগটা আছে। কী করে আছে? আসলে কি জানেন, বাবুমশাই, অন্তরের টান। ইস্কুলে এই যাদের সঙ্গে অনেক দিন ধরে ওঠাবসা—তাতে কোনো স্বার্থের ভেজাল থাকে না। সে সম্পর্কটা একেবারে খাঁটি সোনা। তাই—

বুঝলাম বগলাবাবু মানুষটি কথা শুরু করলে থামতে চান না। আর সেইজন্যে বাসুদেবও বেশ রেগে উঠছিল। তাই তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, গগনদা আমাদেরও অনেক দিনের চেনা। ওঁকে যখন কথায় কথায় এখানে কদিনের জন্যে বেড়াতে আসার প্ল্যানের কথা বললাম তখন উনিই বোধহয় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা করে দিলেন।

এইটুকু বলতেই বগলাবাবু তৎক্ষণাৎ অল্প জলে ল্যাটা মাছ চেপে ধরার মতো আমার ওপর একরকম ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন, ঠিক ঐ কথাটাই জানার জন্যে আমার আসা। বলে হেঁ হেঁ করে হাসতে লাগলেন।

কোন কথাটা বলুন তো।

ঐ যে বললেন এখানে আসার প্ল্যান। এইরকম গোভাগাড়ে জায়গায় আপনাদের মতো শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন যুবকদের আসার আসল উদ্দেশ্যটা কী?

বগলাবাবুর একথায় বাসুদেব রেগে যাচ্ছিল, তাকে কোনোরকমে সামলে-সুমলে হেসে বললাম, এই সামান্য কথাটা জানবার জন্যে রাস্তিরেই চলে এলেন! আশ্চর্য!

বগলাবাবুর মুখটা যেন ঝুলে গেল। খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, ওটা বন্ধ করে দিলেই তো হয়। বাসুদেব বলল, কেন অসুবিধে কী, বেশ ফুরফুরে হাওয়া আসছে—

ফুরফুরে হাওয়া বেরিয়ে যাবে। হঠাৎ যেন ভদ্রলোকটির ভদ্রতার মুখোশ খসে পড়ল। খেঁকিয়ে উঠলেন, জানেন না তো কোথায় এসেছেন।

অবাক হবার ভান করে বললাম, জায়গাটা খারাপ নাকি?

আমি কিছু বলব না। দুদিন থাকুন। তাহলেই বুঝবেন।

দিনে না এসে সন্ধ্যারাত্রে আসার কারণটা বগলাবাবু যেন এড়িয়ে যেতে চাইলেন। উটে চাপ দিলেন, এবার বলুন তো হঠাৎ এখানে আসার আসল কারণটা কী? বলে, যেন কিছুই নয় এমন ভাব করে হাসি-হাসি মুখে আমাদের দিকে তাকালেন।

বললাম, এটা জানা কি আপনার একান্ত দরকার?

বগলাবাবু চোখ বড় বড় করে বললেন, দরকারটা ঠিক আমার একার নয়। এ অঞ্চলে কাছেপিঠে আরও যারা আছে তারাও জানতে চায়। তারাও আপনাদের দেখে অবাক হয়েছে। কৌতূহলী হয়েছে। বুঝতেই পারছেন একসময়ে আমার পূর্বপুরুষেরা জমিদার ছিলেন। প্রজাদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ তাঁদেরই দেখতে হত। এখন জমিদারও নেই, জমিদারিও নেই। তবু তাঁদের বংশধর হিসেবে আমি রয়েছি যখন—

হ্যাঁ, তখন সব দায়িত্ব আপনার।

একটু থেমে বাসুদেব বললে, আচ্ছা, আমাদের দেখলে কি হিমালয় আর বঙ্গোপসাগরের মধ্যস্থানের পশ্চিমবঙ্গ নামক একটি জায়গার মানুষ ছাড়া ভিন্ন গ্রহের কোনো জীব বলে মনে হয়?

বগলাবাবু জিব কেটে বললেন, আরে, না-না। ওসব কিছু নয়। আসলে আপনাদের মতো মানুষজন তো বড় একটা এ পোড়া দেশে পা দেয় না। তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই আপনারা এখানে এসেছেন। সেই উদ্দেশ্যটা সম্বন্ধে আমাদের যৎকিঞ্চিৎ কৌতূহল আর কি।

উদ্দেশ্য খুব সাদা সরল। আমরা দুই বন্ধুতে পশ্চিম বাংলার ছোটো ছোটো অখ্যাত গ্রামগুলো সমীক্ষা করতে এসেছি।

শুনে বগলাবাবু কয়েক মুহূর্ত আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মুখ টিপে হেসে মাথাটা এদিক থেকে ওদিকে বাড়িয়ে বললেন, উঁ-হু। ওসব সমীক্ষা-টমীক্ষা করতে এলে খাতা-পত্তর, ম্যাপ, স্কেল, কম্পাস থাকে। আমি মুখ্য হলেও খুব বোকা নই।

মিথ্যে ধরা পড়ার জ্বালায় বাসুদেব একটু তেতে উঠে বলল, এতই যদি বুদ্ধিমান তাহলে আপনিই আন্দাজ করুন কোন মহৎ কার্যসিদ্ধির জন্যে কলকাতা থেকে এতদূরে মাত্র পনেরো দিনের জন্য ঘর ভাড়া করে রয়েছি!

বগলাবাবুর কুচকুচে কালো গোল মুখখানি আলোকিত করে শ্বেতশুভ্র দাঁতের মধ্যে দিয়ে একটুখানি হাসি দেখা দিল। মাথা দুলিয়ে বললেন, তাহলে আমিই বলব?

হ্যাঁ, বলুন।

আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন না মহাশয়রা। বলব?

হ্যাঁ, চটপট বলে ফেলুন।

আপনারা পুলিশের লোক।

বটে—বটে—বটে! দারুণ বলেছেন তো! কদিন এখানে রয়েছি কেউ আমাদের চিনতে পারেনি। আর আপনি—কিন্তু কী উদ্দেশ্যে পুলিশযুগল এখানে এলেন বলতে পারেন কি? বাসুদেব যেন রুখে উঠল।

নিশ্চয় পারি—নিশ্চয় পারি। আর সে বিষয়ে আপনাদের সাহায্য করতেই আসা।

তা হলে বলুন। আমরা শুনি।

বলছি। তবে আপনাদের আরও আগে আসা উচিত ছিল। কেননা ও তো এরই মধ্যে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। দু-দুটো আদিবাসী, তারপর—

এবার আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারলাম না। বললাম, কী বলতে চাইছেন একটু স্পষ্ট করে বলুন।

বগলাবাবু বললেন, ঐ দেখুন, আপনারাও আবার লুকোচুরি খেলা শুরু করলেন। আচ্ছা, আপনারা যে কদিন এখানে রয়েছেন তার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাননি? অস্বাভাবিক। যেমন—?

যেমন রাত্তির বেলা ঘরের ঠিক বাইরে কারও নিঃশব্দে চলাফেরার শব্দ, কিংবা কোনো অজানা পশুর ডাক—

হঠাৎ বগলাবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, ক'টা বাজল, স্যার?  
পৌনে সাতটা।

ওরে বাবা! এবার আমাকে উঠতেই হবে। আমার হয়েছে সব দিক দিয়ে জ্বালা। দিনের বেলা এলে সাহেব ব্যাটা কিংবা ওর শাগরেদ হয়তো দেখে ফেলবে। আর রাত হলে কী একটা জানোয়ারের হাড়-হিম-করা ডাক।—

হাড়-হিম-করা ডাক! জন্তুটাকে আপনি দেখেছেন?

রক্ষা করুন, মশাইরা। আপনাদের বাবা-মায়ের আশীর্বাদে যেন কোনোদিন তেনার দর্শন পেতে না হয়।

পেলে কী হবে? বাসুদেব জিগ্যেস করল।

কী হবে? ঐ জগা মোড়লের দশা হবে। যে কেসের তদন্ত করতে আপনারা এসেছেন— বেচারি সন্ধেরাতের একটু পরে বাড়ির কাছেই খামার ঘরে কিছু একটা শব্দ শুনে লঠন হাতে দেখতে গিয়েছিল। পাঁচ মিনিটের পথ মশাই, কিন্তু সারা রাত্রেও ফিরল না।...আচ্ছা, চলি। দাঁড়ান-দাঁড়ান। তারপর তার কী হল বলে যান।

সবই তো জানেন। তবে না জানার ভান করছেন কেন? পরের দিন বাঁওড়ের জলে তার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ ভাসতে দেখা গেল।

কে খুন করল তাকে?

সে তো আপনারাই খুঁজে বের করবেন। তবে মানুষ নয়। আমি চলি মশাই।

মানুষ নয়! তবে? আর পাঁচ মিনিট। ঐ যে বাঁওড় না কী বললেন ওটা কী? কোথায়? বাঁওড় জানেন না? তা জানবেন কী করে? আপনারা যে কলকাতাই মানুষ। বাঁওড় হচ্ছে বড় দীঘির মতো। তবে অল্প জল, নোংরা। ছিরিছাঁদ নেই।

বলেই বগলাবাবু লঠনটা হাতে নিয়ে উঠে পড়লেন।

আর একটা কথা। 'সাহেব' না কী বলছিলেন?

ঐ দেখুন, আবার লুকোচুরি! ঐ মুখপোড়া সাহেবটার ওপর লক্ষ রাখার জন্যেই যে এসেছেন তা কি আমি জানিনে? অথচ দেখাচ্ছেন যেন কিছুটা জানেন না। তবে ওকে ধরতে পারবেন কি? দেখুন চেষ্টা করে।

বলতে বলতে মজুমদার মশাই লঠন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে একবার এদিক-ওদিক দেখে নিয়েই অন্ধকারে বাঁপ দিলেন।

আসবেন আবার।

বগলাবাবু কথা বললেন না। হাতের ইশারায় শুধু জানিয়ে দিলেন আসবেন।

দরজা বন্ধ করে আমরা জানলা দিয়ে দেখতে লাগলাম। মাঠের মধ্যে দিয়ে একটা আলো দুলতে দুলতে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

বড় অদ্ভুত লোক।

বাসুদেব বলল, হ্যাঁ।

## মুখপোড়া সাহেব

এখানে এসেই একটি কাজের লোক পেয়ে গিয়েছিলাম। বড় গরিব। এ অঞ্চলের মানুষ। তাই মাইনে নিয়ে দরকষাকষি করেনি। দু' বেলা পেট ভরে খেতে পাবে এতেই খুশি। শুধু বলেছিল, মাত্র পনেরো দিন?

হ্যাঁ, হরিপদ। আমাদের এখানে পনেরো দিনের জন্যেই আসা। তুমি অবশ্য পুরো মাসেরই মাইনে পাবে।

হরিপদর দু'চোখ জ্বলজ্বল করে উঠেছিল। যাক, গোটা এক মাসের জন্যে খাবার ভাবনা তাকে ভাবতে হবে না।

হরিপদর কাজ অল্প সময়ের জন্যে। সকালে এসে জলখাবার করে দিয়ে দুপুরের রান্না সেরে ফেলে। তারপর ও এক মালসা ভাত নিয়ে দু'মাইল দূরে বাড়ি চলে যায়। বিকেলে আসতে চাইছিল না। বলেছিল যে, না হয় টাকা কম দেবেন। কেন আসতে চায়নি তা অবশ্য স্পষ্ট করে বলেনি। আমরাও চাপ দিইনি। শেষ পর্যন্ত রফা হয় তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে চলে যাবে। তাতেও সন্দেহ উৎপন্ন হয়।

আজ ঢের আগেই অর্থাৎ বগলাবাবু থাকতেই ও চলে গিয়েছিল। যাবার জন্যে যেন তর সয় না। সোজা কথা নয়, পাক্কা দু'মাইল রাস্তা হাঁটতে হবে মাঠ, পুকুর পার হয়ে। খাওয়া-দাওয়া করে মশারি টাঙিয়ে ভালো করে চারিদিক গুঁজে, মাথার কাছে দুজনে দুটো জোরালো টর্চ নিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু তখনই ঘুম এল না।

লোকটা যেন কীরকম—কীরকম।

কার কথা বলছ? বগলাবাবুর?

বললাম, ঠিক তাই। কী মতলবে এসেছিলেন তা বোঝা গেল না।

বাসুদেব মশা মারতে গিয়ে নিজের গালেই একটা চড় মেরে বলল, কিন্তু ভয়টা যে কীসের সেটাই বুঝলাম না। উনি তো দিনের বেলায় এদিকে আসতে ভয় পান পাছে কোন এক মুখপোড়া সাহেব দেখে ফেলে। আর, একটু রাত হলে কোন এক অজানা পশুর ভয়ঙ্কর ডাক!

তার ওপর আবার জগা মোড়লের ক্ষতবিক্ষত দেহ!

হ্যাঁ, আরও আছে। জিগ্যেস করেছিলেন, আমরা এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখেছি কিনা বা বাড়ির ঠিক বাইরে কারও পায়ের শব্দ ইত্যাদি শুনেছি কিনা।

বললাম, ভদ্রলোক সম্ভবত অলৌকিক কিছু ব্যাপার দাঁড় করাতে চাইছেন।

বাসুদেব চুপ করে রইল। তারপর বলল, আচ্ছা, তুমি বলছিলে দুটো অস্বাভাবিক জিনিস দেখেছিলে। তার মধ্যে একটা অতিকায় শেয়াল। অন্যটা এখনও বলনি।

বললাম, হ্যাঁ, সেটা একটা লোক।

লোক!

কীরকম?

বললাম, দু' তিন দিন আগে। বেলা তখন আড়াইটে। দুপুরে ঘুমোবার অভ্যেস নেই। তাই ওদিকের রকে চেয়ারে বসে নিস্তব্ধ পদ্মী-প্রকৃতি উপভোগ করছিলাম। হঠাৎ দেখি একটা মোটাসোটা লোক। খুব ফর্সা রঙ। সে যে কোথা থেকে এল বুঝতে পারলাম না। মাঠটার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে গুটিগুটি।

গুটিগুটি হাঁটছিল কেন?

তা কী করে বলব ভাই! কোমরে ব্যাথাট্যাথা হলে ওরকম হাঁটে। কিন্তু কেন যে বারে বারে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের বাড়িটা লক্ষ করছিল তা বুঝতে পারছিলাম না। তা ঘাড় ঘোরানোটাও অস্বাভাবিক। কোনো মানুষ তার ঘাড়টা এত দূর পর্যন্ত ঘোরাতে পারে না।

আচ্ছা! বাসুদেব অবাক হল। তারপর? কোন দিকে গেল?

বললাম, ঐ জঙ্গলের মধ্যে। যেখানে শেয়ালটা ঢুকে গিয়েছিল।

বাসুদেব একটু ভেবে বলল, লোকটার অতখানি ঘাড় ঘোরানোটা সত্যি একটু অস্বাভাবিক। না বন্ধু, আরও আশ্চর্যের ব্যাপার আছে। লোকটার পরনে একটা আন্ডারপ্যান্ট ছাড়া গায়ে আর কিছু ছিল না। একদম খালি গা। গায়ে অস্বাভাবিক লোম। অথচ ধবধবে ফর্সা রঙ। ঘাড় পর্যন্ত ঝাঁকড়া কটা চুল। আর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে ওর মুখটা। যতবার এদিকে ঘাড় ফিরিয়েছে ততবারই দেখেছি মুখটা কালো। যেন পুড়ে গিয়েছে। অমন ফর্সা মানুষটার এমন পোড়া মুখ!

হঠাৎ বাসুদেব উৎসাহে উত্তেজনায় উঠে বসল—বিকাশ—বিকাশ, বুঝতে পেরেছ কি? আমি অবাক হয়ে তাকলাম, কী?

বগলা মজুমদার খুব মিথ্যে বলেননি। তাঁর সেই মুখপোড়া সাহেবকেই তোমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। বললাম, তা হলে তো লোকটার ওপর নজর রাখতে হবে।

বাসুদেব বলল, কিন্তু লোকটাকে পাবে কোথায়? মাত্র তো কয়েক মিনিটের জন্যে দেখতে পেয়েছিলে। কোথা থেকে বা কোন দিক থেকে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল তাও তো বোঝা যাচ্ছে না। আর এখনও পর্যন্ত এমন কিছু ভয় পাওয়ার ঘটনা ঘটেনি যার জন্যে আমাদের নড়েচড়ে বসতে হবে।

বললাম, তা ঠিকই, বগলাবাবুর মুখ থেকেই যেটুকু শোনা। আর ওঁর কথা সত্য হলে আশা করা যায় খুব শিগগির কিছু একটা ঘটবে।

একটু থেমে বললাম, মনে হচ্ছে বেলেঘাটার তিনু ঘোষ যা বলেছিল তার কিছুটা সত্য।

বাসুদেব বলল, তিনু ঘোষের কথা কতটা সত্য তা যাচাই করার জন্যেই তো আমাদের এখানে আসা। শতকরা পঞ্চাশভাগ সত্য হলেও আমাদের অর্থব্যয়, আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

আমি হেসে ফেললাম।

হাসছ যে?

বগলাবাবু বেশ বলেছেন আমরা ছদ্মবেশী পুলিশ!

বাসুদেবও হেসে বললে, হ্যাঁ, পুলিশ হলে আগে পাকড়াও করতাম বগলাকেই। লোকটাকে বোঝা গেল না। ঠিক কী উদ্দেশ্যে ভয়ে ভয়ে এখানে এসেছিলেন! শুধু কি কতকগুলো ভয়ের কথা শোনাতে?

বললাম, না। আরও কিছু ছিল। ওঁর ধারণা ঐ সাহেবটাই এখানে অশান্তি সৃষ্টি করছে। কিছু একটা ঘটাতে চাচ্ছে। অথচ তাকে নাকি ধরা কঠিন!

তাহলে জঙ্গুর ডাকটা কী?

সে ডাক শোনার সৌভাগ্য এখনও আমাদের হয়নি। কে জানে জগা মণ্ডলকে হয়তো সেই জন্তুটাই খতম করেছিল।

আমি একটু থমকে গেলাম। মনে পড়ল বেলেঘাটার তিনু ঘোষও সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবার আগে সন্ধ্যার পর একটা জন্তুর ডাক শুনেছিলেন। তবে সেটা অনেকটা শেয়ালের ডাকের মতো।

বাসুদেব হালকা সুরে বলল, বগলাবাবু মনে করেন পুলিশের ছদ্মবেশে আমরা কলকাতা থেকে এখানে এসেছি ঐ পোড়ারমুখো সাহেবটার ওপর নজর রাখতে। ওকে ধরে জেলে পুরতে পারলেই এখানকার অশান্তির শেষ হবে। বাসুদেব মস্ত বড় হাই তুলে বলল, যাই হোক, লোকটা আমার কাছে রহস্যময় হয়ে উঠেছেন। কোথা থেকে এসেছেন, কত দূরে বাড়ি, কী করেন, কিছুই জানা গেল না। এতই যদি ভয় তাহলে সন্দের পর একা একা এলেন কেন? কথা বলতে বলতে উঠে পালালেনই বা কেন?

হঠাৎ বাসুদেব চুপ করে গেল। কেমন যেন সতর্ক হল।

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, আমার মুখ চাপা দিয়ে ফিসফিস করে বলল, চুপ! কিছু শুনতে পেলো?

কই না তো।

ভালো করে কান পেতে থাকো।

এতক্ষণ বেশ হালকাভাবে কথা হচ্ছিল, এখন হঠাৎ এ আবার কী? নিশ্চয় বাসুদেবের কিছু ভুল হচ্ছে। তবু কান পেতে রইলাম।

এখানে কোনোদিন এত রাত পর্যন্ত জাগা হয়নি। কাজ তো নেই, তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ি। তাই গভীর রাতে জায়গাটার চেহারা কীরকম হয় আজ পর্যন্ত তা দেখা হয়নি। দুজনে পাশাপাশি উৎকর্ণ হয়ে শুয়ে আছি কোনো কিছু শোনার প্রতীক্ষায়। টৌকি থেকে হাত দশেক দূরে খোলা জানলা দিয়ে বাড়ির সামনের মাঠটা দেখা যাচ্ছে। কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। এটা শুরুপক্ষ কি কৃষ্ণপক্ষ জানি না। মুমূর্ষু মানুষের ফিকে হাসির মতো স্নান চাঁদের আলো এসে পড়েছে মাঠের ওপর। কেমন যেন রহস্যঘন ছায়া-ছায়া ভাব। দিকভ্রম হয়ে যায়। কোন দিকে সেই অতিকায় শেয়ালটা বা রহস্যময় সাহেবটা ঘাড় ঘোরাতে ঘোরাতে গিয়েছিল, বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানলা দিয়ে তাকিয়ে এই মুহূর্তে তা মালুম হচ্ছে না।

কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি নিস্তব্ধ নিশুতি রাতেরও নাকি ভাষা আছে। এটা যে কতখানি সত্য তার প্রমাণ আজ পেলাম। দূরে বনঝোপে একটানা ঝিঁঝিঁ ডেকেই চলেছে। কোথা থেকে মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছে শৌঁ শৌঁ শব্দ। অনেকটা ঝাউবনে বাতাস খেলা করার মতো। এ ছাড়া দূরে বাঁওড়ের ধারের জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে ভয়-পাওয়া কুকুরের ডাক। আচ্ছা, কুকুর তো গৃহপালিত পশু। রাস্তাতেও দেখা যায়। তা বনে-জঙ্গলে? কী জানি।

এইসব ভাবছিলাম হঠাৎ বাসুদেব আমার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরল। চাপা গলায় বলল, ঐ শোনো।

শুনলাম।

তেমন কিছু নয়। শুধু বাড়ির ওদিকের বাইরের দেওয়াল ঘেঁষে একটা চাপা শব্দ—  
খস্-খস্-খস্-.....

কেউ যেন ভারী ভারী পা দুটো ঘাঁসটাতে ঘাঁসটাতে খুব সাবধানে বাড়ির চারিদিকে ঘোরবার চেষ্টা করছে।

কে? আমাকেও চমকে দিয়ে বাসুদেব চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা থেমে গেল। একটু পরে মনে হল যে এসেছিল সে যেন দ্রুত চলে গেল।

শিগগির টর্চটা—বলেই টর্চ নিয়ে বাসুদেব দরজার খিল খুলতে যাচ্ছিল, আমি আটকে দিলাম।

অজানা অচেনা জায়গায় দুঃসাহস দেখিয়ে লাভ নেই। কেউ যে এসেছিল এটা যেমন সত্যি তেমনি সত্যি সে আর যাই হোক সামান্য চোর-ডাকাত নয়। কারণ, কোনো মানুষের পায়ের শব্দ অমন হতে পারে না।

বাসুদেব সুবোধ বালকের মতো না বেরিয়ে বিছানায় এসে বসল। বসেই রইল থমথমে মুখে।

কী ভাবছ?

ভাবছি ব্যাপারটা কী ঘটল। কেউ যে বাড়ির কাছে ঘুরছিল তা তুমিও বুঝতে পেরেছ, আমিও। আর সে যে চোর-ডাকাত নয় তাও বোঝা গেছে। আরও প্রমাণিত হল বগলা মজুমদারও এই কথাটা বলেছিলেন। মনে আছে তো?

খুব আছে।

তাহলে কে এই গভীর রাতে এখানে বেড়াতে এসেছিল? কেনই বা এসেছিল?

পরিবেশটা হাঙ্কা করার জন্যে হেসে বললাম, দ্যাখো, হয়তো ঘাড়-বাঁকানো সাহেবই আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিল।

বাসুদেব একরকম ধমক দিয়ে বলল, তুমি হাসছ? দ্যাখো, কলকাতায় তিনু ঘোষ যা বলেছিল তা তেমন বিশ্বাস করিনি। ওর কথায় কৌতুহলী হয়ে নিছক বেড়াতে এসেছিলাম। তারপর আবির্ভাব হল বগলা মজুমদারের। তিনি যে কী বলতে এসেছিলেন বোঝা যায়নি। শুধু খানিকটা ভয় দেখিয়ে গেলেন। আমরা তেমন গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু আজ রাত্তিরে যা শোনা গেল সেটা তো ফুঁ দিয়ে ধুলো ঝাড়ার মতো উড়িয়ে দিতে পারছি না। পারছ কি?

মাথা নেড়ে বললাম, না।

এটাই এখন আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। আচ্ছা, পায়ের শব্দ শুনে আগন্তুকটির উচ্চতা, ওজন আন্দাজ করতে পার?

বললাম, না ভাই, অত এক্সপার্ট নই। তবে একথা বলতে পারি সাধারণ মানুষের চেয়ে ঢের ভারী চেহারা।

যেমন শেয়ালটাকে দেখেছিলে। তাই তো?

হ্যাঁ, তাই।

বাসুদেব বলল, আর দেরি নয়। কাল থেকেই আমাদের কাজ শুরু করতে হবে।

কিন্তু এ তো গোয়েন্দাগিরি নয় যে, হত্যার সূত্র ধরে হত্যাকারীকে খুঁজবে। কীসের ওপর নির্ভর করে কাজ শুরু করবে?

বাসুদেব আমার পিঠ চাপড়ে বলল, রাত্তিরে যিনি এখানে হানা দিয়েছিলেন, যে কোনো কারণেই হোক, তিনি আমাদের ট্যাগেট করেছেন। অতএব চিন্তা নেই, তিনি আবার আসবেন। অল্প সূত্র রেখে যাবেন। অতএব এসো বন্ধু, বাকি রাতটুকু নিশ্চিন্তে গড়িয়ে নিই।

পায়ের ছাপ নেই, হাতের কারসাজি

ভেবেছিলাম এরপর বাকি রাতটুকু একটা লম্বা ঘুম দিয়ে কাটিয়ে দেব। একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমোব। কিন্তু তা হল না। ঘুম ভাঙল অন্য দিনের মতোই ভোরবেলা।

ঘুম ভাঙল, কিন্তু তখনই উঠতে পারলাম না। বড্ড দুর্বল লাগল। প্রথমে মনে হয়েছিল দেহেতে শোওয়ার জন্যেই বোধহয় ক্লান্তি লাগছে। কিন্তু বোঝা গেল তা নয়। মাথাটা অসম্ভব ভার হয়ে আছে। সেই সঙ্গে বুকে কেমন চাপ ধরছে। মনে হল, বাড়িটা আর আশেপাশের বাতাস যেন খুব ভারী হয়ে উঠেছে। অথচ অন্য দিন তো এমন হয় না! তাহলে?

বাসু!

বিছানায় বাসুদেবকে দেখতে না পেয়ে ডাকলাম। সাড়া নেই। আবার ডাকলাম। সাড়া নেই। আবার ডাকলাম। এবারও সাড়া নেই। গেল কোথায়?

শরীরের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে বিছানা থেকে উঠে পাশের ঘরে গেলাম। না, সেখানেও নেই।

আশ্চর্য! গেল কোথায়? অন্য দিন তো এত সকালে ওঠে না। ভাবতে ভাবতে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়লাম।

বাসু!

দূর থেকে সাড়া পেলাম, এই যে এখানে। চলে এসো।

যাক, বাসুর তাহলে কিছু হয়নি। ইট বের করা সরু পথ ধরে ওদিকের ঝোপের দিকে গেলাম। দেখি বাসুদেব মাটির ওপর ঝুঁকে পড়ে খুব মন দিয়ে কিছু পরীক্ষা করছে।

এখানে কী করছ?

কাল রাত্তিরে যিনি এখানে পায়চারি করেছিলেন তিনি কোনো চিহ্ন রেখে গেছেন কিনা দেখছি।

তাই বলে এই সকালবেলায়?

দেখি করলে তো চিহ্ন হারিয়ে যেতে পারে।

কিছু পেলে?

বাসুদেব মাথা নেড়ে বলল, নাঃ।

অথচ কেউ এসেছিলই, অনেকক্ষণ ছিলও। আর তার শ্রীচরণে কোনো 'শু' ছিল না।

তাই তো ভাবছি। শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত হয়েছি যিনি এসেছিলেন তাঁর নিশ্চয় কোনো পা ছিল না। অথচ—

অথচ কী?

হাত ছিল! আর সেই হাত দিয়ে কয়েকটি প্রাণীর জীবন সংহার করেছিলেন।

চমকে উঠলাম। মানে?

ঐ ঝোপের মধ্যে দেখো।

দেখলাম। কতগুলো গলা-ছেঁড়া বাদুড় পড়ে আছে।

আরে সর্বনাশ! তাহলে রাতের আগন্তুকটি তো রীতিমতো হিংস্র জন্তু।

বাসুদেব গম্ভীরভাবে বলল, জন্তু কিনা বলতে পারি না। তবে আগন্তুকটি হিংস্র।

বললাম, তাহলে তো বগলা মজুমদারের আরও একটা কথা সত্য বলে মনে হচ্ছে।

বাসুদেব বলল, তুমি কি জগা মোড়লের কথা ভেবে বলছ?

হ্যাঁ। বাড়ির কাছে পাঁচ মিনিটের পথ খামারবাড়ি। রাত আটটার সময়ে কোনো শব্দ শুনে দেখতে গেল। আর ফিরল না। পরের দিন তার ক্ষতবিক্ষত দেহ পাওয়া গেল বাঁওড়ের জলে। বগলা যদি গুল মেরে না থাকেন তাহলে প্রশ্ন ওঠে, কে মারল তাকে?

বাসুদেব শাস্ত গলায় বলল, বগলা মজুমদার সম্বন্ধে আমাদের আগে যাই ধারণা থাক,



এখন দেখা যাচ্ছে তিনি বাজে কথা বলেননি। কিন্তু আমি অন্য কথা ভাবছি।  
কী?

ধরেই নিলাম বগলা যা বলেছিল, ব্যাপারটা তাই-ই। প্রশ্ন এই, যে শব্দটা শুনে জগা মোড়ল রাত্তির বেলাতেই খামারবাড়ি ছুটেছিল সে শব্দটা কেমন? নিশ্চয়ই পা ঘষটানোর শব্দ নয়। তার চেয়ে জোরে কোনো শব্দ যা বাড়ি থেকে শোনা গিয়েছিল।

বললাম, তা তো বটেই।

শব্দটা কীসের? সে কথাটাই আমায় ভাবিয়ে তুলেছে।

বললাম, অত ভাবাবিবেতে কাজ কী? বগলাবাবু তো আবার আসবেন বলে গেছেন।

বাসুদেব হতাশার হাসি হেসে বলল, তুমি কি সেই আশায় বসে থাকবে?

বললাম, আসবেন না কেন?

আসবেন না এমন কথা বলছি না। তবে অতখানি পথ হেঁটে, বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কেন বারবার আসবেন বলো তো?

বললাম, তা বটে। তাহলে?

ওঁর কাছেই আমাদের যেতে হবে।

কিন্তু—ঠিকানা?

বাসুদেব একটু হাসল। বলল, জানই তো মজুমদার মশাইরা এককালের ডাকসাইটে জমিদার পরিবার। আর এই জায়গাটা মুঠোর মধ্যে ধরা যায়। কাজেই—তঁার ঠিকানা খুঁজতে খুব অসুবিধে হবে না।

### তিনু ঘোষের কথা

বেলেঘাটার তিনু ঘোষ যদিও একজন মামলাবাজ লোক তবু তাঁকে আমার ভালো লাগত। আমার দাদামশায় নামজাদা উকিল ছিলেন। তিনু ঘোষ ছিলেন আমার দাদুর বাঁধা মক্কেল। বিরাট সম্পত্তি তাঁর। শরিকও অনেক। ফলে মামলা-মোকদ্দমা লেগেই থাকত। তবে ঘোষ মশাই-এর অটেল টাকা। মোটা ফি দিয়ে দাদুকে কেস দিতে তাঁর অসুবিধে ছিল না।

তিনু ঘোষ রোগা হলে কি হবে যেটা সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করত সেটা তাঁর বিরাট একজোড়া গৌফ। কোনো মানুষের অতবড় গৌফ থাকে তা ভাবতে পারতাম না। তিনি চিরুনি দিয়ে গৌফ আঁচড়াতেন দিনে চার-পাঁচ বার। তাই আলাদা একটা চিরুনি ঘুরত পকেটে পকেটে। মোমও দিতেন। তিনি জোরে হাসতেন না। হাসতেন নিঃশব্দে। হাসলে তাঁর চোখ দুটো কুঁচকে যেত।

তিনু ঘোষ দাদুর চেম্বারে এসেছেন জানতে পারলেই আমি দোতলা থেকে নেমে আসতাম। আমায় দেখলেই তিনি চোখ ছোটো করে গৌফের ফাঁকে হাসতেন। আমার লক্ষ ছিল তাঁর পাকানো গৌফ জোড়াটার দিকে। একবার হাত দিতে চাইতাম। উনি মুখটা বাড়িয়ে দিতেন। আমি ঠিক গুনে দুবার তাঁর গৌফে হাত বোলাতাম।

দাদু বলতেন, তিনু ঘোষ নাকি অনেক ভূতের গল্প জানেন। কয়েকবার নিজেই ভূতের পাল্লায় পড়েছিলেন।

এ খবর জানার পরই একদিন তাঁকে চেপে ধরলাম, একটা সত্যি ভূতের গল্প বলতেই হবে।

উনি হেসেছিলেন। বলেছিলেন, সত্যি ভূতের গল্প কীরকম?

বলেছিলাম, মানে আপনি নিজের চোখে যা দেখেছেন সেই রকম।

অ, আচ্ছা। তিনি কিছুক্ষণ ভেবে নিয়েছিলেন। তারপর শুরু করেছিলেন তাঁর নিজের চোখে দেখা সত্যিকারের ভূতের গল্প।

বলেছিলেন, ভূত অনেকবার দেখেছি। মোকাবিলাও করেছি। কিন্তু এখন যার কথা বলব তাকে ভূত হিসাবে দেখেছি একটি বারই। তাও অনেক পরে। প্রথম তাকে দেখেছিলাম মানুষ হিসাবেই।

অবাক হয়েছিলাম। একই মানুষ আবার পরে সেই মানুষকেই ভূত হিসাবে দেখা। এমন তো বড় একটা ঘটনা না।

নড়েচড়ে বসে বলেছিলাম, কাকু, বেশ জাঁকিয়ে ঘটনাটা বলুন না।

এরপর তিনি যা বললেন, তা এইরকম—

তখন ইংরেজ আমল। ইংরেজদের দাপট খুব। তারা আবার নেটিভদের অর্থাৎ কালো আদমি ভারতীয়দের সহ্য করতে পারত না। এক সাহেব ট্রেনে করে মুম্বের থেকে কলকাতা আসছিল। সঙ্গে একটা বিরাট কুকুর গ্রেহাউন্ড গোছের। সাহেব আর ওর কুকুর দুজনেরই চোখে হিংস্র দৃষ্টি।

সে সময়ে ট্রেনে চারটে ক্লাস ছিল। ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, ইন্টার ক্লাস, আর থার্ড ক্লাস।

ফার্স্ট ক্লাসে যেত সাহেবসবোরা, সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রী ছিল মোটামুটি বড় অফিসাররা, ইন্টার ক্লাসে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষরা। রুগি নিয়ে যাবার দরকার হলে এই ইন্টার ক্লাসটাই সুবিধের ছিল। আর থার্ড ক্লাস ছিল সাধারণ প্যাসেঞ্জারদের জন্য। ইন্টার ক্লাসের ভাড়া থার্ড ক্লাসের দেড়গুণ। তাই ইন্টার ক্লাসকে চলতি ভাষায় বলা ‘দেড়া গাড়ি’। সেকেন্ড ক্লাসের ভাড়া ছিল থার্ড ক্লাসের ডবল, ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া থার্ড ক্লাসের চারগুণ। তখন ট্রেনে এত ভিড় হত না। এখনকার মতো তখন থার্ড ক্লাসে ফ্যান ছিল না। ফ্যান থাকত শুধু ফার্স্ট আর সেকেন্ড ক্লাসে। আপাদমস্তক পুরু গদি আঁটা সেকেন্ড ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাস। সাধারণ প্যাসেঞ্জার এই সব কমপার্টমেন্টে ওঠা তো দূরের কথা, ফুটবোর্ডে পা রাখতেও সাহস পেত না। প্ল্যাটফর্ম থেকেই কোনোরকমে ভেতরের গদি, ফ্যানগুলো দেখত।

এছাড়া সাহেবদের সঙ্গে অন্তত একজন ‘অ্যাটেনডেন্ট’ বা সাহায্যকারী থাকত ফাইফরমাস খাটার জন্যে। তারা তো আর সাহেবের সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাসে বা সেকেন্ড ক্লাসে যেতে পারে না। তাই ওদের জন্যে ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাসের লাগোয়া একটা সাধারণ কামরা থাকত। সেটা শুধু সাহেবদের সার্ভেণ্টদের জন্যে। সেখানেও অন্য প্যাসেঞ্জাররা ঢুকতে পারত না।

তখন গার্ডও ছিল ফার্সি চামড়ার। ড্রাইভারদের মধ্যেও অনেক আংলোকে দেখা যেত। তারা ইংরিজিতেই কথা বলত। কখনও কখনও হিন্দিতে। বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে গাড়ি নিয়ে যেত কিন্তু বাংলা বলতে পারত না।

এই ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাসের মুষ্টিমেয় প্যাসেঞ্জারদের অহংকারের সীমা ছিল না। তারা বাঙালিদের সহ্য করতে পারত না। একবার এক নিতান্তই মধ্যবিত্ত বাঙালি তাড়াতাড়িতে ভুল করে ফার্স্ট ক্লাসে উঠতে যাচ্ছিল, ফার্স্ট ক্লাসের সাহেব প্যাসেঞ্জারটি তাকে লাথি মেরে নামিয়ে দিয়েছিল।

লাথি হজম করে মাথা নিচু করে বাঙালিটি অন্য গাড়িতে গিয়ে উঠেছিল। তখন সাহেবের

বিরুদ্ধে নালিশ করার কোনো উপায় ছিল না। কে শুনবে নালিশ? ড্রাইভার, গার্ড, স্টেশন মাস্টার প্রায় সবাই তো ফর্সা চামড়ার সাহেব।

এইরকম সময়েই ঘটনাটা ঘটেছিল।

গাড়িতে সে সময়ে কুকুর বা হিংস্র কোনো পশু নিয়ে যাওয়া সহজ ছিল না। অনেক লেখালেখি করে বিশেষ অনুমতি নিতে হত। যে সাহেবের কথা বলা হচ্ছে সে ওসব অনুমতি-টনুমতির ধার ধারত না। চিতাবাঘের মতো বিরাট কালো ছুঁচলো মুখ কুকুরটা তার নিত্যসঙ্গী। তার ঐ কুকুরটাকে দূর থেকে দেখলেই লোকে পালাত।

দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটা প্রথমে ঘটল আসানসোল স্টেশনে।

একজন মাড়োয়ারী সাহেবের কামরায় ঢুকতেই সাহেব তেড়ে গিয়েছিল।

—Get out!

মাড়োয়ারী ভয়ে কথা বলতে পারেনি। তবে টিকিটটা দেখিয়ে বলেছিল, Sir, here is my first class ticket. তাতে সাহেবের মাথা আরও গরম হয়ে গেল। শিস দিয়ে তার কুকুরটাকে লেলিয়ে দিল। কুকুরটা মূর্তিমান বিভীষিকার মতো গৌঁ গৌঁ শব্দ করে তেড়ে গেল। নির্দোষ প্যাসেঞ্জারটি ভয়ে চিৎকার করতে করতে নেমে গেল।

এবারে ঘটনা ঘটল বর্ধমানে। যে বাঙালি ভদ্রলোক ভুল করে সাহেবের কামরায় উঠেছিলেন, তাঁকে দেখেই সাহেব তার নিত্যসঙ্গী জলন্ত চুরুটটা মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে দাঁত কড়মড় করে হাঁকড়ে উঠেছিল, “You bloody get out! This is first class.”

এই বাঙালি ভদ্রলোকটি ইংরিজিতেই উত্তর দিলেন, সাহেব আমি জানি এটা ফার্স্ট ক্লাস। ভুল করে উঠেছিলাম। এখনি নেমে যাচ্ছি। তবে আবার আসব।

বলেই প্ল্যাটফর্মে নেমে গেলেন। একজন চেকারকে ডেকে তাঁর সেকেন্ড ক্লাসের টিকিটটা বদলে ফার্স্ট ক্লাসের করে নিলেন। তারপর সদর্পে ঢুকলেন সাহেবেরই ফার্স্ট ক্লাস কামরায়। দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল সাহেব। হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে জোরে লাথি মেরে দরজাটা খুলে ফেললেন বাঙালি ভদ্রলোকটি।

সাহেব গদিতে হেলান দিয়ে নিশ্চিন্তে চুরুট টানছিল। বাঙালিবাবুকে ফের ঢুকতে দেখে আবার তেড়ে এল, Get out—Get out! I say get out!

বাঙালি ভদ্রলোক নেমে তো গেলেনই না। ফার্স্ট ক্লাস টিকিটটা বের করে সাহেবের নাকের ডগায় ধরলেন।

সাহেব বলল, শোনো বাবু, ভালো কথায় বলছি অন্য গাড়িতে যাও। আরও ফার্স্ট ক্লাস কামরা আছে।

বাঙালিবাবু বললেন, কেন যাব? এ কামরা কি তোমার রিজার্ভ করা?

কোনো কালো আদমি মুখের ওপর কথা বলে সাহেবরা তা সহ্য করতে পারত না। মুখ লাল করে বলল, হ্যাঁ, রিজার্ভ করা। তুমি যাও।

এও এক নাছোড়বান্দা বাঙালি। সাহেব-টাহেব কেয়ার করে না। বললেন, দেখি তোমার টিকিটে কেমন রিজার্ভেশন আছে।

সাহেব আর সহ্য করতে পারল না। বাঙালিবাবুকে লক্ষ করে ঘুঁষি মারতে লাগল। বাবুটির ব্যায়াম করা শরীর। খপ করে সাহেবের হাতটা ধরে ফেললেন। তারপর দাঁতে দাঁত টিপে বললেন, সাহেব, বিনা দোষে আমার গায়ে হাত তুলে ভালো করলে না। আমি দুর্বল নই।

সাহেব এবার বাবুটির নাক লক্ষ করে ঘুঁষি মারতে গেল। বাবুটি মাথা সরিয়ে নিয়ে

জুজুৎসুর কায়দায় সাহেবের ঘাড়ে এমন রপ্তা মারলেন যে সাহেবের ঘাড় বেঁকে গেল। সাহেব আর্তনাদ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভুভক্ত কুকুরটা ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঙালিবাবুর দিকে। বাবু চট করে সরে গিয়ে কুকুরটার পেটে পেছায় একটা লাথি মারলেন। খোলা দরজা দিয়ে কুকুরটা ছিটকে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। সঙ্গে সঙ্গে সাহেব পকেট থেকে রিভলবার বের করল।

বিপদ বুঝে নিরস্ত্র বাঙালিবাবুটি স্টেশনে লাফিয়ে পড়লেন। বাঁকা ঘাড়ের যন্ত্রণায় গৌঁ গৌঁ করতে করতে সাহেবও রিভলবার হাতে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ে তাড়া করে গেল।

প্ল্যাটফর্মে হৈচৈ চৈচামেচি শুরু হয়ে গেল। গোলমাল শুনে পাশের ছোটো কম্পার্টমেন্ট থেকে সাহেবের অ্যাটেনডেন্টটি ভোজালি হাতে বেরিয়ে এল। লোকটা নিগ্রো। বঁটেখাটো কুচকুচে কালো রঙ। মাথায় ছোটো ছোটো কৌঁকড়ানো ঘন চুল। কুৎকুতে দুটো চোখ। যেন সাক্ষাৎ যমদূত। সেও বাঙালিবাবুটিকে তাড়া করল।

সাহেব গার্ড বুদ্ধিমান। সে ক্ষ্যাপা সাহেবকে চিনত। বিপদ বুঝে চৌঁচিয়ে উঠল, মিস্টার জন, ডোন্ট ফায়ার!

কিন্তু কে কার কথা শোনে। জন যন্ত্রণায় ঘাড়টা বেঁকিয়ে গুলি ছুড়ল বাঙালিবাবুকে লক্ষ করে। এবার আর বাবুটি নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না। গুলিটি পাঁজর ঘেঁষে হাতের খানিকটা মাংস খাবলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। রক্তাক্ত দেহে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন বাবুটি।

এদিকে রক্ত দেখে খুন চেপে গেল পাবলিকের। একজন নিরস্ত্র নির্দোষ মানুষকে চোখের সামনে গুলি করল একটা হিংস্র সাহেব! লোকে লাঠি, ডাঙা যা হাতের কাছে পেল তাই নিয়ে তাড়া করল সাহেব আর তার সঙ্গী নিগ্রোটাকে। কুকুরটা ইটের ঘায়ে আগেই মরেছে। সাহেব আর নিগ্রো ছুটছে তো ছুটছেই। পিছনে উন্মত্ত জনতা। সাহেব জানে না কোথায় যাচ্ছে। গলিঘূঁজি, পুকুরপাড় দিয়ে সে ক্রমশ স্টেশন থেকে দূরে শহরের বাইরে এসে পড়ল। নিগ্রোটাপাও...

এই পর্যন্ত বলে তিনু ঘোষ থেমে গিয়েছিলেন।

তারপর? জিগ্যেস করেছিলাম।

তিনু ঘোষ বলেছিলেন, এই পর্যন্তই জানি। ঘটনার সময় আমি স্টেশনেই ছিলাম। ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। নিতান্তই অল্পবয়সি ছেলে তখন। মারামারি খুনোখুনি দেখে হাত-পা অবশ হয়ে যাচ্ছিল।

বললাম, কিন্তু আপনি যে বললেন, সত্যি করে ভূত দেখেছিলেন একবারই। তাও অনেক পরে। অর্থাৎ আপনার জীবনের পরের দিকে।

তিনু ঘোষ একটু চুপ করে থেকে বললেন, হ্যাঁ, তা বটে। আচ্ছা বলছি।

তিনু ঘোষ ফতুয়ার পকেট থেকে মোষের শিঙের ডিবে বের করে তা থেকে এক টিপ নসিয়া নিয়ে নাকে গুঁজলেন। তারপর রুমাল দিয়ে সাধের গৌঁফ জোড়াটা মুছে নিলেন।—কী বলছিলাম যেন—হ্যাঁ, জমিজমা আমার প্রাণ। সারা জীবন এইসব জমি রক্ষা করার জন্য আমরা মামলা করেছি। বাড়িঘরও করেছি। আমার জন্ম, ক্রিয়াকলাপ সব বর্ধমান জেলায়। ইদানিং ইচ্ছে করত বেলেঘাটায় যেমন বাড়িঘর আছে থাক। গ্রামের দিকে ফাঁকা জায়গায় একটা সাদামাটা বাড়ি কিনব। যেখানে একটু নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচব। নিশ্চিন্তে ভগবানের নাম করতে পারব।

গ্রামে বাড়ি কেনার সঙ্গে সঙ্গে একটা গাড়ি কেনারও স্বপ্ন দেখলাম। গাড়ি থাকলে যখন-

তখন হুস্ করে গ্রামে যাওয়া যাবে।

কিন্তু এই বয়সে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বাড়ি খোঁজা, দরদাম করা পোষাবে না। তাই ইচ্ছেটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ সেদিন কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম বর্ধমান থেকে অল্প দূরে কুচুট নামে একটা গ্রামে ফাঁকা জায়গার ওপর একটা দোতলা বাড়ি বিক্রি হবে।

কী নাম বললেন জায়গাটার? কুচুট?

হ্যাঁ। শুনতে খারাপ লাগছে তো ভায়া? কিন্তু খুব প্রাচীন গ্রাম। পুরনো মন্দির-টন্দির আছে। বর্ধমান থেকে কালনা পর্যন্ত যে বাসরাস্তাটা গেছে তারই ধারে গ্রামটা। আমি তখনই ঠিক করে ফেললাম যদি পছন্দ হয় আর দামে পোষায় তাহলে কিনে ফেলব।

তারপরই চাপা গলায় তিনু ঘোষ বললেন, আরও একটু ভেবে রেখেছিলাম কিনে ফেলতে পারলে লোকসান নেই। ভালো না লাগলে এক বছর দু'বছর পর বেশি দামে বেচে দেব। দিন দিন জায়গার দাম, বাড়ির দাম তো বেড়েই চলেছে। আখেরে আমারই লাভ।

আমি চুপ করে রইলাম। জমির দাম বাড়লে কার কতটা লাভ তা জানবার আগ্রহ মোটেই আমার ছিল না। আমি তো অন্য জিনিস জানতে এসেছি।

তারপর?

তিনু ঘোষ বললেন, বাড়িটা দেখলাম। দোতলা বাড়ি অনেকটা জায়গার ওপর। তবু রক্ষা বাড়িটা পুরনো হলেও ততটা জীর্ণ নয়। ছাদের পাঁচিলে ছোট ছোট গুল্ম লতা জন্মালেও অশথ বা বট গাছের শেকড় দেওয়াল ফুঁড়ে বের হয়নি। নীচে তিনটে ঘর। সবগুলোই অন্ধকার। দুটো ঘরের দরজায় তালা লাগানো। একটার দুটো কড়ায় দড়ি বাঁধা। তালাগুলো যে অনেকদিন খোলা হয়নি তা মরচে পড়া দেখলেই অনুমান করা যায়। একটা ঘরের পিছনে একটা ছোটোখাটো সিমেন্টের পাঁচিল তোলা, অনেকটা যুদ্ধের সময় বাফার ওয়ালের মতো।

এটা কী? বাড়ির মালিককে জিগ্যেস করলাম।

বললেন, ঠিকই ধরেছেন। বাফার ওয়াল করা হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যাতে জাপানিরা বোমা ফেললে বোমার টুকরোয় ঘরের কোনো ক্ষতি না হয়।

জিগ্যেস করলাম, তা হঠাৎ এই বাড়িটার গায়ে বাফার ওয়াল কেন? তাছাড়াও তো দেখছি ট্রেঞ্চ কাটার মতো এখনও লম্বা গর্ত কাটা আছে।

বাড়িওলা বললে, হ্যাঁ, ওটা ট্রেঞ্চই। আসলে সে সময়ে কলকাতা এবং চারপাশে বসিং-এর ভয় থাকায় অনেক জায়গায় মিলিটারি রাখা হত। মিত্রপক্ষের মধ্যে আমেরিকান সোলজাররাই বেশি এসব জায়গায় থাকত। এ বাড়িটা ছিল ওদের? এ অঞ্চলের এক নম্বর শেলটার।

ও! তাহলে এ বাড়িতে সৈন্যরাও ছিল।

আজ্ঞে হ্যাঁ। চলুন এবারে দোতলাটা দেখবেন।

দোতলায় আলো-বাতাস বেশ ভালোই। ওপরেও তিনখানি ঘর। বাড়ির মালিক ঘরগুলো খুলে খুলে দেখালেন। পশ্চিম দিকের ঘরটা অপেক্ষাকৃত ছোটো। ভেতরে ঢুকতেই একটা ভ্যাপসা পচা গন্ধ নাকে এল। বাড়ির মালিক মন্থবাবু একটি কথাও না বলে তাড়াতাড়ি জানলাগুলো খুলে দিলেন।

নাকে রুমাল চেপে বললাম, কিছু পচেছে। মন্থবাবু সে কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, হতে পারে।

কিন্তু কী পচতে পারে, কেন পচতে পারে সে বিষয়ে কোনো কথাই বললেন না।

আমি পিছনের জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়লাম। এ দিকটাও ফাঁকা। জিগ্যেস করে জানলাম

এখান থেকে আধ মাইলটাক দূরে একটা বাঁওড় আছে। বাঁওড় কাকে বলে জিগ্যেস করলে বললেন, ও নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বাড়িটা কিনবেন কিনা বলুন।

বাবাঃ খুব ঘ্যাম!

সামান্য একটি কথার মানে জানতে চাওয়ায় এত বিরক্তি কেন বুঝলাম না! শুধু এইটুকু বুঝলাম কোনোরকমে বাড়িটা বেচে দিয়ে কিছু টাকা হাতাবার জন্যেই উনি ব্যস্ত।

আমি তবু জানলায় দাঁড়িয়ে রইলাম। বাড়িটার লাগোয়া যে বিরাট জমি সেটা তার দিয়ে ঘেরা। তারের বেড়ার শেষে পাথরের একটা ভাঙা ফলক দেখে জিগ্যেস করলাম, ওটা কী?

কোনটা? ভুরু কঁচকে জানতে চাইলেন মন্থ কুণ্ডু।

বললাম, ঐ যে ভাঙা পাথরের ফলক? মনে হচ্ছে, এখানে এক সময় খ্রিস্টানদের বেরিয়াল গ্রাউন্ড-ট্রাউন্ড কিছু ছিল।

তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, তা হতে পারে। পুরনো জায়গা তো! নিন, নীচে চলুন।

বুঝলাম, বড্ড তাড়া!

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনের ভাব বোধহয় তিনি বুঝে নিতে পেরেছিলেন। একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, আপনাকে আবার কলকাতায় ফিরতে হবে তো। সেইজন্যেই তাড়া দিচ্ছি। নইলে আমার কী? থাকুন না। যে সম্পত্তি কিনবেন সেটা ভালো করে দেখে শুনে নিন।

কথাটা লুফে নিয়ে তৎক্ষণাৎ বললাম, সেই ভালো। এখনই তো বেলা পড়ে এসেছে। রাতটা থেকেই যাই।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের মুখটা এমন কালো হয়ে গেল যে আমার বুঝতে বাকি রইল না, আমার রাত্রিবাস করাটা উনি চাইছেন না। কিন্তু —কেন?

আমতা আমতা করে উনি বললেন, আপনি থাকলে সে তো আমার অনেক সৌভাগ্য। কিন্তু মুশকিল হয়েছে আমার বাড়িতে আজ আত্মীয় স্বজন এসে পড়ছে। ছোটো বাড়ি তো— বললাম, ওর জন্যে ভাববেন না, আমি এই বাড়িতেই থাকব।

এই বাড়িতে!

বললাম, হ্যাঁ। দোতলার ঘরগুলো তো দেখলাম ভালো অবস্থাতেই আছে।

উনি বললেন, তবু—অনেকদিন এ বাড়িতে কেউ শোয়নি। একটু ঝাঁটপাট দেওয়া— ধোওয়া-মোছা!—

বললাম, এক রাত্তিরের তো মামলা। একটা মাদুর, একটা বালিশ, সম্ভব হলে একটা মশারি আর এক ঘটি জলের যদি ব্যবস্থা করে দিতে পারেন তাহলেই যথেষ্ট হবে।

দেখি। বলে আমাকে এ বাড়িতে একা বসিয়ে রেখেই উনি যেন চিন্তিতভাবে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

উনি তো চলে গেলেন। আমি একা চুপচাপ বসে রইলাম বাড়ির নীচে একটা ভাঙা বেদির ওপর। সত্যি কথা বলতে কি এই সময়টা আমার বেশ ভয় ভয় করছিল। বুঝলে, বিকাশ বাবা।

জিগ্যেস করলাম, কীসের ভয়?

তা ঠিক বোঝাতে পারব না। খোলামেলা জায়গার মধ্যে একটা শূন্য বাড়ি। যে বাড়িতে বহুদিন কেউ বাস করেনি। কেন করেনি কে জানে! ওদিকে মাঠের প্রান্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

পাখিগুলো বাসায় ফিরছে। ফিরছে যেন খুব তাড়াতাড়ি। বোধহয় এখনি অন্ধকার নেমে আসবে বলে। আজ এই মুহূর্তে প্রথম বুঝলাম অন্ধকারকে শুধু মানুষই নয়, ঐ উড়ন্ত পাখিগুলোও ভয় পায়। তাই তারা অন্ধকার নামার আগেই নিরাপদ আশ্রয় পেঁছতে চায়। অন্ধকার নামবার আগে এই নির্জন অজানা জায়গা ছেড়ে আমারও কলকাতায় ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কেন যে দুঃসাহস দেখিয়ে বসলাম কে জানে!

জিগ্যেস করলাম, আর কোনো কারণে আপনার ভয় হচ্ছিল?

তিনু ঘোষ আর একটিপ নসি় নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আরও দুটো কারণে। প্রথম বেরিয়াল গ্রাউন্ডের পোঁতা ভাঙা সেই পাথরের ফলকটা আর দোতলার ছোটো ঘরটায় যে পচা গন্ধ পেয়েছিলাম সেটা। মরা কোনো কিছু এমনকি বেড়াল বা ইঁদুর বা টিকটিকি পর্যন্ত ছিল না। তাহলে কীসের ঐ উৎকট গন্ধ? জানো ভায়া, বাড়ির মালিক পর্যন্ত কোনো কথা বললেন না। এই প্রশ্ন দুটোই তখন মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল। মনে হচ্ছিল আজ রাত্রে এই বাড়িতে কিছু ঘটবেই—আর তা মোটেই শুভ নয়। অথচ কিছুতেই গিয়ে বাড়ির মালিককে বলতে পারলাম না—আমি থাকব না। বর্ধমান যাবার লাস্ট বাস এখনও পাওয়া যাবে। কোনোরকমে বর্ধমান যেতে পারলে হাওড়া যাবার ট্রেনের অভাব হবে না।

অগত্যা থাকতে হবেই বলে মনকে প্রস্তুত করে নিলাম।

তার পরের ঘটনা তিনু ঘোষ যা বলেছিলেন তা এইরকম—

সাড়ে সাতটা বাজতে না বাজতেই মন্মথ কুণ্ডু আর তাঁর বাড়ির কাজের লোকটি এসে মাদুর, বালিশ, মশারি, দড়ি, একটা কুঁজো-ভর্তি জল আর একটা গেলাস রেখে দিয়ে গেল। ওরা যখন চলে যাচ্ছিল তখন বাধ্য হয়ে আমাকে বলতে হল, একটু আলোর ব্যবস্থা তাহলে—বিলক্ষণ! এই যে তারও ব্যবস্থা করেছি। বলে মন্মথবাবু একটি মাত্র সরু মোমবাতি ব্যাগ থেকে বের করে রাখলেন।

দেশলাই আছে তো?

মাথা নেড়ে না জানাতে উনি যে কীরকম অপ্রসন্ন হলেন তা ওঁর গলার স্বরেই বুঝলাম। বললেন, সঙ্গে একটা দেশলাইও রাখেন না? কতই বা দাম! বলে পকেট থেকে নিজের দেশলাইটা বের করে আমার দিকে ছুড়ে দিলেন।

হায়রে আমার কপাল! বুঝলে ভায়া, লোকের পকেটে পকেটে দেশলাই না থাকলে মনে করে নিতে হবে পয়সার অভাবেই দেশলাই রাখেনি। এই নইলে বাড়ির মালিক!

যাক গে, এবার আসল কথায় আসি। সরু অল্পপ্রাণ মোমবাতিটা জ্বলে প্রথমে মাদুর আর চাদর বিছিয়ে বিছানা পেতে নিলাম। তারপর মশারিটা কোনোরকমে টাঙালাম। তারপর একটা তোবড়ানো টিনের গামলায় যে খাবার আনা হয়েছিল তা খেয়ে নিলাম। এত তাড়াতাড়ি খাওয়া আমার অভ্যেস নয় কিন্তু বসে বসে মশার কামড় খেয়ে লাভ নেই। তাই ডান হাতের ব্যাপারটা সেরে নিয়ে দরজায় ভালো করে খিল এঁটে মশারির ভেতর ঢুকে পড়লাম।

ভাগ্যি বুদ্ধি করে টর্চটা এনেছিলাম। ওটা রাখলাম বালিশের পাশে যাতে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়।

শুয়ে শুয়ে ঘুম আসছিল না। মোমবাতিটা অর্ধেক জ্বলার পর নিভিয়ে রেখেছিলাম যদি গভীর রাতে দরকার হয়।

নানারকম চিন্তা করতে করতে কখন একসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ দূরে শেয়ালের ডাক শুনে ঘুমটা ছুটে গেল। শহরে এখন শেয়াল দেখা যায় না, কতকাল শহরের লোক

যে শেয়ালের ডাক শোনেনি তা ঠিক নেই। তবে আমি ছোটবেলায় শুনেছি। এমন কিছু ভয়ঙ্কর ডাক নয়। আর শেয়াল একটা ডেকে উঠলেই একপাল শেয়াল একসঙ্গে ডাকা শুরু করে দেয়। কিছুক্ষণ ডেকেই থেমে যায়। তারপর আবার তিন ঘণ্টা পরে পরে ডাকে।

এই পর্যন্ত বলে তিনু কাকা আমাকে বললেন, জান তো বাছা, সমস্ত দিনরাত্তির ১/৮ সময়কে যাম বা প্রহর বলে। এক প্রহর বা যাম হচ্ছে তিন ঘণ্টা। তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক প্রহর বা যাম। এক-এক প্রহরে শেয়াল ডেকে যাম ঘোষণা করে। সেইজন্যে শেয়ালের একটা নাম যামঘোষক।

তিনু কাকা আবার একটু থেমে বললেন, কিন্তু সেদিন রাতে যে শেয়ালের ডাক শুনলাম তা একটু অন্যরকমের। যেন হাঁড়ির মধ্যে থেকে শেয়ালটা ডাকছিল। এমনি বিকট শব্দ! আমি অবাক হলাম। এ আবার কোন দেশি শেয়াল! আর শেয়াল তো কখনও একা ডাকে না?

মরুক গে! বলে আমি আবার চোখ বুজলাম।

তারপর হঠাৎই ঘুমের ঘোরে মনে হল কারও পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কেউ যেন পা ঘেঁষটে ঘেঁষটে হাঁটছে। আমি কান পেতে রইলাম। মনে হল শব্দটা আসছে নীচে থেকে। তার পরেই মনে হল বাড়ির পিছনে দেওয়াল ঘেঁষে আস্তে আস্তে হাঁটছে। এই নির্জন জায়গায় গভীর রাতে কে অমন করে হাঁটবে! কী চায়? ও কি চোর? এ বাড়িতে বহুদিন পর আমার অস্তিত্ব দেখে এখানে চুরি করতে এসেছে?

আমি কান পেতে রইলাম। শব্দটা আস্তে আস্তে কোথায় যেন চলে গেল।

যাক, যে এসেছিল সে চলে গেছে। কিন্তু কেনই বা এত রাতে এসেছিল, কেনই বা দরজা খোলবার চেষ্টা মাত্র না করে চলে গেল?

তার কিছুক্ষণ পর হঠাৎ সমস্ত ঘরে চুরুটের গন্ধ। আমি চমকে উঠলাম। এত রাতে কে এসে চুরুট খাচ্ছে! আর যে খাচ্ছে সে যে খুব কাছেই আছে বুঝতে অসুবিধে হল না। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। ঘরের মধ্যেই কেমন একটা চাপা শব্দ!

এইবার আমি খুব সাহসের কাজ করে ফেললাম। কী করে করতে পারলাম তা ভাবতে গেলে আজও অবাক হয়ে যাই। আমি মশারি থেকে বেরিয়ে মোমবাতিটা জ্বাললাম। অন্ধকার ঘরে হঠাৎ মড়ার হাসির মতো মোমবাতিটা যেন ঘোলাটে হাসি হেসে উঠল। দেখলাম জানলার গরাদ দিয়ে একটা বিকট হাত দেওয়াল দিয়ে উঠে আসছে.....মুখটা দেখে চমকে উঠলাম। ছোটবেলায় দেখা ট্রেনের সেই খুনি সাহেবটা না.....তখনই নীচে থেকে ভেসে এল চাপা গর্জন। না কোনো ভুল নেই....

আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। তারপর....

তারপর আর কিছু মনে নেই।

এই হল তিনু ঘোষের বৃত্তান্ত। ঘটনাটা বলে উনি হাঁপাতে লাগলেন। বয়েস হয়েছে তো।

বললাম, কাকাবাবু, তারপর বাড়িটা কী করলেন?

কলকাতায় ফিরে এসেই লিখে দিলাম, নানা কারণে এখনই বাড়িটা কেনা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

তারপরেও আমি অনেকক্ষণ তিনু কাকার সামনে চুপ করে বসে ছিলাম দেখে তিনু কাকা বললেন, কী ভাবছ?



আমি চুপ করে রইলাম। উনি হেসে বললেন, ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না তো? এক কাজ করো, ঠিকানা দিচ্ছি। ওখানে একদিন চলে যাও। বাড়িটা যদি এখনও থাকে কিছু দেখতে পাবেই। তবে হয়তো গেলেই পাবে না। ওঁদের দেখা সহজে মেলে না। কয়েক দিন থাকতে হবে।

বললাম, যাব বলছেন?

হ্যাঁ, তোমরা আজকালকার ছেলে। নিজের চোখে না দেখলে অনেক কিছুই বিশ্বাস করতে পার না। কাজেই অবশ্য অবশ্য যাবে। তবে একা নয়। আর গোঁয়াতুমি করবে না।

বলেই ঘোষমাশাই এক টিপ নস্যি নিলেন।

### ‘দেবতার রোষ’

ঠিক হয়েছিল সেদিনই দুপুরে দু’মুঠো ভাত খেয়েই দুজনে বগলা মজুমদারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ব। দেরি করা চলবে না। কারণ গত রাত্রে যে অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা ঘটে গেল আর আজ সকালে বাড়ির পিছনের ঝোপ থেকে যে মড়া বাদুড়গুলো পাওয়া গেল তা রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছে। সত্যিই ভাবনার কারণ। কেননা বেশ কিছুকাল আগে বেলেঘাটার তিনু ঘোষ যা বলেছিলেন তা বিনা প্রতিবাদে শুনে গেলেও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারিনি। আর আমার মুখ থেকে সব শুনে বাসুদেবও প্রায় হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর এখানে হঠাৎ বগলাবাবুর আবির্ভাব। তিনি তো প্রায় ছব্ব তিনু ঘোষের কথাই শুনিয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে শোনালেন মাঝে মাঝে সন্দের পর কোনো হিংস্র জন্তুর অদ্ভুত ডাকের কথা। আর সেই ভয়েই এককালের প্রবল প্রতাপ জমিদারবংশের উত্তরাধিকারীটি আটটা বাজতেই ভয় পেয়ে বাড়ির পথে দৌড়লেন। এই অদ্ভুত ডাকটি কীরকম বা জগা মণ্ডল যে শব্দ শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে খামারবাড়িতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিল সেই শব্দটা কীরকম সে কথা বগলাবাবুকে জিগ্যেস করবার সেদিন আর সুযোগ পাওয়া যায়নি।

এসব অলৌকিক অবাস্তব ব্যাপার-স্বাপার আমরা মন-প্রাণ দিয়ে মেনে নিতে পারিনি। কিন্তু গত রাত থেকে ভাবনায় পড়তে হয়েছে। এ ভাবনার সুরাহা করতে পারেন একমাত্র ঐ প্রৌঢ় বগলা মজুমদারই। তাই আবার তেমন ঘটনা ঘটান আগেই বগলাবাবুর পরামর্শ নেওয়া উচিত। কাজেই উনি কবে আসবেন না আসবেন তার জন্য অপেক্ষা না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজেদেরই যাওয়া উচিত।

মনের সঙ্গে এইরকম বোঝাপড়া করে আমরা যখন বনঝোপ থেকে বাড়ি এলাম বেলা তখন সাবে আটটা।

বাড়ি ঢুকেই দেখা গেল হরিপদ ঠাকুর রামাঘরের বাইরে গামছা কাঁধে রকে বসে আছে গুম হয়ে। এমনটা সে করে না। এসেই চা জলখাবার করতে লেগে পড়ে। তাই অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম—কী ব্যাপার, হরিপদ? সকালবেলায় অমন হাঁড়িমুখ কেন?

হরিপদ দুহাতে মুখ ঢেকে বলল, আর আমার এখানে কাজ করা হবে না, বাবু। কেন?

হরিপদ প্রায় ডুকরে কেঁদে বলল, আপনাদের ওপর ‘দেবতার রোষ’।

দেবতার রোষ! কোন দেবতা?

হরিপদ দুহাত তুলে ওপর দিকে তাকিয়ে বলল, তিনি হাওয়ায় ভেসে বেড়ান। শুনতে

পাই এই গেরামেই নাকি তেনার অধিষ্ঠান। কখন কার ওপর তেনার রোষ পড়বে কেউ জানে না। রোষ পড়লেই তার সন্ধান। মাঝে-মাঝেই তো দু-একজন যাচ্ছে। নইলে জগা মোড়লের মতো সোমন্ত জোয়ান বাড়ি থেকে বেরোল আর ফিরল না!

চা, জলখাবারের কথা ভুলে বাসুদেব একটা টুল টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

তুমি জগা মোড়লকে চিনতে?

চিনতাম বৈকি বাবু। তাগড়াই জোয়ান ছিল। একবার জ্যাস্ট মাসে মোষের গাড়ির একটা মোষ গরমে হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে রাস্তা থেকে নেমে পুকুরের দিকে ছুটছিল। গাড়ি লাট খায় আর কি। জগা ফিরছিল হাট থেকে। ছুটে গিয়ে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে দুহাত দিয়ে শিঙ চেপে ধরেছিল মোষটার। বারকতক মাথা ঝাঁকবার পর ঠান্ডা মেরে গিয়েছিল মোষটা। অথচ সেই ছেলেটাই—এই পর্যন্ত বলে থামল হরিপদ।

হরিপদ বলতে লাগল, এখানে রাতের বেলায় এক-একদিন একটা শব্দ ওঠে। যেন দেবতা আড়াল থেকে গজরাচ্ছেন। তারপরেই তিনি নেমে আসেন মাটিতে। সঙ্গে থাকে একটা শাগরেদ। যার সন্ধান করবেন তার বাড়ি নিশানা করে ঘুরবেন চারিদিকে। তারপর ঘরে ঢুকে—

বাধা দিয়ে বললাম, তা জগার কী হয়েছিল বলো।

জগার মরণ-পাখা গজিয়েছিল। সে বলত ঐ শব্দটা ঠিক কীসের খুঁজে বের করবই। শব্দ উঠলেই ও দলবল নিয়ে মশাল জ্বালিয়ে হেঁচো করে ছুটত। কখনও বড় বড় হাউই ছুড়ত আকাশের দিকে। বোকা গোঁয়ার ছোঁড়াটা ভাবত অশরীরী কেউ বাতাসে ভেসে থাকলে হাউই-এর আঙনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কিন্তু কপাল মন্দ। তাই নিজেই মরল।

ব্যাপারটা কী হয়েছিল?

শুনলাম, সেদিন সারা দিনভর খাটাখাটনি করে সন্ধ্যা রাতে ঘরে এসে শুয়েছিল। হঠাৎ কাছেই কোথাও যেন একটা কুকুর ডেকে উঠল। কুকুর তো কতই ডাকে বাবু। কিন্তু এ ডাক আলাদা। মেঘ ডাকার মতো গর্জন।

বাড়ির কাছে ডাক শুনে ধড়মড় করে উঠে বসেছিল ছোঁড়াটা। দলবল কেউ ছিল না। দেওয়ালের কোণ থেকে সড়কিটা নিয়ে লঠন হাতে ছুটল খামারবাড়ির দিকে।

বাসু, সেই যে গেল আর জীবন্ত ফিরল না। পরের দিন লাশ পাওয়া গেল বাঁওড়ের জলে।

এই বলে হরিপদ মাথাটা হেলিয়ে দিল দেওয়ালে।

কীভাবে মরেছিল জিগ্যেস করলাম।

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না হরিপদ। তারপর দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল, আঙের ঘাড়টা মুচড়ে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল।

ওকে কে মারল ধারণা করতে পার? বাসুদেব জিগ্যেস করল।

হরিপদ ফের হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে শুধু বলল, দেবতার রোষ বাবু!

তোমাদের এই দেবতার উৎপাত এখানে কতদিন ধরে চলছে?

হরিপদ শিউরে উঠে জিব কাটল। বলল, ‘উৎপাত’ বলবেন না, বাবু। একেই তো আপনাদের ওপর রোষ বর্তেছে—বলুন ‘দেবতার মর্জি’।

যাই হোক, এটা চলছে কতদিন?

হরিপদ বলল, খুব বেশিদিন নয়। বাবা বলতেন, এমন চুপচাপ জায়গা এ অঞ্চলে আর ছিল না। কোনো হাঙ্গামা হুজ্জাৎ এখানে হত না। তারপর হঠাৎই একদিন দেবতার আবির্ভাব

জানান দিয়ে গেল—পর পর তিনদিন বাজ পড়ল বাবু এক নাগাড়ে। তিন তিনটে বিরাট দেবদারু গাছ যা প্রহরীর মতো আমাদের গেরামকে রক্ষা করত—ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে! উঃ সে কী শব্দ!

তারপর?

তারপর থেকেই মাঝে মাঝে অনেক রাতে কুকুরের ডাক। প্রথমে কুকুরের কান্না। তারপর বুক-কাঁপানো গর্জন। তারপরেই রাত পোয়ালে দেখা যেত কোনো না কোনো প্রাণী মরে পড়ে আছে রাস্তায়।

প্রাণী? মানুষ নয়? জিগ্যেস করল বাসুদেব।

কত আর মানুষ থাকেন দেবতা? গ্রাম তো উজাড় হয়ে যাবে। মানুষজন তো ভয়ে কাঁটা। জগা গেল, আরও দুজন আদিবাসী গেল। বেশ কয়েক বছর আগে কলকাতা থেকে নাকি একজন এসেছিলেন একটা বাড়ি কিনতে। এক রাত্তির থেকেই পালালেন প্রাণ হাতে করে। এই তো অবস্থা।

এ কি, উঠছ কোথায়?

আপনাদের চা-জলখাবারটা করে দিই।

সে হবেখন। আগে বলো আমাদের ওপর দেবতার রোষ কেন? কী করে বুঝলে? বলব। আপনাদের ভালোর জন্যেই বলব। তার আগে চা-টা করে দিই।

বেশ, চায়ের জল চড়াতে চড়াতেই বলো বাঁওড়ের জলে যে জগার দেহ পাওয়া গিয়েছিল তার কারণ কী? বাঁওড়টা কোথায়? জগা মশাল হাতে দলবল নিয়ে ছুটত কোন্ দিকে? বাঁওড়ের দিকেই কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু। বাঁওড় হচ্ছে মজে যাওয়া খাল বা জলা। ওর জল পচা। আমাদের গ্রামের দক্ষিণ দিকে। বহুকালের পুরনো। ওখানেই শ্মশান, ওখানেই ভাগাড়। আবার ওখানেই যত ভয়। খুব দরকার না পড়লে ওদিকে কেউ যায় না।

কবরখানা নেই? জিগ্যেস করলাম।

হরিপদ বললে, আছে বইকি। ঐ বাঁওড়ের ধারেই। কোনো মড়া জলে চিতার আগুনে। কোনো মড়া যায় মাটির নীচে। দুটোরই ব্যবস্থা পাশাপাশি। বিশেষ ভেদ নেই। বলেই হরিপদ চায়ের জল চড়িয়ে দিল।

চা-জলখাবার খাবার পর হরিপদ তার গতকাল রাতে অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করল।

আপনারা বোধহয় নজর করেছিলেন কাল ঘড়িতে আটটা বাজার আগেই আমি তাড়াহুড়ো করে চলে গিয়েছিলাম। কেন গিয়েছিলাম।—

বাধা দিয়ে বললাম, না হরিপদ, আমরা কেউই নজর করিনি। কোনোদিনই দেখি না কখন চলে গেলে। আমরা জানি তুমি আমাদের রাতের খাবার বানিয়ে দিয়েই চলে যাও। তাছাড়া তুমি একটু তাড়াতাড়ি যাবে তা তো বলাই ছিল।

হরিপদ কৃতজ্ঞ হয়ে বলল, তা তো জানি। তবু কাল হঠাৎ এভাবে কেন গেলাম সেটা আপনাদের জানানো দরকার। বলছি শুনুন—

আমি রান্না করছিলাম, এই সময়ে দেখি লোকটি বাইরের ঘরে এসে ঢুকল। আপনারা কথা বলতে লাগলেন। রান্নাঘরের দক্ষিণ দিকের জানলাটা খোলা ছিল—রোজই থাকে। বাইরে থেকে সাপখোপ যাতে ঢুকতে না পারে তাই জাল দেওয়া। এমনিই তাকালাম। বাইরে জমাট অন্ধকার। মনে হল অন্ধকারটা যেন বড্ড বেশি চাপচাপ। কেমন ভয় করল। মনে

হল যেন কোনো বিপদ ঘটবে। হঠাৎ দূরে জঙ্গলের মধ্যে একফালি চোখ-ঝলসানি আলো জ্বলে উঠল। ঠিক যেমন হয় বিদ্যুৎ চমকালে। কিন্তু বিদ্যুৎ তো চমকাবে আকাশে। এটা অনেক নীচে—জঙ্গলের মধ্যে।

কীসের আলো? ভাবতে ভাবতেই আলোটা আর দেখা গেল না। তারপরেই দূরে কোথায় যেন একটা কুকুর কেঁদে উঠল। একবারই। আমি বাবু, রীতিমতো ভয় পেলাম। বুঝলাম এর পরই সেই ভয়ঙ্কর গর্জন শোনা যাবে। আর—বাবু, কুকুরের সেই হাঁকড়ানির পরেই দেবতার চলাফেরা শুরু হবে। মাঠ পার হয়ে বাড়ি পৌঁছোব কী করে ভেবে তখনই রামনাম করতে করতে বেরিয়ে গেলাম।

বাসুদেব জিগ্যেস করল, ডাকটা কি একটা কুকুরেরই?

তাই তো মনে হয়।

কুকুরটা দেখেছ কখনও?

না বাবু। কুকুরটার ডাক এখানে অনেকেই শুনেছে। কিন্তু কেউ দেখেনি। ও দেখার জিনিস নয়।

কোন দিক থেকে শব্দটা আসে? জিগ্যেস করলাম।

বুঝতে পারা যায় না। কখনও মনে হয় পূব দিক থেকে, কখনও মনে হয় পশ্চিম দিক থেকে, কখনও উত্তর—এসব দেবতার মর্জি বাবু!

ঠিক আছে। তারপর?

তারপর হরিপদ যা বলল তা এইরকম—

আমাদের বাসা থেকে বেরিয়ে হরিপদ চোখ-কান বুজে হাঁটতে লাগল মাঠের ওপর দিয়ে। ঘুরঘুটি অন্ধকার। মনে হচ্ছিল চোখের সামনে যেন এক একটা অন্ধকারের পাঁচিল। এখনি ধাক্কা লাগবে। নিতান্ত চেনা পথ বলে এগিয়ে যেতে পারছিল।

অল্প দূর যাবার পর চোখে পড়ল একটা ঘোলাটে আলো দুলতে দুলতে পাশ দিয়ে যাচ্ছে। ভালো করে ঠাণ্ড করে দেখল একটা লোক আমাদের বাসার দিক থেকে এসে মাঠের ওপর দিয়ে খুব জোরে হেঁটে যাচ্ছে। তার হাতে একটা লণ্ঠন।

এই নির্জন মাঠে—যেখানে চারিদিক নিঝুম—গলা টিপে মেরে ফেললেও কেউ টের পাবে না।—ভয়ে যখন কাঁটা তখন ঠাকুরের কৃপায় একজন মানুষকে দেখতে পেয়ে হরিপদ ভরসা পেল। সে ডেকে উঠল—একটু দাঁড়ান মশাই। আমিও যাব ঐ দিকে!....

কিন্তু হরিপদের ডাক শুনে উন্টো ফল হল। লণ্ঠন হাতে লোকটি যেন ভয় পেয়ে আরও জোরে হাঁটতে লাগল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটা কোথায় যেন হারিয়ে গেল বাবু। আলোটাও আর দেখা গেল না। তাজ্জব ব্যাপার!

সঙ্গে সঙ্গেই হরিপদের আবার ভয় পেতে লাগল। নিজেকে কেমন অসহায় মনে হতে লাগল। পা দুটো কাঁপতে লাগল।

আর তখনই স্পষ্ট বুঝতে পারল পিছনে কেউ একজন আসছে। নির্জন মাঠে সঙ্গী পাওয়া যাবে মনে করে হরিপদ পেছন দিকে তাকাল। কিন্তু—

কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। শুধু একটা ঠান্ডা বাতাস মাঠের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।

মনের জোরে প্রাণপণে হাঁটতে লাগল হরিপদ। কিন্তু একী! এতক্ষণ হেঁটেও নিজের বাড়ি খুঁজে পাচ্ছে না কেন? সে কি পথ ভুল করল?

হঠাৎ মনে হল কেউ যেন আবার তার পিছু নিয়েছে। সে এগিয়ে আসছে....ক্রমেই এগিয়ে আসছে। পাওয়া যাচ্ছে নিঃশ্বাসের শব্দ। সে নিঃশ্বাস না কি মানুষের নয়.....।

কথা শেষ করে হরিপদ হাঁপাতে লাগল।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সহানুভূতি জানিয়ে বাসুদেব বলল, খুবই বিপদে পড়েছিলে দেখছি। কিন্তু আমাদের ওপরই দেবতার রোষ বুঝলে কী করে?

হরিপদ হাতের কাছের ঘটি থেকে খানিকটা জল খেয়ে গামছায় মুখটা মুছে নিয়ে বলল, এ কি আর বোঝার অসুবিধে হয়, বাবু? আপনারা তো ক'দিন হল এসেছেন। তার আগে যদিও বেশ কয়টা অঘটন ঘটে গেছে তবু আপনারা আসার পর থেকে এই প্রথম আপনাদের বাসা থেকে বাড়ি ফিরতে গিয়ে ভয় পেলাম। রান্নাঘরে বসে অন্ধকারে বিদ্যুতের ঝিলিক দেখলাম। সত্যি বিদ্যুৎ হলে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু এ তো—ধরুন না কেন—বিদ্যুৎ কি মাত্র একবার চমকায়? খামোকা কুকুর অমন করে কেঁদে উঠবে কেন? তাও একবার। এ যেন শুধু আমাকে ভয় দেখাবার জন্য। অথচ আমি গরিব নিরীহ মানুষ। কোনো সাতে-পাঁচে নেই। তাছাড়া—তাছাড়া দেখুন, ঐ যে লোকটি আপনাদের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে কথা বলছিলেন তিনিও তো একটু পরেই ভয় পেয়েই চলে গেলেন তাড়াতাড়ি। তা হলে আপনাদের এই বাসায় এমন কিছু ব্যাপার আছে যার জন্যে ‘দেবতা’ কুপিত!

নিতান্ত মজা করেই বাসুদেব হরিপদকে সমর্থন করতে গিয়ে গত রাত্রে কথা বলতে যাচ্ছিল, আমি ইশারায় থামিয়ে দিলাম। সে কথা শুনলে হরিপদ আর কখনও আমাদের বাসামুখো হবে না।

জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা হরিপদ, তোমার তো বেশ বয়েস হয়েছে। চুলে পাক ধরেছে। এখানেই তো আছ বরাবর?

হ্যাঁ বাবু। এখানেই জন্ম, এখানেই বড় হওয়া, এখানেই মরার ইচ্ছে।

তা এখন এই যে সব উৎপাত দেখছ—

হরিপদ জিব কেটে, দু'হাতে কান চাপা দিয়ে বলল, ‘উৎপাত’ বলবেন না! যা কিছু হচ্ছে তা তো দেবতার লীলা।

বললাম, আচ্ছা, তাই না হয় হল। তা এরকম লীলা এখানে ছোটবেলায় দেখেছ? আজে না। কিন্তু পরে ক্রমশ নানা কথা ছড়াতে লাগল। তারপরেই দেবতাদের লীলা শুরু হল। তারপর যখন আদিবাসীদের দুজন হঠাৎ মুখ দিয়ে রক্ত তুলে মল আর এই সেদিন জগা মণ্ডলের লাশ পাওয়া গেল বাঁওড়ের জলে, তখন থেকেই শুরু হল বুকের কাঁপুনি। আর এখন তো মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কোনো ক্ষতি হবে আমাদের।

বাসুদেব বললে, হরিপদ, তুমি একটু আগেই বললে ‘নানা কথা ছড়াতে লাগল’—তা সেই নানা কথাগুলো কী? দু’ একটা বলো না।

এ কথায় হরিপদের মুখটা শুকিয়ে গেল। বোঝা গেল তার বলতে ইচ্ছে করছিল না। শুধু যে ইচ্ছে করছিল না তা নয়, ভয়ও করছিল।

কেন ভয় সেটাই জানতে চাই আমরা।

আমরা আবার বলতে বললাম। ও হাত জোড় করে বলল, ও সব কথা থাক না, বাবু। দেখছি তো দেবতাদের নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করতে গিয়েছে—এমনকি কেন, কী বিভ্রান্ত জানতে চেষ্টা করেছে হয় তারা মরেছে নয় প্রাণের ভয়ে পালিয়েছে।

বুঝলাম এখানেই কোথাও বাড়ি কিনতে এসে এক রাত্তির কাটাতে গিয়ে বেলেঘাটার তিনু ঘোষও ভয় পেয়ে পালিয়েছিলেন।

আসলে লোকটা ছিল তো সাহেবের জাত। আবার বলতে শুরু করল হরিপদ।—সাদা চামড়া, আর অনেক টাকার মালিক বলে অন্য মানুষকে ঘেন্না করত। আর তারই ফলে প্রাণ হারাল কোথাও নয় এই গ্রামের পথে।

এইটুকু শুনেই আমরা দুজনে কান খাড়া করে রইলাম।—এই সাহেবের কথা আমরা জেনেছিলাম তিনু ঘোষের মুখে। কিন্তু পাবলিকের তাড়া খেয়ে বর্ধমান স্টেশন থেকে বেরিয়ে শেষ পর্যন্ত তার কী দশা হল তা জানা যায়নি। কারণ, তিনু ঘোষ নিজেও তা সঠিক জানতেন না। এখন সেই অজানা তথ্য জানাচ্ছে আমাদের রাঁধুনি হরিপদ। এটা ভাবাই যায়নি।

তারপর? লোকটা তাহলে সাহেব ছিল?

হ্যাঁ বাবু, তবে তার একটা চাকর ছিল। সে আরও হিংস্র। আর ছিল সাহেবের পোষা কুকুর। এই তিনজনে একসঙ্গেই চলাফেরা করত বলে শুনেছি। সাহেবের কোনো বিপদ হলে তার চাকর আর ঐ কুকুরটা এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ত তাদের প্রভুকে বাঁচাতে।

কিন্তু এবার সাহেবকে বাঁচাতে পারা গেল না, কী বলো?

কী করে যাবে! মারমুখি কাতারে কাতারে লোক। কুকুরও মল, চাকরটাও মল—সাহেবটাও। কোথায় মানে কোন জায়গাটায় মরল সাহেবটা?

তা বলতে পারি না। তবে সাহেবের মড়া বলে বিশ্রাট হয়েছিল বলে শুনেছি। প্রথমে ওর চাকরটার সঙ্গে চিতায় তোলা হয়েছিল, সেই সময় গির্জার পাদ্রি গিয়ে পড়ায় ভুলটা শুধরে জ্বলন্ত চিতা থেকে সাহেবের মড়াটা তাড়াতাড়ি করে তুলে পাশেই গোর দেওয়া হল। সাহেবের মুখটা পুড়ে গিয়েছিল। আর তার পাশেই মাটি দেওয়া হয় কুকুরটাকে।

এর পর থেকেই কি এখানে যত খুন-খরাপি? কোনো কারণে প্রাণভয়ে পালাতে গিয়ে গ্রামবাসীদের হাতে মার খেয়ে অপঘাতে মরল ওরা তিনজন—তারই প্রতিশোধ নিচ্ছে এখন ঐ সাহেব দেবতা?

হরিপদ হাত জোড় করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, আর আমায় জিগ্যেস করবেন না, বাবু। জানে মেরে দেবে।

আর দু-একটা কথা জানতে চাইব। তুমি বুঝতে পারছ না হরিপদ, এসব কথা জানিয়ে তুমি আমাদের কত উপকার করলে। আচ্ছা, তুমি কি তোমাদের ঐ দেবতাকে না ওর শাগরেদটিকে কখনও দেখেছ?

না, দেখিনি। রক্ষে করুন যেন দেখতে না হয়। গতকাল রাত্রেই তো মাঠের মধ্যে তেনার পায়ের শব্দ শুনেই ভিরমি খেয়েছিলাম।

এখানকার কেউ আজ পর্যন্ত তাঁকে দেখেননি?

হরিপদ একটু চুপ করে থেকে বলল, দু-একজন দেখেছিল।

কোথায়? কোথায় তোমাদের ঐ দেবতার আস্তানা?

হরিপদ বলল, শুনেছি বাঁওড়ের ওপারে ফণিমনসার ঝোপের পেছনে একটা মাঠে। দোতলা বাড়ি।—নাঃ বাবু, আমার আর বাঁচার পথ রাখলেন না। সব জেনে নিলেন।

অভয় দিয়ে বাসুদেব বলল, তুমি যতক্ষণ আমাদের কাছে আছ, তোমার কোনো ভয় নেই।

হরিপদ ব্যাকুলভাবে বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে রইল।

আচ্ছা, যারা দেখেছে তাদের জিগ্যেস করলে ওঁর সঙ্গীদের সম্বন্ধে আরও কিছু জানা যায় না?

হরিপদ তেমনি ভাবেই তাকিয়ে রইল।

আমরা তাহলে তোমার সঙ্গে তাদের দু-একজনের কাছে যাব?

হরিপদ হতাশ সুরে বলল, গিয়ে কী হবে? তাদের একজন নিরুদ্দেশ, একজন বিছানায় পড়ে আছে। কথা বলতে পারে না। আর একজন পাগল হয়ে গেছে।

ইস! অসতর্কভাবেই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে শব্দটা বেরিয়ে এল। একটু চুপ করে থেকে বললাম, আর একটা কথা জিগ্যেস করব।

বাসুদেব কানে কানে বলল, এখন আর জিগ্যেস করো না। ও ক্লান্ত হয়ে পড়ছে।

চাপা গলায় বললাম, এর পর হয় তো সুযোগ পাওয়া যাবে না। ও বেলা থেকে ও আর নাও আসতে পারে।

তাহলে জিগ্যেস করো।

হরিপদকে জিগ্যেস করলাম, যিনি কাল সন্ধ্যাবেলা আমাদের এখানে এসেছিলেন তাঁকে নিশ্চয় চেন?

হরিপদ মাথা নাড়ল।

অবাক হয়ে বললাম, সে কী! উনি তো খুব বড় ঘরের মানুষ। জমিদারবাড়ির বংশধর নাকি?

হরিপদ মোটেই আগ্রহ দেখাল না। শুধু মাথাটা নেড়ে গেল।

আশ্চর্য! এইটুকু জায়গা—সারা জীবন এখানেই কেটেছে। অথচ—

ওঁর নাম বগলা মজুমদার।

হরিপদ ফের মাথা নাড়ল।

এ নামটাও তোমার জানা নয়?

না।

তারপর ওর ভুরু দুটো একটু কুঁচকে উঠল। কী যেন ভাবতে চেষ্টা করল।—কী নাম বললেন?

বগলা মজুমদার।

উনি কি জমির দালালি করেন? বাড়ি-টাড়ি—

বললাম, তা জানি না। তবে আমাদের এ বাড়িটা তিনিই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

এ কথায় হরিপদ কেন যে চমকে উঠল বুঝতে পারলাম না। কারও জন্যে বাড়ি দেখে দেওয়া কি কিছু দোষের? তা হলে?

হরিপদ মুখ গভীর করে বলল, সন্ধানশ বাবু। আর দেরি করবেন না। এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি পারেন ফিরে যান।

বাসুদেব রাগতভাবে বলল, ফিরে তো যাবই। তবে আগে তোমাদের ‘দেবতা’র স্বরূপটা নিজে চোখে দেখি। তারপরে।

হরিপদ চোখ বড় বড় করে বলল, এইজন্যেই কি আপনারা কলকাতা থেকে এখানে এসেছেন?

বাসুদেব বলল, ধরো তাই।

হরিপদ গুম হয়ে গেল।

হঠাৎ দেখলাম মাঠের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে চলেছে বিরাট একটা শেয়াল। ঠিক যেমন প্রথম দিন দেখেছিলাম। আর যা সেদিন বাসুদেব বিশ্বাস করতে পারেনি।

তাড়াতাড়ি বাসুদেবকে ঠেলা দিয়ে বললাম, দ্যাখো দ্যাখো সেদিনের শেয়ালটা।

বাসুদেব আর হরিপদ দুজনেই মুখ বাড়িয়ে দেখল।

বাসুদেব অবাক হয়ে বলল, তাই তো। শেয়াল এত বড় হয়? আর অমন হলেদুলে যায়? তাও দিনদুপুরে!

কিন্তু হরিপদ তখনই কিছু বলল না। সে আরও কিছুক্ষণ লক্ষ করল শেয়ালটাকে। তারপর ভয়ে উত্তেজনায় কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ওটা কি শেয়াল?

ধমকে উঠল বাসুদেব। বলল, শেয়াল নয় তো কী?

ভালো করে দেখুন, বাবুরা—ভালো করে দেখুন। ঐ যে মুখটা বদলে যাচ্ছে...এবার ছুটছে জঙ্গলের দিকে—বাঁওড়—বাঁওড়—

তাই তো! ভালো করে চোখ রগড়ে নিলাম। শেয়ালটা হয়ে গেছে বিরাট একটা কালো কুকুর—।

এসবের মানে কী? তাকালাম বাসুদেবের দিকে। বাসুদেব চুপ! একটু পরে বলল, ও কিছু না, চোখের ভ্রম।

তারপর হরিপদকে বলল, তোমার কী মনে হচ্ছে?

ভালো না বাবু, ভালো না। খুব খারাপ। ও তো রাস্তার কুকুর নয়। দেখেননি গলায় বকলস বাঁধা ছিল। ঐ লোকটা যিনি কাল সন্ধ্যাবেলা এসেছিলেন তাঁর খোঁজ করতে যাবেন বলেছিলেন, যাবেন তো? গেলে বলে দেবেন ওঁরও বিপদ।

হ্যাঁ যাব।

তা হলে তাড়াতাড়ি দু'বেলারই রান্না করে দিয়ে আমিও চলে যাব। আর ওবেলা আসব না। আপনারাও যত তাড়াতাড়ি পারেন কলকাতায় ফিরে যান।

### বগলার অন্তর্ধান

হরিপদ আমাদের খাইয়ে দিয়ে ওবেলার রান্না সেরে বেলা তিনটের মধ্যেই চলে গেল। যাক্, রাতের বেলার জন্যে নিশ্চিন্ত। কাল আর ও আসবে কিনা কে জানে।

হরিপদ চলে যাবার পর আমরা কিছুক্ষণ হরিপদের কথা নিয়ে আলোচনা করলাম। ও যা বলে গেল তা সব বিশ্বাস করা না গেলেও এটুকু বোঝা গেল এখানকার রহস্যময় ব্যাপারগুলোর অনেক কিছুই ও জানে। জানাটাই স্বাভাবিক। কারণ, ও তো এখানেই আছে জন্ম থেকে। ওর কথা থেকেই এখন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল তিনু ঘোষ যা বলেছিল তা অনেকটা ঠিক। ট্রেনের ফাস্ট ক্লাস কামরার সেই উদ্ধত অহংকারী সাহেব আর তার দুই সঙ্গী কুকুরটা আর নিগ্রোটা নিরীহ একজন প্যাসেঞ্জারের ওপর আক্রমণ চালিয়ে যে অপরাধ করেছিল তার প্রতিফল পেয়েছিল। পাবলিকের তাড়া খেয়ে বর্ধমান স্টেশন থেকে এতদূর পর্যন্ত ছুটে আসতে পেরেছিল। তারপর মৃত্যু ঘটেছিল এখানেই। এখানেই তাকে আর দুই সঙ্গীকে কবর দেওয়া হয়েছিল বাঁওড়ের ধারে। সাহেব মরার আগেও এটুকু অনুতাপ করেনি। তাই তার ব্রহ্ম আত্মা শান্তি পায়নি। এই অঞ্চলের মানুষের ওপর প্রতিশোধ নিয়ে বেড়াচ্ছে।



এই অঞ্চলেই কোনো একটা বাড়িতে তার আস্তানা। এখনও পর্যন্ত সেই বাড়িটার সন্ধান আমরা পাইনি। সে চায় না তাকে কেউ বিরক্ত করুক। তাকে নিয়ে খোঁজাখুঁজি করুক। তাই যে কেউ যে কোনো ভাবে তার খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করছে তাকেই শেষ করে দিচ্ছে।

আর ঐ যে হরিপদ বলল, ‘আপনাদের ওপর দেবতার রোষ’ তার কারণ আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি তা সাহেবের পছন্দ নয়। ভালো মানুষের মতো নিজেরা চলে না গেলে আমাদের সরিয়ে দেবে। প্রথম রাত্তিরে ভয় দেখিয়েছিল। এবার ভয়টা কাজে পরিণত করবে।

কিন্তু শেয়ালটার কী ব্যাপার হল?

বাসুদেব নিজেও তো শেয়াল বলেই চিনেছিল। তারপর বলল, চোখের ভ্রম। এটা মনকে চোখ ঠারা। প্রথম অভিজ্ঞতায় যা অস্বাভাবিক যা অলৌকিক বলে মনে হবে, পরে জোর করে তা মন থেকে সরিয়ে দেবে। এ কেমন কথা? অলৌকিক বলে যে কিছু থাকতে পারে তা সে মানতেই চায় না।

এই যে একটু আগে শেয়ালটাকে স্পষ্ট দেখা গেল (আগের দিনও আমি স্পষ্ট দেখেছিলাম, আজও বাসুদেবও দেখল)। তবু ও ওটাকে শেয়াল বলে মানবে না। না মানাটাই স্বাভাবিক। কারণ, চোখের সামনে দিনের বেলাতেই অতবড় শেয়ালটা আস্তে আস্তে বড় একটা কুকুর হয়ে গেল। এটা সম্ভব কী করে? তবু সম্ভব। কারণ, এখানে এসে পর্যন্ত আমরা একরকম অলৌকিক জগতে রয়েছি। বিশেষ করে, হরিপদ কুকুরটার গলার বকলস পর্যন্ত দেখতে পেল। অর্থাৎ শেয়াল থেকে কুকুরে যেটা রূপান্তরিত হল সেটা রাস্তায় একটা কুকুর নয়, সেটা যে সেই সাহেবেরই কুকুর তা প্রমাণিত হল। অথচ হরিপদ তো সে কুকুরটা দেখেনি, যেটা দেখেছিল তিনু ঘোষ নিতান্ত অল্প বয়সে। তাহলে সেই বাঙালি ভদ্রলোকের লাঠি খেয়ে প্ল্যাটফর্মে ছিটকে পড়েও কুকুরটা মরেনি?

ঘণ্টাখানেক পর আমরা দুজনে বগলা মজুমদারের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। যদিও হরিপদের কাছ থেকে অনেক কিছুই জানা গেল তবু বগলাকে আর একবার পাওয়া দরকার। দুজনের কথা শুনতে পেলে বিষয়টা অনেকটা পরিষ্কার হবে। আর তখনই ঠিক করতে পারা যাবে হরিপদের দেবতাটির সঙ্গে দেখা করা সম্ভব কিনা।

কিন্তু আশ্চর্য, সারা দুপুর জায়গাটা এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত খুঁজেও বগলার খোঁজ পাওয়া গেল না। শেষে প্রায় পড়ন্ত বেলায় একটা হরিসংকীর্ণনের আখড়ায় গিয়ে জানা গেল এখানেই তিনি থাকেন। খোল বাজান। একসময়ে নাকি এখানে ওঁর পূর্বপুরুষের কীর্তিনিয়া হিসাবে নামডাক ছিল। এখন কিছুই নেই। নিজেরও কোনো সম্বল নেই। মড়া নিয়ে যাবার সময় বা শ্রাদ্ধে কিংবা হরিনামের আসরে বায়না পেলে দুটো পয়সা রোজগার। তা ছাড়া অবশ্য জমি, বাড়ির সামান্য দালালি করেন। লোকটি এক ধরনের পাগল। নিজেকে খুব বড়ো করে প্রচার করেন। হামবড়াই ভাব। জমিদার বংশের ছেলে। অথচ জানে না লোকে হাসে।

বগলার পরিচয় পেয়ে অবাক হলাম।

কীতনীয়াদের একজনকে জিগ্যেস করলাম, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করা যায়?

লোকটি বলল, সে তো এখন নেই।

কোথায় গেছে জিগ্যেস করলে লোকটি বলল, এখানে কোথায় কলকাতা থেকে দুটি

ছোকরাবাবু এসেছেন। তাঁদের সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলছে। মজুমদারকে সবাই ঠাট্টা করে কণ্ঠা বলে ডাকে। তাই কী উদ্দেশ্যে হঠাৎ কলকাতা থেকে ওঁরা এসেছেন জানবার জন্যে কেউ না বলতেই নিজে থেকে কাল সন্ধেবেলা সেখানে গেছে। কিন্তু আজও ফেরেনি।

অবাক হয়ে বললাম, সে কী! উনি তো আমাদের কাছেই গিয়েছিলেন। তারপর রাত আটটা বাজাবার আগেই চলে আসেন খুব ব্যস্ত হয়ে।

ওরা অবাক হয়ে বলল, কাল রাত্তিরেই চলে এসেছিল? সে কী! তাহলে কণ্ঠা গেল কোথায়? সারা রাত থাকল কোথায়? ওর তো থাকার কোথাও তেমন জায়গা নেই।

আর একজন বলল, খুব ব্যস্ত হয়ে চলে এসেছিল বলছেন?

হ্যাঁ, বাসুদেব বলল, যেন ভয় পেয়ে।

কীসের ভয়?

বাসুদেব বলল, তা তো জানি না। তবে কথা বলতে বলতেই উনি হঠাৎ উঠে পড়লেন। বললেন, এখনি হয়তো শুনতে হবে জম্ভটার হাড়-হিম-করা ডাক! তাই—

তারপর?

তারপর উনি লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে পড়লেন।

একা?

হ্যাঁ, সঙ্গে আর কেউ ছিল না।

তারপর?

ওঁর আরো কিছু বলার ছিল—মানে আমাদের সাবধান করে দেবার জন্যে। সেটা বলার জন্যে ওঁর আবার আসার কথা ছিল। তা আমরা ভাবলাম, উনি আবার কষ্ট করে আসবেন কেন, আমরাই যাই। তাই—

হরিপদও যে অন্ধকার মাঠ দিয়ে তাঁকে যেতে দেখেছিল সে কথা বললাম না।

কীর্তিনিয়াদের আখড়া থেকে আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। খেয়ালই করিনি এরই মধ্যে বেলা শেষ হয়ে অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করেছে। কিন্তু—

কিন্তু বগলা মজুমদার কোথায় গেলেন?

সে চিন্তা আপাতত শিকয়ে তুলে আমরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। এই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আন্দাজে অচেনা পথ ধরে হাঁটা—ভাবলেও শিউরে উঠছিলাম। এরকম ভয় আগে পাইনি। কিন্তু এখন যা সব ঘটছে—যা সব শুনছি তাতে মনের জোর হারিয়ে ফেলছি। মনে হচ্ছে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কোলকাতা থেকে এসেছিলাম তা মাঝপথেই বন্ধ করে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।

অন্ধকারেই বাসুদেবের দিকে তাকলাম। সেও নির্বাক। কথা বলে এনার্জি নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি বাসায় পৌঁছতে পারাই দরকার। তবু ভাগি টর্চটা এনেছিলাম। দুজনে হেঁটে চলছি। নিস্তব্ধ মাঠ। মাঝে মধ্যে গাছপালা, ঝোপঝাপ। ঝোপের মধ্যে ঝাঁঝি ডাকছে। কিন্তু সেসব শোনবার মতো মন নেই। আমরা হাঁটছি তো হাঁটছিই। শুধু দুজনের জুতোর শব্দ।

এক-এক সময়ে ভয় হচ্ছে ঠিক পথ ধরে যাচ্ছি তো? শেষ পর্যন্ত ভুল করে বাঁওড়ের ধারে গিয়ে পড়ব না তো?

হঠাৎ বাসু আমার হাত ধরে টেনে একপাশে সরিয়ে নিল। কী একটা ছোটোখাটো প্রাণী... জ্বলজ্বল করছে চোখ—একেবারে আমাদের গা ঘেঁষে গড়াতে গড়াতে চলে গেল।

কী ওটা? অমন ভারে যাচ্ছে কেন? জিগ্যেস করলাম বাসুকে।

বাসুদেব উত্তর দিল না।

শুধু আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে দ্রুতগতিতে হাঁটতে লাগল।

একটু পরে কোথায় যেন কুকুরের কান্না শোনা গেল। খুব অস্পষ্ট। কে যেন কুকুরটাকে পিটিয়ে মারছে।

জিগ্যেস করলাম, বাসু, শুনতে পাচ্ছ?

বাসুদেব বলল, ওদিকে কান দিও না। চুপচাপ চলো।

বাসুদেবের গলায় যেন কেমন অন্যরকম সুর।

ক্রমে কুকুরের কান্না মিলিয়ে গেল। তারপরই হঠাৎ একটা ভীষণ হুংকারে চারদিক যেন কেঁপে উঠল। প্রথমে হুংকার। তারপর টানা গর্জন। যেন প্রচণ্ড রাগে কোনো জন্তু গর্জন করছে—করেই যাচ্ছে। জন্তুটার ডাকটা যে বিকটাকৃতি কোনো হিংস্র কুকুরের তা বুঝতে অসুবিধা হল না। কিন্তু কোন দিকে থেকে ডাকটা আসছে, কেমন করে আমরা সাবধান হব তা বোঝা গেল না। সেই ভয়ঙ্কর ডাকে নিস্তব্ধ মাঠখানা যেন কেঁপে উঠছিল। বাতাস চমকে উঠছিল।

সভয়ে বললাম, এই কি তাহলে সেই অশরীরী ডাক?

বাসুদেব বলল, এ যেন সেই কোনান ডোয়েলের লেখা ‘হাউন্ড অফ বাস্কারভিলের’ হাউন্ডের ডাক! মনে পড়ছে তো? জোরে, আরো জোরে হাঁটো। নইলে হয় তো আরও বড় বিপদে পড়তে হবে।

ভয়ে ভয়ে বললাম, কিন্তু সামনে যদি কুকুরটা—

তাহলে মরতে হবে। তা বলে তো অন্ধকার মাঠে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

তারপর কী করে যে আমরা মাঠ পার হয়ে বাসায় এসে ঢুকলাম তা সঠিক বলতে পারব না।

অথচ নিরাপদে পৌঁছানোর কথা ছিল না। বিশেষ যখন হরিপদর মুখে শুনেছিলাম দেবতার রোষ আমাদের মাথার ওপরে খাঁড়ার মতো ঝুলছে। নিষ্কৃতি নেই। আর কী কারণে তাঁর রোষ তা আমরা মানি বা না মানি যুক্তির অভাব ছিল না। প্রধান কারণটা বোধহয় এই যে, আমরাই বেশি উৎসাহ করে ওদের রহস্যের জাল ছিঁড়ে প্রকাশ্যে টেনে আনার জন্যে একেবারে কলকাতা থেকে এখানে ছুটে এসেছি। এত সাহস!

এটাই আমাদের অপরাধ—গুরুতর অপরাধ!

যাই হোক মাঠের মধ্যে ঐ ভয়ঙ্কর গর্জন শুনেও আমরা যে নিরাপদে বাসায় পৌঁছতে পেরেছি তার জন্যে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম। কিন্তু ভাগ্য যে পুরোপুরি প্রসন্ন ছিল না তা একটু পরেই বুঝতে পারলাম। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দরজার কাছে এসে কোনোরকমে তালো খোলা হল। কিন্তু দরজা খুলে আলো জ্বালতে গিয়ে দেখি আলো জ্বলছে না। ....বুঝি লোডশেডিং। টর্চের আলোয় কোনোরকমে শোবার ঘরে এসে ঢুকলাম। তারপর মোমবাতি খোঁজবার জন্যে টেবিলের কাছে যেতেই কালোমতো কী একটা জন্তু টেবিলের নীচে গরর গরর করে উঠল। আমি চিৎকার করে উঠলাম। বাসুদেব ছুটে এল। টর্চের আলো ফেলা হল টেবিলের নীচে। কিন্তু আশ্চর্য! কিছুই নেই। অথচ জন্তুটাকে অন্ধকারেও আমি দেখেছি। কালো রঙের কুকুর জাতীয়। বেশ বড়। বাসুদেবও গরর গরর শব্দ পাশের ঘর থেকে শুনেছে।

তাহলে?

তাজ্জব ব্যাপার। দরজা বন্ধ, জানলা বন্ধ। অতবড় কুকুরটা এলই বা কোথা দিয়ে, গেলই বা কোথায়? নিশ্চয়ই দুটো ঘরের মধ্যেই কোথাও ঘাপটি মেরে রয়েছে।

টর্চের মিটমিটে আলোর ওপর ভরসা করে মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বোকামি। অপেক্ষা করতেই হবে। পাশের ঘরে যেতেও সাহস হয় না। অগত্যা এ ঘরের চৌকির ওপরই দুজনে বসলাম। পা গুটিয়ে একেবারে মাঝখানে। যাতে চট করে নাগাল না পায়। কী বোকা। এ কি সাপ বা বিছে যে পা তুলে বসলেই নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে? এ যে পেলায় একটা কুকুর! ছোট্ট একটা লাফ দিলেই একেবারে ঘাড়ের ওপর। তবু উপায়ই বা কী?

আমরা কলকাতার ছেলে। চট করে ভূতুড়ে কাণ্ড কিংবা অলৌকিক ব্যাপার মানতে পারি না। তাই কুকুরটাকে ঘরের মধ্যে দেখে প্রথমে মনে হয়েছিল রাস্তার কুকুর-টুকুর হবে। বাসুদেব তো ওর স্বভাবমতো বলেই বসল, কুকুরটা কখন ঘরে ঢুকে বসেছিল না দেখেই দরজা বন্ধ করে গিয়েছিলাম।

কিন্তু এখন দুজনেই অন্ধকারে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি। সত্যিই তো অত বড় কুকুরটা দিন দুপুরে ঢুকল অথচ আমরা কেউ টেরই পেলাম না। এ কি সম্ভব! তখনই মনে পড়ল এইরকম একটা জন্তুকে সেদিন আমরা দেখেছিলাম মাঠ দিয়ে যেতে। প্রথমে মনে হয়েছিল শেয়াল, তারপর ধীরে ধীরে মুখটা বদলে হয়ে গেল কুকুর। সাংঘাতিক কিছু ঘটবার আগে ঐ কুকুরটাই কি আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ডেকে ওঠে? এই কুকুরটার ভয়েই কি বগলা মজুমদার কথা বলতে বলতে উঠে চলে গিয়েছিলেন? সন্দের মুখে মাঠ দিয়ে বাসার ফেরার সময় ঐ কুকুরটারই হাঁকড়ানি আমরা শুনেছিলাম। শেষ পর্যন্ত সেই কুকুরটাই কি একেবারে ঘরের মধ্যে?

খুব নিচু গলায় আমরা এই সব কথা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। কী বুদ্ধি বিভ্রম!—নিচু গলায় কথা বলছিলাম কেন? না, পাছে কুকুরটা যদি (ঘরের কোথাও থাকে) শুনতে পায়।

আরে মুখ্য! শুনতে পেলেও কুকুর কি মানুষের ভাষা বোঝে, আসলে ভয়ে সব কিছু ঘুলিয়ে যাচ্ছিল।

অন্ধকারে বসে আছি তো বসেই আছি। বিকেলে চা খাওয়া হয়নি। রান্নাঘরে গিয়ে যে চা করব তার উপায় নেই। কে জানে হয়তো এখানেই কোথাও কুকুরটা বসে আছে।

কটা বাজল? টর্চ জ্বালতেও ভয় করে। না জানি কী দেখব! তবু জ্বাললাম। সবে সাতটা। ঘড়িটা চলছে তো? ঘড়ি-বাঁধা কবজিটা কানে লাগালাম। টিক, টিক, টিক টিক—হ্যাঁ, ঘড়ি চলছে। কে জানে এমনিভাবে সারা রাত বসে থাকতে হবে কিনা!

হয়তো তাই হবে। উপায় কী?

একবার বাসুদেব বলল, দেশলাইটা খোঁজার দরকার। আলো জ্বালতেই হবে।

কিন্তু কী করে আলো জ্বালব? দুজনেরই কেউই তো চৌকি থেকে নেমে দেশলাই খুঁজতে যেতে পারছি না।

বাসুদেব বলল, তোমার হাতে টর্চ আছে তো?

তা আছে। নেবে? বলে ও কিছু বলার আগেই টর্চটা ওর দিকে এগিয়ে দিলাম।

হুঁ! বলে যেন চাপা একটু ধিক্কার দিয়ে বাসুদেবই আমার ওপর রাগ করে টর্চ জ্বেল

মাটিতে লাফিয়ে পড়ল। যেন মরণ ঝাঁপ দিল। তারপর এক ছুটে গিয়ে দেশলাইটা নিয়ে এসে চৌকিতে উঠে বসল।

আমার লজ্জা করল। কিন্তু উপায় কী? সাহস বলে বস্তুটা তো সবার সমান থাকে না।

অবশেষে আরও ঘণ্টা তিনেক পরে আপনা থেকেই আলো জ্বলে উঠল। বাইরের দিকে তাকিয়ে বোঝার উপায় নেই। কারণ, বাইরের মাঠঘাট সবই অন্ধকারে ডুবে আছে।

তবু নামতে ভরসা নেই। অথচ নামতেই হবে। খাওয়ার দরকার। কোনোরকমে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলাম। বাসুদেব বাইরে দাঁড়িয়ে রইল সতর্ক হয়ে। মুশকিল এমন একটা লোহার রড বা ভাজা ডালও নেই যে আত্মরক্ষা করা যাবে।

তাড়াতাড়ি দুজনে খেয়ে নিয়ে ভালো করে দরজায় খিল এঁটে শুয়ে পড়লাম। শোবার আগে চৌকির তলা, ঘরের কোনা, কুয়োটলা, জানলা বাইরের দিক দেখে নিলাম। দু'ঘরেই দুটো আলো জ্বালা থাকল।

কিন্তু দু'চোখ বন্ধ করেও চট করে ঘুম এল না। ঘরের মধ্যে ইঁদুর দৌড়ানোর শব্দটুকুতেও চমকে উঠি—ওই বুঝি! জানলার বাইরে তো বারে বারেই কতরকমের শব্দ! একবার ঝুপ করে কী যেন লাফিয়ে পড়ল। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

কী হল? ঘুম জড়ানো স্বরে বাসুদেব জিগ্যেস করল।

বাইরে কী যেন লাফিয়ে পড়ল।

পড়ুক। বলে পাশ ফিরে শুল।

ভাবি, এক-এক জন মানুষ আছে কত সহজেই তারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারে। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের রাতও শেষ হয়। ঘুম এমনি জিনিস। খুব ভয় পাচ্ছে—ঘুমিয়ে পড়ো। বাস্ এক ঘুমে রাত কাবার করে উঠে দেখবে ভোর হয়ে গেছে। আলো ফুটছে মানেই ভয় পালিয়েছে।

কিন্তু আমাদের দুর্ভোগ তখনও কাটেনি। ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে চা খেয়ে ভেতরের ঘরে এসে টেবিলের নীচে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম।

রক্ত! এতটা রক্ত কোথা থেকে এল! আমরা দুজনেই ঝুঁকে পড়লাম। মনে হল যেন তাজা রক্ত—কুকুরটা যেখানে ছিল সেখানেই। তাহলে কি কুকুরেরই রক্ত? মনে হল কিছু দিয়ে জোর করে আঘাত করার ফলেই রক্তপাত হয়েছে। কিন্তু কুকুরকে মারল কে? কখনই বা মারল? আর এত বড় শক্তিশালী কুকুরটাকে আঘাত করা কি দু' একজনের কাজ? কিন্তু কুকুরটা কই?

তাহলে?

এসব এমনই রহস্য যা এখনই দুজনে বসে আলোচনা করে মীমাংসা করা যাবে না। তার দরকারও নেই। গতকাল থেকেই ঠিক করে ফেলেছি। যথেষ্ট হয়েছে। আর এখানে নয়। অনেক কিছুই তো দেখা হল। বাকি থাকল শুধু সেই পোড়া মুখ সাহেবের বাড়িটা অন্তত দেখা যেখানে তিনু ঘোষ এক রাত্রি ছিলেন। যাক গে। এখন কলকাতা ফিরতে পারলে বাঁচি। বাসুদেব প্রথমে রাজি হয়নি। ও সেই বাড়িটা খুঁজে বের করতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত—এখন রাতে সেই কুকুরের ছায়া-শরীর দেখে ঠিক করেছে আজকালের মধ্যেই কলকাতা ফিরে

যাবে। নিজেরাই রক্তটা পরিষ্কার করে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িলাম। অত বড় কুকুরটা কি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল? রক্ত ছাড়া আর কোনো চিহ্নই রেখে যাবে না?

হঠাৎ নজরে পড়ল ছাদের কার্নিশ থেকে কিছুটা রক্ত মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে। ছাদে রক্ত এল কোথা থেকে? কুকুরটা কি রাস্তার বেলায় ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদে গিয়েছিল? ছাদে গেলই বা কী করে? সিঁড়ি তো নেই!

বাসুদেব বলল, দ্যাখো দ্যাখো রক্তের ফোঁটা—ঐ যে ঐ দিকে চলে গেছে।

তাই তো!

চলো দেখা যাক। কোথায় শেষ হয়েছে।

দুজনে মাটির দিকে লক্ষ রেখে এগিয়ে চললাম। ফোঁটাগুলো সোজাসুজি যায়নি। গেছে ঐক্যেবঁকে। বোঝা যায় কুকুরটা আঘাতের যন্ত্রণায় মাথা দোলাতে দোলাতে গেছে।

প্রায় আধঘণ্টা যাবার পর আমরা যে জলাশয়ের কাছে এসে পৌঁছলাম সে দিকে তাকিয়েই বাসুদেব বলে উঠল—নিশ্চয় এই সেই বাঁওড়!

কাদাগোলা জল কোথাও গোড়ালি ডোবা কোথাও এক হাঁটু। কেমন একটা আঁশটে গন্ধ। কোথাও কচুরিপানা ঝাঁক বেঁধে আছে। কোথাও শুকনো ডাঙা। অল্প জলে ছোটো ছোটো মাছ কিলবিল করছে। জলের ধারে গুলি-শামুকের খোল। রক্তের ফোঁটা জলের ধারে এসে মিলিয়ে গেছে।

বাসুদেব বলল, যার গা থেকে রক্ত পড়ছিল সে সম্ভবত জলে নেমে গেছে।

জলে না হয় নেমে গেল। কিন্তু তারপর? কোথায়?

এর জবাব কে দেবে? কেই বা জানে?

তখন বেলা দশটা হবে। বাঁওড়ের ধারটা নির্জন নিঝুম। ডাঙা বরাবর শুধু বাবলা আর বড় বড় ঘাস। এত যে ঘাস অথচ একটা গরুও চরছে না। কাছেই একটা বহুকালের পুরনো বটগাছ। কিন্তু গাছে একটা পাখিও নেই।

বাঁওড়টা বেশি চওড়া নয়। সিকি কিলোমিটারের মতো। ওপারে একটা ডোঙা বাঁধা। কিন্তু মাঝি নেই।

ওপারে কী আছে কে জানে! আমরা দুজনেই তাকালাম। আশ্চর্য! শুধু বনঝোপ, লতাপাতা আর বুনো ফুল। পিছনে মাথা তুলে আছে পরপর কতকগুলো ঝলসানো দেবদারু গাছ আর একেবারে সামনে বর্শা হাতে প্রহরীর মতো সার সার দাঁড়িয়ে আছে কাঁটাভরা ফণীমনসার গাছ।

সবকিছুই যেন অতি সাবধানে ওপারের অস্তিত্বটাই আড়াল করে রেখেছে লোকের চোখের সামনে থেকে। এ তো ভারী অদ্ভুত ব্যাপার!

তবু এপার থেকে দুজনেই এদিক-ওদিক মাথা হেলিয়ে, কখনও পায়ের চেটোর ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে খুঁজতে লাগলাম, যদি কিছু দেখা যায়।

দেখা গেল দুটো দেবদারু গাছের ফাঁক দিয়ে একটা পুরনো দোতলা বাড়ি। কেন জানি না আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। চাপা উত্তেজনায় বাসুদেবকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলে উঠলাম, দ্যাখো, দ্যাখো, ওপারে একটা দোতলা বাড়ি।

বাসুদেব গভীর ভাবে বলল, দেখেছি। তুমি কি আরও কিছু দেখতে পেয়েছ?

না তো!

তাহলে আমার এদিকে সরে এসো। এবার তাকাও বাড়িটার ন্যাড়া ছাদের দিকে।

তাকলাম। সঙ্গে সঙ্গে যা দেখলাম তাতে শিউরে উঠলাম। বিরাট একটা কালো কুকুর ছাদ থেকে যেন আমাদেরই লক্ষ্য করছে। যেন অনেক চেষ্টার পর আমাদের ও এইমাত্র খুঁজে পেয়েছে! মনে হল লাফাবার জন্যে শরীরটা পাঁচিলের বাইরে ঝুঁকিয়ে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বাসুদেব আমার হাত ধরে টান দিল, চলো শিগগির। না-না, ওদিক দিয়ে নয়, অন্য দিক দিয়ে—

অন্য পথ দিয়ে বাঁওড়েরই কিনারা ধরে আমরা হাঁটতে লাগলাম। এক জায়গায় ধোঁয়া উড়ছে দেখা গেল।

এখানে ধোঁয়া কেন?

বাসুদেব বলল, বোধহয় শ্মশান। হরিপদ বলেছিল শ্মশানের পাশেই কবরখানা। যেখানে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল সেই সাহেব আর দুই সঙ্গী নিগ্রো অনুচর আর কুকুরটাকে।

একটু এগোতেই শ্মশানে এসে পড়লাম। একটা মড়া পোড়ানো হবে। আর একটা মাটিতে চালির ওপর। দুজন পুলিশও রয়েছে। আর কেউ কী নেই! এমন কি বাড়ির লোকজন কেউ! কী ব্যাপার? পুলিশরা জানাল একজন লোককে দু'দিন ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কাল বিকেলে পাওয়া গেছে বাঁওড়ের ধারে। ক্ষতবিক্ষত। লোকটি কোথাকার?

চেনেন নাকি? একজন পুলিশ রসিকতা করে মুখ থেকে কাপড়টা সরিয়ে নিল। আঁতকে উঠলাম। ইস্! এ যে বগলা মজুমদার!

শারদীয়া ১৪১৩

—————

## পাশের ঘরেই সে আছে

বেশ অনেক বছর আগের কথা। কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল, একজন খুনী পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এই কলকাতাতেই লুকিয়ে আছে। পুলিশ তদন্ত করে এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিল খুনীটা উত্তর কলকাতার কোথাও কোনো বাড়িতে ছদ্মবেশে ডেরা গেড়ে আছে। লোকটার ছবিও ছাপা হয়েছিল। কাগজে বলা হয়েছিল কেউ যদি লোকটির সন্ধান দিতে পারে তাহলে তাকে গভর্নমেন্ট থেকে পুরস্কৃত করা হবে।

সে সময়ে এখনকার মতো এত খুন-খারাপি হতো না। তাই এইরকম একজন ভয়ঙ্কর খুনীকে পুলিশ ধরতে পারছে না, আর সে বহাল তবিয়ে এই কলকাতাতেই রয়েছে জেনে রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আর ভয় পেয়েছিলাম বলেই ব্যাপারটা আমার এখনও মনে আছে।

এরপর সেই খুনীটা ধরা পড়েছে কিনা সে খবর আর পাইনি। অন্তত কাগজে কিছু চোখে পড়েনি।

জানতে পেরেছিলাম অনেক বছর পরে। সেও খবরের কাগজ পড়েই।

ঘটনাটা এইরকম—

মানিকতলার ব্রিজের ওপারে একটা টু-রুমড ফ্ল্যাট কিনেছিলেন বিভাবতী সরকার। টাকটা দিয়েছিল তাঁর বড়ো ছেলে। দিল্লিতে চাকরি করে। মাকে বলেছিল, তুমি তো কলকাতা ছেড়ে নড়বে না, টাকা দিচ্ছি একটা নতুন ফ্ল্যাট কিনে নাও। রিটায়ার করে তো কলকাতাতেই তোমার কাছে গিয়ে আমাদের থাকতে হবে।

সেইমতো বিভাবতী ফ্ল্যাটটি কিনলেন। ফ্ল্যাটটি একটা পুরনো ভাঙা বাড়ি আর খানিকটা জলা জায়গার ওপর তৈরি। এক সময়ে এইসব অঞ্চলে বাড়ি-ঘর কমই ছিল। যে বাড়ি ভেঙে এই ফ্ল্যাট—সেটা ছিল কোনো এক বাঘা জমিদারের। জমিদারি কবে চলে গিয়েছিল, জমিদারের বংশধরেরাও কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। কিন্তু সাবেকি জমিদারি মেজাজটি ছিল পূর্বপুরুষদের মতোই। সে আমলের পুরনো বাড়ি জমিদারপুত্রদের পছন্দ হচ্ছিল না। তাই সেটাকে ফেলে রেখে দিয়েছিল। মাঝে-মাঝে দু'এক ঘর ভাড়াটে আসত। আবার চলে যেত। সামান্য টাকার ভাড়া। তাই জমিদারপুত্রদের মন উঠত না। তারা ঠিক করল বাড়িটা বেচে দেবে। সে জন্য নতুন ভাড়াটেও আর বসাল না। কেননা ভাড়াটেসুদ্ধ বাড়ি কিনতে কেউ চাইবে না।

তারপর কত হাত-বদল হয়ে এখন সেই বাড়িটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা হাল ফ্যাশনের নতুন ফ্ল্যাট বাড়ি। কিন্তু পিছনের অংশে এখনও এখানে-সেখানে ডোবা, জলা, ঢোল-কলমি আর বনতুলসীর ঝোপ রয়ে গেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় না জায়গাটা শহর কলকাতার মধ্যে।



এইখানেই দুটো ঘর নিয়ে থাকেন বিভাবতী। একাই থাকেন পূজো-আচ্চা নিয়ে। খুব ভক্তিমতী। নিজেই রাঁধেন।

একটি কাজের মেয়ে আছে। সে সারা দিন তাঁকে সাহায্য করে। তার সঙ্গেই গল্প করে তাঁর সময় কাটে।

সবই ভাল তবু কোথায় যেন একটা অস্বস্তি। বিভাবতী এমন কিছু প্রমাণ পেয়েছিলেন যাতে তিনি বুঝেছিলেন বাড়িটায় কিছু দোষ আছে। বিশেষ করে উত্তর দিকের ঘরটায়।

তাঁর অসাধারণ মনের জোর আর সাহস ছিল তাই তিনি রাতে একাই থাকতে পারতেন। না থেকেই বা উপায় কি? ছেলের এতগুলো টাকা খরচ করে ফ্ল্যাটটা কিনেছেন। এখন ছেড়ে দিয়ে যাবেন কোথায়? ছেলেকেই বা কী বলবেন? বাধ্য হয়ে তিনি মুখে কুলুপ এঁটে থাকতেন। কাউকে কিছু বলতেন না। এখানে তাঁর কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন আছে। তারা মাঝে মাঝেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত। কিন্তু কাউকে তিনি রাতে থাকতে বলতেন না। আত্মীয়রা তাঁকে খুব পছন্দ করত। এই বয়সে তিনি এখানে একা থাকেন এই নিয়ে তারা ভাবতও। কিন্তু বিভাবতী হেসে বলতেন তিনি ভালোই আছেন। তা ছাড়া ঠাকুর যা করবেন তাই হবে। অনর্থক ভেবে লাভ কি।

এতখানি ভগবানের ওপর বিশ্বাস দেখে আত্মীয়েরা আর কিছু বলত না। শুধু জানিয়ে যেত অসুখ-বিসুখ করলে তিনি যেন সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন।

তা তিনি বুদ্ধিমতীর মতো একটি কাজ করেছিলেন। টেলিফোন নিয়েছিলেন। আর সেটা রেখেছিলেন মাথার কাছে একটা টুলের ওপরে।

মনে মনে অবশ্য জানতেন অসুখ-বিসুখ ছাড়া আর যে ভয়টা নিঃশব্দে তিনি হজম করে যান, তার প্রতিকার টেলিফোন করে লোক ডেকে হবে না।

টেলিফোন নেবার কিছুদিন পরেই একটা ঘটনা ঘটল। মাঝে-মধ্যে তিনিই দু’-একজনকে ফোন করেন। কিন্তু তাঁকে বড়ো একটা কেউ ফোন করে না।

হঠাৎ সেদিন গভীর রাতে টেলিফোন বাজার শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। এত রাতে কে টেলিফোন করছে? নিশ্চয় রং নাম্বার। তিনি মশারির মধ্যে থেকে হাত বাড়াতে যাচ্ছেন, হঠাৎ দেখলেন মশারির বাইরে থেকে একটা কালো লোমশ হাত রিসিভারটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, শুধুই একটা হাত।

তিনি চমকে উঠলেন। ভয় পেলেন। কিন্তু মুহূর্তেই সামলে নিয়ে শান্ত গলায় বললেন, কে তুমি? কি চাও?

উত্তর পাওয়া গেল না। শুধু অস্পষ্ট একটা পায়ের আওয়াজ ঘরের বাইরে চলে গেল।

তিনি আর উঠলেন না। ভগবানকে স্মরণ করে আবার শুয়ে পড়লেন।

সকালে উঠে ভাবলেন, তিনি কি স্বপ্ন দেখেছিলেন?

তখনই চোখে পড়ল রিসিভারটা টুলের নিচে ঝুলছে।

বিনবিন করে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল তাঁর মুখে। তারপরই তিনি নিজেকে শক্ত করে নিলেন। সংসারের সব কাজই রাজকার মতো করলেন। কাউকে রাতের ঘটনা বললেন না। বললেই রটে যাবে ফ্ল্যাটটা ভুতুড়ে। আর সে কথা ছেলের কানে গেলে তারা আর আসবে না।

একটা কথা ভেবে তাঁর ভয় হলো—এখানে এসে পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারছিলেন উত্তরের

ঐ ঘরটায় কিছু আছে। তবে এ ঘরে কোনোদিন আসেনি। নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু গতরাতের ঘটনায় তিনি বুঝতে পারলেন এ ঘরেও আসতে শুরু করেছে। তাহলে তিনি এখানে থাকবেন কি করে?

তারপরই তাঁর মনে হলো লোকটা কিন্তু তাঁর ক্ষতি করার চেষ্টা করেনি। ‘কে তুমি? কি চাই?’ শান্ত ধীর গলায় প্রশ্ন করতেই সে রিসিভারটা ফেলে রেখেই চলে গিয়েছিল। কেনই বা এসেছিল, কেনই বা চলে গিয়েছিল তার উত্তর খুঁজে পেলেন না। আরও একটা উত্তর তিনি পেলেন না—অত রাতে কে তাঁকে ফোন করেছিল? সত্যিই কি রং নাম্বার?

যাই হোক এদিনের পর থেকে আর সে এ ঘরে ঢোকেনি। কিন্তু গোল বাধাল একদিন কাজের মেয়েটা।

তিনি ঠিক করেছিলেন কাজের মেয়েটাকে রাতে তাঁর কাছে থাকতে বলবেন। তার জন্যে বেশি মাইনেও দেবেন। মেয়েটা রাজীও হয়েছিল। কিন্তু এরই মধ্যে একটা ঘটনা ঘটল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ আলোগুলো নিভে গেল। বিভাবতী বুঝলেন লোডশেডিং। এ তো রোজকার ব্যাপার। কিন্তু হঠাৎই কাজের মেয়েটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এল তাঁর কাছে। মুখ দিয়ে তার কথা বেরোচ্ছে না।

কি রে মালতী? কি হয়েছে?

মালতী অতি কষ্টে শুধু বললে, একটা লোক—

লোক! কোথায়?

মালতী আঙুল দিয়ে ওদিকের ঘরটা দেখিয়ে দিল। তারপর কোনোরকমে বলল, আজকে ঐ ঘরটায় ঝাঁট দিতে ঢুকেছিল। সঙ্গে সঙ্গে লোডশেডিং। আর তখনই ও স্পষ্ট দেখল একটা লম্বা মতো লোক ঘরের মধ্যে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে...

বিভাবতীর বুকটা ভয়ে কঁপে উঠল। লোক বলতে মালতী যে কি বোঝাতে চাইছে তা বুঝতে তাঁর আর বাকি রইল না। কিন্তু মুখে সাহস দেখিয়ে বললেন, ও ঘরে লোক আসবে কোথা থেকে? নিশ্চয় চোখের ভুল।

মালতী যতই বোঝাতে চায় চোখের ভুল নয়, বিভাবতী ততই বলেন, না চোখে ভুল। ও ঘরে লোক আসবে কোথা থেকে?

মালতী চুপ করে আছে দেখে তিনি আরও জোর দিয়ে বললেন, আমি এত দিন আছি। কই কোনো দিন তো কিছু দেখিনি।

মিথ্যে কথাই বলতে হয়েছিল বিভাবতীকে। কিছু না দেখলেও ঐ বন্ধ ঘরে মানুষের চলাফেরার শব্দ তিনি শুনেছিলেন এক-আধবার নয়, বারবার।

বাধ্য হয়েই এই মিথ্যেটুকু বলতে হয়েছিল। না বললে মালতী আর এ বাড়িতে কাজ করত না।

শেষ পর্যন্ত মালতী থাকল। তবে সন্ধ্যা হবার আগেই চলে যেত। তখন থেকে বিভাবতী সারা রাত একা মুখ বুজে। আর পাশের তালাবন্ধ ঘরটায় মূর্তিমান আতঙ্ক।

সেদিনও তাঁর নিস্তরঙ্গ ঘরটাকে সচকিত করে টেলিফোনটা বেজে উঠল। তবে গভীর রাতে নয়, সন্ধ্যার একটু পরে।

চমকে উঠলেন বিভাবতী। কোনোরকমে তুলে নিলেন রিসিভারটা।

হ্যালো! দিল্লি থেকে? ও বৌমা! খুশিতে তাঁর স্বর আটকে যাচ্ছিল।

হ্যাঁ, তা আছি একরকম—ভালোই আছি। আচ্ছা, তুমি কি আগে একদিন অনেক রাতে ফোন করেছিলে? করনি?...তাহলে রং নাস্বার। হ্যাঁ, অনেক রাতে কেউ করেছিল...কথা বলা হয়নি। কেটে গিয়েছিল।

তুমি আসবে পরশু দিন? খুব খুশি হলাম।...মাত্র এক রাতের জন্যে? তোমার বন্ধুর বিয়েতে?...থাকতে পারবে না দুদিন?...কি আর করা যাবে?...তাই এসো।

বিভাবতী দেবী রিসিভারটা রেখে দিলেন। তারপর মুখ তুলতেই তিনি চমকে উঠলেন। ঘরের বাইরে জানলার গরাদ ধরে লম্বা মতো কেউ যেন দাঁড়িয়ে।

কে? কে ওখানে?

সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটা সরে গেল—যেন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। বিভাবতীর রক্ত হিম হয়ে গেল। ও কি শুনতে এসেছিল এ বাড়িতে নতুন কেউ আসছে কি না?

বিভাবতীর ছেলের বৌ অঞ্জনা দিল্লির একটা বিখ্যাত ইংরিজি কাগজের অফিসে কাজ করে। কলকাতায় তার এক বন্ধুর বিয়েতে আসছে। রাতটুকু শুধু শাওড়ির কাছে থাকবে। পরের দিনে সকালের ফ্লাইটেই দিল্লি ফিরে যাবে।

মাত্র একটি রাত বৌমা তাঁর কাছে থাকবে। বিভাবতী মনকে বোঝান—যেটুকু নিজের লোককে কাছে পাওয়া যায় ততটুকুই আনন্দ। তবু তাকে মনের মতো রেঁধেবেড়ে খাওয়াতে পারবেন না এটাই দুঃখ। সে নেমস্তম্ববাড়ি আসছে কিনা।

সেই সঙ্গে তাঁর একটু ভয়ও করল। ঐ যাকে এ বাড়িতে প্রায়ই দেখা যায়—বৌমাও তাকে দেখে ফেলবে না তো?

সেদিন দুপুরবেলাতেই অঞ্জনা হাসতে হাসতে এল। সারা দুপুর বিভাবতীর পাশে শুয়ে কত গল্পই না করল। বিকেলের দিকে বেরিয়ে গেল কিছু কেনাকাটা করতে। বলে গেল সম্ভ্রমের আগেই ফিরবে।

ঠিক সম্ভ্রমবেলাতেই ফিরল অঞ্জনা। ফুটপাথ থেকে উঠে কয়েক ধাপ সিঁড়ি। তারপরেই ঢোকান দরজা। কলিংবেল টিপতে যাচ্ছিল, দরকার হলো না। মালতী দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। বৌদিকে দেখে একটু হাসল।

কাজ হয়ে গেল?

হ্যাঁ।

বাড়ি যাচ্ছ?

হ্যাঁ।

অঞ্জনা ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। এবার একটু প্যাসেজ। প্যাসেজটা অন্ধকার। অঞ্জনা এগিয়ে যাচ্ছিল; হঠাৎ মনে হলো সে যেন এগোতে পারছে না...কিসে যেন বাধা পাচ্ছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন তাকে ঠেলে বের করে দিতে চাইছে। অঞ্জনা খতমত খেয়ে গেল। তখনই তার মনে হলো তার সামনে দু' হাত দূরে কেউ যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে...চোর?

অঞ্জনা দিল্লিতে খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করা মেয়ে, সংবাদ সংগ্রহের জন্যে তাকে নানা জায়গায় ছুটতে হয়। অত সহজে সে ভয় পায় না। ধমকের সুরে বলল, কে ওখানে?

পরক্ষণেই মনে হলো কেউ যেন পথ ছেড়ে সরে গেল।

পাছে মা ভয় পান তাই ব্যাপারটা নিয়ে অঞ্জনা বেশি হেঁচকি করল না। মায়ের ঘরে ঢুকে শুধু একটা কথাই বলল, প্যাসেজটায় আলোর ব্যবস্থা নেই?

বিভাবতী অবাক হয়ে বললেন, আছে বৈকি। এই তো মালতী গেল আলো জ্বলে। কিন্তু—কিন্তু আমি তো দেখলাম অন্ধকার।

বিভাবতী বললেন, তাহলে হয়তো বালবটা কেটে গেছে।

আধঘণ্টার মধ্যে অঞ্জনা সাজসজ্জা করে বিয়েবাড়ি চলে গেল। রাত দশটায় যখন ফিরল তখন দেখল প্যাসেজে দিবি আলো জ্বলছে।

এবার তাড়াতাড়ি শোবার পালা। কাল সকালেই আবার প্লেন ধরতে হবে।

বিভাবতী তাঁর বিছানাতেই অঞ্জনার শোবার ব্যবস্থা করেছিলেন। মাত্র একটা রাত নিজের বৌমাকে কাছে নিয়ে শোবেন। অঞ্জনা কিন্তু শাশুড়ির সঙ্গে শুতে রাজী হলো না। বললে, ওদিকের ঘরটা তো খালি পড়ে রয়েছে। ওখানেই আমি শোব।

বিভাবতীর মুখটা ভয়ে শুকিয়ে গেল। তিনি অনেক করে বোঝালেন। বললেন, ও ঘরটা ব্যবহার করা হয় না। পরিষ্কার করা নেই। কি দরকার? একটা রাত তো একটু কষ্ট করে না হয় আমার কাছে শুলেই।

অঞ্জনা ভাবল শাশুড়ি বোধ হয় ও ঘরে বিছানা পাতা, মশারি টাঙানোর হাঙ্গামার জন্যেই বলছেন। তাই বললে, আপনি কিছু ভাববেন না। আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি।

বলে উত্তর দিকের ঘরে গিয়ে ঝাঁটপাট দিয়ে বিছানা পেতে নিলো।

নিরুপায় বিভাবতী কি আর করেন, শুধু বললেন, ভয়টয় পেলে আমায় ডেকো।

অঞ্জনা হেসে বলল, কিসের ভয়? ভূতের?

‘ভূত’ কথাটা হঠাৎই তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

কি আর করেন, বিভাবতী এক ফাঁকে তাঁর গলার রুদ্রাক্ষের মালাটা অঞ্জনার বালিশের নিচে রেখে দিয়ে এলেন। মনে মনে প্রার্থনা করলেন, ঠাকুর, বৌমাকে রক্ষে করো।

খুব ক্লান্ত ছিল অঞ্জনা। তাই হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে শোয়ামাত্র ঘুম। তখনও সে জানত না কি ভয়ংকর ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে...

অনেক রাত্রে আচমকা তার ঘুম ভেঙে গেল। অসহ্য গরমে তার নিঃশ্বাস যেন আটকে যাচ্ছে। মশারির মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে দেখল পাখা চলছে না। লোডশেডিং? কলকাতায় এত লোডশেডিং হয়! কিন্তু তখনই বাইরের জানলা দিয়ে চোখ পড়তে দেখল রাস্তার আলোগুলো দিবি জ্বলছে।

তাহলে?

হঠাৎই তার মনে হলো ঘরের মধ্যে আরও কেউ রয়েছে। চমকে তাকাতেই দেখল তার বিছানা থেকে মাত্র হাত পাঁচেক দূরে লম্বা মতো একটা লোক কোমরে হাত দিয়ে তার দিকে ভয়ংকর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। এইরকমই একটা আবছা চেহারা সে সন্ধ্যাবেলা দেখেছিল বাড়ি ঢোকার সময়ে। তখন মুখ দেখতে পায়নি।

ধড়মড় করে উঠে বসতে গেল অঞ্জনা। কিন্তু পারল না। মনে হলো তার সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে গেছে।

কি করবে ভাবছে, দেখল লোকটা এক পা এক পা করে তার দিকে এগিয়ে আসছে।...

টিংকার করতে গেল, পারল না। মুখ থেকে শধু একটা গৌঁ গৌঁ শব্দ বেরিয়ে এল।

ততক্ষণে মূর্তিটা একেবারে মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা হাত দিয়ে মশারিটা তুলছে...তারপরই কনকনে ঠাণ্ডা একটা হাত তার বাঁ হাতটা চেপে ধরে টানতে লাগল।

মাগো!

একটা শব্দই অঞ্জনার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। তারপর আর কিছু মনে নেই।

ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়, শাশুড়ির ডাকাডাকিতে। প্রথমে মনে হয়েছিল রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু নিজের হাতের দিকে তাকাতেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। হাত মুচড়ে ধরার দাগটা লাল হয়ে আছে। আর—আর মাথার দিকে মশারিটাও খানিকটা তখনও উঁচু হয়ে আছে।

অঞ্জনা বললে, আপনি এখানে একা আর থাকবেন না। আমার সঙ্গে চলুন।

বিভাবতী বললেন, হট করে কি এখানকার পাট চুকিয়ে চলে যাওয়া যায়—?

তবে আমি এখন যাই। খুব তাড়াতাড়ি আপনার ছেলেকে নিয়ে আসছি। তারপর একসঙ্গে বসে আলোচনা করে ঠিক করা যাবে। এ কদিন একটু সাবধানে থাকবেন।

বিভাবতী একটু হাসলেন।

ব্যাপারটা অঞ্জনা সহজে ছেড়ে দেয়নি। এই বাড়িতে এক রাঙির থাকার ভয়ংকর অভিজ্ঞতা কাগজে লিখল। কলকাতায় এসে পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে যে তথ্যটা বের করেছিল তা হচ্ছে—সেই দীর্ঘদেহী খুনীটা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এই বাড়িতেই লুকিয়ে ছিল দলবল নিয়ে। সাহস করে কেউ পুলিশকে খবর দিতে পারেনি। কিন্তু জমিদারপুত্রদের একজন বাড়িটা খালি করার জন্যে একদিন লেঠেল পাঠিয়ে তাকে খুন করে এখানেই পুঁতে রাখে। পুলিশ পরে এসে মাটি খুঁড়ে লাশের সন্ধান করে। আশ্চর্য! কিন্তু লাশ পাওয়া যায়নি।

# রহস্যময় আলমারি

সাতসকালে ফোন

বেলা তখন নটা।

সবে দ্বিতীয়বার চা খেয়ে কাগজটা পড়ছি, এত সকালে টেলিফোন করছে কে?

মফস্বর শহরে এখন ঢালাও টেলিফোন দিচ্ছে—এমনকি S.T.D.-ও। আমিও নিয়েছি একটা। লোকদেখানো ছাড়া আর কি? কেননা এই ছোটো শহরে কে আর কত ফোন করবে? দরকার হলে পনেরো-কুড়ি মিনিট পায়ে হেঁটে কিংবা সাইকেলে চেপে দেখা করে আসা যায়।

তবে একজন আমাকে মাঝে মাঝেই ফোন করে। সে আমার বন্ধু জলধর গাঙ্গুলি। নামটা যেমন সেকলে, রঙটাও তেমনি জলধরের—মানে জলভরা মেঘের মতোই কালো। মোটাসোটা চেহারা। ছোটো ছোটো চুল। বিয়ে-থাওয়া করেনি। পৈতৃক বাড়িতে একাই থাকে। একমাত্র আমি ছাড়া ওর কোনো বন্ধু নেই। কারো সঙ্গে ও মেশে না। অন্যো ওর সঙ্গে মিশতে চায় না। তারও কারণ আছে। জলধর মানুষটা একটু অন্য ধরনের। তার অদ্ভুত কতগুলো শখ আছে। যেমন নানারকমের পাখি পোষা, পাহাড়-পর্বতে ঘুরে নানারকম পাথর সংগ্রহ করা আর পুরনো আমলের জিনিস কেনা। যেমন এখান থেকে সমুদ্র মাইল দূরে এক পাদ্রী তাঁর ঠাকুরদাদার পিয়ানোটা বিক্রি করবেন শুনেই জলধর গিয়ে সেটা কিনে নিয়ে এল। যদিও সে কস্মিনকালেও পিয়ানো বাজাতে জানত না। ঐ রকম একটা পিয়ানো কিনে সে দারুণ খুশি। সেদিন আমায় ডেকে পিয়ানোটা দেখাল। সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার হচ্ছে সেটা বাজেই না।

এ কথা জলধরকে বলায় সে হেসে বলেছিল, তাতে কি? আমি তো আর বাজাব বলে ওটা কিনিনি। একটা ‘ঐতিহাসিক’ জিনিস বলেই কিনেছি।

ঐ একটা কথা ও শিখে রেখেছে—‘ঐতিহাসিক’। একটা কোনো পুরনো জিনিস পেলেই ও বলে—জানো, দারুণ একটা ‘ঐতিহাসিক’ জিনিস সস্তায় পেয়ে গেছি।

সঙ্গে সঙ্গে সেটা তার ‘ঐতিহাসিক সংগ্রহশালায়’ ঠাঁই পেয়ে যায়। সারা দিন সে এই সব নিয়েই ব্যস্ত থাকে। পুরনো আসবাবপত্রগুলো ঝাড়পৌছ করে। পোষা জন্তুকে লোকে যেমন আদর করে তেমনি ভাবে এই পুরনো জিনিসগুলোর গায়ে হাত বুলায়। আবার খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দ্যাখে কলকাতায় কোথাও কোনো পুরনো জিনিস বিক্রি হচ্ছে কিনা। তেমন বিজ্ঞাপন চোখে পড়লে ও আমাকে নিয়ে কলকাতায় যাবে। জিনিসটা ভালো করে দেখবে। নিজের মনে ওর মাথা নাড়া দেখলেই বুঝতে পারি জিনিসটা ওর পছন্দ হয়েছে। তারপর ও যখন জিজ্ঞেস করে—কি হে, জিনিসটা কেমন? আমি তৎক্ষণাৎ বলি—চমৎকার।

ব্যাস্! ওর ‘ঐতিহাসিক সংগ্রহশালায়’ আর একটি বস্তু এসে ঢোকে।

তা এইরকম মানুষের সঙ্গে কে আর মিশতে চায়? ওরও কারোও সঙ্গে ভাব জমাবার দরকার হয় না।

তবু হঠাৎ ও টেলিফোন নিয়ে বসল। নিজেই বলল, যাক এখন তোমার সঙ্গে কথা বলার সুবিধে হবে। তাই আমি নিশ্চিত জানি এখন টেলিফোন করছে শ্রীমান জলধর ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু সাতসকালে!—নিশ্চয় কোথাও আবার কোনো ‘ঐতিহাসিক’ জিনিসের সন্ধান পেয়েছে। তাই ডাকছে।

হ্যালো!

ওপার থেকে জলধরের জলদগন্তীর গলা পেলাম—শোনো, আজ রাতে তুমি আমার বাড়িতে খাবে।

হেসে বললাম—সে তো আনন্দের কথা। কিন্তু হঠাৎ আমাকে আজই নেমন্তন্ন করার উদ্দেশ্য?

ও কিন্তু হাসল না। বলল—উদ্দেশ্য আর কী? রোজ একা একা খাই। আজ একসঙ্গে খাব।

খুব ভালো কথা। কি মেনু করছ?

কি খাবে বলো। মাংস-ভাত?

বেশ। তোমার কাজের মেয়েটি তো ভালোই মাংস রাঁধে।

ও যেন একটু অন্যমনস্কভাবে বলল—হ্যাঁ।

একটু চাটনি করবে তো? মাংসের সঙ্গে একটু চাটনি না থাকলে—

ও তেমনি নিস্পৃহভাবে বলল—করব। আর শোনো অত রাতে বাড়ি ফিরতে দেব না। আমার এখানেই থাকবে।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, কত আর রাত হবে? ফিরে আসতে পারব।

জলধর বলল—থাকতে আপত্তি কী? অত রাতে এক মাইল পথ ঠেঙিয়ে ফিরবে কেন? এখানে থাকার কোনো অসুবিধে হবে না।

হেসে বললাম, তথাস্তু।

ফোন ছেড়ে দিলাম। একটু অবাক হলাম। যদিও ও মাঝে মাঝেই উপলক্ষ ছাড়াই নেমন্তন্ন করে, তবু এবার যেন ওর গলার স্বরটা কিরকম। যেন জলধর নয়, অন্য কেউ কথা বলছে। খুব অন্যমনস্কভাবে কথা বলছিল।

সবে মাত্র এসে কাগজটা তুলে নিয়েছি আবার ফোন বেজে উঠল। বিরক্ত হয়ে ফোন ধরলাম। জলধরই।

হ্যাঁ, শোনো। রেণু বলছে তুমি একটু তাড়াতাড়ি এসো। ও তো রাতে বাড়ি চলে যায়। আজ সাড়ে আটটার মধ্যেই খাইয়ে-দাইয়ে চলে যাবে।

আচ্ছা! বলে ফোন ছেড়ে দিলাম।

মুশকিল। আটটার সময় কি ক্ষিধে পায়? তার মানে ভালো করে খাওয়াই হবে না।

### জলধরের আচরণ

জলধরের বিরাট দোতলা বাড়িটা শহরের একেবারে বাইরে। পেছনে মাঠের পর মাঠ। বড়ো রাস্তা থেকে একটা সরু পথ এসেছে বাড়িটার কাছে। এই পথের দু'ধারে ঝোপঝাপ।

বুনো ফুলে ভরে থাকে। বাঁ দিকে একটা ভাঙা শিবমন্দির। এদিকে-ওদিকে কয়েক ঘর আদিবাসী আর চাষীর ঘর। বলাই বাহুল্য জায়গাটা খুবই নির্জন। ভাবতে ভাবতে অবাক লাগে এইরকম জায়গায় কেন জলধরের বাপ-ঠাকুর্দা বাস করতেন। এখনই এইরকম অবস্থা—ঘাট-সত্তর বছর আগে তাহলে কী অবস্থা ছিল সহজেই তা অনুমান করা যায়। জলধর বলে—পিছনের এই মাঠগুলো একসময়ে সবই ঠাকুর্দার ছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ফসল ফলাতে পারেননি। এ একটা আশ্চর্য ব্যাপার। জলধর অবশ্য অর্ধেক জমি বেচে দিয়েছে একজন কারখানার মালিককে। যে টাকা পেয়েছে তাতে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে আছে। আর মনের আনন্দে পুরনো জিনিস কিনে বেড়াচ্ছে।

আমি যখন টর্চ নিয়ে ওদের বাড়ি পৌঁছলাম তখন ঠিক সন্ধ্যা। বিকেলের দিকে বড়ো একটা যাই না। যদি একান্তই যেতে হয় তা হলে টর্চ নিয়ে যাই। জায়গাটা খারাপ। অন্তত সাপের ভয় খুব। কিন্তু একথা জলধরকে বলার উপায় নেই। বললেই চটে যায়। রাগ করে বলে—যত ভয় তোমারই। কই এতকাল আমরা রয়েছি, সাপে কাটা তো দূরের কথা—চোখেও পড়েনি কখনও। তবে হ্যাঁ, শেয়াল, বনবিড়াল আছে। তারা তো আর তেড়ে আসে না।

আমি এ নিয়ে তর্ক করি না। নিজে সাবধান থাকি।

কড়া নাড়তেই জলধর নিচে নেমে এসে দরজা খুলে দিল। অন্যবার প্রাণ খুলে হাসে। এবারও একটু হাসল। কিন্তু তাতে প্রাণের স্পর্শ নেই।

তোমার কথাই ভাবছিলাম। এসো।

আমার কথা ভাববার কি আছে? আসব বলেছি যখন আসবই। তা ছাড়া নেমস্তন্ন বলে কথা।

আমার এই সরস মস্তব্যের জলধর কোনো উত্তর না দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। সিঁড়ির পাশে দেখলাম বিরাট বিরাট খাঁচা ঝুলছে। আমি জানি ওগুলোতে সব নানা জাতের পাখি আছে। একতলার উঠানের ওদিকে একটা ঘরে আলো জ্বলছে। দেওয়ালে একটা ছায়া নড়ছে। হঠাৎ দেখলে গাটা ছম্ছম্ করে ওঠে।

কিন্তু ওটা যে জলধরের রাঁধুনী রেণুর ছায়া তা আমি জানি।

দোতলায় বেশ বড়োসড়ো চৌকোনো জায়গা। এখানে চারদিকে চারটে পুরনো অর্থাৎ বাপ-ঠাকুর্দার আমলের সোফা। মাঝখানে একটা সেন্টার টেবিল। টেবিলের ওপর ফুলদানি। একটা অ্যাশ-ট্রে। হঠাৎ লোডশেডিং হলে জ্বালাবার জন্যে একটা মোটা মোমবাতি কাচের স্ট্যান্ডে লাগানো। পাশেই দেশলাই। এসব ছাড়াও বেশ কয়েকটা ছোটো-বড়ো নতুন ধরনের পাথর। ওর পাথরের collection আমি নিচের ঘরে দেখেছি। তবু বোধহয় লোককে দেখাবার জন্যেই কয়েকটি নমুনা সেন্টার টেবিলে যত্ন করে রেখে দিয়েছে।

মুখোমুখি দুটো সোফায় আমরা বসলাম। ও বলল, চা না কফি?

আমি জানি একে ক্ষিধের বলাই নেই। তার ওপর যদি এখন চা-কফি খাই তা হলে ক্ষিধের বারোটো বেজে যাবে। তাই বললাম, কিছু না।

ও তার জন্য দুঃখিত হলো বলে মনে হলো না। বরঞ্চ যেন নিশ্চিত হলো।

আমি বললাম, তা হঠাৎ নেমস্তন্ন করার কারণ কী?

ও একটু গম্ভীর হয়ে বলল, সে তো সকালেই বলেছি চুপচাপ একা থাকি। ভালো লাগে না।

বাস্ এর পর আর কথা চলে না। তবু আমার মনে হচ্ছিল এই হঠাৎ নেমস্তন্ন করার



পিছনে কোনো কারণ নিশ্চয় আছে। ও চেপে যাচ্ছে। নইলে সকাল নটা বাজতে না বাজতেই ফোন করল কেন? একটু বেলাতে করতে পারত।

যাই হোক ও প্রশ্ন আর করলাম না। অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে গল্পগুজব চলল।

একসময়ে হঠাৎ ও চকিত হয়ে উঠল। বলল, এবার খাওয়াটা সেরে নিই কি বল?

গির্জার আকারে পুরনো দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম সবে পৌনে আটটা।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললাম, বেশ তো।

তা হলে চলো নিচে যাই।

আমি জানি খাবার ব্যবস্থা নিচের ঘরে। ওপরেও ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু রেণুর পক্ষে দুজনের খাবার বয়ে আনা অসুবিধে।

অন্যবার খাবার সময় জলধর এক নাগাড়ে বকবক করে যায়। বিষয় সেই একই—কোথায় কোন প্রাচীন জিনিসের সন্ধান পেয়েছে তারই ফিরিস্তি। এই সব collection নিয়ে একটা একজিভিশান করার ইচ্ছেও ও বারে বারে প্রকাশ করেছে। কিন্তু আজ একেবারেই চূপ। একবার শুধু বলল, আর কি নেবে চেয়ে নিও।

মনে মনে রাগলাম। সম্ভ্রান্তে কি ক্ষিপ্ত হয়ে যে বেশি খেতে পারব?

খাওয়ার পর ও বলল, তুমি ওপরে গিয়ে বসো। আমি যাচ্ছি।

আমি জানি ও এখন ওর পাখিদের পরিচর্যা করবে। সব খাঁচাগুলো খুলে খুলে দেখবে যথেষ্ট দানাপানি আছে কিনা।

শীতকাল হলে খাঁচাগুলো ওপরে হালকা কিছু দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেয়। তারপর খাঁচার দরজাগুলোর ছিটকিনি ভালো করে পরীক্ষা করে। এখানে খটাসের খুব উৎপাত। সারা রাত পাখির খাঁচার দিকে ছোক ছোক করে ঘুরে বেড়ায়। সমস্ত একতলাটা তো তখন একদম খাঁ-খাঁ করে।

আমি ওপরে এসে সোফায় সবে বসেছি, হঠাৎ মনে হলো সিঁড়ির দরজার আড়াল থেকে কে যেন উঁকি মারল।

আমি চমকে উঠলাম।

কে ওখানে? চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম।

উত্তর দিল না কেউ।

আমি তখন উঠে গেলাম। দরজার পাটটা ঠেলে খুলে দিলাম। কেউ একজন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

কে তুমি? বলেই টর্চ ফেললাম।

এ কী রেণু!

ও ঠোঁটের উপর আঙুল চেপে চূপ করে থাকতে ইশারা করল। তারপর ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল—বাবুকে একটু দেখবেন। ওঁকে এখানে একা ফেলে রেখে যাবেন না। খুব খারাপ সময়। বলেই তরতর করে নিচে নেমে গেল।

আমি তো হতভম্ব। রেণু অমন চুপি চুপি ওপরে উঠে এল কেন? কেনই বা বলে গেল, খুব খারাপ সময়। বাবুকে দেখবেন? এর আগে তো কখনো এমন করে বলেনি। হঠাৎ কী এমন ঘটল যে জলধর গম্ভীর হয়ে আছে? সারা বাড়ি যেন থমথম করছে?

একটু পরে সদর দরজায় থিল্‌ দেওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। বুঝলাম রেণু চলে গেল। জলধর দরজা বন্ধ করে উঠে আসছে।

সোফায় আরও কিছুক্ষণ বসে রইলাম। জলধর চোখ বুজিয়ে সিগারেট খেতে লাগল। কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তাই বললাম, রেণু চলে গেল?

হ্যাঁ।

ওর আজকে তাড়া আছে দেখলাম।

এবারও জলধর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, হ্যাঁ।

তারপর বলল, চলো শোওয়া যাক।

আমি আবার ঘড়িটার দিকে তাকালাম। সবে রাত নটা। মনে মনে ভাবলাম—হায় কপাল! এখনি শুতে হবে! শুধু তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ার জন্যেই কি ও নেমস্তন্ন করে আনল?

কিন্তু প্রতিবাদ করলাম না। প্রতিবাদ করতে ইচ্ছেও করল না। কেননা, আজকে এই জলধর যেন আমার চিরপরিচিত জলধর নয়। ও হঠাৎ কিরকম বদলে গিয়েছে। ওর হাসিখুশি ভাবটাই নেই। সবসময়ে ও যেন কিছু চিন্তা করছে।

যাই হোক আমরা বিছানায় গিয়ে ঢুকলাম। বড়ো খাট। স্বচ্ছন্দে চারজন শুতে পারে। নিখুঁতভাবে বিছানা পাতা, মশারি টাঙানো। এর আগেও এই বিছানায় আমরা শুয়েছি পাশাপাশি। আজও শুলাম। আগে গল্প করতে করতেই রাত কাবার হয়ে যেত। কিন্তু আজ ও চুপচাপ শুয়ে আছে।

আমি লক্ষ্য করলাম একটা বেডসুইচ ওর ডান হাতের কাছে ঝুলছে। এটা আগে ছিল না।

বেডসুইচটা নতুন করালে?

হ্যাঁ, রাত্রে উঠতে হলে এটা কাজে দেয়।

এ তো সবাই জানে। কিন্তু হঠাৎ আজ কেন?

তবু সে কথা জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করে লাভ নেই।

একটু পরে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কি হয়েছে বলো তো।

ও বললে, জানি না।

তুমি যদি এইভাবে আমাকে এড়িয়ে যাও তাহলে ডাকলে কেন? শুধু মাংস-ভাত খাওয়ানোর জন্যে নিশ্চয় নয়?

ও বলল, রাতটা কাটুক। কাল সকালে বলব।

বলে পাশ ফিরে গুলো।

আগেই বলেছি, এর আগেও অনেকবার এ বাড়িতে খেয়েছি, শুয়েছি। কিন্তু এবার—এবার সবই যেন অদ্ভুত।

জলধর বেলা সাড়ে আটটার আগে কখনো ওঠে না। আজ নটা বাজতে না বাজতেই ফোন করল। সাতসকালে উঠে আমাকে ফোন করার কারণ বুঝতে পারলাম না।

এ বাড়িতে যখন আসতাম তখন দু'পাশে ঝোপে-ঝাড়ে, অজস্র ফুল ফুটে থাকত। এবার দেখলাম, ফুলগুলো যেন বরে যাচ্ছে।

জলধরের একটা পোষা দিশি কুকুর আছে। সে রোজ বিকেলে দরজার কাছে বসে থাকত। আমায় দেখলেই আনন্দে লেজ নাড়ত। আজ কুকুরটাকে দেখলাম না।

বাড়িতে ঢুকেই কেমন যেন অস্বাভাবিক থমথমে ভাব লক্ষ্য করলাম। অথচ বাড়িতে জলধর আছে, অনেক দিনের পুরনো রেণুও আছে।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে পাখির খাঁচাগুলোর দিকে তাকিয়েছিলাম। অন্ধকারে যদি ভুল দেখে না থাকি তাহলে মনে হয়েছে পাখিগুলো যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে জড়োসড়ো হয়ে আছে।

রেণুর তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাওয়া—লুকিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করা—সবই অদ্ভুত। আর সবচেয়ে আমায় স্তম্ভিত করে দিয়েছে জলধরের গুম হয়ে থাকা। গল্প করা তো দূরের কথা—দু-একটা মামুলি ‘হ্যাঁ’ ‘না’ করে ঘুমিয়ে পড়েছে। এসবের মানে কি?

ভাবতে ভাবতে কখন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ মনে হলো কে যেন আমায় দু’ হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরেছে...তাকালাম। দেখি—জলধর।

কি হয়েছে?

জলধর চাপা গলায় বলল, কিছু শুনতে পাচ্ছ?

কই? না।

ভালো করে কান পেতে শোনো।

এবার শুনতে পেলাম। সোঁ সোঁ করে ঝড়ের আওয়াজ। যেন দুরন্ত কালবৈশাখী ঝড় উত্তর দিকের মাঠগুলোর ওপর দিয়ে ছুটে আসছে।

শুনতে পাচ্ছ?

হ্যাঁ, ঝড় উঠেছে।

না। ঝড় নয়। এদিকে জানলার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো।

দেখলাম। জমাট কালো অন্ধকার। সার সার নারকেল গাছগুলো নিশ্চল প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে। ঝড়ের চিহ্নও নেই।

অদ্ভুত তো!

আমি উঠে বসলাম।

তাহলে কিসের শব্দ ওটা?

অপেক্ষা করো। আরও কিছু শুনবে।

হঠাৎ মেঠো ঝড়টা থেমে গেল। তারপরেই দুম্ দুম্ করে শব্দ।

শুনতে পাচ্ছ?

হ্যাঁ। কিন্তু কিসের শব্দ?

সেটাই তো জানবার জন্যে তোমায় রাতে থাকতে বলা। আজ তিন দিন ধরে প্রতি রাতে এই রকম শব্দ। বললে হয়তো বিশ্বাস করতে না। তাই ডেকে এনেছি।

শব্দটা যে একটানা হচ্ছিল তা নয়, মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছিল।

শব্দটা নিচ থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ।

তুমি কোনোদিন নিচে নেমে দেখেছ?

না। সত্যি কথা বলছি সাহস হয়নি।

এমনি সময়ে আবার সেই দুম্ দুম্ শব্দ।

চলো দেখে আসি।

দরকার নেই। এখন কী কর্তব্য বলো।

বললাম, ভালো করে না দেখে কি করে বলব? তুমি না যাও, আমিই যাচ্ছি। বলে আমি মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলাম। সুইচ অন করলাম। কিন্তু আলো জ্বলল না।

জানি জ্বলবে না। পুরো বাড়ি অন্ধকার।

হোক অন্ধকার। টর্চ আছে।

আমি টর্চ জ্বেলে নিচে নামতে লাগলাম। দেখি পিছনে পিছনে জলধরও নামছে।

তুমি আবার আসছ কেন?

কি করব? তোমায় একা ছেড়ে দিতে পারি?

তোমার একটা কুকুর ছিল না? সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করলাম।

এখনও আছে। তবে কদিন ধরে কিরকম হয়ে আছে। বোধহয় রোগে ধরেছে। আর বাঁচবে না। ঐ যে—

বলে টর্চটা সিঁড়ির নিচে ফেলল। দেখলাম, একটা প্যাকিং বাক্সের আড়ালে কুকুরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। মুখটা দেওয়ালের দিকে। যেন এদিকের কিছু দেখবে না—  
শুনবে না।

কুকুরটাকে আমি কয়েক মুহূর্ত লক্ষ করলাম।

দুন্ দুন্ শব্দটা কিছুক্ষণের জন্য থেমেছিল। আবার শুরু হলো।

আমি টর্চ জ্বালিয়ে তরতর করে নিচে নেমে এলাম। প্রথমে মনে হয়েছিল শব্দটা রান্নাঘরের পাশ থেকে আসছে। সেই দিকে ছুটে গেলাম কিন্তু তখনই মনে হলো শব্দটা বাঁ দিকের ভাঁড়ার ঘর থেকে আসছে। সেখানে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম তখন মনে হলো শব্দটা বাইরে থেকে আসছে। ছুটলাম মাঠের দিকে। যেমন করে হোক শব্দটার কারণ আবিষ্কার করতেই হবে।

আমি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে মাঠের দিকে ছুটছি তো ছুটছি—পিছনে জলধর চিৎকার করে উঠল, রমেন, কোথায় যাচ্ছ? ফিরে এসো।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তাই তো পাগলের মতো কোথায় ছুটছিলাম! এখানে তো কোনো শব্দ নেই। ঠিক তখনই আবার গুন্ গুন্ শব্দ। এবার মনে হলো বাড়ির মধ্যে থেকেই শব্দটা আসছে। ছুটে এলাম বাড়িতে।

কোথায় যাচ্ছিলে? শব্দ তো কাছেই। ঐ শোনো! এই যে—এই যে—এই ঘরে—

জলধর এসে দাঁড়ালো ওর সংগ্রহশালার দরজার সামনে। ও যা কিছু পুরনো জিনিস আজ পর্যন্ত কিনেছে সব এই ঘরে রাখা।

দাঁড়াও। তালাটা খুলি। বলে জলধর ফতুয়ার পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলতে লাগল। আমি টর্চটা জ্বালিয়ে ধরে রইলাম। দেখলাম ভয়ে উত্তেজনায় ওর হাত কাঁপছে।

ঝানাং করে শেকলটা দরজার ওপর আছড়ে পড়ল। আমি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই শব্দটা থেমে গেল। আর একটা ঠাণ্ডা বাতাস কাঁপুনি ধরিয়ে দিল।

এ ঘরের বাতাসটা দেখছি খুব ঠাণ্ডা।

ও কোনো উত্তর দিতে পারল না।

একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল জলধর, এই ঘরটা থেকেই শব্দটা হয়। তুমি বাইরে গিয়ে শোনো শব্দটা আর অন্য কোথাও হচ্ছে না।

জলধর একবার বাইরে থেকে ঘুরে এসে বলল, ঠিকই বলেছ। শব্দটা কোথাও নেই।

কিন্তু যে দু'মিনিট জলধর বাইরে ছিল সেই দু'মিনিট একলা এই ঘরে দাঁড়িয়ে আমার শরীরের মধ্যে কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমার গলা টিপে নিশ্বাস

বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করছিল। সে কথাটা অবশ্য জলধরকে বললাম না। ও তা হলে ভয় পাবে। ওকে তো একা এ বাড়িতে থাকতে হয়।

আমি টর্চের আলোটা চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলতে লাগলাম। জিনিসপত্রে ঘর ঠাসা। সবই পুরনোকালের জিনিস। আর এই সব পুরনো জিনিসের একটা বিশেষ গন্ধ আছে। সেই গন্ধটা পাচ্ছিলাম।

তিন-চারটে পুরনো সোফা, দুটো ছেঁড়া কোচ—ভেতরের স্প্রিং বেরিয়ে এসেছে। একটা কাঠের মস্ত রাজকীয় চেয়ার। অসাধারণ কারুকার্য। মস্ত একটা পাথরের খোদাই করা কালীমূর্তি। দেখলে ভয় করে। দেওয়ালে দেওয়ালে টাঙানো বাইসনের শিং, হরিণের শিং, বাঘছাল। সবগুলিরই গায়ে টিকিট লাগানো। কবে কোথায় এই জিনিসগুলি পাওয়া গিয়েছে—এগুলি কতকালের পুরনো জলধর তা লিখে রেখেছে। ওদিকে দেখলাম সেই অকেজো পিয়ানোটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে পড়ে রয়েছে—

কিন্তু—এটা কি?

আমি চমকে দু' পা পিছিয়ে এলাম।

ঘরটা অন্ধকার বলেই ঠাওর করিনি আমার সামনেই—একরকম পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে কুচকুচে কালো একটা কিছু।

টর্চ ফেললাম। একটা বিরাট উঁচু আলমারি।

এটা আবার কবে আমদানি করলে?

জলধর বলল, গত সপ্তাহে।

কোথায় পেলে?

কাল সকালে বলব।

আমি আলমারিটার চারপাশ ঘুরে দেখলাম। টোকা মেরে কাঠ পরীক্ষা করলাম। লোহার পাতের মতো শক্ত। এ ধরনের আলমারি আমি তো কখনও দেখিইনি, খুব কম জনেই দেখেছে। আলমারিটা যে খুব ধনী কোনো ব্যক্তির শখের জিনিস তা বলাই বাহুল্য। কেননা এত বড়ো আলমারি কারোর কোনো কাজে লাগে না। আমি একটু নড়াতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না।

বললাম, খুব ভারী মনে হচ্ছে। ভেতরে কি আছে?

কিছুই না। খালি আলমারি। একটা তাকও নেই। খুলব?

এখন দরকার নেই। কাল দেখব। চলো শাইগে। ঘুম তো আর হবেই না। চোখে বুঁজে পড়ে থাকা যাবে ঘণ্টা দুয়েক।

আমরা দরজা বন্ধ করে ওপরে এসে শুয়ে পড়লাম।

### নন্দগড়ের রাজবংশ

রেণু খুব সকালেই আসে। এদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। চা, টোস্ট আর ডিমসেদ্ধ দিয়ে যখন চলে যাচ্ছিল তখন রেণুকে বললাম, তোমায় কতকগুলো কথা জিজ্ঞেস করব। ঠিক ঠিক উত্তর দেবে। একটি কথাও লুকোবে না।

রেণু বলল, লুকোবো কেন? আমি তো কোনো অন্যায় করিনি। যা দেখেছি, যা বুঝেছি তাই বলব।

একটু থেমে বলল, আপনি কি এখনি জিজ্ঞেস করবেন?

হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানা দরকার।

বলুন। বলে রেণু মাটিতেই গুছিয়ে বসল।

তুমি রাত্রে সাধারণত কখন বাড়ি ফের?

দাদাবাবুকে খাইয়ে, বাসন মেজে, রান্নাঘর পরিষ্কার করে রাত নটা নাগাদ।

কিন্তু কয়েকদিন তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছ। কেন?

রেণু একটু চুপ করে থেকে বলল, এ বাড়ি ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে।

কিরকম?

কিছুদিন ধরে সন্ধ্যারাতেই ঐ মাঠে ঝড়ের লক্ষণ দেখতে পাই। পরে শুনেছি গভীর রাতে ঝড়ের শব্দ ওঠে। আমি এখানকার মেয়ে। আমার বাবা নামকরা ভূতের ওঝা। বাবা বলেন—ঐ মাঠে যখন দোঠেলা বাতাস বইবে তখন সাবধান থাকবে।

বললাম, দোঠেলা বাতাসটা কি?

রেণু বলল, দু'মুখো বাতাস যা বড়ো একটা ঘটে না।

ঘটলে কি হয়?

আসলে দোঠেলা বাতাসে ভর করে খারাপ আত্মারা ঘুরে বেড়ায়। যেখানে নামে সেখানে সর্বনাশ করে দেয়।

আমি হাসি লুকিয়ে বললাম, কিন্তু সে তো গভীর রাত্তিরে। তুমি তো সে ঝড় দেখনি। তাহলে আগে চলে যাও কেন?

রেণু বলল, তেনাদের কেউ যে এ বাড়িতে নেমেছেন।

অবাক হয়ে বললাম, কিসে বুঝলে?

ও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সন্ধ্যারাতে আমি একা রান্নাঘরে কাজ করি। এর মধ্যে দু'দিন শুনেছি ঐ পুরনো জিনিসপত্তরের ঘরের দরজা কে যেন ঠেলছে।

তারপর?

সঙ্গে সঙ্গে কেন্দু টেঁচিয়ে উঠত।

কেন্দু কে?

এ বাড়ির কুকুর।

টেঁচিয়ে উঠে দরজার দিকে ছুটে যেত। তারপরই খুব ভয় পেয়ে সিঁড়ির নিচে ঐ বাস্তুর পাশে লুকোত।

রেণু থামল।

তারপর? আর কিছু?

হ্যাঁ, পরশুদিন আমি রাত্রে দাদাবাবুর দুধ নিয়ে ওপরে উঠছি—হঠাৎ দেখি ঐ ঘরের দরজার বাইরে কেউ যেন পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চিৎকার করে ডাকলাম। দাদাবাবু নেমে এলেন। কিন্তু কিছুই নেই। অথচ আমি আমার ছেলের দিব্যি দিয়ে বলতে পারি—আমি ভুল দেখিনি।

একটু থেমে বলল, এ বাড়িতে আমি আর কাজ করব না ঠিক করেছিলাম। কিন্তু দাদাবাবুর খাওয়ার কি হবে ভেবে চলে যেতে পারিনি। এ বাড়িতে ওঁর একা থাকাও ঠিক নয়।

ঠিক আছে রেণু, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

রেণু তাকাল।

কবে থেকে তুমি এরকম দেখছ শুনছ বা ভয় পাচ্ছ?

দিন তিনেক।

ঠিক আছে। তুমি যাও।

রেণু চলে গেলে জলধরকে বললাম, আলমারিটা কত দিন হলো কিনেছ?

দিন দশেক আগে।

বেশ। এবার বলো হঠাৎ আলমারিটার খোঁজ কোথায় পেলে?

জলধর একটু চুপ করে থেকে বলল, তুমি তো নন্দগড়ের রাজাদের কথা জানই। রাজা মানে খুব বড়ো জমিদার ক্রাসের।

হ্যাঁ, জানি। প্রচণ্ড দাপট ছিল তাদের। পাইক-পেয়াদা-বরকন্দাজ নিয়ে প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করত। প্রজাদের ওপর খুব অত্যাচার করত।

হ্যাঁ, অত্যাচার যেমন করত তেমনি পূজো-আচ্চা, দান-ধ্যানও করত।

জলধর বলল, নন্দগড়ে গঙ্গা ছিল না। তাই প্রায় তিনশো বছর আগে জমিদার সারদাচরণ গুপ্তিপাড়ায় গঙ্গার ধারে বিরাট রাজবাড়ি তৈরি করেছিলেন। মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নান করার জন্যে গুপ্তিপাড়ায় আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে আসতেন।

হ্যাঁ, এসব বাবার মুখে শুনেছি।

রাজা আসা-যাওয়া করেন, অতএব এখানেও ছোটোখাটো অফিস বসল। সেরেসাদার, গোমস্তা আর সবার ওপর থাকত নায়েব। রাজারা এখানে অনেক মন্দির, দানশালা খুলেছিলেন, দোল-নন্দোৎসব হতো। সেসব দেখাশোনা, খরচপত্তর দেখতেন ঐ নায়েব। তিনিই ছিলেন এরকম রাজার প্রতিনিধি।

জলধর বলতে লাগল, তারপর একদিন জমিদারি প্রথা উঠে গেল। রাজাদের অবস্থা পড়ে গেল। তাঁরা নন্দগড় ছেড়ে কেউ কলকাতায়, কেউ বিলেতে চলে গেলেন জিনিসপত্র জলের দরে বেচে দিয়ে।

গুপ্তিপাড়াতেও কম জিনিস ছিল না। নায়েব সনাতন চৌধুরী খুব চৌকস লোক ছিলেন। তিনি চুপিচুপি অনেক জিনিস হাতিয়ে নিলেন। আর কিছু আসবাবপত্র নিজের জানাশোনা লোকের কাছে বিক্রি করে দিলেন চড়া দামে। বুঝতেই পারছ—রাজবাড়ির জিনিস—তার কদরই আলাদা। সবাই কিনতে চায়।

তাই তুমিও কিছু কিনতে চাইলে?

হ্যাঁ, কিন্তু সনাতন চৌধুরীর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। আর উনিও চট করে কাউকে পাত্তা দিতেন না। রাজ-এস্টেটের নায়েব তো। খুব উঁট।

তারপর কি করলে বলো।

নন্দগড়ের শেষ রাজা দেবকুমারের কুলপুরোহিত সদানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে বাবার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি নবদ্বীপে থাকেন। এখন তো আর রাজ-এস্টেট নেই, পূজো-পার্বণ উঠে গেছে। সদানন্দ নবদ্বীপে নিজেই পূজো-আর্চা নিয়ে থাকেন। বাবা যৌবনকালে তাঁর কাছে প্রায়ই যেতেন। বাবাকে তিনি খুব ভালোবাসতেন।

রাজবাড়ির জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে শুনে আমি একদিন নবদ্বীপে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি এখনও বেঁচে আছেন?

জলধর বলল, হ্যাঁ, দিব্যি আছেন। বয়েস চুরানকই। কিন্তু বয়স তাঁকে ছুঁতে পারেনি।

আমি তাঁকে পরিচয় দিয়ে আমার ইচ্ছের কথা বললাম। তিনি তখনই সনাতন চৌধুরীকে চিঠি লিখে দিলেন—যে জিনিস আমি পছন্দ করব তাইই যেন ন্যায্য দামে দেন।

সদানন্দ আরও বললেন, তুমি যেদিন গুপ্তিপাড়ায় কিনতে যাবে, আমায় নিয়ে যেও। আমি জিনিসগুলো একবার দেখব। কেননা রাজবাড়ির সব আসবাবপত্রের তালিকা—ইতিহাস আমার কাছে আছে।

জলধর একটু থামল। তারপর বলল, আমায় যেতে একটু দেরি হলো। কিন্নব বলে টাকা-পয়সা যোগাড় করে যখন নবদ্বীপে গেলাম, তার দুদিন আগে সদানন্দ ব্রহ্মচারী কাশী চলে গেছেন। ফিরতে মাস তিনেক দেরি হবে। আমার আর তর সইছিল না। পাছে ভালো ভালো জিনিস হাতছাড়া হয়ে যায়—তাই ব্রহ্মচারীজির চিঠিটা নিয়েই গুপ্তিপাড়া চলে গেলাম। দেখলাম কুলপুরোহিত বলে সদানন্দ ব্রহ্মচারীকে সবাই এখনও খাতির করে। সনাতন চৌধুরী সাদরে আমাকে রাজবাড়ির জিনিসপত্রের ঘরে নিয়ে গেলেন। সেই ঘরেই আমি ওই আলমারিটা দেখলাম। দেখামাত্রই পছন্দ হয়ে গেল। কেননা এত বড়ো আবলুশ কাঠের আলমারি বড়ো একটা চোখে পড়ে না। দরদস্তুর করে টাকা দিয়ে—লরির ওপর চাপিয়ে আলমারিটা নিয়ে এলাম।

জলধর একটু থামল। তারপর বলল, নিয়ে তো এলাম। কিন্তু তারপর থেকেই এই তো অবস্থা দেখছ!

বললাম, এখনও পর্যন্ত যা জানলাম তাতে মনে হচ্ছে যেহেতু ঐ আলমারিটা আনার পর থেকেই শব্দটন্দ হচ্ছে তখন রহস্যের মূলে ঐ আলমারিটাই।

হ্যাঁ, আলমারিটা যে ভৌতিক তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ওটাকে বিদেয় করব।

সে তোমার যা ইচ্ছে তাই করবে। ‘বিদেয় করব’ বললেই তো আর অত বড়ো আলমারিটা বিদায় করা সম্ভব নয়। কে কিন্নবে? অত বড়ো আলমারি সে কোথায় রাখবে? সবাই তো আর তোমার মতো পাগল নয়। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা—মাঠের ঐ অদ্ভুত ঝড়ের সঙ্গে ঘরের শব্দের সম্পর্ক কী?

জলধর বেজার মুখে বলল, সম্পর্ক নিয়ে তুমি মাথা ঘামাও। আমি বুঝতে পারছি ভূত-প্রেতের পাল্লায় পড়েছি। এবার মরতে হবে।

আমি হেসে ওকে সাহস দিয়ে উঠে পড়লাম। কাল রাত্তির থেকে আমি ঘর-ছাড়া। এখন বাড়ি যাই।

নিচে নামতেই রেণু আমার পিছু পিছু রাস্তা পর্যন্ত এল।

কিছু বলবে?

রেণু মাথা নিচু করে বলল, আজ রাত্তিরেও এখানে থাকবেন তো?

রোজ কি আর থাকা সম্ভব?

রেণুর মুখটা শুকিয়ে গেল।

তা হলে উনি একা কি করে এই বাড়িতে থাকবেন?

আমি ভেবে বললাম, তোমার ভাই-টাই তো আছে। তাদের থাকতে বলো। দু'বেলা খাবে, থাকবে। আমি না হয় জলধরকে বলে দেব।

রেণু আর কিছু না বলে ফিরে গেল।



## গভীর রাতের পালা

কদিন পর সকালে বাড়িতে বসে জলধরের কথা ভাবছিলাম। ওর বাড়িতে সেই এক রান্তিরের অভিজ্ঞতা যা আমার হয়েছিল, তা জীবনে ভুলব না। সত্যিই রহস্যময় অলৌকিক ব্যাপার। তারপর সেদিন আর একটা কাণ্ড ঘটেছিল। সকালবেলাতেই জলধরের ফোন। কাঁপা কাঁপা গলায় ও বললে, রোজকার মতো ঐ ঘরটা ঝাঁট দিতে গিয়ে রেণু দেখে আলমারিটা খানিকটা সরে গেছে। অত ভারী আলমারি সরাবে কি করে? ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে জলধর। আমি তখনই সাইকেল নিয়ে ছুটলাম। দেখি রেণু সিঁড়িতে চুপচাপ বসে। ভয়ে মুখ ফ্যাকাশে। দাদাবাবু কোথায়?

ও কোনোরকমে আঙুল তুলে দোতলা দেখিয়ে দিল। আমি যেতেই ও বলল, এসব কী হচ্ছে রমেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ওকে নিয়ে আমি একতলায় নেমে এসে ঘরটায় ঢুকলাম। দেখলাম সত্যিই আলমারিটা আঙুল চারেকের মতো সরে এসেছে। এটা কি করে সম্ভব হলো, কিছুতেই ভেবে পেলাম না।

তারপর দুদিন আর কিছু ঘটেনি। কালও সকালে ফোন করেছিলাম। ও বলল, কাল রাত্রে ও ভালেই ঘুমিয়েছে। রেণু ও ঘরে আর ঢুকতে চাইছে না। তবে রেণুর একটা ভাই এসেছে। সে নাকি খুব ডাকাবুকো। সেই ঘরটা পরিষ্কার করেছে।

আমি নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছি। যাক রেণু আমার কথা শুনেছে। একটা জিনিস এই বুঝেছি—মানুষ যখন নির্জন জায়গায় একা থাকে তখনই যতরকমের ভয় পেয়ে বসে। যেখানে মানুষের পাশে মানুষ সেখানে ভয় ঘেঁষতে পারে না।

কালকের রাতটা জলধর কেমন কাটাল জানার জন্যে ফোন করব ভাবছি এমন সময়ে টেলিফোনটা বন্বন্ব করে বেজে উঠল। মনে হলো যেন ফোনটা অস্বাভাবিক জোরে বাজল। তাড়াতাড়ি রিসিভারটা তুলে নিলাম।

হ্যাঁ, জলধরই কথা বলছে। ভয়ে ওর গলা শুকিয়ে কাঠ।

আজ প্রায় এক হাত সরে এসেছে আলমারিটা।

বল কী!

হ্যাঁ। শীগগির এসো।

ওর বাড়িতে গিয়ে যখন পৌঁছিলাম তখন দেখি জলধর সামনের রাস্তায় মাথা নিচু করে পায়চারি করছে। আমায় দেখে কিছু বলল না। শুধু আমার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে ঢুকল।

আমি প্রথমেই সেই ঘরটার দিকে এগোলাম। দেখি দরজাটা খোলা। একটা উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। তাগড়া চেহারা। দেখে মনে হলো ছেলেটার ভয়-ডর বলে কিছু নেই।

বললাম, ঐ কি রেণুর ভাই?

জলধর বলল, হ্যাঁ। দুদিন হলো ও এখানে থাকছে। খুব চটপটে। নাম বিশু।

আমি ভেতরে ঢুকলাম। বিশু ফিক করে এমনভাবে হাসল যেন আমি ওর কত দিনের চেনা।

বললাম, বিশু, তুমি তো দুদিন হলো এ বাড়িতে এসেছো। ভয়ের কিছু দেখেছ বা শুনেছ?

ও তেমনি হেসে বলল, কিছু না।

একটু থেমে বলল, বাবা একদিন আপনার সঙ্গে দেখা করবে।

তোমার বাবা?

হ্যাঁ। খুব বড়ো। চোখে ভালো দেখতে পায় না। লাঠি ছাড়া চলতে পারে না। তা ও সঙ্গে লোক চাই।

তা তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন কেন?

ও ঠোট উন্টে চলে গেল। অর্থাৎ ওর বাবা কেন আমার সঙ্গে দেখা করবে তাও জানে না।

জলধরকে নিয়ে আমি আলমারিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সত্যিই আলমারিটা প্রায় এক হাত সরে এসে একেবারে পিয়ানোটার ঘাড়ের ওপর পড়েছে। মনে হলো কেউ যেন আলমারিটাকে টেনে আনবার চেষ্টা করেছে। অথচ এত ভারী আলমারি কোনো একজন মানুষের পক্ষে টেনে আনা সম্ভব নয়।

তা হলে?

বললাম, জলধর, আলমারিটা খোলো তো দেখি।

আলমারিতে তালো দেওয়া ছিল। জলধর ওপরে উঠে গেল চাবি আনতে। কিন্তু দশ মিনিট কেটে গেল তবু জলধর চাবি নিয়ে এল না।

এদিকে বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে কিরকম একটা গ্যাস উঠছিল। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আমি বাইরে এসে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ পরে জলধর শুকনো মুখে নেমে এলো। বলল, কী মুশকিল! চাবিটা খুঁজে পাচ্ছি না।

সে কী? চাবিটা রাখতে কোথায়?

ওপরে টেবিলের ড্রয়ারে।

হতাশ হয়ে বললাম, তাহলে আর কী হবে? চাবিটা পেলে আমায় ফোন করো। চলে আসব। মোট কথা আলমারিটা খুলে দেখতে চাই। আর তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

চলে আসবার সময়ে রেণুর সঙ্গে দেখা হলো। বললাম, তোমার ভাইকে এনে খুব ভালো করেছে।

কিন্তু দাদাবাবু, বিপদ তো বেড়েই চলেছে। ঐ আলমারিটা দূর করতে না পারলে রেহাই নেই।

তা ঠিকই। কিন্তু মাঠের ওপর ঝড়টা?

রেণুর মুখটা শুকিয়ে গেল।

বলল, বাবাকে বলেছি। বাবা একদিন আপনার সঙ্গে দেখা করবে।

তোমার বাবা তো ওঝা ছিলেন?

হ্যাঁ। এখন বড়ো হয়ে গেছে। এখন আর ঝাড়ফুঁক করে না। তবু দেখা করবে।

বললাম, খুব ভালো। একদিন তোমার বাবুর কাছে নিয়ে এসো। আমিও থাকব।

সারাদিন অপেক্ষা করে ছিলাম কখন জলধরের ফোন আসে। ফোন এল সন্ধ্যাবেলায়। চাবিটা পেয়েছি।

কোথায় ছিল?

সিঁড়িতে পড়ে ছিল। বিশুই পেয়েছে।

ঐ আলমারির চাবি সিঁড়িতে পড়ে থাকল কী করে?

কি জানি!

এর মধ্যে আলমারিটা খুলেছিলে?

একদিনও না।

আশ্চর্য! ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি।

রাত্রে এখানেই থাকবে কিন্তু।

অবশ্যই। বলে টেলিফোন রেখে দিলাম।

কিন্তু তখনই যাওয়া হলো না।

কলকাতা থেকে আমার এক পুরনো বন্ধু তার স্ত্রীকে নিয়ে দেখা করতে এল। তাকে এসব ঘটনা বলতে পারলাম না। শুনে হয়তো হাসবে। কাজেই ওদের সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম। ওরা যখন উঠল রাত তখন নটা বাজে।

আজ আর যাব না কথাটা জানিয়ে দেবার জন্যে ফোন করতে যাচ্ছি, ঠিক তখনই জলধর ফোন করল, কী ব্যাপার! তুমি এখনো এলে না কেন?

আমি সব কথা জানিয়ে ওকে যখন বলতে গেলাম—কাল সকালেই যাব—ও একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠল। বলল, না। এখুনি এসো। রাত্রে আমার এখানে থাকবে।

অগত্যা যেতেই হলো।

সত্যি কথা বলতে কি আমার নিজেরও গা-টা কেমন ছম্ছম্ করছিল। বিশেষ করে এত রাত্রে ঐ নির্জন পথ দিয়ে যাওয়া। আমি কোনোদিন ভৌতিক কাণ্ড-কারখানা দেখিনি। ওসব বিশ্বাসও হয় না। কিন্তু জলধরের বাড়িতে ক’দিন ধরে যা ঘটছে তা আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। কিছুই না। তবু ঐ আলমারির চাবিটার কথাই ধরা যাক। চাবিটা দোতলায় টেবিলের ড্রয়ারে থাকত। কেউ কোনোদিন হাতও দেয়নি। হাত দেবেই বা কেন? সেই চাবিটা হঠাৎ হাওয়া। পাওয়া গেল সিঁড়িতে। এর মানে কী? মানে কিছুই নেই। সবই রহস্য। একবার ভেবেছিলাম পুলিশে খবর দিতে বলব। কিন্তু ভেবে দেখলাম পুলিশই বা কী করবে? অগত্যা মাঝে মাঝে জলধরকে সঙ্গে দেওয়া ছাড়া আমার আর কোনো কাজ নেই।

আমি যখন সাইকেল নিয়ে বড়ো রাস্তা থেকে ওর বাড়ির দিকের কাঁচা রাস্তায় নামলাম, রাত তখন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে নটা।

চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু দু’পাশের বন-ঝোপের মধ্যে থেকে কোনো পোকা-মাকড় চিক্ চিক্ করে ডাকছে। কিছু দূরে সেই ফসলশূন্য ধু-ধু মাঠটা যেন বিশাল একটা সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। দেখলে কেমন গা-ছম্ছম্ করে।

আমি জোরে সাইকেল চালিয়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে চলেছি। সাইকেলের চাকা কখনও ধুলোয় বসে যাচ্ছে, কখনো খোয়ার ওপর পড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে।

হঠাৎ মনে হলো আমার সামনে দিয়ে একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে।

অবাক হলাম—এত রাত্রে এই পথে লোক এল কোথা থেকে? তা ছাড়া একটু আগেও তো দেখতে পাইনি।

লোকটার বিশাল চেহারা। কাঁধ পর্যন্ত ঝাঁকড়া চুল—খালি গা—পরনে একটা কপ্‌নি মাত্র।

আমি বেল দিলাম। কিন্তু লোকটা শুনল না। তেমনি সামনে সামনে চলেছে।

আমি আবার বেল দিলাম। কিন্তু লোকটার হুঁশ নেই।

এ কিরকম লোক? আমি কি ভুল দেখছি?

বাঁ হাত দিয়ে চোখ কচলে নিলাম। না—ভুল নয়। লোকটা এবার জোরে জোরে হাঁটছে।

আর আমার মনে হলো ওর জোরে হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে আমার সাইকেলটাও ছুটে চলেছে।

আমায় প্যাডেল করতে হচ্ছে না। শুধু হ্যান্ডেলটা ধরে আছি।

কিছুক্ষণের জন্যে আমি বোধহয় বাহ্যিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। হঠাৎ একটা চোঁচামেচিতে আমার সম্বন্ধ ফিরল। টর্চের আলো এসে পড়ল আমার মুখে। তারপরই দেখি বিশু ছুটতে ছুটতে আসছে।

এ কী স্যার! কোথায় যাচ্ছিলেন?

ভালো করে তাকিয়ে দেখি আমি সেই মাঠের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। সাইকেলটা পড়ে আছে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম। কিন্তু সেই লোকটাকে খুঁজে পেলাম না। যেন মাঠের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

বিশুকে আসল কথা না বলে শুধু বললাম, অন্ধকারে দিকভুল হয়ে গিয়েছিল।

দেখুন দিকি কী সাংঘাতিক ব্যাপার! এই রাত্রে মাঠের মধ্যে গিয়ে পড়লে—আর রক্ষণ থাকত না।

তুমি কোথায় ছিলে?

আপনার দেরি হচ্ছে দেখে দাদাবাবু টর্চ দিয়ে পাঠালেন। ভাগ্যি বেরিয়ে পড়েছিলাম।

জলধরকেও সত্যি ঘটনাটা বলিনি। বললে ও বেচারার খুব ভয় পেত।

আমাকে পেয়ে ও খুশি হলো। বলল, এত রাতে আর আলমারি খুলে দরকার নেই। খেয়ে নিয়ে শোবে চলো।

তাই করলাম।

রেণু আগেই চলে গেছে। বিশুও রান্নাঘরে খেয়ে নিল।

ওপরে এসে বললাম, বিশু শোয় কোথায়?

জলধর বলল, ও নিচেই শুতে চেয়েছিল। আমিই ওকে পাশের ঘরে ব্যবস্থা করেছি। খুব সাহসী ছেলে।

ভালো করেছে। বলে মশারির মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

নিচে দরজায় খিল বন্ধ করার শব্দ শুনলাম। আগে এ কাজটা জলধরকেই করতে হতো। এখন বিশু করে।

খিল বন্ধ করার শব্দটা শুনে মনে হলো—এবার বোধ হয় গভীর রাতের পালা শুরু হবে। জানি না আজ রাতে তেমন কিছু ঘটবে কিনা।

আর কিছু ঘটুক বা না ঘটুক—আসবার সময় যা দেখলাম আর যা ঘটতে যাচ্ছিল তা ভাবতেও শিউরে উঠলাম। আমি চোখ বুজিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করতে লাগলাম—সত্যিই কি কিছু দেখেছিলাম? নিশ্চয় দেখেছিলাম। এখনও তো তার সেই বিরাট শরীরটা চোখের সামনে ভাসছে, আর যদি চোখের ভুলই হয় তাহলে আমি মাঠের ধারে চলে গিয়েছিলাম কি করে? জলধরের বাড়ি তো আমি কম দিন আসছি না যে সত্যিই পথ হারিয়ে ফেলব?

ঠিক করলাম—কাল সকালে রেণুকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করব ঐরকম চেহারার কোনো লোকের কথা শুনেছে কি না।

ভাবতে ভাবতে কখন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। অনেক দূরে কোথাও যেন একটা শব্দ হচ্ছে। এ শব্দ আগের দিনের মতো নয়। এ শব্দটা যেন কোনো ভারী জিনিস টানার শব্দ।

শব্দটা ঠিক কোথায় হচ্ছে প্রথমটা বুঝতে পারিনি। তারপরেই বুঝলাম শব্দটা একতলা থেকে আসছে।

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। পাশে জলধর তখন অকাতরে ঘুমোচ্ছে। আমি পাশে শুয়ে আছি জেনেই ও বোধহয় এত নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পেরেছে।

আমি আন্তে ঠেলা দিয়ে ওকে জাগলাম।

আঁ—আঁ—কী হয়েছে! বলে ও চমকে উঠে বসল।

সাহস দিয়ে বললাম, কিছু না। একটা শব্দ হচ্ছে না?

ও কান পেতে শুনে বলল—হ্যাঁ। নিচের ঘরে।

আমি স্বচক্ষে আজ দেখব। বলে মশারি থেকে বেরিয়ে এলাম।

দাঁড়াও। আমিও যাব। বলে জলধরও বেরিয়ে এল। দেখি ওর পা দুটো কাঁপছে।

সুইচে হাত দিলাম। ঠিক আগের মতোই আলো জ্বলল না। দুজনে দুটো টর্চ হাতে নিয়ে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়লাম—কিন্তু সিঁড়ির ঠিক শেষ ধাপে কেউ যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

চমকে দু' পা পিছিয়ে এলাম।

টর্চ জ্বাললাম। দেখি বিশু। শিকারী বেড়ালের মতো ও নিচে নামছে।

টর্চের আলোয় ও চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকাল। তারপর ইশারায় নিঃশব্দে নামতে বলল। বুঝলাম শব্দটা ও-ও শুনেছে। অতি সাহসী তো। তাই একাই দেখতে যাচ্ছিল ব্যাপারটা।

দুটো টর্চ নিভিয়ে, শুধু একটা মাত্র টর্চ জ্বালিয়ে আমরা তিনজনে সেই ঘরটার সামনে গিয়ে দাঁড়লাম। ঘরের ভেতরে শব্দটা তখনও হচ্ছে। কেউ যেন ভারী কাঠের দুখানা পা নিয়ে ঘেঁষটে ঘেঁষটে অনেক কষ্টে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

জলধরের কাছ থেকে চাবি নিয়ে আমিই দরজাটা খুললাম। তালা খোলার শব্দ হতেই ভেতরের শব্দটা থেমে গেল।

আন্তে করে দরজাটা ঠেললাম। দরজাটা খুলে গেল। একটা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস যেন আমাদের চুল এলোমেলো করে দিয়ে বেরিয়ে গেল।.....ভেতরে জমাট অন্ধকার।

আমরা পায়ে পায়ে এগোতে লাগলাম। এবার তিনটে টর্চই জ্বলছে।

ঘরের চারিদিকে টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেললাম।

না, কোনো জীবন্ত প্রাণীর অস্তিত্ব নেই।

আমরা আলমারিটার কাছে এসে দাঁড়লাম। দেখলাম আরো এক হাত আলমারিটা এগিয়ে এসেছে। আর—ইস্! এটা কী?

দেখি আলমারিটার কাছে একটা মস্ত ইঁদুর চেস্টে খেঁতলে পড়ে আছে। যেন ভারী কোনো জিনিসে চাপা পড়ে মরেছে।

টর্চের আলোয় বিরাট আলমারিটা ভালো করে দেখলাম। আলমারিটাকে একটা ভয়ংকর

দৈত্যের মতো লাগছিল।

সেটার সারা গায়ে ঘুঁষি মেরে দেখলাম। কোনো কিছু ব্যতিক্রম চোখে পড়ল না। তখন আমি বললাম, জলধর, আলমারিটা খোলো।

জলধর তোতলাতে তোতলাতে বলল, খুলে কি হবে? ওর ভেতরে আমি কিছুই রাখিনি। যা বলছি তাই করো। তুমি না রাখলেও আগে থেকে কিছু থাকতে পারে।

জলধর নিজে খুলল না। চাবিটা আমার হাতে দিল।

ক্যা—চ্ শব্দ করে বিরাট দুটো পাট খুলে গেল। একটা বিশী ভ্যাপসা গন্ধ....তিনটে টর্চের আলো বর্ষার ফলার মতো গিয়ে পড়ল।

না, কিছু নেই। ফাঁকা আলমারিটা যেন আমাদের গেলবার জন্য হাঁ করে আছে।

আমার মুখ থেকে একটা অস্ফুট শব্দই শুধু বেরিয়ে এল—আশ্চর্য!

তারপর বিশুকে দিয়ে একটা টুল আনিয়ে তার ওপর দাঁড়িয়ে আলমারিটার ভেতরটা দেখতে লাগলাম। আমার কেমন ধারণা ছিল যে ভেতরে নিশ্চয় কিছু থাকবেই।

আমি টুলের ওপর দাঁড়িয়ে। নিচে ওরা দুজন। তিনটে টর্চই জ্বলছে। আর পাশে পিছনে জমাট অন্ধকার। মনে হচ্ছে ঘরের মধ্যে সবকটা মৃত আসবাবপত্র যেন ভুকুটি করে আমাদের কাজকর্ম লক্ষ করছে।

খুঁ করে একটা শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনটে টর্চ ঘুরে গিয়ে পড়ল জীর্ণ একটা সোফার ওপরে।

একটা ছুঁচো।

চোখে আলো পড়ায় ছুঁচোটা ছুটে পালাল।

আমি আলমারির ভেতরের গাগুলো ভাল করে দেখছি। আরে—

ওটা কী?

বাঁ দিকের গায়ে গোলমাথা পেরেকের মতো একটা বোতাম।

কিছু না ভেবেই আমি বোতামটা টিপলাম। সঙ্গে সঙ্গে আলমারির ভেতরের কাঠটা সরে গেল।

তারপরই যা দেখলাম তাতে আমার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। তাড়াতাড়ি কাঠটা বন্ধ করে নেমে পড়লাম।

...একটা মড়ার খুলি। দু'চোখের কোটরে জীবন্ত মানুষের মতো জ্বলজ্বল করছে চোখ।

হঠাৎই টর্চগুলো নিভে গেল। আমরা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরোতে গেলাম। কিন্তু অন্ধকারে দরজাটা খুঁজে পেলাম না।

জলধর কেবলই গোঙাচ্ছে—আলো—আলো নিয়ে এসো।

কিন্তু আলো আনবে কি করে?

দরজাটা কোনদিকে তাই ঠাওর হচ্ছে না।

এদিকে আবার সেই শব্দটা শুরু হয়েছে—ঘ্যা-স—ঘ্যাস—ঘ্যাস—

এবার খুবই স্পষ্ট।

কাঠের আলমারিটা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে...হয়তো ঐ ইঁদুরটার মতোই আমাদের পিষে মারবে।

## সদাশিবের বিবরণ

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ফিরে আসে আমাদের। দরজা খুঁজে পাই। আলমারিতে আর দরজায় চাবি লাগিয়ে আমরা ওপরে গিয়ে বসি।

সকাল সাতটা নাগাদ রেণু চা দিয়ে গেল। এরই মধ্যে এক ফাঁকে রেণুকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছি লম্বা-চওড়া ঝাঁকড়া চুল কোনো লোককে এখানে কখনো দেখেছে কিনা। রেণু বলেছে তেমন কাউকে কোনোদিন দেখেনি। কেননা ঐরকম চেহারার লোক একবার দেখলে ভুলত না।

বিশু এরই মধ্যে নিচে দিবা তার রোজকার কাজ শুরু করে দিয়েছে। গতরাতের কথা যেন তার মনেও নেই। অসম্ভব অবসন্ন লাগছে জলধরকে। দু'চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে। ক্লান্ত স্বরে বলল, এখন কি করব রমেন?

বললাম, আমিও বুঝতে পারছি না।

জলধর বলল, ঐ মড়ার খুলিসুদ্ধ আলমারিটা নিয়ে আমি আর এ বাড়িতে থাকতে পারব না।

বললাম, অন্তত খুলিটা ফেলে দেওয়া দরকার। তারপর দেখা যাবে আর কোনো ঘটনা ঘটে কিনা।

জলধর কি বলতে যাচ্ছিল এমন সময়ে বিশু এসে বলল, বাবা নিচে এসে বসে আছে, ওপরে উঠতে পারবে না। আপনারা আসুন।

আমরা তখন নিচে নেমে গেলাম। আমাদের এই অবস্থায় রেণুর বাবা কোনো হৃদিস দিতে পারে কিনা দেখা দরকার।

রেণু বা বিশুর বাবার অনেক বয়েস। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। ছোটো ছোটো পাকা চুলে ভরা মাথাটা কেবলই দুলাচ্ছে, যেন জরাজীর্ণ দুর্বল শরীরটা মাথার ভার সহিতে পারছে না। নাম সদাশিব দাস।

আমাদের দেখে লাঠিটা পাশে রেখে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। দু'হাত জোড় করে বিনম্র নমস্কার করে বলল, কর্তাবাবুরা, এ বাড়িতে কদিন ধরে যা ঘটছে রেণুর মুখে সব শুনে আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। তাই আমি যা জানি—মানে বাবার মুখে যা শুনেছি—তাই বলতে এলাম।

আমরা দুখানা চেয়ার নিয়ে ওর সামনে বসে ওকে বলতে বললাম।

সদাশিব প্রথমে চোখ বুজিয়ে কারও উদ্দেশ্যে প্রশ্নাম জানাল। তারপর বলল, বাবুমশাইরা, এসবই ঠাকুরবাবার খেলা।

ঠাকুরবাবা কে?

এর উত্তরে সদাশিব ফোকালা মুখে অস্পষ্ট উচ্চারণে কাটা কাটা অসংলগ্ন কথার মধ্যে দিয়ে যা বলতে চাইল তা এইরকম—

প্রায় তিনশো বছর আগে এই সব জায়গা নন্দগড়ের রাজার অধীন ছিল। রাজা সারদাচরণ রাজ্যশাসনে যেমন কঠোর ছিলেন, উল্টোদিকে তেমনি আবার খুব ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। অনেক দেব-দেউল, অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রাজসভায় সেদিন কাজের অবসরে সারদাচরণ খুশমেজাজে রাজজ্যোতিষীর সঙ্গে ভাগ্যফল নিয়ে আলোচনা করছিলেন। পাশে বসেছিল তাঁর পোষ্যপুত্র যুবরাজ মঙ্গলাচরণ। এমনি সময়ে

জয় তারা! বলে হুংকার দিয়ে বিকটাকার এক সন্ন্যাসী রাজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। খালি গা, পরনে কপড়ি মাত্র, মাথায় জটা, কপালে সিঁদুর, গলায়-হাতে মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। ডান হাতে মস্ত বড়ো খাঁড়া কাঁধের ওপর রাখা। তাঁকে দেখে সভার সকলে ভয়ে চমকে উঠল। রাজা উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানালেন।

সন্ন্যাসী দূর থেকে তাঁকে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন, ভিক্ষাং দেহি।

সারদাচরণ বিনীতভাবে বললেন, ভিক্ষা বলবেন না, ঠাকুর। আদেশ করুন কী চান।

সন্ন্যাসী যেন জানতেনই রাজাকে কি বললে রাজা তার কি উত্তর দেবেন। তাই তাঁর উত্তরও তৈরি ছিল। হাত দিয়ে ঐ সব মাঠ দেখিয়ে বললেন, ঐ ভূমি আমায় দান করলে আমি যাগ-যজ্ঞ করতে পারি। আশ্রম তৈরি করে আমার বহু শিষ্যদের স্থায়ীভাবে এখানে নিয়ে এসে রাখতে পারি। তাতে তোমার রাজ্যেরই কল্যাণ হবে।

সারদাচরণ তাই হবে বলে নায়েবকে ডেকে জমির বিলি-ব্যবস্থা করে দিতে বললেন। আর সন্ন্যাসীর থাকার, সেবার আয়োজনও যাতে সেই দিন থেকেই শুরু হয় সেইরকম নির্দেশ দিলেন।

সন্ন্যাসী খুশি হয়ে রাজাকে আবার একদফা আশীর্বাদ করে রাজসভা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সন্ন্যাসী চলে গেলে সারদাচরণ জ্যোতিষীকে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন ব্যবস্থা করলাম? ভালোই বলো। সন্ন্যাসীর কী রকম চেহারা দেখেছ? খুব উঁচুদরের তান্ত্রিক বলে মনে হলো।

জ্যোতিষী চুপ করে রইলেন।

সারদাচরণ বললেন, আর ঐ মাঠ? শুধু শুধু পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছিল—

জ্যোতিষী বাধা দিয়ে বললেন, সে কী মহারাজ! কত গরিব চাষী আপনার ঐ জমিতে ফসল ফলিয়ে জীবনধারণ করছিল—তাদের মুখের অন্ন কেড়ে নিলেন?

তাঁর কাজের কেউ নিন্দে করলে সারদাচরণ সহ্য করতে পারতেন না। বিরক্ত হয়ে বললেন, চাষীদের পেট ভরানোর চেয়ে ঠাকুরমশাইয়ের আশীর্বাদ পাওয়া আমার ঢের লাভের। বুঝেছ? তাছাড়া রাজ্যের কল্যাণ—

জ্যোতিষী বললেন, আমি ভালোভাবেই বুঝেছি মহারাজ। তবু বলে যাচ্ছি, কাজটা ভালো হলো না। ফল অশুভ। বলে রাজসভা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সারদাচরণ তখনই আদেশ করলেন—এই জ্যোতিষী যেন কোনোদিন আর রাজসভায় ঢুকতে না পারে।

জ্যোতিষী চলে যেতেই যুবরাজ মঙ্গলাচরণও উঠে গেল। সারদাচরণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মনে হলো তাঁর ছেলেও তাঁর এই কাজ পছন্দ করছে না। রাগে মুখটা থম্‌থম্‌ করতে লাগল।

তারপরই শুরু হলো সন্ন্যাসীর কর্মযজ্ঞ। দশ দিনের মধ্যেই কোথা থেকে নিয়ে এলেন শ' দুয়েক শিষ্যাগরেদ। জমি দখল করে নিলেন। কিন্তু কাজটা খুব সহজে হয়নি। গরিব চাষীরা দলবদ্ধভাবে তাদের পেটের অন্ন যোগায় যে জমি তা রক্ষা করবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একদিকে স্বয়ং রাজার পাইক-বরকন্দাজ আর সন্ন্যাসী ঠাকুরের শিষ্যরা, অন্য দিকে চাষীরা। সন্ন্যাসী ঠাকুরের পাশে ছিল তাঁর প্রধান আর প্রিয় শিষ্য প্রলয়ানন্দ। বয়েস ত্রিশের মতো। বড়ো নিষ্ঠুর। সে নিজে খাঁড়া নিয়ে কত চাষীর মুণ্ড কাটল তার হিসেব নেই। চাষীরাও চুপ করে মার খেল না। তারা দলে দলে তীর-ধনুক নিয়ে সন্ন্যাসী নিধনে নেমে পড়ল।



সন্ন্যাসীরা সারা মাঠ জুড়ে যে সব আশ্রম তৈরি করেছিল, সব জ্বালিয়ে দিল চাষীরা। আর চাষীদের নিয়ে সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে যে যুবকটি লড়াই পরিচালনা করছিল, সে হচ্ছে মঙ্গলাচরণ। তারও বয়েস ত্রিশের মতো।

সারদাচরণ ভাবতেও পারেননি যে তাঁরই ছেলে এইভাবে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে। যখন জানতে পারলেন তখনই হুকুম দিলেন মঙ্গলকে বন্দী করো।

বরকন্দাজরা যখন মঙ্গলকে বন্দী করতে এল তখন দেখা গেল মাঠের মধ্যে মঙ্গল মুখোমুখি যুদ্ধ করছে প্রলয়ানন্দের সঙ্গে। প্রলয়ানন্দের হাতে খাঁড়া, মঙ্গলের হাতে তরোয়াল।

মঙ্গল তরোয়াল ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, এখন তোমরা আমার কাছে এগিও না। আগে একে বধ করি। তারপর—

এই পর্যন্ত বলে সদাশিব চুপ করেছিল। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর—

তারপরের কথা কেউ বলতে পারে না বাবুমশাই। শোনা যায় মঙ্গলকে বন্দী করে একটা মস্ত বড়ো কাঠের আলমারির মধ্যে আটকে রাখা হয়েছিল। এটা করা হয়েছিল স্বয়ং সারদাচরণের আদেশেই।

আমরা চমকে উঠলাম।

আলমারির মধ্যে যে খুলিটা রয়েছে সেটা তাহলে মঙ্গলাচরণেরই?

তাই সম্ভব।

আর সেই তাত্ত্বিক সন্ন্যাসী?

সদাশিব বলল, সন্ন্যাসীকে সবাই ঠাকুরবাবা বলত। ঘোর তাত্ত্বিক। এখানে এসেই কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে প্রতি অমাবস্যা় নরবলি দিয়েছেন। কাউকে ভয় করতেন না। কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত বাঁচেননি। চাষীরা তাঁর ঘরে আগুন দিয়ে তাঁকে পুড়িয়ে মারে।

সেই থেকে তাঁর অশান্ত আত্মা মাঝে মাঝেই দোঠেলা বাতাসে ভর করে সারা মাঠ দাপিয়ে বেড়ায়। কিছু যেন খোঁজেন।

বলে সদাশিব আবার প্রণাম করল।

কিন্তু এখন ঐ আলমারি আর খুলিটা নিয়ে আমরা কি করব? খুলিটা ফেলে দেব?

সদাশিব আংকে উঠে বলল, না-না, ওটা আপনারা ছোঁবেন না। আপনারা একদিন দুপুর রাতে মাঠের মধ্যখানে গিয়ে ঠাকুরবাবাকে একমনে ডাকুন। বলুন, ঠাকুরবাবা, আপনি যা চান তা দয়া করে নিয়ে গিয়ে আমাদের শান্তি দিন। আমরা নিরপরাধ।

সদাশিবের কথা মতো সেদিন রাত্তিরেই আমরা তিনজন সেই ধু-ধু মাঠের মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম। চারদিক থম্‌থম্‌ করছে। গোটা মাঠটাকে মনে হচ্ছিল যেন মরুভূমি।

জলধরই প্রার্থনা করল। তারপর আমরা ফিরে এলাম। সেই ঘরের আর আলমারির তালচাবি খুলে রেখে আমরা শুয়ে পড়লাম। রাত তখন একটা।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ ঝড়ের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি জলধবও উঠে বসেছে। ঝড় উঠেছে মাঠের দিকে। সেই সঙ্গে গুম্‌ গুম্‌ শব্দ।

শব্দটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে—এগিয়ে আসছে—

হঠাৎ শব্দটা থেমে গেল। তারপরই পরিষ্কার খড়মের শব্দ খট্—খট্—খট্—

শব্দটা বাড়ির নিচে পর্যন্ত এসেছে। আমরা ভয়ে কাঁঠ হয়ে বসে আছি। ওপরে উঠে

আসবে নাকি?

না, ওপরে এল না। খড়মের শব্দ যেন সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণ রুদ্ধ নিশ্বাসে আমরা মশারির মধ্যে বসে রইলাম। তারপর—

তারপরই হুড়মুড় করে ভীষণ একটা শব্দ.....কিছু যেন পড়ে ভেঙে গেল।

কী ঘটছে তা দেখতে যাবার সাহস আমাদের নেই। আমাদের তেমনিই বসে থাকতে হলো যতক্ষণ না সকাল হলো।

যথেষ্ট বেলা হলে আমরা নিচে গিয়ে দেখলাম, অতবড়ো আলমারিটা ভেঙে চুরমার হয়ে চারদিকে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে।

ভালো করে খুঁজে দেখলাম খুলিটা নেই।

যাক বাঁচা গেল। যে জন্যে এত কাণ্ড সেটা দূর হয়েছে। আলমারিটারও গতি হয়েছে আপনা থেকেই। আমরা নিশ্চিত হয়ে ওপরে এসে বসলাম।

জলধরের বাড়িতে আর উৎপাত হয়নি। তবে একটা ঘটনা আমাদের মনে থেকেই গেল। খুলিটা যখন মঙ্গলাচরণেরই তখন সেই খুলিটা উদ্ধারের জন্যে ঠাকুরবাবার এত চেষ্টা কেন? মঙ্গলাচরণ তো তাঁর শত্রুপক্ষের লোক!

এ রহস্যের মীমাংসা তখনই হয়নি। হয়েছিল আরও কয়েক মাস পরে।

রাজবাড়ির সেই পুরোহিত সদানন্দ ব্রহ্মচারী কাশী থেকে নবদ্বীপে ফিরে এসেছেন জেনে জলধর গেল দেখা করতে। সঙ্গে আমাকেও যেতে হলো।

সব শুনে বুদ্ধ সদানন্দ গভীর হয়ে গেলেন। বললেন, আমার ফেরা পর্যন্ত তোমার অপেক্ষা করা উচিত ছিল। আমি থাকলে ঐ আলমারি কখনো কিনতে দিতাম না। ঐ আলমারিটা ‘ব্যবহার নিষিদ্ধ’ তালিকায় রয়েছে।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটা সব শুনেছ তো?

জলধর তখন সদাশিবের বিবরণটা বলে গেল। সদানন্দ চোখ বুজিয়ে শুনে গেলেন। তারপর বললেন, সদাশিব যা বলেছে তা তার বাবার কাছে থেকে শোনা কথা। আর আমার কাছে আছে এই বংশের সমস্ত ঘটনাপঞ্জী। সদাশিবের অনেক কথাই ঠিক। শুধু একটাই ভুল। আলমারিতে আটকে রাখা হয়েছিল রাজকুমার মঙ্গলাচরণকে নয়, তান্ত্রিকের প্রধান আর প্রিয়তম শিষ্য প্রলয়ানন্দকে। কেউ বলে রাজার সেপাইরা ভুল করে মঙ্গলাচরণের বদলে প্রলয়ানন্দকে আলমারিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আবার কেউ বলে, ভুল নয়। ওরা মঙ্গলাচরণকে খুব ভালোবাসত। তাই ওকে ছেড়ে দিয়ে নিষ্ঠুর হৃদয়হীন প্রলয়ানন্দকেই আলমারির মধ্যে গুম করে রাখে। তবে তারপর থেকে মঙ্গলাচরণকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। রাজবংশের তালিকাতেও তাই বোধহয় মঙ্গলাচরণের নাম নেই।

আমরা ফিরে এলাম। এত দিনে পরিষ্কার হলো কেন সেই অশরীরী তান্ত্রিক হানা দিত এ বাড়িতে। সে বোধহয় মুগ্ধ করতে চাইত তার প্রিয় শিষ্য প্রলয়ানন্দের বন্ধ আত্মাকে।

# ডোডো

জীবনে সেদিন যে অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ঘটনাটা ঘটে গেল সেটা কিছুতেই আর ভুলতে পারছি না। কেবলই মনে হচ্ছে—এ কি কখনো সম্ভব? ডোডো কি এখনও আমাকে মনে রেখেছে?

আবার তখনই মনে হয়েছে—মনে না রাখবেই বা কেন? আমিই কি ভুলতে পেরেছি?

তখন আমি ইস্কুলে পড়ি। মফস্বল শহর। আমাদের বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে মিশনারি সাহেবদের বেশ বড়ো একটা হাসপাতাল ছিল। খাস ইউরোপীয়ান সাহেব ডাক্তাররা সপরিবারে সেখানে থাকত। ঐ সাহেবপল্লীটাকে এখানকার লোকে বলত মিশন। কারো বড় রকমের অসুখ করলে লোকে বলত—মিশন হাসপাতালে নিয়ে যাও। সেরে উঠবেই।

আমার বাবা ছিলেন নামকরা ডাক্তার। সেই সূত্রে হাসপাতালের সাহেব ডাক্তারদের সঙ্গে বেশ খাতির ছিল। তাঁরা প্রায়ই বড়দিনে, ইংরিজি নববর্ষে, ছেলেমেয়েদের জন্মদিনে আমাদের নেমন্তন্ন করতেন। বাবা-মার সঙ্গে আমিও ঘোড়ার গাড়ি চেপে সাহেবদের বাড়ি নেমন্তন্ন যেতে যেতাম। ওঁদের মধ্যে বাবার বেশি বন্ধুত্ব ছিল ম্যাকলার্ন সাহেবের সঙ্গে। মেমসাহেবও ছিলেন খুব মিষ্টকে। তিনি চাইতেন আমরা যেন প্রায়ই ওঁদের বাড়ি বেড়াতে যাই। সেইজন্যে বিশেষ বিশেষ দিন ছাড়াও আমরা ম্যাকলার্ন সাহেবের বাড়ি যেতাম।

এই বাড়িতেই ডোডোর সঙ্গে আমার ভাব হয়। আমারই বয়সী ডোডো। সাহেব-বাচ্চা। সাদা ধবধবে রঙ। কৌকড়ানো কটা চুল। চোখের মণি নীলচে। ভারি সুন্দর দেখতে। কিন্তু তাকে সবসময়ই কেমন যেন বিষণ্ণ মনে হতো।

পরে জেনেছিলাম—ডোডো ম্যাকলার্নদের নিজের কেউ নয়। ওঁদের কোনো আত্মীয়ের ছেলে। মা-বাপ মরে গিয়েছিল বলে ওকে এঁরা পালন করতেন।

ডোডোর সঙ্গে আমার এমন ভাব হয়ে গিয়েছিল যে প্রায়ই ওর কাছে যেতে ইচ্ছে করত। কিন্তু তখন আমি ছেলেমানুষ। একা যেতে পারতাম না। মা-বাবা যখন যেত শুধু তখনই ওর সঙ্গে দেখা হতো।

একদিন ওঁদের বাড়ি গিয়েছি। তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

—“গুড ইভনিং ডক্টর ম্যাকলার্ন!” বলে বাবা হাসতে হাসতে আমাদের নিয়ে ড্রয়িংরুমে ঢুকলেন। ম্যাকলার্ন সাহেবও তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে “গুড ইভনিং” বলে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন।

কিন্তু সেদিন ম্যাকলার্ন সাহেব কী একটা ব্যাপার নিয়ে হাসপাতালের হেড কম্পাউন্ডার চৌধুরী সাহেব আর অন্য কম্পাউন্ডারের সঙ্গে খুব বিরক্ত হয়ে কথা বলছিলেন।

আমরা গিয়ে পড়তে ম্যাকলার্ন সাহেব ওঁদের সরিয়ে দিয়ে বাবার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন।

ওঁরা বহুদিন বাংলাদেশে থাকতে থাকতে বাংলা কথা বুঝতে পারতেন। ভাঙা ভাঙা বাংলাতে কথাও বলতে পারতেন।

যাই হোক আমি ডোডোকে খুঁজছিলাম। বিরাট কম্পাউন্ডওলা বাড়ি। অনেক ঘর। তার সঙ্গে টানা হাসপাতাল। ও যে কোথায় আছে! খুঁজতে খুঁজতে বাগানের ধারে ছোটো ঘরটায় ওকে পেলাম। দেখি এই গরমেও ডোডো গলায় মাফলার জড়িয়ে চুপচাপ বসে আছে।

আমায় দেখে ও তো খুব খুশি। কিন্তু আমি খুশি হতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম—  
“তোমার কি অসুখ করেছে?”

ও বলল, “হ্যাঁ। টনসিল সেপটিক হয়ে গেছে। অপারেশন হবে।”

যদিও তখন শুনতাম টনসিল কাটানো খুব বিপজ্জনক ব্যাপার, তবু বন্ধুকে সাহস দিয়ে বললাম, “ভয় কী? বাড়িতে বড় বড় ডাক্তার—”

ডোডো স্নান হেসে বলল, “না, অপারেশনের জন্যে চিন্তা করছি না।”

—“তবে? এমন চুপচাপ বসে?”

ও হঠাৎ আমায় থামিয়ে দিয়ে কিছু একটা শোনার জন্যে কান পাতল।

ড্রয়িংরুমে তখন বাবার সঙ্গে ম্যাকলার্ন সাহেবের কথা হচ্ছিল। সাহেব বেশ উত্তেজিত হয়ে বলছিলেন—“হাসপাতাল থেকে প্রায়ই যদি এত দামী দামী ওষুধ চুরি যায় তাহলে আমার স্টেপ নেওয়া উচিত বলুন।”

বাবা বললেন, “আপনি কাউকে সন্দেহ করেন?”

—“সন্দেহ! না, এরা সবাই পুরনো লোক। শুধু শুধু কী করে সন্দেহ করি বলুন।”

ডোডো আমার দিকে ফিরে হাতটা ধরে বলল, “অপারেশনের জন্যে নয়, মনটা আমার খুব খারাপ হয়ে আছে বন্ধু।”

—“কেন?”

ডোডো তখনই কিছু বলল না। কী যেন ভাবতে লাগল। একটু পরে বলল, “কারো নামে লাগাতে নেই। ক্রাইস্ট তাতে দুঃখ পান। তবু আমার মনে হয়—যে দুষ্ট লোক—যে পরের ক্ষতি করে—যে চোর তাকে ধরিয়ে দিলে অন্যায় হবে না। ক্রাইস্ট নিশ্চয় আমায় ক্ষমা করবেন। তুমি কী বল?”

বললাম—“নিশ্চয়। কিন্তু....কিন্তু তুমি কার কথা বলছ?”

ও তখন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আমার হাতটা ধরে বলল—“ঐ যে শুনলে আংকেল ওষুধ চুরির কথা বলছিলেন। রোজ রোজ চুরি। চুরি করে সেই ওষুধ বাজারে বিক্রি করে দেয়।”

—“কে?” বোকার মতো জিজ্ঞেস করলাম।

ডোডো বললে, “চোর যে কে আংকেল তো ধরতে পারছেন না। সন্দেহ করছে কম্পাউন্ডারকেই। কিন্তু কম্পাউন্ডার তো অনেক জনই—মিস্টার চৌধুরী, মিস্টার মণ্ডল, মিস্টার বিশ্বাস, মিস্টার গুঁই—”

ডোডো একটু থামল। তারপর বলল, “তাছাড়া এখানকার যে হেড ক্লার্ক তাকেও আংকেলের সন্দেহ। কিন্তু, বন্ধু আমি জানি কে চোর।” বলে উত্তেজনায় আমার হাতটা চেপে ধরল।

—“তুমি জান!”

—“হ্যাঁ।”

—“তো আংকেলকে বলছ না কেন?”

—“কী করে বলব তাই ভাবছি, আর মনে মনে দুঃখ পাচ্ছি। সে মানুষটা খুবই পুরনো, আমাদের সকলেরই নিজের লোকের মতো। আমি তাকে খুবই শ্রদ্ধা করতাম।”

—“তুমি ঠিক জান, সেই চুরি করেছে?”

—“Yes!” খুব জোর দিয়ে কথাটা বলতে গিয়ে ও কেশে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গলার ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ল।

একটু সামলে নিয়ে বলল, “আজই দুপুর বেলা—একা একা হাসপাতালে ঘুরছি। ঘুরতে ঘুরতে ওষুধের ঘরের কাছে যেই এসেছি অমনি জানালার ফাঁক দিয়ে দেখি—”

কথা শেষ হলো না। হঠাৎ ডোডো চমকে উঠল—“Who is there? কে ওখানে?”

সঙ্গে সঙ্গে বাগানের দিকের জানালার পাশ থেকে কেউ চট করে সরে গেল।

আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভয়ে ভয়ে বললাম—“চোর?”

ডোডো বলল, “বোধহয়। আমাদের কথা শোনার চেষ্টা করছিল।”

একটু ভেবে বলল, “চলো, ভেতরে গিয়েই বসি।”

এর দু’দিন পরে ডোডোর টনসিল অপারেশান হলো। অপারেশান সফল হয়েছে। আমি তো মা-বাবাকে নিয়ে সেইদিনই বিকেলে ডোডোকে দেখতে গেলাম।

ডোডোর জ্ঞান ফিরেছে। ওর সর্বাস্র চাদর দিয়ে ঢাকা। ডোডো শুধু একবার তাকাল। সে চাউনি দেখে বুঝলাম ও চিনতে পেরেছে। কিন্তু কষ্ট লাগল যখন দেখলাম ওর হাত-পা লোহার খাটের সঙ্গে বাঁধা। নার্স বলল, “ও ভালোই আছে।”

পরের দিন বেলা তখন দশটা। ইস্কুল যাবার জন্যে রেডি হচ্ছি, বাবা শুকনো মুখে এসে দাঁড়ালেন। আমাকে আর মাকে একসঙ্গেই দুঃসংবাদটা দিলেন—ডোডো কাল গভীর রাত্তিরে মারা গেছে।

আজ এতকাল পরেও মনে আছে, আমি চিৎকার করে বলেছিলাম—“মারা যায়নি। ওকে মেরে ফেলা হয়েছে।”

বাবা আমাকে ধমকে উঠেছিলেন। বলেছিলেন—“পাগল নাকি? অত বড়ো হাসপাতাল। ম্যাকলার্ন সাহেবের বাড়ির লোক। মেরে ফেললেই হলো! আর কেনই বা মারবে?”

বাবাকে কিছু বলতে পারিনি। কিন্তু মাকে সব বলেছিলাম। ডোডো স্বচক্ষে চুরি করতে দেখেছিল। কিন্তু নাম বলবার আগেই ওকে থামতে হয়েছিল।

কিন্তু মাও সেদিন দশ বছরের ছেলের কথা বিশ্বাস করেনি। বলল, “তাছাড়া, কেউ খুন করেছে বুঝতে পারলে সাহেব ছেড়ে দিত?”

যুক্তি অবশ্য অকাটা। তারপর আর ও নিয়ে ভাবিনি।

কিন্তু অনেক পরে কলকাতার কর্মজীবনের মাঝে মাঝে যখন ডোডোর কথা মনে হতো তখনই ভাবতাম—সত্যিই কি ওর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল? না কি খুন করা হয়েছিল?

হ্যাঁ, সাহেবের বাড়ির কেস। খুন সন্দেহ হলে সহজে ছেড়ে দিত না ঠিকই। কিন্তু মনে রাখতে হবে—ডোডো ওঁদের নিজেদের কেউ ছিল না। সেজন্যে হয়তো যতটা তলিয়ে দেখা উচিত ছিল ততটা দেখেননি।

প্রায় চল্লিশ বছর পর আবার একদিন দেশে আসার সুযোগ হলো। সাহেবরা এখন আর নেই। তবে জায়গাটার নাম মিশন এখনও আছে। এখানে একটা ইস্কুল হয়েছে। সেই ইস্কুলে রবীন্দ্র জন্মোৎসব। আমায় সভাপতি হতে হয়েছে।

আমি যেতেই যিনি আমায় সাদর অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এলেন তাঁর বয়স প্রায়

আশি। সাদা ধবধবে চুল, চোখে পুরু লেন্সের চশমা। ইনি সেই চৌধুরী সাহেব যিনি হাসপাতালের হেড কম্পাউন্ডার ছিলেন। বর্তমানে তিনি এই স্কুলের প্রেসিডেন্ট। পুরনোদের মধ্যে সেই ক্লার্কবাবুটিও বেঁচে আছেন। তবে দুঃখের কথা—তাঁর ছেলেটি—তাকে অবশ্য চিনতাম না—একটা খুনের মামলায় জেল খাটছে।

খুনের কথা শুনেই মনটা আমার ছাঁৎ করে উঠল। ডোডোর কথা মনে পড়ে গেল। সে যাকে চুরি করতে দেখেছিল তার নামটা প্রকাশ করে যেতে পারেনি। তার আগেই মরতে হয়েছিল। সে কি তবে ঐ ক্লার্কবাবুরই কাজ? নইলে তাঁর ছেলে খুনী হয় কী করে?

সভা শেষ হতে রাত হয়ে গেল। খাওয়াদাওয়া করে যখন শুতে গেলাম রাত তখন দশটা বাজে।

আমার শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল ম্যাকলার্ন সাহেবের বাড়িতেই। বাড়িটা যদিও পুরনো তবু এই একটা ঘরই মোটামুটি ভালো ছিল। জানালা বা দরজায় কোনো খিল ছিল না, তবে দরজায় লোহার ছিটকিনিটা টিকে ছিল কোনোরকমে। যাক, তাই যথেষ্ট। বাড়িতে ইলেকট্রিকের কোনো ব্যাপার ছিল না। তবে উদ্যোক্তারা একটা লণ্ঠন দিয়ে গিয়েছিল। দরজায় ছিটকিনি এঁটে লণ্ঠনে তেল কতটা আছে দেখছি, কে যেন দরজায় শব্দ করল—ঠুক্-ঠুক্-ঠুক্।

বুকটা কেন কে জানে ধড়াস করে উঠল।

—“কে?”

—“শুয়ে পড়লেন নাকি?”

—“না। যাই।”

বলে উঠে দরজা খুলে দিলাম।

দেখি চৌধুরী সাহেব এক হাতে টর্চ অন্য হাতে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে।

—“আপনি আবার এত রাতে?”

উনি হাসলেন। বাঁধানো দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠল।

—“না, দেখতে এলাম কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা। বুঝতেই পারছেন প্রেসিডেন্টের অনেক দায়িত্ব।”

—“না-না কিছুমাত্র অসুবিধে নেই।”

—“বেশ। খুশি হলাম।” বৃদ্ধ চৌধুরী সাহেব আবার একটু হাসলেন।

—“ভয়টয় পাবেন না তো?”

আমি হেসে বললাম, “কিসের ভয়?”

—“এই আর কি—পুরনো বাড়ি তো!”

—“না চৌধুরী সাহেব, ভূতের ভয় আমি পাই না। তাছাড়া এ বাড়ি আমার চেনা। তবে যদি ডোডোর প্রেতাঙ্গা দেখা দেয়—”

এতকাল পরে ডোডোর কথা শুনে বৃদ্ধর মুখটা কিরকম হয়ে গেল। ঢোক গিলে বললেন, “ডোডোকে মনে আছে?”

—“নিশ্চয়। ওকে কি ভুলতে পারি? ঐ লম্বা ঘরটার একেবারে শেষ দিকের বেড়ে ও মারা গিয়েছিল না?”

—“হ্যাঁ।” বলেই বৃদ্ধ পিছু ফিরলেন। তারপর টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে রাস্তায় গিয়ে নামলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর লাঠির শব্দ শুনতে পেলাম—ঠুক্-ঠুক্-ঠুক্।

ঘুম আসছিল না। কেবলই ডোডোর কথা মনে হচ্ছিল। তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল, না তাকে খুন করা হয়েছিল? খুন করলে কে খুন করল? এ রহস্য তাহলে চিরদিনই অমীমাংসিত থেকে গেল। ভাবতে ভাবতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

তখন কত রাত জানি না। হঠাৎ মনে হলো ঘরের মধ্যে যেন একটা পাখি ক্রমাগত পাখা ঝাপটাচ্ছে। সেই শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো মাথাটা বেজায় ঘুরছে। শুধু মাথা ঘোরাই নয়, সেই সঙ্গে গলার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। আমি ঢোক পর্যন্ত গিলতে পারছি না। মনে হচ্ছিল কেউ যেন ছুরি দিয়ে গলাটার আধখানা কেটে দিয়েছে।

আমি ভয়ানক ভয় পেলাম। এ আমার কি হলো! শুধু তাই নয়, আমার মুখ দিয়ে অনর্গল লালা পড়ে জামা ভিজিয়ে দিচ্ছে। হাত দিয়ে মুছতে গেলাম। কিন্তু হাত তুলতে পারলাম না। দু' হাত লোহার খাটের সঙ্গে বাঁধা। শুধু হাত নয় সমস্ত চাদর ঢাকা শরীরটাই বাঁধা।

আমি আবার চমকে উঠলাম। মনে করতে চেষ্টা করলাম—এ অবস্থা কখন আমার হলো? কে করল?

কোনোরকমে চোখ মেলে তাকলাম। অন্ধ অন্ধ আলো। লক্ষ্য পড়ল দেওয়ালের দিকে। একেবারে সামনের দেওয়ালে গির্জার মতো একটা ঘড়ি। এমন ঘড়ি আমি কখনও দেখিনি। ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় রাত দুটো।

চোখ সরে গেল পাশের দেওয়ালে। সেখানে ঝুলছে পঞ্চম জর্জের ছবি। এ ছবি—এ ছবি যেন ছোটোবেলায় কোথায় দেখেছি।

কোনোরকমে ঘাড়টা একটু কাত করলাম। কিন্তু—ওরা কারা? ঐ যে একটু দূরে সার সার লোহার খাটে নিঃসাড়ে শুয়ে? সব যেন মৃত।

তবে কি হাসপাতালে রয়েছি?

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। নিরুপায় হয়ে এদিক-ওদিক দেখতে চেষ্টা করলাম। ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না। সব যেন ঝাপসা। না, কেউ নেই। না কোনো ডাক্তার, না কোনো নার্স।

...একটু জল খাওয়ার দরকার....নিদেন এক টুকরো বরফ। জিব শুকিয়ে যাচ্ছে।

এমনি সময়ে কে যেন সন্তর্পণে ঢুকল।

আঃ বাঁচলাম। তবু একজন জীবন্ত মানুষ।

কিন্তু ওকে ডাকব কী করে? আমি তো কথা বলতে পারছি না।

না, লোকটা আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। খুব যেন চেনা মনে হচ্ছে।.....একটু একটু করে চিনতে পারলাম। ঐকে অনেক বার ম্যাকলার্ন সাহেবের বাড়িতে দেখেছি। চৌধুরী সাহেব। হাসপাতালের হেড কম্পাউন্ডার।

তিনি কাছে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু হাতে ওটা কী? ইন্জেকশানের সিরিঞ্জ? কেন? ইন্জেকশান দেবেন?

চৌধুরী সাহেব কাছে এসে দাঁড়ালেন। বাঁধন খুলে আমার বাঁ হাতটা তুলে নিলেন। আমি যথাসম্ভব করুণ চোখে তাঁর দিকে তাকলাম। যেন বলতে চাইলাম—Please push slowly. দয়া করে আস্তে আস্তে দেবেন।

কিন্তু উনি যখন আমার হাতে হুঁচটা ফোটাচ্ছেন তখন তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেলাম। কী ভয়ঙ্কর সে দৃষ্টি!

বুঝতে পারলাম না উনি অমন করে আমাকে দেখছেন কেন?

সঙ্গে সঙ্গেই ছুঁচটা বিধিয়ে দিলেন। আর পা থেকে ঘাড় পর্যন্ত সমস্ত শিরাগুলো ঝনঝন করে উঠল।

তা-র-প-র—

তারপরের কথা আমি জানি না। পরে লোকমুখে যা শুনেছি তাই লিখছি।

তখন সবে সূর্য উঠবে উঠবে করছে—ইস্কুলের দারোয়ান দেখল প্রেসিডেন্টবাবু লাঠি হাতে ম্যাকসাহেবের বাড়ির দিকে যাচ্ছেন। এত ভোরে প্রেসিডেন্টবাবু বেরোন না। নিশ্চয় কোনো জরুরি দরকারে যাচ্ছেন বলে দারোয়ানও এগিয়ে গেল।

দারোয়ান দেখল যে ঘরে কলকাতার বাবুটি শুয়েছিল চৌধুরী সাহেব সেই ঘরের দরজায় কড়া নাড়ছেন আর বলছেন—“আর কত ঘুমোবেন মশাই? উঠুন। চা নিয়ে আসছে।”

দারোয়ান দূরে দাঁড়িয়ে দরজা খোলার শব্দ শুনল। তারপরেই কী হলো হঠাৎ চৌধুরী সাহেব ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন—“ডোডো—ডোডো—”

বলেই তিনি যেন প্রাণভয়ে ছুটতে লাগলেন।

দারোয়ান তো অবাক। চৌধুরী সাহেব ঘরের মধ্যে এমন কী দেখলেন যাতে এত ভয় পেয়ে গেলেন? ডোডোই বা কী জিনিস? আর বুড়ো মানুষটি যেভাবে ছুটছেন—

ভাবতে ভাবতে দারোয়ান দেখল চৌধুরী সাহেবের হাত থেকে লাঠিটা ছিটকে পড়ে গেল। কিন্তু তবু চৌধুরী সাহেব বাড়ির দিকে ছুটছেন। তাঁর সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে—চোখ-মুখ লাল।

—“বাবু, দাঁড়ান—বাবু, দাঁড়ান.....” বলতে বলতে দারোয়ান ছুটে গেল ওঁর কাছে। সেই সময়ে চৌধুরী সাহেবের একপাটি চটি খুলে গেল। আর তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়লেন রাস্তার ওপর।

সেই যে পড়লেন আর উঠলেন না।

ততক্ষণে ভিড় জমে গেছে। চৌধুরী সাহেবের বডিটা তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ওরা এসে দাঁড়াল ম্যাকসাহেবের বাড়িতে। এমন কী দেখে চৌধুরী সাহেবের মতো সাহসী পুরুষ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন?

না, ঘরের মধ্যে ভয় পাবার মতো কিছুই ছিল না। আমি যেমন ঘুমোছিলাম তেমনই ঘুমোচ্ছি।

ওরা খুব আশ্চর্য হলো। প্রথমত, দরজা খুলে দিল কে? দ্বিতীয়ত, আমাকে দেখে ভয় পাবার কী ছিল? তৃতীয়ত, কি ডোডো বলে যদি কারো প্রেতাঙ্কাকে তিনি দেখেই থাকেন তাহলে হঠাৎ আজ কেন? এ বাড়িতে তিনি তো এর আগে অনেকবারই একা একা এসেছেন।

এসব রহস্যের কোনো মীমাংসা আমিও করতে পারিনি। তবে চলে আসবার সময় ঐ ঘরের কোলঙ্গায় একটা জিনিস দেখে অবাক হয়েছিলাম। যখন ঘরে ঢুকেছিলাম যত দূর মনে আছে—কোলঙ্গায় ওটা ছিল না।

জিনিসটা আর কিছুই নয় একটা পুরনো ভাঙা ইন্জেকশানের সিরিঞ্জ।



## মড়ার খুলি ও মামা

আর একটু হলেই বুলুটা বাস চাপা পড়ত। এমন অসাবধানে রান্ধা পার হয়—

কথাটা বলল আমার ভাইঝি রীণা। বুলু ওর ক্লাসফ্রেন্ড। রীণার কাকু, কাজেই বুলুরও আমি কাকু। সম্প্রতি নেপাল ঘুরে এল। এখানে এসে এতক্ষণ বাড়ির সকলের কাছে নেপালের গল্প করছিল। আমি ছিলাম না। তাই আমার জন্যে একটুকরো স্লিপ রেখে গেছে।

স্লিপটা আমার হাতে দিতে দিতে রীণা গজগজ করল—এত অসাবধান মেয়েটা—এখুনি যে কী সর্বনাশ হত!

সে কথার উত্তর না দিয়ে আমি স্লিপটা পড়তে লাগলাম।

শ্রীচরণেশু কাকু,

নেপালে গিয়ে দুটো মজার জিনিস পেয়েছি। শীগিরি একদিন চলে আসুন।...

সেদিনই বিকেলে অফিস-ফেরত বুলুদের বাড়ি গেলাম। বাইরে-ঘরেই ওকে পাওয়া গেল। ও তখন নেপালের ওপর লেখা কয়েকটা বই থেকে কী সব নোট করছিল, আমায় দেখেই আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

তারপর একটুও দেরি না করে আমায় টেনে নিয়ে গিয়ে ওর কাচের আলমারির মধ্যে রাখা দুটো মজার জিনিসের একটা দেখাল।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম—এই তোমায় মজার জিনিস?

ও খুব হাসতে লাগল।

—মজার জিনিস নয়? এমন জিনিস ভূভারতে কোথাও আর পাবেন?

তা বটে। জিনিসটা আর কিছুই নয়, একটা মড়ার খুলি। মড়ার খুলি তো অনেক দেখেছি কিন্তু এত ছোটো খুলি কখনো চোখে পড়েনি। খুলিটা স্বচ্ছন্দে হাতের মুঠোয় ধরা যায়।

—কেমন? মজার জিনিস নয়? বলে বুলু আবার হাসতে লাগল।

—মজার কিনা জানি না, তবে অদ্ভুত।

এমনি সময়ে বুলুর মা চা জলখাবার নিয়ে ঢুকলেন।

—দেখুন দিকি মেয়ের কী অনাসৃষ্টি কাণ্ড! শাড়ি গেল, ইম্পোরটেড ছাতা গেল, ক্যামেরা গেল—শেষ পর্যন্ত এই মড়ার খুলিটা ফুটপাথ থেকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনে আনল। আর তারপরেই কী বিপদ শুনেছেন তো? কাঠমাণ্ডু থেকে দক্ষিণা কালী দেখতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে একেবারে খাদে পড়ে যাচ্ছিল।

বুলুকে জিজ্ঞেস করলাম—এটা তো তোমার এক নম্বর মজার জিনিস, দু নম্বরটি?

বুলু মুচকে একটু হাসল। বলল, সেটা আজ দেখানো যাবে না, যে কোনো মঙ্গল কি শুক্লরবারে আসবেন।

বুলুর এই দু নম্বর মজার জিনিসটি যে আরো কত অদ্ভুত হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না।

মঙ্গল কি শুকুরবার মনে নেই। একদিন সন্ধ্যের সময়ে বুলুদের বাড়ি গিয়ে দরজায় কলিংবেল টিপলাম। কিন্তু তখনই কেউ দরজা খুলে দিল না। এরকম বড়ো একটা হয় না। শেষে বার তিনেক বেল টেপার পর—ওদের বাড়ি যে বুড়িমানুষটি কাজ করে—সে দরজা খুলে দিল।

কিন্তু ভেতরে ঢুকেই হতাশ হয়ে গেলাম। বুঝলাম বুলু নেই, বুলুর মাও নেই।

বুড়িকে জিজ্ঞেস করলাম—কেউ নেই?

ও মাথা দুলিয়ে জানাল আছে। বলে বাইরে-ঘরের পর্দা-ফেলা দরজাটা দেখিয়ে দিল।

যাক্, বুলু তা হলে আছে। মনে করে পর্দা সরিয়ে বসার ঘরে ঢুকতেই থমকে গেলাম।

না, বুলু নয়। কেউ একজন কোচে গা এলিয়ে সামনের সেন্টার টেবিলের ওপর দু পা তুলে বসে আছেন। পরনে ধবধবে পা-জামা, গায়ে গিলে করা আদির পাঞ্জাবি।

ইনি যে কে তা বোঝার উপায় নেই। কেননা তিনি একখানা খবরের কাগজ মুখের ওপর আড়াল করে রয়েছেন।

কি করব ভেবে না পেয়ে জুতোর শব্দ করে সামনের কোচটা একটু টেনে নিয়ে বসলাম। কিন্তু ভদ্রলোক কাগজ সরিয়ে একবার দেখলেনও না। এমনকি শ্রীচরণ দুখানিও আমার মুখের সামনে থেকে নামালেন না।

খুবই বিশ্রী লাগছিল। একবার ভাবলাম উঠে চলে যাই। কিন্তু এই অতি অদ্ভুত, অদৃষ্টপূর্ব অভদ্র লোকটিকে ভালো করে না জেনেও যেতে ইচ্ছে করছিল না। অগত্যা একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম।

এমনি কতক্ষণ গেল, হঠাৎ চমকে উঠলাম।

—আরে! ওটা কি?

ভদ্রলোকের কোচের একপাশে কোনোরকমে একটা ম্যাগাজিন চাপা দেওয়া সেই মড়ার খুলিটা না?

ভালো করে দেখতে গিয়ে সেন্টার টেবিলটা নড়ে গেল। একটা বই পড়ে গেল। আর ঠিক তখনই—আঃ! কী সৌভাগ্য আমার! ভদ্রলোক কাগজখানি মুখের সামনে থেকে সরালেন। অমনি তাঁর শ্রীচরণের মতো শ্রীমুখখানিও দেখতে পেলাম। ছুঁচলো মুখ। মাথাটা মুখের তুলনায় বড়ো। অনেকটা নারকেলের মতো। রুক্ষ চুলগুলো সেই মাথার ওপর ফেঁপে ফুলে উঠেছে। কিন্তু সরু গোঁফ-জোড়ার ভারি বাহার!

এও সহ্য করা যায়—কিন্তু এই রাস্তিরে কেউ যে কালো সানগ্লাস পরে থাকতে পারে তা যেন ভাবাই যায় না।

যাই হোক, ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর গলায় যে রুদ্রাক্ষের মালা ছিল এটা এতক্ষণ নজরে আসেনি। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সামনে যে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন, সেদিকে লক্ষ্যমাত্র না করে ম্যাগাজিনের তলা থেকে খুলিটা নিয়ে বুলুর সেই আলমারিতে রেখে এলেন। যেন তিনি খুলিটা ভালো করে দেখতে নিয়েছিলেন, দেখার পর রেখে দিলেন আর কি!

বুলু কি আলমারিতে চাবি লাগিয়ে যায়নি? নাকি ওটা খোলাই থাকে?

জানি না।

ভদ্রলোক আবার নিজের জায়গায় গিয়ে মুখের ওপর কাগজ আড়াল করে বসলেন। আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম—বুলু কখন আসবে বলতে পারেন? উত্তরে একটা গম্ভীর স্বর গলার মধ্যে ঘড় ঘড় করে উঠল—মিনিট তেরোর মধ্যে। ও বাবা! ইনি যে আবার মিনিট সেকেন্ড ধরে কথা বলেন! দশ মিনিটও নয়, পনেরো মিনিটও নয়—একেবারে তেরো মিনিট!

জিজ্ঞেস করলাম—ওর সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছে?

—না।

দেখা হয়নি, বুলু কোথায় গেছে তাও বোধহয় জানেন না। অথচ তিনি বলতে পারেন—তেরো মিনিট পরে আসবে!

কত রকমের স্কু-টিলে মানুষই না আছে!

একটু পরে উনিই আবার কথা বললেন—হ্যাঁ, আর আট মিনিটের মধ্যে ওর এসে পড়া উচিত যদি না কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়।

—অ্যাকসিডেন্ট!

—হ্যাঁ। মানে দুর্ঘটনা।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি অ্যাকসিডেন্টের ভয় পাচ্ছেন কেন?

উনি তেমনি করেই উত্তর দিলেন, অ্যাকসিডেন্টকে ও ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে এনেছে।

কিছু বুঝতে না পারলেও রীণার সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের বাড়ি থেকে ফেরার পথে নাকি বাস চাপা পড়ছিল।

এমনি সময়ে কলিংবেল বাজল। তারপর আধ মিনিটের মধ্যে বুলু হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল। —ও মা, কাকু! কতক্ষণ এসেছেন?

আমি উত্তর দেবার আগেই ভদ্রলোক হঠাৎই উঠে পড়লেন।

বুলু বললে, এ কি মামা, এখনি উঠছেন?

—হ্যাঁ। তুমি একটু শুনে যেও।

বলে সামান্যতম ভদ্রতাটুকুও না দেখিয়ে প্রায় আমার গায়ে ধাক্কা দিয়ে চলে গেলেন।

বুলু ওঁকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে এল। মুখটা থমথম করছে। একটু চুপ করে থেকে বলল, উনি হঠাৎ অমন করে চলে গেলেন কেন বুঝলাম না। আপনার সঙ্গে বোধহয় ভালো করে কথাও বলেননি?

আমি একটু হাসলাম।

—যাবার সময়ে আমাকে বললেন কি জানেন? বললেন, হয় ঐ খুলিটা এ ঘর থেকে সরাও, নয় যার তার এ ঘরে ঢোকা বন্ধ করো। কথার মানে বুঝেছেন তো কাকু?

আমি আবার শুধু হাসলাম।

এই হচ্ছে নাকি বুলুর দু নম্বর মজার জিনিস—বুলুর নতুন পাতানো মামা!

মামাটির সঙ্গে বুলুর আলাপ হয় নেপালের কাঠমাণ্ডুর একটা হোটেলে। তিনি বাঙালী। কলকাতাতেও যেমন তাঁর একটা আস্তানা আছে তেমনি আছে কাঠমাণ্ডুতেও। কিন্তু কাঠমাণ্ডুতে কোথায় যে পাকাপাকিভাবে থাকেন, কি করেন তা কেউ জানে না। মাঝে মাঝে এই হোটেলে তাঁর দেখা পাওয়া যায়। এখানে তাঁর পরিচয় একজন জ্যোতিষী বলে। মুখ দেখেই তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান বলে দিতে পারেন।

এই সূত্রেই বুলুর সঙ্গে তাঁর আলাপ। হোটেলের সবাই ভিড় করে আসে তাঁর ঘরে। শুধু বুলুই যায় না। সে এসব মোটে বিশ্বাস করে না। কিন্তু বুলু না গেলে কি হবে—ভদ্রলোক নিজেই একদিন ডাকলেন—ও মামণি! শোনো শোনো।

অগত্যা বুলুকে ঢুকতে হয়েছিল ওঁর ঘরে।

—সবাই আসে, শুধু তুমিই আস না।

বুলু হেসে বলেছিল—আমি ওসব বিশ্বাস করি না।

ভদ্রলোক একটু হেসেছিলেন।

সেদিন ঐ পর্যন্ত।

এরপর একদিন ভদ্রলোক বুলুকে একেবারে তাজ্জব করে দিলেন যখন বললেন, তোমার বাবার জন্যে কিছু ভেব না। তিনি ভালো আছেন। এই মাসের শেষেই তিনি ফিরে আসছেন।

বুলুর বাবা লিবিয়াতে চাকরি নিয়ে গিয়েছিলেন। অবাক কাণ্ড—নেপালে আসার ঠিক আগের দিনই বুলুরা চিঠি পেয়েছিল—তিনি ফিরছেন।

এত বড়ো ভবিষ্যৎ বাণীর পর আর কি ঠিক থাকা যায়! বরফ গলল। বুলু দারুণ বিশ্বাসী হয়ে গেল। ভদ্রলোককে ‘মামা’ বলে ডাকতে লাগল।

কিন্তু অবাক হবার ব্যাপার তখনো বাকি ছিল।

নেপাল থেকে ফেরার আগের দিন।

সন্ধ্যার পর বুলুরা দক্ষিণাকালী দেখে হোটেলে ফিরল। দক্ষিণাকালী মন্দির কাঠমাণ্ডু থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দূরে। অনেক পাহাড়, খাদ পেরিয়ে তবে যেতে হয়। মন্দিরটা একটা পাহাড়ের নীচে। নামতে হয় অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে। ঐরকম পরিবেশেই বুঝি কালীকে মানায়। প্রকৃতির কোলে নিস্তরঙ্গ, নিবুম পরিবেশটি।

যাই হোক, বুলু ফিরেই তার এই নতুন মামাটির সঙ্গে দেখা করল। হাসতে হাসতে ব্যাগ খুলে কাগজে মোড়া একটা জিনিস বের করে তাঁর হাতে দিয়ে বলল, দেখুন তো মামা জিনিসটা কেমন হলো?

জিনিস দেখে তো মামা হতভম্ব!

—এটা তুমি কোথায় পেলে?

বুলু বলল, একজন পাহাড়ীর কাছ থেকে কিনলাম দক্ষিণাকালীর মন্দিরের কাছে।

মামা অনেকক্ষণ ধরে সেই ছোট্ট খুলিটা পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর বললেন, এ যে বড়ো ভয়ঙ্কর জিনিস। এ নিয়ে তুমি কি করবে মা?

বুলু তাড়াতাড়ি তাঁর হাত থেকে খুলিটা নিয়ে বলল, আলমারিতে সাজিয়ে রাখব।

মামা ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ বুলুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, কাজটা কি ভালো হবে? ও যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেওয়াই উচিত।

এই পর্যন্ত বলে তিনি একটু থামলেন। তারপর বললেন, আমি শীগগিরই ওখানে যাব। ইচ্ছে করলে আমায় দিতে পার। যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেব। দামটা না হয় এখনি তোমায় দিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু বুলু রাজী হয়নি।

তখন উনি বললেন, আমার কথা তোমার মাকে বোলো। তিনি কী বলেন আমায় জানিও।

বুলু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করল—কেন? এটা যদি রাখি তা হলে কি হবে?

—বিপদ অনিবার্য। কেন? আজ ওটা কেনার পর তোমার কি কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি?

এবার বুলুর মুখ শুকিয়ে গেল। মনে পড়ল দক্ষিণাকালী দেখতে যাবার সময়ে তিনতলা সমান উঁচু সিঁড়ি থেকে পা স্লিপ করে খাদে পড়ে যাচ্ছিল! খুব বেঁচে গেছে।

এই বিচিত্র মাথাটির সম্বন্ধে বুলু আগে কিছু খবর পেয়েছিল কাঠমাণ্ডু থেকে চলে আসার দিন হোটেলের নেপালী চাকরটির কাছ থেকে। তাকে খাবার সময়ে বখশিস দিতে কথায় কথায় ও হিন্দিতে জানায় যে ঐ লোকটি ‘ভয়ঙ্কর দেবতা আছেন’। তিনি নাকি নেপালের জাগ্রত দেবতা কালভৈরবের সাধক। কালভৈরব হচ্ছেন মৃত্যুর দেবতা। বিকট চেহারা। কুচকুচে কালো রঙ। তাঁর গলায় মুণ্ডমালা—বীভৎস মুখের হাঁয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর হিংস্র জন্তুর মতো ধারালো দাঁত বেরিয়ে এসেছে।

নেপালীটা জানাল, ঐ দেবতাকে খুশি করে ইনি প্রচণ্ড ক্ষমতা পেয়েছেন। ইচ্ছে করলেই যে কোনো লোকের ক্ষতি করে দিতে পারেন। ভয়ে হোটেলের ম্যানেজার ওঁর কাছ থেকে একটি টাকাও নেন না। উপরন্তু খাতির করেন।

এই হলো বুলুর মামার পরিচয়। বুলুরা তো কলকাতা চলে এল। তারপর হঠাৎই একদিন সন্ধ্যাবেলা সেই মামা বুলুদের বাড়ি এসে হাজির।

জিজ্ঞেস করলাম—ঠিকানা দিয়েছিলে?

বুলু একটু ভেবে বলল, ঠিক মনে নেই। নিশ্চয় দিয়েছিলাম। নইলে উনি এলেন কি করে?

তারপর থেকে প্রায় সপ্তাহে দুদিন করে আসেন। গল্প করেন, চলে যান।

—কোথায় যান?

—ঠাকুরপুকুরের কাছে কবরডাঙা বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে ওঁদের পুরনো বাড়ি। কলকাতায় এলে একাই থাকেন। সবই কেমন রহস্যময়। বলি বটে, এই মামাটি মজার জিনিস। কিন্তু সত্যি বলছি কাকু, মাঝে মাঝে কেমন ভয়ও করে। লোকটার কাছ থেকে রেহাই পেলে বাঁচি।

—খুলিটার কথা উনি জিজ্ঞেস করেন?

বুলু মাথা নাড়ল। —না এখানে এসে পর্যন্ত খুলির কথা বলেননি।

এই পর্যন্ত বলে বুলু ভুল শুধরে বলল—হ্যাঁ, একদিনই বলেছিলেন। সেই যে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

আমি হাসলাম। বললাম, হ্যাঁ, পাছে আমি চুরি করে নিই!

বুলু লজ্জায় জিব কাটল।—ইস!

তবু সেদিন যে খুলিটা তিনি আলমারি থেকে বের করে আমার পায়ের শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি ম্যাগাজিন চাপা দিয়ে রেখেছিলেন সে কথাটা বুলুকে আর বললাম না।

এই মামা লোকটিকে প্রথম দিন থেকেই আমার ভালো লাগেনি। শুধু অভদ্র বলেই নয়, লোকটি মতলববাজ। নেপালে না গেলেও জানি—এইরকম এক ধরনের তান্ত্রিক আছে যারা নিজের সিদ্ধির জন্যে সবরকম অপকর্ম করতে পারে। এ বাড়িতে তাঁর আসার উদ্দেশ্য অস্তুত আমার কাছে পরিষ্কার! সেই সঙ্গে বুলুও যে কী মারাত্মক ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছে তাও আমার জানা। শুধু বুলুই নয়, আমিও লোকটির বিষমজরে পড়েছি। তাই বুলুর মনে আমাকে চোর বলে সন্দেহ ধরিয়ে দিতেও চেষ্টা করেছে। এরপর হয়তো আমার জীবনও বিপন্ন হতে পারে।

অপরাধ? অপরাধ—খুলি চুরি করার ওঁর চেষ্ঠা আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে।

সে যাই হোক, বুলুকে এখন ঐ ভদ্রবেশী তান্ত্রিকের হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

কিন্তু—কি করে? আমি যা ভাবছি তা যদি বুলুকে বলি তাহলে সে বিশ্বাস নাও করতে পারে। উশ্টে আমার ওপর ধারণা খারাপ হবে।

আর যদি বিশ্বাস করেও, একজন ভদ্রলোককে কি সরাসরি বাড়ি আসতে বারণ করতে পারে?

বারণ করলেই কি উনি শুনবেন? ঐ খুলিটা যে ওঁর চাই-ই।

দিন পনেরো পর।

অফিস থেকে সব ফিরেছি। হঠাৎ বুলু এসে হাজির। তার উদ্ভাস্ত ভাব দেখে চমকে উঠলাম।—কী হয়েছে?

—আজ দুপুরে আমাদের বাড়িতে চোর এসেছিল। আমরা কেউ ছিলাম না। আর সেই সময়ে—

—কেন? সেই বুড়ি কাজের লোকটি?

—বলছি দাঁড়ান, আগে একটু বসি।

ইতিমধ্যে রীণা, রীণার মাও এসে পড়েছেন।

—রীণা, একটু জল দে তো!

রীণা তাড়াতাড়ি জল এনে দিল। জল খেয়ে রুমালে মুখ মুছে বুলু বলল, অন্য দিনের মতোই বুড়িটা দুপুরে ঘুমোচ্ছিল। আজ আবার দুপুরে এদিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। কাজেই আরামেই ঘুমোচ্ছিল। কখন থেকে যে কলিংবেলটা বেজে যাচ্ছিল তা সে শুনতে পায়নি। যখন শুনল ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলে দিল। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। তখন বুড়ি আবার গিয়ে শুল। একটু পরে আবার বেল বাজল, বুড়ি আবার উঠে দরজা খুলল। কিন্তু এবারও কাউকে দেখতে পেল না। এমনি করে তিন তিন বার। বুড়ি বুঝল এ নিশ্চয় কোনো দুষ্ট ছেলের কাজ। তাই চার বারের বার বুড়ি রেগে রাস্তায় নেমে দুষ্ট ছেলে ধরবার জন্যে এদিক ওদিক খুঁজতে লাগল। কিন্তু কারো টিকিটুকুও দেখতে পেল না। তখন ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়ল।

এই পর্যন্ত বলে বুলু থামল।

বললাম, কিন্তু চোর এসেছিল কি করে বুঝলে? দুষ্ট ছেলের কাজও তো হতে পারে।

—তা হতে পারে। তবু—

বুলু কি ভাবতে লাগল।

তারপর যেন আপন মনেই বলল, আমার কেমন ভালো ঠেকছে না। চোর এসেছিল বলেই আমার সন্দেহ। তা ছাড়া—

বললাম—থামলে কেন?

—না, তেমন কিছু নয়, তবু বলছি, বিকেলে বাড়ি ফিরে এসে দেখি চৌকাঠে জুতোর কাদা।

আমি চমকে উঠলাম। সে ভাব গোপন করে বললাম, কাদা আগে ছিল না?

বুলু মনে করবার চেষ্ঠা করে বলল—তা হলে নিশ্চয় আমার চোখে পড়ত। তা ছাড়া

কাদা আসবে কোথেকে? বৃষ্টি তো হলো দুপুরে।

—রাইট! বলে বুলুর পিঠ চাপড়ালাম।

—যাই হোক, কিন্তু চুরি যায়নি তো?

—না! এইটুকুই রেহাই।

—ঠিক জান কিছু চুরি যায়নি?

বুলু হেসে বলল, ঘরে ঢুকে এক নজর দেখে কিছু চুরি গেছে বলে তো মনে হলো না।

—চলো, এখনি তোমার বাড়ি যাব।

বলে তখনই গায়ে হাওয়াই শাটটা চড়িয়ে বুলুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ওদের বাড়ি ঢুকেই চলে এলাম ওদের বাইরে-ঘরে। বুলুকে বললাম, তোমার আলমারিটা খোলো।

বুলু চাবি বের করে লাগাতে গেল কিন্তু তার দরকার ছিল না। আলমারিটা খোলাই ছিল। ভেতরে সেই খুলিটা নেই।

সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে পড়লাম।

বুলু ব্যাকুল হয়ে পিছু ডাকল—কোথায় যাচ্ছেন?

বললাম, কবরডাঙায় তোমার ঐ ভণ্ড মামার আস্তানায়।

ও প্রায় কেঁদে উঠল—না-না, এই সন্ধ্যাবেলা যাবেন না।

কিন্তু আমার তখন জেদ—ওটা উদ্ধার করে লোকটাকে পুলিশে দিতেই হবে।

ঠাকুরপুকুরের এদিকটায় কখনো আসিনি। দুধারে মাঠ, কোথাও বা রীতিমতো জঙ্গল। কবরডাঙা। জায়গাটা রীতিমতো গ্রাম। তবু রাস্তাটা পিচঢালা। বাস চলে। মাঝে মাঝে লরিও যায়। এখানে পুরনো বাড়ি কি আছে জিজ্ঞেস করতেই একটা লোক মাঠের ওপর বিরাট দোতলা ভাঙা বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, ভূতের বাড়ি তো?

হ্যাঁ, বলে মাঠে নেমে পড়লাম। লোকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দূর থেকে বাড়িটাকে দেখে মনে ইচ্ছিল প্রেতপুরী। ইট খসে পড়ছে। আলসের মধ্যে দিয়ে উঠেছে অশ্বখের চারা। ঢুকে পড়লাম সেই বাড়িতে। অন্ধকার। চারিদিক থমথম করছে। তারই মধ্যে—হঠাৎ মনে হলো যেন দুটো জ্বলজ্বলে চোখ! থমকে গেলাম।

না, একটা কুকুর। কুকুরটা আমায় দেখে পালাল।

সামনেই সিঁড়ি। টর্চও সঙ্গে করে আনি। দেশলাই জ্বালতে জ্বালতে দোতলায় উঠে এলাম। একটা ঘর। বোধ হয় এই একটি মাত্র ঘরেই দরজা জানলা আছে। ঢুকে পড়লাম। দড়িতে ঝুলছে একটা লুঙ্গি, একটা ফর্সা পাজামা, একটা পাঞ্জাবি। সামনে কালো কাপড় ঢাকা—ওটা কি?

ভালো করে দেখলাম। ওটা একটা তে-পায়া। চমকে উঠলাম। এইরকম তে-পায়াতেই তো প্রেতাঙ্গা নামানো হয়। মামা কি তা হলে—

কিন্তু—আসল জিনিসটি কোথায়? মামাই বা কোথায়?

আবার দেশলাই জ্বাললাম। লক্ষ্য পড়ল কুলুঙ্গিতে। একটি তামার পাত্রে সেই ছোট্ট মড়ার খুলিটি!

আমি মরিয়া হয়ে খুলিটা তুলে নিয়ে পকেটে পুরলাম। তারপর এক ছুটে নীচে। সামনেই

সেই মাঠ। মাঠের পরেই পিচঢালা রাস্তা। পাছে দৌড়লে কারো নজরে পড়ি তাই জোরে হাঁটতে লাগলাম। নিশ্বাস বন্ধ করে হাঁটছি। চারিদিকে অন্ধকার—শুধু অন্ধকার!

হঠাৎ আমার মনে হলো, এই নির্জন মাঠে আমি আর একা নই। কেউ যেন পিছনে রয়েছে।

...হ্যাঁ, স্পষ্ট বুঝতে পারছি পিছনের মানুষটি এসে পড়েছে। ...আমি দৌড়তে লাগলাম। কিন্তু পারলাম না। পিছনের লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। আমি হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। সে অমনি আমাকে জাপটে ধরল। উঃ, কী কঠিন সে হাত দুটো। সে স্বচ্ছন্দে আমার পকেট থেকে খুলিটা বের করে নিল। তারপর আমার গলা টিপে ধরল। ...মৃত্যু নিশ্চিত জেনে আমি প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করলাম। এক মুহূর্তের জন্যে ওর হাতটা টিলে হয়ে গেল। অমনি কোনোরকমে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ছুটলাম রাস্তার দিকে। সেও ছুটে আসছে আমার পিছনে।

রাস্তায় লরির হেডলাইট...তবু আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম রাস্তায়। লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিল।

লরিটা দূরস্ত গতিতে বেরিয়ে গেল।

ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম—নাঃ, আমি বেঁচে আছি। কিন্তু রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে ওটা কি?

কিন্তু সেদিকে মন দেবার মতো অবস্থা তখন ছিল না। হাঁটতে লাগলাম ডায়মন্ডহারবার রোডের দিকে।

পরের দিন সকালে বুলুদের বাড়ি চা খেতে খেতে সমস্ত ঘটনা বললাম। কাগজেও ঐ অঞ্চলে লরিচাপা পড়ে একটি মৃত্যুর খবর বেরিয়েছে।

বুলু বলল, আপনি খুব বেঁচে গেছেন কাকু! ভাগ্যি খুলিটা তখন আপনার কাছে ছিল না।

আমি হেসে বললাম, আর লরির চাকার নীচে খুলিটারও সদ্যাবহার হয়ে গেল।

বুলু একটু হাসল। তারপর বলল, কিন্তু আশ্চর্য এই যে—লোকটার যে বর্ণনা কাগজে রয়েছে তার সঙ্গে আমার চেহারা মেলে না।

আমি বললাম, তা জানি। ওটি আমার সাকরেন্দ। মামা কিন্তু রইলেন বহাল তব্বিতে। হয়তো আবার আসবেন।

বুলু শিউরে উঠল।



# খুনী

দেবব্রত চৌধুরী মানুষটি এতই নিরীহ ভালোমানুষ যে বাইরের লোক আড়ালে আর তাঁর ছেলেমেয়েরা মুখের সামনেই ‘ভীতু’ বলে হাসাহাসি করে। দেবব্রতবাবুর অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না। নিজের কাজটুকু নিয়মমতো মুখ বুজে করেই তাঁর শান্তি। নিজের কাজ মানে অফিস ছাড়া জপ-তপ, সন্ধ্যা-আহ্নিক ইত্যাদি। আর ছোট্ট বাগানটির দিকে সকাল-সন্ধ্যা নজর রাখা।

বীরভূম জেলায় বোলপুরের কাছে ঐর আদি বাড়ি। সেখানকার ইস্কুল থেকে ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করে সেই যে কলকাতায় এসে পড়াশোনা আরম্ভ করেন সেই থেকেই তিনি একেবারে কলকাতার মানুষ হয়ে গেছেন। সায়েন্স নিয়ে তিনি কলেজে পড়েন। উঠতি বয়সে—বোধহয় সায়েন্স পড়ার গুণেই খুব বিজ্ঞানভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। ফলে কোনো সংস্কার, অলৌকিক ঘটনা, তাগা-তাবিজ-মাদুলির গুণাবলী নস্যাৎ করে দিতেন। এই নিয়ে হোস্টেলের ছেলেদের সঙ্গে তাঁর প্রায় রোজই তর্ক বাধত।

মানুষের জীবনে কত আশ্চর্য পরিবর্তনই না ঘটে। সেই তार्কিক মানুষই এখন রিটারার করার মুখে ঠাকুর-দেবতা, জপ-তপ, সন্ধ্যা-আহ্নিক সবই করেন। আর এতে পরম শান্তি পান। মাঝখানে তো তাঁর এক অদ্ভুত খেয়াল হয়েছিল—পরলোকচর্চা। মৃত্যুর পর মানুষ—অর্থাৎ মানুষের আত্মা কোথায় যায়—কি বা তার পরিণতি—এসব তত্ত্ব জানার জন্যে তিনি দেশী-বিদেশী অনেক বইও পড়ে ফেলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্ল্যানচেট পর্যন্ত করতেন। প্ল্যানচেটে আত্মাকে ডেকে কিছু কিছু প্রশ্নও করতেন। পরে অবশ্য স্ত্রী অপছন্দ করায় বাধ্য হয়ে প্ল্যানচেট করা ছেড়ে দেন।

এখন তাই বড়ো বড়ো ছেলেমেয়েরা যখন হাসতে হাসতে তাঁকে বলে, ‘বাবা, তুমি এক নম্বর ভীতু’ তখন তিনি গম্ভীর হয়ে যান।

তাঁকে ভীতু বলার যেটা সবচেয়ে বড়ো কারণ সেটা হচ্ছে—তিনি বাড়ি করলেন কলকাতার একপ্রান্তে এমন জায়গায় যেখানে ট্রামবাসের শব্দটুকুও শোনা যায় না।

এমন জায়গায় বাড়ি করলেন কেন? প্রপার কলকাতায় ভালো জায়গা পাননি? তা নয়, আসলে সেই উনিশ শো ছেচল্লিশ সাল থেকে মধ্য কলকাতায় থাকার সময়ে এত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ট্রাম-বাস পোড়ানো, পুলিশের নির্মম গুলি চালানো, খুন-খারাপি, অ্যান্ড্রিডেট দেখেছেন যে এখন তিনি আর সেসব সহ্য করতে পারেন না। আর ওসব ব্যাপার তো থেমে যায়নি। বরঞ্চ এখন যেন বেড়েই চলেছে। কাজেই এই নিরিবিলা জায়গা বেছে নিয়েছেন।

—অথচ এই তুমিই নাকি প্ল্যানচেট করতে? প্রশ্ন করে এম. এ পাস বড়ো মেয়ে।

—হ্যাঁ, তা করতাম।

—তখন ভয় করত না?

—না, ‘ভয়’ বলে জিনিসটা আমার কোনোদিন ছিল না। আজও নেই। তবে ঐ সব দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-খারাপি দেখলে মনের ওপর কেমন চাপ পড়ে।

—এখনও তুমি প্ল্যানচেট করতে পার? মেজো ছেলে কানু জিজ্ঞেস করে।

—পারি বৈকি। তবে আগে যেমন প্ল্যানচেটে কাঠের ছোট টেবিল ছিল—এখন তো আর সেসব পাওয়া যায় না। তবু একটা কাপ আর একটা চকখড়ি পেলেই কাজ হয়ে যায়।

—একটা কাপ আর চকখড়ি!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। সাধারণ চায়ের কাপ।

ছেলেমেয়ে দুজনেই বলে উঠল—একবার প্ল্যানচেট কর না।

দেবব্রত স্ত্রীর ভয়ে অনেক দিন প্ল্যানচেটে বসতে পারেননি। আজ একবার ইচ্ছে হলো, কিন্তু কানুর মা শোনামাত্র একেবারে অগ্নিমূর্তি হয়ে এসে সবাইকে ধমক দিয়ে বললেন—না, এ বাড়িতে ওসব আত্মাটান্মা নিয়ে ছেলেখেলা চলবে না।

ব্যাস! হয়ে গেল। প্ল্যানচেট পর্ব ঐখানেই শেষ।

কিন্তু—

দেবব্রত জানতেন না এই বয়েসে খুব শীগগিরই তাঁকে অন্তত একদিন প্ল্যানচেট নিয়ে আবার বসতে হবে। অফিসের একটা কাজে হঠাৎ তাঁকে একদিনের জন্যে যেতে হলো বর্ধমান জেলার এক মহকুমা শহরে। সেখান থেকে আবার রিকশা নিয়ে মাইল তিনেক দূরে এক গ্রামে।

এ এমন জায়গা যেখানে হোটেল-টোটেলের বালাই নেই। রাতে থাকবেন কোথায়? অফিসেরই এক ভদ্রলোক সেই গ্রামের তাঁর পরিচিত এক ভদ্রলোককে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিলেন, যেন এক রাত্তিরের জন্যে তাঁর এই অফিসের সহকর্মীটিকে থাকতে দেওয়া হয়। দেবব্রতবাবুকে অবশ্য একটা কথা বলে দেওয়া হয়েছিল, ওখানে গিয়ে যেন বাড়ির কর্তার কথা না জিজ্ঞেস করেন। কেননা বৃদ্ধ ভদ্রলোকের একটি ছেলে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পর থেকে তিনি শোকে একেবারে পাগল হয়ে গেছেন। তাঁকে একটা ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। সেই হতভাগ্য ছেলেটির কথা উঠলে সবাই নতুন করে দুঃখ পাবে, তাই।

দেবব্রত ভাবলেন, ওসব ফ্যামিলি ম্যাটারে যাওয়ার তাঁর কি দরকার? চুপচাপ কোনোরকমে একটা রাত কাটিয়ে দিতে পারলেই হলো।

পরিবারটি সত্যিই ভদ্র। শুধু ভদ্রই নয়, যথেষ্ট আধুনিক। বাড়ির যিনি বড়ো ছেলে তাঁর নাম বিনয়বাবু। ষাট ছাপিয়ে গেছে। তাঁর বড়ো ছেলেটি রাউরকেল্লায় কাজ করে। ছুটিতে বাড়ি এসেছে। মেয়ে সুষমাও কয়েকদিনের জন্য বাপের বাড়িতে এসে রয়েছে। সেও এম. এ. পাস। বড়ো ছেলের ভালো নাম জানা গেল না, তবে ডাকনাম ব্রত। এ বাড়ির যিনি বড়ো বৌ অর্থাৎ বিনয়বাবুর স্ত্রী—তিনিও খুব প্রগতিশীল মহিলা। একজন বাইরের ভদ্রলোকের সামনে বেরিয়ে তিনি স্বচ্ছন্দে আলাপ করলেন। বলাই বাহুল্য, আদর অভ্যর্থনার কোনো ক্রটি এঁরা করেননি।

বাড়িটা টিপিক্যাল যেমন গ্রামের পুরনো বাড়ি হয়। একতলা বাড়ি। পলস্তুরা খসে পড়েছে। মোটা মোটা কড়ি। জনলাগুলো ছোটো। ফলে প্রায় সব ঘরগুলোই কেমন অন্ধকার। আর স্যাঁতসেঁতে গন্ধ। ঘরের বাইরে মস্ত উঠোন। সেখানে ধানের মরাই, ধানভানার টেকি থেকে

গোয়ালঘর পর্যন্ত সবই আছে। তবু কোথায় যেন ওঁদের সবার মনে একটা চাপা দুঃখের ভাব। সেটা হয়তো পুত্রশোকে পাগল ঐ বন্দী বৃদ্ধের জন্যেই।

রাত্রে খাওয়ার পর গল্পের আসর বসল। সবার সঙ্গে বিনয়বাবুর স্ত্রীও বসলেন পানের ডিবে নিয়ে।

নানা পরিচয়পর্বের পর গল্প জমে উঠল। গ্রামের সুখ-সুবিধে, পূজো-পার্বণ থেকে শুরু করে গ্রাম্য পলিটিক্স পর্যন্ত। শেষে ভূতও এসে পড়ল। কথায় কথায় সুষমা বলল—কাকাবাবু, আপনি কখনো ভূত দেখেছেন?

দেবব্রত হেসে বললেন—কলকাতায় আর ভূত কোথায় পাব মা? এত লোডশেডিং—এর সুবিধে তবু তেনারা এখন আর দেখা দেন না।

সুষমা বললে—কিন্তু আমাদের এখানে ভূত আছে। আর এই বাড়িতেই। বলে হেসে মায়ের দিকে তাকাল।

—জানেন, মা এ বাড়িতে প্রায়ই ভূত দেখে।

বিনয়বাবুর স্ত্রী কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে মুখে আর একটা পান গুঁজে বললেন—ভূত কিনা জানি না, তবে অন্ধকারে এ-ঘর ও-ঘর করার সময়ে মাঝে মাঝে কি যেন ছায়ার মতো সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর হঠাৎই মিলিয়ে যায়।

দেবব্রত ভয় পাওয়া তো দূরের কথা বেশ পুলকিত হলেন। বললেন—তা একবার প্ল্যানচেট করে দেখতে পারেন।

—প্ল্যানচেট! নাম শুনেছি বটে, কিন্তু কখনো দেখিনি। ব্রত বলল।

দেবব্রত বিজ্ঞের মতো হেসে বললেন—ও আর এমন কী ব্যাপার! আমিই এক সময়ে প্ল্যানচেট করে কত আত্মা নামিয়েছি।

—আপনি প্ল্যানচেট করতে পারেন?

দেবব্রত গোঁফের ফাঁকে একটু হাসলেন। বললেন—একটা কাপ আর একটা চকখড়ি নিয়ে এসো। দেখিয়ে দিচ্ছি।

সুষমা মহা উৎসাহে বলে উঠল—কিরকম কাপ?

—অতি সাধারণ চা খাবার কাপ। তবে ভালো করে ধুয়ে মুছে এনো।

সুষমা তখনই এরকম ছুটে গেল আর একটু পরেই একটা পরিষ্কার সাদা কাপ আর চকখড়ি নিয়ে এল। তারপর দেবব্রতের নির্দেশে মসৃণ জায়গা দেখে (পুরনো বাড়ি তো) ভালো করে গঙ্গাজল দিয়ে মুছে ফেলা হলো। জায়গাটা শুকোলে এবার দেবব্রত বেশ গম্ভীরভাবে এগিয়ে এসে খড়ি দিয়ে বেশ বড়ো করে একটা গোল গম্ভি টানলেন। তারপর সেই গম্ভির ডান দিকের মাথা থেকে A, তার নীচে B, তার নিচে C, এমনি করে Z পর্যন্ত লিখলেন। দেখে মনে হলো গম্ভিটা যেন কতকগুলো ইংরিজি অক্ষরের মালা গলায় পরে রয়েছে। তারপর সেই বড় গম্ভির ঠিক মাঝখানে ছোটো একটা গোল গম্ভিও টানলেন। তারপর সেই ছোটো গম্ভির মধ্যে কাপটি উপুড় করে রাখলেন।

—ব্যাস্! এবার বড়ো আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ডিম আলোটা জ্বালো।

ব্রত তখনই উঠে গিয়ে বড়ো আলোটা নিভিয়ে নীল আলোটা জ্বেলে দিল।

—বেশ। ধূপ আছে?

—আছে। নিয়ে আসব?

—হ্যাঁ। মানে জায়গাটা যতদূর সম্ভব পবিত্র করা আর কি!

ধূপদানীতে দুটো ধূপও জ্বেলে দেওয়া হলো। মুহূর্তে ঘরের হাওয়াটাই বদলে গেল।

—এবার তোমাদের দু-একটা কথা আগে বলে নিই। দুজনকে বসতে হবে কাপের দুদিকে একটা করে আঙুল শুধু ছুঁইয়ে। যে দুজন বসবে তারা এমন কাউকে স্মরণ করবে যিনি দুজনেরই চেনা। একাগ্র চিন্তে ভক্তিভরে স্মরণ করবে। তারপর যখন দেখবে কাপটা নড়ছে তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করবে—কে এসেছেন? তারপর তোমাদের যা প্রশ্ন থাকবে, আত্মা ঐ কাপ দিয়েই ইংরিজি লেটারগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে ইংরিজিতেই সংক্ষিপ্ত উত্তর দেবেন। এবার তাহলে তোমরা ঠিক করো কাকে ডাকবে আর কে দুজন বসবে।

কৌতূহল যেমন আছে তেমনি ভয় ভয়ও করছে। শেষ পর্যন্ত সুযমা আর ব্রত দুর্ক দুর্ক বক্ষে এসে বসল।

—কাকে ডাকবে ঠিক করেছে?

এ আর কঠিন কি! কত চেনা-জানা লোকই তো এর মধ্যে মারা গেছেন।

—ধীর গাঙ্গুলিকে ডাকলেই তো হয়।

—ধীর গাঙ্গুলি! ঐ সুদখোর-বদমাশ! নানা, ওকে ডেকে কাজ নেই।

ব্রত একটু ভেবে বলল—তবে ঘোষেদের হরেন দাদু?

—ও রে ফাদার! ঐ রাগী লোককে?

—না না, কক্ষনো না। উনি তো ঝগড়া করতে করতেই হার্ট ফেল করেছিলেন।

—তাহলে?

—মা, তোমার সই ‘গঙ্গাজল’কে—

—না বাপু, সে ছিল বেজায় শুচিবাইয়ে। দেখতে না আমাদের ঘরে এসে বসতে চাইত না। আজ মরে গিয়ে তো আরও—

—মহা মুশকিল! তা হলে ডাকা যায় কাকে? বেশ একজন ধীর, স্থির, ভদ্র, নম্র মানুষ হলেই ভালো হয়।

—হ্যাঁ, সেইরকমই কারো কথা তোমরা ভাব। নইলে তেমন স্পিরিট হলে বড্ড বিরক্ত হয়। দেবব্রত গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন।

হঠাৎ সুযমা বলে উঠল—ছোটো কাকাকে ডাকলে হয় না?

ছোটো কাকার কথা উঠতেই এক মুহূর্তে সবার মুখে দুঃখের ছায়া নেমে এল। এতক্ষণে বিনয়বাবু কথা বললেন—কিন্তু সে যে মারাই গেছে—তা তো আজ পর্যন্ত সাব্যস্ত হয়নি। বলে তিনি দেবব্রতর দিকে তাকালেন।

—ঐ একটা আমাদের ফ্যামিলি ট্রাজেডি। সে আজ প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। আমাদের ছোটো ভাই। কলকাতায় কলেজে পড়ত হস্টেলে থেকে। একদিন ওরা কয়েকজন বন্ধু মিলে মধুপুর, গিরিডি বেড়াতে গেল। তিন-চারদিন পর ফিরল সবাই। ফিরল না শুধু আমার ছোটো ভাই আর ওর এক বন্ধু। জানা গেল ওরা দুজনে গিরিডি থেকে দূরে উত্তী ফলস্ দেখতে গেছে। দুদিন পরে বন্ধুটি ফিরল একা। তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে তো অবাক। বলল, ও তো শেষ পর্যন্ত উত্তী দেখতে যায়নি। কলকাতায় ফিরে এসেছিল। বন্ধুটি জোর দিয়ে বলল, সে নিজে ওকে ট্রেনে তুলে দিয়েছিল। কিন্তু ভাই আর ফেরেনি।

এই পর্যন্ত বলে বিনয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

দেবব্রত কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে বললেন—যদি তিনি মারা গিয়েও থাকেন তা হলে কিভাবে সম্ভব মনে করেন?

বিনয়বাবু সহজ সুরেই বললেন—অ্যাকসিডেন্ট! ট্রেন থেকে পড়ে কিংবা ঐ ধরনের কিছু—এ ছাড়া আর কি হতে পারে?

—খুনও হতে পারে। সবইকে চমকে দিয়ে কথাটা বলে উঠলেন বিনয়বাবুর স্ত্রী।

দেবব্রত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—খুন! কে খুন করবে? তার মোটিভ—মানে উদ্দেশ্যই বা কি?

—আমার ধারণা খুনের উদ্দেশ্য একটা ছিল। ওর হাতে একটা বিশেষ আংটি ছিল। আমরা একবার নেপাল বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে একজন লামার সঙ্গে আমার দেওরের আলাপ হয়। লামা তাকে একটা আংটি দিয়ে বলেছিল—এটা পরে থাকলে নাকি কোনোদিন কোনো বিপদ ঘটবে না। সেইসঙ্গে সাবধানও করে দিয়েছিল—যেন সে-কথা কাউকে না বলে। বোকা ছেলেটা আংটিটা সব সময়েই পরে থাকত আর সবাইকে বলে বেড়াত।

—তা থেকে কী প্রমাণ হয়? একজন ঝানু গোয়েন্দার মতো প্রশ্ন করলেন দেবব্রত।

—প্রমাণ কিছুই হয় না, তবে মনে হয় ঐ আংটির লোভেই ওর সঙ্গে যে ছেলেটা ছিল সে-ই খুন করেছে।

দেবব্রত একটু গভীর হয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন—পুলিশ কিছু করতে পারল না? বিনয়বাবু সংক্ষেপে মাথা নাড়লেন।

—নাঃ। কে একটা ছেলে হারিয়ে গেল বা মরল তা নিয়ে বিহার পুলিশের বা কলকাতা পুলিশের তেমন মাথাব্যথা ছিল না।

দেবব্রত আবার কিছুক্ষণ ভাবতে লাগলেন। তারপর বললেন—মৃত্যু হয়েছেই এমন যখন সিদ্ধান্ত নয় তখন অন্য কাউকে ডাকলেই হয়।

কিন্তু সুবমা বলে উঠল—না, ছোটো কাকাকেই ডাকা হোক। তিনি মরে গিয়ে থাকলে নিশ্চয় আসবেন।

—বেশ, তাই ডাকো।

ওরা ভাই-বোনে তখন মুখোমুখি বসল।

—ও হো! দেবব্রত বাধা দিলেন—তোমরা তো ওঁকে দেখইনি তা হলে স্মরণ করবে কি করে? একটু হেসে বললেন—ওঁর একটা ছবি আছে?

এ ওর মুখ চেয়ে সবাই মাথা নাড়ল। না, খুব পুরনো একটা ছবি বোধহয় আছে অ্যালবামে। তাও সেটা ট্রান্সের মধ্যে।

—তবে তোমরা ওঠো। তোমাদের বাবা মাকে বসতে দাও।

বিমর্ষ মনে ওরা উঠে পড়ল। বসলেন বিনয়বাবু আর তাঁর স্ত্রী।

ঘরে হালকা নীল আলো জ্বলছে, ধূপের গন্ধে ঘর ভরপুর। ওঁরা দুজনে কাপের ওপর আঙুল ঠেকিয়ে চোখ বুজিয়ে একমনে এ বাড়ির ছোটো ছেলেটির কথা ভাবতে লাগলেন।

গোটা ঘর স্তব্ধ। কারও নিশ্বাস ফেলার শব্দটুকুও যেন শোনা যাচ্ছে না। শুধু কড়িকাঠের আড়ালে একটা টিকটিকি টিক্‌টিক্‌ করে ডেকে উঠল।

দু মিনিট—তিন মিনিট করে দশ মিনিট কেটে গেল। কিন্তু কাপ একটুও নড়ল না। সবাই চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু দেবব্রতর কোনও চাঞ্চল্য নেই। বরঞ্চ কেমন খুশি খুশি ভাব।

খুশির ভাব তো হবেই—ছেলেটা নিশ্চয় তাহলে বেঁচে আছে।

—যাক্ নিশ্চিন্ত। উনি মৃত নন। এবার ইচ্ছে করলে আপনারা অন্য কাউকে—

কথা শেষ হলো না। সবাইকে চমকে দিয়ে কাপটা হঠাৎ নড়ে উঠল। সবাই নিশ্বাস বন্ধ করে কাপটার দিকে তাকিয়ে রইল।

কাপটা প্রথমে ছোটো বৃত্তের মধ্যে ঘুরল। তারপর হঠাৎ ছটিকে ছোটো বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক করতে লাগল।

দেবব্রত ফিসফিস্ করে বললেন—জিঙ্গেস করুন কে এসেছেন?

ওঁরা কাঁপা কাঁপা গলায় জিঙ্গেস করলেন।

এসব ক্ষেত্রে কাপটা ইংরিজি এক একটি অক্ষরের কাছে গিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সেরকম কিছু ঘটল না। কাপটা শুধু বৃত্তের মধ্যেই ঘুরতে লাগল। এত দ্রুত ঘুরতে লাগল যে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে রাখা দায় হলো।

এমন অদ্ভুত ব্যাপার দেবব্রত নিজেও কখনো দেখেননি। তিনিও যেন কেমন ভয় পেলেন। বলে উঠলেন—আপনারা আঙুল সরিয়ে নিন।

ওঁরা তাই করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাপটাও একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল।

—এ কোনো অশুভ আত্মার কাজ। ক্ষতি করার জন্যে হঠাৎ এসে পড়েছিল। একটু থেমে বললেন—অনেক রাত হয়েছে। আর কাউকে ডেকে কাজ নেই।

সকলেরই গা ছম্ছম্ করছিল। দ্বিরুক্তি না করে সবাই উঠে পড়ল।

দরজায় কি কেউ কড়া নাড়ছে?

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল দেবব্রতর। অন্ধকার ঘর। প্রথমটা বুঝতেই পারলেন না কোথায় আছেন। কিন্তু ভেবে ওঠার আগেই দরজায় এবার জোরে কড়া নাড়া।

—শুনছেন! শীগগির একবার আসুন।

ধড়মড় করে উঠে দেবব্রত আলো জ্বেলে দরজা খুলে দিলেন। দেখলেন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বিনয়বাবু আর তাঁর স্ত্রী। ভয়ে তাঁদের মুখ সাদা।

—একবার এ ঘরে আসুন।

দেবব্রত তখনই তাঁদের সঙ্গে চললেন। এটা সেই ঘর যেখানে কয়েক ঘণ্টা আগে প্ল্যানচেট করা হয়েছিল। বিনয়বাবু সভয়ে বললেন—আমরা পাশের ঘরে শুই। অনেকক্ষণ থেকেই এ ঘরে কিরকম একটা ঠুক ঠুক করে শব্দ হচ্ছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম ইঁদুর-টিদুর। কিন্তু শব্দটা অন্যরকম। উঠে এসে দেখি—সেই কাপটা মিটসেফের ওপর নড়ছে। কিন্তু এখন—

দেবব্রত বললেন—কই নড়ছে? হেসেই বললেন—ঘুমের ঘোরে নিশ্চয়ই ভুল দেখেছিলেন। একটা কাপ কখনো এমনি নড়তে পারে না।

তবু একটু অপেক্ষা করে ওঁরা ফিরে যাচ্ছিলেন—এমনি সময়ে শব্দ—খুট্ খুট্ খুট্। সবাই চমকে উঠে দেখল কাপটা যে শুধু নড়ছে তা নয়, সেটা এগিয়ে এসেছে মিটসেফের ধার পর্যন্ত।

ভয়ে দেবব্রতর মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে গেল। জীবনে তিনি অনেকবার প্ল্যানচেট করেছেন, কিন্তু এমন দৃশ্য কখনো দেখেননি।

—কি হবে দেবব্রতবাবু?

দেবব্রতবাবু বললেন—স্পিরিট দেখছি এখনও যায়নি। বোধহয় কিছু বলতে চায়। ঠিক আছে, আবার বসুন আপনারা।

কিন্তু বিনয়বাবুর স্ত্রী এবার আর কিছুতেই বসতে চাইলেন না। দেবব্রতবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, ঠিক আছে আমিই বসছি। আপনার বসতে তো ভয় করছে না?

ভয় করলেও বিনয়বাবুকে বসতে হলো। যথারীতি খড়ি দিয়ে গাণ্ডি কেটে তার মধ্যে কাপটা বসিয়ে দেবব্রতবাবু বললেন—নির্ন রেডি?

বিনয়বাবু কিন্তু দেবব্রতবাবুর দিকে তাকিয়ে কিছু যেন ভাবছিলেন। এবার ইতস্তত করে বললেন—আপনি বসবেন, কিন্তু আপনি তো আমার ভাইকে দেখেননি।

দেবব্রতবাবু একটু যেন থমকে গেলেন। বিরক্ত হলেন। বললেন—সে আমি বুঝব। বলেই কাপের ওপর আঙুল ছোঁয়ালেন। সঙ্গে সঙ্গেই কাপটা ছোটো গাণ্ডি থেকে তীব্র গতিতে বেরিয়ে এসে বড়ো গাণ্ডির মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।

দেবব্রতবাবুর ইঙ্গিতে বিনয়বাবু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কে এসেছেন দয়া করে জানাবেন?

মুহূর্তমাত্র দেরি না করে কাপটা প্রথমে এগিয়ে গেল R অক্ষরটির কাছে, তারপর তরতর করে উঠে এল A অক্ষরের কাছে, তারপর নেমে ঘুরে গেল M-এর কাছে—সেখান থেকে E তারপর N-এর কাছে গিয়ে থেমে গেল। সকলে ফিসফিস করে উঠল—র-মেন!

—রমেন কে? ভুরু কুঁচকে দেবব্রত জিজ্ঞেস করলেন।

—আমার ছোটো ভাই। বলে ফুঁপিয়ে উঠলেন বিনয়বাবু।

কাপটা ততক্ষণে আবার ঘুরতে শুরু করেছে। যেন কিছু বলার জন্যে হটফট করছে।

—রমেন ভাই আমার! কেমন আছিস? কি করে তোর এই সন্ধান হলো? কে করল?

এত সব প্রশ্নের উত্তর কোনো স্পিরিটই একসঙ্গে দিতে পারে না। রমেনের আত্মাও দিল না। কাপটা শুধু এবার ধীরগতিতে এগিয়ে গেল M-এর কাছে। তারপর U-র কাছে—তারপর R, তারপর D, তারপর E, ফের R...

কাপ নড়ে নড়ে নয়, ছুটে চলেছে বৃত্তের একপ্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। বিনয়বাবু আঙুল ঠেকিয়ে রাখতে একেবারে ঝুঁক পড়েছেন কাপের উপর আর আশ্চর্য—দেবব্রতবাবুর হাতটা কাঁপছে থরথর করে।

এ পর্যন্ত একটি কথাই স্পষ্ট হয়েছে MURDERER—তারপর আরও কটি কথা—WITH YOU.

হঠাৎই দেবব্রতবাবু আঙুলটা তুলে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাপ নিশ্চল হয়ে গেল।

—এটাও নিশ্চয় কোনো খারাপ স্পিরিট। ভয় দেখাতে চায়। বলেই তিনি উঠে একেবারে নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিলেন।

টর্চের আলোয় রিস্টওয়াচটা দেখলেন একবার। রাত সাড়ে তিনটে। ব্যাগটা তুলে নিয়েই জুতোর সামান্যতম শব্দটুকুও না করে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লেন দেবব্রতবাবু। তিন মাইল

রাস্তা হাঁটতে হবে—হয়তো ছুটতে হবে। তারপর যে দিকের যে ট্রেন পাওয়া যায়—

রমেনের বাড়ি যে এটাই তা কি আর জানতেন? ওর কথা তো ভুলেই গিয়েছিলেন। আগে মাঝে মাঝে ভাবতেন। ভাবতেন, উশ্রী ফল্‌স দেখতে না গেলেই হতো। ওঁরই আগ্রহে তো রমেনকে যেতে হয়েছিল।

...বড্ড অহংকারী ছিল রমেনটা। আংটিটা সবাইকে দেখিয়ে বলত—এ জিনিস রাজার ভাগ্যেও জোটে না। এ আংটি পরা থাকলে কোনো বিপদ কাছে ঘেঁষতে পারে না।

বিজ্ঞানের ছাত্র দেবব্রত এসব কথা বিশ্বাস করতেন না। এই নিয়ে বহুবার ওর সঙ্গে তর্ক ঝগড়া হয়েছে.....

উশ্রী প্রপাতের একদম ধারে একটা পাথরের ওপরে দাঁড়িয়ে আবার সেই তর্কের শুরু।

রেগে গিয়ে দেবব্রত বললেন—তাহলে ঐ যেখানে তোড়ে জল পড়ছে সেখানে ঝাঁপ দে। দেখি কি করে বাঁচিস?

রমেন আংটিটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল—তা পারি।

এ কথা বলেও রমেন একটু যেন ইতস্তত করছিল। একটু নাকানি চোবানি খাওয়াবার জন্যে হঠাৎ দেবব্রত সামান্য একটু ঠেলা দিলেন। রমেন ছিটকে পড়ল দু পা দূরে আর একটা পাথরের কাছে যেখানে মোটে হাঁটু জল। কিন্তু জায়গাটা বোধহয় খুব পিছল ছিল। আর তার পরেই....

....সে সব আজ কতদিনের কথা বয়েস তখন কতই বা, আঠারো-উনিশ?

দেবব্রতবাবু তখন প্রাণপণে ছুটছেন। স্টেশন এখনও অনেক দূর।



# ওরা চলেছে নিঃশব্দে

ট্রেনে নতুন সঙ্গী

হিমালয় আমাকে বরাবর টনে। সেই টানে আমি কখনও গিয়েছি দার্জিলিং, কখনও শ্রীনগর। শ্রীনগর থেকে সোনমার্গ, গুলমার্গ, পহেলগাঁও। আবার এদিকে হিমালয়ে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু। এসব জায়গায় যাওয়ার অসুবিধে ছিল না। পাহাড়ের বুক চিরে ঝকঝকে তকতকে রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে যাত্রীবোঝাই বাস নির্বিঘ্নে পৌঁছে দেয় নির্দিষ্ট জায়গায়। খাওয়া-দাওয়ার কোনো অসুবিধে নেই। মাঝে-মাঝেই হোটেল। চা-কফি থেকে ভাত-ডাল-রুটি-মাংস সবই পাওয়া যায়।

কিন্তু এবার হিমালয়ের যেখান দিয়ে যাচ্ছি সে পথ খুবই বিপদসংকুল। সংকীর্ণ পথ, একজন কোনোরকমে পা ফেলে চলতে পারে। তাও পাহাড়ের একেবারে গা ঘেঁষে। নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা পাহাড়ি নদী। নাম জানতে পারিনি। তবে স্রোতের গতি দেখলেই বুক কাঁপে। একবার পা ফসকালে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এ দুর্ভোগে পড়তে হবে কে ভেবেছিল! মাটিতে টাটা সুমো থেকে নেমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, কেউ আলু-পেরোটা, কেউ ব্রেড-বাটার-ওমলেটের সঙ্গে গরম চা কিংবা কফি খেয়ে ফের গাড়িতে উঠে পড়েছিলাম নিশ্চিন্ত মনে। রাস্তা বলে কিছু নেই। কখনও শুকনো নদীখাতে, কখনও বা পাথরের ওপর দিয়ে ডাইনে, বাঁয়ে ঢাল খেতে খেতে গাড়ি এগিয়ে চলছিল। আমাদের গন্তব্যস্থল ‘লে’। লাদাখের রাজধানী। লাদাখ নাম হল কেন? কোন বই-এ যেন পড়েছিলাম ‘লা’ শব্দটার মানে গিরিবর্ষ বা পাহাড়ি রাস্তা। আর ‘দাখ’ মানে দেশ। লাদাখ মানে তাই গিরিবর্ষের দেশ।

সোলাং পেরিয়ে এসেছি। রাস্তার ধারে দেবদারু আর ওক গাছ। বরফঢাকা চূড়া কখনও সামনে কখনও পিছনে। সামনে চড়াই। ... এইভাবে চলতে চলতে প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে একটুকরো সমতল ভূমি মাটিতে এসে পৌঁছেছিলাম। এরপর টানা চড়াই প্রায় ষোলো কিলোমিটার; কিন্তু এ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য স্থান রোটাং গিরিপথের মুখে গাড়িটা থাম্প হয়ে গেল। গাড়ির আর দোষ কী? যা লক্ষ্যবাম্ফ!

কিন্তু স্বল্পভাষী গাইডটি অস্পষ্ট হিন্দিতে নিজের মনেই বিড় বিড় করে যা বলল তার অর্থ দাঁড়ায়—হঠাৎ গাড়ি খারাপ হওয়া লক্ষণটা ভালো নয়।

একপক্ষে ভালোই হল। সেই কখন মানালি থেকে রওনা হয়েছিলাম। একঘেয়ে গাড়ির মধ্যে বসে থাকতে ভালো লাগছিল না। একেবারে খাস হিমালয়ের বুক পা রেখে একটু চলাফেরা করে হাত-পা ছাড়িয়ে নেওয়া মন্দ কী!

গাড়ির ড্রাইভার ছাড়া আমি, আমার কলকাতার বন্ধু বিভাস, একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী থুমি সামভোতা, আর একজন গাইড জিগমে। জিগমে জোয়ান মরদ। তিব্বতী। চওড়া চোয়াল, ছোটো

হোটো চুল। চ্যাপ্টা মুখ। ফ্যাকাশে রঙ। মানালিতে যে হোটোলে ছিলাম, দুই বাঙালি আনাড়ি বন্ধু হিমালয় ভ্রমণে (ভ্রমণ নয়, একরকম রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার) যাচ্ছি জেনে সেই হোটেলের বাঙালি ম্যানেজার অনুগ্রহ করে তাঁর চেনা এই তিব্বতী ছেলেটিকে গাইড হিসেবে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, জানি গাড়ি নিয়ে যাবেন। কিন্তু কোথাও কোথাও হাঁটতেই হবে। হাঁটার অসুবিধে যে কোনো মুহূর্তে ভুল পথে চলে যাওয়া। তা ছাড়া কোথায় খাবার পাবেন, কোথায় পানীয় জল পাবেন, কোন ফুল দেখতে সুন্দর কিন্তু বিষাক্ত—সে সব এর নখদর্পণে। তারপর কোন জায়গাটা কতখানি দূরে তা আপনারা আন্দাজও করতে পারবেন না।

আপত্তি করিনি। কেননা এই অচেনা, অজানা দুর্গম পাহাড়ি পথে, দু'বেলা খেতে দেওয়া আর রোজ হিসেবে পাঁচ টাকা দিলেও লাভ বই লোকসান নেই।

বিভাস আমার সঙ্গে কলকাতার একই মেসে থাকে—একই ঘরে। আমারই মতো চাকুরে। মনের মিলও খুব। তবে আমার চেয়ে ওর স্বাস্থ্য অনেক ভালো। আর স্বাস্থ্য ভালো বলেই সাহসও বেশি। তবে দুজনের 'হবি' দু'রকম। আমি পছন্দ করি ঘরে বসে লিখতে, দেশ-বিদেশের ওপর লেখা বই পড়তে। আর ওর নেশা ভ্রমণের। দুর্গম পথে। মাঝে মাঝে দুঃখ করে, এদেশে যদি আফ্রিকার জঙ্গলের মতো দুর্ভেদ্য জঙ্গল থাকত। কিংবা ক্ষাপা সমুদ্রে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে সাঁতার কেটে কোনো অজানা নির্জন দ্বীপে গিয়ে অসভ্য জাতির মতো প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে পারতাম!

সত্যি কথা বলতে কি, হাওড়া থেকে দিল্লি-কালকা মেলে চেপে ভোরে চণ্ডীগড়। তারপর মানালির বাস। তারপর মানালি থেকে রোটাং পাস। সম্ভব হলে আরও উঁচুতে ওঠার গোটা পরিকল্পনাটাই বিভাসের। মন থেকে আমার বিশেষ সায় ছিল না। কিন্তু বিধির ব্যবস্থা কী তা আগে কে জানতে পারে। নইলে দিল্লি কালকা মেলের একটা কামরায় হঠাৎই বা যোগাযোগ হবে কেন থুমি সামভোতার মতো একজন জ্ঞানতপস্বীর সঙ্গে? বয়েস যাটের কাছে হলেও শরীর মজবুত। কোনোরকম রোগের লক্ষণ নেই। বিভাস ওঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। তারপর ফিসফিস করে বলেছিল, তিব্বতী ভদ্রলোক। নিশ্চয় যোগব্যায়াম বা প্রাণায়াম জাতীয় কিছু করেন। নইলে এই বয়সে অত সুন্দর চেহারা হয় কী করে?

ফর্সা রঙ। ন্যাড়া মাথা। গেরুয়া রঙের কাপড়ের টুপি। পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, গায়ে মেটে রঙের ফতুয়া আর বুক, পিঠ, জানু ঘিরে আড়াআড়ি ভাবে হলুদ চাদর। রিজার্ভড সিটে গা এলিয়ে নিশ্চিতভাবে তিনি পড়ছিলেন একটা ইংরিজি বই—'History of Mongolians.' মোঙ্গল জাতির ইতিহাস। বইটি যে বিদেশে প্রকাশিত তা মলাটের জৌলুস আর পরিচ্ছন্নতা দেখলেই বোঝা যায়।

ভদ্রলোকের শাস্ত্র, সৌম্য, গাভীরূপর্ণ চেহারা। দেখলে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে।

তিনি যে শুধু ইতিহাসই চর্চা করেন তা নয়। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বুঝলাম তিনি রীতিমতো একজন পণ্ডিত লোক। জ্ঞানের গভীরে যেন ডুবে রয়েছেন। কথায় কথায় যখন জানতে পারলাম সংস্কৃত থেকে তিব্বতী ভাষায় পুঁথি অনুবাদ করেছেন তখন শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে গেল। তিনি যে একজন তিব্বতী মাত্র নন, প্রতিবেশী দেশগুলি যেমন চীন, ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ প্রভৃতির সঙ্গে রীতিমতো সাংস্কৃতিক যোগ রাখেন তা তাঁর কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে বুঝতে পারলাম। আর তিনি যখন জানালেন যে, কলকাতায় শুধু এবারই নয়, অনেকবার এসেছেন তখন তাঁর মুখে বাংলা কথা এত সহজে সরে কী করে তার কারণ বুঝতে বাকি রইল না।

তারপর যখন আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম তখন জিগ্যেস করতে সাহস হল, কী জানো তিনি সুদূর তিব্বত থেকে বার বার কলকাতায় ছুটে আসেন? উত্তরে তিনি শুধু একটু মুখ টিপে হাসলেন। তারপর একটু যেন ভেবে বললেন, আপনাদের কলকাতার সবচেয়ে মূল্যবান অ্যাসেট কী বলুন তো?

বিভাস জিগ্যেস করল, আপনি কী দর্শনীয় স্থানের কথা বলছেন?

ধরুন তাই।

এবার আমরা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। কলকাতাতেই থাকি তবু কি কলকাতা শহরটা ভালো করে দেখতে পেরেছি? কত ঐতিহাসিক জায়গা আছে—

বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, কলকাতার মিউজিয়ামটা আপনারা দেখেছেন নিশ্চয়ই?

কোনোরকমে মাথা দুলিয়ে সাই দিলাম। (সত্যি কথা বলতে কি কবে কোন ছোটবেলায় একবার কি দু'বার দেখেছিলাম, তারপর যাদুঘরের পাশ দিয়ে হাজার বার গেলেও ভেতরে ঢোকার ইচ্ছে বা সময় হয়নি)।

তিব্বতী মানুষটি খুশি হয়ে বললেন, দেখেছেন নিশ্চয়ই। কলকাতার কোনো মানুষ যাদুঘর দেখেনি তা হতেই পারে না। তা ক'বার দেখেছেন?

বিভাস তড়বড় করে বলল, তা অনেকবার।

বেশ। সব ঘরে ঢুকেছিলেন?

হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই। টিকিট কেটে যখন যেতে হয়েছিল তখন সবকিছুই তো দেখব। ঘুরে ঘুরে সব দেখতে কতক্ষণ সময় লেগেছিল?

বিভাসকে বলতে না দিয়ে আমিই বললাম, তা অনেকক্ষণ।

শুনো ভদ্রলোক মুচকে একটু হাসলেন।

মমি দেখেছিলেন?

বাবাঃ! মমি দেখার জন্যই তো যাওয়া। দেখলে গায়ের মধ্যে কেমন শিরশির করে ওঠে। কত যুগ আগের বাসি মড়া।

সামভোতা মুখ টিপে একটু হাসলেন। বললেন, ঐ মমি দেখার জন্যেই আমি কলকাতায় ছুটে আসি।

শুধু মমি দেখার জন্যে এতবার কলকাতায় আসেন! অবাক হয়ে আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম। এ আবার কীরকম কথা!

হ্যাঁ, শুধু মমি দেখার জন্যেই বার বার আসি। তোমাদের সঙ্গে তফাত এই যে, তোমরা মমি দেখতে আস আর আমি মমির কাচের কেসের মধ্যে কিছু খুঁজতে আসি।

কিন্তু ওরা আপনাকে কি কেসের গায়ে হাত দিতে অ্যালাউ করে?

করে না বলেই তো বারবার আসতে হয়।

কেসের মধ্যে কী খোঁজেন?

সেটা এখনই এই ট্রেনের মধ্যে বলা যাবে না। পরে বলব। এখন বলো তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

আমরা দুজনে আবার পরস্পরের দিকে তাকালাম। অর্থাৎ বলে ফেলা উচিত হবে কিনা। গোপনীয়তা কিছুই নেই। উদ্দেশ্যও তেমন নেই। হয়তো বিচক্ষণ লোকটি হাসবেন। তবু বলেই ফেললাম, এমনি পাহাড়ে ঘুরতে।

সামভোতা আবার একটু হাসলেন। বললেন, ভারতবর্ষে কি পাহাড়ের অভাব আছে? তা হলে উত্তর দিকেই কেন? কোথায় যাবে?

বলালম, আমার এই বন্ধুটি, বিভাস, অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসে। দুর্গম নির্জন পাহাড়ি জায়গাই ওর পছন্দ। তাই ওর কথামতোই আপাতত আমরা যাব মানালি। সেখান থেকে গাড়ি পাই তো ভালোই। না হলে হিমাচল পর্যটনের বাস। সেই বাসে বিখ্যাত রোটাং পাস। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

সামভোতা উৎসাহ দিয়ে বললেন, খুব ভালো। রোটাং পাসেই থেমে যেও না। গাড়ি যদি পাও, মানালিতে টাটা সুমো, টয়োটা কোয়ালিস এসব আধুনিক গাড়ি পেয়ে যাবে, তাহলে আরও উঁচু গিরিবর্ষ পার হয়ে চলে যেও লাদাখ পর্যন্ত।

একটু থেমে বললেন, তা তোমরা এই পথটা ধরলে কেন? অন্য পথও তো ছিল শ্রীনগর থেকে। সেখান থেকে বাসে সোনমার্গ হয়ে জোজিলা গিরিপথ পেরিয়ে কার্গিলে। সেখানে রাত্রিবাস করে পরের দিন ভোরে রওনা দিয়ে সন্ধ্যায় লে। আমার তো মনে হয় এ পথটা অনেক কম হত। শত্রুপক্ষের গোলাগুলি ছাড়া অন্য ভয় নেই।

অন্য ভয়? চমকে উঠলাম দুজনেই। জিগ্যেস করলাম, অন্য ভয় বলতে?

প্রাজ্ঞ মানুষটি শাস্তভাবে বললেন, পথটা তো দুর্গম। তাছাড়া বহুকাল আগের বহু ঘটনার সাক্ষী। কিন্তু—না, তোমারা ভালো সিদ্ধান্তই নিয়েছ। এখন আমার ইচ্ছে করছে আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই।

অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, সত্যিই আপনি যাবেন? অবশ্য শুধু শুধু কষ্ট করে, পয়সা খরচ করে কেনই বা যাবেন?

সামভোতা এতক্ষণ নিজের সিটে গা এলিয়ে বই হাতে বসেছিলেন। এবার সোজা হয়ে উঠে বসলেন। বললেন, ঐ পথে এর আগে আমি গিয়েছিলাম। কিন্তু যেজন্য গিয়েছিলাম তা সফল হয়নি। আরও যেতে হবে। হয়তো বার বার।

সাহস করে বললাম, আপনি বিরক্ত না হলে বলি ঐ রাস্তার এমন কী আকর্ষণ আছে যে আপনাকে আবার যেতে হবে?

পণ্ডিত ব্যক্তিটি অল্পক্ষণ চুপ করে চোখ বুজিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, ঐখানেই সেই বহু যুগ আগের পথ—যাকে বলা হত প্রাচীন সিঙ্করুট। ঐ পথ দিয়েই তো যাতায়াত করত ছন উপজাতির দল। সেই পথটা খুঁজে পাবার পর আরও অনুসন্ধান করার জায়গা আছে....এটা কোন স্টেশন এল?

আজিমগঞ্জ জংশন।

এতক্ষণে আজিমগঞ্জ!

হেসে বললাম, তবু তো বেশ তাড়াতাড়ি এসেছি। আপনার সঙ্গে গল্প করতে করতে আমাদের মনে হচ্ছে সময় কোথা দিয়ে কেটে গেল। কিন্তু পুরনো পথ ছাড়াও আর কী খুঁজতে চান?

আসল কথা হচ্ছে, আমার ওপর বরাবর কর্তৃত্ব করে এসেছে ইতিহাস। আর সে ইতিহাস শুধু ভারতের বা ইউরোপের নয়, মধ্য এশিয়ার মোঙ্গোলীয়দের নিয়ে। আর আমার ইতিহাসের নায়ক হচ্ছে চেঙ্গিস খান যাঁর আসল নাম ছিল তেমুচিন। পরে যখন মোঙ্গল জাতির প্রধান হয়ে উঠলেন তখন ওঁর নাম হল চিঙ্গীজ খান। ‘চিঙ্গীজ’ কথার অর্থ অসাধারণ শক্তিশালী আর ‘খান’ বলতে বোঝায় ‘নেতা’। কালে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন ধরনের উচ্চারণের ফেরে চিঙ্গীজ খান শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় ‘চেঙ্গিস খান’। তোমরা চেঙ্গিস খানের নাম শুনেছ তো?

আমরা দুজনেই বলে উঠলাম, নিশ্চয়ই। চেন্সিস খান, তৈমুরলঙ্গ এঁরা ইতিহাসের কলঙ্ক।  
ওঁদের অত্যাচারের কথা কেউ ভুলবে না।

থুমি সামভোতা বললেন, চেন্সিস খান শুধু একজন মহা যোদ্ধা বা অত্যাচারী ছিলেন  
না, তাঁর মৃত্যু ও পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপও ছিল রহস্যময়।

রহস্যময়!

হ্যাঁ। কিন্তু সেই রহস্যের কথা এখনি বলব না। তবে জেনো যতদিন সামর্থ্য থাকবে  
ততদিন সেই রহস্য সমাধান করার চেষ্টা করে যাব।

সেইজন্মেই কি আমাদের সঙ্গে যেতে চাইছেন?

হ্যাঁ। বুঝতেই পারছ ওসব জায়গায় একা যাওয়া যায় না। যেতে হয় দলবদ্ধ হয়ে।

আপনাকে যদি সঙ্গে পাই তাহলে খুব খুশি হব।

বিভাস আরও একটু যোগ করল, শুধু খুশি হওয়াই নয় স্যার, আমরা উৎসাহ পাব,  
বিপদে পড়লে আপনার মতো ধীর শান্ত বিচক্ষণ মানুষের পরামর্শ উপদেশ পাব। তা ছাড়া  
রহস্য আমরাও ভালোবাসি।

বিচক্ষণ মানুষটি এ কথায় খুশি হলেন বলেই মনে হল। কেননা ভদ্রলোক এখটু চাপা  
স্বভাবের। উচ্ছ্বাস নেই। প্রাণ খুলে হাসেন না। তবু লোকটি ভালো।

বিভাসের কথা শুনে তিনি হাই তুলে, আলিসি ভেঙে বলে উঠলেন, বেশ তাহলে তোমাদের  
সঙ্গে যাওয়াই স্থির করলাম।

টিকিট?

বললেন, ভেব না। আপাতত চণ্ডীগড় পর্যন্ত টিকিট আছে। তারপর তো বাস। বাসে  
মানালি। তোমাদেরও তো সেইরকম ব্যবস্থা?

হ্যাঁ।

উনি যেন একটু ভেবে বললেন, আমি একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী মাত্র। সুযোগ পেলে বৌদ্ধ  
তীর্থগুলিতে যাই। আর যাই বহু পুরনো গোস্ফাগুলোতে। সম্ভব হলে রাতও কাটিয়ে দিই।  
কিন্তু এ রাত কাটানোই। ঘুম হয় না।

কেন?

ঠিক জানি না। বহু পুরনো জায়গা তো। কেমন যেন মনে হয়। যাক, ওসব কথা  
বাদ দাও। অনেক রাত হল। কিছু খাবার সঙ্গে থাকলে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো।

কী জানি কেন এই মানুষটির কথায় আমরা বেশ উৎসাহ পেলাম।

আপনি কী খাবেন? জিগ্যেস করলাম সবিনয়ে।

আপেল আর মিষ্টি আছে। আমি সন্ন্যাসী মানুষ। স্বপ্নাহারী।

### অশরীরী অরোহী

গাড়ি থেকে আমরা চারজনে নামলাম। তার মধ্যে হাঁড়িমুখো গাইডটিও আছে। নেমেই  
সে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। যেন পথ চেনবার চেষ্টা করল। আমরাও রাস্তায় নেমে  
নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচলাম। একবার আকাশের দিকে তাকলাম। ভাবলাম যদি নীল আকাশ একটু  
দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু পাশের কালো কালো উঁচু উঁচু পাহাড় আর পাহাড়ের গায়ে লম্বা  
ফার, আর চিনার গাছগুলো যেন আকাশটাকে আড়াল করে রেখেছে।

ড্রাইভার ততক্ষণে ইঞ্জিনের বনেট খুলে ঝুঁকে পড়ে কলকজা পরীক্ষা করছে। জিগ্যোস করলাম, কত দেরি হবে?

ড্রাইভার বললে, দেখি। আপনারা এক কাজ করুন। এই পথ ধরে বেড়াতে বেড়াতে এগিয়ে যান। গাড়ি সারানো হলেই আপনাদের ধরে ফেলব।

এই প্রস্তাবে আমরা সকলেই খুশি। সন্ন্যাসী ভদ্রলোকের দু'চোখ খুশিতে উৎসাহে চকচক করে উঠল। উনি যেন হাঁটতেই চাইছিলেন। আমরা যে পাশাপাশি হাঁটব, তেমন সুবিধে নেই। রাস্তাটা পাহাড়ের গা ঘেঁষে। ইচ্ছে করেই বাসরাস্তা ছেড়ে এসেছি। বাসরাস্তায় এত নুড়ি ছড়ানো যে পা হড়কে যাবার ভয়।

আমাদের গাইড বোধহয় তার কাজ দেখাবার জন্যে এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। তিন-চারটে সরু পাহাড়ি পথ হেলসাপের মতো হিলবিল করে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে। সে রকম একটা পথ ধরে আমাদের উঠতে ভালোই লাগছিল।

অনেকক্ষণ থেকে বাতাসে একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল। গাইডকেই জিগ্যোস করলাম, কিসের গন্ধ হে? গাইড ছোকরা তার উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করল না। সে যেন কেমন অন্যান্মনস্কভাবে হাঁটছিল। আর ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক দেখছিল। কিসের এত ভয় তা তো বুঝি না।

আমার কথার উত্তর পিছন থেকে দিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ঠাকুর। বললেন, গন্ধটা বন-গোলাপের।

আমি মুগ্ধ হয়ে তখন দেখছিলাম পাইন গাছের বনগুলি। দেখছিলাম পাহাড়ের সবুজ চাদরে সাদা ফুলের ছিট। অপূর্ব!

আর ঐ দ্যাখো 'নাগলিলি'। ঠিক যেন সাপের ফণা। আর কেশরগুলো যেন সাপের জিব। দেখতে খাসা কিন্তু সাপের মতোই বিষাক্ত।

বাসরাস্তা নীচে ফেলে আমরা ওপরে উঠছি তো উঠছিই। মনে হচ্ছে এই ভাবে পাহাড়টা পার হলে নতুন কোনো জায়গায় পৌঁছে যাব। কিন্তু আশ্চর্য, আমাদের কেউ একবারও ভাবল না, ইতিমধ্যে গাড়ি সারানো হয়ে গেলে ড্রাইভার আমাদের খুঁজে পাবে কী করে?

গাইডকে জিগ্যোস করা বৃথা। সন্ন্যাসী মশাইকে জিগ্যোস করলাম, শেষ পর্যন্ত বাসরাস্তায় ফিরে যেতে পারব তো?

উনি একবার একটা বড়ো পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখে কিছু একটা হিসেব করে বললেন, নিশ্চিত থাকো।

তারপর সার সার পাহাড়ের উপর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার অনুমান যদি ভুল না হয় তা হলে আর অল্পক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের ওপারে আরও একটা রাস্তা পাব।

আমি ভীতু শান্ত প্রকৃতির মানুষ। মনে মনে বললাম, নতুন রাস্তা পেয়ে কাজ নেই। তখন সন্ন্যাসী মশাই বললেন ঐ রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়ে নীচের রাস্তায় নামবেন। তিনি এ কথা বললে বিভাসও লাফিয়ে উঠবে। কিন্তু আমি তা চাই না। এখন গাড়িটা সারানো হয়ে গিয়ে থাকলে উঠে বসতে পারলে বাঁচি।

হঠাৎ দেখি আমাদের গাইড খুব ভয় পেয়ে ইশারায় আমাদের নীচে নেমে যেতে বলছে। নিজেও দাঁড়িয়ে থাকল না। এক-এক লাফে পাথর ডিঙিয়ে নীচের দিকে ছুটছে।

কী ব্যাপার? কী হয়েছে জিগমে?

ও অশ্ফুট স্বরে কোনোরকমে বলল, বক্সী—বক্সী—

বকসী! সে আবার কী? ভুটানিরা নাকি ভূতকে বকসী বলে। এরাও কি বলে? যদি সত্যিই ভূত বোঝাতেই ও বকসী—বকসী বলছে তাহলে এখানে ভূত কোথায়? আমি তিব্বতী মানুষটার দিকে তাকলাম।

দেখি তিনিও যেন কীরকম অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন।

হঠাৎ এই সময়ে নিস্তব্ধ পাহাড়ের উপরে থেকে একটা শব্দ শোনা গেল। টানা শব্দ। অনেকটা যেন ঘোড়ার খুরের মতো—খটাখট্—খটাখট্—খটাখট্—যেন অনেকগুলো ঘোড়া পাহাড়ের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে।

শব্দটা সবাই শুনেছিলাম। তাই সকলেই থমকে গিয়েছিলাম।

পাহাড়ের ওপর এত ঘোড়া এল কোথা থেকে? যেন নিজের মনেই প্রশ্ন করল বিভাস। এর উত্তর দিতে পারে একমাত্র আমাদের গাইড জিগমে গ্যাটসো আর তিব্বতী পণ্ডিত থুমি সামভোতা। কিন্তু গ্যাটসো যেন কেমন হয়ে গেছে আর—আর—আশ্চর্য, সন্ন্যাসী মশাই—এর মুখ ফ্যাকাশে।

আশ্চর্য! তিব্বতী প্রবীণ জ্ঞানী মানুষটিও ভয় পেলেন নাকি? কিসের ভয়?

ততক্ষণে খুরের শব্দ দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে গেছে।

কী ব্যাপার পণ্ডিতজি?

উনি বিমর্ষ মুখে জোর করে হাসি টেনে বললেন, যা শুনলে তা নিয়ে আলোচনা করতে নেই। তবে আমি খুশি, যে পথটা সন্ধান করার জন্যে ইতিপূর্বে আসতে হয়েছে, আজ দৈবের বশে সে পথের সন্ধান বোধহয় পেয়ে গেলাম।

সে পথটা কোথায়?

আরও ওপরে।

ঘোড়াগুলো কোথা থেকে এল? ঘোড়সওয়ারই বা কারা?

শুনে যাবড়ে যেও না, ঘোড়ার অস্তিত্ব নেই, ঘোড়সওয়ারও নেই। থাকলেও চোখে দেখা যায় না।

চমকে উঠলাম। বললাম, সে আবার কী? অতগুলো ঘোড়া পাহাড়ের ওপারে রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটে গেল, কাছে থাকলেও দেখতে পেতাম না?

কাছে থাকলে চোখ মেলে দেখবার সময় পেতে না। ততক্ষণে ধড় থেকে মাথা খসে পড়ত।

আমাদের গাইড যখন প্রাণের ভয়ে পাহাড় থেকে নীচে নামতে যাচ্ছিল, বিভাস তখন ঘোড়াগুলোকে দেখবার জন্যে সামনের উঁচু পাহাড়টার দিকে ছুটছিল। শব্দটা আর শোনা না যেতে সে নেমে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। তিব্বতী সন্ন্যাসীর কথা শুনে দু'হাত মাথায় চেপে ধরে বলে উঠল, হে ভগবান! এই বিজ্ঞানের যুগে এও বিশ্বাস করতে হবে? সামভোতার দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার, এসব কথা কি আপনার মস্তিষ্ক প্রসূত?

বিভাসের জিগ্যেস করার টোনটা এতই উগ্র ছিল যে ভেবেছিলাম সামভোতা বুকি রেগে যাবেন। কিন্তু আশ্চর্য, তিনি এতটুকু রাগলেন না। একটু হেসে বললেন, না, আমার মস্তিষ্ক প্রসূত নয়। এটা তো ঠিক—ঘোড়া ছুটিয়ে যারা গেল তারা আজকের মানুষ নয়। আজকের মানুষ ঐরকম দুর্গম পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে পারে না। ওরা সাধারণ অশ্বারোহী নয়। কোনো ত্রিভুবনজয়ী নৃপতির দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী সৈন্য। অথচ সে নৃপতি জীবিত ছিলেন সম্ভবত আটিশো-ন'শো বছর আগে। হাজার বছরও হতে পারে। কাজেই তাদের চর্মচক্ষুতে দেখা

আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আমায় সাহায্য করেছে বই। বই পড়েই আমি জানতে পেরেছি। যেমন জানতে পেরেছি সিঙ্কুসভ্যতার যুগে দুটি শহর হরপ্পা আর মহেঞ্জোদাড়োর অনেক কথা।

ভয় পেলাম। এইবার বুঝি তিব্বতী পণ্ডিতমশাই শুরু করেন সেই হরপ্পা, মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বংসাবশেষের ইতিহাস। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলাম না। বিভাস অবশ্য চাঁচাছেলা কথা বলে। সোজাসুজি বলল, খুব সংক্ষেপে যদি বলেন শুনতে পারি।

না শুনলেও আমার কোনো ক্ষতি নেই। উত্তর দিলেন সামভোতা। তবে তোমরা বুঝতে পারতে এই অদৃশ্য ঘোড়সওয়ারদের সূত্র কোথায়?

তাহলে বলুন।

এসো, তবে এই পাথরটার ওপর বসা যাক।

সামভোতা বলতে শুরু করলেন, খ্রিস্টপূর্ব প্রায় তিন হাজার বছর আগে সিঙ্কুসভ্যতার বিকাশ। তোমরা জান কিনা জানি না ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এক বাঙালি রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়্যারাম সহানী আর ঐ বিভাগের অধ্যক্ষ স্যার জন মার্শালের উদ্যোগে সিঙ্কুনদের অববাহিকার কয়েকটি জায়গায় খননকার্য শুরু করা হয়। তার ফলে আবিষ্কৃত হল মহেঞ্জোদাড়ো আর হরপ্পা নামে দুটি প্রাচীন উন্নত নগরী। খননকার্যের ফলে সিঙ্কুদেশবাসীর সেদিনের জীবনযাত্রার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। তা থেকে সে সময়ের পথঘাট, সমাজব্যবস্থা, ধর্ম, উপাস্য দেবতা প্রভৃতি অনেক কিছুর সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন সম্প্রতি চণ্ডীগড়ে পাওয়া গিয়েছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগের সীলমোহর। সেগুলির গায়ে খোদাই করা ছিল ষাঁড়, মোষ, হাতি, গণ্ডার প্রভৃতি মূর্তি। অর্থাৎ সিঙ্কুসভ্যতার যুগে প্রধানত এই সব জন্তুর প্রাধান্য ছিল।

হরপ্পা আর মহেঞ্জোদাড়ো দুটি নগরীই বেশ শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিল। তারপর একদিন শুরু হল বহিঃশত্রুর আক্রমণ। তারা আসত পশ্চিম আর উত্তর দিক থেকে। এদের গায়ের রঙ ছিল গৌরবর্ণ, উন্নত নাক—আর্য সম্প্রদায়ের মানুষ। দুর্ধর্ষ তাদের শক্তি। তারা আক্রমণ করত দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চড়ে। এদের দেশেও ঘোড়ার অভাব ছিল না। কিন্তু এরা কখনও ঘোড়াকে বশ করে তার পিঠে চড়ত না।

কেন? ভয় করত যদি ঘোড়া থেকে পড়ে যায়? খানিকটা ব্যস্তের সুরেই জিগ্যোস করল বিভাস।

না। আসলে এরা বিশ্বাস করত একমাত্র অশ্বরীরা আত্মারাই ঘোড়ায় চেপে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে দাপাদাপি করে বেড়ায়। অর্থাৎ ঘোড়া মাত্রই অশ্বরীরা আত্মার বাহন।

ফলে আক্রমণকারীরা যখন চোখের সামনেই ঘোড়া ছুটিয়ে এসে লুণ্ঠাট করে ঘরবাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে পালাত তখন এরা উটের পিঠে চড়ে ওদের পিছনে ধাওয়া করত। কিন্তু দ্রুতগতি ঘোড়ার সঙ্গে উট পেরে উঠত না।

এই ভাবেই একদিন হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো পিছিয়ে পড়ল। প্রভুত্ব করতে এগিয়ে এল আর্যরা।

সামভোতা একটু থামলেন। তারপর বললেন, সিঙ্কুসভ্যতা কী করে ধ্বংস হয়ে গেল সে সব কথা বলার সময় এখন নয়। শুধু এইটুকুই জানাতে চেয়েছিলাম, খ্রিস্টপূর্ব তিন সহস্র বছর আগেও হরপ্পা, মহেঞ্জোদাড়োর লোকেরা ঘোড়া দেখে ভয় পেত। তারা অনুমান করতে পারত এক একটি ঘোড়ার ওপর এক একটি অপদেবতা বসে চারিদিকে লক্ষ রাখছে। অথচ তাদের দেখা যায় না।



এখন, এই কিছুক্ষণ আগে যে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ আমরা শুনলাম, সেসব ঘোড়ার পিঠে যারা সওয়ার তারা কেউ জীবন্ত মানুষ নয়, প্রেতাঙ্গা। আর ঘোড়াগুলোও তাই।

বিভাস বলল, না হয় তাই হল। এখন আমার দুটো প্রশ্ন। এক—আপনি বলেছিলেন কলকাতার মিউজিয়ামে বারে বারে গিয়েছিলেন মমির কেসের মধ্যে কিছু খুঁজতে। কী খুঁজতে বলেননি। আজ বলবেন?

সামভোতা বললেন, যথাসময়ে বলব। এখন তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন কী?

বিভাস বলল, ঐ যে অদৃশ্য ঘোড়সওয়াররা ঘোড়া ছুটিয়ে গেল। কোথা থেকে এল বা কোথায় গেল বলে মনে করেন?

সামভোতা হাসলেন। বললেন, অন্তত আট-ন’শো বছর আগে এই বিদেশীরা কোন জাতির দেহ ধারণ করে সৈনিকবৃত্তি নিয়েছিল, কোন রাজার সৈনিক কোন রাজ্য আক্রমণ করতে চলেছে এসব কি আমার মতো সামান্য একজন মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব? একজন খুব উঁচুদের ইতিহাসবিদও এর উত্তর দিতে পারবেন না। কারণ ইতিহাসবেত্তারা মানুষ নিয়ে গবেষণা করেন, প্রেতাঙ্গাদের নাগাল পান না। তবে—

সামভোতা একটু থামলেন।

তবে কী?

আমি সন্ন্যাসীই হই বা যাই হই মনে-প্রাণে আমি একজন ইতিহাসপ্রেমী। শুধু ইতিহাসপ্রেমী নই, প্রাচীন কালের মানুষদের সমাজ, তাদের সংস্কার, তাদের ধর্ম, তাদের ক্রিয়াকলাপ সব নিয়ে গবেষণা করতে ভালোবাসি। সারা জীবন আমি ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছি। আমি তিব্বতী। তিব্বত আমার দেশ। ওখানকার প্রতিটি ধূলিকণায় কত না প্রাচীন সংস্কার লুকিয়ে আছে—আমি সেসবের সন্ধান করেছি। ‘ওঁ মণিপদ্মে হুম’ এই শাস্ত্রীয় কথার মধ্যে যে কী যাদু আছে তা পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির মানুষকে বোঝাতে পারব না। এই কথাটা উচ্চারণ করলেই আমার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তিব্বতের কত প্রাচীন গোম্ফায় গোম্ফায় আমি ঘুরে বেড়িয়েছি—শুধু চোখের দেখার জন্যে নয়, ঠিক কী খুঁজে পেতে চেয়েছি তা আমি নিজেও জানি না। বৌদ্ধদের দেবদেবীর শেষ নেই।

গিয়েফাং থেকে জোখাং মন্দিরে এগারো মাথা হাজার হাতযুক্ত অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ বা চেং রেজি—সবই আমি দেখেছি। দেখেছি দু-চার বার নয়, বহু বার। কিন্তু যা খুঁজতে চাই তা পাই না। বলে তিব্বতী সন্ন্যাসী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

শুনতে ভালোই লাগছিল। কিন্তু হাতি-ঘোড়া কী যে খুঁজে পাচ্ছেন না তা বুঝতে পারলাম না।

একটু থেমে তিনি ফের বলতে লাগলেন, আমি কিছুকাল ধরে মোঙ্গলদের কথা পড়ছি। মোঙ্গলদের দেশ হচ্ছে মোঙ্গলিয়া। এটা কোথায় জান তো?

আমরা লজ্জায় পরস্পরের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

সামভোতা একজন যোগ্য শিক্ষকের মতো গম্ভীর গলায় বললেন, শুধু এক ফালি পশ্চিমবঙ্গ, বড়োজোর ভারতবর্ষের ম্যাপটা মনে রাখলে চলবে না। চোখের সামনে রাখতে হবে গোটা পৃথিবীর মানচিত্র। যাই হোক এশিয়ার মানচিত্রটা একবার খুলে দেখো। চিনের ঠিক ওপরেই মোঙ্গোলিয়া। মোঙ্গোলিয়ার মাথার ওপরেই সোভিয়েত রাশিয়া। আর অনেক নীচে চিনের গায়ে গায়ে আমাদের দেশ তিব্বত। আর তিব্বতের গায়ে তোমাদের ভারতবর্ষ।

বিভাসটা সত্যিই তড়বড়ে। পণ্ডিত ব্যক্তিটি সবে একটু কথা বলতে শুরু করেছেন অমনি

বিভাস বলে উঠল, কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় তিব্বত আর কোথায় মোঙ্গোলিয়া! পৃথিবীতে এত দেশ থাকতে হঠাৎ মোঙ্গোলিয়াকে নিয়ে পড়লেন কেন?

সামভোতা বিরক্ত না হয়ে বললেন, অধৈর্য হচ্ছ কেন? এই মোঙ্গোলিয়ার সঙ্গে এমন একটি ইতিহাস জড়িয়ে আছে যা সন্ধান করতে আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। এখন—এ কী! এখনি অন্ধকার হয়ে আসছে কেন? আমার ঘড়িতে তো সব সাড়ে তিনটে। তোমাদের?

আমরাও দেখলাম আমাদের কারও ঘড়িতে তিনটে পঁচিশ, কারও কয়েক মিনিট বেশি।

পাহাড়ে ঘেরা চারিদিক তো। তাই বেলা যতই থাক সূর্য পাহাড়ের আড়ালে চলে গেলেই দিনের আলো কমে আসে। নাও, ওঠো। আর দেরি হলে পথ খুঁজে পাব না। বলতে বলতে আকাশের দিকে আর একবার তাকিয়েই অদ্ভুত ব্যস্ত হয়ে পাহাড় থেকে নামতে লাগলেন।

আপনি যেন একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। সেই কথাটা শুনিয়ে দিন।

সামভোতা বললেন, শুধু সেই একটুকরো কথা শুনলে তোমরা কিছুই বুঝতে পারবে না। তবু বলছি, আমি নিশ্চিত যে, মোঙ্গোলিয়ার রাজধানী উর্গা বা উলানবাটোর থেকে খারজম (Khawrizm), সমরখন্দ, বোখারা, আফগানিস্তান, হিরাট, গজনী হয়ে অন্তত পেশোয়ার পর্যন্ত একটা রাজপথ ছিল। যেমন রোটাং গিরিপথই বহু কাল ধরে লাহল, স্পিতি, লে, লাদাখ এবং মধ্য এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যপথ হয়ে আছে। কত যুগ ধরে কত বণিকের দল উট, ঘোড়া কিংবা গাধার পিটে মাল চাপিয়ে বরফ-পড়া শীতে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গেছে। কতজন পথশ্রম আর হিমপ্রাহ সহ্য করতে না পেরে মাঝপথেই প্রাণ হারিয়েছে। সেই সব মৃতদেহ পড়ে থেকেছে তুষারধবল পাহাড়ের নীচে কিংবা ভাগ্য ভালো হলে পাহাড়ি ঝর্নার জলে হয়েছে সলিলসমাধি। ফিরে তাকাবার বা শোক করবার বা ভয় পেয়ে পা গুটিয়ে বসে থাকার উপায় নেই। মাইলের পর মাইল তাদের হাঁটতে হবে—১৩০০০/১৪০০০ ফুট চড়াই ভেঙে। প্রকৃতির এই ভয়ঙ্কর পরিবেশে ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে তাদের চলে না।

বিভাস বলল, না হয় বুঝলাম এইখানেই কোথাও আদিকালের সেই পথটা আছে। কিন্তু সে পথটা খোঁজার জন্যে আপনার এত আগ্রহ কেন? সারা পৃথিবীর স্থলভাগে আদিকাল থেকে কত পথই না ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে অনেক পথ হয়তো ধসে চাপা পড়ে গেছে কিংবা পাহাড়ি নদী গ্রাস করে ফেলেছে। তাহলে একটা বিশেষ পথের জন্যে মাথা ঘামানো কেন?

আমার মন ছটফট করছিল। গাড়িটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে সারানো হয়ে গেছে। আপাতত গাড়িতে গিয়ে বসতে পারলে বাঁচি।

সামভোতার যেন কোনো দুর্ভাবনা নেই। পাহাড় থেকে নামতে নামতে এক জায়গায় একটু দাঁড়িয়ে পাশের পাহাড়ের পথে হাঁটতে লাগলেন। বিভাসের কথার উত্তরে বললেন, আমার ধারণা সেই পথ দিয়েই ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অর্থাৎ ১২২১ সাল নাগাদ মোঙ্গোলীয় যোদ্ধা চেঙ্গিস খাঁ সৈন্যে দিগ্বিজয়ে যেতেন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তার মানে প্রায় আটশো বছর আগে!

বিভাস বিক্রপের সুরে বলল, রাজা বা সেনাপতিরা যুদ্ধ করতে সৈন্য রাজপথ দিয়েই যাবে। আর রাজপথ যদি একটি থাকে তাহলে সেই পথেই যাবে। এতে আর ভাবনার কী আছে!

সামভোতা বললেন, যে রাজপথের কথা বলছিলাম সেই পথ দিয়েই যদি কফিনও নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেই পথ পরে ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল।

কথা বলতে বলতে আমরা এক একটা পাহাড়ি পথ অতিক্রম করছিলাম। কেবলই ভাবছিলাম পাশের ঐ পাহাড়টা দিয়ে এগোলে হয়তো তাড়াতাড়ি নামা হবে।

আগে আগে যাচ্ছিলেন সামভোতা। পাহাড়ের বাতাসে তাঁর গায়ের র্যাগ গরম কোট থেকে বারে বারে ঝুলে যাচ্ছিল। তিনি বারে বারেই সামলাচ্ছিলেন। আর হনহন করে হাঁটছিলেন। তাঁর হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল তিনি কিছু ভাবতে ভাবতে হাঁটছেন।

হঠাৎ পিছন ফিরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আমাদের উদ্দেশে বললেন, গাইড ছোঁড়াটা গেল কোথায়?

তাই তো!

আমরা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম। কোথাও নেই।

তাই তো! ছোকরা গেল কোথায়?

আমি বললাম, কিছুক্ষণ আগে দেখলাম ও মাথা নিচু করে এগিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল যেন আমাদের এড়িয়ে তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইছিল।

সামভোতা গম্ভীরভাবে বললেন, গাড়ি খারাপ হওয়ার সময় থেকেই ওর মুখে চোখে দুশ্চিন্তার ছাপ দেখেছিলাম। তারপর ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনার পর থেকে ও যেন কেমন ভয় পেয়ে গেল। ও যেন অশুভ কোনো ঘটনার গন্ধ পাচ্ছিল। হাজার হোক ও তো এসব অঞ্চলের লোক। অনেক কিছুই জানে।

বিভাস বলল, ওসব কিছু নয়। যতক্ষণ গাড়ি ছিল, বেশ আরামে ছিল। তারপর পাহাড়ে উঠতে ভালো লাগছিল না। আমার মনে হচ্ছে ও কেটে পড়েছে।

কী পড়েছে? সামভোতা চলতি বাংলা কথাটা বুঝতে পারলেন না।

বললাম, এটা আমাদের এখনকার চলতি কথা। ‘কেটে পড়েছে’ মানে—না বলে চলে গেছে।

ও আচ্ছা। তা যাক। কিন্তু আমার ভয় পথ হারিয়ে না ফেলে।

বলেই তিনি হন হন করে হাঁটতে গেলেন কিন্তু জোরে হাঁটতে পারছিলেন না। কারণ প্রথমত পাহাড়ি পথ, সর্বত্র পাথর ছড়ানো। দ্বিতীয়ত কিছুক্ষণ ধরে একটা ঝোড়ো বাতাস শুরু হয়েছে। সেই বাতাসটা আসছে সামনের দিক থেকে। ফলে বাতাস ঠেলে এগোনোই মুশকিল। এ অবস্থা আমাদের দুজনেরও। তাই তো, জিগমে গ্যাটসোটা কোথায় গেল? ও কি সত্যিই পালিয়ে গেল? না কি পথ হারাল?

যদি পথ হারায় তো সর্বশেষে কথা। যে হোটেল থেকে ওকে এনেছিলাম সেখানে তো পৌঁছে দিতে হবে!

একেই তো পাহাড়ের ওপর আমার বিন্দুমাত্র ভালো লাগছিল না। তার ওপর এই এক দুশ্চিন্তা।

হিমালয়ের রাজত্বে এসে পর্যন্ত এখনকার আবহাওয়ার মর্জি বুঝতে পারছি না। কখনও মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, কখনও বৃষ্টি, কখনও দমকা হাওয়া, কখনও তুষারঝড়। কখনও ধূলিঝড়। শীতে হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। তা ছাড়া হঠাৎ হঠাৎ কুয়াশা তো আছেই। পথ হাঁটাই যায় না।

এখন আমার শীতের পোশাকের বর্ণনা একটু দিই। মোটা গেঞ্জি। তার ওপর দুটো ফুলহাতা সোয়েটার। তার ওপর উইন্ডচিটার। তার ওপর মোটা ওয়াটার প্রুফের কোট। পরনে উলের প্যান্ট। মাথায় মাক্সি টুপি। হাতে উলেন দস্তানা। পায়ে নাইলনের মোজা, তার ওপর উলেন মোজা। জুতোর কথা নাই বললাম।

কলকাতায় বসে তোমরা যখন এই উপন্যাস পড়বে তখন আমার এই পোশাক শুনে এখানে শীতটা কেমন কল্পনা করার চেষ্টা করো।

বিভাসের সব তাতেই বাড়াবাড়ি। আমার পোশাকের বহর দেখে হেসেই খুন। বললে, আস্ত একটা ক্লাউন। ও বলতেই পারে। কারণ তার গায়ে একটা হাফহাতা সোয়েটার, তার ওপর একটা ফুলহাতা সোয়েটার, তার ওপর উইন্ডচিটার। পরনে নাইলনের প্যান্ট, হাতে গ্লাভস। মাথায় টুপি। ওর টুপির বাহার দেখে ওকেই ক্লাউন বলে মনে হচ্ছিল আমার।

খুব সিমপল অথচ ফিটফাট লাগছিল তিব্বতী সন্ন্যাসীটিকে। যেমনই হোক তিনি সন্ন্যাসী। তাঁর আলখাল্লার আড়ালে পুরু সোয়েটার আর একটা গরম কম্বল আড়াআড়ি ভাবে জড়ানো। মাথায় সেই গেরুয়া টুপি। ফোলা ফোলা চোখ। ঠাণ্ডায় যেন আরো ফুলে উঠেছে। কাঁধে একটা বড়ো ব্যাগ। তার মধ্যে নিশ্চয় রাত্রে গায়ে দেবার কিছু কম্বল-টম্বল আছে।

কিন্তু জিগমে বেচারি গরিব। তার গায়ে একটা ফুলহাতা সোয়েটার আর মাথায় পাগড়ির মতো জড়ানো একটা মাফলার ....।

সতি ছেলেটা গেল কোথায়? গাইড হিসেবে ওকে আনা আমাদের ভুল হয়েছে। এখন মানে মানে ওকে সেই হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারলে বাঁচি।

উতরাই ধরে অল্প একটু নামতেই হঠাৎ সামভোতা দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর চলার গতির মধ্যে হঠাৎ ব্রেক কবা দেখে আমরা বুঝলাম নিশ্চয় সামভোতা এমন কিছু দেখেছেন— দ্রুত পায়ে তাঁর কাছে যেতেই তিনি আঙুল তুলি দেখালেন, Look!

দেখলাম। পাহাড়ি ঝোপের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জিগমে পটাপট করে কী সব লতাপাতা ছিঁড়ছে। আর নিজের গলায়, মাথায়, বাহুতে জড়াচ্ছে।

সামভোতা কয়েকবার তার নাম ধরে ডাকলেন। কিন্তু জিগমে সাড়া দিল না। একটু উঁচুতে একটা ফুল ফুটেছিল। সেটা নেবার জন্যে লাফালাফি করেই চলল।

সামভোতা এগিয়ে গেলেন। দেখলেন জিগমের চোখমুখ ভয়ে বসে গিয়েছে। কাঁটার আঁচড়ে তার কপাল, হাত ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে।

ঐ ফুলটা তোমার চাই?

জিগমে মাথা দোলাল। দীর্ঘদেহী সামভোতা ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে ফুলটা পেড়ে দিলেন। তাতে জিগমে কতটা খুশি হল বোঝা গেল না। তবে নিশ্চিত হল।

এবার সে কিছু কিছু লতাপাতা আমাদের তিনজনের কজিতে বেঁধে দিল।

সামভোতা জিগেস করলেন, এগুলো দিয়ে কী হবে?

জিগমে পাহাড়ি ভাষায় যা বলল সামভোতা বাংলা করে বুঝিয়ে দিলেন। জিগমে নিশ্চিত এই অঞ্চলে অপদেবতার ভয় আছে। গাড়িটা যখনই খারাপ হল তখনই ও নাকি বুঝতে পেরেছিল অদ্ভুত ঘটনা ঘটবেই। তারপর যত সবাই পাহাড়ে উঠতে লাগল ততই ও নাকি নিশ্চিত হয়েছিল জায়গাটা খারাপ। তাই এগোতে চাইছিল না। তারপর সেই অদৃশ্য ঘোড়া আর খুরের শব্দ ...

ও আরও বলল, এ কহানি তার জানা আছে।

থিব্—থিব্—বলে জিগমে হঠাৎ চিৎকার করে উঠেছিল।

থিব্! চমকে উঠলেন সামভোতা।

বোঝা গেল এই নাম তিনি জানেন।

থিব্ কোথায় জিগমে?

ও উত্তর দিতে পারল না। শুধু সামনের একটা উঁচু পাহাড় দেখিয়ে দিল। বুঝিয়ে দিল যেখান দিয়ে ঘোড়াগুলো ছুটছিল সেখানেই আছে থিব্—অতি ভয়ংকর ....

এই বিশেষ ধরনের লতাপাতা ফুল গায়ে জড়ানো থাকলে প্রেতাঙ্ঘরা নাকি কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

### পাহাড়ে আতঙ্ক

জিগমের মতো একজন পাহাড়ি ছেলের ভয়-সম্প্রস্তু মুখে যখন থিব্—এর कहানি উচ্চারিত হল তখন বিভাস খুব কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে এসেছিল সব ঘটনাটা শুনতে। কিন্তু জিগমে আর একটি কথাও খরচ করল না। জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে চলল।

তার ভাবখানা এমনই যেন একমাত্র প্রেতাঙ্ঘা ছাড়া আর কারও পরোয়া করে না। সামভোতার মুখটা ক্রমশই গম্ভীর হয়ে উঠছিল। কিছু একটা বুঝে তিনি তিব্বতী ভাষায় জিগমেকে আশু আশু চলতে বললেন। কিন্তু জিগমে কারো কথা শোনার পাত্র নয়। শুধু পিছনের পাহাড়টার সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গটা আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়েই জোরে হাঁটতে লাগল।

আমরা তিনজনেই সেই উঁচু চূড়োটার দিকে তাকালাম। বাদুড়ের পাখা ঝাপটানোর গতিতে ধোঁয়াটে অন্ধকার একটা আকার ধারণ করে ক্রমশ এই দিকে এগিয়ে আসছে .... এছাড়া আর কিছু দেখা গেল না।

বুঝলাম জিগমে ঐ অন্ধকারটাকেই ভয় পাচ্ছে।

আবার আমাদের পাহাড়ি পথে হাঁটা। কোথায় যাচ্ছি তা জানি না। জিগমে তো জানেই না। এমনকি মনে হচ্ছে সামভোতাও কেমন দিশেহারার মতো হাঁটছেন।

আমি তো আগেই বলেছি আমার বন্ধুটি যেমন দুঃসাহসী তেমনই বেপরোয়া। পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতি খেয়াল না রেখেই সময় সময় এমন এক-একটা মন্তব্য করে বসে যা শুনে আমারই লজ্জা করে। যেমন এখন নানারকম দুশ্চিন্তার জন্যে তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নামার সময়ে ও হঠাৎ সামভোতাকে জিগ্যেস করল, আচ্ছা সন্ন্যাসীজি, (সামভোতাকে কী বলে সম্বোধন করবে বিভাসের তা ঠিক থাকত না। আর যাই হোক অত বড়ো পণ্ডিত মানুষটি যিনি বাপ-কাকার বয়সী তাঁকে তো মিস্টার সামভোতা বলা যায় না।) সেদিন ট্রেনে মোঙ্গলদের কথা বলছিলেন, এরাই কি ইতিহাসের মোগল?

সামভোতাকে ভালো করে এখনও চেনা হয়ে না উঠলেও এইটুকু বুঝেছি উনি আমাদের মতো অর্বাচীন ছোকরাদের যেমন-তেমন কথাবার্তায় বা মন্তব্যে রেগে যান না, বিরক্তও হন না। বাইরের শাস্ত্র ধীর, সৌম্য মূর্তির মতোই তাঁর অন্তঃকরণটাও যেন অমলিন, স্বচ্ছ, সুন্দর।

বললেন, এইরকম একটা সময়েও তোমার জানার আগ্রহ ভালো লাগল। না, মোঙ্গলরাই মোগল বা মুঘল নয়। তবে পরে—অন্তত একশো বছর পরে দুর্ধর্ষ মোঙ্গলদের অনেকেই তুর্কি জাতির সঙ্গে মিলে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে অনেকখানি সভ্য হয়ে ওঠে। তারাই পরে ইতিহাসে মুঘল নামে পরিচিত হয়।

একটা প্রশ্নের উত্তর পাবার সঙ্গে সঙ্গে গুরুতর পরিস্থিতির কথা মনে না রেখেই আমার বেপরোয়া বন্ধুটি ফের জিগ্যেস করল, স্যার, এইমাত্র আপনি বললেন তুর্কি জাতির সঙ্গে মিলে আর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মোঙ্গলরা অনেকখানি 'সভ্য' হয়ে উঠল। তা হলে কি মোঙ্গলরা অসভ্য ছিল?

সামভোতা একটা ছোটোখাটো পাথরের চাঁই লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে পাশের ঢালের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, ‘মোসল’ কথাটির উৎপত্তি হয়েছে ‘মোঙ’ শব্দ থেকে যার মানে হচ্ছে ‘নিভীক’। তারা ছিল মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতি। তারা বেশিরভাগই ছিল সুদক্ষ অশ্বারোহী, নিষ্ঠুর আর দুর্ধর্ষ সৈনিক। তাদের হাতে থাকত বাঁকা তরোয়াল আর বর্শা। চেস্টিস খানের বাহিনীর বেশির ভাগই ছিল দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী এই মোসল যাযাবররা।

এই রণোন্মাদ রক্তপিপাসু সৈন্যদের সাহায্যে তিনি পিকিং অধিকার করেন। আর এক বছরের মধ্যেই চিনের উত্তর ভাগ দখল করে নেন। মোঙ্গোলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে যে বিশাল খোয়ারদাম সাম্রাজ্য তাও চেস্টিসের পদানত হয়। তারপর বুখারা, সমরখন্দ, বান্খ এমনকি আফগানিস্তানের হিরাট প্রভৃতি শহরগুলি শুধু অধিকার করা নয়, ধ্বংস করে ফেলা হয়।

আর এইসব মোসলদের চেহারা কেমন ছিল শুনবে? শোনো—

যা বলব তা আমার শোনা কথা নয়। বিখ্যাত কবি আমীর খসরু একবার এই মোসলদের হাতে বন্দি হয়েছিলেন। একে কবি মানুষ। ঝগড়াঝাঁটি, অশান্তি মোটেই পছন্দ করেন না। সেপাই-শাস্ত্রী, কারাগারের কথা ভাবলে ভয় পান। ঘটনাচক্রে তিনিই মোসলদের জালে পড়েন। তার জন্যে তাঁর দোষ ছিল না। কিন্তু কে শুনবে তাঁর কথা? মোসলরা কবি-টবির ধার ধারে না। আমীর খসরু তো মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, কিন্তু কী ভাবে যে তাঁর মুক্তি হল সে ইতিহাস অন্তত আমার জানা নেই। তবে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে এই মোসলদের যা বর্ণনা দিয়েছেন তা এই রকম—‘তাদের পশমের পাগড়ি বাঁধা লাল টকটকে মুখ দেখলে মনে হত পশমগুলো যেন জ্বলছে। তাদের মাথা ন্যাড়া। পাথরের গায়ে সরু ফাটলের মতো ছিল তাদের ক্রুর চোখ। তাদের সকলেরই শরীর থেকে পচা মৃতদেহের গন্ধ বেরোত, যে গন্ধ তাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। বিশাল জয়ঢাকের চামড়ার মতো খসখসে তাদের গায়ের চামড়া। তাদের নাকের গর্ত দুটো ছিল এ গাল থেকে ও গাল পর্যন্ত চওড়া। নাকের গর্ত সব সময়ে ভিজে থাকত। আর তা থেকে নর্দমার গন্ধ বেরোত। বড়ো বড়ো দাঁত দিয়ে তারা কুকুর-শুয়ারের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত। জল খেত নানা-নর্দমার। আশ্বাদহীন ঘাস ছিল তাদের আর এক ধরনের প্রিয় খাদ্য।’

সামভোতা এই পর্যন্ত বলে সকলকে নির্দেশ দিলেন, ওহে নওজোয়ানরা আরও একটু জোরে হাঁটতে হবে। মনে রেখো এখনও পর্যন্ত যেখানে আমরা রয়েছি তা সুখকর নয়।

কথাটা শুনে আমার খটকা বাধল। কী বলতে চাইছেন উনি—‘সুখকর নয়’, না ‘নিরাপদ নয়’।

একবার চারিদিকে তাকালাম। পাহাড়ের পর পাহাড়। পাহাড়ের ওপর লম্বা লম্বা ফার, পাইন আর চিনার গাছ।

ইতিমধ্যেই আমার নাছোড়বান্দা বন্ধুটি ফের ঝাঁপিয়ে পড়েছে—

আচ্ছা স্যার, চেস্টিস খানের চেহারা পোশাক-পরিচ্ছদ কীরকম ছিল?

সামভোতা হেসে বললেন, সত্যিই তুমি অদ্ভুত। পাহাড়ে যখন ভয় দেখা দিয়েছে, আমরা যখন নামার জন্য ব্যস্ত তখনও তোমার যেন কোনো দৃষ্টিশক্তি নেই। অবশ্যই এটা তোমার একটা গুণ।

একটু থেমে বললেন, প্রাচীন তিব্বতী গ্রন্থে এক জায়গায় বলা হয়েছে—দাঁড়াও পড়ে শোনান। বলে ঝুলি থেকে একটা বাঁধানো জীর্ণ বই বের করে পড়তে লাগলেন—‘একটু আগে ছোটো ছোটো বন্দি শিশুদের খাবারের লোভ দেখিয়ে ডেকে এনে পাহাড়ের ওপর থেকে তাদের

ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাততালি দিয়ে হেসে উঠেছিলেন মোঙ্গলদের ভয়ংকরদর্শন অধিপতি কটা দাড়িওয়ালা চেঙ্গিজ খান স্বয়ং। .... তারপর তাঁর বাদামি রঙের তেজি ঘোড়ায় চেপে খান-ই-খানানা আনন্দে শিস দিতে দিতে নিজের হলুদ রঙা তাঁবুতে ফিরে গেলেন। ...’

আর এক জায়গায় .... ‘দীর্ঘদেহী চেঙ্গিজ খান স্বর্ণ সিংহাসনের ওপর পা গুটিয়ে বসেছিলেন। তাঁর কালো ভয়ংকর মুখে তামাটে রঙের দাড়ি। তাতে পাক ধরেছে, মাথায় গোলাকার কালো মুকুটের ওপর বিশাল পাল্লা বসানো। মুকুট থেকে কাঁধের ওপর ঝুলছে তিনটে শেয়ালের লেজ।’

দাঁড়ান, দাঁড়ান। অবাক সুরে বিভাস বলে উঠল, শিয়ালের ন্যাজ!

হ্যাঁ।

কী বীভৎস!

আরও শোনো। ‘তাঁর চোখ দুটো ছিল পাহাড়ি বেড়ালের চোখের মণির মতো ঈষৎ সবুজ। সে তো মানুষের চোখ নয়, প্রেতের চোখ।’

কথা বলতে বলতে ওরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। পথ কি ফুরোবে না? আমি ছটফট করছি কখন গাড়িতে গিয়ে বসব। এতক্ষণে নিশ্চয় গাড়ি সারানো হয়ে গেছে। অ্যাডভেঞ্চারের শখ মিটেছে। এখন পালাতে পারলে বাঁচি।

কিছুক্ষণ আগে থেকে একটা অস্পষ্ট গুমগুম শব্দ কানে আসছিল। পাইন গাছের ঘন জঙ্গলটাকে বাঁ দিকে রেখে ডান দিকে ফিরতেই শব্দটা স্পষ্ট হল। আমরা পরস্পরকে জিগ্যেস করলাম, কিসের শব্দ?

সামভোতা মুখে কিছু বললেন না। দাঁড়িয়ে পড়ে শুনতে লাগলেন।

তোমরা আমার পিছু পিছু এসো। মনে হচ্ছে কোনো খরস্রোতা নদীর শব্দ। কিন্তু নদী এল কোথা থেকে? যেন নিজের মনে প্রশ্ন করলেন সামভোতাজি।

বিভাস বলল, পাহাড়-পর্বতে নদী থাকাটা কি অস্বাভাবিক? দাঁড়ান দেখছি। বলে সে একছুটে একটা ছোটো পাহাড়ের দিকে অনেকখানি চলে গিয়েছিল, সামভোতা লাফ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে খপ করে বিভাসের হাত ধরে টেনে নিলেন।

চোখ মেলে দেখো।

সবাই দেখলাম মাত্র কয়েক হাত দূরে পাহাড়ের আড়ালে গভীর খাদ। আর তারই ধার ঘেঁষে ঘুরপাক খেতে খেতে ছুটছে সুরু একটা খরস্রোতা নদী।

ইস্ এখুনি কী সর্বোনাশ হত! বললাম আমি।

কিছুই হত না। ঠিক সামলে নিতাম। কী বলুন সামভোতাজি! তা ছাড়া পাহাড়-পর্বতে খাদ থাকবেই। আমি তা ভালো করে জানতাম বলে সাবধানও ছিলাম।

ঘোড়ার ডিম ছিলে। চালবাজির একটা সীমা থাকা উচিত। কথাটা আমি মনে মনে বললাম। সামভোতা বোধহয় কোনো কথাই শুনছিলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু ভাবছিলেন। কী ভাবছেন? জিগ্যেস করলাম উদ্বেগের সুরে।

যাবার সময়ে অর্থাৎ পাহাড়ে ওঠার সময়ে তো কোনো খাদ বা নদী-নালা দেখিনি। চমকে উঠলাম। তাই তো!

বিভাস কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলল, তা হলে নির্ঘাৎ আমাদের পথ ভুল হয়ে গেছে। ভালোই হল স্যার, অন্ধকার পথে অজানা ঠিকানার উদ্দেশে অ্যাডভেঞ্চারটা বেশ জমবে। সামভোতা কোনো উত্তর দিলেন না। আকাশের দিকে উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে

রইলেন। তখন অন্ধকার চরিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, দোষ আমারই। দিক ঠিক করতে পারিনি।

জিগমে একটা পাথরের ওপর বসে একমনে গাছের সেই লতাপাতাগুলো জড়াচ্ছিল। বিভাস ধমকে উঠে বলল, তুই তো গাইড। ভুল পথে এলি কেন?

উত্তরে ও যা বলল সামভোতা তা বুঝিয়ে দিলেন। —ও বলতে চাইছে প্রথম থেকেই পাহাড়ে ওঠায় ওর আপত্তি ছিল। তারপর অশরীরী ঘোড়সওয়ারগুলোর ঘোড়ার খুরের শব্দ ও .... তো পালিয়েই আসছিল—আমরাই দেরি করলাম।

বাঃ! খাসা জবাব।

তা বাবা, এখন কোন দিকে গেলে আমাদের গাড়ির টিকি দেখা যাবে বলতে পার? জিগমে নিঃশব্দে এবং নির্ভীকভাবে মাথাকে শুধু এদিক থেকে ওদিকে নাড়ল। অর্থাৎ সে জানে না।

সামভোতা গম্ভীর মুখে বললেন, এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। যে রাস্তার ওপর আমাদের গাড়িটা রয়েছে তারই সমান্তরাল কোনো পথ আন্দাজে ঠিক করে এগোতে হবে। গাড়িটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে সারানো হয়ে গেছে, আর বোধ করি বুদ্ধিমান ড্রাইভার সেই পথ ধরে এগিয়ে গেছে আমাদের খোঁজে।

আমার বন্ধুটি যেন ব্যঙ্গ করে বলল, সেরকম হলে তো ভালোই হয়। কিন্তু আন্দাজে নতুন পথ ধরে যেতে যেতে সেই অশরীরী ঘোড়াদের রাস্তায় গিয়ে পড়ব না তো?

দেখা যাক। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে সামভোতা হাঁটতে শুরু করলেন।

হায় রে, ভেবেছিলাম এতক্ষণে কোথায় গাড়ির গদিতে পা ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজিয়ে পড়ে থাকব। তা নয় অন্ধকার অজানা পথে চলেছি পাথরে ঠোঁকর খেতে খেতে।

সামভোতা কাঁধের বুলি থেকে টর্চ বার করলেন। নতুন তেজি ব্যাটারি। বোতাম টিপতেই আলোর ছটা অনেক দূর গিয়ে পড়ল। কিন্তু তাতে মোটেই উৎসাহ পেলাম না। সামনে শুধুই কালো কালো পাহাড়—আর পাহাড়ের গায়ে বিরাট বিরাট গাছ যেন পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

হতচ্ছাড়া বিভাসের দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা বলে ব্যাপারগুলোই নেই। এই প্রবল ঠান্ডায় অন্ধকার অজানা বিপদসংকুল পথে চলতে চলতে যখন ভয়ে আমার বুক কাঁপছে তখন ও কিনা সামভোতাকে সোজাসুজি বললে, এটাই কিন্তু স্যার, সবচেয়ে ভালো পরিবেশ যখন পথের ক্লান্তি ভোলায় একমাত্র উপায় ভূতের গল্প শোনা।

রাগে আমার শিরাগুলো দপদপ করতে লাগল। ইচ্ছে করল সকলের সামনেই বিভাসটার কান দুটো আচ্ছা করে মূলে দিই। বিন্দুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকলে কি কেউ এই দুঃসময়ে দুর্গম পথে ভূতের গল্প শুনতে চায়? কয়েক ঘণ্টা আগে ঘোড়ার খুরের শব্দের কথা কি ভুলে গেছে? সত্যিই তারা অশরীরী কিনা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়নি ঠিকই, তবু পাহাড়ের পর পাহাড়ের রাজ্যে এতগুলো ঘোড়া ছোটো কি বাস্তবে সম্ভব? কোন যুগের কোন দেশের কোন রাজা কোন রাজ্য দখল করতে ছুটল কে বলতে পারে? তা ছাড়া এ যুগে অশ্বারোহী সৈন্য পাঠিয়ে রাজ্য জয়ের কথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না। এই অলৌকিক ব্যাপার-সাপার দেখার পরও এখন আবার ভূতপ্রেতদের ডাকা কেন?

সামভোতা কিন্তু একটুকুও বিরক্ত হলেন না। বললেন, তোমার সাহস দেখে আমি খুশি হচ্ছি। কিন্তু তিব্বতের মতো জায়গায় বাস করেও ভূতের ঘটনা বিশেষ জানি না। বরঞ্চ তুমি কিছু বলো।



বিভাস বললে, দূর! কলকাতায় ভূতটুত নেই। কাজেই ভূতের গল্প আমি জানি না। আমার প্রশ্ন—চেঙ্গিস খানের মতো ভয়ংকর নেতা ভূতটুত কি মানতেন? সে তো আজকের ব্যাপার নয়, প্রায় আটশো বছর আগের কথা। তখন ভূত-প্রেতরা বেশ জাঁকিয়েই রাজত্ব করে গেছে। তাই না?

সামভোতা এ কথার উত্তর না দিয়ে হয়তো নিছক সময় কাটাবার জন্যেই বললেন, আমি চেঙ্গিস খানের ওপর নানা ইতিহাসবিদের নানা বই পড়েছি। চেঙ্গিস খান যে কখনও ভূতের মুখোমুখি হয়েছিলেন এমন কথা পড়িনি। তবে উনি সংস্কার, গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব মানতেন, কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটলে তার কারণ না জানা পর্যন্ত স্বস্তি পেতেন না। আর এই কারণ খোঁজবার জন্যে নিজের বুদ্ধি, বোধশক্তি, বিচার-শক্তি খাটাতেন না। বৈজ্ঞানিক চিন্তার কোনো ব্যাপারই ছিল না। কারণ জানার জন্যে তাঁর সাম্রাজ্যের সব বড়ো বড়ো গণ্যকার, জ্যোতিষীদের ডেকে পাঠাতেন।

একবার শিকারে বেরিয়ে একটা বন্য বরাহর পিছনে ধাওয়া করতে গিয়ে তাঁর ঘোড়া হোঁচট খায়। খান মাটিতে পড়ে যান। ঘোড়া ছুটে পালায়। বরাহটি খানের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু খানের কোনো ক্ষতি না করে ধীরে ধীরে নলখাগড়ার বনে চলে যায়। নির্ধাৎ মৃত্যুর হাত থেকে এই বেঁচে যাওয়াতেও দুশ্চিন্তায় তাঁর ঘুম হল না। মনের ভেতর যোরাফেরা করতে লাগল একটাই কথা—কে তাঁকে বাঁচাল? এতে অমর-লোকের কোনো উদ্দেশ্য আছে কিনা।

এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে তাঁর অধিকৃত চিনের উত্তর ভাগ থেকে ঐ দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী চানচুনকে ডেকে আনালেন। সব শুনে সেই চৈনিক শাস্ত্রজ্ঞানী শুধু এই কথাই বলেছিলেন যে, মহামান্য খানের অনেক বয়স হয়েছে। স্বর্গীয় নির্দেশ—তিনি যেন শিকার করাটা এখন কমান।

চেঙ্গিস খান এ কথায় সন্তুষ্ট হননি। কারণ শিকারে যাওয়া তিনি বন্ধ করতে পারবেন না।

সুদূর চিন থেকে—সহস্র লি\* পথ অতিক্রম করে আসা এই মহাজ্ঞানী তাপস চানচুনকে কাছে পেয়ে খান আরও জিগ্যেস করেছিলেন, আচ্ছা আমাকে বুঝিয়ে বলুন দেখি বজ্র জিনিসটা কী? ওঝারা আর শামানদের সর্দার বেকি আমাকে বলে, মেঘলোকের ওপারে স্বর্গলোকে যে দেবতারা থাকেন তাঁরা যখন মানুষের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে গর্জন করেন তখনই নাকি বজ্রপাত হয়। এ কথা কি সত্যি? তারা আরও বলে, লোকে যখন নিয়মমতো কালো রঙের প্রাণীর বদলে অন্য কোনো রঙের প্রাণী কুরবানি দেয় তখনই তিনি রুষ্ট হন, এ কথাও কি সত্যি? এছাড়াও লোকেরা আমাকে ভয় দেখায় গরমকালে স্নান করা বা নদীতে কাপড়-জামা ধোওয়া উচিত নয়, কস্মল বোনা কিংবা ব্যাঙের ছাতা তোলাও উচিত নয়। তাতে দেবতারা রুষ্ট হয়ে মানুষকে শাস্তি দেবার জন্যেই বজ্র ও বিদ্যুতের সন্ত্রাস করেন।

বৃদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞানী মানুষটি চেঙ্গিস খান-এর দিকে তাকিয়ে একটু হেসেছিলেন।

চেঙ্গিস খান তখন স্বর্ণসিংহাসনে সাদা পশমী গদির ওপর দুটি পা গুটিয়ে বসেছিলেন। মাথায় তাঁর গোল মুকুট। মুকুটে লাগানো শেয়ালের কালো লেজ তাঁর মুখের ওপর ছায়া ফেলেছিল। স্বর্ণসিংহাসনের দু'পাশের উঁচু উঁচু বাতিদানে জুলছিল মোটা মোটা মোমবাতি।

\* চিনা ভাষায় দূরত্বের পরিমাপ : এক 'লি' = প্রায়  $\frac{1}{2}$  কিলোমিটার।

শিবিরের মধ্যে কেউ ছিল না। থাকার মধ্যে গালিচার ওপরে বসে মোঙ্গল ও চিনাভাষায় দক্ষ তাঁর দুই দোভাষী।

পুণ্যবান চৈনিক শাস্ত্রজ্ঞানী বয়েসের কারণে দুর্বল কণ্ঠে শুধু বললেন, হে সম্রাট, আমি একজন সামান্য বুনো পর্বতবাসী। প্রাচীন পুঁথিপত্রে পড়েছি যে, মানুষের বিভিন্ন রকমের তিন হাজার অপরাধের মধ্যে ঘণ্যতম অপরাধ হল পিতা-মাতার উপর অশ্রদ্ধা। আর যিনি প্রজাপালক তাঁর বাঁকা তরোয়ালে রক্তের ছোপ লাগা। আপনার রাজ্যে এসে দেখেছি প্রজারা নিজেরা ভোজসভায় মাতামাতি করে। অন্যদিকে বৃদ্ধ পিতা-মাতা, পিতামহ-পিতামহীকে শুকিয়ে মারে। এমনকি তাড়াতাড়ি ঘর খালি হওয়ার জন্যে তাদের মৃত্যু কামনা করে; সেবাশুশ্রূষা করা তো দূরের কথা। সম্রাট অন্য কোনো কারণে নয়, শুধু এই দুটি কারণেই স্বর্গের দেবতারা অসন্তুষ্ট হয়ে নরাদমদের ধ্বংস করার জন্যে বজ্রবিদ্যুৎ নিক্ষেপ করেন। ....সামনে আবার খাদ। সাবধান! বলে সামভোতা টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলতে লাগলেন।

তবে চেস্টিস খানের স্ত্রী অশুভ আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন। তার প্রমাণ পুঁথিপত্রে পেয়েছি। একবার চেস্টিস খান পর্বতে বাস করছিলেন। সেখানে তাঁর স্ত্রী কুলান খাতুন আর চেস্টিসের শিশুপুত্র কুলকানও ছিলেন। তাঁরা দুজনেই অসুস্থ হয়ে রেশমী গদির ওপর পশুলোমের চাদর জড়িয়ে শুয়ে জুরের ঘোরে ছটফট করছিলেন। সেই পার্বত্য অঞ্চলে যতটুকু সম্ভব চেস্টিস খান চিকিৎসার ঋণটি করেননি। কিন্তু রোগ সারার কোনো লক্ষণ নেই। হতাশ কুলান খাতুন কাঁদতে কাঁদতে স্বামীকে বললেন, যেভাবে আমার চিকিৎসা করছ, তা যতই যত্ন নিয়ে হোক, তবু আমরা সেরে উঠব না। এ হল এখানকার পাহাড়ি ভূত-প্রেতের কাণ্ড। এই অভিশপ্ত জায়গায় যে থাকবে ওনারা তাকেই কষ্ট দেবেন।

একটু থেমে বললেন, খাদের তলা থেকে কেমন কুয়াশা ওঠে দেখেছ? তোমার নিজের এবং তোমার ফৌজের হাতে যে সব কচি বাচ্চার প্রাণ গেছে এ হল তাদেরই আত্মা। আমি আর ছোট্ট কুলকান এখানেই মারা যাব। বাঁচাতে গেলে নিজের দেশ মোঙ্গলস্বেপে আমাদের ফিরে যেতে দাও।

চেস্টিস খান রেগে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, এখান থেকে অন্য কোথাও যাবার কথা মুখে আনবে না। আমাকে আগে দুনিয়ার বাকি অর্ধেকটা জয় করতে হবে। তারপর অন্য কথা।

কুলান খাতুন কাঁদতে কাঁদতে বললেন, একটার পর একটা রাজ্য জয় করে, নিরাপরাধদের রক্তে হাত রাঙিয়ে আর কত ওনার বাড়িয়ে তুলবে? তানগুত-সম্রাট বুর্খানের বিকলাঙ্গ ছেলেটাকে তুমি কী নির্মমভাবে খুন করেছিলে সে কথা তো ভুলে যাওনি?

হুঁঃ! বিকলাঙ্গ হলে কি হবে, ও ব্যাটা ছিল সাক্ষাৎ শয়তানের বাচ্চা। যে আমাকে মারবার চেষ্টা করবে তাকে আমিই আগে শেষ করে দেব। এটাই আমার নীতি।

তা কি তুমি পারতে যদি না তোমার অনুগত পদলেহী কিছু সাধারণ মানুষ মিথ্যের কাঁদ পেতে বিশ্বাসঘাতকতা করে ওকে তোমার তরোয়ালের মুখে ঠেলে দিত?

সামভোতা আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ পাহাড়ের নিচু অংশের শালগাছগুলোর মধ্যে একটা ঝোড়ো হাওয়া উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে কী একটা ভারী বস্তু বিকট শব্দ করে পাশের পাহাড়ের গাছগুলোর ওপর লাফিয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে সামভোতা টর্চের বোতাম টিপলেন। এদিক-ওদিক আলো ফেললেন। তারপর বললেন, ও কিছু না, বাঁদর। এখানকার পাহাড়ে পাহাড়ে বাঁদররা রাতে লাফালাফি করে।

কিন্তু স্যার, হঠাৎ বলে উঠল জিগমে, টর্চের আলোয় আমি যে দেখলাম বাঁদর নয়। অন্য কিছু। বাঁদরের তো ল্যাজ থাকবে।

অন্য কিছু! চমকে উঠলাম আমরা তিনজনেই।

ঠিকঠাক বলো তো বাছা, ‘অন্য কিছু’ বলতে কী বোঝাচ্ছ?

একটা বড়োসড়ো মোটাসোটা কালো ল্যাড়কা। ল্যাড়কা—কিন্তু গায়ে লোম। হ্যাঁ, আর যেন মনে হল তার মাথাটাই নেই।

### অন্ধকার গুহায় কিছুক্ষণ

দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আমরা জনমানবশূন্য পথে হেঁটে চলেছি। কোথায় কোনদিকে যাচ্ছি কিছুই জানি না। পাঁচ-দশ মিনিট অন্তর আমরা প্রত্যেকেই হেঁচট খাচ্ছি। টর্চ থাকায় অবশ্য পাহাড়ি রাস্তায় সামান্য এক চিলতে পায়ে চলা পথের সন্ধান পাচ্ছি—এইটুকুই রক্ষে। শুধু চলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। সামভোতা বলতে চান রাতের মতো একটা মাথা গোঁজার জায়গা চাই-ই। আকাশে মেঘের ঘনঘটা—বিদ্যুতের চমকানি। পাহাড় কাঁপিয়ে গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে। এ যেন প্রলয়ের পূর্বাভাস! বৃষ্টি নামল বলে। তা হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে হবে। এই প্রবল শীতে বৃষ্টিতে ভিজলে, তারপর ভিজে জামা-প্যান্ট পরে রাত কাটালে মৃত্যুর ঘণ্টা বাজবেই।

আমার মাথায় তখনও ঘুরছিল সেই ‘অন্যকিছু’ বস্তুটার কথা। সামভোতামশাই বললেন. ‘পাহাড়ি বাঁদর’। বেশ কথা। তার না হয় একটা মানে আছে। কিন্তু হতভাগাটা যা বলল সে তো অদ্ভুত কথা। একটা জলজ্যাস্ত ‘ল্যাড়কা’ অর্থাৎ ছেলেমানুষ—বড়োসড়ো ‘খোকা’, মোটাসোটা, গায়ে লোম, আবার নাকি মাথাটাই নেই!—সে বস্তুটি কী?

টর্চের আলোয় চকিতের মধ্যে এমন বস্তুটি শুধু শ্রীমান জিগমের চোখেই পড়ল, আর কারও নয়!

আশ্চর্য, কারও মনে কোনোরকম খটকাই বাধল না? সন্ধ্যাসীজি তো চুপ করেই গেলেন। মুখে যেন রুমাল গুঁজে আছেন।

আমি নিচু গলায় বিভাসকে জিগ্যেস করলাম, ‘খোকা’টিকে কী মনে হল শুনে?

তৎক্ষণাৎ বলল, নাথিং। শ্রেফ ইলিউশন! চোখের ভুল!

বাস! তাহলে তো সমস্যার সমাধান হয়েই গেল। এদিকে জিগমে এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে যেন ভয় পেয়ে আমাদের মাঝখানে থাকতে চাইছে। তবু এক এক সময় দলছুট হয়ে যাচ্ছে। একে গাঢ় অন্ধকার। তার ওপর কালো রঙ। মনে হল অন্ধকারে বুঝি মিশেই গেল।

জিগমে! স্তব্ধতা খান খান করে আমরা হাঁক দিই। দেখা তো নেই, সাড়াও নেই। তারপরই হঠাৎ ও যেন মাটি ফুঁড়ে ওঠে।

কী বলছ?

কোথায় গিয়েছিলি?

ঐ যে কে একজন ডাকল আমায় ঐ পাহাড়টার দিকে ...

কে ডাকল? আমরা তো ডাকিনি।

নির্লিপ্ত স্বরে বলল, তা হলে ... কি জানি।

সামভোতা বললেন, ঐ পাহাড়ের পাশে খাদ আছে। শেষ হয়ে যেতে। খবরদার, স্বয়ং চেন্সিস খান ডাকলেও আমাদের কাছ থেকে কোথাও যাবে না। মালুম?

ও সুবোধ বালকের মতো উত্তর দিল, জি হাঁ।

তবু সে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বোঝাতে চাইল ইচ্ছে করে সে ওদিকে যায়নি। কেউ ওকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

মরুক গে। এসব অদ্ভুত কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

কড়—কড়—কড়াৎ করে হঠাৎ বাজ পড়ল। বিদ্যুতের চোখ ধাঁধানো ঝিলিক ছুটে গেল সামনের পাহাড়টার দিকে। একটা দেবদারু গাছের মাথা জ্বলে উঠল। কতকগুলো পাথর গড়িয়ে পড়ল খাদের নীচে। পাহাড়ে এমন বজ্রপাত এই প্রথম দেখলাম।

তারপরই শুরু হল বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি। এই ভয়টাই করছিলাম আমরা। একটু আশ্রয়ের জন্যে সামভোতা টর্চের আলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফেলতে লাগলেন।

চলো ঐ দিকে। ঐ পাহাড়টার নীচে। মনে হচ্ছে ওখানে মাথা গোঁজা যাবে।

ছুটতে ছুটতে আমরা পাহাড়টার নীচে এসে পৌঁছলাম। পাহাড়ের এই অংশ ছাদের মতো খানিকটা বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ভিতরটা ফাঁকা। এখানে চারজনে ঘেঁষাঘেঁষি করে কোনোরকমে দাঁড়াতে পারব। সামভোতা টর্চের আলো ফেলে চারিপাশটা একবার দেখে নিলেন। গুহাটার চারিপাশে বুনো লতাপাতার ঝোপ। সাপখোপ চোখে পড়ল না। চোখে না পড়লেও আড়াল থেকে একটি নিঃশব্দ ছোবল হানতে কতক্ষণ! কিন্তু ভেবে লাভ কী?

জোর বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টির সময় কলকাতার রাস্তায় পথ চলতে চলতে আমরা যেমন ছুটে গাড়িবারান্দার নীচে আশ্রয় নিয়ে ছাঁট থেকে রেহাই পাবার জন্যে কেবল পিছোতেই থাকি, তেমনি এই সংকীর্ণ গুহায় ঢুকেই বুদ্ধিমানের মতো যতটা সম্ভব পিছিয়ে একেবারে পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম। এমন জায়গায় নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়ালাম যে বৃষ্টির ছাঁট লাগা তো দূরের কথা, বাইরে যে শীতল প্রবাহ বইছে তার থেকেও রক্ষা পেয়ে যাচ্ছি।

সবাই যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, আমি তখন উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলাম, বসবার জায়গা যদি থাকত তাহলে এখানে বসেই বাকি রাতটুকু নিরাপদে কাটানো যেত।

বিভাস দাবড়ে উঠে বলল, রাতটুকু মানে? এখন কটা বেজেছে জান?

কটা?

স্যার, টর্চটা একবার জ্বালুন তো।

টর্চটা জ্বেলেই সামভোতা বললেন, দশটা পনেরো মিনিট।

মাত্র দশটা। আমি মুষড়ে পড়লাম, তা হলে তো বৃষ্টি থামলেই আবার হাঁটতে হবে। তাও যদি জানা একটা নির্দিষ্ট জায়গা থাকত! আচ্ছা, আমরা কোথায় চলেছি? তিব্বতী সন্ন্যাসী তো বলছিলেন কোন একটা বহু প্রাচীন রাস্তার খোঁজ করছেন। সে রাস্তা নাকি ভয়ংকর! আচ্ছা, পাগল না হলে কেউ এইরকম পাহাড়ে-পর্বতে এরকম ভয়ংকর রাস্তা খুঁজে বেড়ায়? সে রাস্তাটা খুঁজে পেলে নাকি একটা ঐতিহাসিক আবিষ্কার হবে। কী জানি! ওসব ব্যাপার বুঝি না।

আর আমরা কোথায় যাচ্ছি? গন্তব্যস্থল ছিল লাদাখের রাজধানী লে। কিন্তু গাড়ি খারাপ হয়ে যাবার পর ভুল রাস্তায় পড়ে এখন যে কোথায় এসে পড়েছি তার ঠিক নেই। তাই ঠিক করা গেছে যতটা সম্ভব পাহাড়ের পথ ধরে এগিয়ে যাব। তারপর? পথের শেষ কোথায় কে জানে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ভারী হয়ে যাওয়ায় পাথরের গায়ে হেলান দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম। যে জিনিসটা আমার গায়ে ঠেকল সেটা কিছুতেই পাহাড়ের খসখসে পাথর নয়, অন্য কিছু। শরীর বাঁকানো দূরের কথা, জায়গাটা এত সংকীর্ণ যে ঘাড় ফেরানোও কষ্টকর। সেই 'অনাকিছুটা যে গুহা-ভেদ-করে-ওঠা কোনো গাছ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না তা জানতাম, তবু ঘাড় না ফিরিয়ে দু' হাত দিয়ে জিনিসটা কী বোঝবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলাম না। গাছ নয়, এটা ঠিক। তাহলে? হাত বোলাতে বোলাতে মাঝে মাঝে ফাঁকে ফাঁকে আঙুল ঢুকে যাচ্ছিল। সেইভাবেই দুটো হাত আরও একটু উপরে তুললাম। গোলমতো একটা কিছু হাতে ঠেকল। একটা ফুটোর মধ্যে দুটো আঙুল ঢুকে গেল স্বচ্ছন্দে। জিনিসটা যেন একটু নড়ে উঠল। তার পর.....তার পর দুটো সরু সরু গাছের ডালের মতো কিছু যেন আমার গলার চামড়া ছুঁল। আমি শিউরে উঠলাম। হাঁকপাক করে বললাম, স্যার, একবার টর্চটা জ্বালুন তো।

আমার গলার স্বরে নিশ্চয় ভয় ফুটে উঠেছিল তাই সাপটাপ ভেবে উনি চমকে উঠে টর্চটা জ্বাললেন।

অন্ধকার ঘুটঘুটে সেই গুহার কিছুটা অংশ আলোকিত হল। সেই আলোতেই দেখলাম।

দেখলাম যেটার গায়ে হেলান দিয়ে এতক্ষণ নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেটা একটি নরকংকাল। ঘাড়টা কাত হয়ে বুকের কাছে বুলছে। যে হাত দুটো উঠে আমার গলার দিকে এগিয়েছিল, এখন সেই হাড়িসার হাত দুটো তারই রক্তমাংসশূন্য গায়ের পাশে হাওয়ায় দুলছে। আর—

আর দেখা গেল কবেকার সেই কংকালটি লতাপাতায় শক্ত করে বাঁধা। সেটি বুলছে গুহার ছাদের উপর থেকে।

তারপর কী করে যে সবাইকে ঠেলে দুই লাফে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম তা আমিই জানি।

আবার হাঁটা শুরু হয়েছে। কারও মুখে কথাটি নেই। আমার গা-টা কেমন ঘিন ঘিন করছে। কবেকার একটা কংকাল....

কিন্তু অন্ধকার গুহার মধ্যে মরল কী করে? আমাদের মধ্যে কেউ বলছে নির্জন জায়গা পছন্দ করে দড়ির অভাবে লতাপাতা জড়িয়ে বুলে মরেছে। কেউ বলছে খুন করে গুহার ভেতর বুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিভাস প্রতিবাদ করে বলল, খুনটুন বাজে কথা। এখানে কে কাকে খুন করবে? খুন হয়েছে তার প্রমাণও নেই।

আমি বললাম, খুলিটা দেখেছিলে? কাঁধের উপর লটকে পড়েছিল না? আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি ও বেচারিকে ঘাড় মটকে মারা হয়েছে। তারপর শক্ত লতা দিয়ে বুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু মারলটা কে?

এবার সামভোতা বললেন, ও তর্ক করে লাভ নেই। টর্চের আলোর যতটুকু লক্ষ্য করেছি তাতে বুঝছি কংকালটা বুলে আছে বহুদিন। কংকালের গায়ে ছাতলা পড়ে গেছে। চটা উঠে গেছে।

এরপর কেউ আর কোনো কথা বলল না। কথা বলতে বলতে হাঁটলে ভয় থেকে দূরে থাকা যায়। কিন্তু কেউ কথা না বললে একা একা কি কথা বলা যায়? ফলে নিজেদের জুতোর শব্দ শুনে অস্বস্তি আমি চমকে উঠছিলাম—কেউ পিছনে আসছে না তো?

সামভোতার মতো এক প্রবীণ ঋষিতুল্য তিব্বতী মানুষ কখন যেন আমাদের অভিভাবক হয়ে উঠেছেন। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে তিনিই এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। টর্চের আলো ফেলে ফেলে পথ দেখে নিচ্ছেন।

সহজ হবার জন্যে একসময়ে তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি তো বেশ সাহসী ছেলে। দিবা একটা ঘাড়-মটকানো কংকালের গায়ে গা লাগিয়ে সময় কাটাচ্ছিলে।

সাহস আর কী স্যার, আমি যদি জানতাম গায়ের কাছে আস্ত একটা কংকাল বুলছে তাহলে কি ওখানে দাঁড়াতাম। তবে লোকটা কোনো এক কালে খুন হয়েছিল এ কথা ভাবতেও কষ্ট হয়। হয়তো লোকটা নিরপরাধ ছিল। তবে যদি খুনটা ভূতে করে থাকে তাহলে বলার কিছু নেই।

সামভোতা বললেন, আমার দেশে তিব্বতে প্রেতচর্চা চলে নিষ্ঠার সঙ্গে। অনেক প্রাচীন পুঁথিপত্র ঘাঁটা হয়। এইসব আলোচনাক্রমে আমিও বহুদিন ছিলাম। একটা ‘সত্য’ জেনেছি—ভূত মাত্রই মানুষের ক্ষতি করে না। অকারণে মানুষ মারে না। কিন্তু সে নিজে যদি অত্যাচারিত হয়ে খুন হয়ে থাকে তাহলে সে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে। চেস্টিস খান কতখানি নিষ্ঠুর ছিলেন প্রাচীন পুঁথিপত্র তার সাক্ষ্য দেয়। তাঁর নিজের হাতে বা তাঁর ফৌজের হাতে কত নিরীহ মানুষ খুন হয়েছে তার হিসেব নেই। সেইসব ক্ষুদ্র প্রেতাশ্বা যদি তাঁর বা তাঁর পরিজনদের ওপর প্রতিশোধ নেয় তাহলে বলার কিছু নেই। এ কথা তিনিও বুঝতেন। তাই তিনি কী করলে মঙ্গল হবে, কী করে ফেললে ক্ষতি হবে সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর নির্ভর না করে শামান, ওঝা, বৈদ্য, ফকিরদের ডাকতেন।

একবার তাঁর খেয়াল হল চুলে পাক ধরেছে। চুল পেকে যাওয়াটাকে তিনি খুব ভয় পেতেন। মনে হত এবার বৃদ্ধ হয়ে পড়বেন, তারপরেই মৃত্যু।

‘মৃত্যু’ ব্যাপারটা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। অথচ সব মানুষকেই নাকি মরতে হবে—এ তো বড়ো অদ্ভুত কথা। যদিও তাঁর উপযুক্ত ছেলে ছিল জাগাতাই, পৌত্র ছিল মৃতুগান—যে মৃতুগানই ঠিক হয়েছিল সমস্ত মুসলিম দুনিয়ার ভাবী খান-ই-খানান, তবু তাঁর হাতে গড়া বিরাট সাম্রাজ্য—

বাধা দিয়ে বিভাস জিগ্যাস করল, তাঁর সাম্রাজ্য কতদূর পর্যন্ত ছিল?

তা ধরো উত্তরে সাইবেরিয়া থেকে দক্ষিণে জর্জিয়া আর পূবে চিন থেকে পশ্চিমে রাশিয়া। বাবাঃ! এ তো বিশাল সাম্রাজ্য!

হ্যাঁ, তাই। আর একটার পর একটা রাজ্য জয় করেছিলেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিজে সৈন্য পরিচালনা করে। তাঁর দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল শত্রুদের ত্রাস। যেমন ধরো এ যুগে যুরোপ-কাঁপানো হিটলারের ট্যাঙ্ক বাহিনী। আর তাঁর সেই বিশাল সাম্রাজ্য ভেবে রেখেছিলেন তিনিই শাসন করে যাবেন চিরকাল ধরে।—‘মৃত্যু’ বলে ব্যাপারটা কোনোরকমেই বাধা না হয়ে দাঁড়ায়।

মন্ত্রীদের, পণ্ডিতদের তো মাথায় হাত। এই পৃথিবীতে জীবজন্তু তরুলতা মানুষ কেউই অমর নয়। অমর হওয়া সম্ভব নয়।

চেস্টিস খান শোনবার পাত্র নন। তাঁকে অমর হতেই হবে। তাও বিছানায় পড়ে থেকে নয়। রীতিমতো শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে। তখন তিনি তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের যত নামকরা বৈদ্য, ওঝা, কবিরাজ, হেকিমদের ডেকে পাঠালেন। এমন কিছু ওষুধ তৈরি করো যাতে অমর হওয়া যায়।

এই অসম্ভব আদেশ শুনে তাঁদের তো খুতনি ঝুলে গেল। এ কী করে সম্ভব?

চেস্টিস খান কোনো কথা শুনতে চান না। সাত দিন সময় দিলেন। সাত দিনের মধ্যে তাঁর ওষুধ চাইই।

নির্দিষ্ট দিনে চারজন বৈদ্য অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পানীয় নিয়ে হাজির হলেন। সন্দিগ্ধস্বভাব, অবিশ্বাসী খান মুখে পাথরের ফাটলের মতো সরু হাসি হাসলেন। বললেন, যাক, তোমরা তাহলে দাওয়াই তৈরি করতে পেরেছ?

চারজনেই বলল, আজ্ঞে হাঁ সম্রাট!

বেশ তা হলে তো তোমাদের পুরস্কৃত করা উচিত।

আজ্ঞে সে আপনার মজি।

তখন তিনি ঐ সব বৈদ্যদের যার যার নিজের আবিষ্কৃত দাওয়াই পান করার হুকুম দিলেন। তার পরদিন তিনি তাদের বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে নিজে হাতে শিরোচ্ছেদ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ করতে থাকেন তারা সত্যিই মরে গেছে কিনা।

তারা কেউ বেঁচে ওঠেনি। তাই দেখে চেস্টিস খান মনে মনে গর্জে উঠেছিলেন—দুনিয়ার সবাই তাকে ঠকাতে চায়। সবাই শত্রু।

শেষে তাঁর প্রধান অমাত্য ও জ্যোতিষী ইয়েলিও-এর পরামর্শে চিন দেশের শ্রেষ্ঠ গুণী মহাহুবির চানচুনকে সাদরে তাঁর রাজসভায় আমন্ত্রণ জানানলেন। তিনি ত্রিকালদর্শী মহাসাধক। তিনি ধ্যান করেন কখনও মৃতদেহের মতো নিশ্চল হয়ে বসে; কখনও সারাদিন গাছের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েই থাকেন। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে অনেক কিছু দেখেছেন। বহু প্রাচীন পুঁথি পড়েছেন। তিনি বহু কষ্টে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে এলেন। তিনিই চেস্টিস খানকে বোঝাতে পেরেছিলেন, এ জগতে কেউ অমর হতে পারে না।

তারপর সামভোতা পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বললেন, নিরপরাধ মানুষকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ না দিয়েই খেয়ালের বশে তিনি কতজনের প্রাণ সংহার করেছেন। এইসব ক্ষুদ্র আত্মা সুযোগ পেলে কি সম্রাটের ক্ষতি করবে না?

ক্ষতি কি চেস্টিস খানেরও হয়নি? বালতান দুর্গের লড়াইয়ে শত্রুপক্ষের ছোড়া বর্ষার আকারের এক বিশাল তীর এসে বেঁধে চেস্টির খানের বড়ো আদরের পৌত্র মৃত্যুগানের বুক। তাতেই সে শেষশয্যা গ্রহণ করেছিল। বেদনাহত, ত্রুদ্ব, ক্ষুদ্র চেস্টিস তখনই গণৎকারদের ডেকে এনে এত বড়ো দুর্ঘটনার কারণ জিগ্যেস করলেন। কিন্তু কেউ সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। শুধু একজন বৃদ্ধ গণৎকারই বলেছিল, এটা কোনো ক্ষুদ্র আত্মার প্রতিহিংসা।.....

শুনতে শুনতে আমরা অনেক দূর চলে এসেছিলাম। হঠাৎ মনে হল আমাদের দলটা যেন হাক্কা হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সামভোতা টর্চ জ্বলে সঙ্গীদের হিসেব নিয়ে নিলেন। জিগমে নেই। চমকে উঠে বার বার তার নাম ধরে ডাকা হল। কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না।

হয় তো অন্ধকারে অনামনস্ক ভাবে চলতে চলতে পথ হারিয়ে ফেলেছে।

আমি কতকটা নিজের মনেই বলে উঠলাম, আচ্ছা সেই কংকালের গুহা থেকে আমরা

যখন সবাই ছড়মুড় করে বেরিয়ে আসি তখন ও-ও বেরিয়ে আসতে পেরেছিল তো?  
এর উত্তরে আমরা শুধু নিঃশব্দে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করেছি। উত্তর দিতে পারিনি।

### আঁধারে প্রদীপ জ্বলে

জিগমের কথা মনে করে আমরা সকলেই এমন ভারাক্রান্ত হয়ে আছি যে হাঁটার ক্লাস্তিকে ক্লাস্তি বলেই মনে হচ্ছে না। কতকগুলো যান্ত্রিক মানুষ যেন দম দেওয়া পুতুলের মতো এগিয়ে চলেছে দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে। অথচ কোন নিরুদ্দেশের পথে, কোন মৃত্যুপুরীর ঠিকানায় চলেছি তার ধারণাটুকুও নেই।

হঠাৎ ডান দিকের পাহাড়ের গাছগুলো কেঁপে উঠল। আমরা চমকে উঠলাম। আবার কি সেই মনুষ্যকৃতি লোমশ জন্তুটা—হ্যাঁ, তাই।

বেঁটেখাটো একটা প্রাণী অন্য একটা গাছে লাফিয়ে পড়ে তার ডাল ধরে ঝুলতে লাগল। আমরা ভয়ে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু তারপর যা ঘটল—

সামভোতা হঠাৎ টর্চ-এর আলো ফেললেন জীবটার দিকে। চমকে উঠলাম। মনুষ্যকৃতি একটা বামন। লোমে ভরা তার ছোট্ট দেহটা। বীভৎস তার মুখ। ক্রোধে ঝকঝক করছে চোখ দুটো। দেহের তুলনায় হলদে দাঁতগুলো বড়ো বড়ো। সেই দাঁতে চেপে আছে একটা ছোরা। আশ্চর্যের বিষয় তার মাথাটা ঠিক ঘাড়ের ওপর নেই। কাঁধের পাশে লেগে রয়েছে।

মুখের ওপর আলো পড়তেই ও মুখটা আরও ভয়ংকর করে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল আমাদের সেই পাহাড়ি রাস্তার ওপর। তারপর দু'হাত দোলাতে দোলাতে গুটগুট করে আমাদের সামনে সামনে এগিয়ে চলল। কাটা মাথাটা কাঁধের ওপর দুলতে লাগল।

গভীর রাতে নির্জন পাহাড়ি পথে এমন একজন বামনকে দু'হাত দুলিয়ে বীরবিক্রমে হাঁটতে দেখব কল্পনা করিনি। এই কি জিগমের ভাষায় সেই 'থিব্‌স'?

কে উত্তর দেবে?

অল্পক্ষণের মধ্যেই বামনটি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

তারপর আরও কিছুক্ষণ হাঁটা—কিছুক্ষণ পথের ধারে পাথরের ওপর বসে বিশ্রাম। আবার চলা। আশ্চর্য, কেউ কোনো কথা বলছে না। কোন অদৃশ্য শক্তি যেন আমাদের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়েছে। অবশ্য কী কথাই বা বলা যাবে? এ তো বেড়াতে যাওয়া নয়? সবাই নিজের মতো করে রহস্যের সমাধান করার চেষ্টা করছি। জিগমের কথা ছাড়াও আমার ভাবনা হচ্ছিল আমাদের ড্রাইভারকে নিয়ে। সে এই ভয়ানক জায়গায় একা গাড়ি নিয়ে কোথায় কত দূরে পড়ে আছে কে জানে!

হঠাৎ সামভোতা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। টর্চের আলো এদিক-ওদিক ফেললেন।

ইস! একী!

রাস্তার দু'পাশে কংকালের পর কংকাল পড়ে আছে। তাদের কোনোটারই মাথা নেই।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে সামভোতা চাপা গলায় বলেছিলেন, সাবধান! আর এগিয়ো না।  
এ দ্যাখো।

সবাই দেখলাম। না, চোখের ভুল নয়। স্পষ্ট দেখলাম, পাহাড়ি যে রাস্তা দিয়ে আমরা এতক্ষণ হাঁটছিলাম সেই রাস্তাটা যেখানে অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তায় এসে মিশে সামনের দিকে



এগিয়ে গেছে তারই কিছুদূরে কয়েক জন একটা কফিন কাঁধে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তাদের একহাতে খোলা তরোয়াল। শুধু চারজন শববাহকই নয়, তাদের সামনে-পিছনে জনা দশেক লোক নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। প্রত্যেকের হাতে বর্শা।

এত রাতে এই অন্ধকার নির্জন পথে ওরা কারা? কফিনে করে কার শব নিয়ে যেন অতি গোপনে অতি সম্ভ্রান্তভাবে এগিয়ে চলেছে। আরও খানিক দূর এগিয়ে শবযাত্রীর দল হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সামভোতা আমাদের একটা বড়ো পাথরের আড়ালে বসে পড়তে ইশারা করলেন। আমরা তাঁর নির্দেশ পালন করলাম।

অভিজ্ঞ সামভোতা ঠিকই বুঝেছিলেন শবযাত্রীর দল এবার একবার পিছন ফিরে তাকাবেই। তাকালও। বোধহয় দেখতে চাইল কেউ তাদের দেখছে কিনা।

তারপর তারা পথ ছেড়ে ডান দিকের গভীর জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। রাতচরা একটা মস্ত শেয়াল জাতীয় পশু এত লোকজন দেখে ভয় পেয়ে ছুটে পালাচ্ছিল, শববাহী দলের সামনে যারা ছিল তাদেরই একজনের হাতের বর্শায় নিরপরাধ পশুটা দু'বার ঘুরেই পড়ে গেল। শববাহীর দল খুব গোপনে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দশ-পনেরো মিনিট পরে আমরা উঠে দাঁড়িলাম। তারপর ফের এগিয়ে যাওয়া। আমার দুঃসাহসী বন্ধুটির ভাষায় যতই 'চোখের ভুল' হোক না কেন, তবু আমরা, যেখান থেকে শববাহীর দল ডান দিকের জঙ্গলের পথ ধরেছিল সাবধানতার জন্যে সেই পথটুকু ছেড়ে দিয়ে একটু ঘুরপথ ধরে এসে আবার সেই অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তা ধরলাম।

একটার পর একটা ঘটনায় আমরা বিমূঢ়, শাস্ত। আমাদের ব্রেন যেন আর কাজ করতে চাইছে না। রাত ক'টা বেজেছে? নিজের হাতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করছে না। কী হবে ক'প্রহর রাত হয়েছে জেনে? এ রাত কি কোনোদিন সূর্যের মুখ দেখবে? এ পথ কি কোনোদিন ফুরোবে?

এর পরেই আবার একটি আকস্মিক ব্যাপার!

সূর্যের মুখ কবে দেখতে পাব বা কোনোদিনই দেখতে পাব কিনা জানা না থাকলেও কিছু দূরে সেই জনমানবশূন্য অন্ধকার পথে হঠাৎ একটা বিন্দুর মতো আলো দেখা গেল।

আলো! আনন্দের আতিশয্যে আমাদের মুখ থেকে একটা চাপা উচ্ছ্বাস বেরিয়ে এল। যেন আমরা কত যুগ পরে আলো দেখলাম।

কিন্তু এই অন্ধকারের রাজ্যে ওটা কিসের আলো, আনন্দে উৎসাহে তা ভেবে দেখার অবকাশই পাইনি। তিব্বতী প্রৌঢ়টির দিকে তাকালাম। তাঁর মুখে কোনো উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনার চিহ্নমাত্র নেই।

জিগোস করলাম, ওটা কিসের আলো?

উনি বিরক্ত হয়ে বললেন, এখান থেকে কী করে বলব? আমি গণৎকার নই। ওটা আলো নাও হতে পারে। চলো, সাবধানে এগোনো যাক।

না, আলোই। মরীচিকা বা অন্য কোনোরকম অলৌকিক চোখ-ভোলানো ব্যাপার নয়। আমরা সবাই আলোটোর সামনে এসে দাঁড়িলাম। একটা মস্তবড়ো পাথরের প্রদীপে তেল-জাতীয় কিছুতে সলতে জ্বলছে। আর তা থেকে সুগন্ধ বেরোচ্ছে।

আরে! ঐ দ্যাখো, সামনে রাস্তার ধারে ধারে আরো ক'টা পিদিম জ্বলছে।

কাছে গিয়ে দেখা গেল একই রকমের প্রদীপ।

কিন্তু এগুলো এত যত্ন করে জ্বালাল কে? কেনই বা জ্বালিয়ে রেখেছে? পথিকদের সুবিধের জন্যে?

তা হলে কি সত্যিই আমরা এতক্ষণে অন্ধকার থেকে আলোর জগতে এসে পৌঁছলাম? সামভোতা মুখ ভোঁতা করে বললেন, আমাকে তোমরা ক্ষমা করো। আমার মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এভাবে পথের ধারে ধারে এত সুন্দর দীপাধারে কারা আলো জ্বেলে রেখেছে? কেন রেখেছে? অথচ দ্যাখো কাছেপিঠে লোকজনের চিহ্নমাত্র নেই। আচ্ছা, গাছগুলোর আড়ালে ওটা কী?

উনি টর্চের বোতাম টিপলেন। একটা বহু পুরনো ভাঙা পোড়ামাটির ইন্টের বাড়ি।

এই দীর্ঘ পাহাড়ের রাজ্যে, হোক ভাঙা তবু, এই প্রথম একটা বাড়ি চোখে পড়ল। তাহলে?

দাঁড়াও—দাঁড়াও মনে পড়ছে। ইতিহাস.....সিঙ্কুসভ্যতা.....মাটির নীচ থেকে তুলে আনা প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগের দুটি গোটা নগরী—হরপ্পা আর মহেঞ্জোদড়ো! পোড়া ইন্টের বাড়ি, রাস্তার মাঝে মাঝে আবর্জনা ফেলার জায়গা, জল-নিকাশি ব্যবস্থা, নগরের বাইরে উঁচু উঁচু টিলার ওপর বড়ো বড়ো ট্যাক্সের মতো জলাধার, যাতে বৃষ্টি আর নদীর জল ধরে রাখা হত নগরবাসীর প্রয়োজন মেটাবার জন্যে। প্রধানত পুরোহিত আর ধনী সামন্ত বণিকরাই শাসন করত নগরবাসীদের। এই সময়ে এখানেই দেখা গেছে পথিকের সুবিধের জন্য রাস্তায় রাস্তায় প্রদীপ জ্বেলে রাখবার ব্যবস্থা। পূর্ণিমা গুরুপক্ষ ছাড়া। বাড়ির আলো রাস্তায় পড়ত না। কেননা রাস্তার দিকে বাড়ির কোনো জানলা থাকত না। কেন থাকত না কে জানে!

সাড়ে তিন হাজার বছর আগের সিঙ্কুসভ্যতার ধারার এক চিলতে আলো কি আজও ধরে রেখেছে এই অঞ্চলের মানুষ?

কিন্তু মানুষজন কই?

### রহস্যময় চৈনিক মহাজ্ঞানী

আপনারা দেখছি সারা রাত জেগে, পথ চলে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছেন। যান, অনুগ্রহ করে আপনাদের জন্যে নির্দিষ্ট কক্ষে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন।

সকাল তখন ন'টা। পাহাড়ের অন্ধকার রাজ্য পার হয়ে একটা সমতলভূমিতে আমরা এখন এসে পৌঁছেছি। এখানে লোকজন, বাড়িঘর, ঘোড়ায় টানা টাঙা সবই আছে। হোটেল আছে কিনা ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে একজনকে জিগ্যেস করতেই সে একজন চ্যাপটা মুখ, হলদে রঙের ছোকরার হাতে আমাদের তুলে দিল। ছেলোটোর শুধু চ্যাপটা মুখই নয়, মুখের তুলনায় বড়ো বড়ো কান। হাসলে মুখটা হাঁ হয়ে প্রায় কানের লতি ছোঁয় আর কি। দেখলে ভয় করে। মোঙ্গল নাকি?

এটা হোটেল?

ছোকরাটি উত্তর না দিয়ে মাথা দুলিয়ে সায় দিল।

তুমি এখানে কাজ কর?

ছোকরাটি আবার নিঃশব্দে সায় দিল।

এখানে দু-একটা দিন থাকা যাবে?

শুধু মাথা দুলিয়ে এবারও জানাল, হ্যাঁ।

হোটেলটি পুরনো। একতলা বাড়ি। দূরে পাহাড়ের শ্রেণি। ঐ সব পাহাড়ের কোনগুলির মধ্যে দিয়ে কাল সারা রাত্রি হেঁটেছি এখান থেকে তা অনুমান করার সাধ্য নেই।

ভেতরে ঢুকতেই কাজের লোকদের গলা পাওয়া গেল। সেই সঙ্গে রান্নার সুগন্ধ। মনটা শান্ত হয়ে হল। মনে হল কত দিন এরকম ব্যস্তসমস্ত মানুষের গলা শোনা যায়নি। যদিও তাদের ভাষা আমাদের কাছে অজানা।

এরপর পীত বর্ণের কারুকার্য করা পর্দা সরিয়ে যে ঘরে আমাদের আনা হল সে ঘরটি বেশ সাজানো। দেওয়ালে দেওয়ালে চিনদেশীয় ছবি। ছবিগুলির মধ্যে অনেকগুলি পাহাড়-পর্বতের। মাঝখানের ছবিটি ধ্যানস্থ বুদ্ধদেবের। একটা সাধারণ কার্পেটের ওপর পুরু ভেড়ার লোমে ঢাকা আরামকেদারায় দু'পা গুটিয়ে শুয়ে শুয়ে দীর্ঘ সটকা ঠোটে চেপে যে বুদ্ধটি ভুরুক ভুরুক করে গড়গড়া টানছিলেন তাঁকে দেখে আমরা দুই বন্ধু যতটা অবাক হয়েছিলাম তার থেকে ঢের বেশি স্তম্ভিত হয়েছিলেন সামভোতা।

চিনদেশীয় বুদ্ধটি এতই বুদ্ধ যে তাঁর বয়েস অনুমান করা যায় না। এই বয়েসে মুখের চামড়া হাতের মুঠোয় মোড়া কাগজের মতো অজস্র ভাঁজে কুঁকড়ে গেছে। তা হলেও ফর্সা মুখখানায় লালচে আভা। থুতনির কাছে কয়েক গাছা পাকা দাড়ি। মাথায় চিন দেশের ধর্মগুরুদের মতো টুপি। মুখে স্নিগ্ধ হাসি।

ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে কথাগুলি বললেন তা কলকাতার চিনেপট্রির চৈনিকদের মুখে বাংলা ভাষার মতো। স্বচ্ছন্দ নয়, দুর্বোধ্যও নয়। থুমি সামভোতা হঠাৎ কেন যে কার্পেটের ওপর নতজানু হয়ে বুদ্ধ চিনাটিকে শ্রদ্ধা জানালেন বুঝতে পারলাম না। দেখাদেখি আমাদেরও ঐভাবে নত হতে হল। একজন হোটেলের মালিককে এতখানি শ্রদ্ধা জানাবার কারণ প্রথমে বুঝতে পারিনি। একটু পরেই বুঝলাম।

সামভোতা হাত জোড় করে বললেন, আপনি কী করে জানলেন আমরা সারা রাত জেগে পথ হেঁটে এসেছি?

হাসলেন বুদ্ধ চৈনিক। বললেন, শুধু এইটুকুই? আর সারা রাত কত ভয়ংকর ব্যাপার কাটিয়ে এসেছেন তাও কি আমি জানি না?

হঠাৎ আমার মনে হল—কে এই চৈনিক বুদ্ধ? কোথায় এঁকে দেখেছি?

না, কোথাও দেখিনি। দেখা সম্ভবও নয়। তবে ঐর কথা শুনেছি সামভোতার মুখে। যে বর্ণনা শুনেছিলাম তাতে মনে হয় প্রায় আটশো বছর অতিক্রম করে সুদূর চিন দেশ থেকে এখানে এসে অবস্থান করছেন সেই মহাহুঁবির গুণী—যিনি ধরণী ও আকাশের সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন এমনকি অমরত্ব লাভের পরশপাথর 'তান'-এরও নাকি সন্ধান জানেন—যাঁকে একদিন ডেকে পাঠিয়েছিলেন স্বয়ং চেন্সিস খান—যাঁর নাম চানচুন।

কিন্তু তা সম্ভব কী করে? সুদূর চিন থেকে চেন্সিস খান-এর আহ্বানে তিনি পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। তা বলে সেই মানুষ আটশো বছর বেঁচে থাকবেন। তিনি কি 'তান' নামে সেই পরশপাথর সত্যিই আবিষ্কার করে ফেলেছেন?

বিভাসকে বলতেই ও ক্ষেপে গেল। বলল, যত আজগুবি ধারণা তোমাদের মাথায় আসে? একজন অতি বুদ্ধ চিনা লোক হলেই কি তিনি আটশো বছর আগের চানচুন হবেন?

ইতস্তত করে বললাম, তা ঠিকই তবে সামভোতার মতো মানুষ হঠাৎ ওঁকে নতজানু

হয়ে প্রণাম করলেন কেন? কী করেই বা ঐ বৃদ্ধ আমাদের গত রাত্রে কথ্য বলে দিলেন? তা ছাড়া ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি কেমন একটা দৈব অভিব্যক্তি!

এমনি সময়ে একটি বিচিত্র ইউনিফর্ম পরা ব্যক্তি বাইরে থেকে এসে দাঁড়াল। দুর্বোধ্য ভাষায় লোকটি কিছু বলল। সঙ্গে সঙ্গে গায়ের চাদরটি জোব্বার ওপর ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বৃদ্ধ সবিনয়ে আমাদের বললেন, হোটেল চালানো ছাড়াও আমার ছোটোখাটো একটি নার্সিংহোম আছে। এই সময়টা একবার পেশেন্টদের দেখে আসি। আপনারা ততক্ষণ বিশ্রাম করুন। অবশ্য ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যেতেও পারেন। গেলে খুশিই হব।

সারারাত্তির দুর্ভোগের পর আর রুগি দেখতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম প্রায় শত বছর বয়সের ভার মাথায় নিয়ে কী উৎসাহে বৃদ্ধ স্বচ্ছন্দে রোগিরও সেবা করে যাচ্ছেন!

যেতে যেতে বোকার মতো বলেই ফেললাম, হোটেল চালাচ্ছেন, সে তো কম ঝামেলা নয়, তার ওপর আবার নার্সিংহোমের ব্যবসা!

বৃদ্ধ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সফ্রু আকারের চশমার কাচটা একটু তুলে ধরে মিনিটখানেক আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, অপরিচিত মানুষের সঙ্গে না বুঝে কথা বলা ঠিক নয়। হোটেল চালানোটা আমার জীবিকা কিন্তু আমার কোনো ঝামেলা নেই। আমার একদল দায়িত্ববান কর্মচারী আছে। তারাই সব ‘ঝামেলা’ কাঁধে নিয়ে আছে। বিশ্বাসভঙ্গের কথা তারা ভাবতেই পারে না।

আর নার্সিংহোম? ওটা ব্যবসার জন্যে নয়। মানুষের সেবা করার জন্যে। শুধু মানুষের সেবা করাই নয়, পশুপাখির জন্যেও আমার নিরাময় কেন্দ্র আছে। দু’দিন যদি থাকেন দেখাব। আমরা যে সম্প্রদায়ের মানুষ, সেবাই হচ্ছে তাদের একমাত্র ধর্ম—একমাত্র কর্ম। আপনারা স্বামী বিবেকানন্দের মতো—

হ্যাঁ, এমন মানবপ্রেমী—

বিভাসকে থামিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ বললেন, তিনি শুধু মানবপ্রেমী নন, জীবপ্রেমীও.....

যাই হোক, প্রথম আলাপেই বৃদ্ধটিকে খুব ভালো লাগল। আর তাঁর নার্সিংহোমে গিয়ে যে লাভ হল তার জন্যে ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই।

একটি বেডের কাছে গিয়ে প্রাঞ্জল বৃদ্ধটি বললেন, দেখুন তো একে চেনা মনে হচ্ছে কিনা?

আমরা তিনজনেই আনন্দে চমকে উঠলাম।

এ কী! জিগমে!

হ্যাঁ, আজ ভোরে একে ঐ পাহাড়টার নীচে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। জ্ঞান ফিরলে ও সব কথা বলে। জিগোস করেছিলাম, তা দল ছেড়ে কী করে ওদিকে গেলে? ও যা বলল তা অদ্ভুত। বলল, কে নাকি ওকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। খাদের ধারে গিয়েও গাছের শেকড় আঁকড়ে ধরে বেঁচে যায়।

এর আগেও ওকে অমনি কে ডেকে খাদের ধারে নিয়ে গিয়েছিল। কে অমন মরণডাক দিয়েছিল আপনি কি বলতে পারেন?

বৃদ্ধটি একটু হাসলেন। বললেন, পারি। এখন আপনারা হোটেল ফিরে গিয়ে খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করুন। সন্ধেবেলা বলব।

জিগ্যেস করলাম, জিগমের সুস্থ হতে কত দিন লাগবে?

আপনারা তো দু'দিন আছেন। দু'দিন রেস্ট পেলেই ও ঠিক হয়ে যাবে। একসঙ্গে ফিরবেন।

সন্ধেবেলা।

সেই ঘরটিতে সাদা পশমী গদির ওপর বসে আছেন বৃদ্ধ চৈনিক জ্ঞানী মানুষটি। তাঁকে যেন এখন কেমন কুঁজো কুঁজো লাগছে। দু'পাশে রূপোর উঁচু উঁচু বাতিদানে জ্বলছে মোটা মোটা মোমবাতি। তিনি ভাঙা ভাঙা গলায় সামভোতাকে জিগ্যেস করলেন, প্রথমেই আপনার কথা জানতে ইচ্ছে করছে। তিব্বতের পুণ্যভূমিতে আপনার জন্ম। সংসার করেননি। তবু সারা জীবন কিসের খোঁজে নানা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?

সামভোতা বললেন, আমি জানি আপনি সর্বজ্ঞ। তবু বলি—খাতায় কলমে বা কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসের ডিপ্লোমা না পেলেও আমি মনে-প্রাণে একজন ইতিহাসবিদ। পৃথিবীর যত প্রাচীন প্রখ্যাত পুরুষ, তাঁদের প্রকৃত জীবনকাহিনি, লুপ্তপ্রায় প্রাসাদ, জন্মভিটে, তাঁদের স্থাপত্যকীর্তি আমি খুঁজে বেড়াই। শুধু ছাপার বই নয়, প্রাচীন পুঁথিপত্রও কম পড়িনি।

একটু থেমে সামভোতা ফের শুরু করলেন—মহাযোদ্ধা রক্তলোলুপ চেন্সিস খানের কথা যতই পড়েছি ততই অবাক হয়েছি। তাঁর কোনো মহৎ গুণের কথা কোথাও পাইনি। তবু নৃশংস সাম্রাজ্যবাদী একজন যোদ্ধা হিসেবে তিনি ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে ইচ্ছে করে।

চৈনিক বৃদ্ধটি বললেন, আপনি যথার্থই ইতিহাসপ্রেমী।

সামভোতা বিনয়ে প্রণাম করে বললেন, আমার আর একটি কৌতূহল আছে। মমির অনুসন্ধান করা। মমিগুলি সম্বন্ধে ভালো করে জানা। তিন হাজার-চার হাজার বছরের পুরনো মমি—আমাকে বিহ্বল করে দেয়।

চৈনিক বৃদ্ধটি বললেন, আজ পর্যন্ত মিশরে প্রায় একশোটি মমি আবিষ্কৃত হয়েছে—মার্জনা করবেন, সামভোতা বললেন, সংখ্যাটি বোধহয় আশির বেশি নয়।

তাই না হয় হল। কিন্তু ঐ আশিটি মমি পরীক্ষা করা কি সম্ভব? আর কী বা জানবেন? সামভোতা বিনীতভাবে বললেন, সম্ভ্রতি মাত্র আঠারো বছর বয়স্ক রাজা তুতেনখামেনের মমি পরীক্ষা করে তাঁর মৃত্যুরহস্য জানা গেছে। তাঁর গায়ের একটা ক্ষতচিহ্ন থেকে শল্যবিদ্রা জানিয়েছেন তিনি নাকি ক্যানসারে মারা গিয়েছিলেন। তখন 'ক্যানসার' নাম ছিল না। হয় তো অন্য নাম ছিল। এই থেকেই আমার এখন ইচ্ছে করে কলকাতার মিউজিয়ামে রক্ষিত মমি দুটোর মৃত্যুর কারণ সন্ধান করি।

সে কাজ কি সম্ভব হবে? কে আপনাকে সাহায্য করতে পারবে?

এখনও পর্যন্ত কোনো আশা দেখছি না। তবে কলকাতায় এলেই একবার করে যাই যদি কোনো ক্লু পাই।

চৈনিক বৃদ্ধটি বললেন, চেন্সিস খান সম্বন্ধে আপনার আগ্রহ শুনলাম। কিন্তু কতটা জানেন? কিছুই না। টুকরো-টাকরা ইতিহাস পড়ে যেটুকু জানা যায় আর কি।

চৈনিক বৃদ্ধটি এই সময় যেন একটু অন্যমনস্ক হলেন। যেন কারও নিঃশব্দ উপস্থিতি টের পেলেন। তারপর থেমে থেমে বলতে লাগলেন, চেন্সিস খান দু'বার বড়ো আঘাত পেয়েছিলেন। না, অস্ত্রাঘাত নয়, হৃদয়ে শোকের আঘাত। তাঁর পিতা ছিলেন আঞ্চলিক প্রধান।

তাতারদের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রতিশোধ নেবার জন্যে তিনি তাতার সহ মোঙ্গলদের সব শত্রুদের নির্মমভাবে নিধন করে মোঙ্গোলিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি হন। রক্ত নিয়ে খেলার এই হল শুরু। দ্বিতীয় আঘাত পান—

হ্যাঁ, আগে বলে নিই চেঙ্গিস খানের চার পুত্র। জুচি, জানাতাই, উগেদেই আর তুলি খান। জাগাতাই-এর পুত্র, মোঙ্গল খানের বড়ো আদরের নাতি মুতুগান বালতান দুর্গের লড়াইয়ে নিহত হন। সেই খবর পেয়ে মোঙ্গল খান যাকে তোমরা চেঙ্গিস খান বল, ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বালতান ধ্বংস করে দেন।

সামভোতা বিনয় সহকারে বললেন, এটা আমার জানা।

খুব ভালো। একটা কথা জানো তো, যত দেশ জয় করা হবে, যত অত্যাচার করা হবে ততই শত্রু বাড়বে। মোঙ্গল খানের শত্রুদের মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে তাঁর আত্মীয়-স্বজন, উত্তরাধিকারীরা যারা তাঁর রক্তমাখা বিপুল সম্পত্তি গ্রাস করার জন্যে ওৎ পেতে ছিল।

তারপরই ছিল তাঁর পুরনো শত্রু তানগুতে সম্রাট বুর্খান। যাকে তিনি কিছুতেই হটাতে পারেননি। উশ্টে বুর্খানের একটি বিকলাঙ্গ ছেলে মোঙ্গল খানকে খুন করার জন্যে বারেবারে চেষ্টা করেছিল। তার একটা সুবিধে ছিল সে ছিল বেঁটে বামন। খুব সহজেই গাছের ডাল থেকে ঝুলে, কিংবা গুঁড়ি মেরে বাগিচার মধ্যে দিয়ে গিয়ে চেঙ্গিস খানের প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারত। কিন্তু তবু মোঙ্গল খানের সতর্ক সশস্ত্র প্রহরীদের জন্যে খুন করবার সুযোগ পায়নি।

চেঙ্গিস খান বুর্খানের এই বামন ছেলেটাকে ধরবার অনেকরকম ফাঁদ পেতেছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই সে তার ছোটখাটো দেহ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। তার নাম ছিল থিব্‌স্—

থিব্‌স্! চমকে উঠলাম আমরা। নামটা যেন জিগমের মুখে শোনা!

চেঙ্গিস খানকে হত্যা করার জন্যে থিব্‌স্ গোপনে ষড়যন্ত্রীদের নিয়ে একটি দল করেছিল। তারা তাকে পালাবার সময়ে সাহায্য করত। একবার থিব্‌স্ পালাতে গিয়ে পাবলিকের হাতে ধরা পড়ল। যে পাবলিকের হয়ে থিব্‌স্ অত্যাচারী সম্রাটকে খুন করার ব্রত নিয়েছিল, তারা মোটা পুরস্কারের লোভে বিশ্বাসঘাতকতা করে থিব্‌স্কে সোজা তুলে দিল চেঙ্গিস খানের হাতে। পাবলিকের এই বিশ্বাসঘাতকতায় সে রাগে দুঃখে কাতর হয়ে পড়েছিল। চেঙ্গিস খান নিজে হাতে তাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেন।

তারপর থেকে.....সব মানুষই থিব্‌সের ভ্রুদ্বন্দ্ব আত্মার শিকার হয়ে পড়ল।

হঠাৎ এই সময়ে একটা দমকা হাওয়া ঘরের দরজা-জানলা কাঁপিয়ে দিল। বাতিগুলো নিভে গেল। হোটেলের আর যারা ছিল ভয়ে চৈঁচিয়ে উঠল। শুধু শান্ত হয়ে বসে রইলেন চৈনিক বৃদ্ধটি।

একটু পরেই সব শান্ত হল। আলো জ্বালা হল।

সামভোতা জিগেস করলেন, এটা কী হল?

চৈনিক বৃদ্ধটি এবার হাসলেন না। শুধু বললেন, ও যে এখানেও এসে পড়েছে, তা জানান দিল।

কে?

থিব্‌স্!

থিব্‌স্!

হ্যাঁ।

এখানেও!

মানুষমাত্রই ওর শত্রু। সবাইকে নিধন করতে চায়। বিশেষ করে কোনো ক্ষতি না করেও আমি তার শত্রু।

কেন?

এই যে ওর কথা আমি তোমাদের কাছে বলে দিলাম। যাই হোক, আজ রাতটা সাবধানে থাকতে হবে।

বিভাস বলল, আপনার আশ্রয়ে আমরা নিশ্চয় নিরাপদ।

বৃদ্ধ বললেন, আমরা সকলেই কিন্তু মানুষ। অতএব মৃত্যুর অধীন।

এরপর অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে গেল। বৃদ্ধটি আগের মতোই রাত্রের অভিজ্ঞতার কথা মন দিয়ে শুনলেন। তারপর গড়গড়ার সট্কা ঠোটে চেপে নিঃশব্দে ধূমপান করতে লাগলেন। তারপর একসময়ে বললেন, তোমাদের সৌভাগ্য সব বিপদ কাটিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছে।

আমি বললাম, সবই তো হল। কিন্তু আমাদের গাড়িটা আর ড্রাইভারের দশা কী হল কে জানে।

বৃদ্ধ বললেন, ড্রাইভারকে নিয়ে চিন্তা করো না। গাড়ি সারানো হয়ে গেলে নিশ্চয় প্রচণ্ড ঠান্ডায় সারা রাত তোমাদের অপেক্ষায় পাহাড়-জঙ্গলের নীচে গাড়ির মধ্যে বসে থাকবে না। সে ফিরে গেছে।

আমরা ফিরব কোন পথে?

তোমরা তো লাদাখের দিকে যাবে?

হ্যাঁ।

কাছেই। তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

এর পর আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করে চৈনিক বৃদ্ধটি চেঙ্গিস খানের জীবনের শেষ পর্বটি আমাদের জানালেন। আশ্চর্য, তাঁর বলার ভঙ্গি, বক্তব্যের দৃঢ়তা দেখে মনে হল একশো বছরেরও ঢের বেশি বয়স্ক এই বৃদ্ধ যেন চেঙ্গিস খানের মৃত্যুসময়ে নিজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই বলে শুরু করলেন, এ কথাটা সবাই জানেন যে, সিঙ্কুসভ্যতার যুগে নয়, তার ঢের পরে মাত্র আটশো বছর আগেও চেঙ্গিস খান নির্বোধের মতো জরা-মৃত্যুকে এড়িয়ে যাবার জন্যে নানা উপায় খুঁজছিলেন। পাননি।

তাঁর তরুণী পত্নী কুলান খাতুনের মৃত্যুর তিন বছর পরেই চেঙ্গিস খান বুঝতে পেরেছিলেন তাঁরও দিন ফুরিয়ে এসেছে।

মোঙ্গল খান বুঝতে পারছেন তাঁর অস্তিম কাল আসন্ন। শ্বেত কব্জলের শয্যায় শায়িত। মাথার নীচে কৃষ্ণসার চর্মের নরম বালিশ। একটা কালো কব্জলে তাঁর পা ঢাকা। তাঁর দীর্ঘ শীর্ণ দেহটিকে অসম্ভব ভারী বলে মনে হচ্ছিল। নাড়াচাড়া করতে পারছিলেন না। তিনি তাঁর মাত্র কয়েকজন বিশ্বস্ত কাজের মানুষকে ডেকে পাঠালেন। তারপর নিচু গলায় কয়েকটি মূল্যবান পরামর্শ দিলেন। তার মধ্যে একটি এইরকম—

আমি মারা গেলে আমার মৃত্যুসংবাদ যেন কোনোভাবে প্রকাশ না পায়। কান্নাকাটি বা বিলাপের রোল তুলো না। শত্রুরা জানতে পারলে তারা শুধু খুশি আর উৎসাহী হবে তাই নয়, তোমাদের শোকপালনের সুযোগ নিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করে বসতে পারে। আমার চিরশত্রু

তানগুতের রাজা আর রাজ্যের লোকজন যখন ভেট নিয়ে দুর্গের তোরণ থেকে বের হবে তক্ষুনি তাদের ওপর আক্রমণ করবে। দ্বিধা করবে না। তাদের ধ্বংস করবে....।

তিনি আরও বললেন, আমার নিকট আত্মীয়দের কাছ থেকে ঈশিয়ার থেকে। আমার সেদিনের সেই জমজমাট ভোজসভার মাত্র তিন দিন পরেই হঠাৎ আমার সুস্থ প্রিয়তমা পত্নী কুলানের মৃত্যু হল। সে মৃত্যুর কারণ আর কেউ না জানলেও আমি অনুমান করতে পারি। তাকে হত্যা করেছিল আমারই নিকটতম আত্মীয়জন। প্রমাণ পাইনি। তাই তাদের প্রাণদণ্ড দিতে পারিনি।

তারপরই হঠাৎ সভয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করে বলে উঠলেন, সেই গলাকাটা বামনটা আমার চারদিকে ঘুরঘুর করছে কেন? ওকে তাড়িয়ে দাও। আমি সহ্য করতে পারছি না।

বলতে বলতে চেঙ্গিস খানের মুখ বিকৃত হল। ডান চোখ দীপ্তি হারিয়ে ঘোলাটে হয়ে গেছে। তিনি বিছানায় পড়ে গেলেন। তারপর সব শেষ।

চেঙ্গিস খান অনেক দিন আগে থেকেই একখণ্ড ভারী কাঠের খোল বানিয়ে রেখেছিলেন। ভেতরে সোনার পাত মোড়া একটা শবাধার। সেটা গোপনে তাঁর কাছেই থাকত যাতে হঠাৎ মৃত্যু হলে লোকজানাজানি হবার আগেই সেই শবাধারে তাঁর মৃতদেহটি ঢুকিয়ে দেওয়া যায়।

আজ সেটা কাজে লাগল। গভীর রাত্রে সম্রাটের ছেলেরা শবাধারটি ঘরের মাঝখানে এনে রাখল। সামরিক বর্ম গায়ে পরিয়ে যোদ্ধার বেশে তাঁর মৃতদেহটি সযত্নে শবাধারে রাখা হল।

বুকের ওপর ভাঁজ করা দুটো হাত মুঠো করে ধরিয়ে দেওয়া হল তাঁর কারুকার্য করা নিজস্ব তরোয়ালটি। মাথায় আটকানো ইম্পাতের কালো শিরস্ত্রাণ তাঁর বোজানো চোখ আর মুখের ওপর একটা বিস্তী ছায়া ফেলেছে। শবাধারে তাঁর দু'পাশে রাখা হল তীর-ধনুক, ছুরি, আগুন জ্বালাবার চকমকি পাথর আর সোনার পানপাত্র। চেঙ্গিস খানের আদেশমতো সেনা-নায়করা তাঁর মৃত্যুর খবর গোপন রাখল। তানগুতেরা যখন শহরের ফটক থেকে বেরিয়ে এসে চেঙ্গিস খানের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে সন্ধি প্রার্থনা করল তখন চেঙ্গিস খানের সেনা-নায়করা তাঁরই নির্দেশমতো অতর্কিতে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেবুড়ো নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করল। তারপর একটি শত্রুরও চিহ্ন না রেখে চেঙ্গিস খানের শবাধার কন্ডলে জড়িয়ে বারোটি ষাঁড়টানা দু' চাকার গাড়িতে চাপিয়ে নির্দিষ্ট গোপন জায়গার দিকে এগিয়ে চলল। পাছে কেউ মোঙ্গল খানের শবদেহবাহী শকট যাচ্ছে বলে সন্দেহ করে তাই দু'পাশের কী মানুষ কী জন্তু-জানোয়ার যে কেউ চোখে পড়েছিল তাদের সকলকেই তারা হত্যা করেছিল।

এক সময়ে তিনি বুরখান খালদুনের পাহাড়ে শিকার করতে গিয়েছিলেন। পাহাড়ের ঢালুতে নির্জন জায়গায় একটা আকাশে ছোঁওয়া উঁচু দেবদারু গাছের নীচে তিনি বিশ্রাম নিয়েছিলেন। সেই শান্ত নির্জন বনভূমি আর দেবদারু গাছটি তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। সঙ্গের বিশ্বস্ত লোকদের তিনি বলেছিলেন, একান্তই যদি মরতে হয় তাহলে এই গাছটার নীচেই আমাকে চিরশান্তিতে থাকতে দিও। হ্যাঁ, গাছটা চিনে রেখো।

চেঙ্গিসের সেনানায়করা জঙ্গলের মধ্যে সেই দেবদারু গাছটি খুঁজে বের করে সেখানকার মাটির নীচে অনেক গভীরে তাদের প্রিয় খানের কফিনটা নামিয়ে দিল। তারপর মাটি চাপা



দিয়ে তার ওপর এমনভাবে বুনো গাছ বসিয়ে দিল যে, কেউ যেন বুঝতে না পারে এখানে এক বিরাট পুরুষের দেহ রক্ষিত আছে।

বৃদ্ধ চৈনিক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটির মুখে সব কথা শুনে আমরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম। একটা জিনিস লক্ষ করছিলাম, রাত যতই বাড়ছিল, বৃদ্ধটি ততই বাসি ফুলের মতো স্নান হয়ে পড়ছিলেন। অথচ তিনি নিয়মিত রাত জেগে বসে থাকতেন। ঘুম আসত না। আর আজ এখন তো সবে রাত আটটা।

বিনীতভাবে সামভোতা বললেন, সেই কবরস্থানে লোকে যায়? সেখানে নিশ্চয় নাম লেখার পাথর গাঁথা আছে বাঁধানো সমাধির ওপরে?

কথা বলতেও বোধহয় কষ্ট হচ্ছে বৃদ্ধর। তিনি শুধু মাথা নাড়লেন। সে সমাধিস্থান আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বাঁধানো তো নয়ই, বুনো গাছপাতার আড়ালে কোথায় লুকিয়ে আছে। এমনটাই তিনি চেয়েছিলেন।

এইটুকুই বলে বৃদ্ধ হাঁপাতে লাগলেন। তারপর নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হলে তিনি বললেন, তা ছাড়া সেখানে পাহারা দিচ্ছে বেশ কিছু ভয়ংকর অশরীরী প্রেতাত্মা। ওখানে কেউ গেলে মৃত্যু নিশ্চিত। ছাগল-গোরুও ওখানে ঘাস খেতে যায় না।

সামভোতা বললেন, যে রাস্তা দিয়ে খানের শবদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই রাস্তাটা ঠিক কোথায় জানি না। তবু দেখবার সাধ ছিল।

বৃদ্ধ হাসবার চেষ্টা করে বললেন, কাল রাতে অজ্ঞাতে তোমরা ঐ পথ দিয়েই এসেছিলে। কথা শেষ করেই তিনি সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে শুতে চলে গেলেন। বলে গেলেন, আজ রাতটা সাবধানে থেকো। ও এখানেই ঘুরছে। কারও ক্ষতি করবেই।

খুব ক্লান্ত ছিলাম। এখন অনেকটা নিশ্চিত। একটা মোটামুটি ভালো হোটেল। বড়ো একটা ঘরেই তিনটে বেড পেয়েছিলাম। চৈনিক বৃদ্ধটি বারে বারে সাবধান করায় একটু যে ভয় করছিল না তা নয়। তবে যেহেতু ত্রিকালদর্শী বৃদ্ধটি এখানেই আছেন সেইজন্যে খুব ভয় পাইনি। তা ছাড়া অ্যাটাচড বাথরুম। বাইরে বেরোবার দরকার হবে না।

বিছানায় শোয়া মাত্র ঘুম।

অকাতরেই ঘুমোচ্ছিলাম। তারপরে অনেক রাতে মাথার দিকের বন্ধ জানলার বাইরে কেমন একটা চাপা শব্দ। শব্দটা সাপের গর্জনের মতো। জানলায় দু'বার ঠক্ঠক করে শব্দ হল। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, কে? উত্তর পাওয়া গেল না। শুধু হোটেলের কম্পাউন্ডের মধ্যে একটা গাছের ডাল ভেঙে পড়ার শব্দ। তার পরেই এমন কিছু ইঙ্গিত পেলাম যা বোঝাতে পারব না, কিন্তু নিজে বুঝলাম—যে এসেছিল সে কাজ শেষ করে চলে গেল।

কাল রাতেই ঠিক করা হয়েছিল আজই রওনা হব। হোটেলের 'বয়' ট্রেতে করে চা আর টোস্ট আমাদের তিনজনকে দিয়ে গেল নিঃশব্দে।

এখানে দেখছি প্রায় সবাই কম কথা বলে।

ব্রেকফাস্ট শেষ হতেই একজন ইউনিফর্মপরা কর্মচারী এসে জানাল, আপনাদের লাদাখে পৌঁছে দেবার জন্যে গাড়ি এসে গেছে।

বাবাঃ! এ যে ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ!

গাড়ির ব্যবস্থা করতে কে বললেন?

থমথমে মুখে কর্মচারীটি চোখ বুজিয়ে হাত জোড় করে বলল, কাল রাত্তিরেই তিনি আদেশ দিয়েছিলেন।

বাস্! আর কিছু বলার নেই।

পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা বেরিয়ে এলাম।

কিন্তু আমাদের আর একজন? পেশেন্ট—

তিনি আগেই গাড়িতে উঠে পড়েছেন। বলল কর্মচারীটি। তাকে যেন খুব ব্যস্ত মনে হল। আমাদের জন্যে সময় নষ্ট করতে চাইছিল না। মানে মানে বিদেয় করে দিতে পারলেই যেন বাঁচে।

সামভোতা বললে, যাবার আগে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

এ কথায় কর্মচারীটিকে বিব্রত লাগল। ইতস্তত করে বলল, দেখা করবেনই? তবে আসুন।

গত রাতে তাঁর সেই ঘর নয়। শোবার ঘর দেখলাম লোকে ভর্তি। সবাই মাটিতে বসে রয়েছে ধ্যানে বসার মতো। নিঃশব্দে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। বিছানায় শুয়ে যে মানুষটি, ফুলের মালার অন্তরালে তাঁর সর্বাঙ্গ ঢাকা পড়ে গেছে।

কী ব্যাপার?

কর্মচারীটি বিমর্ষ বেদনায় শুধু বলল—কাল রাতে হঠাৎই উনি দেহ রাখলেন। রাত তিনটের আগে আমরা কিছু বুঝতে পারিনি।

ওঁকে শেষ প্রণাম জানিয়ে আমরা গাড়িতে এসে উঠলাম। কাল রাত আটটার পর থেকেই তাঁর শরীর খারাপ করছিল। কিন্তু এমন কী হল যে রাতটুকুও কাটল না?

‘চেসিস খানের জীবনের অনেক ঘটনা জেনেছি ভাসিলি ইয়ান রচিত ‘চেসিস খান’ উপন্যাস থেকে।’

## ভর

অনেকেই আমাকে জিগ্যেস করে আমি কি সত্যিই বিশ্বাস করি ভূত বলে কিছু আছে? এ প্রশ্ন শুধু আজকের নয়, বহুকাল আগের। আর সত্যি কথা বলতে কি এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউ দিতে পারেনি। পারবেও না।

ইদানিং ক্লাস টেন-এ পড়া আমার এক প্রতিবেশীর ছেলে বুন্টু আমার ভূতের গল্পের পাঠক ও শ্রোতা হয়ে উঠেছে। তার মনেও অজস্র প্রশ্ন। জিগ্যেস করে, আমি যতগুলি ভূতের গল্প লিখেছি তা কি সবই সত্যি?

কঠিন প্রশ্ন।

তবু উত্তর দিতে হয়। বলি—না, কোনো গল্পই পুরোপুরি সত্য হয় না। সত্যি-মিথ্যে মিলিয়েই গল্প।

বুন্টু জিগ্যেস করে, সত্যি বলো তো কখনও ভূত দেখেছ?

টোক গিলে বলি, না, তা দেখিনি। তবে—

তবে কি? বুন্টু কৌতূহলে ঝুঁকে পড়ে।

বললাম, তবে কিছু অনুভব করি।

সে আবার কী?

বললাম, সে এখন তোরা বুঝবি না। বড় হ তখন বুঝবি।

খুব বুঝবি। তুমি বলো না।

মুশকিল! এ তো পরীক্ষার পড়া বোঝানো নয়, এ হচ্ছে অনুভূতির ব্যাপার। কতবার যে ঘটেছে আমার জীবনে! এই যেমন—এক একটা এমন নির্জন জায়গা আছে সেখানে একা গেলেই মনে হয় আমি আর একা নই, আরও কেউ যেন আছে। তাকে দেখতে পাই না, কিন্তু শব্দ শুনতে পাই। পিছনে শুকনো পাতা মাড়িয়ে কেউ যেন আসছে।

শুধু নির্জন জায়গাতেই নয়, নিজের বাড়িতেও অন্ধকার ঘরে আমি হয়তো উঠে দেশলাইটা আনতে যাচ্ছি, স্পষ্ট টের পেলাম কেউ যেন আমার গা ঘেঁষে সাঁৎ করে সরে গেল। না, পুরো মানুষ নয়, মানুষের একটা ছায়া।

বুন্টু হঠাৎ আমাকে আঁকড়ে ধরল।

কী হল?

ও বলল, ঐ দ্যাখো আলোর জোর কীরকম কমে যাচ্ছে। এখনি লোডশেডিং হবে। বলে আঙুল তুলে বালব্টা দেখিয়ে দিল।

কী হয়েছে?

দ্যাখো না।

দেখলাম আলোটা আস্তে আস্তে নিভে আসছে। কথা বলতে বলতেই গোটা বাড়ি অন্ধকার হয়ে গেল।

বুন্টু আরও কাছে এসে ভয়ে ভয়ে বলল, কী করে বাড়ি যাব?

পিঠে হাত রেখে বললাম, ভয় পাবার কিছু নেই। একটু পরে যাস।

ও কোনোরকমে বলল, বড্ড অন্ধকার!

বললাম, লোডশেডিং! অন্ধকার হবে না?

বুন্টু বলল, লোডশেডিং না ছাই! ঐ দ্যাখো সব বাড়িতেই আলো জ্বলছে। শুধু এই বাড়িতেই—

তাকিয়ে দেখি, তাই তো। সব বাড়িতে আলো জ্বলছে। শুধু আমাদের বাড়িতেই—

অবশ্য এটা কিছু নতুন নয়। এমনটা আজকাল প্রায়ই ঘটছে। সন্দের পর থেকে শুভে যাবার আগে পর্যন্ত হঠাৎ-হঠাৎ আলো নিভে যায়। অথচ লোডশেডিং নয়। কেননা অন্য সব বাড়িতে তখন দিবা আলো জ্বলে।

বারে বারে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ডেকেছি। তারা এসে যা হোক ব্যবস্থা করেছে কিন্তু লাইন আর ঠিক হয় না। শেষে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি যখন বলল, গোটা বাড়িটায় নতুন করে ওয়্যারিং করতে হবে তখন আমি পিছিয়ে এলাম। কারণ অত টাকা খরচ করার সামর্থ্য আমার নেই।

তা ছাড়া ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখলাম, লাইনই যদি খারাপ হবে তাহলে সারাদিন কারেন্ট থাকে কী করে? আর রাত্তিরে আলো নিভে যায় কিছুক্ষণের জন্য। আলো নেভে, কিন্তু পাখা চলে। এ তো বড়ো তাজ্জব ব্যাপার! কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? তবে কেউ না জানুক আমি বিশ্বাস করি, এ সবই ভৌতিক কাণ্ড। কিন্তু এ কথা কাউকে বলা যাবে না।

বাড়িটা আমার দাদামশাইয়ের। দাদুর ছেলে ছিল না। আমার মা তাঁর একমাত্র মেয়ে, আমি একমাত্র নাতি। দাদু মারা যাবার কিছুকাল আগে মাকে আর আমাকে কাছে এনে রাখলেন। আর আমাকেই উত্তরাধিকারী করে গেলেন।

অনেকখানি ফাঁকা জায়গার ওপর বাড়িটা। আমাদের ছোটো সংসারের পক্ষে যথেষ্ট। অনেকখানি কম্পাউন্ড। মধ্যে ফুলের বাগান। পিছনে কলা বাগান, নারকেল বাগান। বেশ শান্ত পরিবেশ। তবে বাড়ির উত্তর দিকে একটা পরিত্যক্ত মাঠ। সেখানে কোনো ছেলে খেলা করে না। এমনকি গরু-ছাগলও চরে না। ঘাসই হয় না তো গরু চরতে যাবে কোন দুঃখে? আসলে ওটা একটা পুরনো পরিত্যক্ত কবরখানা। ঐ মাঠ দিয়ে চলাফেরা করা বারণ ছিল। কিন্তু ছেলে-ছোকরারা শুনত না। শটকাট করতে মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটত। মাঝে মাঝে অসাবধানে জলে-ধসে যাওয়া কবরের গর্তে পা ঢুকে যেত। গাটা কেমন করে উঠত। বাড়িতে বলা যেত না। বললেই স্নান করতে হবে। শীত করলেও রেহাই নেই।

দাদামশাই ছিলেন একটু অন্য প্রকৃতির মানুষ। সে বিষয়ে বলার আগে বাড়িটার কথা বলে নিই।

বাড়িটার একতলায় তিনটি ঘর। যে ঘরটিতে দাদু থাকতেন সে ঘরটায় অন্য কেউ আসা-যাওয়া করে দাদুর তা পছন্দ ছিল না। কেউ ওখানে ঘোরাঘুরি করলেই দাদু হাঁকতেন—কী চাই?

না, কিছু না। এমনই।

যাও! পালাও।

দাদু একটু রাগী মানুষ ছিলেন। আমরা তাই দাদুর ঘরের ত্রিসীমানায় যেতাম না। ভাবতাম কী এমন ও ঘরে আছে যে দাদু কাউকে ও ঘরে ঢুকতে দিতে চাইতেন না!

মাকে জিগেস করলে মা বলত, কী দরকার দাদুর ঘরের কথা ভেবে? আমাদের থাকতে

দিয়েছে এতেই আমরা খুশি।

এক-একদিন সকালবেলায় দাদু বেরিয়ে যেতেন। ফিরতেন অনেক রাতে।

কিছু বললে জ্যেষ্ঠ?

কই না তো!

মনে মনে বিড়বিড় করছিলে যে।

তখনই আমার মাথায় দুর্বুদ্ধি চাপল। নিরীহ ছেলেটাকে ভয় দেখাবার জন্য গলার স্বর বিকৃত করে বললাম, আলো নিভল কেন? ভৌতিক ব্যাপার নয় তো!

সামান্য কথা। কিন্তু বুন্টু আঁৎকে উঠল। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমি বাড়ি যাব।

যাবে তো নিশ্চয়। আলোটা জ্বলুক।

বুন্টু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, না আমি এখুনি যাব। বলেই উঠে পড়ল।

বললাম, দাঁড়াও। একা যেও না। বলে ডাকলাম, শংকর—দু-তিনবার ডাকাডাকির পর শংকর এলো। বললাম, একে বাড়ি দিয়ে এসো। আমার টর্চটা নিয়ে যাও। বলে টর্চটা দিলাম।

শংকর বুন্টুকে নিয়ে নেমে গেল।

ও চলে গেলে ভাবলাম ভয় না দেখালেই হত। ছেলেমানুষ! কিন্তু—হঠাৎ ভূতের কথাটা মুখে এসে গেল কেন? আলো নিভে যাওয়া নতুন কিছু নয়। ইদানিং প্রায় প্রতিদিনই তো...। বেশ কিছুক্ষণ ঐ একটা কথাই মনের ভেতর ঘোরাফেরা করতে লাগল—হঠাৎ ভূতের কথা মনে এল কেন?

এমনি সময়ে নীচ থেকে বুন্টুর ডাক শুনতে পেলাম—জ্যেষ্ঠ!

চমকে উঠলাম। কী হল বুন্টুর?

যাই। বলে মুহূর্তমাত্র দাঁড়িয়ে না থেকে অন্ধকার ঘরের মধ্যে দিয়ে ছুটে বারান্দায়। তারপর দেওয়াল ধরে ধরে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে একেবারে রাস্তার দরজায়।

অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। আন্দাজেই বুন্টুকে ডাকলাম, তুই কোথায়? টর্চটা জ্বালা।

টর্চ তো জ্বালা হলই না। বুন্টুর কাছ থেকে সাড়াও পাওয়া গেল না। শংকরই বা গেল কোথায়? ডাকলাম, শংকর—

সাড়া পাওয়া গেল না। ফের ডাকলাম—শংকর—

এবার যেন অনেক দূর থেকে সাড়া পেলাম।

এই যে আমি এখানে।

কোথায়?

এবার আর সাড়া পাওয়া গেল না। আমি দরজার দিকে যাবার জন্য কানামাছি খেলার মতো নিজেরই বাড়িতে ঘুরপাক খেতে লাগলাম। পথ আর খুঁজে পাই না।

কতক্ষণ এইভাবে ঘুরেছি জানি না। হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। চোখ কচলে তাকলাম। এ কী! সিমেন্ট বাঁধানো উঠান থেকে কখন নেমে এসে দাঁড়িয়েছি পাতকুয়োর কাছে। আমার কি মাথার গুণ্ডগোল হয়ে গেল নাকি? ডাকলাম, শংকর—

শংকর বোধহয় কাছেই কোথাও ছিল। সাড়া দিল—বলুন। তারপর আমার দিকে চোখ পড়তেই বলে উঠল, একী! আপনি কুয়োতলায় কী করছেন?

আমি সলজ্জভাবে উত্তর দিলাম, কী জানি বুঝতে পারছি না। বুন্টুকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছি তো?

ক—খ—ন! এতক্ষণে খেতে বসে গেছে।

এরই মধ্যে খেতে বসেছে!

শংকর বলল, এরই মধ্যে বলছেন কেন? এখন কটা বাজে জানেন?

জানি না। জানতে চাই না। বুঝতে পারি আমার মাথার মধ্যে কিছু গোলমাল হয়েছে।

দাঁড়াতে পারছিলাম না। পা দুটো কাঁপছিল। আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এলাম।

ওপরে এসে অনেকক্ষণ খাটে বসে রইলাম। শরীরটা কেমন দুর্বল লাগছে। মনে হল যেন অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছি।....আশ্চর্য! এমন তো কোনোদিন হয়নি। আমি খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে রইলাম। গোড়া থেকে সব ব্যাপারটা ভাবতে শুরু করলাম। এমন অদ্ভুত ব্যাপার কেন ঘটল?

বুন্টুকে হঠাৎ আজই ভয় দেখাতে ইচ্ছা করল কেন? এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন : বুন্টুকে শংকরের হেপাজতে দেবার পর থেকে আমি একা নীচে কী করছিলাম? কেনই বা সিমেন্ট বাঁধানো উঁচু রক থেকে কুয়োতলার ভিজে মাটিতে নেমে গেলাম—যেখানে বড় একটা নামার দরকার হয় না। কুয়ো থেকে জল তোলার দরকার হলে রক থেকেই কপিকলের সাহায্যে তোলার ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া আমিই বা জল তুলতে যাব কেন? দরকার মতো শংকরই জল তুলে দেয়।

আরও একটা ভাবনা আমায় চিন্তায় ফেলেছিল, বুন্টুকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে শংকর যখন নীচে নেমে গেল, আমিও প্রায় তখনই নীচে নেমেছিলাম। গিয়ে দেখি শংকর অনেক আগেই বুন্টুকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছে।

বেশ। মানলাম শংকর ঠিকই বলছে। কিন্তু শংকরকে যখন আমি জিগোস করলাম বুন্টুকে পৌঁছে দিয়েছে কিনা তখন শংকর বললে—অনেকক্ষণ। এতক্ষণে বোধহয় বুন্টু রাতের খাবার খাচ্ছে।

তাই যদি হয় তা হলে এতক্ষণ আমি কী করছিলাম? কোথায় ছিলাম?

কোনো প্রশ্নেরই উত্তর পেলাম না। দূর ছাই! আর ভাবতে পারি না—বলে আলিসা ভেঙে উঠে বসলাম। কটা বেজেছে দেখবার জন্যে দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকলাম। অবাক হয়ে গেলাম। পাঁচটা বেজে দশ মিনিট! ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। আশ্চর্য! আমার ঘড়িটা তো কখনও এমন আলটপকা বন্ধ হয় না। তাহলে কি দম দেওয়া হয়নি? দম দিতে ভুলে গেছি?

না, এমন ভুল আমার হয় না। বেশ মনে পড়ছে নিয়মমতো আজও ব্রেকফাস্ট সেরেই দম দিয়েছি। ঘড়িতে দম দেওয়ার পর শুরু হয় প্রতিদিনের কাজকর্ম। আজও তার যে ব্যতিক্রম হয়নি তার প্রমাণ রয়েছে ঐ যে টুলটা। পাশের ঘর থেকে টুলটা টেনে নিয়ে এসে তার উপর দাঁড়িয়ে আমি পুরোনো দেওয়াল ঘড়িটায় দম দিই।

সবই তো দেখছি ঠিকঠাক হয়েছে। তবু কেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে?

এর কারণ কী?

উত্তর একটাই—জানি না।

একা বসে এই সব ভাবছি, হঠাৎ একটু বেশি মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠলাম। সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ! কেউ যেন খালি পায়ে নীচ থেকে ওপরে উঠে আসছে। শব্দটা স্পষ্ট হতে লাগল ততই আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে যেতে লাগল। কে আসছে? কোথা থেকে আসছে? কেন আসছে? এখন তাহলে আমি কী করব?

দরজাটা ভেজানো ছিল। মনে হল এই মুহূর্তে আমার কর্তব্য হচ্ছে দরজার খিল দিয়ে দেওয়া।

তাড়াতাড়ি উঠে দরজার কাছে গেলাম। চেপে বন্ধ করতে যাচ্ছি, দেখলাম হাঁটু পর্যন্ত তোলা ধুতি পরা একটা পা চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে। ভয়ে আমি চিৎকার করতে যাচ্ছি, এবার গোটা মানুষটাকে দেখতে পেলাম। খাবার থালা হাতে শংকর অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দরজা বন্ধ করছেন কেন? খাবেন না?

ও! হ্যাঁ!

নিজের এই দুর্বলতায় খুব লজ্জা পেলাম। সরে এলাম। শংকর টেবিলের ওপর আমার রাতের খাবার রেখে চলে গেল।

## ॥ দুই ॥

জায়গাটার নাম ‘পোড়া মাঠ’। লোকবসতি কম। মেন রাস্তা থেকে দক্ষিণে নেমে এলেই দেখা যাবে অনেকখানি জায়গা জুড়ে শুধু মাঠ আর মাঠ। এত জায়গা থাকতে কেন যে দাদামশাই এখানে এই বাড়িটা কিনেছিলেন তা আজ আর জানার উপায় নেই। দাদামশাই মানুষটি খুব খেয়ালি স্বভাবের ছিলেন। টাকাপয়সাও ছিল ভালো রকম। শুনেছি তিনি উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে থাকতে ভালোবাসতেন, তাই হয়তো এই জায়গাটাকে পছন্দ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন পাকাপাকিভাবে বাস করার জন্যে বাড়িটা নেননি। মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে এসে হৈ-হুল্লোড় করতেন। বাড়ির নাম দিয়েছিলেন ‘বিলাস-নিকেতন’। থাকতেন মধ্য কলকাতার একটা ভাড়াবাড়িতে। কলকাতাতেই চাকরি। তবে উনি নাকি চাইতেন ছুটি-ছটায় এখানে এসে থাকতে। পাকাপাকিভাবে থাকার অভিপ্রায় কোনোদিনই ছিল না।

এই যে একসঙ্গে এত বড়ো মাঠ এরকম খুব একটা দেখা যায় না। অবশ্য এখন আর টানা মাঠ নেই। বন্যায়, ঝড়ে, বৃষ্টিতে কিংবা ভূমিকম্পে বিশাল মাঠটা যেন খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে। আরও অদ্ভুত ব্যাপার মাঠে কোথাও শুধু বালি, কোথাও পাহাড়ি জায়গার মতো শুধু পাথর। আর এখানে-ওখানে বাবলার ঝোপ।

এসব ছিল দাদামশাই যখন এখানে বাড়ি কিনেছিলেন তখন। আমরা যখন এখানে আসি তখন অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়েছে। অনেকখানি মাঠ জুড়ে লোকবসতি গড়ে উঠেছে। ছেলেদের খেলবার মাঠ তৈরি হয়েছে। মাঝে মাঝে সার্কাসপার্টি এসে তাঁবু ফেলে। লাইট, ফোন সবই এখন হয়েছে এখানে।

দাদামশাই যে কেন এখানে মাঝে মাঝে আসতেন তার কারণ জানতে পেরেছিলাম তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কাঠের বাস্তু থেকে পাওয়া একটা খাতা বা ডায়েরি থেকে। আসলে তিনি ছিলেন এক ধরনের গবেষক। পুরোনো পরিত্যক্ত কোনো জায়গা দেখলেই সেখানকার ইতিহাসের খোঁজ করতে শুরু করেন। এইভাবেই তিনি ‘পোড়া মাঠের’ হারিয়ে যাওয়া কাহিনি খুঁজে বের করেন। কিন্তু কাউকে বলেননি। লিখে রেখে গিয়েছিলেন। মলাটে লাল কালিতে লিখে রেখেছিলেন ‘অতি ভয়ঙ্কর’।

কী ভয়ঙ্কর লেখেননি। কিন্তু আমি আমার জীবন দিয়ে তা অনুভব করেছি। এবার সেই কথাই বলি।

মাঠের পূর্বদিকটার জমিদার ছিলেন জয় পাল। আর পশ্চিমদিকের মালিক ছিলেন দশরথ মণ্ডল। ঝগড়া হত আবার মিটেও যেত। দু'পক্ষের মধ্যে যত মারামারিই হোক নববর্ষের দিন দু'পক্ষই সাদা নিশান উড়িয়ে জানিয়ে দিত এবার সন্ধি। সেদিন একপক্ষ থেকে আর-একপক্ষের কাছে যেত ঝাঁকা ঝাঁকা ফল, টিন টিন মিষ্টি। জমিদারের জন্যে পাঠানো হত ফাইন ধুতি, মলমলের পাঞ্জাবি আর পাগড়ি। এমনি পাগড়ি কেউ পরত না, কিন্তু উপহারের পাগড়ি মাথায় একবার দিতেই হত দুই জমিদারকে। ঐ একদিনই পাগড়ি পরা হত। বাকি সময় পাগড়ি তোলা থাকত আলমারির মাথায়।

একদিন ঘটল একটা ঘটনা! এমন ঘটনা, যে তা একরকম ইতিহাস হয়ে উঠল।

জয় পালের ছিল একটি পরমাসুন্দরী কন্যা। নাম আত্রেয়ী। বারো বছর বয়েস। ওই অল্পবয়েসেই নানা জায়গা থেকে বিয়ের ভালো ভালো সম্বন্ধ আসতে লাগল। কিন্তু আত্রেয়ীর বাবা-মা এত অল্প বয়েসে বিয়ে দিতে রাজি নন। আত্রেয়ীও বিয়ের কথা ভাবে না। তার ভালো লাগে একা একা ঘুরে বেড়াতে। দেখতে ইচ্ছে করে দু'পা দূরে দশরথ মণ্ডলের রাজ্যপাট। ঐ তো দেখা যাচ্ছে পশ্চিম প্রান্তের সার সার তালগাছ। গাছগুলো যেন সীমান্তের গ্রহরী। দুই জমিদারেরই কড়া হুকুম ছিল কেউ যেন অনুমতি ছাড়া ভিন রাজ্যে না ঢোকে। এই আদেশ অমান্য করলেই কয়েদ করে রাখা হবে। ফলে কোনো পক্ষেরই মানুষ সীমান্তের ধারে-কাছে যেত না।

আত্রেয়ীর এই আদেশের কথা জানত, কিন্তু ও নিয়ে মাথা ঘামাত না। সীমান্তের ওপারে যাবার কথা তার বন্ধুদের কাছে বললে তারা আঁতকে উঠে সাবধান করে দিত, তোর বাবার আদেশের কথা জানিস না?

আত্রেয়ী বলত, জানি। কিন্তু আমি তো গুপ্তচর নই। কাজেই কোনো পক্ষেরই ভয় পাবার কিছু নেই। বরং দু'পক্ষেরই লাভ। খোলা মনে মিশতে পারলে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ় হয়।

আত্রেয়ী ভালো লাগত গভীর রাতে চুপি চুপি বেরোতে। চারিদিক নিবুন্ম নিস্তব্ধ। কেউ দেখছে না। আত্রেয়ী মনের আনন্দে চলে যেত সীমানা পেরিয়ে দশরথ মণ্ডলের এলাকায়। আবার ভোর রাতে ফিরে আসত। এ যেন একরকম অ্যাডভেঞ্চার। খুব ভালো লাগত। সারা রাত ঘুরত যেন স্বপ্নের ঘোরে। তারপর সারা দুপুর ঘুমোত। এইভাবে দিন কাটছিল।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময়ে এই অঞ্চলের মানুষের দুটি ব্যাপারে ভয় ছিল। এক—বিষধর সাপ, দুই—ভূত। সাবধানে চলাফেরা করলে সাপকে তবু এড়ানো যায়। কিন্তু ভূত খুবই ভয়ংকর। তখন ভূতের আড্ডা নাকি ছিল গোটা পোড়া মাঠ জুড়ে। তবে সহজে তারা দেখা দিত না। বিশেষ বিশেষ তিথিতে বিশেষ বিশেষ ভাবে তাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যেত। কখনও কখনও দেখা যেত গভীর রাতে ঐ পোড়া মাঠে একটা ছায়া ছায়া মূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার কখনও গভীর রাতে হঠাৎ হঠাৎ ঝড় উঠত। তারপর দেখা যেত জলস্রোতের মতো বালির স্রোত। প্রায় আকাশ-ছোঁওয়া। পরক্ষণেই বিকট শব্দ করে আছড়ে পড়ত মাঠের ওপর। এসবই যে ভৌতিক ব্যাপার তা সবাই জানত। তাই দরজা-জানলা বন্ধ করে গুটিগুটি মেরে শুয়ে থাকত মশারির মধ্যে। আবার কখনও গভীর রাতে হয়তো দেখা গেল বিকট একটা মূর্তি লম্বা লোমশ দুটো হাত দোলাতে দোলাতে মাঠের মধ্যে এদিক-ওদিক ঘুরছে। যে ক'জন দেখেছে তারা কেউই আর সুস্থ স্বাভাবিক নেই।

আত্রেয়ী নিশ্চয়ই একথা জানত। তবু সে বেরোত রাতের বেলা। প্রায় রাত্তিরেই তার



মনে হত মাঠের অন্য প্রান্ত থেকে কারা যেন তাকে ডাকে। সে ডাকে সাড়া না দিয়ে পারত না আত্রেয়ী। কিন্তু—একদিন সে আর ফিরল না। কোথায় যেন হারিয়ে গেল। যে রাতে সে হারিয়ে গেল সে রাতে না কি ঐ অঞ্চলের সব বাড়িতে আলো নিভে গিয়েছিল।

এসব অনেক দিন আগের কথা। ক্রমে এ অঞ্চলের মানুষ ভুলে গেল জয় পাল আর দশরথ মণ্ডলের কথা। কিন্তু জমিদারকন্যা আত্রেয়ীর কথা আজও মুখে মুখে ফেরে। কী হল মেয়েটার? বাড়ির কাছে অতি পরিচিত মাঠ থেকে উধাও হয়ে গেল কেমন করে?

শোনা যায় জমিদার জয় পাল মেয়ের খোঁজে দেশে দেশে লোক পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সন্ধান পাননি।

শেষে এক গুণিন এসে ছক কেটে হিসেব করে জানিয়ে গেল ঐ পোড়া মাঠ বড়ো অভিশপ্ত। অশরীরী আত্মার কোপ আছে। সাবধান।

অনেকদিন তো আছি এ বাড়িতে, কিন্তু এত সব কথা আমি কিছুই জানতাম না, জেনেছি এই সব—দাদামশায়ের সেই খাতাখানি পড়ার পর থেকে। আর তারপরেই যে কীসব ঘটে চলেছে চারদিকে! চারদিকে নাকি আমার মনের মধ্যেই? কী জানি, সেটাও তো ভালো বুঝতে পারি না ছাই।

তবে এটাও কিন্তু ঠিক, লোকজনও বেশ সাবধান হয়ে গিয়েছে এখন। অবশ্য সাবধান আর কী হবে? দু' অঞ্চলের মানুষজন খুব দরকার না হলে কেউ আর ঐ মাঠে পা দিত না। সূর্য ডোবার পর তো নয়ই।

## ॥ তিন ॥

হঠাৎ চমক ভাঙল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সাড়ে বারোটো।

কী সর্বনাশ! এত রাত পর্যন্ত জেগে কী করছিলাম?

ক্রমে ক্রমে মনে পড়তে লাগল সব কথাই। ঐ তো টেবিলের ওপর আমার রাতের খাবারের থালাটা পড়ে রয়েছে। শংকর রেখে গিয়েছিল। মুখে দেওয়া হয়নি। আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম?

না। আসলে নানা কথা ভাবতে ভাবতে অনেক দূর পিছিয়ে গিয়েছিলাম।

এবার থালাটা টেনে নিলাম। খাওয়ার ইচ্ছে নেই। খেতে পারলামও না। রুটিগুলো শুকিয়ে চামড়ার মতো হয়ে গেছে।

থালা নামিয়ে রেখে হাতমুখ ধুয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম এল না। কেবলই মনে হতে লাগল আজও হঠাৎ কেন সন্ধ্যাবেলায় আলো নিভল! আর আলো নেভা মাত্রই ব্যাপারটা ভূতুড়ে কাণ্ড বলে মনে হল? কেনই বা সন্ধ্যাবেলা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত একটা ঘোরের মধ্যে রইলাম! কেনই বা এতকাল বাদে 'পোড়া মাঠ'-এর কাহিনিটা মনের মধ্যে জেগে উঠল! আর 'আত্রেয়ী' নামে সেই হতভাগিনী মেয়েটি—যার কথা আজ অনেকেই ভুলে গেছে, তার কথা মনে পড়ল? আমার অস্বস্তি আরও বাড়ছিল সেই ছায়ামূর্তির কথা মনে পড়ায়, যে নাকি গভীর রাতে লম্বা লম্বা পা ফেলে দু'হাত দোলাতে দোলাতে পোড়া মাঠের মধ্যে দিয়ে

এগিয়ে আসত। এগিয়ে আসত এই দিকে, মানে—দাদামশাইয়ের বাড়ির দিকে—যে বাড়িতে এখন একা আমি থাকি।

এত দিক থাকতে কেন যে সে এই বাড়িটার দিকেই আসত তা আমি বুঝতে পারি না। যেমন বুঝতে পারি না কত দিনে মাঠ থেকে উঠে এসে সে পৌঁছবে এখানে। তারপর কী করবে তাও অজানা। তবে এটুকু জানি তাকে ঠেকাবার শক্তি আমার নেই। সে কি তাহলে আজই এসে পৌঁছেছে? সন্ধ্যাবেলায় আলো নিভিয়ে দিয়ে কি সে-ই ঢুকেছে এ বাড়িতে?

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। তাকাতেই দেখলাম একটি মেয়ের ছায়া যেন ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আশ্চর্য! কে এই মেয়ে? ঘরে ঢুকল কী করে? দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ।

চমকে উঠে বসলাম। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভাঙা গলায় বললাম, কে তুমি?

উত্তর দিল না। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল।

এবার টেঁচিয়ে বললাম, উত্তর দিচ্ছ না কেন? কে তুমি?

মেয়েটি এবারও উত্তর দিল না। শুধু ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল।

উঃ কী ভয়ংকর! মাথার সামনের দিকটা জুড়ে বীভৎস একটা গর্ত। যেন হিংস্র কোনো জন্তু ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার মুখের ওপর। মাথা ঘোরাবার সঙ্গে সঙ্গে একগাদা বালি পড়ল মাথা থেকে। এত বালি এল কোথা থেকে?

এমন সময়ে ভোরের পাখি ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বীভৎস মূর্তিটা যেন সচেতন হল। আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে হঠাৎ তার কংকালসার একটা হাত তুলে সামনের মেঝেটা দেখিয়ে দিয়ে কিছু যেন বোঝাতে চাইল। তারপরেই বাতাসের একটা ঝাপটা তুলে বেরিয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, ও এখন এখানেই থাকে।

আমি কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে রইলাম।

এই কি সেই বহুযুগ আগে পোড়া মাঠে হারিয়ে যাওয়া আত্রেয়ী? ওর মাথা থেকে বালি ঝরে পড়ল কেন? তবে কি সে বালির মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল? তাই যদি হয় তবে এ কথা আজ কাকে বলব?

এই এতক্ষণ ধরে আজ রাতে যা ঘটল তা যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে দাদামশাই-এর এই বাড়ি তৈরি হয়েছিল ‘পোড়া মাঠ’-এর সেই জায়গায় যেখানে আত্রেয়ী চোরাবালিতে ডুবে গিয়েছিল।

এতদিন এখানে আছি একদিনের জন্যেও ভয় পাইনি। কিন্তু এখন সর্বত্র এক অশরীরীর অস্তিত্ব অনুভব করছি। দিনের বেলাটা একরকম কাটে। কিন্তু সন্ধ্যা হলেই হয়ে যাই অন্যরকম। তখন একবার মনে হয় এই সময়ে ঘরে থাকা ঠিক নয়। হয়তো অঘটন কিছু ঘটবে। ছটফট করে ঘরের বাইরে চলে আসি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় এই ভরসন্ধ্যায় বাইরে থাকা ঠিক নয়। বরঞ্চ ঘরটাই নিরাপদ। আর তখনই আবার ঘরের দিকে পা বাড়াই। এ এক অদ্ভুত অবস্থা মনের। মনটা যেন আমার নয়, অন্য কেউ তার লাগাম ধরে আছে। মনের এই অদ্ভুত অবস্থা এমনি-এমনি হয়নি। বিপদ ঘটবার চান্স ছিল। হ্যাঁ ছিল। যেমন—

সে দিন বিকেলে শংকর গুটিগুটি এসে দাঁড়াল। ওকে এই অবস্থায় এসে দাঁড়াতে দেখলেই বুঝতে পারি কোনো মতলব আছে। বললাম, কী রে? কিছু বলবি?

ও সসংকোচে বলল, আমার কাকার ছেলে এসেছে। দেখা করে আসব?

জিগ্যেস করলাম, কোথায়?

শংকর বলল, টাউনে।

মনে মনে ভাবলাম, ও বাবা! সে তো অনেক দূর। মুখে বললাম, তাড়াতাড়ি ফিরবি তো?

শংকর ভালো করেই জানে ওকে না হলে আমার একবেলাও চলে না। তাই বিনয়ে ভেঙে পড়ে বললে, যাব আর আসব।

আশ্বস্ত হয়ে বললাম, তবে যা। ও খুশি হয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, দরজাটায় খিল দিয়ে দিন।

শংকর চলে গেল। যাবার সময়ে আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলল, কেউ ডাকলেও দরজা খুলবেন না। মনে মনে একটু যেন চমকে উঠলাম। শংকর এরকম কথা তো কোনোদিন বলে না, আজ কি তবে আমার কোনো বিপদের আশঙ্কা করছে ও! হেসে বললাম, আর তুই যখন আসবি তখন?

ও বলল, আমি রাস্তা থেকে ডাকব আপনাকে।

ঠিক আছে। তুই যা।

একটু পরেই সূর্য্যদেব তালগাছগুলোর আড়ালে নেমে পড়লেন। মনে হল যেন আকাশ-জননী দু'হাত বাড়িয়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত সন্তানকে কোলে টেনে নিলেন।

এটা কিছু নতুন ব্যাপার নয়। শংকরের ওপর আমার নির্ভর করে থাকতে হয় ঠিকই, তা বলে ও আমাকে একা রেখে কখনও কোথাও যায় না, এমনও তো নয়। কাছেই একটা পুরোনো কালীবাড়ি আছে। সন্ধ্যাবেলা কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি হয়। শংকর প্রায় দিনই আরতি দেখতে যায়। আরতি শেষ হলে ফিরে আসে। এই সময় আমাকে প্রায় আধঘণ্টা একা থাকতে হয়। তা নিয়ে কোনোদিন কিছু ভাবিনি। কিন্তু এই কিছুদিন আমার যে কী হয়েছে একা থাকলেই ভয় করে। কিসের ভয় তা বুঝতে পারি না।

এই যেমন আজ সন্ধ্যাবেলা ঘরে চুপচাপ বসে আছি। শংকর ফিরলেই একটু ঘুরে আসব বলে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে রেডি হচ্ছি, এমন সময় খিড়কির দরজায় কে যেন কড়া নাড়ল।

আমার কাছে বড়ো একটা কেউ আসে না। বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলা। তাই অবাক হলাম। কিন্তু তখনই সাড়া দিলাম না। মিনিট কয়েক পরেই আবার শব্দ। এবার যেন কেউ অধৈর্য হয়ে কড়া নাড়ছে।

যাচ্ছি। বলে উঠে পড়লাম।

আর তখনই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলাম। যে কড়া নাড়ছিল সে যেন নিজেই উঠে আসছে।

বিরক্ত হলাম। বলা নেই কওয়া নেই একেবারে উপরে উঠে আসছে।

আমি ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইলাম। এরই মধ্যে ভেবে নিলাম যদি তেমন কেউ হয় তা হলে তো এক কাপ চাও খাওয়াতে পারব না। কারণ ওসব দায়িত্ব শংকরের।

তা হলে—এমনিভাবে মিনিট পাঁচেক সময় গেল।

আচ্ছা, কোন ঘরে বসাব?

সে না হয় দেখা যাবে। আগে তো আসুক। কিন্তু জুতোর শব্দে আর পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হল যে আসছিল সে যেন হঠাৎ থেমে গেছে। আমার কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। দেখতে চাইছে আমি গিয়ে রিসিভ করি কি না।

ততক্ষণে চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। আমি সিঁড়ির দিকে এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিছু একটা হয়েছে মনে হচ্ছে।

কী হল ব্যাপারটা?

বাইরের দরজায় কেউ কড়া নেড়েছিল একটু আগে। একবার নয়, দু-দুবার। কিন্তু সে উপরে উঠে এল কী করে? শংকর বেরিয়ে যাবার পর আমি তো নিজের হাতে ভেতর থেকে খিল নিয়ে এসেছি।

তা হলে?

আমার মাথাটা টলে গেল। দেওয়াল ধরে কোনোরকমে সামলে নিলাম। মনে হল এখনই বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়া দরকার। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে চলে এলাম। তারপর বিছানা থেকে বালিশটা টেনে নিয়ে তার মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লাম। আমি নিশ্চিত, যে বেশিক্ষণ চোখ বুঁজে ছিলাম না। একটু পরেই শংকরের হাঁকডাক শুনে উঠে বসলাম। যাক, শংকর এসে গেছে।

কখন এলি?

এই তো আসছি। বলে আলোটা জ্বেলে দিল সে।

কোথাও বেরোচ্ছিলেন নাকি?

বেরোচ্ছিলাম! আমি! কই না তো?

ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছেন।

মনে পড়ল কিছুক্ষণ আগে আমি বেরোব বলে তৈরি হয়েছিলাম। তারপর—

আচ্ছা, আপনাকে আমি বার বার করে বলে গেলাম বাইরের দরজায় খিল দিতে ভুলবেন না। তবু ভুলে গেলেন। কোন দিন বিপদ ঘটবে দেখবেন।

অবাক হয়ে বললাম, কে বলল আমি দরজা বন্ধ করিনি?

বলবে আবার কে? আমিই তো প্রমাণ। দিব্যি গড় গড় করে ওপরে উঠে এলাম।

তাই তো। আমি হতভম্বের মতো শংকরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

একটু আগেও সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শুনেছি। ঐ কথাটাই ভাবছিলাম। বাইরের দরজা আমি তো নিজের হাতে বন্ধ করে এসেছি। তাহলে?

রাতে কী খাবেন? ভাত না রুটি?

আমার এখন অন্য চিন্তা—খিল খুলল কে? সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শুনেছিলাম? কে সে? ওপরে উঠে এল না কেন?

বললাম—যা হোক কর গে।

শংকর চলে গেল। কিন্তু—তখনই হস্তদস্ত হয়ে ফিরে এল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, যা ভেবেছিলাম তাই।

কী?

কেউ একজন কখন বাড়িতে ঢুকে পড়ে সিঁড়িতে লুকিয়ে আছে।

সে কী!

মনে হল চোর।

চোর! আমি চমকে উঠে বসলাম।

হতে পারে বটে, নীচে নেমেছিলাম একবার। হঠাৎ দেখি সিঁড়িতে কী যেন নড়ছে। ছাগল-কুকুর নয়। একটা আস্ত মানুষই। গুঁড়ি মেরে বসেছিল অন্ধকারে। আমার সাড়া পেয়েই কুঁজো হয়ে লাফাতে লাফাতে বাইরের দরজার দিকে চলে গেল। কথাটা শংকরকে বলা চলবে না। ভয় পাবে। তাই বললাম, বলিস কী? চল তো দেখি।

বলতে বলতে টর্চ জ্বলে নীচে নেমে গেলাম।

কই রে। কেউ তো নেই।

শংকর মাথা চুলকে বলল, এখন নেই। কিন্তু একটু আগেও ছিল। আমি নিজের চোখে দেখেছি।

তা হলে গেল কোথায়?

তাই তো ভাবছি। বলতে বলতে শংকর এগিয়ে চলল। পেছনে আমি। বাইরের দরজার কাছে গিয়ে টর্চের আলো ফেলতেই চমকে উঠলাম। দেখলাম দরজায় ভেতর থেকে খিল আঁটা।

তার মানে বাইরে থেকে কেউ ঢোকেনি।

শংকর ঢুকেছিল। নিশ্চয়ই তখন দরজা খোলা ছিল। তারপর ঢুকেই ভেতর থেকে খিল লাগিয়ে দিয়েছিল সে।

ইচ্ছে করেই শংকরকে জিগ্যেস করলাম, ঢুকে দরজা বন্ধ করেছিলি তো?

ও মাথা নিচু করে বলল, না। খেয়াল ছিল না।

নাও ঠালা।

সিঁড়িতে জুতো পরে যিনি আসছিলেন—তিনি তো বাড়িতে ঢুকেছেন অনেকক্ষণ আগেই। কী করে ঢুকেছিলেন এর উত্তরও আমার জানা নেই।

## ॥ চার ॥

শুধু মনের নয়, বাইরেও পরিবর্তন হতে লাগল। সেটা বুঝতে অবশ্য দেরি হয়েছিল। প্রথম প্রথম বুঝতে পারতাম না। শুধু দেখতাম ইদানিং শংকর হঠাৎ আমার সামনে এসে পড়লে কেমন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার সে সময়ের চোখের ভাষা ঠিকমতো বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝতাম কেমন যেন ভয়-মেশানো অবাক চাউনি।

মাঝে মাঝে আমি বিরক্ত হয়ে ওকে ধমকে উঠতাম, হাঁ করে কী দেখছিস?

শংকর উত্তর দিতে পারত না। কারণ উত্তর দেবার কিছু ছিল না। ও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চলে যেত।

কয়েকদিন কাটল। তারপর লক্ষ করলাম ও যেন আর আমার সামনে আসতে চায় না। ডাকলে কোনোরকমে দূর থেকে হঁ-হাঁ করে সাড়া দিয়ে কাছে এসে চোখ নিচু করে দাঁড়াত। যেন আমার মুখ দেখতে চায় না।

কেন এরকম আচরণ? আমার মুখটা কি কদিনের মধ্যে বদলে গেছে? কী বা বদলাতে পারে! ভালো হলে বড়োজোর রোগা মুখটা ভরাট হতে পারে। খারাপ হলে মুখটা আরও শীর্ণ হয়ে যাবে। তার বেশি কিছু নয়। যাক সে কথা ভেবে লাভ নেই। বরঞ্চ একবার আয়নার সামনে দাঁড়ালেই সঠিক বোঝা যাবে।

এখানেও মুশকিল। একটা ছোটো আয়না আছে বটে কিন্তু তা আমি ব্যবহার করি না। দরকারও হয় না। আয়না ছাড়াই আমার চুল আঁচড়ানো হয়ে যায়। আয়না ছাড়াই দাড়ি কামানো সুসম্পন্ন হয়।

যাই হোক শংকরকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে আর ইচ্ছে করে না। ভাবলাম কাল বুন্টু এলে দেখব ও কী করে।

কিন্তু পরের দিন বুন্টু এল না।

কেন এল না?

নিজেকেই নিজে উত্তর দিই। কেন আবার? রোজ আসা কি কারও পক্ষে সম্ভব?

সাধারণত বুন্টু এলে সঙ্গে দু-তিনটে বন্ধুও আসে। বাড়ির সংলগ্ন বাগানে একটা দোলনা টাঙানো আছে। বুন্টুরা এলে ঐ দোলনায় চড়ে। কোনোদিন ক্যারামবোর্ডটা নিয়ে বসে। আমার ভালো লাগে। এরা না এলে বাড়িটা যেন বড্ড শূন্য লাগে।

পরের দিন দুপুর থেকেই আমি অপেক্ষায় রইলাম কখন বুন্টুরা আসে। এমনভাবে কোনোদিন ওদের জন্য অপেক্ষা করি না। আজ করলাম। তার কারণ মনটা অস্থির হয়ে ছিল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ওরা কিছু বলে কিনা জানার জন্যে। সে দিন ওরা এত দেরি করে এল যে আমি অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম। তাই ওরা আসতেই আমি ধমকে উঠলাম, এত দেরি?

বুন্টু খুবই অবাক হল। কেননা আমি কোনোদিন ওদের আসা-যাওয়া নিয়ে কিছু বলি না। দেখলাম বুন্টু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

ওর অবাক হওয়া দেখে আমি ভয় পেলাম। জিগ্যেস করলাম, কী দেখছিস?

ও মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, কিছু না।

সত্যি করে বল।

বুন্টু থতমত খেয়ে বললে, তোমার ডান দিকের গালে কালো মতো একটা দাগ—।

চমকে উঠলাম—কালো দাগ!

হ্যাঁ। কিছু লেগেছে বোধ হয়।

আমি ভয় পেলাম। আমি তো জানি কিছু লাগার দাগ নয়। ওটা অন্য জিনিস।

দুপুরবেলা টেবিলের ড্রয়ার থেকে আয়নাটা বের করলাম। তারপর জানলার ধারে গিয়ে ভালো করে লক্ষ করলাম।

হ্যাঁ, দাগই। চামড়ার ভেতর থেকে ফুটে উঠেছে। দেখলে মনে হয় কোনো চর্মরোগ। সপ্তাহখানেক পরে লক্ষ করলাম দাগটা অনেকখানি বেড়ে গেছে। থুতনি থেকে চোখের কোণ পর্যন্ত।

কেন এমন হচ্ছে বুঝতে পারি না। নিজের সঙ্গে নানা তর্ক করি। সব যেন গুলিয়ে যায়। যত গুলিয়ে যায় ততই ভয় পাই। কিসের ভয় তা জানি না। শুধু মনে হয় ভয়ংকর কোনো অশুভ ঘটনা ঘটতে চলেছে।

সেদিন বিকেলে বুন্টু এল। যাক, একাই এসেছে। ও এ বাড়ির ছেলের মতোই। ঠিক করলাম ওকে ডেকে নিয়ে জিগ্যেস করব, দাগটা কমেছে না কি এখনও আছে? যদি কমে গিয়ে থাকে তাহলে ভালোই। আর যদি এখনও দাগ থাকে তা হলে কী হবে জানি না। ডাক্তারের কাছেও যেতে ইচ্ছে করে না।

যাই হোক চা খাওয়া শেষ করে অন্য দিনের মতো খুব সহজভাবে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম ও ক্যারামবোর্ডটা নিয়ে একা একা হিট করছে।

কী বুন্টুবাবু, একা যে? আজ তোমার বন্ধুরা কোথায়?

বুন্টু আমার দিকে তাকিয়েই কেমন যেন হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ক্যারাম ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল।

আশ্চর্য! আমার কথার উত্তর পর্যন্ত দিল না? খুব রাগ হল। কড়া গলায় ডাকলাম—  
বুন্টু! ডেকেই চমকে উঠলাম। এ কার স্বর? এত কর্কশ! ততক্ষণে বুন্টু নীচে নেমে গেছে।  
ও সাড়া পর্যন্ত দিল না।

আমি তাড়াতাড়ি শংকরকে ডাকলাম। শংকর ওপরে উঠে এল। কিন্তু আমার মুখের  
দিকে তাকাল না। মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। জিগ্যেস করলাম, বুন্টু চলে গেল?

হ্যাঁ, গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল শংকর।

হঠাৎ চলে গেল কেন?

শংকর খুব সহজভাবে বলল, বোধ হয় ভয় পেয়েছে।

মনে মনে এবার আমিই ভয় পেলাম। তা হলে বুন্টুও আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছে!  
কিন্তু কেন? শংকরকে জিগ্যেস করতে ভরসা পেলাম না। কারণ ও কী বলবে জানি। ও  
যে সব কিছুই বাড়িয়ে বলতে ভালোবাসে।

কদিন আর আয়না হাতে করলাম না। যা হচ্ছে হোক ভেবে নিয়ে চোখ বুজিয়ে রইলাম।  
ঘর থেকেও বেরোলাম না। বুন্টুরা নিজেরা খেলা করে বাড়ি চলে যায়। আমার সঙ্গে আর  
দেখা করে না। গল্প শুনতেও চায় না।

তারপর একদিন বিকেলে বিছানা থেকে জাম্প দিয়ে নেমে পড়লাম। ওরা এসেছিল  
সেদিন। ছেলেরা হঠাৎ আমার মতো আধবুড়ো একজন মানুষকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসতে  
দেখে চমকে উঠল। বুঝলাম আমাকে দেখে ওরা ভয় পেয়েছে। খুব মজা লাগল। তারপর  
আমি, এত বড়ো মানুষটা, ছাদে ছোট্টাছুটি শুরু করলাম। ছেলেরা আমায় এরকম করতে  
দেখে চোঁচামেচি করে ছুট লাগলো। আমি খুব জোরে হেসে উঠলাম। জীবনে কখনো বোধহয়  
এত জোরে হাসিনি।

সেদিন দুপুরবেলা—

রাস্তায় হঠাৎ হইহল্লা। এর আগে আমার বাড়ির কাছে কোনোদিন হইহল্লা তো দূরের  
কথা দু-চারজন মানুষকে একসঙ্গে গলা উঁচু করে কথা বলতেও শোনা যায়নি। তো আজ  
হঠাৎ হল্লা কেন?

উঠে গিয়ে দাঁড়লাম রাস্তার দিকের জানালায়। দেখলাম বুন্টুর বাবা রমণীবাবু কয়েকজনের  
সঙ্গে কী নিয়ে আলোচনা করছে। সবার চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

এদের আবার কী হল? কৌতুহল চেপে বিছানায় গিয়ে বসলাম। হয়েছে ভালো। নিজেকেই  
জিগ্যেস করলাম, বুন্টুর বাবার মতো আমিও কেন রাস্তায় গিয়ে ওদের সঙ্গে আলোচনা করতে  
পারি না? এরও কোনো উত্তর নেই।

যাই হোক, কী হয়েছে বিকেলে জানা যাবে। বিকেল পর্যন্ত আমায় অপেক্ষা করতেই  
হবে।

ঠিক করেছিলাম বিকেলে বুন্টুরা এলে ওদের মুখ থেকেই শোনা যাবে। কিন্তু বুন্টুরা  
এলই না। তবে শংকর জানাল, গতকাল বুন্টুর এক বন্ধু বিকেলে খেলতে বেরিয়ে আর  
বাড়ি ফিরে আসেনি। যেখানে যেখানে যাওয়া সম্ভব সর্বত্র খোঁজ করা হয়েছে। কিন্তু কেউই  
বলতে পারেনি। তা সে তো গতকালের ব্যাপার। আজ আবার ওদের হল কী?

একটু দেরি করেই এল মাত্র দুজন—গোপাল আর কেপ্ট। বেশিক্ষণ থাকল না। জিগ্যেস  
করলাম, আর সবাই কোথায়?

গোপাল বলল, জানি না।

ওরা ঘরে ঢোকার পর থেকেই পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিল। তারপরেই চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

বললাম, তোমরা এখনই চলে যাচ্ছ?

হ্যাঁ। বলেই নীচে নেমে গেল। কেন, কিছুই বুঝলাম না।

কদিন পর।

আমি হঠাৎ আবার এমন একটা কাণ্ড করে বসলাম যে নিজেই আবাক। আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল একটা বাঁশ গাছ। তার একটা ডাল (কণ্ঠ) বাড়তে বাড়তে আমাদের ছাদ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল। একেবারে নাগালের মধ্যে। দেখে খুব ইচ্ছে করল, ডালটা ধরে ঝুলে পড়ি। মারলাম লাফ। অত বড়ো গাছটা কেঁপে উঠল। আমার খুব মজা লাগল। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি রাস্তায় লোক জমে গেছে। তারা আবাক হয়ে আমার কাণ্ডকারখানা দেখছে।

এবার আমি যখন শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়লাম তখন যারা দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল তারা সবাই ছুট লাগল। আমি হা হা করে হাসতে লাগলাম। একটু পরে নিজের অপকীর্তি দেখে নিজেকেই ধমকে উঠলাম।

আমি কি পাগল হয়ে গেছি!

## ॥ পাঁচ ॥

পাগল এখনও পুরোপুরি হইনি। তবে হতে বোধহয় দেরি নেই। বুঝতে পারি ক্রমশই আমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছি। কখন কী যে করে ফেলি তা বুঝতে পারি না।

অথচ আমি আগে তো এমন ছিলাম না। এ বাড়িতে এসে দাদামশাই-এর সেই খাতাখানা পড়ার পর থেকেই আমার পরিবর্তন শুরু। প্রথম দিকে বুঝতে পারিনি। তারপর যেদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ শুধু আমার বাড়ির আলো নিভে গেল আর বুন্টু ভয় পেল সেদিন থেকেই শুরু হল আমার পরিবর্তন। এত ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে লাগল যে আমি খেয়াল করতেও পারিনি। একেই বোধহয় বলে 'চিন্তাবিকার'। কোন একটা ইংরেজি বই-এ পড়েছিলাম যে খারাপ চিন্তা, খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে থাকতে থাকতে সুস্থ মানুষও ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। অবশ্য সাইকিয়াট্রিক ট্রিটমেন্ট আছে। এখানে সেসব চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই।

মনে হয়, একটানা ভৌতিক পরিবেশে থাকার ফলেই আমার এইসব অদ্ভুত পরিবর্তন। আর এর ফলে আমি ক্রমশই যেন অস্বাভাবিক হয়ে উঠছি।

এই যেমন ছুটে ঘরে ঢুকেও নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। দরজায় তো খিল দিয়েছি। তিনটে জানলার সব কটাই বন্ধ করে দিয়েছি। তবু কেবল যেন শুনতে পাচ্ছি একদল লোক আমায় তাড়া করে আসছে। অথচ এও জানি বুন্টুকে ভয় দেখিয়ে চলে আসবার সময় একটা লোকও তাড়া করে আসেনি। ভাবতে ভাবতে আমার মাথার ভেতরে কেমন করে উঠল। দাঁড়িয়ে ছিলাম, মাটিতে বসে পড়লাম। তারপর একসময়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ পর শুনতে পেলাম শংকরের ডাক।

—দরজা খুলুন। খেতে দিয়েছি।



উঠলাম। দরজাও খুলে দিলাম। কিন্তু শরীরটা বড়োই দুর্বল। এসবই করছি যেন ঘোরের মধ্যে। লক্ষ করছিলাম বুন্টু যেন ইদানিং আমাকে এড়িয়ে চলছে। ও যেন আমায় কেমন ভয় পাচ্ছে।

আমার সবচেয়ে ক্ষতি হল যখন ও আমার বাড়ি আসা বন্ধ করে দিল। অন্য কেউ না আসুক তাতে কষ্ট নেই। কিন্তু বুন্টুকে আমি খুব ভালোবাসতাম, রোজ বিকেলে আমি ওর পথ চেয়ে থাকতাম।

কিন্তু যে প্রতিদিন আসত সে যখন আর একদিনও আসে না তখন বুঝলাম, ভুল করে ফেলেছি। বুন্টুকে এভাবে ভয় দেখানো উচিত হয়নি। একটা বোবা কান্নায় আমার বুক ফেটে যেতে লাগল।

শেষে আর পারলাম না। একদিন চলে গেলাম বুন্টুদের বাড়ি। অন্তত একটি বার বুন্টুকে চোখের দেখা দেখতে চাই। এ বাড়িতে এর আগে অনেকবার এসেছি। কিন্তু এবার আসাটা যেন অন্যরকম। মনে হচ্ছে কোনো অচেনা লোকের বাড়ি যাচ্ছি, এমন একজন যাকে ও বাড়ির লোকেরা এড়িয়ে চলতে চায়। তার জন্য তাদের অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। আমার চেহারাটাই যে বদলে গেছে।

ইচ্ছে করেই সন্দের পর বেরিয়ে ছিলাম। কারণ লোকের সামনে বড়ো একটা বেরোতে চাই না। সবাই কেমন যেন অবাক হয়ে আমায় দেখে। ভালো লাগে না। কিন্তু তবু নিস্তার নেই। অন্ধকারে রাস্তায় বেরোতেই গোটাকতক কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল। এই বুঝি কামড়ে দেয়।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বুন্টুদের বাড়ি পৌঁছলাম। বুন্টু বাইরের ঘরে বসে ওর বাবার কাছে পড়ছিল। একা বুন্টু থাকলেই খুশি হতাম। যাই হোক এসেছি যখন বুন্টুকে দূর থেকেই দেখে যাই।

সেই মতো আমি নিঃশব্দে রকে উঠে জানলা দিয়ে উঁকি মারলাম। বুন্টু আমায় দেখতে পেল না। তখন সাহসে ভর করে ডাকলাম—বুন্টু—

বুন্টু চমকে উঠল। তারপর জানলার দিকে তাকিয়ে যে আঁংকে উঠল। চিৎকার করে ‘বাবা গো?’ বলেই ভেতরে চলে গেল। আমি কতবার ‘বুন্টু’ ‘বুন্টু’ করে ডাকলাম। কিন্তু ও আর আমার সঙ্গে দেখা করল না। ওর বাবা আমায় রীতিমতো ধমক দিয়ে বললেন, শোনো, তোমায় দেখে বুন্টু যখন এত ভয় পায় তখন এ বাড়িতে আর এসো না। লজ্জায়, দুঃখে আমি মাথা নিচু করে পালিয়ে এলাম। ঠিক করলাম, বুন্টুর সামনে আর কোনোদিন যাব না।

কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারলাম না।

ক’দিন পর।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়।

আমি আমার ঘরটিতে বসে আছি, দরজা-জানলা বন্ধ করে।

হঠাৎ রাস্তায় হল্লা, ধর—ধর—ছেলেধরা—।

চমকে উঠলাম। ছেলেধরা এল কোথা থেকে?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শংকর এসে ঘরে ঢুকল। চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, বুন্টুকে ছেলেধরার দল ধরে নিয়ে গেল!

চমকে উঠলাম—অ্যা! বলিস কী? কখন?

এখনই।

ওর বাড়িতে জানে?

হ্যাঁ, কান্নাকাটি করছে।

আমি আর বাড়িতে বসে থাকতে পারলাম না, যে অবস্থায় ছিলাম সেই অবস্থাতেই ছুটলাম।

ছোটো তো নয় উড়ে যাওয়া।

শরীরটা অসম্ভব হাল্কা মনে হচ্ছে। মাটিতে যেন পা ঠেকছেই না। দূরন্ত গতি।.....রাস্তার লোক হাঁ করে দেখছে।

কিন্তু আমার এদিক-ওদিক তাকাবার ফুরসৎ নেই। যেমন করে হোক বুন্টুকে উদ্ধার করতেই হবে। আমার পায়ে যেমন ঝড়ের গতি, শরীরে তেমনি অলৌকিক বল। মিনিট পনেরো পর ধরে ফেললাম গাড়িটিকে।

গাড়িতে জনাচারেক লোক ছিল। আমাকে ছুটে আসতে দেখে তারা অবাক হল। তারা তো জানে না যখন আমার এই শরীরে অলৌকিক শক্তি ভর করে তখন আমাকে কেউ আটকাতে পারে না। দেখলাম গাড়ির মধ্যে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে বুন্টু।

একটা অস্বাভাবিক ঝংকার দিয়ে রুখে দিলাম গাড়িটা। তারপর চারজন ছেলেধরাকে কাবু করে বুন্টুকে কাঁধে করে বাড়িতে পৌঁছে দিলাম।

জীবনে এই একটা ভালো কাজ করতে পারলাম।

কিন্তু—

কিন্তু কীভাবে এটা সম্ভব হল একা আমার পক্ষে?

এটা যদি সত্যিই অলৌকিক ব্যাপার হয় তা হলে প্রশ্ন জাগে কোথা থেকে পেলাম এই শক্তি? কে জোগাল?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একজনের কথা মনে হল—সে আত্রেয়ী।

জানি সে বহুকাল আগে মৃত। মৃত্যু হলেই কি সব শেষ হয়ে যায়?

যায় না। তার বহু প্রমাণ আমি পেয়েছি।

আত্রেয়ী নিজেই তার প্রমাণ দিয়েছে এই সেদিনও।

তার দেহ যে আমার এই বাড়ির নীচেই পোঁতা আছে আমি জানি। সে গত রাতে হঠাৎ কেন দেখা দিয়েছিল? কেন দিয়েছিল?

না, আমাকে ভয় দেখাতে নয়। মনে হয় শুধু এই কথা জানাতে চায়, সে আমার কাছেই আছে। এ বাড়িতে তার একটা নতুন আকর্ষণ হয়েছে। সে আকর্ষণ বুন্টু আর তার বন্ধুরা—। এও বলেছিল, আমি যেন আমার শারীরিক পরিবর্তন নিয়ে না ভাবি।

এখন মনে হচ্ছে বিকেলে যখন ওরা খেলা করত তখন মাঝে মধ্যেই কোথাও নৃপুরের শব্দ শোনা যেত। মনে হত কেউ যেন নৃপুর পরে হালকা পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের সঙ্গে খেলছে। কিন্তু তাকে দেখা যায় না।

আত্রেয়ী ছিল ছেলেমানুষ। তাই ছোটো ছেলেমেয়েদের ভালোবাসত। বুন্টুরা যখন ছাদে খেলা করত তখন আত্রেয়ীও যে অলঙ্কে সেখানে এসে দাঁড়াত তা আজ বোঝা যাচ্ছে।

কতদিন শোনা গেছে আমার ঘর থেকে নুপুর পায়ে দিয়ে কেউ যেন ছাদে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই কি বুনটুর বিপদে ওকে বাঁচাবার জন্যই আত্রেয়ীর আত্মা আমার ওপর ভর করে ছেলেধরার হাত থেকে বুনটুকে বাঁচিয়ে দিল?

সঠিক উত্তর জানা না গেলেও এই মুহূর্তে আত্রেয়ীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে উঠল। মনে মনে বললাম, আত্রেয়ী, তুমি যেখানেই থাক যেভাবেই থাক আমার নমস্কার নিও। প্রার্থনা করি, বুনটুকে রক্ষা করে তুমি যে মহৎ কাজ করলে তার জন্য পরমেশ্বর তোমার এই অভিশপ্ত জীবন থেকে তোমায় মুক্তি দেবেন।

সেদিনই—রাত তখন গভীর।

হঠাৎ ঘরের মেঝে কেঁপে উঠল। তারপর মেঝের একটা অংশ ফেটে গেল। আর সেইখান দিয়ে খানিকটা সাদা ধোঁয়া হুশ করে বেরিয়ে এল। তারপর পাক খেতে খেতে জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙল পাখির ডাকে। তাকিয়ে দেখি পূর্বের জানলা দিয়ে আসা ঝলমলে আলোয় ঘর ভরে আছে। একটু পরেই শংকর গরম চা আর টোস্ট নিয়ে ঢুকল। আমি হাসিমুখে উঠে বসলাম।

শংকর আমার হাতে চা তুলে দিয়েও আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। জিগ্যেস করলাম, কী দেখছিস?

ও উত্তর দিল না। শুধু টেবিলের ড্রয়ার থেকে ছোট আয়নাটা এনে আমার হাতে দিল। কী রে, হঠাৎ আয়না দিচ্ছিস?

দেখুন!

দেখলাম। মুখে আমার সেই বীভৎস দাগ আর নেই। সব মিলিয়ে গেছে। বুনটুকে আয়েত্ৰী উদ্ধার করেছিল আমার মধ্যে দিয়ে। আর মুক্তি পাবার পর সে আমায় মুক্ত করে দিয়ে গেল আমার ভয়ঙ্করতম সমস্যা থেকে। আমি আবার আগের মতো হয়ে গেছি। বুনটুরা আর আমায় দেখে ভয় পায় না। নিয়মিত খেলে। এর পরেও কি আমি বিশ্বাস করব না—ভূত বলে সত্যিই কিছু আছে! আমি তো আমার জীবনেই তা প্রমাণ পেয়েছি। যতদিন আয়েত্ৰীর আত্মার ভর আমার ওপর ছিল ততদিন আমি অন্য মানুষ ছিলাম। মুখটা হয়ে উঠেছিল কদাকার। এরপর হয়তো চেহারাটাও হত। আমার প্রার্থনায় আয়েত্ৰী মুক্তি পেল। আমাকেও মুক্তি দিয়ে গেল।

# গভীর রাতের ভয়ঙ্কর

## অশুভ সংকেত

এই বাগানবাড়িতে যেদিন জনার্দন তার স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে একমাসের জন্যে বেড়াতে এল সেদিন ওদের আনন্দের পরিসীমা ছিল না। এক মাস এই ফাঁকা জায়গায় সবুজ প্রকৃতির কোলে প্রাণভরে নিশ্বাস নিয়ে বাঁচবে।

যেদিন এখানে প্রথম এল সে দিনটা ছিল ৯ ফেব্রুয়ারি। তখনও তারা জানত না এই দিনটির পিছনে একটার পর একটা কী ভয়ঙ্কর অশুভ ঘটনা অপেক্ষা করে আছে।

ডায়মন্ড হারবার রোড থেকে প্রায় আধ মাইল ভেতরে বাড়িটা। বোধহয় কোনোকালে জমিদারদের বাগানবাড়ি ছিল। বাড়ির সামনে ধুলোভরা রাস্তাটা যে কোথায় চলে গেছে তার খোঁজ জনার্দন রাখেনি। রাখার দরকারও ছিল না। নির্জন বলেই জায়গাটা তার পছন্দ। একঘেয়ে কলকাতায় থেকে থেকে সে যেন হাঁফিয়ে উঠছিল। এখানে এসে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করবে কিছুদিন, সম্ভবত এই ছিল তার মনের ইচ্ছে।

বাড়ির ভিতরে অনেকখানি খালি জায়গা। ঝোপঝাপ বুনোফুল ছাড়া আর কিছু নেই। জায়গাটা দক্ষিণ দিকে ক্রমে ঢালু হয়ে একটা পুকুরে গিয়ে পড়েছে।

বাড়ির পশ্চিম দিকে রাস্তা দিয়ে এগোলে আদিবাসীদের কয়েকটা ঘর। তারা চাষবাস করে। কিন্তু কেন কে জানে সন্ধে হলেই যে যার ঘরে এসে ঢোকে। ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দেয়। সকালের আগে কিছুতেই দরজা খোলে না। এদের মাটির ঘরগুলোয় জানলা থাকে না। ওদের সংস্কার—সন্ধের পর খোলা পেলেই অশুভ আত্মা ঢুকে পড়ে। জায়গাটাও তেমন ভালো নয়। অল্প দূরে একটা পুরনো কবরখানা। বেলা পড়ে এলে আদিবাসীরা কেউ এদিকে তাকায় না।

এখানে এসে জনার্দনের স্ত্রী মালতীও খুব খুশি। হোক পুরনো তবু কত বড়ো বড়ো ঘর। হাত-পা খেলিয়ে থাকা যাবে কদিন।

সবচেয়ে খুশি টনি। বয়েস তার বছর তেরো। পাতলা একহারা চেহারা। চোখের দৃষ্টি ছটফটে। দেখলেই মনে হয় খুব সাহসী। কলকাতায় আঁটসাঁট চার দেওয়ালের বন্ধ ঘরে কেবল পড়া-পড়া করে হাঁপিয়ে ওঠে। এখানে এই খোলামেলা জায়গায় এসে সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

বেলা তিনটেয় ওরা মালপত্র নিয়ে এ বাড়িতে এসে পৌঁছল। ওর বাবা-মা লেগে গেল ঘর গোছাতে। আর সে ফুক করে বেরিয়ে গেল ঘুরতে। চারিদিক ফাঁকা ফাঁকা। গাছে গাছে কোকিল ডাকছে। ডাকছে অদ্ভুত স্বরে হাঁড়িচাচ। ও মনের আনন্দে ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ালো কবরখানার কাছে। পাঁচিলঘেরা অনেকখানি জায়গা। পাঁচিল ভেঙে পড়েছে কোথাও। একটা মস্ত লোহার গেট। একটা পাট তার উধাও। কেউ কোথাও নেই। টনি ঢুকে গেল কবরখানার

ভেতর। দুপাশে আম গাছের ছায়ায় ঢাকা চওড়া পথ। সেই পথ থেকেই আবার ডাইনে-বাঁয়ে বেরিয়ে গেছে অনেকগুলি সরু সরু পথ। তারই দুধারে পর পর সমাধি। সিমেন্ট বাঁধানো। কোনো কোনোটার ওপরে শ্বেতপাথরের ফলক লাগানো। বেশির ভাগ সমাধিই ভেঙে পড়েছে। বিরাট বিরাট ফাটল।

টনি বুঝতে পারল সমাধিক্ষেত্রটা বর্তমানে পরিত্যক্ত। নতুন করে এখানে কাউকে আর কবর দেওয়া হয় না।

আশ্চর্য! টনির এতটুকু ভয় করল না। বরঞ্চ তার ভালোই লাগল জায়গাটা।

সে যখন বাড়ি ফিরে এল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। জিনিসপত্র গোছানো হয়ে গেছে অনেকটা। মা জলখাবার বানাচ্ছে। এর পর রাতের রান্না।

এ বাড়িতে একটাই অসুবিধে—ইলেকট্রিক নেই। ছিল একসময়ে। এখন লাইন কাটা। কেউ তো থাকত না। শুধু কালো কালো তারগুলো সাপের মতো ঝুলছে দেওয়ালে দেওয়ালে।

এখনও বেশ শীত আছে। কাজেই পাখার দরকার নেই। আলো? তিনটে-চারটে লণ্ঠন সন্ধ্যা করে এনেছে। টনি খুব খুশি। একঘেয়ে ইলেকট্রিক আলো ভালো লাগে না। সে মাকে বলে, কেমন নির্জন জায়গা, পুরনো বাড়ি, লণ্ঠনের টিমটিমে আলো, বেশ রহস্য-রহস্য নয় মা?

তোর যত অদ্ভুত কথা। মেহের সুরে বলে মা। নে খেতে বোস দেখি।

ডাইনিং টেবিলের সামনে বসেছে তিনজনে। টেবিলের ওপর জ্বলছে লণ্ঠন। দেওয়ালে তাদের মস্ত মস্ত ছায়া।

সবে পরোটায় কামড় দিয়েছে টনি হঠাৎ বাথরুমের দিকে শব্দ। কিছু যেন ভেঙে পড়ল। চমকে উঠল তিনজনেই। কি হলো?

দাঁড়াও, আমি দেখছি। টনি উঠতে যাচ্ছিল, বাধা দিল মা।

টনির বাবাকে বলল, তুমি দ্যাখো না। লণ্ঠন নিয়ে উঠে গেল জনার্দন বাথরুমের দিকে। দেখল দেওয়াল থেকে একটা মস্ত বড়ো চাঙড় ভেঙে পড়েছে।

আরে ওটা কী?

ততক্ষণে টনি আর তার মাও এসে দাঁড়িয়েছে। একটা সাদা বেড়াল—মাথাটা তার খেঁতলে গেছে চাঙড়ের চাপে।

ইস! কী বীভৎস দৃশ্য! মা আঁতকে ওঠে। এখন এটাকে ফেলতে হবে। নইলে পচে দুর্গন্ধ বেরোবে।

চা-পরোটা খাওয়ার আনন্দ মাথায় উঠল। বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই দুঘটনা!

কিন্তু ঝড় নেই বৃষ্টি নেই হঠাৎ অত বড়ো চাঙড়টা পড়ল কি করে? অবাক হয়ে প্রশ্ন করে মা।

সে ভেবে লাভ নেই, উত্তর দেয় জনার্দন। এখন মরা বেড়ালটা ফেলতে হবে।

টনি বলল, বাবা, আমি ওটা ফেলে দেব?

মা বললে, না। তোমার বাবা ফেলবে।

অগত্যা পাথর সরিয়ে বেড়ালটার লেজটা হাতে ধরে জনার্দন সেটা পিছনের জমিতে ফেলে দিয়ে এল। মরা বেড়ালের ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বারান্দাময় ছড়িয়ে।

জনার্দনের গা-টা কেমন করে উঠল।

টনি বলল, রক্তটা আমি ধুয়ে দেব মা?

মা বলল, না, আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি।

যে রকম আনন্দ করে প্রথম রাতটা কাটাতে ভেবেছিল তেমন আনন্দ হলো না। বাধা পড়ল। মালতীর মনে হলো এটা একটা অশুভ লক্ষণ।

নটা বাজতে না বাজতেই নিঝুম রাত। গোটা হলঘরটা থমথম করছে। বহুদিন পর এ বাড়িতে লোক সমাগম দেখে বাড়ির দেওয়াল থেকে কড়িকাঠ পর্যন্ত যেন অবাক হয়ে দেখছে। এরা তিনজন নড়ছে চড়ছে আর লণ্ঠনের আলোয় তাদের ছায়াগুলো যেন ভৌতিক চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রাত সাড়ে নটায় সব লণ্ঠন নিভিয়ে শুধু শোবার ঘরের লণ্ঠনটার পলতে কমিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা। টনির জন্যে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা। টনি সেখানেই শুতে চেয়েছিল। কিন্তু মা শুতে দেয়নি। বললে, আজকের মতো আমাদের সঙ্গে শোও।

গভীর রাত। ঘুম ভেঙে গেল জনার্দনের। একটা বেড়াল বাড়ির চারিদিকে ক্রমাগত ডেকে চলেছে। ডাকটা যেন ভয়-পাওয়ার মতো।

এত রাত্তিরে রাস্তায় বেড়াল এল কোথা থেকে?

তারপরই কেমন খসখস শব্দ। কেউ যেন জুতো টেনে টেনে হাঁটছে। প্রথমে জনার্দন ভেবেছিল শব্দটা বুঝি ঘরের ভেতরেই। কান খাড়া করে অনেকক্ষণ শুনল শব্দটা। না, ঘরের ভেতরে নয়, বাইরে।

এই শুনছ? জনার্দন ঠেলা দিল মালতীকে।

হ্যাঁ, শুনছি।

ধড়মড় করে উঠে বসল টনি। চাপা গলায় বলল, আমিও শুনছি।

শব্দটা কিন্তু থেমে গেছে।

পরক্ষণেই আবার শব্দ—খস খস খস।

শব্দটা এবার বাড়ির পিছন দিকে। একটু পরে শব্দটা পাশের দিকে।

কেউ যেন বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করছে।

বাবা, আমি গিয়ে দেখব?

মা ধমকে উঠল, খবরদার! চুপ করে শোও।

পরের দিন ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। সারারাত ভালো করে ঘুম হয়নি। কেমন যেন ভয়ে ভয়ে কেটেছে রাতটা। কিসের ভয় তা ঠিক বুঝতে পারছিল না। অথচ এখন দিনের আলোয় সব পরিষ্কার। ভয়ের কোনো চিহ্নমাত্র নেই। মনে হচ্ছে যেন সারারাত ওরা দুঃস্থল দেখেছিল। কিন্তু খস খস শব্দটা তো সবাই শুনেছিল। কে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বাড়ির চারিদিকে?

কৃপানাথ, যার কাছ থেকে বাগানবাড়িটা জনার্দন কিনেছিল, বলেছিল বটে, জায়গাটা কিন্তু ভালো নয় জনার্দনবাবু। সমাজবিরোধীদের আড্ডা। নিরিবিলিতে তারা জড়ো হয়, চুরি-ডাকাতির প্ল্যান করে। তারপর ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। এমনকি অন্য কোথাও খুন-খারাপি করে লাশ এনে পুঁতে দেয় ঐ বেওয়ারিশ কবরখানা।

তাহলে কি কাল রাত্তিরে চোর-ডাকাতরাই কেউ ঘোরাফেরা করছিল?

দ্বিতীয় দিনটা বেশ ভালোই কাটছিল। কিন্তু দুপুরের দিকে হঠাৎ সূর্য নিস্তেজ হয়ে পড়ল। কুয়াশার মতো একটা মেঘ দেখা দিল। সেই সঙ্গে শিরশিরে বাতাস। টনি খুব খুশি। খেয়েদেয়েই সে বেরিয়ে গেছে।

জনার্দনও বেরিয়েছিল দুপুরে। কলকাতার বাস ধরতে হয় আধ মাইল হেঁটে ডায়মন্ড

হারবার রোডে গিয়ে। বাড়িতে গোছানো এখনও অনেক বাকি। তাই বিকেল-বিকেল ফিরছিল।  
বাস থেকে নেমে সে হেঁটে আসছিল বাড়ির দিকে। আসতে আসতে একটু অবাক হলো,  
মেঘ করেছে! অথচ যখন বাস থেকে নামল মাত্র পাঁচ মিনিট আগে তখনও তো বেশ রোদ  
ছিল।

যাই হোক সে বাড়ির দিকে জোরে পা চালাল।

জায়গাটা নির্জন। দু'পাশে খাঁ খাঁ মাঠ। ধুলোভরা রাস্তার পাশে সার সার বাবলা গাছ।  
কোথাও কোথাও মাদার গাছে লাল টকটকে ফুল যেন রেড সিগন্যাল দিচ্ছে।

জনার্দন হাঁটছিল। হঠাৎই তার মনে হলো রাস্তায় সে এই মুহূর্তে একা নয়। কেউ যেন  
পিছনে পিছনে আসছে।

চমকে পিছন ফিরে তাকাল। না, কেউ নেই।

মনের ভুল ভেবে জনার্দন এগিয়ে চলল। এবার স্পষ্ট শুনল খসখস শব্দ। পিছনে কেউ  
আসছেই।

আবার ফিরে তাকাল। না, কেউ নেই।

এরকম মনে হচ্ছে কেন? জনার্দন নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করল। তার পরে 'ও কিছু  
না' বলে মনকে বুঝিয়ে আরও জোরে হাঁটতে লাগল।

বেশি দূর যেতে হলো না। স্পষ্ট অনুভব করল কেউ যেন অদৃশ্য থেকে একেবারে  
তার ঘাড়ের কাছে এসে পড়েছে। একটা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া তার সারা দেহ অবশ করে  
দিচ্ছে। একটা হিমস্রোত যেন পিঠ থেকে উঠে গলাটা চেপে ধরছে...

এমনি সময়ে কে যেন ডাকল, বাবা! জ্ঞান হারাবার মুহূর্তে জনার্দন দেখল বিপরীত  
দিক থেকে ছুটে আসছে টনি।

বাবা, আমি এখানকার সব রাস্তাগুলো চিনে ফেলেছি। তাড়াতাড়ি বাড়ি চলো। এখনি  
বৃষ্টি নামবে।

আশ্চর্য! টনি কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে পিছনে যে ছিল সে কোথায় মিলিয়ে গেল।  
জনার্দন প্রাণভরে নিশ্বাস নিল।

হ্যাঁ, চলো বাড়ি যাই। তোমার মা একা রয়েছে।

সেই দিনই—

রাত বোধহয় এগারোটা। বৃষ্টি হয়নি। কিন্তু আকাশটা থমথম করছে। ঠাণ্ডাটা যেন নতুন  
করে পড়ল। আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল জনার্দন। কানে এল গত রাতের মতো  
একটা বেড়াল রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে...যেন অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তারপরেই  
ওদিকের ঘরের জানলা ঠেলছে। কিংবা ইট ছুড়েছে।

মালতীরও ঘুম ভেঙে গেল।

কিসের শব্দ?

জনার্দন বলল, বুঝতে পারছি না।

ঝড়?

না, ঝড় কোথায়?

কিন্তু টনি যে ও ঘরে একলা। আমার বড্ড ভয় করছে।

দাঁড়াও দেখছি।

জনার্দন লণ্ঠনটা বাড়িয়ে দিল। হাতে টর্চ নিয়ে দরজা খুলে গিয়ে দাঁড়াল টনির ঘরের সামনে। পিছনে মালতী।

টনি!

আমি জেগে আছি।

একটা শব্দ শুনলে?

হ্যাঁ, শুনেছি।

মালতী বলল, তুমি আমাদের ঘরে চলে এসো।

না। আমি ঠিক আছি।

### সন্ধেবেলায় আগন্তুক

আজ বাগানবাড়িতে থাকার তৃতীয় দিন। কাল বৃষ্টি হয়নি। কিন্তু আজ দুপুরবেলায় সমাধিভূমির দিক থেকে দৈত্যের মতো ঘন কালো মেঘ এগিয়ে আসতে লাগল। শীতকালে এরকম মেঘ দেখা যায় না। এ যেন আষাঢ়ের জলভরা মেঘ।

তারপরেই নামল বৃষ্টি।

এখন সন্ধে। সারা দুপুর টানা বৃষ্টি হবার পর এখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি। তারই সঙ্গে হাড়-কাঁপানো ঠান্ডা।

দরজা-জানলা বন্ধ করে হলঘরে বসে জনার্দন তার কনট্রাক্টরি কাজের খাতাপত্র ঠিক করছিল। একটু দূরে টেবিলের ওপর বই-খাতা নিয়ে পড়ছিল টনি। ভেতরে রান্নাঘরে ওর মা রান্না করছে।

টনি বলল, যেরকম আকাশের অবস্থা, আমার মনে হচ্ছে বন্যা হবে। তাহলে মন্দ হয় না। চারিদিকে জল থৈ থৈ করবে। তার মধ্যে দ্বীপের মতো জেগে থাকবে আমাদের বাড়িটা আর তিনটি মাত্র প্রাণী—তুমি, মা আর আমি।

তুমি মন দিয়ে পড়ো তো!

এই তো পড়ছি। বলে টনি কিছুক্ষণ চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে পড়ল। তারপর মাকে উদ্দেশ্য করে বলল, মা, খিচুড়ি করছ তো?

হ্যাঁ, খিচুড়ি আর ডিম ভাজা।

বাঃ! ফাইন।

জনার্দন ধমকে উঠল, পড়তে পড়তে খাওয়ার চিন্তা! কিসসু হবে না তোমার।

মালতী ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কফি খাবে নাকি?

দাও।

হঠাৎ এই সময়ে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। চমকে উঠল জনার্দন। সচকিত হলো টনি।

এই দুর্যোগে কে আবার এল?

শুধু যে কৌতূহল তা নয়, জনার্দনের মতো শক্তসমর্থ মানুষটাও কেমন ভয় পেল।

হ্যাঁগো, কেউ যেন কড়া নাড়ল। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল মালতী।

জনার্দন চাপা গলায় বলল, চূপ! একেবারে চূপ!

রীতিমতো ভয় পেয়েছে জনার্দন। তার বোধহয় মনে পড়েছিল কৃপানাথের কথা।



বাগানবাড়িটা কেনার সময়ে বলেছিল জায়গাটা সমাজবিরোধীদের আড্ডা। সেই সঙ্গে সাবধান করে দিয়েছিল, ওরা যদি কেউ আসে, দু-একদিন থাকতে চায়, বাধা দেবেন না যেন। ওদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে ওরা কিছু বলবে না। তা নইলে বিপদে পড়বেন। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

হ্যাঁগো, কে কড়া নাড়ল?

জনার্দন মাথা নাড়লে, জানি না।

চোর-ডাকাত নয় তো?

জানি না।

একবার নেড়েই থেমে গেল কেন?

জানি না বলেই টনিকে ধমকে উঠল, হাঁ করে আমাদের কথা শুনছ কি? পড়ো না।

আর তুমি রান্নাঘরে যাও তো।

তা যাচ্ছি। কিন্তু কে কড়া নাড়ল তখন?

ও শোনার ভুল। বাইরে ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। বোধহয় তাতেই কোনোরকমে—

কথা শেষ হলো না। আবার কড়া নাড়া খট খট খট—

জনার্দনের মুখটা চুপসে গেল।

নাঃ, সত্যিই কেউ এসেছে। কিন্তু এই দুর্যোগে—

বাবা, আমি দরজাটা খুলে দেব?

দাঁড়াও। আর একবার নাড়ুক।

তিন জনে কান খাড়া করে রইল। একটু পরেই আবার কড়া নাড়া। টনি ছুটে যাচ্ছিল, ওর মা হিস্টিরিয়া রোগীর মতো চৈঁচিয়ে উঠল, না, তুই যাবি না। আমার মনে হচ্ছে কোনো বিপদ ঘটতে চলেছে।

এমনও তো হতে পারে মা, এই ঝড়-বৃষ্টির রাতে কেউ আশ্রয় চাইছে।

অনুমতির অপেক্ষা না করে টনি এগিয়ে গেল দরজার দিকে। জনার্দন তেমনি বসে রইল ফ্যাকাসে মুখ নিয়ে।

টনি দরজা খুলে দিতেই একটা দমকা ঠান্ডা বাতাস ঘরে ঢুকে জনার্দনের কাগজপত্র উড়িয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গেই মাথা থেকে পা পর্যন্ত ওয়াটারপ্রুফ পরা লম্বা একটা লোক ধীরে ধীরে কালো রবারের জুতো পরা পা ফেলে ঘরে ঢুকল। পা দিয়ে ঠেলে দরজাটা বন্ধ করে দিল। হাত ব্যবহার করল না। হাত দুটো শীতের জন্যেই বোধহয় পকেটে ঢোকানো ছিল।

কে আপনি? কি চান? শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল জনার্দন।

লোকটা বর্ষাতির টুপির তলা থেকে ক্রুর দৃষ্টিতে একবার চারিদিক দেখে নিল। তারপর বলল, ডায়মন্ড হারবার থেকে ফিরছিলাম। গাড়িটা খারাপ হয়ে আছে খালের ধারে। এখানে থাকতে চাই।

কিন্তু ডায়মন্ড হারবার রোড তো অনেক দূরে। এদিকে এলেন কী করে?

আগন্তকের মুখ চাপা রাগে থমথম করতে লাগল। বলল, ভুল করে।

মালতী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে নমস্কার করে বললে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এই রাতে আপনি আমাদের মাননীয় অতিথি। অনুগ্রহ করে বসুন।

ধন্যবাদ।

এতক্ষণে জনার্দন নিজেকে ঠিকঠাক করে নিতে পেরেছে। যদিও সে এই উটকো আগন্তককে

মোটাই পছন্দ করছিল না তবু কৃপানাথের কথাগুলো মনে পড়ায় তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে খুব খাতির করতে লাগল। লোকটা যে খুনে ডাকাত-ফাকাত ছাড়া আর কিছু নয়, তা তার রাগী-রাগী মুখ দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল। যদিও ওয়াটারপ্রুফের টুপিতে অর্ধেক মুখ ঢাকা ছিল।

যে ডাইনিং টেবিলে জনার্দন কাজ করছিল তার থেকে বেশ কিছুটা দূরে দরজার কাছে একটা চেয়ার ছিল। লোকটা সেখানেই পা ত্রুশ করে বসল।

জনার্দন তার কাছে গিয়ে হাত জোড় করে বললে, আপনি কোনোরকম সংকোচ করবেন না। এ বাড়িটা আপনার নিজের বাড়ি বলেই মনে করবেন।

লোকটা ভদ্রতা করেও তার উত্তর দিল না। টনির পর্যন্ত সেটা খারাপ লাগল।

আপনি যদি ভিজ়ে ওয়াটারপ্রুফটা খুলে আমায় দেন তাহলে টাঙিয়ে রাখতে পারি। বলেই সন্ধিদ্ধভাবে লোকটার ভেতরের পকেটের দিকে তাকাল। লোকটা সেই থেকে দু'পকেটে দু'হাত গুঁজে রেখেছে। পকেটে রিভলভার নেই তো?

লোকটা গভীরভাবে বলল, চিন্তা করবেন না। আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নেব।

এই সময়ে টনির মা এক কাপ কফি আর টোস্ট এনে টেবিলে রাখল। তারপর হাসিমুখে অতিথিকে টেবিলে আসতে অনুরোধ করল।

আগন্তুক বলল, শুধু কফিটা আমায় দিন।

অর্থাৎ টেবিলে সে আসবে না।

অগত্যা মালতী একটা ছোটো টুল এনে কফির পেয়ালা তার ওপর রাখল।

টোস্ট না খান দুটো বিস্কুট দেব?

না, ধন্যবাদ।

কথা বলতে বলতে মালতী লক্ষ্য করল লোকটা ঘরের চারিদিক কেমন খরদৃষ্টিতে দেখছে।

মালতী কফি রেখে ডাইনিং টেবিলের কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। সে অবাক হলো, লোকটা টেবিলে এল না কেন? মালতী তাকালো টনির দিকে। দেখল সেও তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে।

সামনে টুলের ওপর গরম কফি। ধোঁওয়া উড়ছে। আগন্তুক সেদিক তাকিয়ে আছে। তার দুহাত তখনো ওয়াটারপ্রুফের ভেতরে। মনে হচ্ছে তার এত শীত করছে যে হাত বের করতে পারছে না। তবু হাত তো বের করতেই হবে। নইলে কফি খাবে কি করে?

এতক্ষণে তার বাঁ হাতটা পকেটের মধ্যে নড়ে উঠল। আর তখনই লণ্ঠনটা নিভে গেল।

এ আবার কী! আজই তো লণ্ঠনে তেল ভরেছি। মালতী বলে উঠল। অন্ধকারেই জনার্দন দেখল আগন্তুকের বাঁ হাতটা যেন পকেট থেকে বেরোল। জনার্দন অজানা আতঙ্কে তাড়াতাড়ি টেবিলের নীচে মাথাটা গুঁজে দিল। তার মনে হলো এখনই একটা শিসের গুলি ছুটে এসে ওর মাথার খুলিটা উড়িয়ে দেবে।

অন্ধকারে দেশলাই খুঁজে নিয়ে মালতীই লণ্ঠনটা জ্বালল। দেখল আগন্তুকের বাঁ হাতটা আবার পকেটে ঢুকে গেছে। কফির পেয়ালা শূন্য।

আশ্চর্য, অত গরম কফি এক নিশ্বাসে খেল কী করে!

মালতী এগিয়ে গিয়ে শূন্য কাপটা তুলে নিল। হেসে বলল, কফিটা কি জুড়িয়ে গিয়েছিল?

আগন্তুক তার উত্তর দিতে চাইল না। বেজার মুখটা অন্য দিকে ফেরালো।

মালতী হেসে বলল, আপনার শোবার ব্যবস্থা করছি ওদিকের ছোট ঘরটায়। খুব নিরিবিলি। অ্যাটাচড বাথরুম। আপনার অসুবিধে হবে না। বিছানা রেডি করা আছে। খাওয়ার পর বিছানাটা বেড়ে মশারি টাঙিয়ে দেব। এখানে বড্ড মশা।

ধন্যবাদ। কোনো কিছুরই দরকার নেই। নিজেই সব ঠিক করে নিতে পারব। রাতেও কিছু খাব না। এখন একটু বিশ্রাম করতে চাই।

একেবারেই কিছু খাবেন না? ক্ষুধা স্বর বেরিয়ে এল মালতীর গলা থেকে।  
না। বললাম তো।

ঘরটা দেখিয়ে দেবার জন্যে মালতী এগিয়ে গেল। ঠিক পিছনেই লোকটা। ঘাড়ে নরম নিশ্বাসের মতো কি লাগছিল। ফিরে দেখল লোকটা একেবারে পিছনে। ভয়ে মালতীর বুক কেঁপে উঠল। আর আশ্চর্য তার স্বামী; ডাইনিং টেবিলের সামনে মুখ চুমড়ে বসে শুধু দেখছে।  
হঠাৎ টনি এগিয়ে এসে বলল, আপনার নামটা তো জানতে পারলাম না, আঙ্কেল।  
আগন্তুক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বর্ষাতির টুপির তলা দিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালো টনির দিকে। খসখসে গলায় বলল, তুমি ছেলেমানুষ। আমার নাম জানতে চাও কেন? এটা তোমার স্পর্ধা।

আঙ্কেল, কিছু মনে করবেন না। গেস্টের নাম জিজ্ঞেস করা কী অন্যায়?

লোকটা এবার তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরের ভেতরে ঢুকল।

একটা লঠন এনে দিই? মালতী জিজ্ঞেস করল।

দরকার নেই। হ্যাঁ, আর শুনুন আমি হয়তো ভোরবেলা চলে যাব। আবার আসব যে কোনোদিন। জায়গাটা আমার পছন্দ হয়েছে। ভাবছি খানিকটা জমি কিনে কারখানা করব। আর আমার খাবারের ব্যবস্থা করবেন না। বলেই মিস্টার গুর্গে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

### দৃষ্টিস্তার রাত

সর্বসাকুল্যে চারখানি ঘর। দরজা দিয়ে ঢুকলেই সামনে বেশ বড়োসড়ো হলঘর। মাঝখানে ডাইনিং টেবিল। খান চারেক চেয়ার। এছাড়া আরও কয়েকটা চেয়ার এদিক-ওদিক ছড়ানো। হলঘরের বাঁ দিকে একটা বেডরুম। এখানে শোয় জনার্দন আর তার স্ত্রী মালতী। তার পাশেই একটা ছোটো ঘর। দু'ঘরের মধ্যে সেকালের তৈরি কাঠের পার্টিশান। এই ছোটো ঘরে থাকে জিনিসপত্র। ডাইনিং হল আর এই ছোটো ঘরের পাশে রান্নাঘর। রান্নাঘরের পিছনে সেকলে খাটা-পায়খানা। একটা কুয়ো। এদিকে পাঁচিলটা নিচু। সেই নিচু পাঁচিলের নিচে বেঁটে খিড়কি দরজা।

ডাইনিং হলের ডান দিকে ছোটো ঘরটার মাপে একটা ঘর। এখানে টনি শোয়। তার গায়েই আর একটা ঘর বাইরের দিকে। দু'ঘরের মধ্যে আগের ঘরের মতোই কাঠের পার্টিশান। কাঠ জীর্ণ হয়ে ফেটেফুটে গেছে। এটা গেস্টরুম। বড়ো একটা ব্যবহার হয় না বলে তালা দেওয়া থাকে।

জনার্দন চুপচাপ শুয়েছিল। পাশে মালতী। সেও চুপচাপ। বাইরে তখনও টিপ টিপ বৃষ্টি পড়েই চলেছে।

এই আগন্তুকটি আসার পর থেকে জনার্দনের অস্বস্তির শেষ নেই। সবটাই যেন কেমন রহস্যজনক। হঠাৎ বৃষ্টির সন্ধ্যায় লোকটা এল। সে নাকি ডায়মন্ড হারবার থেকে গাড়ি নিয়ে আসছিল। ভুল করে এই পরিত্যক্ত রাস্তায় ঢুকে পড়েছে। কিন্তু ভুল হওয়ার কারণ নেই। ডায়মন্ড হারবার রোড পিচঢালা পাকা রাস্তা। সেই পথ ছেড়ে ভুল করে এই ধুলোভরা কাঁচা রাস্তায় এসে পড়বে তা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তারপর কোথায় যাবে তাও স্পষ্ট নয়। এখানে এসে জায়গাটা পছন্দ হয়েছে। খুব ভালো কথা। কিন্তু অন্ধকারে জায়গাটা দেখল কী করে? বলল, এখানে মাঝে মাঝে আসবে। কিন্তু থাকবে না। এখানে না থাকবে তো থাকবে কোন চুলোয়? কাছাকাছির মধ্যে একটা মুদিখানার দোকান নেই তো হোটেল! আসলে সবই ধাঙ্গা।

সে আশ্রয় নিতে এসেছে, কিন্তু কোনো বিনয় নেই। কথা নেই। যেটুকু কথা বলে তা যেন অর্ডার করা! যেন তার নিজের বাড়িতে এসেছে। এ বাড়ির সেইই যেন কর্তা!

এই সব দেখে শুনে জনার্দনের মনে হচ্ছে লোকটা সমাজবিরোধীদেরই একজন। ভাগ্যি কৃপানাথ আগে থেকে সাবধান করে দিয়েছিল ভালো ব্যবহার করতে। এখন সকালবেলায় মানে মানে বিদেয় হলেই বাঁচা যায়।

কিন্তু সকাল? সে তো ঢের দেরি। এখন সবে রাত দশটা। গোটা রাত পড়ে রয়েছে।

যদি ডাকাতই হয় তাহলে কী মতলবে আজ রাতের অতিথি হলো বোঝা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে না বলেই ভয় হচ্ছে। খুব সাবধানে থাকতে হবে। অবশ্য সাবধান আর হবে কি নিয়ে? একটা ভোঁতা দা পর্যন্ত নেই। তার ওপর টনিটা হয়েছে রামপাকা। খামোকা নাম জিজ্ঞেস করতে গিয়ে খচিয়ে দিল লোকটাকে।

...টনির মাও শুয়ে আছে চোখ বুজিয়ে। ঘুম আসছে না। আজ সঙ্গে পর্যন্ত মনটা বেশ ভালোই ছিল। কড়া শীত। সেই সঙ্গে বৃষ্টি। বেশ মৌজ করে গরম থিচুড়ি আর ডিম ভাজা থাকবে বলে সাত তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকেছিল। কিন্তু কোথা থেকে একটা উটকো লোক এসে মেজাজটা খিঁচড়ে দিল। এমনি সাধারণ লোক হলে ভাবনার কিছু ছিল না। কিন্তু এ লোকটা যেন কেমন। মুখটাও ভালো করে দেখা গেল না।

লোকটা বোধহয় অবস্থাপন্ন। গাড়ি করে আসছিল। শুধু কফি খেল। আর কিছু খেল না। এটা কি তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা? এমনি রাতেরে কিছু খেতে চাইল না। ভেবেছে কি তারা খুব গরিব?

একটু গল্পগুজব তো করবে। তাও না। সাত তাড়াতাড়ি শুতে চলে গেল। বিছানা পরিষ্কার করা, মশারি টাঙানো এটুকুও করতে দিল না। এমনি ঘরে লঠন পর্যন্ত নিল না।

কেন?

এখন যে ভয়টা করছে, সেটা হচ্ছে লোকটা বোধহয় ডাকাতই। কৃপানাথবাবু তো আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন।

আর একটা গোলমালে ব্যাপার আছে। সেটা অবশ্য নিজেদের ব্যাপার।

গড়িয়ায় তাদের নিজেদের একটা ছোটোখাটো বাড়ি আছে। সেখানেই বেশ দিন কাটছিল। হঠাৎ কর্তার কী খেয়াল হলো বাইরে কোথাও গিয়ে মুক্ত আলো বাতাসে একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।

প্ল্যানটা খারাপ লাগেনি। তা বলে এই জায়গা! এ তো একটা ভূতুড়ে বাগানবাড়ি! তবু কেন কর্তা শেষ পর্যন্ত এই জায়গাটাই পছন্দ করলে বোঝা গেল না। জিজ্ঞেস করলেও ভালো করে উত্তর দেয় না।

এখন মনে হচ্ছে লোকটা খুনে ডাকাতই হবে। যেন সব সময়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়।

তা ডাকাতই যদি হয় তাহলে এ বাড়িতে কেন? কী এমন আছে তাদের যে ডাকাতি করবে? তা ছাড়া এই নির্জন বাড়িতে ডাকাতের অতিথি সেজে আসার দরকার ছিল কি? ঘরে ঢুকে পকেট থেকে রিভলভার বের করে তাক করলেই তো কাজ হাসিল হয়ে যেত।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, লোকটা সব সময়ে পকেটে হাত গুঁজে ছিল বটে!

মহা মুশকিল! এরকম রহস্যজনক লোক বাড়িতে ঢুকিয়ে রাত কাটানো যায়?

ঠং ঠং করে দেওয়াল ঘড়িটায় বারোটা বাজল।

নাঃ, ঘুম আসছে না। ওদিকে কর্তা লেপ মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। ঘুমিয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

কিন্তু টনি একা ওর ঘরে কী করছে? ভয় পাচ্ছে না তো? খুব বুদ্ধিমান ছেলে। একটুতেই সব বুঝে ফেলে। তেমনি সাহসী। ওর বাবা যখন গ্যাট হয়ে বসে রইল তখন ও-ই তো গিয়ে দরজা খুলে দিল। ও-ই তো ঐ অদ্ভুত লোকটার কাছে গিয়ে নাম জিজ্ঞেস করল। তাতে লোকটা রেগে গেল। আবার ওর বাবাও রেগে গেল ছেলের ওপর—কী দরকার পাকামো করে তার নাম জিজ্ঞেস করার?

ছেলেটা একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। ছোটবেলা থেকেই ওর মনটা বড়ো উদাস। নির্জন জায়গা পছন্দ করে। চুপচাপ আকাশের দিকে তাকিয়ে কী ভাবে। কারো সঙ্গে মিশত না। এখনও তাই। এই নিরিবিলা জায়গা ওর খুব ভালো লেগেছে। এখন ইস্কুলের ছুটি। এখানে এসে পর্যন্ত বাড়ি থাকে না। সারা দুপুর টো টো করে ঘুরে বেড়ায়।

একদিন দেখল টনি ওদিকের ঐ কবরখানা থেকে বেরিয়ে আসছে। কী সৰ্বনাশ! শ্মশানে-মশানে-কবরখানায় কেউ শখ করে যায়?

জিজ্ঞেস করলে হেসে বলল, জায়গাটা ওর খুব ভালো লাগে। ওখানে কত কাল ধরে কত লোকে মাটির নিচে শুয়ে আছে। আহা বেচারি।

টনি একটা অদ্ভুত কথা বলল, জান মামণি, আমি গেলে ওরা খুব খুশি হয়। আমার সঙ্গে ওরা ইশারায় কথা বলে।

না না, ওখানে খবরদার যাস নে।

কিন্তু টনি শোনে না। শুধু হাসে। সত্যিই ছেলেটা অদ্ভুত।

পাদ্রীবাবা বলেছিলেন, এর দিকে নজর রেখো। ওর অযত্ন করো না। ও অন্য ধরনের ছেলে।

অনেকদিন পর পাদ্রীবাবার কথা মনে পড়ল। ঋষিতুল্য লোক। ওঁর দয়াতেই তো— ঠং করে ঘড়িতে একটা বাজল।

নিশ্চিতি রাত। বাইরে এখনও টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আবার সেই বেড়ালের কান্না। এই বৃষ্টিতে রাস্তায় বেড়াল কোথা থেকে এল?

হঠাৎ টনির মা'র কান দুটো সজাগ হয়ে উঠল। কোনো কিছুর শব্দ হলো কি? এ ঘরে নয়। ওদিকের ঘরে....

টনি ভালো করে দরজায় খিল দিয়েছে তো?

এই সময়ে জনার্দন এ-পাশ ও-পাশ করল।

ঘুমোওনি?

জনার্দন অস্ফুট স্বরে বললে, না। ঘুম আসছে না।

আমারও। একটু থেমে বলল, আমি ভালো বুঝছি না।

বুঝে দরকার নেই, বললে জনার্দন। সকালে যদি না যায় ওকে এড়িয়ে থেকো।

এই বলে জনার্দন উঠল। অন্ধকার ঘর। মালতীও হঠাৎ উঠে বসল। কোথায় যাচ্ছ? বাথরুমে।

আমার মনে হচ্ছে আমাদের দরজার কাছে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে।

### টনির সংশয়

আজকের সন্ধ্যা টনির বেশ ভালোই লাগছিল। শীতকাল তার খুব পছন্দ। তার ওপর যদি সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি হয় তাহলে তো কথাই নেই। একটাই আনন্দ কখন লেপের তলায় ঢুকবে। আজ আবার গরম খিচুড়ি আর ডিম ভাজা। তোফা!

কিন্তু দরজায় কড়া নাড়াটাই সব গণ্ডগোল করে দিল। হ্যাঁ, এইরকম সন্ধ্যায় হঠাৎ কেউ এলে একটু ভয়-ভয় করে বৈকি। কিন্তু তার ভয় করেনি। সে ভেবেছিল নিশ্চয় কোনো আশ্রয়প্রার্থী। আর ক্ষুধার্ত মানুষকে যে দু'মুঠো খেতে দেয় কিংবা আশ্রয়প্রার্থীকে যে আশ্রয় দেয়, ঈশ্বর তাকে ভালোবাসেন। তাই শুধু মানুষ কেন, একটা কুকুর-বেড়াল হলেও সে তাড়িয়ে দেয় না।

দরজাটা সে খুলে দিতে গেল। কিন্তু বাবা গেল না। বাবা শক্তসমর্থ মানুষ। তবুও বাড়িতে এক এক সময়ে কেমন যেন অনামনস্ক থাকে। সব সময়ে কী যেন ভাবে।

বাবা দরজা খুলতে গেল না। আশ্চর্য! বাবা ভয় পেল।

মুশকিল! বাবাও যদি কাউকে দেখে ভয় পায় তাহলে বিপদের সময় কে সাহস দেবে? অথচ বাবা কখনোই ভীতু নয়। ভয় পাবার অবশ্য কারণ ছিল।

লোকটার মুখ ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। তাকে আশ্রয় দেওয়া হলো কিন্তু তার কোনো কৃতজ্ঞতাবোধ নেই। খসখসে গলায় শুধু শুকনো ধন্যবাদ দিল।

সে কফি খেল দূরে বসে। ডাইনিং টেবিলে এল না। কোনো গেস্ট এলে সে কি তফাতে বসে?

আরও ব্যাপার আছে। কফি খাবার জন্যেও পকেট থেকে হাত বের করছিল না। সে সময়ে হঠাৎ লণ্ঠনটা নিভে যায়। সেই অন্ধকারের মধ্যে লোকটা কফি খেয়ে নেয়। খেয়েই সে হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে দেয়।

কেন? তার হাতে কি পোলিও হয়েছে? না কি কুষ্ঠ?

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, অত গরম কফি এক মিনিটে খেল কী করে? ম্যাজিক?

এই ছোটো ছোটো ব্যাপারগুলো তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। যতই ভাবছে, ততই তার কৌতূহল বাড়ছে। বেশ মজার। ধীরে সুস্থে মাথা খেলাবার মতো একটা জিনিস পেয়েছে।

আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার—লোকটা এ বাড়িতে এসে নিজের পরিচয় ভালো করে দিল না। এ বাড়ির কর্তারও কোনো পরিচয় জানতে চাইল না। যেন সে এ বাড়ির লোকদের চেনে।

সত্যিই কি চেনে?

সে নিজের নাম পর্যন্ত বলেনি। তাই বাধ্য হয়ে টনি নিজেই নাম জিজ্ঞেস করল। হয়তো এটা ছোটো মুখে বড় কথা। তবু কৌতূহল। কিন্তু লোকটা অযথা তার ওপর রেগে গেল। কেন?

আচ্ছা, কাল রাত্তিরে জানলায় অমন শব্দ হলো কেন? কেউ কি সত্যিই জানলা ঠেলছিল?

তার সঙ্গে আজকের এই লোকটার কি কোনো সম্পর্ক আছে? ভাবতে ভাবতে টনির মাথাটা কিরকম গরম হয়ে উঠল।

ওদিকের ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। এত রাত পর্যন্ত সে কখনও জাগে না। আজ ভেবেছিল বই-খাতা গুটিয়ে, খিচুড়ি খেয়ে তাড়াতাড়ি লেপের মধ্যে ঢুকবে। কিন্তু তা আর হলো না। ঐ লোকটা এসে সব নষ্ট করে দিল।

তার ঘরে তার একটা ছবি ছিল। সেটার দিকে চোখ পড়তেই সে যেন একটু আরাম পেল। সে ছবির কথা ভেবে ভয় ভুলে থাকতে চেষ্টা করল। তার চার-পাঁচ বছরের ছবি। ছবিটা তুলেছিলেন পাদ্রীবাবা চার্চের চাতালে বসিয়ে। ছবি তোলা সে কখনও দেখেনি। সেই প্রথম ছবি তোলা দেখল। নিজের ছবি দেখে অবাক।

সেই ছবিটার দিকে চোখ পড়তেই তার ছোটোবেলার কথা মনে পড়ল। তখন সে খুবই ছোটো। তার মা-বাবার কথা মনে নেই। চন্দনপুর গ্রামের একটা চার্চের চাতালে সে বসেছিল। কী করে সে এখানে এল তা সে জানে না।

সেই চার্চের এক দয়ালু পাদ্রী তাকে একা দেখে নিজের কাছে নিয়ে রাখেন। পাদ্রীর কাছে সে মাস ছয় ছিল। এইটুকু বয়েস থেকেই সে পাদ্রীর সঙ্গে রোজ চার্চে যেত। প্রেয়ার শুনত। আর প্রভু যিশুর কথা ভাবত। সেই থেকে তার মনটাই কেমন উদাস হয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে বেড়ে গেল সাহস। মনের জোর।

তাকে যখন পাদ্রীবাবা তাঁর কাছে নিয়ে আসেন তখন প্রবল শীতে তার পরনে একটা ময়লা হাফপ্যান্ট আর ছেঁড়া হাফশার্ট ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর ছিল একটা লোহার কবচ কালো করে বাঁধা। কবচটা তার রোগা রোগা হাতের তুলনায় বেশ ভারী। পরে থাকতে কষ্ট হতো। পাদ্রীবাবা সেটা প্রায়ই দেখতেন। একদিন জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি মনে আছে কবচটা তোমায় কে দিয়েছিল? সে জানিয়েছিল মনে নেই। পাদ্রী বলেছিলেন, তুমি যেখানে যে অবস্থাতেই থাক কবচটা কখনো খুলো না।

তা সে কখনো খোলেনি। তবে সে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করত লোহার কবচটা কিরকম সোনার মতো জ্বলজ্বল করছে। তখনই তার মাথাটা কিরকম ঝিমঝিম করে উঠত। তারপর আবার ঠিক হয়ে যেত। সে এও লক্ষ্য করেছে যখনই কোনো বিপদে পড়েছে তখনই ওটা রঙ বদলাতো। বিপদ কেটে গেলে আবার আগের মতো ম্যাডম্যাডে লোহা।

তারপর একদিন—

ঘড়িতে ঢং ঢং করে একটা বাজল। বাইরে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। হঠাৎ তার মনে হলো লোকটা তো পাশের ঘরেই আছে। কী করছে দেখা যাক।

টনি বিছানা থেকে উঠল। পার্টিশনটা অনেক ফাঁকফোকর। সেই ছিদ্র দিয়ে ঘরের মধ্যে দেখতে লাগল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। শুধু অন্ধকার। সে অন্ধকারটাও কেমন ভয়ঙ্কর। মনে হলো ঘরভর্তি যেন আলকাতরা ঠাসা।

একটু পরে অন্ধকারে যখন দৃষ্টি সয়ে গেল তখন সে দেখে অবাক হলো—বিছানায় কেউ নেই।

লোকটা গেল কোথায়? অথচ দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ।

আশ্চর্য! লোকটা ঘর থেকে উবে গেল নাকি? ম্যাজিক-ট্যাজিক জানে?

হঠাৎ সে চমকে উঠল। দেখল মাটিতে কিছু একটা যেন নড়ছে। ফুটোর ওপর আরও ঝুঁকে পড়ল টনি। তখনই যে দৃশ্যটা দেখল তাতে সে ভয়ে শিউরে উঠল।

দেখলো খাটের তলা থেকে কেউ যেন গড়িয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে আসছে।

হ্যাঁ, সে মিস্টার গুর্গে।

কিন্তু বিছানা থাকতে চৌকির নিচে মাটিতে শুয়েছিল কেন?

এই কথাটা মনে হতেই তার যেন শিরদাঁড়া বেয়ে একটা বরফের স্রোত বয়ে গেল।

বুঝতে পারল লোকটা তাহলে ধুলোতেই শোয়। তার ঐ যে দেহটা, ওটা বিছানায় শোবার জন্য নয়।

টনির মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। মনে হলো এখনি অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিন্তু অসাধারণ মনের জোরে সামলে নিল। দেখতেই হবে লোকটা কী করে?

লোকটা উঠে দাঁড়াল। তার গায়ে এখনও সেই সন্ধের পোশাক। শুধু ওয়াটারপ্রুফটা যেন একটু বেশি দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছে।

লোকটা দরজা খুলে ভেতরের ডাইনিং হলের দিকে এগোতে লাগল। তার অস্বাভাবিক লম্বা ওয়াটারপ্রুফটার একটা অংশ মাটিতে লুটোচ্ছে।

কিন্তু একী! লোকটা বাবার ঘরের দিকে যাচ্ছে। তার প্রতি পদক্ষেপ একটা অস্বাভাবিক শব্দ হচ্ছে খস্ খস্ খস্।

লাফিয়ে উঠল টনি। সোয়েটারটা গায়ে দিতে গেল আর তখনই কবচটা তার বাহুতে খচ করে লাগল। লোহার কবচটা ধীরে ধীরে রঙ বদলাচ্ছে।

বুকে অমিত সাহস নিয়ে টনি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। এসে দাঁড়াল একেবারে সেই লোকটার সামনে।

আঙ্কেল!

চমকে ফিরে তাকাল মিস্টার গুর্গে। দু'চোখে যেন আগুন ঝরছে।

আঙ্কেল, আপনি এত রাতে এখানে?

বাথরুমটা—

বাথরুম তো আপনার ঘরের পাশেই। মা তো দেখিয়ে দিয়েছে।

ও! ঠিক আছে। বলে টনির দিকে বিস্ময় ভীরের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

ঠিক তখনই দরজা খুলে বেরিয়ে এল টনির মা। কি হয়েছে টনি?

কিছু না। তুমি ঘুমাও গে।

## দু'বছর আগের একটি ঘটনা

ভোরবেলা।

তখনও জনার্দন ওঠেনি। টনির মা অতিথির জন্যে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছে। একটা দীর্ঘ কালো ছায়ার মতো মিস্টার গুর্গে এসে দাঁড়াল বেশ একটু তফাতে। সন্ধেবেলার সেই একই পোশাক। ওয়াটারপ্রুফটা শুধু কাঁধের ওপর একটা বিরাটাকার মরা শকুনির মতো ঝুলছে।

আমি এখন যাচ্ছি। খসখসে গলায় বলল গুর্গে।

সে কি! চা খেয়ে যাবেন না?

না।



এই সময়ে জনার্দন ঘুম চোখে বেরিয়ে এল। টনিও এসে দাঁড়িয়েছে। তার কৌতূহলের শেষ নেই।

চললেন নাকি? জনার্দন জিজ্ঞেস করল।

গুর্গে বিশ্রীভাবে মিনিটখানেক তাকিয়ে রইল জনার্দনের দিকে। তারপর বলল, হ্যাঁ। আবার আসছি। দেখা হবে। কাজ বাকি আছে।

কী কাজ আর জানতে চাওয়ার সাহস হলো না জনার্দনের।

একটা অভদ্র দুবিনীত লোকের মতো গুর্গে বেরিয়ে যাচ্ছিল, টনিকে দেখে বলল, এই যে তুমিও রয়েছে। আমার সঙ্গে এসো তো। খালের ধারে আমার গাড়িটা রয়েছে। একটু ঠেলার দরকার হবে।

লোকটার একটু উপকার করার জন্য টনির মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। তা ছাড়া ভাবল লোকটাকে হয়তো ভালো করে জানাও যাবে, কী তার উদ্দেশ্য। তাই সে রাজি হলো। মা তখন রান্নাঘরে। ইচ্ছে করেই মাকে কিছু বলল না। হয়তো মা যেতে দেবে না।

কিন্তু মায়ের প্রাণ, হঠাৎ অজানা একটা ভয়ে ছটফট করে উঠল। এদিকে টনি তখন দরজা খুলে গুর্গের পিছু পিছু বেরোচ্ছে, তার হাতের কবচটা রঙ বদলাচ্ছে। কবচটা কেমন ভারী হয়ে উঠছে।

এখন হচ্ছে কেন? টনির মনে দৃশ্চিন্তা। তবে কি কোনো বিপদ—

আর তখনই ওর মা ছুটে এসে ডাকল, টনি, কোথায় যাচ্ছ? সকালবেলা পড়াশোনা নেই?

অগত্যা টনিকে ফিরতে হলো। একবার পিছন ফিরে দেখল মিস্টার গুর্গে যেন একটা বাজ-পড়া তালগাছের মতো জ্বলছে।

গত রাতে গুর্গের ঘরে উঁকি মেরে দেখে টনির যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে তার সংশয় আরো বেড়ে গেল। লোকটা যেই হোক, গভীর রাতে বাবার শোবার ঘরের দরজার পাশে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে ছিল কেন? তবে কি বাবার ওপর আক্রোশ আছে? কিসের জন্য আক্রোশ? টনি ঠিক করল এটার একটা ফয়সালা করতে হবে।

বেলা নটা। জনার্দন তার ঘরে বসে কী সব হিসেবপত্র করছিল, টনি এসে দাঁড়াল। একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। বলবে?

জনার্দনের মেজাজটা ভালো ছিল না। ভুরু উঁচিয়ে টনির দিকে তাকালো।

তুমি কি ওই লোকটাকে চেনো?

ঐ লোকটাকে? না, কখনোই না।

মিস্টার গুর্গে যেন তোমায় চেনে বলে মনে হলো।

কী সব পাগলের মতো বকছ! যাও! কাজ করতে দাও।

একবার টনি ভাবল বলে ফেলে সাবধান হও। সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ। কিন্তু বলল না। বলে লাভ নেই। বাবা বিশ্বাস করবে না। বিমর্ষ মনে টনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টনি চলে গেল কিন্তু জনার্দন আর কাজে মন বসাতে পারল না। তার কেবলই মনে হতে লাগল কেন টনি ঐ কথা বলল। গুর্গেকে সে সত্যিই চেনে না। কখনো ঐ রকম কাউকে দেখেনি। গুর্গেই বা তাকে চিনবে কী করে? তবু কেন টনি ও কথা বলল? কিসে তার ঐরকম উদ্ভট চিন্তা মাথায় এল?

জনার্দন গুম হয়ে বসে ভাবতে লাগল। গড়িয়ায় নিজের বাড়িতে এতকাল থেকেছে,

নিজের কষ্টাক্ষীরি কাজ নিয়ে অনেকের সঙ্গেই মেলামেশা করতে হয়েছে। কিন্তু মনে রাখার মতো ঘনিষ্ঠ লোক....হ্যাঁ, দুজন ছিল।

মনে পড়ল, প্রায় দুবছর আগে একদিন—

সন্ধেবেলায় গড়িয়ার বাড়িতে একটি ছেলে এল। ছেলেটির বয়স আঠারো-উনিশ। সুন্দর স্বাস্থ্য, ফর্সা রঙ, মুখে শান্ত ভাব। তাকে দেখে জনার্দন অবাক হলো।

কাকে চাই?

আপনাকে।

আমাকে! আমাকে তুমি চেন?

ছেলেটির মুখে হাসি নেই। যেন এক বোঝা দুশ্চিন্তা মাথায় করে এসেছে। বলল, আপনি তো জনার্দনবাবু। আমার বাবা রতিকান্ত—

ও! আচ্ছা, তুমি রতিকান্তর ছেলে? বেশ বেশ। আমি তো কখনো তোমায় দেখিনি। কিন্তু আমি আপনাকে দেখেছি অনেকবার। আমাদের বাড়ি গিয়ে বাবার সঙ্গে দরজা বন্ধ করে গল্প করতেন।

জনার্দন একটু খতমত খেয়ে গিয়েছিল। সামলে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, ও-ই আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ওর ঘরে বসাতো। বিজনেসের কথাবার্তা হতো। তা বলো কী ব্যাপার?

কাকাবাবু, বাড়িতে বাবা-মার মধ্যে কেবলই বগড়া অশান্তি হচ্ছে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে কোনোদিন কিছু একটা বড়ো ধরনের বিপদ ঘটে যাবে।

জনার্দন একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিচু গলায় বললে, তোমার কাকিমা এখন ব্যস্ত। চা খাওয়াতে পারছি না। তাছাড়া এসব ব্যাপার বাড়িতে আলোচনা করা ভালো নয়। চলো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুনি।

দুজনে রাস্তায় নেমে একটা নিরিবিলা জায়গায় এসে দাঁড়াল।

তা আমায় কী করতে বল?

আপনি বাবার একমাত্র বন্ধু। বাবাকে বোঝান যেন মায়ের ওপর অত্যাচার না করে।

তা না হয় বলব। কিন্তু কেন অত্যাচার করে তা তো জানি না।

ছেলেটি এবার চোখ বড়ো বড়ো করে তাকালো। কাকু, সত্যিই কি আপনি জানেন না?

জনার্দন টোক গিলে বলল, না, ঠিক জানি না। তা ছাড়া অন্যের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে—

বাবা যে লোক ভালো নয় তা তো জানেন। বাবার অনেক কুকীর্তি আছে। মা তা সহ্য করতে পারে না। তারপর লক্ষ্মীনারায়ণ আবার আমাদের বাড়িতে যাওয়া-আসা শুরু করেছে। লক্ষ্মীনারায়ণ!

জনার্দনের মুখটা মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটার তা লক্ষ্য এড়াল না। বলল, লক্ষ্মীনারায়ণকে তাহলে আপনিও চেনেন?

হ্যাঁ, চিনি বৈকি। সে তো সাংঘাতিক লোক?

সেই লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাকে একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলেছে। বাবা বোধহয় অনেক টাকা ধার করেছে ওর থেকে।

শোধ করছে না?

করছে অল্প অল্প করে। কিন্তু—

থামলে কেন? বলো।

আসলে লক্ষ্মীনারায়ণের মতলব অন্যরকম। আমাদের বাড়িতে একটা খুব মূল্যবান জিনিস আছে। সেটা লক্ষ্মীনারায়ণ হাতাতে চায়। কিন্তু মা প্রাণ থাকতে তা দেবে না। বাবা প্রাণের দায়ে সেটা লক্ষ্মীনারায়ণকে বেচে দিতে চায়।

...এ কী ঘুমোচ্ছ! অফিস যাবে না? জনার্দন যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। এমনি ভান করে তাকাল।

ওঃ তাইতো অনেক বেলা হয়ে গেছে। কাল রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়নি। তাই—  
আজ হবে তো? স্নান হাসল মালতী। তিনি তো আবার আসবেন বলে গেছেন।  
জনার্দনের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

### আরও রহস্য

গুর্গে নামে লোকটা চলে যাবার পর টনি ঐ ঘরটায় ঢুকল। ভাবল ঘরে তেমন কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে। সে তন্নতন্ন করে সারা ঘর খুঁজছিল। কিন্তু গত রাতে যে এই ঘরে কেউ ছিল তার কোনো চিহ্ন দেখতে পেল না। তবে একটা জিনিস অনুভব করল— ঘরের ভেতরের বাতাসটা যেন বড্ড ভারী। আর গুমোট ভাব। দম আটকে আসে। অথচ এই ঘরে সে তো আগেও এসেছে, তখন এমন মনে হয়নি।

ফিরে আসবার সময়ে হঠাৎ ওর কী খেয়াল হলো ঢোকির তলাটা হেঁট হয়ে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল। ওগুলো কী? অর্ধেক মেঝে জুড়ে কালো কালো কী নড়ে বেড়াচ্ছে? ভালো করে ঠাওর করে দেখল একঝাঁক মাছি। এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরে এত মাছি এল কোথা থেকে?

গা-টা শিউরে উঠল টনির। সবই মিলে যাচ্ছে—কেন বিছানা থাকতেও মাটিতে ধুলোয় শোয়, কেনই বা তার শোবার জায়গায় মাছি ভনভন করে!

টনি সকালের চ-জলখাবার খেল। কিন্তু খুবই অনামনস্ক। কিছুতেই মন শান্ত করতে পারছে না। লোকটা সত্যিই কি প্রেতাত্মা? মানুষের চেহারা ধরে এসেছে তাদের ক্ষতি করতে? ঠিকমতো জবাব পায় না।

মনটা এরকম উতলা হলেই ও চলে যায় কবরখানায়। ওখানে নিরিবিলিতে বসে ঠান্ডা মাথায় ভাবতে পারে। আজও তাই সে কবরখানার দিকে চলল।

কবরখানার কাছাকাছি যখন গিয়েছে তখন দেখল একটা লোক কবরখানার দিকে যাচ্ছে। খুব আশ্চর্য হলো। যে ক'বার সে এখানে এসেছে কখনো সে কাউকে এদিকে আসতে দেখেনি। এ আবার কে?

আরও একটু এগোতেই সে চমকে উঠল। বাবা!

টনি খুব খুশি হলো বাবাকে কবরখানার দিকে যেতে দেখে। সে অমনি ছুটল। কাছে গিয়ে ডাকল, বাবা!

জনার্দন চমকে পিছন ফিরে তাকাল।

বাবা, কোথায় যাচ্ছ?

জনার্দন কেমন থতমত খেয়ে গেল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আমি? না, আমি তোঁ কোথাও যাইনি।

টনি হেসে বলল, যাওনি কী? এই তো যাচ্ছ?

জনার্দন ফ্যালফ্যাল করে চারিদিকে তাকাল। যেন বুঝতে পারল না কোথায় যাচ্ছে। কি হলো? দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? চলো।

জনার্দন যেন ঘুমের ঘোরের মধ্যে বলল, কোথায়?

টনি হাসল। বলল, যেখানে যাচ্ছিলে, কবরখানায়। দেখবে কী চমৎকার জায়গা।

হঠাৎ জনার্দন চমকে উঠল। ভয়ানক ভয় পেল। চুঁচিয়ে বলল, না না, আমি ওখানে যাব না। বলেই হনহন করে বাড়ির দিকে ফিরে চলল।

টনি অবাধ হয়ে ভাবতে লাগল বাবার হলো কী! কেনই বা অফিস যাব বলে বেরিয়ে কবরখানার দিকে যাচ্ছিল, কেনই বা অমন করে ফিরে যাচ্ছে? যাই হোক সেও বাবার পিছুপিছু বাড়ি এসে ঢুকল।

সে রাত্রেও ওরা ভয়ে ভয়ে বিছানায় শুলো। না জানি আজ আবার কোনো শব্দটপ শোনা যায় কিনা।

না, তেমন কিছু হলো না। মাঝে মাঝে শুধু পিছনের মাঠে একটা বেড়ালের কান্না শোনা যাচ্ছিল। তারপর একসময়ে তাও থেমে গেল। এক ঘুমেই রাত কাবার। সকালে জনার্দন চুপচাপ তার কাজ করল। কিন্তু বড়ো গভীর। বেলা বারোটোর মধ্যে নাওয়া-খাওয়া শেষ। তারপরেই জনার্দন ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

মালতী জিজ্ঞেস করল, আজও কাজে যাবে না?

জনার্দন বললে, না, শরীরটা ভালো নেই। বলে পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বন্ধ করল। ....একদিন গভীর রাতে জনার্দনের গড়িয়ার বাড়ির দরজায় টোকা পড়ল।

এত রাতে কে এল? জনার্দন ভয় পেল। তবু সে সাবধানে বেরিয়ে এল। দরজা খুলে দেখল রতিকান্ত।

আমার খুব বিপদ। তুমি শিগগির এসো।

বাড়িতে কিছু না বলে সে তখনই রতিকান্তের সঙ্গে বেরিয়ে এল। একটু ভয়-ভয় করছিল। কী এমন বিপদ যে এত রাতে তাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে? লক্ষ্মীনারায়ণের মুখোমুখি হতে হবে না তো?

রতিকান্তর বাড়ি এসে জনার্দন দেখল রতিকান্তর বৌটা মরে পড়ে আছে। ভীষণ ভয়ে সে বলে উঠল, এ কী কাণ্ড!

চুপ করো। একটি কথাও জিজ্ঞেস করো না। এখন বলো কি করা উচিত।

জনার্দন সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার ছেলে কোথায়?

জানি না। আমাদের অশান্তির জন্যে দু'দিন বাড়ি ঢোকেনি। যাই হোক এখন যা করার তুমি করো।

একটু থেমে বলল, জানই তো আমি মোটেই পুলিশের সুনজরে নেই। ব্যাটারা আমাকে দেখলেই পাকড়াবে। তারপরে ঘরে বৌয়ের লাশ দেখলে আর রক্ষে নেই। একেবারে ফাঁসিকাঠের ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাবে।

রতিকান্ত আবার একটু থামল। তারপর বলল, ঐ পার্সটা রাখো। টাকা আছে। ঐ দিয়ে লাশটার গতি করো।

হ্যাঁ, বন্ধুর জন্যে জনার্দন চমৎকারভাবে সব ম্যানেজ করল। কাকপক্ষীতে টের পেল না। তারপর—

মালতী এসে বলল, ওঠো ওঠো। চা হয়ে গেছে।

জনার্দন ধীরে ধীরে উঠে চায়ের টেবিলে গিয়ে বসল।

টনি বলল, আজও অফিস গেলে না। কি হয়েছে?

শরীরটা ভালো নেই।

চলো একটু বেড়িয়ে আসি। তাহলেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

কোথায় যাবি?

খিদিরপুর চলো না। জায়গাটা আমি দেখিনি। ওখানে ডক আছে। না?

খিদিরপুর শুনেই জনার্দন চমকে উঠল। তারপর কী ভেবে বলল, আচ্ছা, চলো।

চা খেয়ে দুজনে বেরিয়ে যাচ্ছিল, মালতী জনার্দনের হাতে টচটা দিয়ে বলল, এটা রাখো।

আর ভাড়াতাড়ি ফিরো। বাড়িতে আমি একা।

তবে থাক। যাব না।

মালতী ভাড়াতাড়ি বললে, না না, ঘুরে এসো। সবসময়ে তো বাড়িতেই বসে আছ।

### চন্দনপুরের পাদ্রীবাবা

বিকেলে জনার্দন আর টনি বেরিয়ে গেল। মালতী লক্ষ্য করল মানুষটা আজ বড়ো অন্যমনস্ক। সবসময়ে কী যেন ভাবছে। অবশ্য ভাবটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। গুর্গে নামে লোকটা সবাইকেই ভাবিয়ে তুলেছে। সবচেয়ে ভয়ের কথা লোকটার আচরণ। পরশু রাতদুপুরে কেন লোকটা তাদের শোবার ঘরের দরজার কাছে এসে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়েছিল? বাথরুম খুঁজছিল এটা মিথ্যে কথা।

আর টনি? টনিকে নিয়েই এখন তার যত দুর্ভাবনা। বড্ড বেশি সাহস ওর। আর বড্ড বোকা। নইলে ঐ লোকটা গাড়ি ঠেলবার জন্যে ডাকতেই যেতে চাওয়া উচিত হয়েছিল? তার মায়ের প্রাণ অশুভ কিছু ঘটবে টের পেয়েছিল। তাই আটকে ছিল।

হ্যাঁ, মায়ের মন.....

শূন্য সংসারে যখন বুকচাপ কান্না গুমরে গুমরে উঠত তখনই বুঝি ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। চন্দনপুর গ্রামে শিবের মেলায় সন্তানকামনায় 'হতে' দিতে গিয়েছিল একাই। ফেব্রার পথে যখন জল তেষ্টায় কাতর তখন এক বৃদ্ধ পাদ্রীর সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, মা, আমি খ্রিস্টান। তুমি হিন্দু নারী। পূজো দিয়ে ফিরছ। আমার হাতে কি জল খাবে?

সে হেসে বলেছিল, বাবা, জল-বাতাস তো ঈশ্বরের দান। মানুষের হাতে কি তার পবিত্রতা নষ্ট হতে পারে?

পাদ্রী খুশি হয়ে তাকে নিজের কোয়াটারে নিয়ে গেলেন। সেখানেই প্রথম দেখল টনিকে। এক নজরেই মায়া পড়ে গেল। তারপর যখন শুনল ওর মা-বাবা কেউ নেই, কেউ তাকে চার্চের চাতালে ফেলে রেখে গিয়েছিল তখন সে তাকে চাইল।

পাদ্রী খুশি হয়ে বললেন, ছেলেটি খুবই ধর্মপ্রাণ। এইটুকু ছেলের ঈশ্বরভক্তি দেখে আমি অবাক হই। এই ছেলে বড়ো হলে একদিন যদি মহাপুরুষ হয়, আমি আশ্চর্য হবো না,

তবে মা, আমি বুড়ো হয়েছি। কবে মরে যাব, কে তখন ওকে দেখবে ভেবে দুশ্চিন্তায় থাকি। এখন তুমি যখন ওকে নিতে চাইছ তখন আমি নিশ্চিন্ত।

তারপর তার হাতের কবচটা দেখিয়ে বললেন, এই কবচ ওকে কে দিয়েছিলেন জানি না। তবে এটা সাধারণ কবচ নয়। এ দ্যাখো কবচে একটা পঞ্চশূল আঁকা। এই চিহ্ন আগে তান্ত্রিকরা ব্যবহার করতো। যাই হোক দেখো, এই কবচ যেন ও কখনো না খোলে। এটা সম্ভবত ওকে অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করবে। আর মাঝে মাঝে ওকে নিয়ে আমার কাছে আসবে। মন খারাপ করলে ওকে দেখতে ইচ্ছে করবে। তোমার ঠিকানাও রেখে যাও।

এইভাবে ছ' বছরের টনি তার কোল জুড়ে বসল।

আজ দেখতে দেখতে প্রায় সাত বছর কেটে গেছে। মালতীর ভয় ছেলেটা যেরকম উদাসী কোনোদিন সন্ন্যাসী হয়ে না যায়।

আর ঐ কবচটা? সত্যিই কি ওর তেমন কোনো গুণ আছে? তবে কবচটার কালো কারটা ক্রমশ পঙ্কা হয়ে যাচ্ছে। ওটা বদলাতে হবে।

কিন্তু আজ হঠাৎ টনির খিদিরপুর যেতে ইচ্ছে করল কেন? কর্তাও এককথায় রাজি হয়ে গেল। হয়তো কিছুই নয়। তবু—

মালতীর কেমন ভয় করতে লাগল। এখানে এসে এই কদিনেই সে কিরকম যেন ভীতু হয়ে গেছে।

### ইদ্রিশ আলি লেন

ধুলোভরা কাঁচা রাস্তা ধরে হাঁটছিল জনার্দন। ডায়মন্ড হারবার রোড একটু দূরে। সেখানে থেকে বাস ধরে তবে খিদিরপুর।

হ্যাঁ, খিদিরপুর!

তখনই তার আবার সেই দিনকার কথা মনে পড়ল।

...রতিকান্তর স্ত্রীর মৃত্যুর দিন দশেক পর জনার্দনের নিজস্ব ছোটোখাটো অফিসটায় ফোন বাজল।

হ্যালো।

আমি রতিকান্ত।

রতিকান্তর নামটা শুনেই জনার্দনের বুকটা ছাঁৎ করে উঠেছিল। মনে হয়েছিল ও তো সর্বনাশের পথে এগিয়ে চলেছেই, তাকেও ঐ পথে টেনে নিয়ে যাবে।

ভয়ে ভয়ে বলল, কী বলছ বলো।

খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর এল, বিশেষ দরকার। আজ সন্ধ্যাবেলায় তুমি আসবে।

এ যেন আদেশ। রতিকান্ত তার একমাত্র বন্ধু ঠিকই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তার হাত থেকে নিস্তার পেলেই বাঁচে। কিন্তু অত সহজে নিস্তার পাওয়া যায় না। এদিক দিয়ে সে দুর্বল প্রকৃতির।

যথাসময়ে জনার্দন গেল। দরজা ভালো করে বন্ধ করে দিয়ে রতিকান্ত গভীর মুখে একটা চিঠি বের করে দেখাল। চিঠিটা লিখছে ওর একমাত্র ছেলে বাসু।—‘তোমার কাছে থাকতে আর ইচ্ছে করে না। তোমার ড্রয়ারে টাকা ছিল। নিয়ে চললাম। আমার খোঁজ করা বৃথা চেষ্টা।’

যাঃ! ছেলেটাও কেটে পড়ল। বৌ তো আগেই মরেছে। তাহলে তুমি তো এখন মুক্ত পুরুষ হে!

না জনার্দন, বৌ গেছে যাক। কিন্তু ছেলেটাই আমার সব ছিল। ও ওর মায়ের মৃত্যুর জন্যে আমাকেই দায়ি করেছে। সে যাই হোক, এখন বলি যে জন্যে তোমায় ডাকা। ব্যাপারটা খুব গোপনীয়। বিশ্বসংসারে একমাত্র তুমিই জানবে।

একটু থেমে বলল, এদিকে আমি আর একটা ব্যাপারে ফেঁসে গেছি। পুলিশ এখনও টের পায়নি। পেলেই আমায় ধরবে। এখন তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। তাই—এমনি সময়ে দরজায় কড়া নাড়া। রতিকান্তর মুখ শুকিয়ে গেল। পুলিশ? দরজা খোলো।

না পুলিশ নয়। এ গলা লক্ষ্মীনারায়ণের। সাক্ষাৎ যমদূত। রতিকান্ত ফিসফিস করে বলল, তুমি আজ যাও। কাল এই সময়ে অবশ্য আসবে। জনার্দন বেরোতেই লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে মুখোমুখি। কটমট করে জনার্দনের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ বলল, তুমিই ছিলে এখানে! এতক্ষণ কী শলাপরামর্শ হচ্ছিল? শায়েস্তা করে দেব। বলেই লক্ষ্মীনারায়ণ লাথি মেরে দরজাটা ভালো করে খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

‘শায়েস্তা করে দেব’ কথাটা তখনও জনার্দনের কানের কাছে বিস্ত্রী শব্দ করে ঘুরছিল। বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠল। তবু, সে চলে গেল না। কী কথা হচ্ছে জানার জন্যে দরজায় কান পেতে রইল।

সব কথা শোনা গেল না। মাঝে মাঝে রাগের মাথায় চেষ্টা করে যে কথাগুলো বলছিল সেগুলোই গুনতে পেল। যেমন—তুমি পালাবার মতলব করেছে? আগে আমার সব টাকা একেবারে শোধ করো নইলে তোমার কাছে যে জিনিসটা আছে ওটা আমায় দাও।

ওটা আমার কাছে নেই।

কোথায়?

বাসু নিয়ে গেছে।

কোথায় গেছে?

জানি না।

মিথ্যে কথা।

মা কালীর দিব্যি।

জিব ছিঁড়ে ফেলে দেব। বলো সেটা কোথায়?

বলছি তো আমার কাছে নেই। ইচ্ছে করলে খুঁজে দেখতে পারো।

ঠিক আছে। সাত দিন পর আবার আসব। তোমার ছেলের কাছেই রাখ আর তোমার ঐ জনার্দনের কাছেই রাখ, সেদিন ওটা আমার চাই। নইলে লাশ ফেলে দেব...

জনার্দনের শরীর কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি পালিয়ে এল।

পরের দিন সন্ধ্যায় কথামতো দুকদুক বক্ষে জনার্দনকে যেতে হলো। রতিকান্ত অপেক্ষা করছিল। তার ঝোড়ো কাকের মতো বিভ্রান্ত অবস্থা দেখে জনার্দন ভয় পেল।

সময় সংক্ষিপ্ত। যে কোনো মুহূর্তে লক্ষ্মীনারায়ণ হানা দিতে পারে। তাই কথা না বাড়িয়ে একটা পেতলের বাস্তু খুলে বার করল একটা সোনার মুকুট। আলো পড়ে মুকুটটা ঝলমল

করে উঠল। জনার্দনের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কাঁপা কাঁপা গলায় রতিকান্ত বলল, এটা আমাদের বংশের মুকুট। এটার ওপর লক্ষ্মীনারায়ণের শকুনির দৃষ্টি। তোমায় বিশ্বাস করে এটা রাখতে দিলাম। খুব সাবধানে রাখবে। আমার ছেলে ফিরে এলে তাকে দেবে।

একটু থেমে বলল, আর একটা কথা, আমার গোপন ডেরা একমাত্র তুমিই জানো। যত চাপেই পড় না কেন সেখানকার ঠিকানা কাউকে দেবে না। বিশ্বাসঘাতকতা করলে বন্ধু বলে খাতির করব না।

শপথ করে জনার্দন মুকুট নিয়ে চলে এসেছিল। দিন চারেক পরে তার গড়িয়ার বাড়িতে স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ এসে হাজির। জনার্দনের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

তোমার বন্ধু পালিয়েছে। তুমি জান ও কোথায় গেছে?

না।

ওর ছেলে কোথায় জান?

না।

জানি এই উত্তরই তুমি দেবে। ঠিক আছে। আমি মানলাম তুমি কিছুই জান না। এখন বল দিকি ও কোথায় কোথায় থাকতে পারে।

জনার্দন বলতে চায়নি। কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ খুব অল্প কথার মানুষ। ঠান্ডা মাথায় বললে, জনার্দন, বৌ ছেলে নিয়ে ঘর কর। শুধু শুধু জীবন বিপন্ন করবে কেন? ঠিকানাগুলো দাও।

অগত্যা জনার্দন গড়গড় করে ঠিকানাগুলো বলে গেল।

ঠিকানাগুলো লক্ষ্মীনারায়ণ নোট করে নিল। তারপর বললে, আর?

আর নেই।

উহু। আরও আছে। খিদিরপুরের কাছাকাছি ওর আরও একটা ডেরা আছে না?

হ্যাঁ আছে। জনার্দন জানে রতিকান্ত প্রায়ই সেখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু ওর সে ঠিকানা কিছুতেই বলা যাবে না। জনার্দন মন শক্ত করে রইল।

কি হলো, বোবা হয়ে গেলে যে?

লক্ষ্মীনারায়ণের পাথরের মত ভোঁতা কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে জনার্দন ভড়কে গেল।

...বাবা, আমরা তো ডায়মন্ড হারবার রোডে এসে পড়েছি না?

হ্যাঁ।

একটা বাস এসে দাঁড়াল। ওরা উঠে পড়ল। মিনিট দশেকের মধ্যেই ওরা খিদিরপুর ব্রিজের কাছে এসে নামল।

টনি জিজ্ঞেস করল, বাবা, এই রাস্তাটা কোথায় গেছে?

এসপ্লানেড।

এখান থেকে আমাদের গড়িয়ার বাড়ি কতদূর?

অনেক দূর।

কিসে করে যেতে হয়?

এসপ্লানেড থেকে বাস আছে।

আর এদিকটা?

জনার্দন অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, এটা গেছে মেটিয়াব্রুজের দিকে।

ডকটা কোথায়?

ঐ দিকে।



বাবা, একদিন ডকটা দেখাবে?

জনার্দনের কাছে থেকে তখনই উত্তর পাওয়া গেল না।

জনার্দন কি ভাবছে?

ও বাবা!

আঁ।

ডকটা একদিন দেখাবে?

দেখাব।

ওখানে অনেক জাহাজ আছে, না?

হ্যাঁ।

টনি ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল। জনার্দন নিজের মনেই বলল, ইদ্রিশ আলি লেনটা যেন কোন দিকে?

একজনকে জিজ্ঞেস করল। সে বলতে পারল না। তারপর একটা পান-বিড়ির দোকানে জিজ্ঞেস করলে বলল, ডকের দিকে মিনিট দশেক হাঁটতে হবে।

জনার্দন হাঁটতে শুরু করল।

টনি জিজ্ঞেস করল, বাবা, ইদ্রিশ আলি লেনে কি আছে?

কিছু না। এমনিই।

টনি একটু ভাবল। এমনি এমনি কেউ একটা অচেনা রাস্তা খোঁজে? বাবা নিশ্চয় তাকে বলতে চাইছে না।

মিনিট পনেরো হাঁটার পর ডকের কিছু আগে একটা বাঁহাতি রাস্তায় ঢুকল। তারপর আরও কিছুদূর গিয়ে সরু একটা গলি। এটাই ইদ্রিশ আলি লেন। জনার্দন হিসেব করে দেখল এই রাস্তাটা ডায়মন্ড হারবার রোডের সমান্তরাল। অর্থাৎ ডায়মন্ড হারবার রোড থেকে খিদিরপুর না এসে বাঁ দিকেই এই রাস্তাটা। জানা ছিল না বলে এত ঘুরপথে আসা।

ইদ্রিশ আলি লেনের কাছে এসে জনার্দন দাঁড়িয়ে পড়ল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। জায়গাটা খুবই নির্জন। কিছু গরিব মুসলমানের বসতি। কোনো যানবাহন নেই। লোক চলাচলও কম। তুমি এখানে একটু দাঁড়াও। আমি আসছি।

কোথায় যাচ্ছ?

ঐ গলির মধ্যে আমার এক বন্ধু থাকত। সেই বাড়িটা একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। সে বন্ধু এখন নেই?

না। তুমি দাঁড়াও। আমি এখুনি আসছি।

জনার্দন টনিকে একলা দাঁড় করিয়ে রেখে গলির মধ্যে ঢুকল। টনি অবাক হলো।

গলিটা সরু। দু'পাশে টালির ঘর। জনার্দন কিসের নেশায় যেন টালির ঘরগুলো দেখতে দেখতে চলল।

তারপর ডান দিকে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। হ্যাঁ, এই তো পেয়ারা গাছটা। ঐ যে সিমেন্ট বাঁধানো রক। সামনেই দরজা। দরজায় শেকল তোলা। কিন্তু তালা লাগানো নেই। ঘরটার পিছনে ঝোপঝাপ, তার পরে পোড়ো জমি।

হ্যাঁ, এই বাড়িটায় মাত্র একবার এসেছিল। পরিবেশটা ভালো লাগেনি। ওখানে যারা ছিল তারা ভদ্রলোকের সঙ্গে মেশার অযোগ্য। তাই আর সে এখানে আসেনি। আজ দু'বছর পর জনার্দন এল। কেন এল তা সে নিজেও জানে না।

তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। জনার্দন একবার এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে শেকলটা খুলল। ঝনাৎ করে লোহার শেকলটা দরজার ওপর আছড়ে পড়ল। দু'হাতে দরজা ঠেলল জনার্দন। দু'বছর আগে দেখা লক্ষ্মীনারায়ণের মুখটা মনে পড়ল জনার্দনের। সেই পাথরের মতো ভোঁতা মুখটা। জিজ্ঞেস করেছিল, খিদিরপুরে রতিকান্তর একটা ঠিকানা আছে না?

দরজাটা বিশ্রী শব্দ করে খুলে গেল। একটা ভ্যাপসা গন্ধ। ইস্! টর্চটা টনির কাছে রেখে এসেছে। টর্চটা থাকলে একবার জেলে দেখত। কি দেখত? দেখবার আজ আর কি আছে?

কিছুই না। তবু—

জনার্দন অন্ধকার ঘরে দু'পা এগোল। আর সঙ্গে সঙ্গেই তার পা দুটো আটকে গেল। দেখল একটা ভাঙা চেয়ারে কেউ একজন বসে আছে।

জনার্দন স্ট্যাকুর মতো দাঁড়িয়ে রইল। না পারছে এগোতে, না পারছে বেরিয়ে যেতে। মিনিট দুই চুপ করে থেকে জনার্দন অতিকষ্টে দুটো কথা মাত্র উচ্চারণ করল, কে তুমি? লোকটা উত্তর দিল না। উঠে দাঁড়াল। তারপর এক পা এক পা করে সান্নাৎ মৃত্যুর মতো এগিয়ে আসতে লাগল। জনার্দন ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। সেই ভয়াবহ মূর্তিটা তখন একেবারে কাছে এসে পড়েছে। জনার্দন পালাতে গেল কিন্তু অন্ধকারে দরজাটা খুঁজে পেল না।

এমনি সময়ে অন্ধকার ঘরে টর্চের আলো এসে পড়ল।

বাবা, এখানে কি করছ? বলে টনি এসে দাঁড়াল। তার হাতের কবচটা ভারী হয়ে উঠল। আর সোনার মতো জ্বলজ্বল করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটা জনার্দনকে ছেড়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

টনির সমস্ত শরীর থরথর করে কঁপে উঠল। টর্চের আলোয় মুহূর্তের জন্য যাকে দেখল, কে সে?

ফেরার পথে জনার্দন একটি কথাও বলল না। শুধু বাড়ি ঢোকার মুখে ক্লান্ত স্বরে বলল, টনি, মাকে এসব কথা বোলো না।

টনি বলল, আচ্ছা।

### পরিত্যক্ত কবরখানায় নতুন কবর

সেদিন রাতে টনি ভালো করে ঘুমোতে পারল না। কেবলই ইদ্রিশ আলি লেনের ঘটনাটা মাথায় ঘুরতে লাগল।

সেই পরিত্যক্ত টালির ঘরে লোকটা কে ছিল? ও কি মানুষ, না অন্য কিছু? ও কি বাবার জন্য অপেক্ষা করে ছিল? ও কি জানত বাবা ওখানে যাবেই? আর বাবাই বা হঠাৎ কেন ওখানে গেল, যাবার তো কথা ছিল না। সে বাবা বলে ঢোকামাত্র লোকটা পালালো কেন? এসব কথা নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করা যাবে না।

পরের দিন সকালে ঘুরতে ঘুরতে বেলা একটা নাগাদ টনি কবরখানায় ঢুকল। কিছু ফুল তুলে নিল। তারপর সার সার সমাধিগুলোর ওপর সেগুলো ছড়িয়ে দিল। সে অনুভব করল একটা স্নিগ্ধ বসন্তবাতাস যেন তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সে হাত জোড় করে অশরীরী আত্মাদের উদ্দেশে প্রণাম করল।

তারপর একটা গাছের তলায় গিয়ে বসল। ঘটনাগুলো ঘটার পর তার কাছে এখন অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেছে। বুঝতে পেরেছে মিস্টার গুর্গে আসলে একটা দুষ্ট প্রেতাশ্বা। মানুষের রূপ ধরে তাদের, বিশেষ করে বাবার ক্ষতি করতে এসেছে। তাকেও সহ্য করতে পারে না। এখন কয়েকটি প্রশ্ন—

১। কেন ক্ষতি করতে আসা? বাবা কী এমন অপরাধ করেছে?

২। বাবা কেন কাল ইদ্রিশ আলি লেনে গেল?

৩। আজ এতদিন পর এই বাগানবাড়িতে আসার পরই প্রেতহানা কেন?

৪। আর বাবাই বা কেন হঠাৎ এই বাগানবাড়িটা পছন্দ করল?

নাঃ সব প্রশ্নের মীমাংসা করা এখনই সম্ভব নয়। মাথাটা কিরকম গরম হয়ে উঠেছে। শরীরটা দুর্বল ঠেকছে। ও উঠে পড়ল।

এক জায়গায় দেখল অনেকগুলো নতুন কবর। অবশ্য অন্যগুলোর তুলনায় নতুন। এগুলো বাঁধানো নয়। বোধহয় এগুলো বেওয়ারিশ লাশ। সম্ভবত সমাজবিরোধীরা খুন করে রাতারাতি এই পরিত্যক্ত কবরখানায় পুঁতে দিয়ে গেছে।

হঠাৎ একটা কবরের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। এটা অপেক্ষাকৃত নতুন কবর। কিন্তু মনে হলো যেন মাটিটা ফাঁপা। কেউ যেন মাটিগুলো সরিয়ে আবার পরে চাপিয়ে দিয়েছে। এরকম কেন?

কেউ কি এখান থেকে মড়া তুলে নিয়ে গেছে? এরকম নাকি যায় কিছু লোক কঙ্কালের ব্যবসা করার জন্য। হয়তো তাই হবে।

তাহলে অন্যগুলো থেকে তোলেনি কেন?

হয়ত আগেই তোলা হয়ে গেছে।

হঠাৎ একটা বিশ্রী গ্যাস কবরটা থেকে উঠে এল। কিরকম যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাতাসটাও ভারী হয়ে উঠেছে। সন্দিগ্ধ যে ঘরে মিঃ গুর্গে ছিলেন সে ঘরে এইরকম ভারী বাতাস অনুভব করেছিল। কিন্তু এখানকার বাতাসটা যেন আরও তীব্র, আরও—

এ কী দম বন্ধ হয়ে আসছে যে!

হঠাৎ তার নজরে পড়ল কবরের ওপরের মাটিগুলো যেন কাঁপছে। এখনই যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

তখন বেলা দেড়টা। খাঁ খাঁ করছে কবরখানা। কাছে জনমানুষ নেই। একটা কাক বিকট চোখ করে তাকে দেখছে।

টনি কেমন ভয় পেল। গেটের দিকে এগোতে লাগল। কিন্তু পা দুটো এত ভারী লাগছে কেন? আর কবচটা আবার হাত থেকে পড়ে যাবার জন্যেই যেন নেমে নেমে আসছে। কবচটা হাতের বাহুতে তুলে সে জোরে হাঁটতে লাগল। কিন্তু—

কেউ কি তার পিছন পিছন আসছে? সে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। ঐ তো ওদের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে! টনি ছুটছে...ছুটছে...ছুটছে....

এত ছুটেও বাড়ি পৌঁছচ্ছে না কেন সে? হঠাৎই তার খেয়াল হলো সে কোথায় কত দূরে এসে পড়েছে। সামনে একটা খাল...একটা নৌকো...মনে হলো যেন কেউ নৌকোটোর ওপর বসে আছে। নৌকোটা এগিয়ে আসছে তার দিকে। নৌকোতে যে রয়েছে সে আর কেউ নয়, স্বয়ং মিস্টার গুর্গে।

টনি বুঝতে পারল তার শরীরটা কেমন করছে। জ্ঞান হারাচ্ছে। কবচটা আবার বাহু থেকে

কজিতে নেমে আসছে। ও প্রাণপণে সেটা ওপরের দিকে ঠেলে দিয়েই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল।

### টনি কোথায় গেল?

বেলা দুটো বেজে গেল তবু টনি ফিরল না। মালতীর মন ছটফট করতে লাগল। কোথায় গেল ছেলেটা? এত বেলা পর্যন্ত তো বাইরে থাকে না। ওর কি তবে কোনো বিপদ হলো? বিপদ একটাই হতে পারে। আর সে কথা ভেবে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

মালতী অনেকবার দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল। কয়েকবার 'টনি টনি' করে চেষ্টা করে ডাকল। শেষে আর থাকতে পারল না। দরজায় তাল দিচ্ছে টনিকে খুঁজতে বেরোল।

টনির যাবার জায়গা একটাই—কবরখানা। সকালে-বিকালে ওখানেই যায়। গিয়ে বসে থাকে। বিদেহী আত্মারা নাকি তাকে ভালোবাসে। শুনলেও বুকের রক্ত জল হয়ে যায়।

মালতী সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কবরখানায় গেল। সারা জায়গাটা খুঁজল। কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। এবার কি করবে? বাড়িই ফিরতে হয়। কিন্তু বাড়ি গিয়েও যদি দেখে টনি ফেরেনি? তাহলে? তখন কি করবে? কর্তাও বাড়ি নেই যে খোঁজ করে দেখবে। এমনিতে রাত করে ফেরে। তবে আজ পইপই করে বলে দিয়েছে যেন সন্দের আগে বাড়ি ঢোকে। কিন্তু সন্দের তো ঢের দেরি। এখন?

ভাবতে ভাবতে মালতী বাড়ি ফিরে এল। না, টনি ফেরেনি।

মালতী তাল খুলল। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল।

ঘরে ঢুকতেই কেমন হাঁপ ধরল। সারা ঘরে যেন কুয়াশার মতো হালকা ধোঁওয়া। ঘরে ধোঁওয়া এল কোথা থেকে?

ডাইনিং হলটা পেরিয়ে ডান দিকে টনির ঘর। টনির ঘরটা উঁকি দিয়ে দেখল। বুখাই দেখা। দরজা তো তালাবন্ধ ছিল।

এবার সে নিজের ঘরে ঢুকতে গেল। থমকে দাঁড়াল। দরজায় শেকল দিয়ে গিয়েছিল না? তাহলে শেকল খুলল কে? দরজা হাট করে খোলা। তাহলে বোধহয় ভুল করেই দরজা খুলে রেখে গেছে।

মালতী ঘরে ঢুকল। এ কী! ট্রান্স সুটকেস খোলা পড়ে আছে। জিনিসপত্র লগুভণ্ড।

কে করল এমন? চোর এসেছিল? নিশ্চয় চোর এসেছিল। টাকা-পয়সা খুঁজছিল। কিন্তু চোর ঢুকল কী করে? বাইরের দরজা তো তালাবন্ধ ছিল।

এ তো বড়ো অদ্ভুত ব্যাপার। দিন-দুপুরে চোর। চিৎকার করে লোক ডাকতে ইচ্ছে করল। কিন্তু লোক কোথায়?

মালতী কী করবে এই মুহূর্তে ভেবে পেল না। কিন্তু সে কেমন করে যেন বুঝতে পারল বিপদ এখনো কাটেনি। আরও কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তখনই সে ঠিক করল বাড়িতে তার একদণ্ড একা থাকা উচিত নয়, বেরিয়ে যাবে। এই বলে ঘরের বাইরে আসতেই সে কাঠ হয়ে গেল। দেখল পর্দার আড়ালে ডাইনিং টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে মিস্টার গুর্গের পৈশাচিক মূর্তি।

মালতী চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। মূর্তিটা পায়ে পায়ে তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

এমনি সময়ে ‘মা মা’ বলে টনি ঘরে এসে ঢুকল। চুল উস্কেখুস্কে। দু’চোখে ঘুমের ঘোর। কিন্তু মুহূর্তেই তার ঘুম ছুটে গেল। ছুটে গিয়ে মাকে আঁকড়ে ধরল। গুর্গে সমস্ত শক্তি দিয়ে টনিকে ধরতে গেল। টনির হাতের কবচটা হঠাৎ ভারী হয়ে উঠল। লোহার রঙ বদলাতে লাগল। মূর্তিটা পিছতে লাগল। পিছতে পিছতে খোলা জানলা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

### ঘুম নেই

সন্দের আগেই বাড়ি ফিরে সব শুনে জনার্দন থমকে গেল।

মালতী বার বার একই কথা বলতে লাগল, বলো কী খুঁজতে ও এসেছিল? টাকা-পয়সা তো কিছুই নেয়নি। বলো, দোহাই তোমার চুপ করে থেকো না। আমাদের কাছে কি এমন জিনিস আছে যার জন্যে একটা ভয়ঙ্কর প্রেত হানা দিচ্ছে?

এই শীতের সন্ধেতেও জনার্দনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। মিনমিন করে বলল, তা আমি কেমন করে জানব?

হ্যাঁ, জান। নিশ্চয় জান। আমার কাছে তুমি লুকোচ্ছ।

একটু থেমে বলল, তুমি আমায় সব কথা বলো। প্রতিকার করতে হবে। নইলে আমাদের সবাইকে মরতে হবে। টনি তো আজ মরতে মরতে বেঁচে গেছে।

তবু জনার্দন চুপ করে রইল। উত্তর দিতে পারল না।

রাত সাড়ে এগারোটা।

ভালো করে দরজা এমনকি জানলাগুলোও বন্ধ করে জনার্দন শুয়ে আছে। পাশে মালতী। আজও কারো চোখে ঘুম নেই। কিন্তু কথা বলতেও সাহস হয় না। কে জানে হয়তো বাইরে কেউ ওৎ পেতে আছে।

রতিকান্ত.....রতিকান্ত.....রতিকান্ত.....

এখন এই গভীর রাতেও জনার্দনের একমাত্র চিন্তা রতিকান্তকে নিয়ে। রতিকান্ত যে সত্যিই খুন হবে জনার্দন তা ভাবতে পারেনি। তার মনে হয়েছিল লক্ষ্মীনারায়ণ ভয় দেখিয়েছিল মাত্র। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রতিকান্ত খুন হয় ডায়মন্ড হারবার রোডের কাছে ইন্ড্রিশ আলি লেনে ওর গোপন ডেরায়। ঠিকানাটা লক্ষ্মীনারায়ণকে জানিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

রতিকান্ত তার কাছে সোনার মুকুটটা গচ্ছিত রেখেছিল। জনার্দন সেদিন সহজ মনেই সেটা রেখেছিল। লকারে রাখার কথা মনে হয়েছিল, কিন্তু পরের জিনিস—ফ্যাসাদ হতে পারে, এইসব সাত-পাঁচ ভেবে সে ওটা গড়িয়ার বাড়িতেই রেখেছিল।

কিন্তু পনেরো দিনের মাথায় খবর পেল রতিকান্ত খুন হয়েছে। তবে তার লাশ যে তার এই বাগানবাড়ির কাছেই ঐ পরিত্যক্ত কবরখানায় পুঁতে দেওয়া হয়েছে তখনও তা জানত না।

রতিকান্তের হত্যার খবর শুনে জনার্দন দুঃখ পেয়েছিল, ভয় পেয়েছিল, আবার খুশিও হয়েছিল। তার মাথায় দুর্বুদ্ধি চাপল মুকুটটার তাহলে দাবিদার কেউ রইল না। তার ছেলে ফিরবে কিনা তার ঠিক নেই। ফিরলেও জিনিসটা যে তার কাছে গচ্ছিত আছে তা জানার উপায় নেই। জনার্দন সেদিনই মনস্থ করে ফেলল মুকুটটা রতিকান্তের ছেলেকে দেবে না।

ওটা কলকাতার বাসায় রাখা নিরাপদ নয়। লক্ষ্মীনারায়ণ চড়াও হতে পারে। তাই খোঁজ পাওয়ামাত্র এতদূরে নিরিবিলা আর নিশ্চিন্ত থাকার জন্য জলের দরে এই বাগানবাড়িটা কিনে ফেলল। রতিকান্তকে কাছেই কবর দেওয়া হয়েছে জানলে হয়তো এদিকেই আসত না।

এখানে আসার পর থেকেই শুরু হলো প্রেতহানা। প্রথমে বুঝতে পারেনি কে সে? এখন পরিষ্কার। কী উদ্দেশ্যে তার আক্রমণ তা এই মুহূর্তে জনার্দনের বুঝতে বাকি নেই। মুকুটটা তাকে ভোগ করতে দেবে না। আর বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু।

মুকুটটা সে তাদের চৌকির গুপ্ত ড্রয়ারের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। তার স্ত্রীও তা জানে না।

কিন্তু এর পর?

### এত রাতে কে ও?

ঘুম নেই টনির চোখেও। আজ কত বড়ো বিপদ থেকে যে সে বেঁচে গেছে সেই কথাই ভাবছিল। কিন্তু কেমন করে বাঁচল? কে বাঁচালো? এ কথা ভাবতে ভাবতেই তার ডান হাতটা উঠে গেল কবচটার ওপরে। ইস্! কারটা বদলাতেই হবে। নইলে কখন টুক করে ছিঁড়ে পড়বে।

কবচটার কথা মনে হতেই তার মনে পড়ল পাত্রীবাবার কথা। সেই শাস্ত করণ স্নেহভরা মুখখানি। সাদা পোশাক, সাদা দাড়ি। গলায় বুলছে কালো কর্ডে বাঁধা ক্রশ।

কতদিন তাঁকে দেখেনি। ঠিক করল, এবার একদিন বাবা-মাকে নিয়ে চন্দনপুর যাবে। তখনই অন্য ভাবনা মাথায় এলো। সেই প্রেতমূর্তিটা এখন দিনের বেলাতেই হানা দিচ্ছে। কিন্তু কেন?

তারপরেই ভাবল এভাবে বাঁচা যাবে না। ঐ পিশাচটা বাবাকে তো মারবেই, মারবে মাকেও। আর সেও রেহাই পাবে না।

তাহলে?

বাড়ির দক্ষিণ দিকের জানলাটা খোলা ছিল। এই জানলা দিয়ে তাদের বাড়ির লাগাও যে অংশটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে সেটা দেখা যায়। সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার মনে হলো জমির শেষপ্রান্তে কী যেন নড়ছে।

লাফিয়ে উঠে বসল টনি। এগিয়ে গেল জানলার কাছে। কী নড়ছে ওখানে?

একটা মানুষ...ও কি ছাতা মাথায় দিয়ে? রাত্রে ছাতা মাথায় কেন? এখন তো বৃষ্টি হচ্ছে না।

চোর? ডাকাত? সমাজবিরোধীদের কেউ? ছাতার আড়ালে লুকিয়ে কিছু করছে? নাকি গুণ্গেই নতুন বেশে? কিন্তু কি করছে ওখানে ছাতা মাথায় দিয়ে?

টনি একবার ভাবল ছুটে গিয়ে জাপটে ধরে লোকটাকে। কিন্তু এই প্রথম সাহস হলো না। অন্ধকারে গা মিশিয়ে সে জানলার গরাদে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মিনিট পনেরো পরে মূর্তিটা উঠে দাঁড়াল। তারপর—

মূর্তিটা এগিয়ে আসছে এদিকে। টনির গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আজ রাত্রেও তাহলে কী—

অনেকটা এগিয়ে এসেছে মূর্তিটা। পরনে কালো প্যান্ট, গায়ে চাদর জড়ানো। মাথায় কালো ছাতা। অন্ধকারে বেশ মিশে গেছে।

মূর্তিটা চলে এল বাড়ির কাছে। খিড়কির দরজার কাছে। হাতে কোদাল!

আবার কারো লাশ পোঁতা হলো নাকি? এবার বাগানবাড়িতেই?

তারপরেই চমকে উঠল টনি। এ কী? বাবা।

টনি দেখল চোরের মতো বাবা পা টিপে টিপে খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকল।

আশ্চর্য! এত রাতে বাবা ওখানে কোদাল নিয়ে কী করতে গেছিল? আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না টনি। গায়ে সোয়েটার চড়িয়ে টর্চ নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল। বেরোতে গিয়ে জোরে হোঁচট খেল।

আন্দাজে আন্দাজে ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছল টনি। খুব সাবধানে হাতের আড়ালে টর্চটা একবার জ্বেলে জায়গাটা বুঝে নিল। তারপর দু'হাত দিয়ে মাটি তুলতে লাগল। আর তখনই যে কবচটা ছিঁড়ে পড়ে গেল সেটা জানতে পারল না। এক সময়ে হাতে শস্ত্র মতো কিছু ঠেকল। টেনে তুলল সেটা। একটা বড়ো ক্যাশবাক্স। খুলে ফেলল ডালাটা। অমনি অন্ধকারে ঝলমল করে উঠল সেটা। একটা সোনার মুকুট।

আবার সাবধানে টর্চ জ্বালল টনি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল মুকুটটা। মুকুটের গায়ে একটা স্লিপ আঁটা—‘এই মুকুট আমার একমাত্র পুত্র বাসুর জন্যে। অন্য কারো অধিকার নেই।—রতিকান্ত।’

টনি অবাক! রতিকান্তকাকা। বাবার বন্ধু! উনি তো দু'বছর আগে অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছেন। তাঁর জিনিস বাবা কী করে পেল? এক মুহূর্তে সবকিছু তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। লজ্জায়, দুঃখে টনির দু'চোখ জলে ভরে উঠল।

এটা নিয়ে কী করবে এখন? বাবাকে তো বলা যাবে না, মাকেও না। তার চেয়ে যেমন আছে তেমনই থাক। ভেবে সেটা আবার মাটি চাপা দিয়ে রাখল।

টনি উঠে দাঁড়াল। ঠিক তখনই তার পিঠে গরম নিশ্বাসের ছেঁকা লাগল। চমকে ফিরে দাঁড়াতেই দেখল মিস্টার গুর্গে একেবারে তার গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। এবার কোটের ভেতর থেকে ডান হাতটা বেরিয়ে এল। হাত নয়, শুধু সাদা হাড়। হাতটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে টনির গলার দিকে।

টনি একবার প্রাণপণে চেষ্টা করে উঠল, বাবা! তারপরেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

## মৃত্যুর পদধ্বনি

১৬ ফেব্রুয়ারি।

এ বাড়িতে ওরা এসেছিল ৯ ফেব্রুয়ারি। মাত্র আট দিনে তিন জনের এই সংসারের ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেল। আজ সেই চরম দিনটি।

জনার্দন-মালতীর জীবনে শেষ আশার প্রদীপটি নিভতে চলেছে।

ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। বিছানায় পড়ে রয়েছে টনির শীর্ণ দেহ। গোটা শরীর বিছানার চাদরের মতো সাদা।

সারা রাত্রি মাথার কাছে বসে রয়েছে জনার্দন আর মালতী। মালতী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। জনার্দন যেন নিশ্চল পাথর।

বেলা দশটা।

টনির শরীর হিম হয়ে আসছে। মালতী চৈঁচিয়ে উঠে বলল, বসে বসে দেখছ কী? ডাক্তার ডাকো।

ডাক্তার এখানে কোথায় পাব?

এখানে না পাও যেখান থেকে পার নিয়ে এসো।

অগত্য বেরোতে হল জনার্দনকে।

জোরে হেঁটে চলল জনার্দন—যেন ছুটছে।

তারপর যখন ট্যাক্সিতে করে ডাক্তার নিয়ে এল, বেলা তখন একটা।

ডাক্তার দেখলেন। প্রেশার মাপতে গিয়ে তিনি হতাশ হলেন। মুখ গভীর করে তিনি উঠে গেলেন।

কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু? ওষুধপত্র?

কোনো লাভ নেই। রাত কাটবে না।

জবাব দিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন। নিরুপায় স্বামী-স্ত্রী চূপচাপ বসে রইল। মালতীর বুঝি কাঁদার শক্তিও নেই। সে কেবল বলছে, আমি ওর মা নই। কিন্তু যিনি ওর সত্যিকার মা তিনি যেখানেই থাকুন তাঁর ছেলেকে রক্ষা করুন।

যে জনার্দন জীবনে কখনো ভগবানের নাম মুখে আনেনি, হঠাৎ তাঁর ঠোট কেঁপে উঠল। বিড়বিড় করে বলল, টনিকে বাঁচিয়ে দাও। আমি আর পাপের পথে যাব না।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

সন্কে সাড়ে পাঁচটা।

শেষ শীতের বেলা—এখনও ছোটো। এরই মধ্যে ধূসর হয়ে আসছে। দেওয়ালের গায়ে অন্তর্যূরের একফালি রশ্মি কী করুণভাবে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

টনির দু'চোখ বসে যাচ্ছে। ঘাড় বেঁকে যাচ্ছে। জোরে জোরে নিশ্বাস টানছে। শেষ প্রাণশক্তি দিয়ে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করছে।

জনার্দন চৈঁচিয়ে উঠল, মালতী, মন শক্ত করো। টনি চলে যাচ্ছে।

মালতী ডুকরে কেঁদে উঠল।

ঠিক তখনই কে যেন দরজায় মৃদু কড়া নাড়ল। দু'জনেই চমকে উঠল। কে এল আবার? নিঃসংকোচে, নির্ভয়ে আজ জনার্দন উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

এ কী আপনি!

সামনে দাঁড়িয়ে চন্দনপুরের পাদ্রীবাবা। সাদা গাউন, সাদা দাড়ি, সাদা চুল। গলায় ঝুলছে কালো কর্ডে ক্রুশ। হেসে বললেন, টনিকে অনেকদিন দেখিনি। মন কেমন করল তাই চলে এলাম।

মালতী হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। আর কী দেখবেন পাদ্রীবাবা? টনি তো—

ফাদার ধীরে ধীরে টনির বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। একবার কপালে হাত রাখলেন। তারপর চমকে উঠে বললেন, ওর কবচটা কোথায়?

তাই তো!

তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল ওরা। কিন্তু পাওয়া গেল না।



পাদ্রী বললেন, নিশ্চয় কোথাও ছিঁড়ে পড়ে গেছে। কোথায় পড়েছে শিগগির খুঁজে দেখুন। জনার্দনের কী মনে হলো, সে তখনই ছুটল যেখানে কাল রাত্তিরে টনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেল কবচটা। হাঁপাতে হাঁপাতে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে নিয়ে এল ওটা।

ফাদার আর দেরি করলেন না। একটানে ছিঁড়ে ফেললেন নিজের গলার ত্রুশাটি। সেই ছেঁড়া কর্ড দিয়ে কবচটা বেঁধে দিলেন টনির হাতে।

আপনাব ত্রুশ ছিঁড়ে ফেললেন। ওরা অবাক।

ফাদার হাসলেন। বললেন, এই তো পকেটে রাখলাম। এটা এবার আমার সঙ্গে কবরে যাবে।

সত্যিই কি ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলে কিছু আছে? না কি সম্মোহনী শক্তি?

দশ মিনিটের মধ্যে টনির নিশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। বিবর্ণ মুখে রক্ত চলাচলের লক্ষণ দেখা দিল।

ফাদার আরও আধ ঘণ্টা রইলেন। তারপর বললেন, আর ভয় নেই। এবার আমি চললাম। আর শোনো, যত তাড়াতাড়ি পার এখানে থেকে চলে যেও।

ফাদার চলে গেলেন। ওরা দুজনে কৃতজ্ঞ চিন্তে হাত জোড় করে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। বলল, টনি একটু সুস্থ হলেই আপনার কাছে নিয়ে যাব। ও কেবলই আপনার কথা বলে।

ফাদার কিছু বললেন না। একটু হাসলেন মাত্র। ডান হাতটা তুললেন। বিদায়!

ওরা ভেবেছিল ফাদার বোধহয় ট্যাক্সিতে এসেছিলেন। কিন্তু কোথায় ট্যাক্সি? অতখানি পথ হেঁটে এসেছিলেন?

নিশ্চয় তাই। ঐ তো হেঁটেই যাচ্ছেন। ঐ তো এখনও দেখা যাচ্ছে.....

জনার্দনরা গড়িয়ায় নিজেদের বাসায় ফিরে এসেছে। মাসখানেক পর ফুল আর মিষ্টি নিয়ে ওরা তিন জনে গেল চন্দনপুরে। কিন্তু ফাদারের সঙ্গে দেখা হলো না। এক মাস আগে মারা গেছেন।

মৃত্যুর তারিখটা ছিল ১৬ ফেব্রুয়ারি। সময় বিকেল পাঁচটা।

# লোহিত সাগরের আতঙ্ক

॥ এক ॥

হ্যারিকাকু ও তাঁর ঘর

চিঠিখানা পেয়ে বাপ্পা বেশ একটু অবাক হয়ে গেল। যদিও সে ভাবছিল খুব শিগগির একদিন কলকাতায় গিয়ে হ্যারিকাকুর সঙ্গে দেখা করে আসবে, তা বলে কল্পনাও করতে পারেনি হ্যারিকাকু মনে করে তাকে চিঠি দেবেন।

তার আরও যেটা আশ্চর্য ঠেকল তা হচ্ছে চিঠিটা আসছে কলকাতা থেকে নয়, সুদূর সাঁওতাল পরগনার জগদীশপুর থেকে।

চিঠিখানা ইংরিজিতে লেখা। তার বাংলা তর্জমা এইরকম—

মাই ডিয়ার ইয়ং ফ্রেন্ডস্

আশ্চর্য হয়ো না এই খবর জেনে যে আমি আর কলকাতাতে নেই। বহুকালের বাস ছেড়ে চিরদিনের মতো এখানে চলে এসেছি। এখানে আসার জন্য আমার বন্ধু এখানকার পাদ্রী ফাদার শ্যামুয়েল অনেক দিন থেকে বলছিলেন। এখানে এসে থাকলেই আমি নাকি আমার গবেষণা, ডক্টর আত্মার অনুসন্ধান প্রভৃতি যা আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং যা আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন, তোমরা দুজন জানতে তার সিদ্ধি ঘটবে।....

সিদ্ধি কতদূর লাভ করতে পেরেছি তা আমি জানি না। তবে এখানে এসে আমি কেমন ভীত হয়ে পড়েছি। কেবলই মনে হচ্ছে খুব শিগগিরই কি যেন ঘটবে—যা শুভ ফলপ্রসূ নয়। আর তা আমি চাইওনি কখনো। আমি যা চেয়েছিলাম, তা তো তোমরা জানোই—অলৌকিক এক রহস্যের যবনিকা উত্তোলন। তার জন্যে আমি প্রায় সারাজীবন কিনা করেছি! শেষ পর্যন্ত আমাকে এখানেই রুগ্ন, ভগ্নস্বাস্থ্যে চলে আসতে হলো।

আমি চাই তোমরা যত শীঘ্র পারো এখানে একদিনের জন্যেও চলে এসো। আমি বড্ড একা।...

স্টেশনে নেমে পুরনো চার্চ কিংবা ফাদার শ্যামুয়েলের কোয়ার্টার বললেই টাঙ্গা তোমাদের এখানে পৌঁছে দেবে। আমি আবার বলছি—আমি ভীত। তোমাদের আসা একান্ত দরকার। আশা করছি তোমরা ভালো আছ।

—তোমাদের হ্যারিকাকু

কাঁপা কাঁপা অক্ষরে লেখা চিঠিখানা। ওটা পড়ে বাপ্পা ঠিক বুঝতে পারল না। তাঁর মতো মানুষ হঠাৎ কিসের জন্যে এত ভীত হয়ে পড়লেন? চিঠিটার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। চিঠির মাথায় আর শেষে দু-জায়গায় দুটি ক্রুস চিহ্ন।

বাপ্পা এতে অবাক হয়নি। কেননা, কলকাতায় হ্যারিকাকুর বাড়িতেও এই ক্রুসচিহ্ন

দেখেছিল। দেওয়ালে, টেবিলে, এমনকি মাথার কাছেও ক্রুস। তিনি যে খুব ধার্মিক প্রকৃতির, যিশুর ওপর তাঁর যে পরম নির্ভরতা বাপ্পা ছেলেমানুষ হলেও তা বুঝতে পারত। আর তাঁর এই ভক্তি যে মোটেই লোকদেখানো নয়, আন্তরিক, সেটা বলে দেবার অপেক্ষা রাখত না। আর সে কারণেই বাপ্পা, রঞ্জু তাঁকে ভক্তি করত।

তবে হ্যারিকাকুর ওপর বাপ্পাদের যে আকর্ষণ তা কিন্তু মোটেই তাঁর ধর্মপ্রাণতার জন্যে নয়, অন্য কারণ ছিল।

তাহলে সব ব্যাপারটা খুলে বলা যাক।—

হ্যারিকাকুর ভালো নাম হ্যারোল্ড ইভেন্স। থাকতেন কলকাতার ইলিয়ট রোডের একটা অপরিস্ফুট গলিতে।

বাপ্পা মাঝে মাঝেই দেশের বাড়ি থেকে কলকাতায় তার বন্ধু রঞ্জুর বাড়ি বেড়াতে আসত। ওদের বেশ বড়োসড়ো একটা লাইব্রেরি আছে। সেখানে বিদেশী গোয়েন্দা কিংবা অলৌকিক কাহিনির নানা বই। এইসব বই পড়ার লোভেই বাপ্পা ছুটিছটায় কিছুদিন কলকাতায় এসে থেকে যেত।

রঞ্জুই ওকে হ্যারিকাকুর কথা বলেছিল।

একদিন নিয়ে যাব। দেখবি কী অদ্ভুত মানুষ!

‘ভূত’ আর ‘অদ্ভুত’ এই দুটি জিনিসের ওপর মানুষের চিরদিনের আগ্রহ। বাপ্পার মতো একজন স্পিরিটেড ছেলের অ্যাডভেঞ্চারে তো আকর্ষণ থাকবেই।

তারপর একদিন রঞ্জু বাপ্পাকে নিয়ে এল হ্যারিকাকুর ইলিয়ট রোডের বাড়িতে।

বাড়িটা কিন্তু ইলিয়ট রোডের ওপরে নয়, একটা সরু গলির মধ্যে। গলিটাও নোংরা। সেখানে কোনো ভদ্র অভিজাত মানুষ বাস করতে পারে না।

যে বাড়িটার সামনে এসে ওরা দাঁড়াল সেটা একটা তিনতলা বাড়ি। ইটগুলো যেন ছাল-চামড়া ছাড়ানো কঙ্কালের মতো হাসছে।

রঞ্জু আর বাপ্পা ভেতরে ঢুকল। একতলার ঘরগুলো গুদামঘর। চুনের গন্ধ।

দোতলায় উঠে এল। এখানে কয়েক ঘর ভাড়াটে আছে। বাপ্পা এক নজর দেখে নিল। তিনতলায় উঠতে উঠতে বলল, ভাড়াটেরা সবাই বোধহয় পুরুষ মানুষ। অন্তত যাকে বলে গেরস্ত তা নয়।

রঞ্জু বলল, কি করে বুঝলি?

প্রথমত, ঘরগুলোয় লোকে বাস করে কিন্তু দরজার সামনে জঞ্জাল জমে রয়েছে। ঝাঁট পড়ে না। মেয়েরা থাকলে এরকম হতো না। দ্বিতীয়ত, বারান্দার তারে প্যান্ট, শার্ট লুঙ্গি, পা-জামা শুকোচ্ছে, কিন্তু কোনো শাড়ি, ব্লাউজ বা ছোটোদের জামাপ্যান্ট নেই।

রঞ্জু কিছু বলল না।

সিঁড়ি অন্ধকার। কোথায় পা ফেলছে বাপ্পা নিজেও তা জানে না। শুধু অন্ধের মতো রঞ্জুর পিছু পিছু উঠছিল।

অবশেষে তিনতলায় এসে হ্যারিকাকুর ঘর।

পাশাপাশি দুটো দরজা। দুটি দরজাই ভেতর থেকে বন্ধ। রঞ্জু যে দরজাটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল তার গায়ে মস্ত ক্রুস আঁকা।

রঞ্জু আস্তে আস্তে কড়া নাড়ল। সাড়া পাওয়া গেল না। আবার কড়া নাড়ল।

জায়গাটা কিরকম লাগছে? রঞ্জু হেসে জিজ্ঞেস করল।

কলকাতা শহরে এখনও এমন জায়গা তা হলে আছে? এ তো রীতিমতো ক্রিমিনালদের লুকিয়ে থাকার জায়গা!

এরকম জায়গা আরো আছে।

বাগ্মা কী বলতে যাচ্ছিল এমনি সময়ে দরজা খুলে গেল।

দরজার সামনে যিনি এসে দাঁড়ালেন, পরনে তাঁর ছিটের পাজামা, গায়ে ঢিলে ফতুয়া। মাথার চুল পাকা, ছোটো করে কাটা। রঙ ফ্যাকাশে, চোখ কটা। হাড় বের করা শীর্ণ শরীর। দু'গাল বসে হনু দুটোকে ওপর দিকে ঠেলে দিয়েছে। গলায় একটা রূপোর ত্রুস।

তিনি বাগ্মার দিকে তাকিয়ে রঞ্জুকে বললেন, কী খবর রবিনসন? ভেতরে এসো।

এ বয়েসেও বেশ গমগমে গলা। কিন্তু কেউ এলে যে মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে—বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মুখে সে হাসির চিহ্নটুকু নেই। প্রথম দর্শনেই বাগ্মার মনে হয়েছিল ভদ্রলোক হাসতে জানেন না। আর—যে মানুষ হাসে না, তার চরিত্রও বড়ো জটিল।

ভেতরে ঢুকে রঞ্জু বললে, হ্যারিকাকু, এ আমার বন্ধু বাগ্মা। বর্ধমান জেলার একটা গ্রামে থাকে। কলকাতায় মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসে। ভালো ডিটেকটিভের মতো অনেক কটা চোর-ডাকাত ধরে দিয়ে নাম করেছে।

হ্যারিকাকু চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন, বটে! বটে! ইয়ং ডিটেকটিভ! কিন্তু ব্রাদার, আমার এখানে তো চোর-ডাকাতের কেস পাবে না। তবে দোতলায় কয়েকটা পকেটমার আর একতলায় দুটো চোরাকারবারি আছে—নগণ্য—তাদের নিয়ে কি চলবে? বলে চোখ ট্যারা করে রঞ্জুর দিকে তাকালেন।

রঞ্জু হেসে বলল, ওসব নয়। ওকে এনেছি আপনার কাছ থেকে গল্প শোনবার জন্যে। ও ভূতটুত একেবারে মানে না। কিন্তু আপনি আমায় যেসব অলৌকিক গল্প বলেছেন—বিশেষ করে পার্ক স্ট্রিটের বেরিয়াল গ্রাউন্ডের কাছে—আপনার নিজের দেখা—ওকে একবার শুনিয়ে দিন তো।

এ কথায় হঠাৎ কেন যে তিনি এত গম্ভীর হয়ে গেলেন তা বোঝা গেল না।

গম্ভীর হয়েই তিনি খোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলেন। সামনে যে দুটি কিশোর বসে আছে সে খেয়ালও বুঝি নেই।

বাগ্মার মনে হলো তাকে যেন হ্যারিকাকুর পছন্দ হয়নি। তার আর থাকতে ইচ্ছে করছিল না। ওঠার জন্যে উসখুস করছিল, এমনি সময় হ্যারিকাকু উঠে পর্দা সরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে গেলেন।

বাগ্মা তাকাল রঞ্জুর দিকে। রঞ্জু ঠোট ওন্টাল। অর্থাৎ সেও ঠিক বুঝতে পারছে না হ্যারিকাকুর আচরণটা ঠিক কিরকম।

বাগ্মা এবার ঘরটা দেখল। চৌকো, ছোট ঘর। একজন মানুষেরই উপযুক্ত। সে আমলের সাহেবদের বাড়ির জানলার মতো গরাদহীন জানলা। রঙওঠা নীল রঙের পর্দা জানলায়। সেই জানলার দিকে পিছন করে হ্যারিকাকু বসে থাকেন কুশনআঁটা চেয়ারে। চেয়ারের সামনে বহু পুরনো একটা টেবিল। টেবিলে দোয়াতদানি, কলম, খুব মোটা একটা ফাউন্টেন পেন, একটা মোষের শিঙের পিঠ চুলকোবার ছড়ি। হিজিবিজি কাটা কিছু পেপার-ওয়েট চাপা কাগজ। আর পুরনো হলেও খুব সুন্দর কাজ করা একটা ফ্লাওয়ার ভাস। তাতে একটা লাল গোলাপ।

ঘরের একপাশে একটা ক্যাম্প খাট। তাতে রানী রঙের ময়লা চাদর, আর দুটো বালিশ।

ওরা কোনোরকমে বসেছিল ক্যাম্প খাটটায় পা ঝুলিয়ে। ঘরে আর কোনো বসার জায়গা নেই।

বাগ্নার চোখ পড়ল সামনে দেওয়ালে। একটা সাদা কাগজে বড়ো বড়ো করে লেখা, Be one with Him : তাঁর সঙ্গে একাত্ম হও।

তোর হ্যারিকাকু কি করে রে?

ঠিক জানি না। তবে আগে চার্চে পিয়ানো বাজাতেন বলে শুনেছি।

ঘরটা অপরিচ্ছন্ন। দেওয়ালে যিশুখ্রিস্টের ক্রুসবিদ্ধ ছবি, পাশেই কাঠের একটা ক্রুস ঝুলছে। আর ওদিকের দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো মস্ত একটা জাহাজের ছবি। জাহাজটা উত্তাল সমুদ্রে ভাসছে।

এরকম জাহাজের ছবি দেখা যায় না। বাগ্না উঠে ছবিটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। রঞ্জুদের লাইব্রেরিতে একটা ইংরেজি ম্যাগাজিনে এইরকম জাহাজের ছবি দেখেছিল। স্টিমচালিত প্রথম যুগের জাহাজ। চিমনি থেকে গলগল করে ধোঁওয়া বেরোচ্ছে। এইরকম একটা পোকায় কাটা পুরনো যুগের জাহাজের ছবি বাইরের ঘরে টাঙিয়ে রাখার কারণ কী?

বাগ্না নিজের মনেই হাসল। বড্ড বেশি অকারণ কৌতূহল। পুরনো কালের ছবি তো অনেক শিল্পরসিকই পছন্দ করে। তবে?

পরক্ষণেই মনে হলো, হ্যারিকাকুকে প্রথম দর্শনে যা মনে হয় তাতে তিনি যে একজন যথার্থ শিল্পরসিক তা ভাবা যায় না।

তাহলে?

এমনি সময়ে পাশের ঘরে চটির ফটাস ফটাস শব্দ। বাগ্না তাড়াতাড়ি তার জায়গায় এসে বসল।

হ্যারিকাকু দু'হাতে দু'কাপ কফি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। প্লেটও জোটেনি। টেবিলের ওপর কাপ দুটো রেখে বললেন, খেয়ে নাও। আমি একটু বেরোব। বলেই তিনি আবার পর্দার আড়ালে চলে গেলেন।

নিঃশব্দেই দুজনে কফি খেয়ে নিল। বাগ্না কফি খেয়েই উঠে দাঁড়াল।

নে ওঠ।

দাঁড়া, উনি আসুন।

কিন্তু বাগ্নার আর তর সইছিল না। এখান থেকে চলে যেতে পারলেই বাঁচে।

এমনি সময়ে হ্যারিকাকু একটা কালো প্যান্ট, আধময়লা আস্তিন গোটানো শার্ট আর মাথায় হ্যাট চাপিয়ে বেরিয়ে এলেন। হাতে একটি ছড়ি।

তোমরা উঠছ? ঠিক আছে। আর একদিন এসো।

হ্যারিকাকুর এইটুকু সৌজন্যেই বোধহয় ওরা দুজনে কৃতার্থ হয়ে গেল।

ঘর থেকে ওরা বেরোতেই হ্যারিকাকু দরজা বন্ধ করে দিলেন।

রাস্তায় নেমে রঞ্জু বলল, আমার খুব খারাপ লাগছে রে। তোর সঙ্গে কাকু মোটেই ভালো ব্যবহার করলেন না।

বাগ্না কোনো উত্তর না দিয়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগল।

তুই বোধহয় আর কখনো এখানে আসবি না!

বাগ্না হাসল এবার। বলল, কেন আসব না? আসতেই হবে। তোর হ্যারিকাকুকে খুব ইনটারেস্টিং লেগেছে।

॥ দুই ॥

### বাপ্পার গোয়েন্দাগিরি

ওরা হাঁটছিল ইলিয়ট রোড ধরে ওয়েলেসলির দিকে। রাস্তাটা মহাত্মা গান্ধী রোড কিংবা আচার্য জগদীশচন্দ্র রোডের মতো চওড়া নয়। অপেক্ষাকৃত সরু। মাঝখানে ট্রাম লাইন। বাপ্পা দু'পাশের বাড়িঘর দেখতে দেখতে যাচ্ছিল। কলকাতায় ও কম এসেছে। এদিকে কখনো আসেনি।

এখানকার বেশির ভাগ বাড়িই দেখছি পুরনো। আর একটু অন্য ধরনের।

রঞ্জু বলল, এ অঞ্চলটাই খুব পুরনো। আর এখানে বেশির ভাগই থাকত যাঁদের বলা হয় ফিরিঙ্গি। অর্থাৎ খাস ইউরোপীয়ান নয়। এই বাড়িগুলো সাহেবী কায়দার।

বাপ্পা চলতে চলতেই বলল, এখানে এলে মনেই হয় না কলকাতায় রয়েছি।

রঞ্জু হেসে বলল, কী মনে হয়?

মনে হয় যেন একশো বছর আগের পথ ধরে হাঁটছি, যে পথের দু'ধারে শুধু সেইসব নিম্নমধ্যবিত্তদের বাস, যারা পুরো ইউরোপীয়, না ভারতীয়, যাদের সাহেবী স্টাইলে থাকার সাধ কিন্তু সাধ্য ছিল না। এর পর যখন কলকাতায় আসব তখন তোর সঙ্গে চৌরঙ্গীটা ভালো করে ঘুরবো।

হঠাৎ রঞ্জু বলে উঠল, দ্যাখ, দ্যাখ হ্যারিকাকু।

বাপ্পা দেখল ওদিকের ফুটপাথ দিয়ে হ্যারিকাকু ছড়ি হাতে ধীরে ধীরে হাঁটছেন। তিনিও ওয়েলেসলির দিকে চলেছেন।

দাঁড়া ডাকি। বলে ডাকবার আগেই বাপ্পা ওর হাত চেপে ধরল।

না, ডাকিস না। তার চেয়ে চ দূর থেকে ওঁর পিছু পিছু যাই।

কেন? রঞ্জু একটু অবাক হলো।

বাপ্পা হেসে বলল, ওঁকে একটু চমকে দেব।

রঞ্জু একটু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তোর মতলবটা কি বল দিকি? তোকে তো অনেক দিন থেকেই চিনি। কোনো রহস্যের গন্ধটুক—

বাপ্পা হেসে ওর পিঠ চাপড়ে বলল, পাগল নাকি! একে বুড়ো, তার ওপর কলকাতার মানুষ, তা ছাড়া ভালো করে আলাপই জমল না, ওঁর মধ্যে রহস্য খুঁজে পাব কি করে? নে জোরে হাঁট। ঐ যাঃ! কোথায় হারিয়ে গেলেন?

রঞ্জু আঙুল তুলে বলল, ঐ তো ঐ ঝাঁকাওয়ালা পিছনে।

দুজনে ফুটপাথ ক্রস করে একেবারে হ্যারিকাকুর পিছনে এসে পড়ল।

আরও মিনিট দশেক চলার পর হ্যারিকাকু ওয়েলেসলির মোড়ে যেখানে ফুটপাথে একজন মুসলমান পুরনো বই বিক্রি করছিল সেখানে এসে থামলেন।

হ্যারিকাকুকে দেখে বইওলা বলল, না সাহেব, বইটা এখনো আসেনি।

হ্যারিকাকু যেন একটু হতাশ হলেন। হ্যাটটা খুলে রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন।—সত্যি করে বলো তো ইসমাইল, বইটা পাওয়া যাবে তো?

ইসমাইল বলল, আমি তো মুন্সায়েরে খোঁজ করেছি। ওরা তো বলেছে, সামনের লটে যে সমস্ত বই আসবে তার মধ্যে আপনার বইটা থাকবে।

ওরা বইটার নাম করে বলেছে তো, না আন্দাজে?

ইসমাইল বলল, আপনি তো লিখে দিয়েছিলেন। সেই 'সিলিপটাই পাঠিয়ে দিয়েছি। বলছে কায়রোতে ছাপা অত পুরনো বই পাওয়া কঠিন। তবু খোঁজ পেয়েছে।

হারিকাকু যেন এক বিন্দু আশার আলো দেখলেন। বললেন, তোমায় তো বইটার জন্যে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করেছি, আর কিছু দেব?

দরকার হবে না।

হারিকাকু বললেন, বইটা আমার খুব তাড়াতাড়ি দরকার। বয়েস হয়ে গেছে। কোন দিন মরে যাব—কিংবা রোগে পড়ে থাকব। তাহলে আর আক্ষেপের শেষ থাকবে না।

ইসমাইল বলল, বইটা পেলে আমি আপনার বাসায় দিয়ে আসব।

থ্যাঙ্ক ইউ ইসমাইল। বলে উনি ফিরলেন। আর তখুনি বাপ্পা রঞ্জুর হাতটা টেনে নিয়ে স্যাঁৎ করে একপাশে সরে গেল।

হারিকাকু বেশ কিছুদূর চলে গেলে রঞ্জু বলল, এত দূর ওঁর পিছু পিছু এসে কিছু লাভ হলো?

বাপ্পা হেসে বলল, হলো বৈকি!

কীরকম?

ঘরে একখানি বইয়ের চিহ্নও নেই, তবু বিশেষ একখানি বইয়ের জন্যে তিনি পাগল হয়ে উঠেছিলেন। কী এমন সেই বই? ঘরের চারদিকে ত্রুস চিহ্ন। খুব বড়ো পাদ্রীর ঘরেও এত ত্রুসের ছড়াছড়ি থাকে না। পুরনো চিত্রকলায় টেস্ট আছে বলে মনে হয় না, তবু তাঁরই ঘরের দেওয়ালে পুরনো কালের জাহাজের ছবি!

একটু থেমে বলল, তুই বলেছিলি হারিকাকু বড়ো অভুত মানুষ। এখন মনে হচ্ছে উনি শুধু অভুতই নন, রহস্যময়ও বটে।

## ॥ তিন ॥

### সে কালের জাহাজের ছবিটা কেমন

এক মাস পর।

তখন সন্ধ্যা হয়নি। সন্ধ্যা গলি আর ঘেঁষাঘেঁষি চাপা বাড়ি বলেই বোধহয় অন্ধকার হয়ে এসেছিল। বাপ্পা আর রঞ্জু বসেছিল ক্যাম্প-খাটে। আর চেয়ারে বসেছিলেন হারিকাকু।

বাপ্পার ইচ্ছে ছিল না এইরকম অবেলায় হারিকাকুর কাছে আসার। সে মফঃস্বলের ছেলে। কলকাতার রাস্তাগুলো চেনে না। তাই সন্ধ্যা হয়ে গেলেই বাপ্পার অস্বস্তি হয়, যদি পথ হারিয়ে ফেলে। ভরসা—সন্ধ্যা রঞ্জু আছে। সে কলকাতার ছেলে, বড়ো হয়েছে, অনেক রাস্তাই চেনে। ও-ই বলল, হারিকাকুর কাছে গল্প শুনতে হলে সন্ধ্যাবেলাই ঠিক সময়। নইলে কটকটে রোদে ওঁর গল্প শুনে আরাম হয় না।

হারিকাকুর ছিনে লম্বা গলা থেকে হর্ন বাজার মতো কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কি জানতে চাও বলো।

বাপ্পার দিকে তাকিয়েই তিনি যেন কথাগুলো ছুড়ে মারলেন।

রঞ্জু তাড়াতাড়ি বলল, ও কিছু জানতে চায় না হারিকাকু। ওকে এনেছি আপনার কথা শোনার জন্যে।

হারিকাকু গম্ভীরভাবে বললেন, না, রবিনসন, আমায় নিয়ে ওর খুব কৌতূহল।

রঞ্জকে রবিনসন বলে ডাকতে বাপ্পা দু'বার শুনল।

হ্যাঁ, আমায় নিয়ে ওর খুব কৌতূহল। তাই আগে ওর কৌতূহল মেটাতে চাই। বলো ইয়ং ডিটেকটিভ, কী জানতে চাও?

বাপ্পা অবাক হলো। সত্যিই যে ওঁর ওপরে তার একটু বিশেষ কৌতূহল আছে, মাত্র প্রথম দিনের মিনিট পনেরো দেখাতেই কি করে উনি বুঝলেন!

যাই হোক, সে কথা চেপে গিয়ে বাপ্পা বলল, ঐ জাহাজের ছবিটা আপনি টাঙিয়ে রেখেছেন কেন?

এটা কি একটা বুদ্ধিমান ছেলের প্রশ্ন হলো? হ্যারিকাকু যেন বিরক্ত হয়েই বললেন। ছবিটা ছিল। ফেলে না দিয়ে টাঙিয়ে রেখেছি। What's wrong?

বাপ্পা বুঝল হ্যারিকাকুর মেজাজটা খিঁচড়ে আছে—বোধহয় তার ওপরেই। তবু ঘাবড়ে না গিয়ে বলল, তা নয়। আসলে জাহাজটা সেই যুগের যখন স্টিমের জাহাজ প্রথম চালু হয়। সেই জাহাজের ছবি—

হ্যারিকাকুর কাঁচা-পাকা ভুরু দুটো কাছাকাছি হলো। তিনি একটু অবাক হলেন। বললেন, ছবিটা দেখে বুঝলে কী করে যে এটা প্রথম যুগের জাহাজ?

রঞ্জদের লাইব্রেরিতে একটা ইংরেজি ম্যাগাজিনে এইরকম কিছু ছবি দেখেছিলাম।

I see.

একটু থেমে বললেন, হ্যাঁ, এটা সেই সময়েরই ছবি।

এ ছবিটা আপনি পেলেন কি করে? এ কি কিনতে পাওয়া যায়? আর কেনই বা এটা যত্ন করে বাইরের ঘরে টাঙিয়ে রেখেছেন?

হ্যারিকাকু কিছুক্ষণ চুপ করে কী ভাবলেন। তারপর বললেন, না, এ ছবি কিনতে পাওয়া যায় না। অন্তত আমার চোখে পড়েনি। ছবিটা একটা পুরনো কাঠের বাক্সে পেয়েছি। সম্ভবত আমার ঠাকুর্দা রেখেছিলেন।

কিন্তু এটা টাঙিয়ে রেখেছেন কেন?

বাঃ! ঠাকুর্দার আমলের ছবি। ফেলে দেব?

বাপ্পা চুপ করে রইল।

আর কিছু জিজ্ঞেস করার আছে?

আপনি কি এখানে একাই থাকেন?

শুধু এখানে বলে নয়। ইহজগতে আমার কেউ নেই একমাত্র যিশু ছাড়া।

এই পুরনো ভাঙাচোরা বাড়িতে আপনি কতদিন আছেন?

বহুদিন।

এ বাড়িতে থাকতে আপনার ভালো লাগে?

ভালো লাগা-না-লাগা বুঝি না। অভ্যস্ত হয়ে গেছি। অসুবিধে হয় না।

কিন্তু এ বাড়িতে থাকা তো risky. ভূমিকম্প হলে—

কী আর করা যাবে!

অন্য কোথাও—

অসম্ভব। কোথায় বাড়ি পাব? অত টাকাই বা কোথায়? তা ছাড়া পাঁচজনের সঙ্গে থাকা আমার অভ্যেস নয়।

বাপ্পা তৎক্ষণাৎ বলল, সেইজন্যই বোধহয় আপনার ঘরে ঐ একখানি চেয়ার ছাড়া আর কোনো চেয়ার নেই? লোক-আসা আপনি পছন্দ করেন না?



বাণ্মার এই ধরনের প্রশ্ন রঞ্জুর মোটেই ভালো লাগছিল না। তার মনে হচ্ছিল, বাণ্মা যেন পুলিশের মতো জেরা করছে। ও তো হ্যারিকাকুকে চেনে না। এখুনি যদি রেগে যান তাহলে আর কোনোদিন তাদের মুখদর্শন করবেন না।

রঞ্জু তাই লুকিয়ে বাণ্মাকে চিমটি কেটে থামতে ইঙ্গিত করল। কিন্তু বাণ্মা গ্রাহ্যই করল না।

হ্যারিকাকু, আমার কেমন মনে হয় আপনি খুব ডিস্টার্বড। কিছু যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন— এমন কিছু যা সহজে পাওয়া যায় না। তাই কি?

এ কথায় হ্যারিকাকু খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, সেটা আমার খুব পার্সোনাল ব্যাপার। কাউকেই বলব নয়—তোমাদের মতো বাচ্চাদের তো নয়ই।

ঠিক আছে। জানতে চাই না। আমি শুধু আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব। যদি অনুমতি দেন—

বলো।

আপনার ওপর আমার যে সত্যিই কৌতূহল আছে, মাত্র একদিন দেখে আপনি কী করে বুঝলেন?

এ কথায়, বর্ষার থমথমে মেঘের মধ্যে হঠাৎ যেমন এক চিলতে রোদ ঝিলিক দিয়ে যায়, হ্যারিকাকুর থমথমে মুখে তেমনি এক ফালি হাসি ফুটল। বললেন, তোমার চোখ দেখে। প্রথম দিনই তুমি আমায় খুব লক্ষ্য করেছিলে। আমার ওপর তোমার এতদূর কৌতূহল যে আমায় ফলো পর্যন্ত করেছিলে। তাই না?

হ্যারিকাকুর এ কথা শুনে দুজনেই চমকে উঠল। আশ্চর্য! এই বয়েসেও হ্যারিকাকু এত সতর্ক।

হ্যারিকাকু গম্ভীরভাবে বললেন, এরপর নিশ্চয়ই জানতে চাইবে কোন বইটার খোঁজ করছিলাম?

বাণ্মা বলল, জানতে ইচ্ছে করে। তবু না জানলেও ক্ষতি নেই। বইটা দুঃপ্রাপ্য, পুরনো। নিশ্চয়ই তাতে এমন কোনো তথ্য আছে যা জানার জন্যে আপনি যে কোনো দাম দিতে চান। কী সেই তথ্য? আমার মনে হয় ঐ জাহাজের সঙ্গে সেই তথ্যের কোনো সম্পর্ক আছে। আর সেটা যে কোনো গুপ্তধন উদ্ধারের ব্যাপার সেটা বুঝতে পারি—আপনার ঘরে এই যে এত ক্রুস রয়েছে তাই দেখে। আপনি চারদিকে ক্রুস এঁকে যেন কোনো বিশেষ ভয় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চাইছেন!

শুনতে শুনতে হ্যারিকাকুর মুখটা ফাঁক হয়ে গেল। তিনি মুগ্ধ হয়ে বললেন, তোমার বুদ্ধি, সূক্ষ্ম দৃষ্টি, অনুমান করার শক্তি দেখে আমি মুগ্ধ হচ্ছি। তুমি যা বলেছ তা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট।

একটু থেমে বললেন, তুমি যখন এতদূর জেনে ফেলেছ, তখন যে ঘটনার জন্যে আমি সত্যি সত্যিই ডিস্টার্বড—যার রহস্য সন্ধানের জন্যে আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি—যে ঘটনা কাউকে বলার নয়, তাই আজ তোমাদের বলব। ঘটনাটা শুনতে শুনতে একটু রাত হলে তোমাদের অসুবিধে নেই তো?

দুজনেই বলে উঠল, না, কোনো অসুবিধে নেই।

ঘটনাটা ঘটেছিল বহুকাল আগে। কলকাতাতে তো নয়ই—বহু দূরে—ভারতবর্ষের বাইরে। কিন্তু তার জের বোধহয় এখনো মেটেনি। হয়তো আমিই নির্বোধের মতো জের টেনে চলেছি। দাঁড়াও। আগে একটু কফি করে আনি।

বলে হ্যারিকাকু টেবিল ধরে উঠে দাঁড়িয়ে পর্দা সরিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

॥ চার ॥

## অশরীরী দানবের হানা

কফি খেতে খেতে হ্যারিকাকু তাঁর কাহিনি শুরু করলেন। সে কাহিনি এইরকম :

১৮৪৪ সালে ইন্ডিয়া থেকে ইংলন্ডে যাবার প্রথম জাহাজ চালায় P & O কোম্পানি। তখন ইংলন্ডে যেতে হলে কলকাতা থেকে মাদ্রাজ ও সিংহল হয়ে লোহিত সাগরের ভেতর দিয়ে সুয়েজ। সুয়েজ থেকে স্থলপথে মরুভূমি পার হয়ে কায়রো। নীলনদ দিয়ে স্টিমারে চড়ে আলেকজান্দ্রিয়া। তারপর মান্চা, নেপলস, রোম, ফ্লোরেন্স, ভেনিস, জার্মানির বিভিন্ন শহর পার হয়ে ইংলিশ চ্যানেল ক্রস করে লন্ডন।

ক'বছর পর কলকাতা থেকে ঐ P & O কোম্পানির জাহাজ 'বেন্টিঙ্ক' ছাড়ল। আকারে বড়ো হলেও জাহাজটায় অব্যবস্থার চূড়ান্ত। মোটামুটি আশিজন যাত্রী ধরে। মাত্র ছ'টি কেবিন। এ কেবিন ক'টি ছাড়া আর যে সমস্ত জায়গায় থাকার ব্যবস্থা ছিল তা বসবাসের অযোগ্য। সব যেন ইঁদুরের গর্ত। যেমনি সংকীর্ণ, তেমনি নোংরা। আলো, বাতাসের বালাই নেই। এই যাত্রীদের বেশির ভাগকেই ডেকে সারাদিন সারারাত্রি কাটাতে হতো।

সেদিনও রাত্রে একদল যাত্রী পাশাপাশি ডেকে শুয়েছে। জাহাজটা তখন ইন্ডিয়ান ওশেন ছাড়িয়ে সবে লোহিত সাগরে ঢুকেছে। জাহাজের ডেকে বাতাস খুব। কিন্তু বাতাসটা যেন বেশ ভারী আর গরম।

ডেকের যাত্রীরা তবুও বেশ আরাম করেই ঘুমোচ্ছিল, মাঝরাতে হঠাৎ উঠল দারুণ ঝড়। যে ঝড়ের কোনো পূর্বাভাস ছিল না। যাত্রীরা ডেক থেকে ছুটে যে যেখানে পারল ইঁদুরের গর্তে ঢুকে পড়ল।

ঝড় বেশিক্ষণ থাকেনি। ভোর হলো। নীল সমুদ্রের বুক থেকে লাফিয়ে উঠল নতুন দিনের লাল সূর্য। সবাই খুশি মনে প্রাতঃকালীন চা নিয়ে বসল। কেউ খেয়াল করল না—যারা ডেকে শুয়েছিল তাদের মধ্যে একজন নেই।

খেয়াল যখন হলো তখন বেলা দুপুর। খাবার টেবিলে দেখা গেল একটা মিল বেশি হচ্ছে। অর্থাৎ একজন প্যাসেঞ্জার নেই।

রেজিস্টার হাতে নিয়ে কাপ্টেন সবাইকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে নাম ডাকলেন। সবাই সাড়া দিল। দিল না শুধু একজন।

সেই একজন কোথায় গেল? সে তো গভীর সমুদ্রে নেমে বেড়াতে যেতে পারে না। মজা করে লুকোচুরিও খেলবে না।

তাহলে?

কাপ্টেন হুকুম দিলেন জাহাজের অলিগলি, ফাঁক-ফোঁকর সব খুঁজে দেখতে। বলা যায় না যদি কোথাও অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকে।

কিন্তু না—কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। এক অজানা ভয়ে যাত্রীদের বুক দুকদুক করে উঠল।

এই পর্যন্ত বলে হ্যারিকাকু থামলেন। কেমন যেন একটু অনামনস্ক হয়ে গেলেন। উঠে গিয়ে জানলার পর্দাটা সরিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। তখন বেশ রাত হয়েছে। উঁচু উঁচু বাড়িতে আলো জ্বলছে। রাস্তাতেও আলো ঝলমল করছে। কেমন একটা গুমোট ভাব। তিনি যেন একটু চিন্তিত মুখে আবার চেয়ারে এসে বসলেন।

তারপর? উৎসুক আগ্রহে বাপ্পা জিজ্ঞেস করল।

হারিকাকু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, লোকটিকে যখন কোথাও পাওয়া গেল না তখন সিদ্ধান্ত হলো, নিশ্চয় ঝড়ের সময় অন্ধকারে তাড়াতাড়ি উঠে আসতে গিয়ে জলে পড়ে গিয়েছে।

কথাটা সবাই মেনে না নিলেও বেশির ভাগ প্যাসেঞ্জারই বলল, তাই হবে। যা ঝড় উঠেছিল মনে হচ্ছিল সবাইকে বুঝি সমুদ্রে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

জাহাজ লোহিত সাগর দিয়ে ক্রমেই সুয়েজের দিকে বিকবিক করে এগোচ্ছে। পরের দিনও, রাত্রে ঠিক একই সময়ে ঝড় উঠল। সবাই হুড়মুড় করে ভেতরে গিয়ে ঢুকল। তারপর সকালে দেখা গেল আর একজন নেই।

দ্বিতীয় জনটিও কি ঝড়ের সময়ে ডেক থেকে পড়ে গেছে? তা কী করে সম্ভব? বিশেষ করে যখন সকলেরই আগের দিনের অ্যাকসিডেন্টের কথা মনে আছে!

এবার সবাই রীতিমতো আতঙ্কিত। সবাই কাপ্তেনকে ঘিরে ধরল, এটা কী হচ্ছে?

কাপ্তেন আর কি করবেন? তিনি নিজেও খুব চিন্তিত। বললেন, আমিও তো আপনাদের সঙ্গেই রয়েছি। আপনাদের মতোই বিভ্রান্ত। তবু দেখছি—

জাহাজে একজন খুব সাহসী যুবক ছিলেন। নাম জোসেফ। জোসেফ ইভেন্স (নামটা শুনেই বাপ্পা একটু নড়েচড়ে বসল)। তিনি কাপ্তেনকে এসে গোপনে কয়েকটি কথা বললেন। শুনে কাপ্তেনের দু-চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসার উপক্রম। বললেন, এ যে অসম্ভব কথা মিস্টার ইভেন্স!

জোসেফ ইভেন্স গভীরভাবে বললেন, না, অসম্ভব নয়। আমি কায়রো থেকে পাবলিশ করা একটা বইয়ে ঠিক এইরকম ব্যাপারের কথা পড়েছি। তা ছাড়া গত রাতে ঝড়ের সময় মুহূর্তের জন্যে আমার চোখেও কিছু অবিশ্বাস্য দৃশ্য ধরা পড়েছিল। সে বিষয়ে আমি এক্ষুনি নিশ্চিত করে কিছু বলছি না। আমারও ভুল হতে পারে। তবে আজ রাত্রেও যদি ঝড় ওঠে তাহলে আমি প্রস্তুত থাকব।

কাপ্তেন বললেন, মিস্টার ইভেন্স, আপনার এই সংসাহসের জন্যে ধন্যবাদ। আমিও সজাগ থাকব।

পরের দিন সকাল এল একটা বিমর্ষ দুর্ভাবনার বোঝা নিয়ে। আজও সকালে প্রভাতী চায়ের কাপ হাতে নিয়ে যাত্রীরা আলোচনা করতে লাগল গত রাত্রে কথ। কিছুতেই তারা ভেবে পায় না কী হতে পারে। শুধু জোসেফ ওদের মধ্যে থাকলেন না। তিনি ডেকের চারদিক ঘুরে দেখতে লাগলেন। এক সময়ে কাপ্তেন পাশে এসে দাঁড়ালেন। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, মিস্টার ইভেন্স, কি দেখছেন?

ইভেন্স বললেন, ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো চিহ্ন কোথাও আছে কিনা!

পেলেন কিছু?

না।

রাত্রি হলো।

যাত্রীরা কেউ আর ডেকে শুতে চায় না। অথচ ভেতরে যে শোবে সেরকম জায়গা নেই। তার ওপরে গরম। সারারাত ঘুম হবে না। অগত্যা তারা কেউ শ্রীহরির, কেউ আল্লার,

কেউ বুকে অদৃশ্য ক্রুস ঐকে ডেকেই শুলো। কিন্তু কিছুতেই দু-চোখের পাতা এক করতে পারছিল না।

তবু একসময়ে তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত তখন একটা বেজে চল্লিশ মিনিট। জোসেফ ইভেন্স ঠায় বসে আছেন তাঁর কেবিনে। ঝড়টা ওঠে রাত দুটো নাগাদ। তিনি ঐ সময় পর্যন্ত জেগে থাকবেনই। তাহলে আর কুড়ি মিনিট। তিনি কেবিনে বসে আছেন। লক্ষ তাঁর খোলা জানলা দিয়ে আকাশের দিকে। ওপরে অন্ধকার আকাশ, নিচে গাঢ় নীল জল। ইভেন্স আকাশের গায়ে তারা দেখে বুঝলেন, পরিষ্কার আকাশ। তাহলে বোধহয় আজ আর তেমন কিছু ঘটবে না।

দশ মিনিট পর তিনি দেখলেন আকাশের তারাগুলো অদৃশ্য হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি খাড়া হয়ে বসলেন। মেঘ করছে। তাহলে আজও ঝড় আসছে। অশ্চর্য! পরপর তিন দিন একই সময়ে ঝড়!

ভাবতে ভাবতেই গৌঁ গৌঁ করে একটা প্রচণ্ড ঝড়ের ধাক্কায় জাহাজটা দুলে উঠল। বড়ো বড়ো ঢেউ আছড়ে পড়ল জাহাজের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে ডেকের যাত্রীদের মধ্যে চিৎকার-চৈচামেচি, হটোপাটি। তারা ডেক ছেড়ে ভেতরে ছুটে আসছে।

মুহূর্তমাত্র দেরি না করি জোসেফ ইভেন্স কেবিন থেকে বেরিয়ে ডেকের দিকে ছুটলেন। এক হাতে তাঁর টর্চ, অন্য হাতে গুলিভরা পিস্তল।

তিনি ডেকের কাছে যেতেই আতঙ্কে দু-পা পিছিয়ে এলেন। দেখলেন সাদা চাদরের মতো কিছু একটা জড়ানো বিশাল একটা মূর্তি সমুদ্র থেকে উঠে বরফের মতো সাদা পা ডেকের উপর তুলেছে। দু'খানা তুষারঝরা হাত এগিয়ে আসছে একজন যাত্রীকে ধরার জন্যে।

সঙ্গে সঙ্গে ইভেন্স পরপর দুবার গুলি ছুড়লেন। কিন্তু কিছুই হলো না। ততক্ষণে হাতখানা প্রায় ধরে ফেলেছে যাত্রীটিকে। ইভেন্স টর্চ পিস্তল ফেলে দিয়ে মরিয়া হয়ে একেবারে মূর্তিটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মুহূর্তেই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল। একটা বিকট শব্দ করে সেই অশরীরী দানবটা শিকার ছেড়ে দিয়ে ডেক থেকে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে হারিয়ে গেল।

...হারিকাকু যখন দু-হাত তুলে ঘটনাটা উত্তেজিতভাবে বলে যাচ্ছিলেন তখন তাঁকে কিরকম যেন লাগছিল। মনে হচ্ছিল তিনি যেন আর ইহজগতের মানুষ নন, ঘটনাস্থলও কলকাতার ইলিয়ট রোড নয়—যেন প্রায় ১২৫ বছর আগের এক ভয়াবহ সমুদ্রযাত্রীর ঘটনাটা চোখের সামনে ঘটছে।

আর ঠিক তখনই ঘরের বাইরে একটা চাপা গর্জন, যেন প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ছুটে আসছে... ঝড় আছড়ে পড়ল কলকাতার বুকে। জানলার বাইরে একবার তাকালেন। আতঙ্ক জড়ানো স্বরে নিজের মনেই বলে উঠলেন, ঝড়!

বাগ্মা রঞ্জু দুজনেই অবাক হলো। ঝড় তো হতেই পারে। তার জন্যে এত ভয় পাবার কি থাকতে পারে? ততক্ষণে গৌঁ গৌঁ শব্দে ঝড় ঘরে ঢুকে পড়েছে। সব যেন চুরমার হয়ে যাবে। দেওয়ালে জাহাজের ছবিটা মাথা কুটছে। এই বুঝি পড়ে খানখান হয়ে যাবে।

হারিকাকু কোনোরকমে উঠে দাঁড়ালেন।

ও ঘরের জানলাটা, বলতে বলতে উনি পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

ঘরটায় সুইচ অফ করা ছিল। দু মিনিটও হয়নি, দড়াম করে একটা শব্দ—সঙ্গে সঙ্গে হারিকাকুর আর্ত চিৎকার, বাঁ-চা-ও।

ছুটে গেল বাগ্মা আর রঞ্জু। এ ঘরটা কিরকম তা এরা জানে না। সুইচবোর্ডটাও যে

কোথায় কে জানে। হাতে টর্চও নেই। কোথায় তিনি? অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু হ্যারিকাকুর আর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

বাগ্না চেষ্টায়ে উঠল, হ্যারিকাকু—আ-স্কে-ল—

হঠাৎই সেই অন্ধকারের মধ্যে কী যেন দেখল ওরা। একদলা সাদা কুয়াশা লম্বা হয়ে উঠছে...যেন কী একটা টানতে টানতে জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

রঞ্জু, টর্চটা—চেষ্টায়ে উঠল বাগ্না।

কিন্তু কোথায় টর্চ?

এমনি সময়ে বিদ্যুৎ চমকালো। সেই আলোয় সুইচবোর্ডটা দেখে নিয়ে রঞ্জু ছুটে গিয়ে আলো জ্বালিয়ে দিল। দেখল গরাদহীন জানলায় হ্যারিকাকুর দেহের অর্ধেকটা বুলছে। অচৈতন্য।

প্রায় এক ঘণ্টা পর হ্যারিকাকু একটু সুস্থ হলে ওরা দুজন যখন রাস্তায় নেমে এল তখন কলকাতার আলোকোজ্জ্বল রাজপথে ঝড়ের দাপটের আর কোনো চিহ্নমাত্র নেই। ট্রাম চলছে, বাস চলছে, ট্যাক্সি ছুটছে। অথচ এই কিছুক্ষণ আগে এই কলকাতার বুকেই যে অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটে গেল তা কেউ জানতে পারল না।

ব্যাপারটা ওরা বাড়িতে কাউকে বলল না। প্রথমত, কেউ বিশ্বাস করবে না। দ্বিতীয়ত, ঐসব জায়গায় সন্দের পর ছেলেমানুষদের যাওয়া রঞ্জুর বাবা মোটেই পছন্দ করেন না।

বাগ্না পরের দিনই দেশে ফিরে গেল। কলকাতায় প্রায় এক সপ্তাহ ছিল। আর থাকা যায় না। যাবার সময়ে আড়ালে রঞ্জুকে বলে গেল, ব্যাপারটা আমায় খুব ভাবিয়ে তুলেছে। আমি শিগগিরই আবার আসব। তখন আবার হ্যারিকাকুর ওখানে যাব। অনেক রহস্য আছে।

দু-পা গিয়ে ফিরে এসে বলল, হ্যাঁ, শোন এ নিয়ে কাউকে কিছু বলবি না। আর ভুলেও কখনো ওখানে একলা যাবি না।

॥ পাঁচ ॥

### হ্যারিকাকুর পূর্ব অভিজ্ঞতা

মাস তিনেক পরে এক রবিবার বেলা দশটা নাগাদ হ্যারিকাকুর বাড়িতে ওরা বসেছে। হ্যারিকাকু এখন বেশ সুস্থ। স্বাভাবিক। আজও উনিই বক্তা। সেদিনের ঘটনা সম্বন্ধে উনি বেশ খুশমেজাজেই বললেন, কী যে হলো আমি নিজেই তা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। ঝড় তো আগেও হয়েছে। কিন্তু এমন ভয় পাইনি কখনো। তারপর যখন ও ঘরে জানলা বন্ধ করতে গেলাম তখনই দেখলাম জানলার মধ্যে দিয়ে ঝড়ের সঙ্গে এক দলা কুয়াশার মতো কী যেন ঘরে ঢুকছে। সেই অন করবার আগেই হঠাৎ মনে হলো আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। তারপর আর কিছু মনে নেই। তোমরা ঘরে গিয়ে কী দেখলে?

রঞ্জু বেশ উত্তেজিতভাবেই কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাগ্না ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে বলল, আলো জ্বালতেই দেখলাম আপনি জানলার ধারে পড়ে রয়েছেন।

জানলার ধারে। হ্যারিকাকু চমকে উঠলেন।

হ্যাঁ।

কিন্তু আমি তো জ্ঞাতসারে ওদিকে যাইনি। বলে নিজেই ভাবতে লাগলেন। আর সেই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখটা যে কিরকম বুলে যাচ্ছিল বাগ্নার তা নজর এড়াল না। তবু তো বাগ্না বুদ্ধি করে জানলার বাইরে অর্ধেক দেহ বুলছিল বলেনি।

আচ্ছা, তোমরা আর কিছু দেখোনি?

সত্যি কথা বলার জন্যে রঞ্জুর মন ছোঁক ছোঁক করছিল। সে চকিতে একবার বাপ্পার দিকে তাকাল। বাপ্পা তাকে চোখের ইশারায় নিরস্ত করে বলল, কই না তো।

কিন্তু আমি কিছু একটা দেখেছিলাম। সাদা একটা কিছু—মানুষের মতো—

সে হয়তো আপনার চোখের ভুল।

হ্যারিকাকু অন্যমনস্কভাবে বললেন, কী জানি।

আচ্ছা হ্যারিকাকু, এর আগে এরকম আর কখনো ঘটেনি?

না।

ভালো করে মনে করে দেখুন তো!

হ্যারিকাকু চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লেন।

হ্যারিকাকু, হয় আপনি ভুলে যাচ্ছেন, নইলে ছেলেমানুষ বলে আমাদের কাছে বলতে চাইছেন না। কিন্তু কেন? আমরা তো আপনার কাছে গল্প শুনতেই এসেছি। আর সে গল্প যদি আপনার মতো বহুদর্শী মানুষের নিজের অভিজ্ঞতা হয় তাহলে তো কথাই নেই।

হ্যারিকাকু তবু মাথা নেড়েই যাচ্ছেন।

না হে, না। এরকম ঘটনা আর ঘটেনি।

কোনো অশরীরীর আবির্ভাব?

হ্যারিকাকু শুকনো গলায় বললেন, না-না-না।

যদি নাই হবে তাহলে ঘরের চারদিকে এত ক্রুসচিহ্ন কেন? কেউ তো শখ করে এত ক্রুস এঁকে ঘরের শোভা বাড়ায় না।

হঠাৎ হ্যারিকাকু যেন ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গেলেন। বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছে। কিছু একটা প্রায়ই ঘটে। আর তা অনেক দিন ধরেই।

কীরকম দয়া করে একটু বলুন না।

এই যেমন একা বসে আছি, মনে হলো কেউ যেন আমার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। এমনকি তার গরম নিশ্বাস পর্যন্ত টের পাচ্ছি। কিংবা বাথরুমে যাচ্ছি—মনে হলো কেউ যেন বাথরুম থেকে বেরিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠছি অন্যমনস্কভাবে—আমার মনে হলো আমার ঠিক আগে আগে খালি পায়ে কেউ উঠছে। বড়ো বড়ো পা—তুলোর মতো সাদা। এইরকম আর কি!

আপনার কি মনে হয় এই ঘরটাই haunted room, না শুধু আপনাকেই ভয় দেখানো? আমাকে—আমাকেই ভয় দেখানো।

কী করে বুঝলে?

আমি বুঝতে পারি।

কিন্তু কেন?

এবার হ্যারিকাকু কোনো উত্তর দিলেন না। হঠাৎ ওর ঠোট, হাত, গা তিরতির করে কাঁপতে লাগল।

আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে কাকু?

না, ঠিক আছি। তুমি একটু আগে জিজ্ঞেস করছিলে সেদিনের ঘটনার মতো ঘটনা আর কখনো ঘটেছিল কিনা। মনে পড়েছে। ঘটেছিল। তবে এরকম মারাত্মক নয়।

দয়া করে সে ব্যাপারটা বলুন না!

হ্যারিকাকু আবার কিছুক্ষণ অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন। তারপর বলতে লাগলেন, সে বেশ কিছুকাল আগের কথা। তখন আমি ছিলাম রডন স্ট্রিটের একটা বাড়িতে। আমার দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয় জানায় যে, তার কাছে অনেক পুরনো অব্যবহার্য জিনিস আছে, সেগুলো অল্প দামে বেচে দিতে চায়। আমি প্রথমে রাজি হইনি। তারপর সে যখন জানাল যে জিনিসগুলো আমারাই পূর্বপুরুষদের তখন জিনিসগুলো অন্তত দেখার ইচ্ছে হলো।

গেলাম তাদের বাড়ি। মস্তবড়ো পুরনো একটা কাঠের সিঁদুকে অনেক কিছুই ছিল। যেমন, কিছু বাসনকোসন, ফুলদানি, টেবিল-ল্যাম্প, একটা সেলাই মেশিন, এইরকম সব।

আমি কিছু নিলাম, অনেক কিছুই নিলাম না। যেটা সবচেয়ে পছন্দ হলো সেটা ঐ জাহাজের ছবিটা। আর একটা অমূল্য জিনিস পেলাম, সেটা একটা ডায়েরি। ডায়েরিটা আমার ঠাকুরদাদার বাবার। তাঁর নিজের হাতের লেখা। সেদিন তোমাদের যে জাহাজের ঘটনাটা বলেছিলাম সেটা ঐ ডায়েরি থেকে পাওয়া। সেই ডায়েরিতেই লেখা আছে ছবিটার কথা। এটা সেই জাহাজের ছবি যে জাহাজে একদিন আমার ঠাকুরদার বাবা সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন।

তিনিই বোধহয় জোসেফ ইভেন্স? বাপ্পা বলে উঠল।

হ্যাঁ, তাই। যাই হোক, সেই জাহাজের ছবি জেনে আমি ছবিটা ভালো করে বাঁধিয়ে রাখলাম।

একটু থামলেন হ্যারিকাকু। তারপর বললেন, প্রথম দিনই তুমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবিটার কথা জানতে চেয়েছিলে। ছেলমানুষের এত আগ্রহ দেখে অবাক হয়েছিলাম, বিরক্তও হয়েছিলাম। তাই এড়িয়ে গিয়েছিলাম।

চুরুটটা নিভে গিয়েছিল। হ্যারিকাকু কয়েকটা দেশলাইয়ের কাঠি ধ্বংস করে চুরুটটা আবার ধরালেন।

কিন্তু আঙ্কেল, আপনি যে বলেছিলেন কী দেখেছিলেন!—রঞ্জু অর্ধৈর্ষ্য হয়ে উঠল।

Don't worry my boy! ব্যস্ত হয়ে না। বলছি। গোড়া থেকে না বললে ঠিক বোঝা যায় না।

যাই হোক, ছবিটা এনে আমার বাইরের ঘরে টাঙিয়ে রেখেছিলাম। একদিন অচেনা এক মহিলা হঠাৎ এলেন কী একটা কাজে। ছবিটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বেশ ভালো টাকা দিয়ে ছবিটা কিনতে চাইলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ এইরকম একটা অতি সাধারণ জাহাজের ছবি কিনতে চাইছেন কেন?

মহিলাটি হেসে বললেন, এ ধরনের জাহাজের ছবি বড়ো একটা দেখা যায় না বলেই সংগ্রহ করতে চাই।

আমি তখন খুশি হয়ে তাঁকে জাহাজের গল্পটা বললাম। শুনে উনি এত দূর ভয় পেলেন যে আমার চোখের সামনেই তাঁর মুখটা সাদা হয়ে গেল।

আমি ওকে ভরসা দিয়ে বললাম, আপনি ঘটনাটা শুনে ভয় পাচ্ছেন, আর আমি ভাবছি যদি আমার প্রচুর টাকা থাকত তাহলে একবার জাহাজে করে সেই জায়গাটায় গিয়ে সেই সমুদ্র-দানবের বিষয় অনুসন্ধান করতাম।

অনুসন্ধান করতেন! মহিলাটি চমকে উঠলেন।

হ্যাঁ, করতাম। করতাম কেন, এখনো করছি এখানে বসেই। সত্যিই সেদিন কি ঘটেছিল, কেন ঘটেছিল, সেরকম ঘটনা সম্ভব কিনা এসব আমায় জানতেই হবে। জানতে পারলে আমি

আধুনিক জগতের মানুষের কাছে তা প্রচার করব।

মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু এখানে বসে কী করে আপনি অনুসন্ধান করবেন?

বললাম, আপনি বোধহয় খবর রাখেন না এখনও আমাদের দেশে এমন সব তান্ত্রিক আছেন যাঁরা সারাজীবন এইসব অলৌকিক ব্যাপারের রহস্য সন্ধান করে যাচ্ছেন।

বললাম, আমি এমন ফকিরের কথা জানি যিনি ইচ্ছে করলে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে নিজের আত্মাকে দেহমুক্ত করে সুদূর দেশ ঘুরে আসতে পারেন।

ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে শুনতে লাগলেন।

আমি বললাম, আমার ঠাকুরদার বাবা তাঁর ডায়েরিতে মিশর থেকে ছাপা একটা বইয়ের উল্লেখ করেছেন যাতে নাকি সেই সমুদ্র-দানবের কথা আছে। সেই বইয়ের সন্ধান করছি।

একটু থেমে বললেন, আমি ভদ্রমহিলাকে বুঝিয়ে দিলাম, আমার কোনো বন্ধন নেই, কাজেই নির্ভাবনায় অলৌকিক বিষয় অনুসন্ধান নেমে পড়ব।

তারপর? বাপ্পা জিজ্ঞেস করল।

হ্যারিকাকু বললেন, মহিলাটি এই পর্যন্ত শুনে খুব ভয় পেয়ে গেলেন। আমাকে সাবধান করে দিলেন। ওসব বড়ো বিপজ্জনক কাজ, মিস্টার ইভেন্স।

আমি হেসে উঠে বললাম, আমার কাছে একটা মড়ার মাথার খুলি আছে। এত বড়ো খুলি যে মানুষের হতে পারে ভাবা যায় না। তাতে দুর্বোধ্য ভাষায় অনেক কিছু লেখা আছে। দেখবেন?

মহিলাটি শিউরে উঠে বললেন, না। আমার কোনো আগ্রহ নেই।

জিজ্ঞেস করলেন, সেটা পেলেন কোথায়?

বললাম, প্রেতাশ্বার রহস্য সন্ধানে আমি নেপাল পর্যন্ত গিয়েছিলাম। সেখানে এক তিব্বতী লামার সাক্ষাৎ পাই। তিনি আমার সব কথা শুনে অনেক উপদেশ, পরামর্শ আর কীভাবে কী করলে সেই প্রেতাশ্বার রহস্য জানা যাবে শিখিয়ে দিয়েছেন। তিনিই সেই খুলিটা দিয়েছিলেন। সঙ্গে দিয়েছিলেন লাল একটুকরো কাপড় আর কিছু কাঠের গুঁড়োর মতন।

কিছু ফল পেয়েছেন, মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন।

বোধহয় পেয়েছি। লামা আমায় বলেছেন, সেই প্রেতাশ্বা এখনও আছে। হয়তো তার দেখাও পেতে পারো যদি ঠিকমতো ‘একাত্ম হও’। তবে সাবধান।

‘একাত্ম হও’ মানে? মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন।

ঠিক জানি না। বোধহয় ঐ একটি বিষয় নিয়ে তন্ময় হয়ে সাধনার কথা বলেছেন। কিন্তু কলকাতায় বসে সেরকম সাধনা করা বড়ো কঠিন হয়ে পড়েছে। এখানে বড্ড ডিস্টার্বেন্স।

তাহলে কলকাতার বাইরে কোথাও চলে যান, একান্তই যদি অপঘাতে মরার ইচ্ছে হয়ে থাকে।

আমি বললাম, দূরে কোথায় যাব? তেমন টাকা-পয়সা নেই, জায়গাও জানা নেই। তবে ছোটোনাগপুরে আমার এক বন্ধু আছে—স্যামুয়েল। তাকে সব কথা জানিয়েছি। সে তো কেবলই বলে ওর কাছে চলে যেতে। জায়গাটা নাকি ঐ ধরনের সাধনার পক্ষে খুবই উপযুক্ত।

মহিলাটি আর কিছু না বলে চলে গেলেন। যাবার সময়ে আবার আমায় সাবধান করে দিয়ে গেলেন যেন আমি ওসব নিয়ে মাথা না ঘামাই।

• উনি চলে যেতে না যেতেই হঠাৎ মেঘের গর্জন। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়। তখন সবে সন্ধ্যা। ঝড়ে নিচের সিঁড়ির দরজাটা ভয়ানক শব্দ করছিল। দরজাটা বন্ধ করার জন্যে নামতে যাব,



দেখি লম্বা একটা মানুষ সর্বাঙ্গে চাদর জড়িয়ে উঠে আসছে এক-পা এক-পা করে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না।

তখনই আমি উঠে এসে টেবিল থেকে টর্চ নিয়ে নেমে গেলাম কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না।

আর সেই মহিলা? রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞেস করল বাপ্পা।

তাঁকেও দেখতে পেলাম না। ঐটুকু সময়ে ঝড়ের মধ্যেই রাস্তায় নেমে কোথায় যেন vanish হয়ে গেছেন। ঝড়ের মধ্যেই বেরনোর এমন কী তাড়া ছিল বুঝতে পারিনি।

কথা শেষ করে হ্যারিকাকু কোমরের পিছনে দু-হাত রেখে গম্ভীরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন।

একটু পরে বাপ্পা বলল, তাহলে কাকু, এই পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে যে দু'বার আপনি প্রায় একই জিনিস দেখেছিলেন। আর সেই দু'বার দেখার আগে ভীষণ ঝড় উঠেছিল।

হ্যারিকাকু পায়চারি করছিলেন, দাঁড়িয়ে পড়লেন। একটু ভেবে বললেন, তা বটে।

আর এ ঝড় ঠিক সাধারণ ঝড় নয়।

সেটা ঠিক বলতে পারছি না।

তবে ঐটুকু বলা যায় ঝড়ের সঙ্গেই মূর্তিটার সম্বন্ধ। অর্থাৎ ঝড়ের মধ্যে দিয়েই তাঁর আবির্ভাব।

হ্যাঁ, তা অবশ্য বলতে পারো।

আর দু'বারই আপনি এই বিশেষ ঝড়ের সময়ে ভয় পেয়েছিলেন।

হ্যারিকাকু একটু ভেবে বললেন, শেষবার ভয়টা খুব বেশি পেয়েছিলাম। কিন্তু প্রথমবার তেমন ভয় পাইনি। মনে করেছিলাম সাধারণ ঝড়।

রঞ্জু এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিল, এবার বলে উঠল, আরো একটা ব্যাপার নোটিশ করো বাপ্পা, যে দু'বারই ঝড় উঠেছে বা কিছু দেখা গিয়েছে সেই দু'বারই উনি কাউকে না কাউকে জাহাজের গল্লটা শুনিয়েছেন। সেবার সেই রহস্যময়ী মহিলাকে, এবার আমাদের।

বাপ্পা প্রায় লাফিয়ে ওঠে বলল, বাঃ! দারুণ পয়েন্ট ধরেছিস তো!

হ্যারিকাকু ভুরুতে ভাঁজ ফেলে রঞ্জুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন স্বগত বললেন, রাইট!

বাপ্পা বলল, কাকু, একটা রিকোয়েস্ট করব। ঐ জাহাজের ঘটনাটা কাউকে আর নাই বললেন।

হ্যারিকাকু সামান্য একটু হাসলেন। বললেন, আর কাউকে বলব কিনা জানি না, তবে ঐ বস্তুটা যে কী, কেন এভাবে এখানে হানা দেয়, আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন সে রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা চালিয়ে যাব।

কিন্তু সেই যে লামা আপনাকে 'একাত্ম হও' কথাটা বলেছিলেন তার মানে এতদিনে বুঝতে পেরেছেন?

না, এখনো তা ঠিক পারিনি। 'একাত্ম হও'-এর মানে তো এই দাঁড়ায়, 'Be one with Him'। কিন্তু এই 'Him' কে?

বলতে বলতে হঠাৎ তিনি দু'হাতে মাথা টিপে ধরে চেয়ারে বসে পড়লেন।

রঞ্জু বলল, কিন্তু সেই জাহাজের গল্লটা এখনো শেষ করেননি। মিস্টার জোসেফ ইভেল তারপর কী করলেন?

হ্যারিকাকু মাথা টিপে ধরে বললেন, হ্যাঁ, সেটা অবশ্যই বলতে হবে। তবে আজ আর কথা বলতে পারছি না। শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে। তোমরা আর একদিন এসো।

॥ ছয় ॥

## জোসেফ ইভেন্সের ডায়েরি

এবার ওদের আসতে দেরি হলো প্রায় চার মাস।

হারিকাকুকে খুব ক্লান্ত আর বিষণ্ণ লাগছিল। মুখটা কিরকম ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। গলার মোটা শিরাগুলো যেন চামড়া ফুঁড়ে উঠে আসছিল।

হারিকাকু তবু আন্তরিকতার সঙ্গে ওদের বসালেন। কফি তৈরি করে খাওয়ালেন। বললেন, আর কিছুদিন পরে এলে আমায় আর পেতে না।

কেন?

আমার সেই বন্ধু স্যামুয়েল বারবার আমায় ডাকছে। ভাবছি ওর কাছেই চলে যাব।

বাগ্না চূপ করে শুনছিল আর ঘরটা দেখছিল। একটু যেন পরিবর্তন হয়েছে। ঘরটা বেশ গোছাল। বোধহয় চলে যাবেন বলেই ঘরটা গুছিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য হলো টেবিলে সেই ফুলদানিতে লাল গোলাপের জায়গায় একটা বড়ো সাদা গোলাপ দেখে।

এবার সাদা গোলাপ দেখছি। আগে দেখতাম লাল গোলাপ।

হারিকাকু বললেন, লাল গোলাপ আর পছন্দ হয় না। বড্ড যেন অহংকার। বড্ড আত্মপ্রচার!

বাগ্না অবাক হলো। বাবা! হারিকাকুর মুখে এসব আবার কী কথা! সত্যিই কি উনি শেষ পর্যন্ত সাধু-সম্যেসী হয়ে যাবেন?

যাই হোক, কফি খেতে খেতে হারিকাকু সেই জাহাজের ঘটনার শেষাংশটুকু বলে গেলেন।

...জোসেফ ইভেন্স এর পর লন্ডনে পৌঁছেই জাহাজের ঘটনা নিয়ে হৈচৈ বাধিয়ে দিলেন। সভা-সমিতি করলেন, কাগজের রিপোর্টারদের ডাকলেন। নিজের অভিজ্ঞতার কথা বললেন। সাক্ষ্য দিলেন জাহাজের কাপ্তেন স্বয়ং। তাছাড়া প্যাসেঞ্জারদের অনেকেই ছিল। জোসেফ গভর্নমেন্টের কাছে দাবি করলেন, ঐ সমুদ্র-দানবকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সন্ধান চালানো হোক।

তিনি বড়ো বড়ো থিওজফিস্টদের সঙ্গেও এই নিয়ে আলোচনা করলেন। বললেন, অতল সমুদ্র থেকে ঐ যে মূর্তিটা উঠে এল ওটা হাড়-মাংসের জীব নয়। চোখেরও ভুল নয়। তবে ওটা কি?

এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি। যেমন উত্তর পাওয়া যায়নি কী করে তিনি নিজে রক্ষা পেলেন—কেনই বা সমুদ্র-দানবটা তাঁকে দেখে অমন ভয়ংকর চিৎকার করে লাফিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

এই শেষ প্রশ্নের জবাবে সেদিন ইংলন্ড আর জার্মানির প্রেততত্ত্ববিদরা একবাক্যে বলেছিলেন, নিশ্চয় মিস্টার ইভেন্সের মধ্যে কোনো দৈবশক্তি আছে যা তিনি নিজেও জানেন না।

এর পর থেকে বেশ কিছুকাল ঐ জলপথে যখন জাহাজ যেত তখন ঐ জায়গাটায় এলে যাত্রীরা কেউ ডেকে থাকত না। তারা সবাই একসঙ্গে থাকত। হোলি বাইবেল পড়ত সমস্বরে। আর প্রত্যেকের হাতে থাকত ক্রুস।

এ সবই জোসেফ ইভেন্স তাঁর ডায়েরিতে লিখে গেছেন তাঁর পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রদের জন্যে। এ কথাও লিখেছেন, কোনো দৈবশক্তি সত্যিই আমার আছে কিনা জানি না। তবে আমার মনে হয় এ শক্তি আর কিছুই নয়—শুধু পরোপকারবৃত্তি আর সাহস। আমি যদি

সেদিন সেই যাত্রীটিকে বাঁচাবার জন্যে মরিয়া হয়ে ঐ সমুদ্র-দানবের ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়তাম তাহলে আরো একজনকে হারাতে হতো। আজ আমি কিছুতেই বোঝাতে পারব না সেদিন আমার ওপর কি এক অদ্ভুত শক্তি ভর করেছিল। নইলে আমি তো খুব সাধারণ একজন মানুষই।

শেষে লিখছেন, যাই হোক জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমি ঐ সমুদ্র-দানবের রহস্য ভেদ করার চেষ্টা চালিয়ে যাব। তার জন্যে যদি আমাকে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে হয় তবু আমি পিছপা নই। আজ পর্যন্ত শুধু এইটুকু তথ্য পেয়েছি—একদল লোক নাকি মিশর থেকে একটা হাজার বছরের মমি চুরি করে জাহাজে করে ঐ পথে পালাচ্ছিল। জাহাজটা হঠাৎ ডুবে যায়, সেই সঙ্গে মমিটাও। তারপর থেকেই নাকি—এইটুকু তথ্য। এখনও আরো প্রমাণ দরকার।

ডায়েরি এখানেই শেষ। হ্যারিকাকু বললেন, কিন্তু তিনি বেশিদিন বাঁচেননি। একদিন সম্ভ্রান্ত পথ চলতে চলতে ঝড়ে গাছের ডাল চাপা পড়ে মারা যান।

হ্যারিকাকু একটু থামলেন। তারপর বললেন, এই ডায়েরি আসে আমার পিতামহের হাতে। তিনিও রহস্য ভেদ করতে করতে মধ্য বয়সেই আগুনে পুড়ে মারা যান।

তারপর আমার বাবা। তিনি এবার সেই মমির ইতিহাস সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বজ্রাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

কথা বলতে বলতে হ্যারিকাকু ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। তবু বলতে লাগলেন, জোসেফ ইভেন্স থেকে পরপর তিন পুরুষের কেন এই অপমৃত্যু? তোমরা হয়তো বলবে ঘটনাচক্র। বলবে অপঘাতে কি মৃত্যু হতে পারে না?—ঠিক। তবু আমার মনে প্রশ্ন থেকেই যায়, এ কি সেই অলৌকিক অস্তিত্বটির প্রতিহিংসা—জোসেফ ইভেন্স অলৌকিক রহস্যের জাল ছিল করে বিজ্ঞানের আলোয় সত্যকে উদ্ঘাটন করে মানুষকে সাহস যোগাতে চেয়েছিলেন বলে?

আর যেহেতু তাঁর বংশধরেরা সেই একই পথে এগোচ্ছিলেন তাই তাঁদের ওপর অকাল অপঘাত মৃত্যুদণ্ড।

যদি তাই হয় তাহলে বাপ্পা, রবিনসন, তোমরা জেনে রাখো এবার আমার পালা আসছে। তাই কি আপনি ঘরের চারিদিকে ক্রুস চিহ্ন এঁকে রেখেছেন? বাপ্পা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল। ধরে নাও তাই। যদি সেই করুণাময় পরম পিতার আশ্রয়ে থেকে আমি আমার সাধনা নির্বিন্দে চালিয়ে যেতে পারি, তারই চেষ্টা।

আপনি যখন এতদূর ভাবতে পেরেছেন তখন আর নাই এগোলেন!

না, তা সম্ভব নয়। যে রহস্য ভেদ করতে করতে আমার পূর্বপুরুষেরা জীবন দিয়েছেন সে কাজ আমিও করে যাব। এখন শয়নে-স্বপনে আমার শুধু ঐ একটি চিন্তা— প্রেততত্ত্ব। ঐ দ্যাখো কত প্রেততত্ত্বের বই এই ক'মাসে যোগাড় করেছি। আর যদি অপঘাতে মৃত্যু হয় তাহলে হোক। আমি প্রস্তুত।

বলে তিনি ঠোঁট ছড়িয়ে হাসলেন। এমন ধবধবে সাদা বড়ো বড়ো একপাটি দাঁত বের করে হাসতে তাঁকে কখনো দেখা যায়নি। ওঁর দাঁতগুলো কি এত সাদা ছিল? ঐ দাঁত আর হাসি দেখে বাপ্পার গা ছমছম করে উঠল।

হ্যারিকাকু বললেন, এক একবার আমার কেমন মনে হয় যেন ‘আমি’ আর সেই পুরনো ‘আমি’ নেই। খুব একটা পরিবর্তন—অদ্ভুত পরিবর্তন নেমে আসছে আমার মধ্যে। জানি না পরিণতি কী! সেদিন এই পর্যন্ত।

॥ সাত ॥

## হ্যারিকাকুর ক্রমবিবর্তন

এর পর আগস্টের এক মেঘলা দুপুরে বাপ্পা আর রঞ্জু গিয়েছিল হ্যারিকাকুর বাড়ি। জাহাজের গল্প শোনা শেষ হয়ে গিয়েছে। নতুন গল্প শোনার আর তেমন আগ্রহ নেই। এখন শুধু দেখা করতে যাওয়া—খবর নিতে যাওয়া কেমন আছেন তাদের সেই রহস্যময় মানুষটি, যাঁর নাম হ্যারোল্ড ইভেন্স ওরফে হ্যারিকাকু।

দরজার সামনে সেই বড়ো ক্রুসচিহ্ন। দরজার বিবর্ণ রঙটা যেন আরো ফিকে। হ্যারিকাকুই দরজা খুলে দিলেন। কিন্তু—এ কী চেহারা হয়েছে তাঁর! শরীরটা যেন একটা গুরু কাঠির মতো শীর্ণ হয়ে গেছে। মাথাভর্তি পাকা জট-পাকানো চুল—একমুখ পাকা দাঁড়ি। দু-চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি। পিছনের দেওয়ালে শুধু সেই লেখাটা জ্বলজ্বল করছে—“Be one with Him। তাঁর সঙ্গে একাত্ম হও।”

ঘরে ঢুকে ওরা অবাক হয়ে গেল। টেবিলে ফুলদানিতে আজ আর শুধুই সাদা গোলাপ নয়, টেবিলক্ৰুথটিও সাদা। জানলা-দরজার বিবর্ণ নীল পর্দা আর নেই, তার বদলে সাদা পর্দা। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় সবই সাদা। আর যে হ্যারিকাকু বরাবর পরে এসেছেন ছিটের পা-জামা, তাঁর পরনে সাদা পাজামা আর সাদা ফতুয়া!

হ্যারিকাকু এদিন বেশি কথা বলতে পারেননি। কোনোরকমে দরজা খুলে দিয়েই বিছানায় শুয়ে পড়েছেন।

কেমন আছেন হ্যারিকাকু?

ক্যাম্পখাটটার দ'পাশে দুজনে বসে জিজ্ঞেস করল।

ঠিক জানি না।

এ এমন একটা উত্তর যার ওপর আর প্রশ্ন করা যায় না।

কিন্তু চারিদিকে এত সাদা কেন?

হ্যারিকাকুর সেই ভরাট গলা আর নেই। ফ্যাকাশে গলায় বললেন, সাদাই তো সব। সাদাই পবিত্রতা।

বলে শীর্ণ হাতটা বাড়িয়ে দিলেন রঞ্জু আর বাপ্পার দিকে।

॥ আট ॥

## লোহিত সাগরের আতঙ্ক

কয়েক মাস পর বাপ্পা হ্যারিকাকুর সেই চিঠিখানা পেল।

চিঠিখানা পেয়ে বাপ্পা আশ্চর্য হলো, তাহলে এই শেষ বয়সে হ্যারিকাকু সত্যিই কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন ছোটোনাগপুরের একটা অখ্যাত জায়গায় নির্বিঘ্নে প্রেততত্ত্ব সাধনা করতে। কিন্তু ভীত হয়ে পড়ছেন কেন? সেই অশরীরী দানবটা কি সেখানেও হানা দিচ্ছে?

যাই হোক, তাকে জগদীশপুরে যেতেই হবে। তাদের দুজনকে হ্যারিকাকু আকুলভাবে ডেকেছেন।

পরের দিন বাপ্পা কলকাতায় চলে এল। দেখল রঞ্জুও ঐরকম চিঠি পেয়েছে। একই বক্তব্য—একই ভাষা।

কবে যাবি? রঞ্জু জিজ্ঞেস করল।

আজই।

কিন্তু—

কি ভাবছিস?

ভাবছি মা-বাবাকে কী বলব! সত্যি কথা বললে যেতে দেবে না। ঠিক আছে—এমনি বেড়াতে যাচ্ছি বললে আপত্তি করবে না। বিশেষ যখন তুই সঙ্গে আছিস। বলে রঞ্জু একটু হাসল।

রঞ্জুর বাবা কিছু বলেননি। রঞ্জুর মা গজগজ করলেন, শুধু শুধু এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ানো—এ আবার কী? তাড়াতাড়ি ফিরো।

যাবার সময়ে বাপ্পা বললে, হ্যারিকাকুর ঠিকানাটা একটা স্লিপে লিখে টেবিলে রেখে যাস। বলা যায় না যদি কোনো কারণে আটকে যাই।

সেদিনই রাতে মাগলসরাই প্যাসেঞ্জারে ওরা চাপল। সারারাত ট্রেনে। যতক্ষণ না ঘুম এসেছিল ততক্ষণ ওরা হ্যারিকাকুকে নিয়ে আলোচনা করল।

বাপ্পা বলল, একটা কথাই ভাবছি—হ্যারিকাকু কেন লিখলেন ভীত হয়ে পড়ছি!

নিশ্চয় ওখানেও সেরকম কিছু ঘটেছে।

কিন্তু ওখানে তো তিনি একা নন। পাদ্রী সাহেবও আছেন। তিনিই তো তাঁকে অনেক দিন ধরে ডাকছেন। তিনি আবার হ্যারিকাকুর বন্ধু। তাহলে?

রঞ্জু বলল, কলকাতায় যেদিন সন্কেবেলা ঝড় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঐরকম মারাত্মক ঘটনাটা ঘটল সেদিন তো আমরাও ছিলাম।

বাপ্পা চিন্তিতভাবে বলল, তা বটে। একটু থেমে বলল, আর একটা জিনিস লক্ষ করেছিলি? হ্যারিকাকুর কিরকম তাড়াতাড়ি পরিবর্তন হচ্ছিল। প্রথম দিনের সেই হ্যারিকাকু যিনি হ্যাট মাথায়, ছড়ি হাতে ওয়েলেসলির দিকে হাঁটছিলেন, তিনি যেন শেষের দিকে আর বেরোতেই পারছিলেন না। অথচ ক’ মাসেরই বা তফাত! শুধু তাই নয়, যিনি প্রথম দিকে কাঠখোঁট্টা মানুষ ছিলেন, টারা টারা কথা বলতেন, তিনিই ক্রমশ যেন কেমন ভীতু হয়ে পড়লেন। কথা বলতে বলতে হাত, ঠোট কাঁপত।

রঞ্জু সায় দিয়ে মাথা দোলাল।

তারপর হঠাৎ তাঁর সাদার ওপর প্রীতি উথলে উঠল। লাল গোলাপের জায়গায় সাদা গোলাপ এল। জানলার পর্দা, বিছানার চাদর, টেবিলক্লথ সব সাদা। তিনি যেন হঠাৎ কেমন দার্শনিক হয়ে উঠলেন!

আর ওঁর সেই বড়ো বড়ো সাদা দাঁতের হাসি! বাবা গো!

অথচ উনি কম হাসতেন। ওঁর ঐরকম বড়ো বড়ো সাদা দাঁত আগে কখনো চোখে পড়েনি।

আর শেষ যেদিন দেখা করে এলাম সেদিন তো উনি একেবারে শয্যাশায়ী। ভালো করে কথাই বলতে পারলেন না।

এখানে একটা কথা ভাববার আছে রঞ্জু। যে মানুষকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখে এসেছি সে মানুষ কি এত গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারে?

রঞ্জু বলল, চিঠি বোধহয় উনি লেখেননি। পাদ্রী সাহেবকে দিয়ে লিখিয়েছেন। তিনিও তো বৃদ্ধ। তাই কাঁপা কাঁপা লেখা।

বাগ্না একটু ভেবে বলল, তা হতে পারে। কিন্তু চিঠির প্রথমটা পড়।

রঞ্জু পকেট থেকে চিঠিটা বের করল।

বাগ্না আঙুল দিয়ে চিঠির প্রথম দিকটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, এইরকম সহজ স্বাভাবিকভাবে কোনো মূর্খ্য মানুষ dictate করতে পারে? আমাদের যাওয়া যখন এতই জরুরি তখন তো টেলিগ্রাম করলেই চলত। তাই না?

এটা কি তবে আগে লিখে রাখা?

তারিখটা দ্যাখ তো? বলেই বাগ্না চিঠির ওপরে ঝুঁকে পড়ল।

আশ্চর্য! কোনো তারিখ নেই।

এর মানে কী?

অনেক ভেবে রঞ্জু বলল, হয়তো ভুলে গেছেন।

কিন্তু যুক্তিটা কারো মনঃপূত হলো না।

সকালে ওরা পৌঁছল মধুপুর। তারপর চড়ে বসল গিরিডির ট্রেনে।

স্টেশনে দুটো কেক আর দু' ভাঁড় চা খেয়ে ওরা জানলার ধার নিয়ে আরাম করে বসল। ট্রেন ছাড়ল। ওরা গল্প করছিল। কিন্তু গল্প করাতেও ক্লান্তি। প্রথমত, সারারাত ভালো ঘুম হয়নি, দ্বিতীয়ত, মনে চাপা দুর্ভাবনা—কে জানে হ্যারিকাকুকে কী অবস্থায় দেখবে? ত' ছাড়া ভয়ও আছে। এ তো শুধু অসুস্থ একজনকে দেখতে যাওয়া নয়। এমন একজনকে দেখতে যাওয়া যে এক মহাশক্তিশালী অশরীরী আত্মার শিকার।

আমি কিন্তু প্রস্তুত হয়েই যাচ্ছি। বাগ্না সকৌতূহলে তাকাল।

রঞ্জু হেসে পকেট থেকে একটা বালা বের করে দেখাল।

কী ওটা? লোহার বালা মনে হচ্ছে!

রঞ্জু বলল, হ্যাঁ, যদি আবার সত্যিই এসবের পাল্লায় পড়ি তাহলে—

তাহলে লোহা তোকে বাঁচাবে?

রঞ্জু বলল, হ্যাঁরে, লোকে বলে সঙ্গে লোহা থাকলে ওরা ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না।

তোর মাথা। তাহলে জাহাজে আর ওসব ঘটনা ঘটত না। জাহাজটায় তো লোহার অভাব ছিল না। ডেকের রেলিংগুলো কি কাঠের ছিল?

অকাটা যুক্তি। রঞ্জু চুপ করে গেল।

জোসেফ ইন্ডেন্সের সেই কথাগুলো ভুলে গেলি? পরোপকারবৃত্তি আর প্রচণ্ড সাহস— এই হলো বাঁচার অস্ত্র। আজ পর্যন্ত ভূতের হাতে প্রাণ হারিয়েছে ভীতুর দল। যারা সর্বশক্তি দিয়ে প্রেতাচার দিকে ছুটে যেতে পারে তারা মরে না। বরঞ্চ দুষ্টু আত্মাই পালায়। মানুষ যেমন ভূতকে ভয় পায়, ভূতও তেমনি ভয় পায় মানুষকে।

ট্রেন চলেছে। দু'পাশে রুক্ষ মাটি। বাংলা দেশের মতো শস্যশ্যামল সমতল জমি আর নেই। উঁচু-নিচু মাঠ যেন ঢেউ খেলিয়ে ছড়িয়ে আছে। হুঁ করে বাতাস আসছে খোলা জানলা দিয়ে।

রঞ্জুর একটু বিমুনি এসেছিল। একসময়ে সামলে নিল। সলজ্জভাবে তাকাল বাগ্নার দিকে। দেখল বাগ্না জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যেন অস্বস্তির সঙ্গে কী দেখেছে।

কী দেখছিস অমন করে?

বাগ্না উত্তর দিল না। শুধু আঙুল দিয়ে আকাশ দেখিয়ে দিল।

রঞ্জু দেখল আকাশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে কালো মেঘ একটা দৈত্যের মতো হুহু করে এগিয়ে আসছে।

বাগ্না চুপ করে রইল।

জগদীশপুরে ওরা যখন নামল তখন বাতাসের গোঙানি শুরু হয়ে গিয়েছে।

ছোট স্টেশন। প্যাসেঞ্জার যে ক'জন নামল আঙুলে তা গোনো যায়। একটা টাঙ্গাও পাওয়া গেল। তাকে ফাদার স্যামুয়েলের কোয়ার্টার বলতে সে কিছুই বুঝল না। কিন্তু যখন বলা হলো পুরনো গির্জা—তখন সে বুঝল বটে কিন্তু ও এতই অবাক হয়ে গেল যে ভাড়া বলতে ভুলে গেল।

যাই হোক, ভাড়া ঠিক করে ওরা দুজনে টাঙ্গায় উঠে পড়ল। ততক্ষণে ঝড়ের দাপট তীব্র হয়ে উঠেছে। তারই মধ্যে দিয়ে টাঙ্গার বুড়ো ঘোড়াটা প্রাণপণে ছুটছে...পিঠের ওপর চাবুক পড়ছে সপাং—সপাং—

জায়গাটা একেই জনবসতিবিহীন। টাঙ্গা যতই এগোচ্ছে ততই যেন নির্জন এক জগতে তারা প্রবেশ করছে। খোয়া বের-করা, ধুলো-ভরা সড় রাস্তা। দু'পাশে শুধু আতা-পেয়ারার গাছ, সার সার বাবলা গাছের পাতলা ছায়া আর ঘোপঝাপ।

ও হে গাড়োয়ান, স্যামুয়েল সাহেবের কোঠা আর কেতনা দূর?

গাড়োয়ান কোনো উত্তর দিল না। গাড়ি ছুটছেই। এদিকে ঝড়টা কখনো কমছে কখনো জোরে হচ্ছে। যখন জোর ঝাপটা মারে—এরা মুখে চোখে রুমাল চেপে ধরে। ধুলো আর ধুলো।

শেষ পর্যন্ত টাঙ্গাটা যেখানে এসে থামল সেখানে শুধু জঙ্গল আর ঘোপঝাড় ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। রাস্তাটাও যেন হঠাৎই সেখানে শেষ হয়ে গেছে।

গির্জা কাঁহা?

গাড়োয়ান কথা বলল না। হাত তুলে দক্ষিণ দিকটা দেখিয়ে দিল।

হ্যাঁ, ঐ যে গির্জার মতো কী একটা দেখা যাচ্ছে।

টাঙ্গাওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দুজনে নামল।

রঞ্জু বলল, হ্যারিকাকু তো আচ্ছা জায়গায় সাধনা করতে এসেছেন!

ওরা দুজনে চার্চটার কাছে এগিয়ে গেল। চার্চের অবস্থা দেখে ওরা অবাক। জীর্ণ বিবর্ণ দেওয়াল। জানলাগুলো ভাঙা। কেউ যে এখানে প্রেয়ার করতে আসে তার কোনো লক্ষণই নেই। দরজায় একটা তালা ঝুলছে।

রঞ্জু বলল, এর মানে কী? চার্চেরই যখন এই অবস্থা তখন পাদ্রী এখানে কী করেন? তাঁর থাকার দরকারটাই বা কী?

বাগ্না বলল, যাই হোক, তিনি নিশ্চয়ই কাছেই কোথাও থাকেন। নইলে হ্যারিকাকু ঠিকানা দিলেন কি করে? আর হ্যারিকাকু তো ওঁর কাছেই থাকেন।

ওরা এদিক ওদিক দেখতে লাগল। কিন্তু কোনো কোয়ার্টার চোখে পড়ল না।

এ তো আচ্ছা রহস্য। রঞ্জু বেজার হয়ে উঠল।

বাগ্না কী বলতে যাচ্ছিল, দেখল এক বুড়ি যেন কুঁজো হয়ে ঠুকঠুক করতে করতে চার্চের দিকেই আসছে। তিনি এদের কাছে এলেন, কিন্তু যেন এদের দেখতেই পেলেন না। তিনি গুটি গুটি চার্চের দরজার কাছে গিয়ে ব্যাগ থেকে চাবি বের করে তালা খুলতে লাগলেন।

বাগ্না কাছে গিয়ে বলল, ম্যাডাম, ফাদার স্যামুয়েলের কোয়ার্টারটা কোথায় বলতে পারেন?

মেমসাহেব তাঁর ঘোলা ঘোলা চোখ দুটো তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে আসছ? কলকাতা থেকে।

তোমরা কি ফাদারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছ?

হ্যাঁ ওর সঙ্গেও বটে। আবার ওঁর কাছে থাকেন মিস্টার হ্যারোল্ড ইভেন্স, তাঁর সঙ্গেও বটে।

বাণী লক্ষ করল হ্যারোল্ড ইভেন্সের নাম শুনে মেম যেন চমকে উঠলেন।

একটু সামলে নিয়ে বললেন, কিন্তু ফাদার তো এখানে নেই।

নেই! ওরা দুজনে একসঙ্গে যেন হোঁচট খেল।

হ্যাঁ, উনি হঠাৎ কোথায় চলে গেলেন।

কোথায় গেলেন বলে যাননি?

না। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। লাস্ট সানডে। হঠাৎ রাত দুটোর সময়ে ফাদার হাঁপাতে হাঁপাতে আমার কাছে গিয়ে চার্চের চাবিটা দিয়ে বললেন, আমি চলে যাচ্ছি। আমায় কিছু প্রশ্ন করো না। বলেই তিনি সেই অন্ধকার রাত্রে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর চোখে মুখে অস্বাভাবিক ভয়ের ছাপ দেখেছিলাম।

ভয়ের ছাপ! বাণী উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ, অমন ভয় পেতে এর আগে কখনো দেখিনি।

তারপর—আপনি আর ওঁর কোয়ার্টারে গিয়েছিলেন?

আর কিছু প্রশ্ন করো না। উত্তর দেব না। বলে ব্যাগ থেকে দুটো মোমবাতি নিয়ে দরজা খুলে চার্চে ঢুকতে গেলেন। বাধা দিয়ে বাণী বলল, শুধু আর একটা প্রশ্ন। মিস্টার ইভেন্স কোথায়? উনি কি একাই আছেন? ভালো আছেন তো?

মেমসাহেবের হাত থেকে একটা মোমবাতি পড়ে গেল। তিনি কেমন একরকমভাবে বাণীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, তিনি লাস্ট সানডে রাত্রে মারা গেছেন।

মারা গেছেন?

হ্যাঁ, প্লিজ আমায় কিছু প্রশ্ন করো না। আমি মোম দুটো জ্বালিয়ে দিয়েই চলে যাব। বলে আকাশের দিকে তাকালেন।

ঝড়টা তখন থেমেছে। কিন্তু মাঝে মাঝেই ঝাপটা বাতাস বইছে। আকাশ অন্ধকার।

আপনি শুধু ওর কোয়ার্টারটা দেখিয়ে দিন। একবার সেখানে যাব। উনি আমাদের আসতে বলেছিলেন।

না যাওয়াই ভালো। তবু যদি যেতে চাও, ঐ ইউক্যালিপটাস গাছটার পিছনে গেলেই পাবে।

ওরা যখন যাচ্ছিল মেমসাহেব ব্যাকুল হয়ে বললেন, তোমরা সত্যিই যাচ্ছ? প্লিজ যেও না।

আমাদের যেতেই হবে। হ্যারিকাকুকে আমরা কথা দিয়েছিলাম আসব বলে।

তবে এই ক্রসটা সঙ্গে রাখো।

পুরনো একটা ঘর। ঘরের চারদিকে ভাঙা পাঁচিল। দু'পাশে ঝোপঝাপ। একটা ছোটো কাঠের গেট।



ওরা গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকল। এক ফালি রক। রকের সামনে দরজা। এই সময়ে প্রচণ্ড ঝড় উঠল। ঝড়ের ধাক্কায় দরজা খুলে গেল।

অন্ধকার ঘর। দেশলাই জ্বালতে জ্বালতে ওরা এগোল। মেঝেতে অনেকগুলো হেঁড়া পাতা উড়ছে। বাপ্পা কয়েকটা পাতা তুলে নিল।

কিরে ওগুলো? রঞ্জু ঝুঁকে পড়ে জিঙ্গেস করল।

মনে হচ্ছে জোসেফ ইভেন্সের সেই ডায়েরি।

ইস্! এইভাবে ছিঁড়ল কে?

বাপ্পা কোনো উত্তর দিল না।

দেওয়ালে সাদা কাগজে কী যেন লেখা। বাপ্পা আবার দেশলাই জ্বালালো। লেখাটা পড়া গেল—“Be one with Him!”

সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হঠাৎই রঞ্জু বলে উঠল, আমার শরীর কিরকম করছে। আমি বাইরে যাব।

বাপ্পা বলল, আমারও অস্বস্তি হচ্ছে।

তারপর শান্ত গলায় বলল, এখানে এসেছি যখন আয়, পাঁচ মিনিট আমরা হ্যারিকাকুর জন্যে প্রার্থনা করি।

দুজনে সেই লেখাটার নিচে হাঁটু পেতে বসল।

সবে মিনিট দুই হয়েছে, হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ঝড় আর্তনাদ করে ঘরে ঢুকে পড়ল। আর তখনই তারা দেখল ভেতরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সর্বাস্থে সাদা চাদর-জড়ানো একটা মূর্তি। তার সারা মাথায় জট-পাকানো সাদা চুল, মুখে সাদা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দু'চোখে মরা মাছের দৃষ্টি। তার সামনের দাঁতগুলো ঠোঁটের নিচ থেকে বেরিয়ে এসে ঝকঝক করছে। হ্যারিকাকু!

হ্যাঁ, হ্যারিকাকু হাসছেন!

হ্যা-রি-কা-কু! বলে রঞ্জু চিৎকার করে উঠল।

হ্যা-রি-কা-কু, আমরা এসেছি।

দেখা গেল হ্যারিকাকু শীর্ণ ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছেন—তুষারশুভ্র হাত। সে হাতে এতটুকু মাংস নেই, যেন হ্যাডশেক করতে চাইছেন।

# পাথরমহল

## পরিত্যক্ত কবরস্থানে

মাঠাবুরু পাহাড়ের পিছনে সূর্য তখন ডুবছে। সামনে হাঁটুডোবা জল। সরু নদীটার ওপারে শাল, মহয়ার অরণ্য। জায়গাটায় জনবসতি কম। এমনিতেই সমস্ত দিন নিরিবিলি, নিস্তব্ধ। এখন পড়ন্ত বিকেলে চারিদিক যেন নিঃসাড়। থমথম করছে।

নদীর ধারে বড়ো বড়ো গাছপালার আড়ালে একটা পুরনো কবরস্থান। কবরস্থানটা পরিত্যক্ত। শহরের বাইরে এই কবরস্থানে কেউ এখন আর কবর দিতে আসে না। চোরকাঁটা আর বুনা গাছের ঝোপে ভর্তি।

সেদিন পড়ন্তবেলায় হঠাৎ এই পরিত্যক্ত কবরস্থানেই একটা কালো কফিন কাঁধে করে কয়েকজন লোক এল। সাধারণত কবর দেবার সময় শবদেহের সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী অনেকেই আসে। কিন্তু এই মৃতদেহের সঙ্গে লোক ছিল খুব অল্প। আর যারা ছিল তারাও যেন কেমন ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিল। যেন কোনো গোপন ব্যাপার তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলতে এসেছে। এমনকি স্বয়ং পাদ্রিসাহেবের চোখেমুখেও অস্বস্তির ছাপ ফুটে উঠেছে।

কবর আগেই কাটা হয়েছিল। দড়ি বেঁধে খুব তাড়াতাড়ি কফিনটা নামিয়ে দেওয়া হলো। তখন পাশের ইউক্যালিপটাস গাছটার ওপর একঝাঁক পাখি কিচিরমিচির করে উঠল। যেন তারাও কিছু বলতে চাইল।

প্রথমতো যে ক'জন লোক দাঁড়িয়েছিল তারা নিচে কফিনের ওপর একমুঠো করে মাটি ছুঁড়ে দিল। তখন গম্ভীর গলায় পাদ্রিসাহেব পড়ছিলেন—‘যেহেতু সর্ব-শক্তিমান ঈশ্বর আপন পরম দয়াতে প্রসন্ন হইয়া এক্ষণে পরলোকগত আমাদের প্রিয় ভ্রাতার আত্মাকে—’

‘প্রিয় ভ্রাতা’ কথাটি উচ্চারণ করতে গিয়ে পাদ্রিসাহেবের গলার স্বর হঠাৎ আটকে গেল। তিনি দু’বার স্বর পরিষ্কার করে নিয়ে ফের পড়তে লাগলেন—‘প্রিয় ভ্রাতার আত্মাকে আপনার নিকট লইয়াছেন, অতএব আমরা তাহার শরীর ভূমিতে সমর্পণ করি, মৃত্তিকাতে মৃত্তিকা, ভয়েতে ভস্ম, ধূলাতে ধূলা, এই সত্য ও নিশ্চিত ভরসায় যে, আমাদের প্রভু যীশুখ্রিস্ট দ্বারা অনন্ত জীবন পুনরুত্থান হইবে।’

পরে সকলে চোখ বন্ধ করে হাত জোড় করে পাদ্রির সঙ্গে গলা মিলিয়ে সমবেত কণ্ঠে এই কণ্ঠি কথা উচ্চারণ করল—

হে প্রভু, আমাদের প্রতি দয়া করো।

হে খ্রিস্ট, আমাদের প্রতি দয়া করো।

হে ভ্রাতা, আমাদের প্রতি দয়া করো।

যারা এর আগে পাদ্রিসাহেবের প্রার্থনা শুনেছে তারা লক্ষ্য করল আজ আর তাঁর সেই

ভরাট গম্ভীর গলা নয়, পরিবর্তে যেন ক্ষীণ স্বর তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিচ্ছিল। অথচ সে স্বর কিছুতেই অশ্রুসিক্ত নয়।

কেন এই কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন?

শুধু পাদ্রিসাহেবেই নন, যারা উপস্থিত ছিল তারা কেউই প্রার্থনা মন দিয়ে শুনছিল না। প্রার্থনা শেষ হতেই কবরে মাটি ভর্তি করেই তাড়াতাড়ি কবরস্থান থেকে বেরিয়ে এল। যেন এখান থেকে চলে যেতে পারলেই বাঁচা যায়।

আরও আশ্চর্য ব্যাপার বাইরে বেরিয়ে এসে তারা কেউ মৃতের বিষয়ে একটি কথাও আলোচনা করল না। প্রত্যেকেই শুধু নিজের জামার ওপর চোখ বুজিয়ে ক্রুশচিহ্ন আঁকল। তারপর দ্রুত যে যার বাড়ির উদ্দেশে পা চালাল।

পরিত্যক্ত নির্জন কবরস্থানে পড়ন্তবেলায় মাত্র কয়েক মিনিটের এই অনুষ্ঠানটি বাইরের যদি কেউ দেখত তা হলে সে অবাক হতো। অবাক হতো এই ভেবে যে, অনুষ্ঠানটি এমন গোঁজামিল দিয়ে সারা হলো কেন? কোনোরকমে মৃতদেহটি মাটি দিয়ে পালাতে পারলেই যেন সবাই বাঁচে। এত ভয় কিসের? ‘প্রিয় ভ্রাতার আত্মা’ বলতে গিয়েই বা পাদ্রির স্বর আটকে যাচ্ছিল কেন?

এসবের উত্তর কে দেবে? এ নিয়ে কাউকে প্রশ্ন করাও যাবে না। কাজেই যা চুপচাপ হয়ে গেল তা চাপা থাকই ভালো।

### অদৃশ্য কুকুরের গর্জন

বিচিত্র জায়গা পশ্চিমবঙ্গের এই মালভূমি অঞ্চল। সেদিনের মানভূম, সিংভূম ছাড়াও গোটা পুরুলিয়া জেলা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার অংশবিশেষ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল।

পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণাংশ ছাড়া গোটা জেলা এই মালভূমির মধ্যে। গ্রানাইট জাতীয় শিলায় তৈরি এই অঞ্চলের পাহাড়গুলো বেশ উঁচু উঁচু। অযোধ্যা পাহাড়, পাঞ্চেন্দ্র পাহাড়, বাঘমুণ্ডি পাহাড়, পঞ্চকূট পাহাড়, রঘুনাথপুরের চণ্ডী পাহাড়—পাহাড়ের যেন আর শেষ নেই। গোর্গাবুরু অযোধ্যা পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়া।

হ্যাঁ, গোর্গাবুরু। সারা মানভূমে বিচিত্র সব পাহাড়ের নাম—কড়াকুবুরু, মাঠাবুরু, গজবুরু। জায়গার নামও আর-পাঁচটা নামের মতো নয়। চরসা গ্রাম যদিও চেনা-চেনা মনে হয়, কিন্তু সিধিয়াটাড়? এ যেন কোনো রহস্যময় জায়গার নাম। কেন এই নাম তারও ব্যাখ্যা আছে। সাঁওতালি ভাষায় টাড় মানে রক্ষ। আসলে এই অঞ্চলটাই রক্ষ। শস্যশ্যামল গাঙ্গেয় অববাহিকার কোমলতা এখানে নেই। এখানে পাহাড়ই সব। মাঘ মাসের প্রথম দিনটিতে যেমন সাঁওতালদের নতুন বছর আরম্ভ, তেমনি পাহাড়-পুজোরও দিন। পাহাড়-পুজো! ভাবতে পারা যায়? জীবনের প্রয়োজনে পাহাড়ের গাছপালা, ফল-মূল আর বন্যপ্রাণী—সবই পাহাড়-দেবতার সৃষ্টি। সেই পাহাড়ের দেবতাকে তুষ্ট করার জন্যে করতে হয় পুজো। তাই এইসব অঞ্চলের অনেক কিছুই সাধারণ জীবনের সঙ্গে মেলে না। যেখানে শক্ত কঠিন নীরস পাহাড়কে দেবতা বলে পুজো করা হয় সেখানে এমন অনেক কিছুই ঘটে যা কল্পনা করা কঠিন। নইলে সমাধিক্ষেত্রে কবর দিতে গিয়ে এমন গোঁজামিলের ঘটনা ঘটে?

হাওড়া থেকে রাত্রের আদ্রা-চন্দ্রধরপুর প্যাসেঞ্জার পুরুলিয়ায় পৌঁছয় পরদিন সকালে। স্টেশন

থেকে রিকশায় বাসস্ট্যান্ড। সেখান থেকে বাসে করে মাঠামোড়। মাঠামোড় থেকে মাঠা বনবাংলো কয়েক মিনিটের পথ।

একদিন বিকেলের দিকে ঐ বাংলাতে এসে পৌঁছলো জনা তিনেকের একটি ছোট দল। পিঠে তাদের রুক্স্যাক আর হাতে একটা করে ভি. আই. পি. মার্কা মাঝারি ব্রিফকেস। ঠিক ছিল তারা কয়েকদিন পুরুলিয়ায় থেকে মাঠাবুরুর পাহাড়-পুজো দেখে যাবে। মাঠা বনবাংলোয় থাকতে পারলে জায়গাটা কাছে হবে, তাছাড়া শহরের বাইরে একেবারে পাহাড়ের কোলে শালের বনের মধ্যে একটা নিরিবিলা নিঝুম বাংলাতে থাকার অভিজ্ঞতাও হবে।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এই বনবাংলোটা। অল্প কয়েকটা দোকানপাট, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সাঁওতাল-পল্লী। তাই নিয়ে এই মাঠা অঞ্চল। তবু এখানকার এই বাংলায় বছরের নানা সময়ে অল্প হলেও লোক আসে। বুকিং-এর জন্যে রীতিমতো লিখতে হয় পুরুলিয়ায় ডিভিশনাল ফরেস্ট-অফিসারের (বন দফতর) কাছে। নিছক বেড়াতে আসা ছাড়া এখানে আসার আর তেমন কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। দু-চার দিন থেকেই তারা চলে যায়। যেখানে মানুষজন নেই বললেই হয় সেখানে শুধু পাহাড়, রুক্ষ অসমতল পথপ্রান্তর, শাল-মহুয়ার অরণ্য আর সন্ধ্যা হতেই জীবজন্তুর ডাক শুনে কত দিন থাকা যায়!

এরা তিন বন্ধু টগা, চপল আর বিকু। সকলেরই বয়েস কুড়ি থেকে বাইশ। যাকে বলে তরতাজা যুবক।

এখানে আসার উদ্দেশ্য পাহাড়-পুজো দেখা ছাড়াও অ্যাডভেঞ্চার করা। অ্যাডভেঞ্চার বলেতে যা বোঝায় তা পশ্চিম বাংলার গন্ধমাখা এই মানভূম, পুরুলিয়ায় আর কোথায় পাবে? নিতান্তই শাস্ত, জনবসতিবিরল, নির্ঝঞ্ঝাট জায়গা। তবু একঘেয়ে কলকাতা শহর আর ভালো লাগছিল না। তাই বেরিয়ে পড়েছিল কলকাতা থেকে দূরে নির্জন কোনো জায়গার সন্ধানে। সেইদিক দিয়ে পুরুলিয়ার এই জায়গাটি বেশ পছন্দ হয়ে গেল। বিশেষ করে এই মাঠা বনবাংলোটি। অ্যাডভেঞ্চার করার সুযোগ নেই বটে, তবু অজানা, অচেনা নির্জন এই পাহাড়ে জায়গাটা অ্যাডভেঞ্চারের বেশ উপযুক্ত কল্পনা করেও আনন্দ।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে কম্পাউন্ড। তারই মধ্যে বাংলা। ফুলে-পাতায় ঢাকা গেটের ভেতরে মোরাম বিছানো রাস্তা। দু'পাশে ফুলের বাগান। কম্পাউন্ডের মধ্যে একটা বকুল গাছ। কম্পাউন্ডের পিছনে উঁচু-নিচু পাথুরে পথ কোথায় কোন গ্রামের দিকে চলে গেছে।

এখন পাহাড়ের পিছনে সূর্য ডুবছে। চারিদিক স্তব্ধ। কম্পাউন্ডের মধ্যে সিমেন্ট-বাঁধানো বেঞ্চিতে বসে টগা মুগ্ধস্বরে বলে উঠল, ফাইন!

চপল বলল, সত্যি এমন দৃশ্য কলকাতায় দেখা যায় না।

পাশেই দাঁড়িয়েছিল বিকু। তাকে যেন একটু অস্থির বলে মনে হচ্ছিল। দু'বন্ধুকেই সূর্যডোবার দৃশ্য মুগ্ধ দেখে বিরক্ত হয়ে বললে, একটা কথা মনে করিয়ে দিই, আমাদের ঘরের জানালার ছিটকিনিটা কিন্তু ভাঙা। আর জানলাটা আবার পিছনের দিকেই।

টগা বলল, থাম তো। তোর স্বভাবই হচ্ছে যে কোনো ব্যাপারে শুরুতেই তাল কেটে দেওয়া। ভালো জিনিস নিজেও এনজয় করতে পারিস না, অন্যদেরও করতে দিস না।

বিকু কিছুমাত্র রাগ না করে বলল, কী করব ভাই, আমি তোদের মতো কবি-দার্শনিক নই। আমি প্র্যাকটিকাল। এখানে যে ঘরটা আমাদের দেওয়া হলো তা ভালো করে না দেখেই তোদের পছন্দ হয়ে গেল কিন্তু আমার হয়নি।

কেন? ভুরু বঁকিয়ে জিগ্যেস করল চপল। যথেষ্ট বড়ো ঘর, একসঙ্গে আমরা থাকতে পারব, এটাই কি যথেষ্ট নয়?

বিকু বললে, কিন্তু ঘরের সিকিউরিটি নেই। সবচেয়ে পুরনো ঘর এটা। দরজাটা নড়বড়ে। জানলার ছিটকিনি নেই। বিদেশ-বিভুই। বিপদ ঘটতে কতক্ষণ?

চপল বলল, বিপদ! তুই কি ভাবছিস জানলা ভেঙে চোর ঢুকবে?

চোর কেন অনেক কিছুই ঢুকতে পারে।

দুজনেই অবাক হয়ে বিকুর দিকে তাকাল।

অনেক কিছুই ঢুকতে পারে মানে?

বিকু উত্তর দিল না।

ও বোধহয় ভূত-প্রেতের কথা বলতে চাইছে। বিদ্রূপ করে বলল টগা।

বিকু এবারও উত্তর দিল না। বিরক্ত হয়ে ভেতরে চলে গেল।

ক্রমে অন্ধকার নেমে এল পাহাড়গুলোর গা বেয়ে। পাখির দল ঝাঁক বেঁধে উড়ল বনের এক মাথা থেকে অন্য মাথায়। চারিদিক নিঝুম হয়ে এল। ওরা দুজনে ভেতরে চলল।

বনবাংলোটা একতলা হলেও অনেকখানি জায়গা জুড়ে। সদর দরজা দিয়ে ঢুকতেই একটা বেশ বড়োসড়ো চৌকোনো ঘর। গোটা চারেক সোফা, গোটা দুই কৌচ রয়েছে। মাঝখানে একটা সেন্টার টেবিলে খবরের কাগজ থেকে আরম্ভ করে ইংরেজি-বাংলা পত্র-পত্রিকা। দেওয়ালে নানা দেশের ছবি। সব দেশই যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে—‘বেরিয়ে পড়ো, বেরিয়ে পড়ো ঘর থেকে। দেখে যাও আমাদের....প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার।’ দেখলেই বোঝা যায় এটা ড্রয়িংরুম। বাংলোর অতিথিরা এখানে বসে আলাপ-পরিচয় করে। কিন্তু এই মুহূর্তে ড্রয়িংরুম ফাঁকা। বোধহয় বাবুরা বাইরে বেড়াতে গেছে। এখনও ফেরেনি।

ফতুয়া-পরা মাঝবয়সী একটা লোক বারান্দা থেকে সুইচ টিপে আলো জ্বালাতে জ্বালাতে এসে ড্রয়িংরুমে ঢুকল। সামনেই এদের দেখে হকচকিয়ে গেল। কাছে এসে মাথা চুলকে বললে, বেরিয়েছিলেন?

চপল বলল, না। বাইরে বসেছিলাম।

হ্যাঁ, বেরোবেন আর কোথায়? এ তো আর পুরুলিয়া টাউন নয়। একমুঠো জায়গা। শুধুই পাহাড়। আপনাদের সঙ্গে মেলামেশা করার যুগি লোক তো নেই।

তবু তো লোক আসে এখানে। বলল টগা।—নইলে আর বাংলাটা রাখা হয়েছে কেন?

লোকটা বলল, হ্যাঁ, লোক আসে। তবে দু-তিন দিনের বেশি থাকে না।

চপল জিগ্যেস করল, কেয়ারটেকারবাবু আর তুমি ছাড়া আর ক’জন থাকে?

আর আছে জমাদার। ঝাড়পৌছ, ধোওয়া-মোছা করে। রাঁধুনি-বাবুর্চি আছে।

আর বোর্ডার?

লোকটা ঠোঁট উন্টে বলল, যতগুলো ঘর আছে তার অর্ধেকও যদি বোর্ডার থাকত তাহলে বাংলোর চেহারা ফিরে যেত। তাছাড়া কিজনেই-বা লোক আসবে? পাহাড় ছাড়া আর তো কিছু নেই। আর বছরে একদিন পাহাড়-পুজো। সে কাহিনীই বা ক’জন জানে?

একটু থেমে টগা জিগ্যেস করল, তোমায় কী করতে হয়?

বাজার-দোকান করা। আর আপনাদের দেখাশোনা করা।

তোমার নাম কী?

আজ্ঞা, মহেন্দ্র শতপথী।

তুমি ওড়িয়া?

আজ্ঞা।

এখানে কতদিন আছ?

দু'বছর হয়নি এখনও। আপনারা চা খাবেন তো?

তা খেলে মন্দ হয় না। কিন্তু আমাদের আর-একজন—।

কাছেই কোথাও আছেন নিশ্চয়ই। আপনারা ঘরে গিয়ে বসুন। আমি তিন কাপ চা দিয়ে আসছি। বলে মহেন্দ্র বাইরের বারান্দার আলো জ্বালাতে গেল।

এরা ড্রয়িংরুম থেকে ভেতরে ঢুকল। টানা বারান্দা। দু'পাশে পর্দা ফেলা ঘর। ঘর যত সেই তুলনায় বোর্ডার যে বেশি নেই তা তো মহেন্দ্রর মুখেই শোনা গেল। বাঁ দিকের কোণের একটা ঘরে আলো জ্বলছিল। ধূতি-পাঞ্জাবি পরা একজন ভদ্রলোক কিছু খাতাপত্র নিয়ে। সেই ঘরে ঢুকছিলেন, দূর থেকে এদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অগত্যা এরা নিজের ঘরে না ঢুকে ভদ্রতা করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

ভদ্রলোকের নাম সদাশিব রায়। এই বাংলোর ম্যানেজারগোছের। কেউ কেউ বলে—কেয়ারটেকার। আসলে বাংলোর সব দায়িত্ব তাঁর ওপরে। বয়েস চল্লিশের কাছে। ছোটো ছোটো চুল। মুখে না-কামানো দাড়ি। বেশ আলাপী মানুষ।

হেসে বললেন, বেরিয়েছিলেন?

নাঃ। প্রথম দিন। আলসেমি হচ্ছিল। কম্পাউন্ডের মধ্যেই বসেছিলাম। বললে চপল।

হ্যাঁ। বেরোলে বেলাবেলি বেরোবেন। আর অন্ধকার হবার আগেই ফিরে আসবেন।

টগা একটু অবাক হয়ে বলল, কেন? এখানে সেরকম কোনো ভয় আছে নাকি?

সদাশিববাবু হেসে বললেন, ভয় কোথায় নেই বলুন। নতুন জায়গা হলে অনভ্যস্ত চোখে অনেক কিছুই অস্বাভাবিক ঠেকে—তাছাড়া পাহাড়ি জায়গা তো। এসব অঞ্চলে যারা থাকে তারা শহর-বাজারের শিক্ষা পায়নি—নানা কুসংস্কার। যাকগে ওসব কথা। একটু চা খাবেন তো?

মহেন্দ্র আমাদের ঘরে চা দিয়ে আসবে। আচ্ছা, এখানে বোর্ডার কতজন আছে?

সদাশিব চোখ বুজিয়ে হিসেব করে বললেন, আপনারদের নিয়ে সাতজন। আর একজন আসবেন।

কখন আসবেন?

সদাশিববাবু বললেন, আর একটু পরে।

টগা অবাক হয়ে বলল, অতদূর পুরুলিয়া থেকে রাত্রিও লোক আসে?

সাধারণত রাতে কেউ আসে না। কিন্তু ইনি আসবেন। আর আগাম টাকা পাঠিয়েছেন যাতে স্টেশন থেকে আসার জন্যে গাড়ি রাখা হয়।

চপল হেসে বলল, তাহলে তো ভি. আই. পি. লোক।

সদাশিববাবু বললেন, ভি. আই. পি. কিনা জানি না, তবে তিনি বাঙ্গালোর থেকে আসছেন। একজন উঁচুদের পাদ্রি। এই প্রথম নয়, এর আগেও এসেছেন।

এখানে চার্চ-টার্চ আছে নাকি?

সদাশিববাবু হেসে বললেন, চার্চ কোথায় নেই বলুন।

টগা বলল, চার্চ যখন আছে তখন পাদ্রিও তো আছে।

তা তো আছেই। প্রতি বছর খ্রিস্টমাস ডে-তে, ইংরিজির নববর্ষের দিনে, গুডফ্রাইডেতে বেশ ঘটা করে চার্চে প্রেয়ার হয়।

এখানকার খৃস্টানরা কি সবাই বাঙালি?

বাঙালিই বেশি। সেই সঙ্গে অবাঙালিও আছে। আর আছে আদিবাসীরা। এই যে মহেন্দ্র এখানে তিনকাপ চা দিয়ে যাও।

চপল বলল, আমাদের আর একজন আছে—

হ্যাঁ, বিকাশবাবু। এই তো একটু আগে আমার কাছে এসেছিলেন।

কেন?

একটা হাতুড়ি আর পেরেকের খোঁজে।

হাতুড়ি-পেরেক!

হ্যাঁ, আপনাদের ঘরের একটা জানলার ছিটকিনি খুলে গেছে না ঢিলে হয়ে গেছে, তাই। বললাম, কাল সকালেই ছুতোর ডেকে ব্যবস্থা করে দেব, তো উনি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইলেন না। বলে একটু হাসলেন।

টগাও একটু হেসে বলল, ও ঐরকমই। একটু বেশি ঝঁশিয়ার।

বিদেশে একটু বেশি ঝঁশিয়ার হওয়া কিন্তু ভালো। তা হলে ওঁর চা-টা—

মহেন্দ্র বলল, ঘরে দিয়ে এসেছি।

বেশ।

টগা বলল, পাদ্রির কথা বলছিলেন, তা অত দূর থেকে এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে তাঁর আসার কারণ?

সদাশিববাবু দু' হাতের ভঙ্গি করে বললেন, জানি না। একটু চুপ করে থেকে বললেন, এবার নিয়ে উনি তিন-তিন বার এলেন। কিন্তু কেন আসেন তা বলেন না।

আপনি জিগ্যেস করেন না?

সদাশিববাবু বললেন, কোনো বোর্ডারকে কি জিগ্যেস করা যায়, যদি তিনি নিজে না বলেন? এমনিতেই নিজে থেকে কোনো কথা বলতে চান না। এর আগে দেখেছি এখানে এসেই বেরিয়ে যেতেন। ফিরতেন সন্ধ্যাবেলা। ওঁর মতো অত বয়েসের লোকের পক্ষে এত পরিশ্রম করা কঠিন ব্যাপার। অলৌকিক কোনো ক্ষমতা না থাকলে পারতেন না।

এখানে থাকতেন কত দিন?

সাত-আট দিনের বেশি নয়।

এই ক'দিন তিনি কী করতেন আপনি জানতেন না?

সদাশিববাবু মাথা নাড়লেন। আমি কেন? কেউ জানত না। আমিও কোনো আগ্রহ দেখাতাম না।

এরপর কিছুক্ষণ তিনজনেই নিঃশব্দে চা খেতে লাগল।

চপল বলল, আচ্ছা সদাশিববাবু, আপনি তো এখানে অনেক দিন আছেন, রহস্যজনক কোনো ব্যাপার কখনও ঘটতে দেখেছেন?

সদাশিববাবু হেসে বললেন, এখনও গোটা একদিন হয়নি আপনারা এসেছেন। এর মধ্যেই রহস্যের গন্ধ পেলেন নাকি?

চপল একটি অপ্রস্তুতে পড়ল। হাসবার চেষ্টা করে বলল, আসলে এখানকার পরিবেশটাই যেন কিরকম। সবসময়ে মনে হচ্ছে কিছু যেন ঘটবে।

সদাশিববাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, তা বটে।

টগা একটু ঝুঁকে পড়ে কৌতূহলের সঙ্গে জিগ্যেস করল, আপনিও তাহলে সেরকম কিছু 'ফিল' করেন?

না, তেমন কিছু নয়। তবে এইসব বহু প্রাচীন নির্জন জায়গায়, যেখানে প্রকৃত ভৌগোলিক কিংবা ঐতিহাসিক তত্ত্ব মানুষ এখনও পুরোপুরি আবিষ্কার করতে পারেনি, বিজ্ঞানের আলো যেখানে এসে তেমন পড়েনি, হাজার কুসংস্কার জড়িয়ে মানুষ যেখানে কতকগুলো অলৌকিক কিংবদন্তির মধ্যে ডুবে আছে সেখানে রহস্যজনক ঘটনা না ঘটলেই অবাক হতে হয়।

তারপর একটু হেসে বললেন, নইলে এত জায়গা থাকতে পাদ্রিসাহেব সুদূর বাঙ্গালার থেকে এরকম চুপিচুপি এখানেই বা আসতে যাবেন কেন?

চপল বলল, সত্যিই তো কেন আসেন এখানে?

সদাশিববাবু বললেন, তার উত্তর অন্তত আমার জানা নেই।

কথায় কথায় রাত আটটা বেজে গেল। সদাশিববাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা এসে ঢুকল তাদের পাঁচ নম্বর ঘরে। আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে বিকাশ ওরফে বিকু শুয়েছিল। শুয়েই রইল।

টগা বলল, ঘুমুচ্ছিস নাকি?

বিরক্ত হয়ে বিকু বলল, সন্ধ্যা থেকে পড়ে পড়ে ঘুমোই তারপর সারারাত জেগে থাকি—এত বোকা আমি নই।

ও বাবা, জানলায় ছিটকিনি লাগানো হয়ে গেছে। টগা ঠাট্টা করে হাসল।

বিকু বলল, ছিটকিনি-ভাঙা জানলা নিয়ে আমি শুতে পারি না।

কেন? চোর ঢুকবে?

শুধু চোর কেন, অনেক কিছুই ঢুকতে পারে।

চপল কি বলতে যাচ্ছিল, এমনি সময়ে দূরে সাইকেল-রিকশার হর্ন শোনা গেল।

বাবা, এত রাত্তিরে কে আবার আসছে এখানে?

কে আসছে টগা, চপল জানে ভালো করেই। টগা বলল, তাঁকে এখনই একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।

চপল বলল, সেটা বড্ড বাড়াবাড়ি হবে। ঐ যে মহেন্দ্র ব্যস্তভাবে ছুটল বিশেষ ব্যক্তির মোটরগাড়ি আনতে। আর সদাশিববাবু পাক খাচ্ছেন অফিসঘরের সামনে। রিসিভ করতে যাবার জন্যে মন চাইছে না, আবার নিশ্চিন্তে বসেও থাকতে পারছেন না।

রাত নটার সময়ে মহেন্দ্র এসে জেনে গেল তাদের রাতের খাবার ঘরে দেবে, না, ওরা ডাইনিংহলে যাবে।

টগা ওদের ডাইনিংহলে যাবার ইচ্ছে জানাল। উদ্দেশ্য—যদি পাদ্রিসাহেবও খেতে আসেন।

পাদ্রিসাহেব যে সকলের কাছ থেকে তফাত রেখে চলতে চান টগার তা বুঝতে দেরি হয়েছিল।

রাতের খাওয়া শেষ হলো। যে যার ঘরে চলে গেল। দরজায় দরজায় খিল পড়ল। মহেন্দ্র শতপথী বাংলার দরজাগুলো ভালো করে পরীক্ষা করে অল্প দূরে ইঁদারার পাশ দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

তারপর সব চুপচাপ। গোটা বনবাংলো সুপ্তির কোলে ঢলে পড়ল।

রাত তখন গভীর।

একে নির্জন পাহাড়ি এলাকা, তার ওপর শীতকাল। সমস্ত জায়গাটা থমথম করছে।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার—ঠিক যেন একটা পাগলা কুকুরের ভয়ংকর চাপা গর্জন পশ্চিম



দিকের পাহাড় কাঁপিয়ে এদিকে ছুটে এল। একবার নয়—তিন-তিন বার। তারপরই প্রতিধ্বনির রেশ রেখে থেমে গেল।

এদের তিনজনেরই ঘুম ভেঙে গেল। বিকু ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করল, কিসের শব্দ? চপল তাকাল টগার মুখের দিকে।

টগা বলল, বুঝতে পারলাম না।

ততক্ষণে ঘর থেকে সবাই বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে বাংলোর লনে।। সবার চোখেমুখেই আতংকের ছাপ। এরা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আপনারাও শুনেছেন তো?

ঐ ডাক না শুনে উপায় নেই। বন্ধ কালাও লাফিয়ে উঠবে।

সকলের মুখেই একটি প্রশ্ন—কিসের গর্জন ওটা? কোথা থেকে এল?

সদাশিববাবুকে দেখে এরা এগিয়ে গেল। চপল বল, আপনি তো এখানে অনেক দিন আছেন। এর আগে শুনেছেন কখনও?

মাঝে মাঝে শুনেছি। খুব সহজভাবে বললেন সদাশিববাবু।

কিসের গর্জন ওটা?

সদাশিববাবু তেমনি শান্ত স্বরে বললেন, তা বলতে পারব না। শুধু আমি কেন, এ-অঞ্চলের কেউই বলতে পারে না।

এ তো মহা মুশকিল হলো। এরকম গর্জন তো কোথাও শুনিনি। এ যে দেখছি বেড়াতে এসে প্রাণটি খুইয়ে যেতে হবে।

সদাশিববাবু ভীতপ্রস্তু বোর্ডারদের শান্ত করে বললেন, আমি বলছি কোনো ভয় নেই। এর আগেও ওরকম শব্দ শোনা গেছে। কোনো বিপদ হয়নি। রাত আড়াইটে বাজল। আপনারা শুতে যান।

একে একে সবাই যে যার ঘরে শুতে চলে গেল। টগারাও চলে গেল। চপল শুধু বলল, সবাই বেরিয়েছিল। শুধু পাদ্রিসাহেব বেরোননি।

### পাহাড়-পূজোর মেলায়

পরের দিন সকালে মিষ্টি রোদে ঝলমল করে উঠল মাঠাবুরু। গত রাতে যে গা-ছমছমে ভাব ছিল আজ সকালে তার রেশমাত্র নেই। সেই অলৌকিক কুকুরের ডাক যা তারা সকলেই শুনেছিল, সকালের তাজা রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল যেন দুঃস্বপ্ন—অবাস্তব।

আজ পাহাড় পূজোর দিন। নীরস পাহাড়ও যে মানুষকে কিছু দেয়—তা সে গাছপালাই হোক, ফলমূলই হোক কিংবা বন্যপ্রাণী, তারই জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাতে আদিবাসীরা করে পাহাড়-পূজো। আজ তাই ভোর থেকেই দূর-দূরান্ত গ্রাম থেকে দলে দলে আসছে আদিবাসীরা। মেলা বসে গেছে ইতিমধ্যে সামনের মাঠে। রঙিন চুড়ি, পুঁতির মালা, লিপস্টিক, আর্শি, কানের দুল, টিপের পাতা, মাটির পুতুল ছাড়াও কোদাল, গাঁইতি, হাঁড়ি, কড়া, কী নেই মেলায়? ঝালদা, বিহার থেকেও দোকানিরা এসেছে। কিন্তু আসল লক্ষ্য পূজো। মাঠের শেষে শালের অরণ্যের মধ্যে দিয়ে ধাপে ধাপে উঠতে হবে পাহাড়ে। প্রায় হাজার ফুট ওপরে খোলা আকাশের নিচে বাবার ‘থান’। থানে সাজানো পোড়া মাটির ঘোড়া। সেই কোন সকাল থেকে শুরু হয়েছে ভক্তদের আসা-যাওয়া। কাঁধে তাদের মানত করা ছাগল কিংবা মোরগ। বলি হবে

বাবার থানে। আবার কারও কারও হাতে থাকে খড়ের মোড়কে পায়রা। বলি দেবার জন্যে নয়, বাবার সামনে, বাবাকে সাক্ষী করে পাহাড়ের ওপর থেকে উড়িয়ে দেয় সকলের জন্যে মঙ্গল কামনা করে। অন্য দিকে পূজো দিয়ে ভক্তরা নেমে আসে মুণ্ডুহীন ছাগল কিংবা মোরগ নিয়ে মহা উল্লাসে। বলির এই মাংস দিয়েই আজ তাদের হবে আনন্দভোজ। তারপর সন্ধ্যা থেকে শুরু হবে ধামসা, মাদলের সঙ্গে নাচগান। তখন মাঠাবুরুর আর এক রূপ।

ওরা তিনজনও পাহাড়ে উঠেছে। বাবার ‘থানে’র কাছে বেজায় ভিড় দেখে ওরা ওদিকে গেল না। নিচে যেমন মেলা বসেছে, পাহাড়ের ওপরেও তেমনি মেলা। তবে ওপরের মেলায় না দেবদেবীর মূর্তির দোকানই বেশি। নাড়ুগোপাল থেকে কালী, ছিন্নমস্তা সব কিছুই আছে।

টগা বলল, এখানে অনেকক্ষণ ধরে দেখার কিছু নেই। নেমে চল।

চপল বলল, পাহাড়ের ওপর রোদটাও বড়ো চনচনে।

বিকু বলল, আমি তো আগেই বলেছি জায়গাটা বাজে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে দুপুরেই পুরুলিয়া চলে যাব। তারপর নিজেদের জায়গা কলকাতায়।

চপল, টগা এ কথার কোনো উত্তর দিল না। ঘুরতে ঘুরতে তারা পাহাড়ের অন্য দিকে চলে গেল। এদিকে দোকানপাট তেমন নেই। কাজেই ভিড় নেই। কয়েকটা কেন্দু আর সেগুন গাছ। তারই তলায় কিছু লোক জড়ো হয়েছে। নিচু হয়ে কী যেন দেখছে। বোধহয় কেউ কিছু বিক্রি করছে। কোনো নিষিদ্ধ জিনিস কি? নইলে দোকান করেনি কেন?

কৌতূহলী হয়ে এরা গাছতলায় এসে দাঁড়াল। একটা তিব্বতী ছেলে। কেমন যেন ভীতু-ভীতু চোখ। রুম্মু চুল। গায়ে একটা ময়লা ছেঁড়া সোয়েটার। পেটের দায়ে সুদূর তিব্বত কিংবা নেপাল থেকে এসেছে। অ্যান্টিকের অস্থায়ী দোকান পেতেছে। খবরের কাগজের ওপর সাজানো হরেকরকমের পুরনো জিনিস—যা এ যুগের সাধারণ মানুষ চোখেও দেখেনি কোনোকালে।

এই অ্যান্টিকের ওপর খুব আগ্রহ টগার। কেনই-বা না থাকবে। কতকাল আগের পুরনো দুস্ত্রাপ্য জিনিস সব। এখন যেন ইতিহাস হয়ে গেছে। তাছাড়া এই বিশেষ অ্যান্টিকে মনে হয় এমন কিছু নিষিদ্ধ জিনিস আছে যা একসময়ে ব্যবহার করত তান্ত্রিক, ওঝারা। ভূত, প্রেতের কারবারিরা, পিশাচ-সিদ্ধরা।

টগা আঙুল দিয়ে একটা মূর্তির বিকট মুখ দেখিয়ে জিগ্যেস করল, ওটা কার মুখ?

ছেলেটি তিব্বতী হলেও টগার প্রশ্নটা বুঝল। জড়ানো স্বরে বলল, মহাকাল।

মহাকালের নাম অনেকেই জানে। নেপালের এক ভয়ংকর দেবতা।

কিছুক্ষণ থেকে ‘বাবার থানে’র কাছে একটা চাপা হাল্লা শোনা যাচ্ছিল। এখন যেন সেটা আরও বেড়ে যাচ্ছে। টগার মন সেদিকে ছিল না। সে অ্যান্টিকগুলো দেখছিল। হরিণের শিঙের একটা মূর্তি তার খুব পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু বেজায় দাম—

আরে ওটা কি?

জিনিসটা প্রকাশ্যে রাখা ছিল না। ঝুলির ভেতর ঢোকানো ছিল। প্রায় অর্ধেকটা বেরিয়ে ছিল। সেটা দেখেই টগা চমকে উঠল। একটা ভয়ংকর জানোয়ারের মুখ। অনেকটা কুকুরের মতো—চোয়ালের দু’পাশ থেকে ঝকঝক দাঁত হিংস্র উত্তেজনায় বেরিয়ে এসেছে। লাল ঝরছে দু’পাশের কষ বেয়ে। প্রায় এক হাত লম্বা কালো পাথরের মূর্তিটা। মূর্তি নয়, যেন জ্যাণ্ড একটা জন্তু। এটা কি শিল্পী নিছক কল্পনা করে তৈরি করেছে না বাস্তবে কিছু দেখে?

দেখি, দেখি ভাই ওটা।

দোকানি কেন যেন একটু ইতস্তত করে ওটা বের করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ এমনি সময়ে দুদাড় করে লোকে ছুটে নিচে নামতে লাগল। এরা দেখল পুলিশ তাড়া করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিব্বতী যুবকটিও তার দোকান গুটিয়ে একটা পুঁটিলির মধ্যে সব জিনিসগুলো ঢুকিয়ে তড়বড় করে নিচে নামতে লাগল। কি যে হলো টগারা কিছুই বুঝতে পারল না। পুলিশের কখন যে কী মর্জি হয়—

ওরা পাহাড়ের এদিক-ওদিক উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরছে, হঠাৎ দেখল লম্বা কালো একজন বৃদ্ধ, পরনে কালো প্যান্ট, কালো কোট, টাই, টুপি, এইমাত্র পাহাড়ে উঠে ব্যস্ত হয়ে কী যেন খুঁজছেন। চোখে কালো রোদচশমা।

চপল বলল, আমার মনে হচ্ছে এই বৃদ্ধটি এখানকার নন।

টগা বলল, আমি আরও বলে দিচ্ছি শোন, ইনি একজন পাদ্রি। এবং আসছেন দক্ষিণ ভারতের কোনো জায়গা থেকে।

বিকু বলল, পাদ্রিই যে কী করে জানলি?

গলায় ক্রুশ ঝুলছে।

তাহলে আমিও বলে দিচ্ছি ইনি এখানে এসেছেন মাত্র গতকাল রাতে। উঠেছেন বনবাংলোয়। তিনজনেই জোরে হেসে উঠল।

চুপ! ভদ্রলোক এদিকে আসছেন।

ভদ্রলোক কাছে এসে দাঁড়ালেন।

এক্সকিউজ মি। আপনারা নিশ্চয় বাইরে থেকে এসেছেন?

টগা মজা করে বলল, আশ্চর্য! কী করে জানলেন?

সে কথার উত্তর না দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, আই অ্যাম ডিক ফার্নান্ডেজ ফ্রম বাঙ্গালোর। যদিও আমি এখানে অনেকবার এসেছি। আচ্ছা, এখানে কি কোনো তিব্বতী ছেলেকে দেখলেন যে অ্যান্টিক নিয়ে বসেছিল?

টগা বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু আগে বসেছিল ঐ গাছতলাটার নিচে।

এরই মধ্যে উঠে গেল?

তাই তো দেখলাম।

আচ্ছা, ওর কাছে কোনো জীবজন্তুর মুখ ছিল?

ছিল বৈকি।

বৃদ্ধ যেন আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

কোনদিকে গেল?

এই দিক দিয়ে নেমে গেল।

মিস্টার ফার্নান্ডেজ একটু ভাবলেন। তারপর তিব্বতী ছেলেটা যে পথে নেমে গিয়েছিল সেই পথে দ্রুত নেমে গেলেন। তাঁর পা দুটো বয়েসের ভারে আর পাথরে ঠোঁকর লেগে টলছিল। মনে হচ্ছিল এই বুঝি পড়ে গেলেন—কিন্তু পড়লেন না।

ফার্নান্ডেজ দ্রুত চোখের আড়ালে চলে গেলেও তিনজন কেমন হতভম্বর মতো সেই দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটা যেন খানিকটা ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে দিয়ে গেল।

বিকু বলল, আমায় যদি তোমরা বৃদ্ধটির সম্বন্ধে জিগ্যেস করো, তাহলে নির্দিধায় আমি বলব, লোকটি পাগল।

চপল বলল, মোটেই নয়। পাগল হলে এই আশি বছর বয়েসে কেউ বাঙ্গালোর থেকে এখানে বেড়াতে আসতে পারে? বেড়াবার আর জায়গা পেল না? আসলে ভালো করেই জানে এখানে এমন কিছু সম্পদ আছে যা অন্য কেউ জানে না।

টগা বলল, লোকটি যে সাধারণ মানুষ নয় সেটা সহজেই বোঝা যায়। উনি বারে বারে অকারণে এখানে ছুটে আসেন না। সদাশিববাবুও বললেন, এখানে এসে সারা দিন তিনি কোথায় থাকেন, কী করেন তা তিনিও আজ পর্যন্ত জানতে পারেননি। রহস্যটা এখানেই।

বিকু বলল, কেস জটিল। এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাঁজিয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে চলো ঐ চায়ের স্টলটায় বসে চা খেতে খেতে কথা বলা যাক।

টগা আড়ালে চপলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। অর্থাৎ বিকুর মতো ছেলের মনেও রহস্যের ঘোর লেগেছে।

পাহাড় থেকে একটু নেমে এসে তিনজন বসল তিন কাপ চা নিয়ে।

এ-কথা ও-কথার পর টগা বলল, পাদ্রিসাহেব সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যা শুনেছি আর আজ তাঁকে দেখে আমি কয়েকটা পয়েন্ট পেয়েছি। যেমন এক, কোনো বিশেষ গোপন আকর্ষণে তিনি বাঙ্গালোর থেকে এখানে ছুটে আসেন এই বয়েসেও। দুই, বিষয়টা এতই গোপন যে তিনি কাউকেই কিছু বলেন না। তিন, কালো চশমায় চোখ ঢেকে রাখেন। চার, অলৌকিক কুকুরের ডাক সম্বন্ধে তিনি অনেক কিছু জানেন। পাঁচ, পাহাড়ের ওপরের তিব্বতী ছেলেটাকে তিনি চেনেন। যে কোনো উদ্দেশ্যেই তাকে দরকার। মনে হয়, ছেলেটার কাছে যে কুকুরের মূর্তিটা আছে সেটাই তাঁর প্রধান আকর্ষণ।

বিকু অবাক হয়ে বলল, কেন?

টগা একটু হাসল। বলল, তা ঠিক বলতে পারব না। তবে আমি নিশ্চিত ঐ কুকুরের ডাক শুধুই কোনো একটা কুকুরের ডাক নয়। ঐ ডাকের মধ্যে মিশে আছে অলৌকিক কোনো ভয়ংকর কণ্ঠস্বর। পাদ্রিসাহেবও তা বোঝেন। আগেও তিনি ঐ গর্জন শুনেছেন বলেই কাল রাত্তিরে সবাই যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল তিনি বেরোননি। আজ সকালে তিনি ঐ তিব্বতী ছেলেটার খোঁজেই পাহাড়ে উঠেছিলেন।

টগার কথা শেষ হলে সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। শুধু বিকুই পার্স খুলে সকলের চায়ের পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বলল, আর এখানে দেরি করে লাভ নেই। বাংলায় চলো।

টগা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, শোন বিকু, তুই যদি আজই কলকাতায় ফিরে যেতে চাস তো চলে যা। আমি কিন্তু থাকব।

চপল বলল, বাঃ রে! তুই থাকবি আর আমি থাকব না? রহস্যের সন্ধান যখন পেয়েছি—

বিকু বলল, কলকাতায় আমি ফিরছি না। ঐ পাদ্রিসাহেবের ব্যাপারটা কী আমাকেও জানতে হবে। আমার মনে হয় এখানে বসে না গাঁজিয়ে বাংলায় গিয়ে পাদ্রিসাহেবের সঙ্গে আলাপ জমানোটাই কাজের কাজ হবে।

অন্য সময়ে বিকুকে এরা বড়ো একটা পাস্তা দেয় না। কিন্তু এখন এই শেষ কথাটা খুবই যুক্তিযুক্ত বলে ওদের মনে হলো। ওরা পাহাড় থেকে নেমে চুপচাপ বাংলোর দিকে এগিয়ে চলল।

### সদাশিববাবু কেমন লোক?

ওরা ব্রেকফাস্ট সেরেই পাহাড়ে গিয়েছিল। কাজেই একটা বড়ো কাজ হয়ে গেছে।

এখন সকাল প্রায় ন'টা। হাতে অফুরন্ত সময়। সময় কাটাবার উপযুক্ত উপায় পাদ্রিসাহেবের সঙ্গে গল্প করা। গল্প করতে করতে যদি পাদ্রিসাহেবের পেট থেকে কথা বার করা যায়! আর সেই উদ্দেশ্যেই তো ওরা তাড়াতাড়ি বাংলাতে ফিরে এসেছে।

কিন্তু পোড়া কপাল। পাদ্রিসাহেবের ঘরের সামনে গিয়ে দেখা গেল দরজায় তালা ঝুলছে। এটাই তো স্বাভাবিক!

তা হলে?

এমনি সময়ে ওদিকের অফিস-ঘর থেকে সদাশিববাবু ডাকলেন, তপেন্দুবাবু!

তপেন্দু অর্থাৎ টগা হাত তুলে সাড়া দিল। বাংলোর খাতায় এদের ভালো নামগুলো লেখা হয়ে আছে।

পাদ্রিসাহেব নেই। কাজেই অগতির গতি সদাশিববাবু। কাল রাত্তিরে যতটুকু কথাবার্তা হয়েছে তাতে তারা বুঝেছে মানুষটি ভালো। আর এখানকার অনেক কিছুই জানেন। টগার ইচ্ছে, একবার চেষ্টা করে দেখা যদি কোনো কথা বের করা যায়।

সকালে বেরিয়েছিলেন?

টগা বলল, হ্যাঁ, পাহাড়ে উঠেছিলাম।

কেমন লাগল পাহাড়-পুজো?

ভিড় দেখে পুজোর দিকে আর এগোইনি। এদিক-ওদিক ঘুরলাম। তবে পাদ্রিসাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। শুধু দেখাই।

কীরকম?

নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাইলেন কোনো তিব্বতী ছেলেকে অ্যান্টিক বেচতে দেখেছি কিনা। তার খবর দিতেই তিনি ছেলেটার খোঁজে তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন।

এ ছাড়া আর কোনো কথা বলেননি?

না। হঠাৎ গায়ে পড়ে আমাদের সঙ্গে আলাপই বা করবেন কেন? আমরা এসেছি জানবেনই বা কী করে?

সদাশিববাবু বললেন, কাল রাত্রেই জেনেছেন।

কী করে জানলেন?

ওঁর এবার একটু বড়ো ঘর দরকার বলে আপনাদের ঘরটাই নিতে চাইলেন। তখনই আপনাদের কথা বলতে হলো।

তাতে উনি কী বললেন? টগা জিগ্যেস করল।

বুড়ো মানুষ তো। কৌতূহলটা বেশি। তাই ক'জন এসেছেন, কোথা থেকে এসেছেন, কেন এসেছেন, কতদিন থাকবেন জিগ্যেস করলেন। একটু চা খান।

চপল বলল, পাহাড়ে চা খেয়ে আসছি।

তা হোক। শীতের দিন, চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

মহেন্দ্র শতপথী কাঁধে গামছা ফেলে দু'বালতি টাটকা জল পাদ্রিসাহেবের দরজার সামনে রেখে কিচেনের দিকে যাচ্ছিল, সদাশিববাবু চার কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন। তারপরেই যেন কিছু মনে পড়ল, একটু বসুন, আমি আসছি, বলেই উঠে গেলেন।

এরা তিনজন চুপচাপ বসে রইল।

চপল খোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল দূরের পাহাড়গুলোর দিকে। তার মনে হতে লাগল গাছপালায় ঢাকা ঐ পাহাড়গুলোর পাথরে পাথরে যেন রহস্য কত কাল ধরে দানা বেঁধে আছে।

বিকু লক্ষ্য করছিল মহেন্দ্রকে। চায়ের ট্রে হাতে করেই ওদিকের বারান্দায় একজন গুণামতো লোকের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছে।

কী এত কথা? চুরি-ডাকাতির ষড়যন্ত্র চলছে না তো?

আর টগা তাকিয়েছিল ফার্নান্ডেজের ঘরের দিকে। সব জানলাগুলো বন্ধ, এমনকি ভেতর দিকের জানলাগুলোও।

টগা অবাক হলো। এত সতর্কতা কিসের?

খুব হচ্ছা করল ঘরটার চারপাশ ঘুরে দেখে। সেইরকম মনে করে উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে সদাশিববাবু ঢুকলেন। পিছনে মহেন্দ্র শতপথী। টগার আর ঘরটা ঘুরে দেখা হলো না।

চা খেতে খেতে সদাশিববাবু বললেন, পাহাড়-পুজো তো দেখলেন। এবার কী দেখবেন?

টগা বলল, পুজো আর দেখা হলো কই? শুধু লোকের ভিড়। ভিড় দেখার জন্যে তো এখানে আসিনি।

তাহলে কি ফিরেই যাবেন?

চপল বলল, এখানে আর কিছু তো দেখার নেই?

আছে বৈকি। সিধিয়াটাড়ের সতীমেলার থান।

সে আবার কোথায়?

সদাশিববাবু বললেন, এখান থেকে মাইল দশেক দূরে সিধিয়াটাড়। টাড় মানে রক্ষ। এর কাছেই চরসা গ্রাম। সেই গ্রামের বধু সরলাদেবী স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় পুড়ে পুণ্যবতী সতী হয়েছিলেন। সেই সতীর স্মরণেই প্রতি বছর এই সময়ে ওখানে মেলা বসে। যেখানে চিতা জ্বলেছিল সেখানে একটা বেদি তৈরি করা হয়েছিল। তার ওপর ওড়ে লাল নিশান। গ্রামের বৌ-রা সেই বেদিতে স্বামীর কল্যাণে সিঁদুর লেপে দেয়। বহু নারী-পুরুষ আসে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে।

টগা বলল, সতী মাথায় থাকুন। ও জায়গা দেখবার আগ্রহ আমার মোটেও নেই।

হ্যাঁ, বরঞ্চ অন্য কোনো জায়গা যদি কাছেপিঠে থাকে, চপল বলল।

সদাশিববাবু হতাশ হয়ে বললেন, না, তেমন দ্রষ্টব্য জায়গার কথা তো আমি জানি না।

এরপর নিঃশব্দেই চা খাওয়া শেষ হয়ে গেল। কেউ কোনো কথা বলছে না। বিকুই নীরবতা ভাঙল। হেসে বলল, টগা একমনে কী এমন ভাবছে?

সদাশিববাবুও টগার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, তপেন্দুবাবু কাল রাতের সেই কুকুর ডাকের কথা ভুলতে পারছেন না বোধহয়।

টগা গম্ভীরভাবে বলল, ও যে ভোলার ব্যাপার নয় সদাশিববাবু। যদি আমি নিজে কানে না শুনতাম তা হলে হয়তো বিশ্বাসই করতাম না। কিন্তু যাক সে কথা। আমি ভাবছিলাম মিস্টার ফার্নান্ডেজের কথা। আচ্ছা, এবার উনি বড়ো ঘর চেয়েছিলেন কেন? মানুষ তো একা।

সদাশিববাবু যেন একটু অবাক হলেন। বললেন, তাই তো। কথাটা তো আমি ভেবে দেখিনি।

টগা বলল, সদাশিববাবু, মাত্র এক রাত্রির এখানে কাটিয়েই আমি বুঝতে পেরেছি এখানে রহস্যজনক কিছু আছেই। আর সেই রহস্যের সঙ্গে প্রধানত জড়িয়ে আছে দুটি জিনিস। এক—কোনো পশুর অলৌকিক গর্জন আর দুই—প্রায় আশি বছরের ঐ বুড়ো পাদ্রির অস্বাভাবিক ঘোরাঘুরি, দাপাদাপি।

সদাশিববাবু আঁৎকে উঠলেন। বললেন, চুপ চুপ, পাদ্রিসাহেব শুনতে পেলে এমন কাণ্ড বাধাবেন—

টগা সে কথায় কান না দিয়ে বলল, এই দুটো রহস্য ভেদ না করে আমরা এখান থেকে নড়ছি না। আর সত্যিই যদি এই রহস্য ভেদ করতে হয়, তাহলে সব আগে দরকার হবে আপনার সাহায্য। কেননা আপনি এখানে অনেক দিন আছেন অনেক কিছুই জানেন। অথচ আমাদের কাছে বলতে চাচ্ছেন না।

টগার এইরকম সোজাসুজি কথায় সদাশিববাবু যেন ধরা পড়ে গেলেন। ইতস্তত করে বললেন, ঠিক আছে। সম্বোধনীয় আসবেন। তখন কাজ থাকে না, আমি যতটুকু জানি তা বলব। তবে মিস্টার ফার্নান্ডেজ সম্বন্ধে আমি বেশি কিছুই জানি না তা বলে রাখলাম।

টগা সে কথা যেন শুনতে পেল না। বলল, আর একটা কথা। এখানে যিনি স্থানীয় পাদ্রি আছেন তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিতে হবে।

সদাশিববাবু বললেন, এখানে একজন পাদ্রি আছেন বটে তবে তাঁর সঙ্গে বিশেষ আলাপ নেই। আমি চার্চে যাই না। চার্চের কেউ বড়ো একটা এদিকে আসেন না। তবু আলাপ করিয়ে দেবার চেষ্টা করব। ঐ লাঞ্চার ঘণ্টা পড়ল। আপনাদের তো স্নানও হয়নি। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে ডাইনিংহলে আসুন।

ওঠবার সময় টগা বলল, কাল রাতে সেই কুকুরের ডাকটা পশ্চিমের ঐ পাহাড়টার দিক থেকে আসেনি?

তাই তো মনে হয়েছিল।

নিজেদের ঘরে ফিরে আসতে আসতে টগা আর একবার পাদ্রিসাহেবের ঘরের দিকে তাকাল। না, তিনি এখনও ফেরেননি।

### পাথরমহলের পথে

দুপুরে লাঞ্চার সেরে ওরা তিনজন ঘরে এসে ঢুকল। বিকু তৎক্ষণাৎ লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। ছুটির দিনে দুপুরে ফাস্ট ক্লাস একখানি ঘুম দিতে না পারলে তার চলে না। চপল বিছানায় বসে দেশলাই-এর কাঠি দিয়ে আরাম করে কান পরিষ্কার করছিল। কেবল হটফট করছিল টগা। রহস্য ভেদ করতে গেলে কি পেট ভরে খাওয়া আর কুস্তকর্ণের মতো ঘুম দিলে চলে?

এই চল না একটু ঘরে আসি।

বিকু কোনো উত্তরই দিলো না।

চপল বলল, এই দুপুর রোদে কোথায় যাবি?

দুপুর রোদ! শীতের দিনে পাহাড়ে রোদ যে কত আরামের—

তেমন শীত এখনও পড়েনি। তাছাড়া কাল রাতে ঘুমটা ভালো জমেনি। কী যে ছাই একটা বিশ্রী ডাক শোনা গেল, ব্যস ঘুম গেল চটে। এখন মেক আপ দিতে হবে।

সেই ডাকটা সম্বন্ধে জানতে কৌতূহল হয় না?

হবে না কেন? তা বলে সারা দুপুর পাহাড়ে, রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেই কি কৌতূহল মিটবে?

টগা বলল, সত্যি যদি রহস্য বলে কিছু থাকে তা হলে পশ্চিমের ঐ পাহাড়গুলোর কাছেই আছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কল্পনায় রহস্য ভেদ করা যায় না। আচ্ছা, তোরা ঘুমো। আমি একটু ঘুরে আসি।

চপল বলল, নতুন জায়গা। গোঁয়ারতুমি করে বেশি দূর যাস নে। তাছাড়া এখানে সম্ভো নামে তাড়াতাড়ি।

টগা সে কথায় কান না দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ঠিক কোথায় যাচ্ছে জানে না। কিন্তু কোন দিকে যাচ্ছে জানে। তার দৃঢ় বিশ্বাস পশ্চিম দিকে ঐ যে পাহাড়টা গাছপালায় কালো হয়ে আছে তারই কোনো গহ্বর থেকে কুকুরের সেই অস্বাভাবিক গর্জন শোনা গিয়েছিল। কিন্তু কেমন সেই জন্তু যা মাত্র একবারই ডাকে? কত জনে হয়তো একবছর-দু'বছরে মাত্র একবারই ডাক শুনেছে। কিন্তু সে ডাক যে জীবন্ত কোনো প্রাণীর তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

টগার মাথার ভেতর কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল। কিসের গর্জন ওটা? কুকুরের মতো। কিন্তু কুকুরের গর্জন কি অত ভয়ংকর হয়? যদি মেনেও নেওয়া যায় ওটা কুকুরেরই ডাক তাহলে কত বড়ো সেই কুকুরটা যার গর্জন পাহাড়-টীলা কাঁপিয়ে এত দূর পর্যন্ত এসে পৌঁছয়?

আচ্ছা কুকুরের গর্জনের সঙ্গে কি অন্য কোনো প্রাণীর স্বরও মিশেছিল? অনেকটা যেন অতিপ্রাকৃত জগতের মানুষের মতো?

আশ্চর্য, গত রাতে সেই ডাক শোনার পর থেকে সে যতটা ভাবছে, চপল, বিকু বা বাংলোর অন্য কেউ তারা কিছুই ভাবছে না।

টগা সেই দুর্গম পাথুরে পথ ধরে, ছোটো-বড়ো টিবি টপকে হেঁটেই চলেছে। শীতের দিন বলে ক্লাস্তি নেই।

কিন্তু ভয়ংকর সেই ডাকের চেয়েও অদ্ভুত মানুষ ঐ পাদ্রিটি। পাদ্রিদের ওপর সাধারণত মানুষের শ্রদ্ধা হয়। পাদ্রিদের দেখে মনে হয় তাঁরা যেন সংসারের যাবতীয় লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতার অনেক উর্ধ্বে। কিন্তু বাঙ্গালোরের এই ডিক ফার্নান্ডেজকে দেখলে পাদ্রি বলে মোটেই শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা করে না। কেন? তার কারণ বোধহয় লোকটি ধূর্ত, মতলববাজ। কারও সঙ্গে মিশতে চান না। সব সময়ে যেন কালো চশমা পরে নিজে লুকিয়ে রাখতে চান। শুধু তাই নয়, এই যে মানুষটা সকালে বেরিয়ে সেই রাস্তা দিয়ে ফেরেন—সারাদিন কী করেন? কোথায় থাকেন?

এদিকে এই পাহাড়ি জায়গায় এমন ঘর-বাড়ি চোখে পড়ছে না যে সেখানে তিনি থাকবেন। তাহলে তাঁর থাকবার একমাত্র জায়গা পুকুলিয়া কিংবা পুকুলিয়ার কাছাকাছি কোথাও। তাই যদি হয় তাহলে তিনি মরতে এত দূরে এই বাংলায় থাকতে এলেন কেন? নিশ্চয় পাহাড়-পুজো দেখাই তাঁর উদ্দেশ্য নয়।

হঠাৎ টগার হাঁশ হলো। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছন ফিরে দেখল—কোথায় কত দূরে তাদের বনবাংলোটা? দেখাই যাচ্ছে না। আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে, ইচ্ছে করে আসেনি, কেউ যেন ঠেলে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু কী লাভ হলো এত দূরে এসে? গাছ নেই, পালা নেই, মানুষজনের সাড়া নেই,



শুধু পাথরের রাজ্য। এদিকে শীতের বেলা ফুরিয়ে আসছে।...

হঠাৎ টগার নজরে পড়ল অনেক দূরে একটা ভাঙা বাড়ির মতো কী যেন রয়েছে। আর তার গা বেয়ে সরু হয়ে বেরোচ্ছে ধোঁয়া।

টগা অবাক হলো। এই জনমানবশূন্য পাথুরে রাজ্যে ধোঁয়া আসছে কোথা থেকে?

খুব ইচ্ছে করছিল আরও একটু জোরে হেঁটে ভাঙা বাড়িটা দেখে আসে। অন্তত বুঝতে পারে সত্যি বাড়ি, নাকি চোখের ভুল! বাড়ি হলে কিসের বাড়ি? কিন্তু এই সন্ধ্যার মুখে অত দূরে যেতে সাহস হলো না। ফিরতে হলো। একটা কথা মনে হলো। এই পাথুরে রাজ্যে তো মানুষের থাকার আশ্রয়ই নেই। তাহলে আদিবাসীদের বাস কোন দিকে? সকালের সেই তিব্বতী ছেলেটাই বা কোন দিকে গেল!

টগা আর একবার পিছন ফিরে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি নিশ্চল হয়ে গেল। অবাক কাণ্ড! দেখল বেশ কিছুটা দূরে টুপি মাথায়, কোট-প্যান্ট পরা কঞ্চির মতো সোজা একজন বৃদ্ধ টপাটপ পাথর উপক্রে এগিয়ে আসছেন। বুঝতে বাকি রইল না লোকটি কে? শুধু বুঝতে পারল না সারাদিন মানুষটা কোথায় ছিলেন?

যাই হোক, আর দেরি না করে টগা বাংলোমুখো পা চালাল। কিন্তু মিনিট দশেক হাঁটার পরই বুঝতে পারল পাথরের রাজ্যে পথ চিনে বাড়ি ফেরা কত কঠিন। কাছে-পিঠে, সামনে-পিছনে এমন কোনো চিহ্ন নেই যা দেখে পথ চিনবে। পথ? এই ছড়ানো পাথর, নুড়ি আর ঘাসের মধ্যে পথ কোথায়? অনেক দুর্গম জায়গায় পায় চলা পথও থাকে। এখানে তাও নেই। তাহলে ঐ বুড়ো মানুষটি কোন পথ ধরে অত দূর গেলেন?

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত টগলা বনবাংলোয় এসে পৌঁছিল। ওকে দেখে চপল, বিকু জিগ্যেস করল, কোথায় ছিলি সারা দুপুর?

বেড়াছিলাম। ছোট্ট উত্তর দিয়েই টগা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। নিচু গলায় জিগ্যেস করল, পাদ্রিসাহেব এখনও ফেরেননি তো?

চপল বলল, অনেকক্ষণ ফিরেছেন।

টগা চমকে উঠল, সে কী! আমি তো দেখলাম—

বিকু বলল, তা ঘণ্টাখানেকের উপর হলো উনি এসেছেন।

টগা নিজের মনে সময়ের হিসেব করে নিয়ে বলল, ঘণ্টাখানেক আগে! অসম্ভব! তাহলে কাকে দেখলাম অনেক দূরে, কোট-প্যান্ট পরা, টুপি মাথায়, এক-একটা পাথর উপক্রে দিবি এগিয়ে আসছে? সে কি অন্য কেউ? নাকি পাথরমহলের ইন্দ্রজাল?

### নীলকর সাহেবদের কথা

সদাশিববাবু বলেছিলেন বটে সন্ধ্যার সময়ে তেমন কাজ থাকে না, সেই সময়ে অফিসঘরে আসতে—গল্পওজব করা যাবে। কিন্তু দেখা গেল সদাশিববাবু তখন টিভি খুলে বসে আছেন আর বোর্ডাররা নিউজ শোনার জন্য সেখানেই জাঁকিয়ে বসেছে।

টগা অর্ধৈষ হয়ে উঠেছে। সদাশিববাবুর কাছ থেকে কিছু জানতে চায়। বিশেষ করে আজ দুপুরে ঐ জনশূন্য পাথুরে রাজ্যে গিয়ে দূর থেকে ভাঙা বাড়ি, বাড়ির পিছনে ধোঁয়া আর ওখানে পাদ্রিসাহেবকে দেখে তার সন্দেহ দৃঢ় হয়েছে যে, ওখানে গভীর রহস্য কিছু আছেই।

আচ্ছা, যদি ভুল দেখে না থাকে তাহলে ঐ বুড়ো পাদ্রিসাহেবের পক্ষে কী করে সম্ভব

হলো অত তাড়াতাড়ি বাংলায় ফিরে আসা? এ যে অমানুষিক ব্যাপার! সত্যি ফিরে এসেছে তো? ভেবে পাদ্রিসাহেবের ঘরের দিকে তাকাতেই দেখল কে একজন অন্ধকারে পাদ্রিসাহেবের ঘর থেকে চকিতে বেরিয়ে গেল। চিনতে দেরি হলো না। মহেন্দ্র শতপথী।

আশ্চর্য! পাদ্রিসাহেবের ঘরে এই সময়ে মহেন্দ্র কী করছিল?

টগাও যথাসম্ভব অন্ধকারে নিজেকে গোপন করে মহেন্দ্রের ঘরের দিকে গেল।

মহেন্দ্র!

মহেন্দ্র চমকে উঠল। আপনি বাবু এখানে?

কয়েকটা কথা জিগ্যেস করব। ঠিক ঠিক উত্তর দিও।

টগার গলার স্বরে মহেন্দ্র ভড়কে গেল। কোনোরকমে বলল, বলুন।

পাদ্রিসাহেব কেমন লোক ঠিক করে বলো তো।

মহেন্দ্র ইতস্তত করে বলল, কী করে বলব? কদিনই বা দেখছি।

তুমি ভালো করেই ওঁকে জান। একটু আগে ওঁর ঘরে কী কথা হচ্ছিল সত্যি করে বল।

মহেন্দ্র ভয় পেয়ে গেল। ভাবল কলকাতার এই বাবু নিশ্চয় আড়াল থেকে তাদের কথা শুনেছে। তাই হাতজোড় করে বলল, বিশ্বাস করুন বাবু, আমি রাজী হইনি।

কিসে রাজী হওনি?

আজ্ঞে ও পাদ্রি নয়, আস্ত শয়তান। আদিবাসীদের ঘর থেকে একটা ছোটো ছেলেকে ধরে এনে দিতে বলেছিল। ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে আনতে বলেছিল। ওষুধের সঙ্গে একশোটা টাকা দিতে চেয়েছিল। আমি রাজী হইনি। তাইতে খুব রেগে মারতে এসেছিল। আমি পালিয়ে এসেছি।

টগা স্তম্ভিত হয়ে গেল। বলল, ছেলে নিয়ে কী করবে?

জানি না বাবু। তবে—

তবে কী?

ঐ পাথরমহলে অনেক কিছু ঘটে বলে শুনেছি। ওখানে নাকি একটা ভয়ংকর দেবতা আছে—যেনার সঙ্গী, রাতে যেনাদের নাম করতে নেই।

টগা চুপ করে শুনল। তারপর বলল, তুমি ঠিক বলছ?

জগরনাথের নামে দিব্যি। একটু থেমে বলল, আপনি আজ দুপুরে পাথরমহলের দিকে গিয়েছিলেন। আর যাবেন না।

কে বলেছে ওদিকে গিয়েছিলাম?

সে আর নাই শুনলেন। আপনি এখন যান। পাদ্রিসাহেব যদি দেখে ফেলেন আপনার সাথে কথা বলছি তাহলে মেরে ফেলবে। আপনার ওপর খুব রাগ।

টগা বলল, কেন? আমি তাঁর কী করেছি?

তা আমি জানি না।

মেরে ফেলা অত সহজ নয়। তুমি একটা খবর আমাকে জানাতে চেষ্টা কর—কী আছে ঐ পাথরমহলে? আর আদিবাসীদের ছেলে নিয়ে কী করতে চায় পাদ্রিসাহেব?

জানবার চেষ্টা করব। আর আমি যা বললাম তা কাউকে বলবেন না।

তারপর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলল, আপনি ইঁদারার পাশ দিয়ে চলে যান বাবু। নইলে পাদ্রিসাহেব হয়তো দেখে ফেলবেন।

মহেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে টগা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। মহেন্দ্র যা যা বলল, তা কি সব সত্যি? কোন ভয়ংকর দেবতা আছেন ঐ পাথরমহলে? পাদ্রিসাহেবের সঙ্গে ঐ জায়গার সম্পর্কই বা কী? কেনই বা তিনি আদিবাসী ছেলের খোঁজ করছেন? কী করবেন তাকে নিয়ে?

এইসব ভাবতে ভাবতেই টগা ঢুকল সদাশিববাবুর অফিসঘরে। সেখানে তখন চপল আর বিকু চাড়া আর কেউ ছিল না।

টগাকে দেখে সদাশিববাবু হেসে বললেন, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ ভাই? আপনার সঙ্গে তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে আছে।

টগা বলল, পাদ্রিসাহেবের ঘরের কাছে ঘুরছিলাম। দেখা হলে আলাপ করতাম।

সদাশিববাবু যেন চমকে উঠলেন। বললেন, ওঁর ঘরের কাছে ঘুরছিলেন! সর্বনাশ! দেখতে পেলে রক্ষে রাখতেন না।

টগা হেসে বলল, কেন? আলাপ করা বুঝি পছন্দ করেন না?

সদাশিববাবু বললেন, মোটেই করেন না। মেজাজও খুব। বুঝলেন না একে বাঙ্গালোরের পাদ্রি, তার ওপর টু পাইস আছে।

টগা খুব সাবধানে ভেবে ভেবে প্রশ্ন করছিল। বলল, আজ দুপুরে কি উনি বেরিয়েছিলেন? ও বাবা! বেরোনোই তো ওঁর কাজ।

ফিরলেন কখন?

সেটা লক্ষ্য করিনি।

আচ্ছা, উনি বড়ো ঘর চাইছিলেন কেন?

জানি না। তবে মনে হয় কিছু রাখবেন। কারণ ছুতোর মিস্ত্রিরও খোঁজ করছিলেন।

চপল বলল, তা হলে বোধহয় এবার এখানে বেশ কিছুদিন থাকবেন?

সেইরকমই মনে হচ্ছে।

টগা বলল, এবার আসল ব্যাপারটা সম্বন্ধে জিগ্যেস করি।

বলুন। যদি জানা থাকে তাহলে সত্য উত্তর পাবেন। বলে পকেট থেকে সিগারেট ধরালেন। চলবে?

নাঃ। তিনজনেই একসঙ্গে উত্তর দিলো।

এই একটা জিনিস লক্ষ্য করছি ইয়ং ছেলেরা অনেকেই সিগারেট খাচ্ছে না। খুব ভালো।

টগা বলল, কালকে রাত্তিরের সেই অদ্ভুত গর্জনটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। আচ্ছা, শব্দটা ঠিক কোন দিক থেকে আসে বলে মনে হয়?

এ প্রশ্ন তো আগেও করেছেন। উত্তরও দিয়েছি। আবার বলছি, আন্দাজ করি পশ্চিম দিকে যে টিলা-পাহাড়গুলো আছে, ঐ দিক থেকেই আসে।

টগা দেওয়ালে ভালো করে ঠেসান দিয়ে বলল, ওটা কী ব্যাপার খোঁজখবর করতে হচ্ছে করে না? হাজার হোক বিজ্ঞানের যুগে তো আমরা বাস করছি।

সদাশিববাবু হাত নেড়ে বললেন, না মশাই। অত কৌতূহল আমার নেই। শুধু আমি কেন, কাছে-পিঠে তো অনেকেই বংশানুক্রমে বাস করেন। তাঁরা কেউ রহস্যভেদ করতে গেছেন? ও মশাই, রহস্য রহস্যই থাক। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

এতক্ষণে বিকু বলল, আমারও তাই মত। এই দেখুন না, টগা আজ দুপুরে ঐ দিকে গিয়েছিল।

সদাশিববাবু চমকে উঠলেন, অ্যাঁ!

টগা হেসে বলল, ওর কথা বাদ দিন। আচ্ছা, এখানে তো বেশিরভাগ আদিবাসী। তারা ঐ গর্জনটাকে কীভাবে নেয়?

তারা? তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে ঐ শব্দটা অশুভ। কোনো ক্রুদ্ধ দেবতার গর্জন। আর সেই দেবতা থাকেন ঐদিকের পাহাড়ে। তারা মনে করে ঐ গর্জনের পরিণতি একদিন মারাত্মক হয়ে উঠবেই এখানকার মানুষদের জীবনে। যে রাতে গর্জন শোনা যায় পরের দিনই ওরা সেই দেবতার উদ্দেশ্যে মুর্গি বলি দেয়। কৃপা ভিক্ষা করে।

এই পর্যন্ত বলে সদাশিববাবু থামলেন। তারপর বেল বাজিয়ে শতপথীকে ডাকলেন। শতপথী এসে দাঁড়াল। টগা তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। হঠাৎ যেন কিসের ভয়ে তার মুখের সমস্ত রক্ত নিঃশেষ হয়ে গেছে। সদাশিববাবু অত লক্ষ্য করলেন না। তিনি ফের চার কাপ চা দিতে বললেন।

টগা জিগ্যেস করল, এখানে পাথরমহল কোন জায়গাটাকে বলে?

সদাশিববাবু বললেন, এ নামটা শুনলেন কোথা থেকে?

শতপথী চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। করুণ চোখে টগার দিকে তাকাল।

টগা মিথ্যে কথাই বলল। আজই দুপুরে বেরিয়েছিলাম ঐদিকে। বেশ লাগছিল। একজন আদিবাসীকে জিগ্যেস করে জানলাম ঐ জায়গাটাকেই পাথরমহল বলে।

সদাশিববাবু একটু হেসে বললেন, তবে আর কি, উত্তর তো পেয়েই গেছেন। কী রে! তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন?

মহেন্দ্র যেন কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল।

টগা ইতস্তত করে বলল, উত্তর পেয়েছি বটে কিন্তু খটকা আছে।

কীরকম?

মহল কথাটাই গোল বাধাচ্ছে। আমরা নবাবী আমলে অনেকবার ‘মহল’ কথাটা পেয়েছি। তাতে নির্দিষ্ট কোনো জায়গাকে বোঝায়। যেমন ‘তাজমহল’, ‘শিশমহল’, ‘রঙমহল’। তাই আমার ধারণা ‘পাথরমহল’ বলতেও কোনো অঞ্চল নয়, নির্দিষ্ট জায়গা বোঝায়। আমার কৌতূহল সেই বিশেষ জায়গাটা কোথায়? কী ছিল সেখানে? আর এর উত্তর একমাত্র আপনিই দিতে পারেন।

সদাশিববাবু মনে মনে খুশি হলেন। মাথা চুলকে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, এখান থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার পশ্চিমে পাহাড়ের কোলে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বড়ো বড়ো কয়েকটা বাড়ির চিহ্ন পড়ে আছে। বাড়িগুলোর যে অংশগুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে তা দেখলে নাকি মনে হয় যেন আগাগোড়া পাথরের তৈরি। কেউ বলে ওগুলো বাঘমুণ্ডির রাজাঠাকুর বয়ার সিংহের কাছারিবাড়ি। কেউ বলে নীলকর সাহেবদের ঘাঁটি।

নীলকর! হঠাৎ বিকু বলে উঠল, এই ব্যাপারটা খুব শুনেছি। কিন্তু ঠিক জানি না। আগে নাকি নীলের চাষ হতো। এখন হয় না কেন?

সদাশিববাবু কিছু বলার আগেই টগা বলে উঠল, ডাই অর্থাৎ নীল রং তৈরির জন্য একসময়ে এই নীল গাছের চাষ হতো খুব। সাহেবরা এদেশে এসে এই নীলের চাষ করে বড়োলোক হয়ে গিয়েছে।

চপল বলল, সে নীল উঠে গেল কেন?

টগাই উত্তর দিলো, এখন কেমিক্যাল ডাই বেরিয়ে গেছে।

সদাশিববাবু বললেন, সে সময়ে এই নীল চাষ নিয়ে যে বিরাট কর্মযজ্ঞ হতো তা ভাঙাচোরা

নীলকুঠিগুলো দেখলেই বোঝা যায়। চাষীদের ওপর কম অত্যাচার করেছে সাহেবরা! দীনবন্ধু মিত্র তাই নিয়েই ‘নীলদর্পণ’ নামে নাটক লিখে ফেললেন। সেই নাটক দেখতে দেখতে বিদ্যাসাগরমশাই রাগে সাহেবের দিকে চটিই ছুঁড়ে মারলেন। ভুলেই গিয়েছিলেন ওটা অভিনয় হচ্ছিল। এসব তো ইতিহাস!

টগা বলল, সেই ‘পাথরমহলে’ কেউ এখন থাকে?

সদাশিববাবু হাসলেন। বললেন, যদি কেউ থাকে তাহলে তারা সাহেবদের হাতে খুন হওয়া হতভাগ্য চাষীদের আত্মা।

এই পর্যন্ত বলে সদাশিববাবু থামলেন। বললেন, রাত হয়েছে। আজ আর নয়।

মহেন্দ্র ঘরে ঢুকল চায়ের কাপ নিয়ে যাবার জন্য।

টগা বলল, আর একটা কথা জিগ্যেস করব।

সদাশিব নিঃশব্দে হাসলেন।

বলুন।

বাস্তালোর থেকে আসা বৃদ্ধ পাদ্রিটিকে আপনার কীরকম লাগে? কেন তিনি মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন?

সদাশিববাবু বললেন, জানি না।

আচ্ছা, আমাদের সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল কেন?

তাও জানি না ভাই। একবার শুধু জিগ্যেস করেছিলেন কোথায় কোথায় ঘুরবে ওরা? বলেছিলাম জানি না। এই পর্যন্ত।

টগা বলল, খুব ইচ্ছে ছিল একবার ওঁর মুখোমুখি হওয়া। দেখা যাক—

ঠিক সেই মুহূর্তেই যে লম্বা, শীর্ণ, বৃদ্ধ, প্যান্ট-শার্ট পরা মূর্তিটি উত্তেজিতভাবে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, বুখতে বাকি রইল না তিনিই বাস্তালোরের পাদ্রিসাহেব। রাতের বেলাতেও তাঁর চোখে কালো চশমা!

চাপা খসখসে গলায় তিনি বললেন, মিস্টার ম্যানেজার, অনুগ্রহ করে আমার রাতের খাবারটা ঘরে পৌঁছে দিতে বলবেন? অনেক রাত হয়েছে।

সদাশিববাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সে কী! মহেন্দ্র এখনও আপনার খাবার দেয়নি? ও এখন আমাকে অবজ্ঞা করে।

মহেন্দ্র তখনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পাদ্রিসাহেব শুধু একবার টগাদের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখে নিলেন। কালো চশমার মধ্যে দিয়েই তাঁর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি আগুনের মতো জ্বলে উঠল।

## দুই পাদ্রি

ভোরবেলায় উঠে টগা কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল। ফিরল যখন বেলা প্রায় ন’টা। বিকু তখনও ঘুমোচ্ছিল। চপল বলল, বাবাঃ, এতক্ষণ ধরে কোথায় বেড়ালি?

জায়গাটা একটু ঘুরে দেখছিলাম। দূরে একটা পাহাড় আছে। দেখলাম তার রঙটা অদ্ভুত ধরনের কালো। দেখলে কেমন যেন ভয় করে।

চপল সে কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বলল, এদিকে একটা কাণ্ড হয়েছে।

কী হলো আবার?

বাস্তালোর থেকে পাদ্রি এসেছে শুনে এখানকার চার্চের পাদ্রি সকালবেলাতেই আলাপ করার জন্যে ছুটে এসেছেন।

সে তো ভালো কথা।

ভালো আর হলো কই? আমাদের পাদ্রিসাহেব বললেন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া তিনি কারও সঙ্গেই দেখা করেন না। এখানকার চার্চের পাদ্রি খুব লজ্জা পেলেন। তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিলেন। সদাশিববাবুও মিস্টার ফার্নান্ডাজেকে বিশেষ করে অনুরোধ করলেন শুধু পাঁচ মিনিটের জন্যে দেখা করতে। কিন্তু কোনো ফল হলো না। এখন—তুই আলাপ করতে চেয়েছিলি শুনে তোর জন্যে বসে আছেন।

আমার জন্যে বসে আছেন! কোথায়?

সদাশিববাবুর অফিস-ঘরে।

টগা তখনই ছুটল।

সাদাসিধে সরল মানুষটি। বৃদ্ধ হয়েছেন। মুখে শুভ্র দাড়ির সঙ্গে শুভ্র হাসি। দেখলেই শ্রদ্ধা হয়। নাম বিনয় মজুমদার। গলায় কালো কারে ঝুলছে পবিত্র ক্রুশচিহ্ন। এখানে যে ছোটোখাটো চার্চটি আছে সেখানেই প্রার্থনা করেন প্রতি রবিবার। এখানে খ্রিস্টান পরিবার বেশি নেই, থাকবার কথাও নয়। তবে যে ক'জন আছেন তাঁরা নিয়মিত চার্চে যান। সুদূর বাস্তালোর থেকে একজন অবাঙালি পাদ্রি এসেছেন অখ্যাত, অল্প পরিচিত এই মাঠাবুরু অঞ্চলে, এ কি কম কথা! এর আগেও তিনি যখন এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন তখন দেখা করতে পারেননি। যেদিন দেখা করতে এসেছিলেন তার আগেই তিনি চলে গিয়েছিলেন।

একজন পাদ্রি হয়ে সুদূর বাস্তালোর থেকে এতদূর এলেন বার তিনেক, তবু কোনোবারই স্থানীয় চার্চে গেলেন না, এখানকার খ্রিস্টানদের সঙ্গে আলাপ করলেন না, এমনকি চার্চটিও দেখলেন না—এ স্কেভাঁদের সবার মনে থাকলেও খুব ইচ্ছে ছিল এবার তাঁকে এখানকার খ্রিস্টান সমাজ থেকে সংবর্ধনা দেবে। কিন্তু কী আশ্চর্য! ভদ্রলোক নিজে পাদ্রি হয়েও আর একজন পাদ্রির সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করলেন না! বিনয় মজুমদার এর জন্যে মনে মনে দুঃখ পেলেও টগার কাছে তার জন্যে স্কেভা প্রকাশ করলেন না। উলটে বললেন, দোষ তো আমারই। আগে থেকে না জানিয়ে এলে এই সব ব্যস্ত ভি. আই. পি. মানুষের কি দেখা পাওয়া যায়?(অথচ মিস্টার ফার্নান্ডেজ তখন দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরেই রয়েছেন।)

বিনয় মজুমদার একবারও জানতে চাইলেন না কী উদ্দেশ্যে মিস্টার ফার্নান্ডেজ এখানে এসেছেন। অহেতুক কৌতূহল প্রকাশ করাটা যে অভদ্রতা এই বৃদ্ধ পাদ্রি তা জানেন।

যাই হোক, খুব অল্প সময়ের মধ্যে টগার সঙ্গে আলাপ করে তিনি খুশি হলেন। এমনকি চার্চে তাঁর কোয়ার্টারে যাবার নেমস্তন্ন পর্যন্ত করলেন।

টগা মনে মনে এই সুযোগটাই খুঁজছিল। বলল, আমি আজই বিকেলে যাব। আপনার মতো অভিজ্ঞ মানুষের সঙ্গে পেলে এখানকার বিষয় অনেক কিছু জানতে পারি।

একটু হতাশ হয়ে বিনয়বাবু বললেন, এখানে এমন কী ইতিহাস আছে যা বলে আপনার মতো কলকাতার একজন আধুনিক ছেলের কৌতূহল নিবারণ করব? ঠিক আছে। আপনি আসুন তো। তবে বিকেলে যদি আসেন অবশ্যই টর্চ সঙ্গে নেবেন। অন্ধকার হয়ে গেলে পথঘাট নানা কারণে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

বলে বিনয়বাবু মাথায় হ্যাট পরে বাইরে এসে সাইকেলে চেপে বসলেন।

বিনয়বাবু চলে যেতেই আর এক কাণ্ড! মিস্টার ফার্নান্ডেজ খুব চেষ্টামেচি করে মহেন্দ্রকে

ডাকলেন। ভয়ে ভয়ে মহেন্দ্র গিয়ে দাঁড়াল। পাদ্রিসাহেব কৈফিয়ৎ চাইলেন, কেন তাঁর ঘুম ভাঙানো হয়েছে?

নিরপরাধ মহেন্দ্র যখন জানাল এখানকার পাদ্রিবাবা দেখা করতে এসেছেন বলেই ম্যানেজারবাবু তাঁকে ডাকতে বলেছিলেন, তখন রাগে অন্ধ হয়ে ফার্নান্ডেজ সদাশিববাবুর কাছে একরকম ছুটে গিয়ে বললেন, আপনাদের এই ভূত্যাতি বড়োই দুর্বিনীত, অবাধ্য। তা ছাড়া সে প্রায়ই আমার ঘরে ঢুকে তত্ত্ব-তালাশ করে। একে তাড়িয়ে দিন। নইলে আমি এখানে থাকব না।

সদাশিববাবু এমনিতে খুব ধীর, শাস্ত মানুষ। কিন্তু ফার্নান্ডেজের মেজাজ, অকারণে নির্দোষ মহেন্দ্রের ওপর দোষারোপ তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না। বললেন, মহেন্দ্র এখানে অনেকের চেয়ে পুরনো লোক। কাজেই কেউ ভয় দেখালেও তাকে এখান থেকে আমি সরাব না।

তাই নাকি? আ—চ্ছা—কিন্তু 'Angry Hound' যদি নিজেই সরাতে ইচ্ছে করেন? বলে একটানে চশমাটা খুলে ফেললেন। চশমা খোলা অবস্থায় তাঁকে বড়ো একটা দেখা যায় না। এই মুহূর্তে তাঁর লাল লাল চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে সদাশিববাবু আঁৎকে উঠলেন। ও তো মানুষের চোখ নয়, হিংস্র কুকুর জাতীয় কোনো পশুর।

মিস্টার ফার্নান্ডেজ তাড়াতাড়ি চশমাটা পরে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

### সারমেয়রাজ

বিকেল হতে না হতেই টগা বিনয়বাবুর কোয়ার্টারে চলে এল। খুব একটা দূরে নয়। খুঁজতেও অসুবিধে হয়নি। এখানে সবাই তাঁকে 'পাদ্রিবাবা' বলে। খুব শ্রদ্ধা-ভক্তিও করে।

জায়গাটা এককথায় বেশ মনোরম। উঁচু-নিচু রক্ষ পাথুরে বটে তবু অনেকখানি সমতল জায়গা আছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শালগাছ, আর একরকম কী পাহাড়ি গাছ—নাম জানা নেই। কাছেই চার্চ। প্রতিবছর রঙ ফেরানো হয়। চারিদিকে ফুলের বাগান। বাগানের পরিচর্যার জন্য মালী আছে। চার্চের বাইরে বাগানের ধারে ধারে লোহার বেঞ্চ। জায়গাটি নিস্তরঙ্গ।

বাঃ! চমৎকার জায়গাটা তো।

বিনয়বাবু দাড়িতে হাত বুলিয়ে স্নিগ্ধ হাসলেন।

কিন্তু সামনেই ফাস্ট এড বক্সটা মোটেই মানাচ্ছে না।

বিনয়বাবু বললেন, ওটা শোভাবর্ধনের জন্যে নয়, প্রয়োজনে। পাশেই ছোটো একটা ঘরকে O.T. হিসেবে ব্যবহার করা হয়। চলনসই একজন ডাক্তারও আছেন! বুঝতেই পারছেন শুধু প্রেয়ার করলেই তো চলে না। রোগ-ব্যাদি আছে। তাকে তো অস্বীকার করা যায় না। বলে হাসলেন একটু।

টগার শুনে ভালো লাগল। এবার অন্য প্রশঙ্গ তুলল, শুনেছি আর একটা চার্চ নাকি আছে?

বিনয়বাবু বললেন, এর চেয়েও পুরনো একটা চার্চ ছিল ডাচদের আমলের। সেটা এখন ভেঙে পড়েছে। অব্যবহার্য। তার সঙ্গেই ছিল একটা সিমেন্ট্রি। প্রধানত ডাচদের জন্যে। কখনও কখনও ইংরেজদের বডি সমাহিত করা হতো বটে। কিন্তু নেটিভদের বা আদিবাসী খ্রিস্টানদের দেহের ঠাই হতো না, সেইজন্যে ওটা এখন পরিত্যক্ত কবরস্থান। নতুন বা চলতি কবরখানাটা একটু দূরে।

কথা বলতে বলতেই চা আর স্যাডুইচ এসে গেল।

বিনয়বাবু যে মিস্টার ফার্নান্ডেজের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার পেয়েছেন সে বিষয়ে একটি কথাও তুললেন না। কোনো অজুহাতে নিন্দাও করলেন না। নিন্দা করা যেন তাঁর স্বভাবের বাইরে।

বিনয়বাবু অন্য দু-চারটে কথা বলে জিগ্যেস করলেন, কী জানতে চান বলুন।

টগা সময় নষ্ট না করে সোজাসুজি জিগ্যেস করল, সেদিন রাত্তিরে এক ধরনের ভয়ংকর কুকুরের ডাক শুনেছিলেন তো?

প্রথমেই এই ধরনের প্রশ্ন সম্ভবত বিনয়বাবু আশা করেননি। একটু ইতস্তত করে বললেন, আপনি কি ‘সারমেয়রাজ’-এর কথা জিগ্যেস করছেন?

টগা বলল, দেখুন ‘Angry Hound’ কি ‘সারমেয়রাজ’ তার কিছুই জানি না। শুধু—

দাঁড়ান দাঁড়ান। কি বললেন, ‘Angry Hound’? এ নামটা আবার কোথায় পেলেন?

বাস্তালোরের পাদ্রিসাহেব মিস্টার ফার্নান্ডেজ কথায় কথায় বলে ফেলেছিলেন। ‘Angry Hound’ বলতে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন তা জানি না। তবে আন্দাজ করেছিলাম কুকুরের গর্জন প্রসঙ্গেই কথাটা বলেছিলেন। আর বলেছিলেন ঐ একবারই।

বিনয়বাবু চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, না, ঐরকম নাম আমি শুনিনি। আমি কেন—আমরা কেউই শুনিনি। হতে পারে অন্য জায়গায় ঐ নামটাই প্রচলিত।

টগা একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, কার নাম, কী বৃত্তান্ত একটু খুলে বলবেন?

বিনয়বাবু ধীরে ধীরে বললেন, হ্যাঁ, সেই অদ্ভুত গর্জন আমিও শুনেছি। অনেকদিন পরপর দু-একবার শোনা যায়। এখানকার সাধারণ লোক বলে ওটা ক্রুদ্ধ দেবতার গর্জন। বলি চাইছেন। ঐ হংকার শুনলে সে বছর কিছু না কিছু ক্ষতি হবেই। কিন্তু মজা এই—তেমন কোনো ক্ষতি এতকালের মধ্যে হয়নি, আর সেই ক্রুদ্ধ দেবতাটি কে জানেন? ভয়ঙ্কর একটি শিকারী কুকুর।

টগা বলল, যাকে মিস্টার ফার্নান্ডেজ বলেছিলেন ‘Angry Hound’ আর আপনি বললেন ‘সারমেয়রাজ’ অর্থাৎ ‘কুকুরের রাজা’।

রাইট!

সত্যিই জীবন্ত কোনো কুকুর আছে নাকি? থাকলে তার কাজ কী? ঠিকানাই বা কী?

দাঁড়ান ভাই, অত ব্যস্ত হবেন না। আপনি যখন আমার কাছে জানতে এসেছেন তখন যতটুকু যা জানি তাই বলছি।

বিনয়বাবু একটু থামলেন। তারপর বলতে লাগলেন, এখানে আসার ঢের আগে, আমার যৌবনকালে কলকাতার একটু পুরনো বই-এর দোকানে একটা অতি পুরনো ইংরিজি বই পেয়েছিলাম। বইটার নাম ‘The God and Goddess of the uncivilized class’ অর্থাৎ ‘অসভ্য জাতির দেবদেবীরা’। এই বইটার মধ্যে একটা অধ্যায় ছিল—‘Ghost in the guise of Dog’—অর্থাৎ কুকুররূপী ভূত। আমাদের দেশে এবং বিদেশে ভয়ংকর সব ভূতের গল্পে কালো বেড়ালের একটা বিশেষ ভূমিকা দেখা গেছে। কিন্তু কুকুর-ভূতের কথা শুনিনি। ঐ বইটাতেই প্রথম পড়লাম।

টগা বলল, এই কুকুর-ভূতদের কোথায় দেখা মেলে?

বিনয়বাবু বললেন, বিশেষ করে ছোটোখাটো পাহাড়ের রেঞ্জ যেখানে আছে সেখানেই এদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়—আর তা ভারতের যে কোনো জায়গায় হতে পারে। সেইজন্যই



বোধহয় মিস্টার ফার্নান্ডেজ তাঁর জ্ঞানমতো বলেছিলেন 'Angry Hound'। আমাদের এখানে তার পরিচয় 'সারমেয়রাজ'।

খুব ইনটারেস্টিং লাগছে। উৎসাহিত হয়ে টগা বলল। কিন্তু এই কুকুর-দেবতা বা কুকুর-ভূতের ক্রিয়াকলাপ কী? শুধুই কিংবদন্তির মধ্যে বেঁচে আছে, না কুকুরের চেহারা নিয়ে থাকে? কারাই বা তার পূজো করে? কীভাবে করে? সেই গর্জনটাই বা কিসের?

এবার বিনয়বাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তপেন্দুবাবু, খোলাখুলি বলি। এখানকার বেশির ভাগ মানুষ সংস্কারাচ্ছন্ন। তাদের বিশ্বাস এখান থেকে মাইল তিনেক পশ্চিমে যে পাহাড়ের রেঞ্জ দেখা যায়—সেখানে রহস্যময় ভয়ংকর কিছু ব্যাপার আছে বহুকাল থেকে। সেটা যে ঠিক কী তা আমি বলতে পারব না। বাস্তবে কোনো কুকুরের অস্তিত্ব আছে কিনা তাও আমি জানি না। আবার এও ভাবি যদি কুকুর নাই থাকে তাহলে 'সারমেয়রাজ' নাম প্রচার হলো কেন? গর্জনটাই বা কিসের? সবই অনুমান। কারণ আমি কখনও সেখানে যাইনি। যাবার ইচ্ছেও নেই।

এইভাবে বিনয়বাবু যেন অনেক কিছু এড়িয়ে গেলেন।

টগার হঠাৎ মহেন্দ্রর একটা কথা মনে পড়ে গেল। বলল, আচ্ছা, একটু আগে আপনি বললেন, এই ভূতটি কিংবা দেবতাটি মাঝে মাঝে বলি চান। এটা আপনি বিশ্বাস করেন?

প্রশান্ত হেসে পাদ্রিবাবা বললেন, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা থাক। বই-এ পড়েছিলাম এঁরাও মাঝে মাঝে ক্ষুধিত হন। ক্ষুধিত হলেই গর্জন করেন। সে সময়ে কেউ যদি শিশু-মাংস দিতে পারে তার ওপর তিনি খুশি হন। তাকে সর্বশক্তিমান করে দেন।

টগা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। মনে মনে বলল, এইজনেই বুঝি ফার্নান্ডেজের আদিবাসীদের একটা ছেলের দরকার পড়েছিল?

বিনয়বাবু জিগ্যেস করলে, আপনার আর কিছু প্রশ্ন আছে?

টগা বলল, আপনার মতো জ্ঞানী মানুষের কাছে বসে থেকে আরও অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আপনার সময়ের দাম আছে। তবু জিগ্যেস করি—আজ না হয় আপনার বয়েস হয়েছে। কিন্তু অল্প বয়েসে কখনও ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখে আসতে ইচ্ছে করেনি?

বিনয়বাবু স্বচ্ছন্দে মাথা নেড়ে বললেন, না।

কেন?

বিনয়বাবু বললেন, দেখুন, মানুষ যতই অহংকার করুক তার জ্ঞানের পুঁজি কিন্তু খুব অল্প। এই পৃথিবীতে কত-না অজানা রহস্য লুকিয়ে আছে, তার কতটুকু মানুষ সমাধান করতে পেরেছে! সব রহস্য জেনে ফেলে লাভই বা কী? আর জানাটা কি খুব সহজসাধ্য? মোটেই না। হিমালয়ের এক-একটা শৃঙ্গ আবিষ্কার করা যায় কিন্তু হিমালয়ের বিশাল দেহে গভীর জঙ্গলে এখনও কত রকম হিংস্র, নিরীহ প্রাণী লুকিয়ে আছে, তা কি সব আবিষ্কৃত হয়েছে বলে মনে করেন? না, হয়নি। তাতে মানুষের কোনো ক্ষতিও হয়নি।

একটু থেমে বললেন, পশ্চিম পাহাড়-অঞ্চলে এখনও বিরাট বিরাট বাড়ির ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে বলে শুনেছি। ওখানে নাকি এক সময়ে অত্যাচারী নীলকর সাহেবরা ছিল। অকথা অত্যাচার করেছে তারা গরিব দুর্বল চাষীদের ওপর। অনেক চাষীকে মরতে হয়েছে। কেউ কেউ বলে তাদের আত্মা এখনও প্রতিশোধ নেবার জন্যে ঘুরে বেড়ায় ঐ অঞ্চলে। আবার টম সাহেবের কথাও শুনেছি। তার নাকি বিরাট একটা হাউন্ড বা শিকারী কুকুর ছিল। চাষীদের পিছনে হাউন্ডটাকে লেলিয়ে দিত। হাউন্ডটা তাদের দাঁতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত।

তারপর একদিন নীলচাষীরা হৈ হৈ করে গিয়ে হাউন্ডটার খাঁচায় আঙুন ধরিয়ে দেয়। সেদিন টম সাহেব গুলি করে অনেক নীলচাষীকে মেরেছিল কিন্তু আঙুনের হাত থেকে টমও বাঁচেনি, তার শয়তান কুকুরটাও না। বই-এ লেখা না থাকলেও এখানকার অনেকে বিশ্বাস করে সেই হাউন্ডটার প্রেতাত্মা নাকি এখনও পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায় মানুষের রক্তপানের নেশায়।

এই পর্যন্ত বলে বিনয়বাবু একটু থামলেন। বললেন, এসব আমি যেমন বিশ্বাস করি না তেমনি অবিশ্বাস করার সাধ্যও আমার নেই তপেন্দুবাবু। তাই ভাবি, কিছু কিছু রহস্য না হয় অমীমাংসিতই থাক। ক্ষতি কী?

টগা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যাবার সময় আমার শেষ প্রশ্ন—যদিও মিস্টার ফার্নান্ডেজের সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি তবু তাঁর সম্বন্ধে আপনার ধারণা কিরকম?

হঠাৎ এ কথায় বিনয়বাবুর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। কঠিন গলায় বললেন, শুনুন, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করেননি সেটা ওঁর মতো লোকের পক্ষে কিছু অস্বাভাবিক নয়। ভদ্রলোকটি নামেই একজন পাদ্রি। আসলে একজন বিপজ্জনক মানুষ। আপনি আমার ছেলের মতো তাই পরামর্শ দিচ্ছি যতটা সম্ভব ওঁকে এড়িয়ে চলবেন। এখানে উনি মাঝে মাঝে যে আসেন সেটা যে কতটা অসৎ উদ্দেশ্যে তা ভাবতে পারবেন না।

টগা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, আপনি তাঁর সঙ্গে একটি কথাও না বলে তাঁকে জানলেন কি করে?

একটু অপেক্ষা করুন। বলে বিনয়বাবু ভেতরে চলে গেলেন। একটু পরে ফিরলেন একটা খাম হাতে করে।

বাঙ্গালোর চার্চ থেকে এই টেলিগ্রামটা আমার নামে এসেছিল। পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন কেন তাঁর সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করতে গিয়েছিলাম।

টগা পড়ে ফেলল। তারপর টেলিগ্রামটা ফেরত দিয়ে বলল, এখন আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। ধন্যবাদ আপনাকে। বলে টগা বেরিয়ে গেল।

### অ্যাংরি হাউন্ড

পাদ্রিবাবার কাছ থেকে ফিরে এসে টগা খুব অন্যমনস্ক হয়ে রইল। অনেকরকম চিন্তা তার মাথায় ঘুরতে লাগল। দেখল সদাশিববাবুর কথার সঙ্গে বিনয়বাবুর কথার অনেক মিল। তবে বৃদ্ধ বিনয়বাবু এই অঞ্চলের রহস্য নিয়ে অনেক কিছু পড়াশোনা করেছেন। তবু তিনিও পরিষ্কার বলতে পারলেন না ‘সারমেয়রাজ’ বলে বাস্তবে কিছু আছে, না ওটা টম সাহেবের শিকারী কুকুরের প্রেতাত্মা! না কি কুকুরের গর্জনটা প্রাকৃতিক একটা হঠাৎ শব্দ মাত্র! আসলে রহস্য নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে চান না। তিনি চান রহস্যটা রহস্যই থাক।

বাস্তবে কুকুর-দেবতা বা কুকুর-ভূত থাক বা না থাক পুরনো ইংরিজি বই পড়ে জেনেছেন এই সারমেয়টি মাঝে মাঝে শিশু-রক্তের জন্যে তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে আর তখনই গর্জন করে। বিনয়বাবুর এই কথার সঙ্গে অদ্ভুত মিল পাওয়া গেল বন-বাংলোর মহেন্দ্র শতপথীর কথার। ফার্নান্ডেজ সাহেব নাকি ওকে আদিবাসীদের একটা ছোটো ছেলে যোগাড় করে দিতে বলেছিলেন। ফার্নান্ডেজ সাহেব যে সেই নীলকুঠিতে অস্তত একবার গিয়েছিলেন টগা তার প্রমাণ পেয়েছে। কাজেই সেই রাত্রে সেই ভয়ংকর গর্জন শোনার পর ‘Angry Hound’ বা ‘সারমেয়রাজ’-

এর কাছে বলি দেবার জন্যেই যে ফার্নান্ডেজ সাহেব আদিবাসী-শিশুর খোঁজ করছিলেন তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু এসব তথ্য ছাড়াও বিনয়বাবু তাকে যে টেলিগ্রামটি দেখিয়েছিলেন, সেটা পড়ে টগা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। কী উদ্দেশ্যে তাঁর এখানে আসা সে বিষয়ে ইঙ্গিত আর সেইসঙ্গে ফার্নান্ডেজের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন বাঙ্গালোরের চার্চের কর্তৃপক্ষ। আর এইজন্যেই বিনয়বাবুর মতো একজন বৃদ্ধ পাদ্রি নিজে এসেছিলেন আলাপ করতে।

এই হলো পরিস্থিতি। এর মধ্যে টগাদের কি কোনো কর্তব্য আছে?

না, কখনই না। তবে টগার একান্ত ইচ্ছে আর কেউ সঙ্গে থাক বা না থাক, সে একবার ঐ নীলকুঠির বাড়িতে যাবেই। স্বচক্ষে একবার দেখে আসতে চায়। আর তা যত শীগগির সম্ভব।

চিন্তায়-ভাবনায় টগার ভালো করে ঘুম হচ্ছিল না। হঠাৎ নিস্তরক রাতে তার মনে হলো কোনো ঘরের দরজা খুব সাবধানে খোলা হলো। তারপর ফের দরজা বন্ধ করার শব্দ। তারপর অতি ধীর চাপা পদশব্দ...তারপর আবার সব চূপচাপ।

একটু পরে দূরে কোনো দরজায় ঠুক ঠুক শব্দ। কেউ যেন সাবধানে দরজা খুলতে বলছে...

টগার মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। উঠে বসল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দরজার দিকে...

ঠিক তখনই বাংলাবাড়ির ইঁদারার পিছন থেকে ভেসে এল মৃত্যু-যাতনায়-কাতর মর্মভেদী আর্তনাদ। টগা খিল খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। অন্ধকার বারান্দা। সুইচটা কোথায় খেয়াল হলো না। তাই অন্ধকারেই এগিয়ে গেল ইঁদারা লক্ষ্য করে। ততক্ষণে ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। ব্রহ্ম ভীত বোর্ডাররা আগের দিনের মতোই বেরিয়ে এসেছে।

উঃ কী ভয়ংকর শব্দ! কিসের শব্দ? অন্যজন উত্তর দিলো, মনে হলো কেউ খুন হচ্ছে।

খুন! তৃতীয়জন চমকে উঠল।

কে খুন হলো?

টগা বলল, ইঁদারার দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখুন।

ততক্ষণে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু কেউ আর ইঁদারার দিকে এগোতে চায় না।

এই যে তপেন্দুবাবু, আমি জানি আপনি সব থেকে আগে এগিয়ে আসবেন। আর্তনাদ বলেই তো মনে হলো। আপনার কী মনে হয়?

আমারও তাই মনে হচ্ছে।

কিন্তু থেমে গেল কেন?

হয়তো সব শেষ হয়ে গেল।

সদাশিববাবু সহ অন্য সকলে একসঙ্গে চমকে উঠল।

খুন!

সদাশিববাবু অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। দু-চারজন বলল, কে খুন হলো?

টগা আঙুল দিয়ে ইঁদারাটা দেখিয়ে দিলে বলল, আমার ধারণা ঐ দিকে গেলে দেখতে পাবেন।

বাস! কারো মুখে আর কথা নেই। তারপর একে একে প্রায় সকলেই যে যার ঘরের

দিকে গা বাঁচিয়ে চলে গেল। রইল শুধু চপল আর বিকু।

আসুন সদাশিববাবু, দেখা যাক হতভাগটা কে।

সদাশিববাবু কাঁপা-গলায় বললেন, কেমন যেন নার্ভাস হয়ে পড়ছি।

তা তো হবেনই। যদি সত্যিই খুন হয়ে থাকে তা হলে ম্যানেজার হিসেবে সব দায়িত্ব আপনার।

ঘরের সামনেই পড়ে ছিল মহেন্দ্র শতপথী। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল কণ্ঠনালী। টগা হাঁটু গেড়ে বসে দেহটা পরীক্ষা করে বলল, মহেন্দ্রর প্রাণ কিন্তু এখনও আছে। এক্ষুণি ডাক্তার দেখিয়ে রক্ত বন্ধ করতে পারলে হয়তো বেঁচে যাবে।

কিন্তু এত রাতে ডাক্তার কোথায় পাব তপেন্দুবাবু? হাসপাতালও তো কাছে নয়।

টগা বলল, এক্ষুণি একবার চার্চের কোয়ার্টারে বিনয়বাবুর কাছে খবর পাঠান। ওঁর কাছে ফার্স্ট এড দেবার ব্যবস্থা আছে দেখেছি। তিনি খবর পেলে কিছু একটা ব্যবস্থা করবেনই।

খুব ভালো কথা বলেছেন। বলেই সদাশিববাবু তখনই দুজন লোক পাঠিয়ে দিলেন।

চপল বলল, সবাইকে দেখলাম। মিস্টার ফার্নান্ডেজকে তো বেরোতে দেখলাম না।

উনি হয়তো টের পাননি। যা ঘুম! বললেন সদাশিববাবু।

চলুন দেখি।

সদাশিববাবু বললেন, আমি কিন্তু দরজা ঠেলতে পারব না তপেন্দুবাবু। তাঁরা ঘুম ভাঙানো নিয়ে যা অশান্তি একবার হয়ে গেছে—

টগা বললে, আপনাকে কিছুই করতে হবে না। যা করবার আমিই করব।

শেষ পর্যন্ত কাউকেই হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করতে হলো না। টগা যেন জানতই, এইভাবে বন্ধ দরজাটা একটু ঠেলল। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল।

মিস্টার ফার্নান্ডেজ!

অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়েই টগা হাঁকল। কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না।

কী ব্যাপার? এত রাতে উনি গেলেন কোথায়?

গেছেন নিজের খুব পরিচিত জায়গায়। বলে টগা একটু হাসল। যাবার আগে সামান্য একটু কাজ সেরেই গেছেন। চলুন, মহেন্দ্র কেমন আছে দেখি গে।

আধঘণ্টার মধ্যেই ঐ গভীর রাতে বৃদ্ধ পাদ্রিবাবা নিজেই লোকজন, স্টেচার, ওয়ুথপণ্ডর নিয়ে হাজির হলেন। টর্চের আলো ফেলে মহেন্দ্রর গলার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করতে করতে বলে উঠলেন, তপেন্দুবাবু, লুক। আঘাতটা দেখে কি মনে হয় টুটিতে দাঁতের কামড়?

সকলেই বলে উঠল, হ্যাঁ, স্পষ্ট দাঁতের দাগ।

এই অবস্থাতেও বিনয়বাবু হাসলেন একটু। বললেন, এই হলো আপনাদের Angry Hound-এর রাগের নমুনা। মিস্টার ফার্নান্ডেজ তো নিজেকে Angry Hound-এর প্রতিনিধি মনে করেন।

টগা চমকে উঠল। এও কী সম্ভব! মিস্টার ফার্নান্ডেজের মতো একজন বৃদ্ধ লোক— অন্যেরা কিছু বুঝল না। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

বিনয়বাবু প্রাথমিকভাবে ক্ষত থেকে রক্ত বন্ধ করার ব্যবস্থা করে মহেন্দ্রকে রাতের মতো চার্চে নিয়ে গেলেন।

### পাথরমহল

বিকু এল না। বলল, পাগল! শেষ পর্যন্ত প্রেতপুরীতে মরতে যাব! ততক্ষণ ঘুমোলে কাজ হবে।

চপল বলল, তাই ঘুমো।

ঘুম তো দরকার। গত রাত্রে মহেন্দ্রর ওপর আক্রমণ, টুটিতে কামড় দিয়ে ফার্নান্ডেজের এই বৃদ্ধ বয়েসেও পাঁচিল উপকে পাথরমহলের দিকে পলায়ন, পাদ্রিবাবার সেবা ইত্যাদি সব অপ্রত্যাশিত ঘটনায় রাতে কারো ভালো ঘুম হয়নি। তবু টগা আর চপল অদম্য কৌতুহলে আর অসাধারণ সাহস বুকে করে সন্ধ্যাবেলাতেই বেরিয়ে পড়ল সম্পূর্ণ অজানা, অচেনা পাথরমহলের দিকে।

পিছনের সূর্য ক্রমে মাথার উপর উঠে এল। পাথরের পর পাথর উপকে চলেছে দুজন। সঙ্গে কয়েক বোতল জল আর কিছু শুকনো খাবার। একসময়ে তারা এসে দেখল মরুভূমির যেমন চারদিকে ধু ধু বালি ছাড়া আর কিছু নেই, এখানেও তেমনি। ছোট-বড়ো পাথর ছাড়া আর কিছু নেই।

তারপর আধঘণ্টা এগোতেই চোখে পড়ল দূরে কালো পাহাড়ের নিচে একটা লম্বা উঁচু পাঁচিল। আর তার ভেতরে একটা ভাঙা দোতলা বাড়ি। বাড়িটার দোতলার একদিকের বারান্দা ভেঙে ঝুলছে। গোটা বাড়ি ঢাকা পড়ে আছে লতা-পাতা-আগাছায়।

বাড়ির কাছে এসে যখন তারা পৌঁছল তখন ওদের আনন্দের সীমা নেই। এই জায়গাটা ঘিরেই কত কালের কত জল্পনা-কল্পনা। কেউ বলে এটা ছিল রাজবাড়ি। কেউ বলে এটা অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের আস্তানা। এখানেই নাকি থাকে কুকুর-দেবতা বা কুকুর-ভূত—ফার্নান্ডেজ যাকে বলেন ‘Angry Hound’, পাদ্রিবাবা বলেন, ‘সারমেয়রাজ’। যিনিই হন—মাঝে মাঝে তিনি শিশুরক্তের তৃষ্ণায় হুংকার ছাড়েন। সেই বুক-কাঁপানো ডাক শোনা যায় বন-বাংলায় বসেও। অথচ কেউ আসতে সাহস পায় না। আজ কলকাতার দুটি ছেলে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছল।

কিন্তু কোথায় তিনি? তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে।

বাড়ির ভেতরে ঢোকবার আগে ওরা প্রথমে বাড়িটা—না, গোটা বাড়িটা বলতে যা বোঝায় এখন আর তা নয়, ধসে পড়া ইঁটের স্তূপ—ঘুরে দেখল। বোঝা গেল একসময়ে বিরাট জায়গা জুড়ে ছিল দোতলা বাড়িটা। সামনে থেকে দেখলে মনে হয় পাথরের বাড়ি। ওপরে যে ঘরগুলো এখনও মোটামুটি ভালো অবস্থায় আছে তার বড়ো বড়ো জানলাগুলোর কতকগুলো খোলা, কতকগুলো বন্ধ। এইসব পুরনো শূন্য ঘরে সাধাবণত পায়রার বাসা থাকে। কিন্তু এখানে তেমন লক্ষণ নেই।

পাহাড়ি জায়গায় কি পায়রা থাকে না? চপল জিগ্যেস করল।

টগা প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল।

ওরা ঘুরতে ঘুরতে বাড়ির পিছন দিকে এসে পড়ল। এ দিকটা আরও পরিত্যক্ত। চোরকাঁটা ভর্তি জমি কবে যে এদিককার রকে ওঠার সিঁড়িটা পর্যন্ত গ্রাস করে ফেলেছে তার ঠিক নেই।

বাড়ির এই পিছন দিকেও কয়েকটা ঘর আছে। সবগুলিরই জরাজীর্ণ অবস্থা। হঠাৎ তারই একটা ঘর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। বয়েসের ভারে কুঁজো হয়ে গেছে। মাথাভর্তি

জট পাকানো পাকা চুল। হাতে একটা লাঠি। গায়ে একটা ময়লা ফতুয়া। আর আশ্চর্য...পরনে ধুতি বা লুঙ্গি নয়, সাহেবদের মতো খাঁকি হাফপ্যান্ট। প্যান্টটা বড্ড ঢিলে। যেন অন্যের প্যান্ট পরেছে।

বুড়ো লাঠি ঠক ঠক করতে করতে এগিয়ে এসে পরিষ্কার বাংলায় বলল, বাবুদের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

আলাপ জমতে দেরি হলো না। তারা যে কলকাতা থেকে শুধু এই পাথরমহলটাই দেখতে এসেছে তা শুনে বুড়ো খুশি হলো। কেননা এই জায়গা দেখবার জন্যে দূর থেকে কেউ বড়ো একটা আসে না।

বুড়োর নাম মুকুন্দ। হ্যাঁ, শুধুই মুকুন্দ বলল। পদবি জানা নেই। না, তার কেউ নেই আজ। একাই থাকে এখানে। তার কাছ থেকেই জানা গেল একসময়ে এই বাড়িটা ছিল নীলকর সাহেবদের। খাঁটি সাহেব যাকে বলে। কী মেজাজ! নীলচাষীদের কুকুর-শেয়ালের মতো দেখত। বুটের নিচে দাবিয়ে রাখত তাদের।

তুমি তাদের দেখেছ?

দেখিনি? সাহেবদের মধ্যে জাত-সাহেব ছিল টম সাহেব। তারই বাগানে কাজ করত মুকুন্দ। খাস মালী। ওর মতো গোলাপের তোড়া বাঁধতে আর কেউ পারত না। তাই টম সাহেব তাকে খুব পছন্দ করত। কিন্তু বড়ো অত্যাচার করত সাহেব নীলচাষীদের উপর। তারপর একদিন নীলচাষীরা ক্ষেপে উঠল। মারমুখো হয়ে আক্রমণ করল কুঠিবাড়ি। টম সাহেব তার বাঘের মতো কুত্তাটাকে লেলিয়ে দিলো তাদের দিকে। কুত্তাটা একটার পর একটা চাষীর টুটি ছিঁড়তে লাগল। ওরা তখন দিলো এই বাড়িটার আগুন ধরিয়ে। জ্যাস্ত পুড়ে মরল টম সাহেব আর তার কুত্তাটা।

একটু থেমে মুকুন্দ বলতে লাগল, এসব তো সেদিনের কথা। তারপর নীলচাষ উঠে গেল। সাহেবরা একে একে এলাকা ছেড়ে চলে গেল। নীলের জমিতে শুরু হলো আম-জাম-কাঁঠালের চাষ।...তারপর আরও কত বছর কাটল। সেইসব বন-বাগানও শেষ হয়ে গেল। তৈরি হলো চাষের জমি। সবই এই দুটো চোখে দেখলাম খোকাবাবুরা।...

কথা বলতে বলতে মুকুন্দ বাড়িটার পাশ দিয়ে হাঁটছিল।

সেই জমি থেকে লাঙলের মুখে উঠল কত কংকাল।

কংকাল!

হ্যাঁ, চাষীদের জোর করেও যখন নীলের চাষ করাতে পারত না তখন মেরে ঐসব জমির নিচে পুঁতে দিত সাহেবরা। আমি যত্ন করে সেগুলো তুলে রেখে দিয়েছি।

চমকে উঠল ওরা। বলে কী মুকুন্দ!

কোথায় রেখেছ?

দেখবেন? সব গুনে গুনে রাখা আছে। হয়তো কোনোদিন কাউকে হিসেব দিতে হবে।

না-না দরকার নেই। তুমি বরঞ্চ অন্য যদি কিছু দেখাবার থাকে তো দেখাও।

হ্যাঁ, দেখাব বইকি। কেউ তো আসে না। আপনারা এসেছেন কত দূর থেকে—ঐ যে ছাতলাধরা ভাঙা একতলা মস্ত ঘরটা—ওটা ছিল নীলের গুদাম। আর ঐ যে উঁচু-মতো দেখছেন, ওটা ছিল নীলের চৌবাচ্চার চিমনি। দিন-রাত গলগল করে ধৌওয়া বেরোত। আর ঐ ভাঙা চৌবাচ্চাতে নীল ভেজানো হতো।

চৌবাচ্চার নিচের দিকে কিসের দাগ?

ওখানে ছিল মোটা মোটা তামার পাত।

তামার পাত!

হ্যাঁ। সব গেছে।

চুরি?

না বাবু, একজন ভদ্রলোক। বুড়ো। যিশুর শিষ্য। আস্ত শয়তান। ক'বছর অন্তর কোথা থেকে এসে সে-সব পাত খুলে নিয়ে যায়। শুধু তামার পাতই নয়, এই বাড়ির কোথায় কোন ঘরের মাটির নিচে সাহেবদের সোনাদানা থাকত ঐ বুড়োটা তাও জানত। সব নিয়ে গেছে।

টগা অবাক হয়ে চপলের দিকে তাকাল। তারপর মুকুন্দকে বললে, তোমরা বাধা দিতে পারনি?

মুকুন্দ কেমন একরকমভাবে হাসল। এত বয়েসেও হলদে হলদে বিশী দাঁতগুলো বেরিয়ে এল। বলল, আমি ছাড়া আর কে আছে এ তল্লাটে বাবু? তা একাই লড়তে গিয়েছিলাম। বুড়োটা আমাকে অবাক করে দিয়ে আমার ধরে ডেকে বলল, মুকুন্দ, তুমি আমায় চিনতে পারছ না? আমি যে টম সাহেবের নাতি! এই কুঠিবাড়িতে যা কিছু আছে সবকিছুর দাবিদার এখন আমি। তা শুনে আমি হাত গুটিয়ে নিলাম। কিন্তু আমি জানি ও মিথ্যে কথা বলছে। ও চোর। আর তার জন্যে ওকে শাস্তি পেতেই হবে।

এই পর্যন্ত বলে বুড়ো মুকুন্দ হাঁপাতে লাগল।

কষ্ট হচ্ছে তোমার মুকুন্দ?

না। এবার তো আপনারা ওপরে যাবেন? যান। সাবধানে যাবেন।

তুমি যাবে না?

না বাবু, আমি সাহেবদের ভৃত্য ছিলাম। ওপরে যাওয়া আমার বারণ।

তা হলে আমাদের বুঝিয়ে দেবে কে?

বোঝাবার কিছু নেই। শুধু দেখেই নেমে আসবেন। যে ঘরগুলো তালা দেওয়া সেগুলোর দিকে তাকাবার দরকার নেই।

তুমি এখন কোথায় চললে?

কোথায় আর যাব? এ বাড়ি ছেড়ে আমার তো যাবার উপায় নেই। এখানেই আছি।

### মুকুন্দরহস্য

ভাঙাচোরা সিঁড়িতে ভয়ে ভয়ে পা রেখে ওরা দোতলায় উঠে এল। দোতলায় উঠতেই দুজনকে চমকে দিয়ে গোটা বাড়িটা দুলে উঠল। একবার—দু'বার—তিনবার—

ভূমিকম্প নাকি?

না, ভূমিকম্প যে নয় তা দরজা-জানাগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা গেল। সেগুলো অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তাহলে বাড়িটা অমন কেঁপে উঠল কেন?

চপলের মুখ শুকিয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে তাকাল টগার দিকে। টানা বারান্দা দিয়ে চলতে চলতে বলল, এটা কিরকম হলো?

টগা উত্তর দিলো না। চপল ফের জিগ্যেস করল, এটা কি ভূমিকম্প?

টগা বলল, না।

তা হলে?

টগা নিরুত্তর।

চপল ফের জিগ্যেস করল, কিছু বলছিস না কেন?

বলার কিছু নেই।

তার মানে?

পুরনো বাড়ি মাঝে মাঝে এইরকম কাঁপে। এই দিক দিয়ে আয়।

কেন?

দেখছিস না চেয়ারগুলো?

পর পর এত চেয়ার কেন?

সাহেবরা এই বারান্দায় বসে পাহাড়ের শোভা দেখত বোধহয়।

সে তো কোন যুগের কথা! তা বলে আজও চেয়ার পাতা থাকবে?

টগা গভীরভাবে বলল, এই মুহূর্তেও তারা হয়তো চেয়ারে বসে দেখছে...এখন অবাক হয়ে আমাদের দেখছে...ভাবছে কী সাহস! ওরা আগের মতোই পা ছড়িয়ে বসে আছে চেয়ারে। তাই ধারে আসতে বললাম। পায়ে পা না লাগে...

কী যে বলিস! ওরা এখনও চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে আছে!

টগা বলল, ভালো করে লক্ষ্য করে দ্যাখ। সরু সরু হাড্ডিসার পায়ের ছায়া পড়েছে দেখেছিস? না-না, দাঁড়াসনে। এগিয়ে যেতে যেতে দ্যাখ।

ওসব কথা বলিসনে টগা। ভয়ে ভয়ে বলল চপল।

টগা বলল, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ, আড়চোখে চেয়ারগুলো লক্ষ্য কর। পুরনো উইথরা পায়ভাঙা। কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পুরনো চেয়ার এত পরিষ্কার থাকে কি করে? নিশ্চয় রোজ কেউ ঝাড়পৌঁচ করে? কে করে? মুকুন্দ ছাড়া আর কোনো মানুষ দেখতে পেলি? তাছাড়া মুকুন্দ দোতলায় ওঠে না। কী রে আমার হাত ধরছিস কেন? হাত যে তোর বরফের মতো ঠাণ্ডা!

টগা, আমি ফিরে যাব।

একা যেতে পারবি না।

তুইও চল।

আমি সব দেখে যাব।

তবে আমি নিচে চললাম।

যেতে পারবি তো?

চপল উত্তর দিতে পারল না। টলতে টলতে কোনোরকমে সিঁড়ির দিকে গেল বটে কিন্তু সিঁড়ি খুঁজে পেল বলে মনে হলো না।

চপল!

সাড়া পেল না টগা।

এই মরেছে গেল কোথায়? টগা এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল। চপল!

পাশ দিয়ে সরু সিঁড়ি কোথায় যেন চলে গেছে। চপল ভুল করে এদিকে যায়নি তো? এই ভেবে টগা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। সিঁড়িটা ঐক্যেবঁকে একটা বড়ো ঘর পর্যন্ত গিয়েছে। ফাটা দেওয়াল। কড়ি-বরগা ঝুলছে। জানলাগুলো কবে থেকে বন্ধ হয়ে আছে।



কই? এখানে তো চপল নেই।

কিন্তু কেউ আছেই। ঐ তো পিছনে চাপা পায়ের শব্দ...এগিয়ে আসছে।

চপল? চপল কি মজা করে ভয় দেখাচ্ছে? চট করে ঘুরে দাঁড়াল টগা। না, কেউ নেই।

কিন্তু কেউ তার পিছনে আছেই তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ভয়ে টগার সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠল। না, পালাতে হবে। এ বড়ো মারাত্মক জায়গা। কিন্তু, চপল যে নেই?

চপল নিশ্চয় নিচেই গেছে।

কিন্তু ও সিঁড়ি দিয়ে নামেনি।

হয়তো ভুল করে অন্য কোনো পথ দিয়ে নেমে গেছে।

টগা এগোতে লাগল। বিরাট ঘর। গোটা দুই ভাঙা ইজিচেয়ার। টানা পাথার কড়া কড়িকাঠের সঙ্গে এখনও লেগে রয়েছে। এখনও পর্যন্ত একটি পায়রাও চোখে পড়েনি। এত পুরনো বাড়ি হলেও দেওয়ালে মাকড়সার চিহ্নমাত্র নেই। টগা কিছুতেই যেন ঘরটার শেষপ্রান্তে পৌঁছতে পারছে না। যেন শেষ নেই। শেষ পর্যন্ত শেষ হলো—যেখানে শুরু হয়েছে আবার শুরু সিঁড়ি।

ও! এই দিক দিয়েও তা হলে নিচে নামা যায়। টগা নামতে লাগল সাবধানে। বড্ড অন্ধকার। মিনিট তিন-চার নামার পর সিঁড়িটা যেন হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়ল ভিজে মাটিতে। কিন্তু মাথাটা লাগল ঠক করে জোরে শক্ত কোনো কিছুর সঙ্গে।

সেটাকে শক্ত করে দু-হাতে ধরে কোনোক্রমে উঠে দাঁড়াল টগা।

এত বড়ো—কি এটা?

ঘুলঘুলি দিয়ে শুরু একফালি রোদ এসে পড়েছিল, চমকে উঠল টগা। মানুষের মতো উঁচু পাথরের একটা বিরাট কুকুর দু-পায়ের উপর ভর দিয়ে মুখ উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেন অক্ষুণি স্থংকার ছাড়বে! আর তার মুখে লেগে রয়েছে রক্ত। হয় রক্তপান করেছে, নয় রক্তবমি করেছে। চোখের মণি দুটো কী পাথরের, কে জানে। মনে হচ্ছিল যেন জ্বলছে। টগা পালাতে গেল। কিন্তু দাঁড়াতে পারল না। শেষে হামাগুড়ি দিয়ে সেই ঘুপচি ঘরের অন্য প্রান্ত দিয়ে নামতে লাগল।

অন্ধকার—সাঁত্যসেঁতে সিঁড়ি। গড়িয়ে গড়িয়ে চলল টগা। এই মুহূর্তে চপলের কথা মনে এল। তারপরই হঠাৎ ধপ করে কোথায় যেন পড়ল। আর তখনই কানে এল পাশেই কে যেন কাতরাচ্ছে, উঃ, বাবা গো!

চপল!

হঁ। পড়ে গেছি ওপর থেকে।

লাগেনি তো?

না, কিন্তু পিঠে কী বিঁধছে। উঠতে পারছি না।

এখানে একটা বন্ধ দরজা আছে বলে মনে হচ্ছে। দেখি যদি খোলা যায়।

টগা হামাগুড়ি দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর টানাটানি করে কোনোরকমে দরজাটা খুলল। খুলতেই এক ঝলক আলো ঘরে এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল। শিউরে উঠল চপল। পাটকাঠি যেমন গোছা করে সাজিয়ে রাখে তেমনি করে গোছা বাঁধা রয়েছে নরকংকাল ঘরের এক কোণে। চপল ওপর থেকে পড়েছিল সেই কংকালের ওপরে।

অতি কষ্টে দুজনে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। এটা বাড়ির পিছনের দিকের বারান্দার একটা ঘর। এরই পাশাপাশি কোনো একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল মুকুন্দ। কিন্তু—

কিন্তু সেটা কোন ঘর খুঁজে পাওয়া গেল না। সব ঘরগুলোই বাইরে থেকে ওপরে-নিচে তাল্লা বন্ধ। সব তাল্লাই মর্চে পড়া! বহু দিন খোলা হয়নি।

আশ্চর্য, মুকুন্দ গেল কোথায়?

চপল বলল, মুকুন্দকে আর দরকার কী? তাড়াতাড়ি আমরা ফিরে যাই চলো।

টগা বলল, ওর সঙ্গে দেখা করে যাওয়া উচিত।

তা উচিত। কিন্তু সে গেল কোথায়?

আয়, এখানে ঘাসের ওপর বসে একটু অপেক্ষা করা যাক।

বসে বিশ্রাম করতে করতে চপল জানাল কীভাবে অন্ধকারে কার পায়ের শব্দ টগার মনে করে, সেই শব্দ অনুসরণ করে চলতে চলতে একটা গর্তের মধ্যে দিয়ে নিচে পড়ে গিয়েছিল।

তারপর টগা শোনালা কীভাবে দর্শন পেয়েছিল সারমেয়রাজের। তবে জ্যাস্ত সারমেয় নয়, পাথরের মূর্তি।

যাক! তবু তো তুই দেখলি।

হ্যাঁ। তুই দেখবি?

রক্ষে করো। এখন অনেক পথ হাঁটতে হবে। ওঠো—ওঠো—

হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল বারান্দায় জীর্ণ দড়িতে মেলা রয়েছে একটা খাঁকি হাফ প্যান্ট, একটা ময়লা ফতুয়া। এসবই যে মুকুন্দের তাতে সন্দেহ নেই। এগুলোই তো একটু আগে পরেছিল। এসব খুলে রেখে সে গেল কোথায়?

ঐ দ্যাখো ওর হাতের লাঠিটা।

টগা দেখল লাঠিটা বেশ যত্ন করে বারান্দার দেওয়ালে ঠেসানো। যেন কেউ এইমাত্র লাঠিটা বাইরের দেওয়ালে ঠেসিয়ে রেখে ভেতরে ঢুকেছে।

দুজনে একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। বুঝতে কিছু বাকি রইল না। তারপর জোরে হাঁটতে লাগল।

### শেষকৃত্য

শেষ-বিকেলে ওরা যখন পাদ্রিবার চার্চের কাছাকাছি এসে পড়ল তখন দেখল জনা চারেক লোক একটা কফিন কাঁধে করে নিঃশব্দে প্রায় দৌড়চ্ছে। সঙ্গে কয়েকজন ছাড়া শবযাত্রীও নেই। তবে পাদ্রিবাবা বিনয়বাবু আছেন। অবশ্য তাঁর তো না থাকলেই নয়। শেষ প্রেয়ারটা তাঁকেই করতে হবে।

কিন্তু এদিকে কেন? নতুন বেরিয়াল ফিল্ডটা তো অন্য দিকে?

হঠাৎ দেখা গেল শবযাত্রীদের পিছন থেকে বিকু হাত নেড়ে ডাকছে।

আশ্চর্য! বিকু শবযাত্রীদের দলে কেন?

না, শুধু বিকুই নয়, বানবাংলোর আরও কেউ কেউ রয়েছে। আরে ঐ তো সদাশিববাবুও! সদাশিববাবু থমথমে মুখে ইশারায় ওদের ডাকলেন।

নিঃশব্দে টগা, চপল ওঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কি ব্যাপার?

সদাশিববাবু গভীর মুখে চাপা গলায় বললেন, মিস্টার ফার্নান্ডেজ—

সে কী কখন!

সদাশিববাবু বললেন, রাতে মহেন্দ্রর গলায় ক্ষাপা কুকুরের মতো কামড়ে দিয়ে পাঁচিল টপকে পালাচ্ছিলেন। পালাতে পারেননি। পড়ে গিয়ে মারা যান। হ্যাঁ, তাঁর মধ্যে অশেষ শক্তিসম্পন্ন evil spirit—অশুভ শক্তি ছিল। কিন্তু তবু বয়েস হয়েছিল তো। তা ছাড়া পাপের পরিণতি এই-ই হয়।

ওরা ততক্ষণে সমাধিক্ষেত্রের কাছাকাছি এসে পড়েছে। যতই কাছাকাছি আসছে ততই ওদের গতি বাড়ছে। যেন সন্ধ্যা হবার আগেই কফিনটাকে মাটির নিচে নামিয়ে পালিয়ে আসতে পারে। বলা তো যায় না শয়তান যদি আবার জেগে ওঠে!

টগা জিগ্যেস করল, কিন্তু পুরনো সমাধিতে কেন? এটা তো এখন ব্যবহার করা হয় না।

সদাশিববাবু বললেন, সকালে ওঁর বডিটা পাবার পর পাদ্রিবাবাকে খবর দেওয়া হয়। স্থানীয় খ্রিস্টানরা অনেকেই আসেন। সকলেই মিস্টার ফার্নান্ডেজের ক্ষত-বিক্ষত দেহ—বিশেষ করে রক্তাক্ত ভয়ংকর মুখটা দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেন। ক্ষাপা কুকুরের মতো মহেন্দ্রর টুটি কামড়ানো আর সেইসঙ্গে কিছু কিছু ঘটনায় তাঁরা মনে করে নেন ইনি কোনো পাদ্রি হতে পারেন না। ইনি ছদ্মবেশী শয়তান। কাজেই মাটি দেওয়ার ব্যাপারে একজন পাদ্রির উপযুক্ত সম্মান এঁকে দেওয়া যায় না।

তখন তর্ক ওঠে—তবু তো উনি একজন খ্রিস্টান। অতএব শেষ সময়ে যেটুকু সম্মান প্রাপ্য সেটুকু দিতে হবেই।

অন্যেরা রাজী হলো। কিন্তু জানিয়ে দিলো নতুন বেরিয়াল ফিল্ডে ওঁকে সমাহিত করা হবে না। ওঁর জন্যে উপযুক্ত জায়গা সেই পুরনো পরিত্যক্ত নিষিদ্ধ সমাধিক্ষেত্র।

মর্চে-পড়া তালা ভেঙে, লোহার গেট খুলে একরকম চুপিচুপি কফিন নিয়ে মাত্র জন কয়েক মানুষ সমাধিক্ষেত্রে ঢুকল। মাটি কাটাই ছিল। বাকি কাজটুকু সেরে ফিরতে আধঘণ্টার বেশি সময় লাগল না।

কোনোরকমে একটা ভয়ংকর, হিংস্র অশুভ আত্মার শেষ কাজটুকু সেরে এরা যখন বাইরে এসে দাঁড়াল তখন মাঠাবুরু পাহাড়ের পিছনে সূর্য ডুবে গেছে। অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে চারিদিকে।

# রহস্যময় রোগী

হঠাৎ টেলিগ্রাম

প্রায় ষাট বছর আগের কথা বলছি। তখন আমি ডাক্তারি পাশ করে একটা নামী হাসপাতালে ঢুকেছি। সেই সঙ্গে প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করছি। ঐ অল্প বয়সেই বেশ নামডাক হয়েছিল। ইংরিজিতে যাকে বলে ‘জেনারেল ফিজিশিয়ান’ হলেও আমি বেশি চিকিৎসা করতাম মানসিক রোগীদের। আর এতেই আমার খ্যাতি। মানসিক রোগী মানেই পাগল নয়। পাগল না হয়েও কেউ কেউ অস্বাভাবিক আচরণ করে। যেমন—কেউ সবসময়ে গম্ভীর হয়ে থাকে। মোটে হাসে না। আপন মনে দিনরাত কি যেন ভাবে। কেউ কেউ সব সময় বিমর্ষ। কারো সঙ্গে মিশতে চায় না। চুপচাপ ঘরে বসে থাকে। এই রকম নানা লক্ষণ থেকে বোঝা যায় লোকটি মানসিক রোগী হয়ে গেছে।

আমি এই ধরনের রোগীদের চিকিৎসা করতে বেশি পছন্দ করতাম। মেলামেশা করে তাদের মনে কিসের দুঃখ, কিসের অভাব জেনে নিতাম। তারপর চিকিৎসা করে ভালো করে দিতাম।

হঠাৎ সেদিন আমার নামে একটা টেলিগ্রাম এলো। টেলিগ্রাম এলেই মানুষ ভয় পায়—না জানি কার কী হলো।

টেলিগ্রাম খুলে নিশ্চিত হলাম। না, সেরকম কিছু নয়। তবে অবাক হলাম। আমার বন্ধু নিশীথ টেলিগ্রাম করেছে বাগআঁচড়া থেকে। লিখেছে “কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে শীগগির চলে এসো এখানে। ভালো একটা কেস আছে।”

মনস্থির করা মাত্র পরের দিনই বেরিয়ে পড়লাম। শেয়ালদা থেকে রানাঘাট। সেখান থেকে বাসে বাগআঁচড়া। জায়গাটা কলকাতা থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার দূরে। শান্তিপুরের কাছে।

জায়গাটার নাম বাগআঁচড়া কেন সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত।

একসময়ে শান্তিপুরের বর্তমান বাবলা গ্রাম দিয়ে গোবিন্দপুর হয়ে গঙ্গা প্রবাহিত হতো। পরে প্রাকৃতিক কারণে গঙ্গা দক্ষিণে সরে আসাতে গঙ্গার পুরনো খাত জুড়ে চর পড়ে যায়। কারও কারও মতে ঐ চরে কোনো ফসল হতো না বলে লোকে চরটাকে বলতো বাগআঁচড়া। আবার কেউ কেউ বলেন ওখানে খুব বাঘের উপদ্রব ছিল। লোকে প্রায় প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেত দরজার সামনে বাঘের আঁচড়াবার দাগ। মানুষের গন্ধ পেয়ে খেতে এসে বন্ধ দরজা আঁচড়ে থাকা মেরে খোলবার চেষ্টা করত। সেই থেকেই নাকি এই জায়গার নাম বাগআঁচড়া।

বাঘ ছাড়াও আরও কিছু অন্য ভয় ছিল ওখানে। ঐ যে ধু ধু চর—দুপুরের রোদে জ্বলন্ত মরুভূমির মতো। আর রাতে? রাতে ঐ চরের অন্য রূপ। জনমানবশূন্য শুধু বালি

আর বালি। ভুল করে কেউ ওদিকে গেলে সে আর বেঁচে ফিরত না। কী করে কী যে হতো কেউ তা বুঝতে পারত না। শুধু সারা চর জুড়ে একটা হু হু করে দমকা বাতাস বইত। তারপর কেমন একটা গোঙানির শব্দ। তারপরই সব চূপ। পরের দিন সকালে দেখা যেত একটা মানুষ কিংবা একটা কোনো নিশাচর পাখি, নিদেন একটা কুকুর মরে পড়ে আছে। কে যেন প্রবল আক্রোশে তাদের জিভ টেনে বের করে দিয়েছে।

এই ভয়ংকর চরে ঢের পরে বসবাস করতে আসেন এক দুর্ধর্ষ সাহসী প্রবল প্রতাপ ব্যক্তি। নাম চাঁদ রায়।

কে এই চাঁদ রায়?

কেউ কেউ বলেন ইনি নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের (কৃষ্ণনগর ঐরই নামে) জ্ঞাতি। কেউ বলেন—না, জ্ঞাতি নয়, চাঁদ রায় ছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান। আবার কারো মতে চাঁদ রায় একজন নিষ্ঠুর দস্যুসর্দার। যাই হোক না কেন তিনি যে একজন সাহসী আর প্রতাপশালী লোক ছিলেন তার প্রমাণ মিলল যখন দেখা গেল ঐ ভয়ংকর চরে এসে তিনি পাকাপাকিভাবে থাকতে লাগলেন। শুধু থাকাই নয়, ঐ চরের খানিকটা জায়গা জুড়ে চাষবাস শুরু করলেন। যে চর বেশ কয়েক শত বছর ধরে ভয়াল ভয়ংকর মৃত্যুফাঁদ হয়ে পড়েছিল, এখন চাঁদ রায়ের চেষ্টায় সেই চরে সোনার ফসল ফলতে শুরু করল। কয়েক বছরের মধ্যেই ঐ চাষের দৌলতে প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়ে উঠলেন চাঁদ রায়। তারপরেই তিনি একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার বলে গণ্য হলেন। কেউ কেউ তাঁকে বলত রাজা—রাজা চাঁদ রায়।

এ সব প্রায় তিনশো বছর আগের কথা।

ক্রমে চাঁদ রায়ের দেখাদেখি অনেকে এখানে এসে বসবাস করতে লাগল। আর চাঁদ রায় প্রাসাদ তৈরি করে রীতিমতো রাজার হালে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। সে সময়ে রাজা-জমিদাররা প্রজাদের ওপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করলেও নিজেদের নাম চিরস্থায়ী করার জন্যে অতিথিশালা, জল, রাস্তাঘাট নির্মাণ, মন্দির প্রতিষ্ঠা করতেন। চাঁদ রায়ও কয়েকটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেগুলোর ধ্বংসাবশেষ বাগআঁচড়ায় এখনও আছে।

চাঁদ রায় ঐ চড়ার অনেকখানি জায়গা দখল করে রাজপ্রাসাদ তৈরি করলেও যে কারণেই হোক চরের পশ্চিম দিকটা পরিত্যক্তই রেখেছিলেন। পাত্র-মিত্র-মন্ত্রী-পারিষদরা কারণ জিজ্ঞেস করলে উনি উত্তর দিতেন না। এড়িয়ে যেতেন। শুধু তাই নয়, উনি আদেশ জারি করলেন একটা বিশেষ সীমার ওদিকে যেন কেউ না যায়।

চরের পশ্চিম দিকে কী ঘটেছিল—এমন কী ব্যাপার তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা কেউ জানতে পারল না আরও আশ্চর্যের ব্যাপার তিনি নাকি পশ্চিম দিকের জানলা রাত্রিবেলায় খুলতেন না।

এরপর তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে বেশ নামকরা কয়েকজন ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন। আর তাঁদের বসবাসের জন্যে বাগআঁচড়ার কাছাকাছি একটা জায়গা ঠিক করে দেন যেখানে ব্রাহ্মণরা নিশ্চিন্তভাবে পূজা-অর্চনা করতে পারেন। সেই জায়গাটা ব্রাহ্মণরাই শাসন করতেন, চাঁদ রায় সেখানে নাক গলাতেন না। জায়গাটার নাম হয়েছিল তাই ব্রহ্মশাসন।

কালের নিয়মে এক সময় চাঁদ রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন। রাজপ্রাসাদ ভেঙে পড়ল। যুগ বদলে গেল। তারপর কোথা থেকে উদয় হলেন এই রাজাবাবু। তাঁর নাম চন্দ্রভানু রায়। ইনি বলেন—উনি নাকি চাঁদ রায়েরই বংশধর। কিন্তু ইতিহাসে তাঁর নাম নেই। চন্দ্রভানু রায়

নামেই রাজা, রাজ ঐশ্বর্য আর আগের মতো নেই। থাকেন সেই পুরনো ভাঙা রাজপ্রাসাদেই নতুন করে সারিয়ে সাজিয়ে। যখন তিনি রাজা তখন তাঁকেও রাজার মতোই চলতে হয়। দাস-দাসী, আমলা, গোমস্তা যেমন আছে তেমনি হাল আমলের মতো রাখতে হয়েছে একজন সেক্রেটারি। সেই সেক্রেটারিই সব—রাজার ডান হাত। এই সেক্রেটারিই হচ্ছে আমার বন্ধু নিশীথ।

### কঠিন ব্যাধি

রানাঘাট স্টেশনে নেমে বাস।

এখনকার মতো তখন এত বাস ছিল না। সারাদিনে হয়তো দু'খানি বাস চলত। একখানি ঝরঝরে বাস দাঁড়িয়ে ছিল। ভেতরে তিলধারণের জায়গা নেই। ছাদের ওপরেও লোক। কোনোরকমে ঠেলেঠেলে ভেতরে দাঁড়াবার একটু জায়গা করে নিলাম। নতুন জায়গা—নতুন পথ। ভেবেছিলাম নিশীথ আসবে কিংবা কাউকে পাঠাবে। কিন্তু তেমন কাউকে তো দেখলাম না। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে ধুলোর মধ্যে চলার পর বাগআঁচড়া পৌঁছনো গেল।

বাস থেকে নেমে এদিক-ওদিক তাকলাম। প্রায় ষাট বছর আগের বাগআঁচড়া এখনকার মতো ছিল না। চারিদিকে জঙ্গল। দূরে চড়ার খানিকটা দেখা যাচ্ছিল। যেরকম জানা ছিল সেরকম দিগন্তপ্রসারী চড়া আর নেই। অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ খানিকটা পড়ে আছে। আমি কোনদিকে যাব ভেবে পেলাম না। এমন একজন কাউকে দেখলাম না যে জিজ্ঞেস করব রাজবাড়িটা কোন দিকে।

হঠাৎ দেখলাম দূরে একটা পাক্ষি আসছে। কাদের পাক্ষি কে জানে। পাক্ষিটা আমার কাছে এসে থামল। একজন লম্বা লাঠি হাতে পাগড়ি মাথায় লোক এসে দাঁড়াল। সেলাম করে বলল, আপনি ডাগতারবাবু? কলকাতা থেকে আসছেন?

বললাম, হ্যাঁ। নিশীথবাবু পাঠিয়েছেন?

লোকটা বলল, সেকরিটারিবাবু পাঠিয়েছেন।

যাক, বাঁচা গেল।

জীবনে কখনো পাক্ষি চড়িনি। এখানে আসার দৌলতে পাক্ষি চড়া হলো। কিন্তু সেও তো এক ফ্যাসাদ। গুটিসুটি মেরে কোনোরকমে তো খোলার মধ্যে ঢুকলাম। তারপর বেহারারা যতই দৌড়ায় ততই আমার দুলুনি লাগে। বারে বারে কাঠে মাথা ঠুকে যায়।

পাক্ষির দু'পাশের দরজা খোলা ছিল। দেখতে দেখতে চলেছিলাম। দু'দিকেই জলাজঙ্গল—হোগলার ঝোপ। মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে আছে বিরাট বিরাট দেবদারু গাছ। হু হু করে বাতাস বইছে। কিন্তু বাতাসটা যেন কিরকম। সে বাতাসে গা জুড়োয় না। কেমন যেন শুকনো—আগুনের হলকা মাখানো। অথচ এতক্ষণ বাসে এলাম এরকম বাতাস পাইনি।

দরজাটা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা চোঁচামেচি কানে এল। মুখ বাড়িয়ে দেখলাম একটা থুথুড়ে বুড়ি এক বুড়ি শুকনো ডালপালা নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আর একপাল কালো কালো প্রায় উলঙ্গ ছেলে মজা করে তাকে ঢিল মারছে। বুড়ি কিন্তু তাদের কিছুই বলছে না। শুধু ঢিল থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করছে। আমি আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলাম না। বেহারাদের পাক্ষি নামাতে বলে নেমে পড়লাম। তারপর

আর ডাক্তার হিসাবে নিশীথ যখন আমায় ডেকেছে তখন নিশ্চয় মেয়েটার কোনো অসুখ আছে। আর যা-তা অসুখ নয়, জটিল কোনো মানসিক রোগ। নইলে নিশীথ আমাকে ডাকতে যাবে কেন? কাছেপিঠে কি ভালো ডাক্তারের অভাব আছে?

রাজাবাবুর সঙ্গে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে আলাপ করিয়ে দিয়েই নিশীথ সেই ভাঙচোরা রাজপ্রাসাদের একতলার একটা ঘরে এনে বসাল। বলল, এই ঘরটাতে তুমি থাকবে। পুরনো বাড়ি, কিন্তু বাথরুম, জলের কল সব নতুন করে করা হয়েছে। এখানে সাপের ভয় আছে বটে তবে বাড়িতে সাপ নেই। ডজনখানেক বেঁজি পোষেন রাজাবাবু। দিনরাত বেঁজিগুলো ঘোরে বাড়িময়, ওদের ভয়ে সাপ ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না।

‘ঘেঁষতে পারে না’ বলে যতই আশ্বাস দিক তবু সাপ বলে কথা। খুব ভরসা পেলাম না। প্রচুর জলখাবার আর কফি খাওয়ার পর নিশীথ যা বললে তা এইরকম—

বর্তমান রাজাবাবুর একটাই দুঃখ ছিল তাঁদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। অনেক যাজযজ্ঞ করেছিলেন, অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুই হয়নি। একদিন রাজাবাবু আর রানীমা গঙ্গান্নান করতে গিয়ে চরের ওপরে একটা সদ্যোজাত শিশুকে পড়ে পড়ে কাঁদতে দেখেন। রানীমার মাতৃহৃদয় চঞ্চল হয়ে ওঠে।—আহা! কার এত সুন্দর মেয়ে গো! এর মা-বাবা কী নিষ্ঠুর। এমন মেয়েকে ফেলে দিয়ে গেছে। বলে, তাকে বুকে তুলে নেন। তারপর তাকে নিজের মেয়ের মতো মানুষ করতে লাগলেন।

কিন্তু মেয়ে যত বড়ো হতে লাগল ততই তাকে কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হলো সবার। মেয়েটি সুন্দরী। কিন্তু গলার স্বর পুরুষের মতো মোটা। তার চোখের মণি কটা। আর মাঝে মাঝে মণিদুটো ঘোরে। মেয়েটি খুব চঞ্চল। কিছুতেই এক জায়গায় বসে থাকে না। গোটা প্রাসাদ ঘুরে বেড়ায়। কেন যে অমন করে ঘোরে কে জানে! বয়স এখন তার দশ-এগারো। আর ওকে ঘরে রাখা যায় না। কেবল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

কোথায় যায়? কথার মাঝখানে আমায় জিজ্ঞেস করতে হলো।

নিশীথ বললে, ঠিক কোথায় যায় কেউ জানে না। তবে বনের দিকে যায়।

জিজ্ঞেস করলাম, তারপর ও নিজেই ফিরে আসে?

কখনও প্রহরীরা গিয়ে ধরে আনে। কখনও নিজেই চলে আসে। তবে তখন ওকে খুব ক্লান্ত মনে হয়। এসেই শুয়ে পড়ে।

কোথায় যায় জিজ্ঞেস করলে ও কি বলে?

কিছুই বলে না, উন্টে ভীষণ রেগে যায়।

জিজ্ঞেস করলাম, ও কি খুব রাগী?

সাংঘাতিক। বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর যেন রাগ বাড়ছে। রেগে গেলেই ও দৌড়োদৌড়ি, লাফলাফি শুরু করে। হাতের কাছে যা পায় ভেঙে চুরমার করে দেয়।

ডাক্তার দেখানো হয়েছিল?

নিশীথ বলল, ডাক্তার? ডাক্তার দেখলেই মারতে যায়। একবার একজন ডাক্তারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা টিপে ধরেছিল।

একথা শুনেই বুড়ির কথাটা মনে হয়েছিল। সে যে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল সে কি এইজন্যেই?

নিশীথ বলল, এর রোগটা মানসিক বলেই মনে হয়। আর সেইজন্যেই রাজাবাবুকে তোমার কথা বলেছিলাম।

বললাম, কিন্তু ডাক্তার দেখলেই যদি ক্ষেপে যায় তা হলে আমি কাছেই বা যাব কি করে, চিকিৎসাই বা করব কি করে?

নিশীথ বলল, তুমি যে ডাক্তার একথা বলা হবে না। তারপর ওকে দেখে ওর সঙ্গে কথা বলে তুমি যা করতে পার করো।

কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হবে কি করে? কি বলেই বা আলাপ করব?

সে কথাও আমরা ভেবে রেখেছি। ওকে বলা হবে কলকাতা থেকে একজন এসেছে যে কাক ধরতে পারে।

আমি কাক ধরতে পারি! শুনে তো হতভম্ব।

হ্যাঁ। ও কাক খুব পছন্দ করে। ওর মর্জিমতো কত যে কাক দূর দূর পাহাড়ের দেশ থেকে ধরা হয়েছে তা দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

বললাম, কিন্তু আমি কাক ধরব কি করে?

নিশীথ বলল, তার ব্যবস্থাও হয়েছে। এ ঘরে এসো।

ও আমাকে নিয়ে পাশের ছোট্ট একটা ঘরে ঢুকল। ঘরটা অন্ধকার। তার মধ্যেই গোটা তিনেক খাঁচা চোখে পড়ল। তিনটে খাঁচাতেই বোধহয় কাক রয়েছে।

নিশীথ বলল, এসবই অম্বুজার কাক। তিনটে লুকিয়ে নিয়ে এসে রেখেছি।

আমি খুবই হতাশ হয়ে পড়লাম। এইভাবে ধাপ্পা দিয়ে কি রোগীর চিকিৎসা করা যায়? অসম্ভব।

নিশীথ বলল, এবার তুমি স্নান করে খেয়ে নাও। এদিকে বাথরুম। চৌবাচ্চাভর্তি জল আছে। তারপর ঠাকুর এ ঘরেই খাবার দিয়ে যাবে। তোমায় কোথাও যেতে হবে না। আমি এখন যাচ্ছি।

সবেমাত্র নিশীথ চৌকাঠের বাইরে পা রেখেছে হঠাৎ দুমদাম শব্দ। শব্দটা এল দোতলার কোনো ঘর থেকে। আমি চমকে উঠলাম। নিশীথ বলল, ও কিছু নয়। অম্বুজা দরজা ঠেলছে।

অম্বুজা?

রাজকুমারীর নাম। জলের ধারে পাওয়া গিয়েছিল বলে ঐ নাম দেওয়া হয়েছে। অম্বু মানে তো জল।

নাম নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। বললাম, ও কি ঘরে আটকে আছে? হ্যাঁ, যখন-তখন পালিয়ে যায় বলে ওকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়।

বলেই নিশীথ চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা চিৎকার, দরজা খোলো—দরজা খোলো—

বললে কেউ বিশ্বাস করবে না গলাটা পুরোপুরি একটা রাগী পুরুষের।

ঐ গলা শোনা মাত্র বাড়ির পিছনের গাছে গাছে যে-সব পাখিরা কিচমিচ করছিল তারা থেমে গেল। উঠোনে একটা কুকুর চোখ বুজিয়ে ঘুমোচ্ছিল, হঠাৎ সোজা হয়ে কান খাড়া করে উঠে দাঁড়াল। আমি শব্দ লক্ষ্য করে দোতলার সার সার ঘরগুলোর দিকে তাকলাম। কিন্তু কোন ঘর থেকে অম্বুজা চিৎকার করেছিল তা বুঝতে পারলাম না।

খাওয়া-দাওয়ার পর লম্বা হয়ে শুয়ে বিশ্রাম করছিলাম। বিশ্রাটা হচ্ছিল শরীরের, মনের



নয়। একটা চিন্তাই মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল—যে কণ্ঠস্বরটা শুনলাম সে কি একটা দশ-এগারো বছরের মেয়ের? মেয়েদেরও গলার স্বর কারো কারো মোটা হয়, কিন্তু এ যে কোনো ব্রুন্দ দানবের গলা। তা হলে এ তো কেবলমাত্র একটি মানসিক রোগগ্রস্ত মেয়ে নয়, অন্য কিছু। সে অন্য কিছুটা কী? আমি তার কী-বা চিকিৎসা করব?

নিস্তব্ধ দুপুর। আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগের একটা গ্রাম মাত্র। যারা পাড়াগাঁয়ে থাকে একমাত্র তারাই জানে দুপুরের নিস্তব্ধতা ওসব জায়গায় কেমন।

আমি আর শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে পারলাম না। উঠে পড়লাম। ঘরটা ভালো করে দেখলাম। সে আমলের মোটা মোটা কড়ি। আলকাতরা মাখানো। ঘরখানা ছোটোই। তিনদিকে জানলা। জানলার গায়ে লোহার জাল দেওয়া। বাড়ির পিছন দিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে ঘন জঙ্গল। সে জঙ্গল কতদূর পর্যন্ত গেছে কে জানে। একবার ওদিকের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িলাম। আমি বরাবর শহরে-থাকা মানুষ। ঘরের গায়ে একেবারে জানলার ধারেই এমন জঙ্গল কখনো দেখিনি। গা-টা কেমন ছমছম করে উঠল। কিসের ভয় তা জানি না। তবু ভয়। মনে হলো কিছু একটা ঘটবে। এখানে আসা আমার উচিত হয়নি। এই জঙ্গলের ধারে—এই ঘরে আমাকে একা রাত কাটাতে হবে।

এ ঘরের মাঝখানে যে খাটটা সেটা রাজবাড়িরই উপযুক্ত। কালো বার্নিশ করা মোটা মোটা পায়া। খুব উঁচু। পুরু গদি। কবেকার গদি। জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে ছোবড়া বেরিয়ে গেছে।

এবার চারপাশের জায়গাটা কিরকম দেখার জন্য দরজায় তাল লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কোন দিকে যাব?

ঠিক করলাম বাড়িটার চারদিক আগে দেখা দরকার। বিশেষ করে দোতলার কোন ঘরে অম্বুজাকে আটকে রাখা হয়েছে সেটার যদি হদিস পাওয়া যায়।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাশেই কাছারিবাড়ি। সেখানে নায়েব-গোমস্তারা একটা করে কাঠের বাক্স নিয়ে তার ওপর হিসেব-পত্তর কষছে। কিন্তু সবাই যেন বোবা হয়ে রয়েছে। কাছারিবাড়ির পাশ দিয়ে বাঁদিকে চললাম। গোড়ালি-ডোবা ঘাস। ওদিকে কলাবাগান। সজনে গাছ। কুল গাছ। একটু দূরে লম্বা লম্বা কতকগুলো দেবদারু গাছ।

আশ্চর্য হলাম সব গাছগুলোই যেন শুকিয়ে গেছে। দুটো নারকেল গাছ। একটাতেও পাতা নেই। পায়ের নিচে ঘাসগুলো কেমন হলুদবর্ণ। এমন কেন হলো?

ক্রমে গোটা বাড়িটা ঘুরে দেখলাম। অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাড়িটা। কত যে ঘর তার হিসেব নেই। সব ভেঙে পড়ছে। ভেবে পেলাম না এখানে মানুষ কী করে থাকতে পারে।

হঠাৎ কি যেন একটা পায়ের কাছ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। চমকে লাফিয়ে উঠলাম। একটা বেঁজি।

কিন্তু এই যে বাড়ির চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি—ঠিক কী যে খুঁজছি তা আমি নিজেও জানি না। আমি তো এই রাজবাড়ির একটি মেয়ের চিকিৎসা করার জন্যে এসেছি। তবে কেন একজন গোয়েন্দার মতো চারিদিক লক্ষ্য করে বেড়াচ্ছি?

নিজেই উত্তর খুঁজে পেলাম। আমি যে রোগীকে দেখতে এসেছি, সে সাধারণ রোগী নয়। এখানে এসে পর্যন্ত অস্বস্তিকর বাতাস, চারিদিকে থমথমে ভাব, সেই ভয়ংকর চড়া,

অদ্ভুত বুড়িটা, শুকনো গাছপালা আর—আর রাজকন্যার পুরুষ মানুষের মতো গলা, কাক পোষা, বাড়ি থেকে যখন-তখন পালিয়ে যাওয়া—এসবই যেন কেমন রহস্যময়। শুধু রহস্যময়ই নয়, অশুভ কোনো কিছুর দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে। একটা কথাই বারে বারে মনে হচ্ছে মেয়েটা তাহলে আসলে কী? আমার আবার বুড়ির সেই কথাটাই মনে হলো—সাবধান!

### সেই দিন রাতে

নিশীথ সেই যে চলে গিয়েছিল আর পান্তা নেই। বুঝি তার অনেক কাজ—রাজাবাবুর সেক্রেটারি, তবু অপরিচিত জায়গায় আমাকে এভাবে একা ফেলে রাখাটা ঠিক হয়নি। এই স্তব্ধ নির্জন ঘরে কথা বলারও তো মানুষ চাই।

সারা দুপুর রাজবাড়ির চারিদিক ঘুরে পড়ন্ত বেলায় দরজার তালা খুলে ঘরে এসে ঢুকলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হলো। অমনি মশার ঝাঁক ছেকে ধরল। বাড়ির চাকর গুটিগুটি এসে একটা লণ্ঠন দরজার কাছে রেখে গেল। আশ্চর্য, সেও একটা কথা বলল না। যন্ত্রের মতো শুধু ঘরে ঘরে, দালানে লণ্ঠন রেখে দিয়ে যাচ্ছে।

একটু পরে বাইরে জুতোর শব্দ হলো। তাকিয়ে দেখি নিশীথ আসছে। আর তারই সঙ্গে বাবুর্চির মতো একটা লোক ট্রেতে করে চা আর ডিমের ওমলেট নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রেখে গেল।

আমি কিছু বলার আগেই নিশীথ বলল, জানি তুমি রাগ করেছ। কিন্তু আমার সমস্যা যে কতরকম তা ভাবতে পারবে না। আজকেই একটা কাণ্ড হয়ে গেছে। খাবার জন্যে অম্বুজার দরজা খোলা হয়েছিল আর সেই ফাঁকে দৌড়। ভাগ্যি প্রহরীরা ধরে ফেলেছিল! তবু ঐটুকু মেয়েকেও কায়দা করতে পারছিল না। মওকা বুঝে একজন প্রহরীকে আঁচড়ে কামড়ে এমন ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে যে তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে।

বললাম, ও কি বরাবর এইরকম হিংস্র প্রকৃতির ছিল?

না। যত বড়ো হচ্ছে ততই যেন হিংস্র হয়ে উঠছে।

একটু থেমে বলল, যাক, একটা কথা বলে নিই। অম্বুজা শান্ত হলে ওকে তোমার কথা বলেছি। তুমি কাক ধরতে পার জেনে ও চুপ করে রইল। কালকে তোমার কাছে নিয়ে আসব বলেছি। সেই সময়ে তুমি ওকে ভালো করে স্টাডি করে নিও।

আমি নিঃশব্দে মাথা দোললাম। নটার মধ্যেই রাতের খাওয়া সেরে ভালো করে দরজা-জানলা বন্ধ করে লণ্ঠনটা একটু কমিয়ে মশারি টাঙিয়ে শুয়ে পড়লাম। বালিশের পাশে রাখলাম টর্চটা যেন দরকার হলেই পাই।

সারা দিনের ক্লান্তি আর চাপা উত্তেজনা ছিল। যতক্ষণ না ঘুম আসছিল ততক্ষণ অম্বুজার কথাই ভাবছিলাম। তাকে এখনও চোখে দেখিনি কিন্তু যা সব শুনলাম তাতে তো বেশ ঘাবড়ে যাচ্ছি। একটা দশ-এগারো বছরের মেয়ে একজন দারোয়ানের টুটি কামড়ে ধরে! তাছাড়া আশ্চর্য ঐ রাজাবাবু মানুষটি। থমথমে মুখ। নিশীথ যখন আলাপ করিয়ে দিল তখন উনি কোনো কথাই বললেন না। শুধু মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানিয়ে উঠে গেলেন। এ আবার কিরকম রাজা! এত বিষয় কেন?

ভাবতে ভাবতে কখন একসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎই কিসের যেন একটা মৃদু শব্দ পেলাম। ঘুমের ঘোরে প্রথমে মনে হয়েছিল এদিকের জানলার ধারে টানা বারান্দা দিয়ে

বুঝি কেউ আসছে। কিন্তু তারপরেই মনে হলো—না, শব্দটা বাইরে থেকে আসছে না। ঘরের ভেতরেই। আর তা আমার খাটের কাছেই।

আমার মেরুদণ্ড দিয়ে যেন একটা হিমশ্রোত বয়ে গেল। সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠল। সব দরজা-জানলা বন্ধ তবু কে ঘরে আসতে পারে? যেইই আসুক সে যে কখনোই মানুষ হতে পারে না এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয়নি। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুয়ে রইলাম।

মৃদু শব্দটা তখন ঘুরছে—খাটের এদিক থেকে ওদিক। লক্ষ্য যে আমিই, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তা অনুভব করতে পারলাম। কিন্তু—কী ওটা? পায়ের শব্দ নেই, নিঃশ্বাসের শব্দ নেই, অথচ ঘরের মধ্যেই কিছু একটা আছে। আমি ইচ্ছে করেই টর্চ জ্বাললাম না। অন্ধকারের মধ্যেই এতটুকু না নড়ে ঠাণ্ড করার চেষ্টা করলাম। কিছু দেখতে পেলাম না।

হঠাৎ আমার পায়ের দিকের মশারিটা নড়ে উঠল। মনে হলো কেউ যেন মশারিটা তোলবার চেষ্টা করছে। ভয়ে পা দুটো টেনে নিলাম। তারপরেই বস্তুটা যেন জানলার ধারে চলে গেল। গিয়ে পাশ থেকে মশারিটা তোলবার চেষ্টা করতে লাগল। আমি তাড়াতাড়ি বাঁ দিকে গড়িয়ে এলাম। সেও এবার সরে এল মাথার কাছে। এখন কোনো শব্দ নেই। শুধু নিঃশব্দে চেষ্টা চলছে আমার মশারির মধ্যে ঢোকবার। এবার মাথার দিকের মশারিটা তুলছে....আমি বালিশ দিয়ে জোরে মশারির প্রান্তটা চেপে ধরলাম। আর তখনই দেখলাম দুটো ছোট গোল গোল চোখ আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

যা থাকে কপালে ভেবে টর্চটা টেনে নিয়ে জ্বাললাম। একটা বিকট কাক। বেশ বড়োসড়ো। বোধহয় পাহাড়ী কাক। এরকম অদ্ভুত কাক দেখা যায় না। কিন্তু....ঘরের মধ্যে কাক এল কোথা থেকে? সে কথা ভাবার সময় পেলাম না। চোখের ওপর টর্চের আলো পড়া মাত্র কাকটা লম্বা ঠোঁট দুটো ফাঁক করে ফের মশারির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। টর্চ দিয়ে তাড়া করতে এবার মশারির চালে এসে বসল। বসামাত্রই তার ভারে মশারিটা অনেকখানি ঝুলে পড়ল। আমি প্রমাদ গুনলাম। ভয়ংকর কাকটা চালের ওপরে। ক্রমশই চালটা নিচু হচ্ছে। নড়েচড়ে যে আত্মরক্ষা করব তার উপায় নেই। মশারি থেকে বেরোতেও সাহস হয় না। তা হলে তো চোখ দুটো খুবলে নেবে। কোনোরকমে উপড় হয়ে শুয়ে কি কর্তব্য ভাবতে লাগলাম।

কেমন সন্দেহ হওয়ায় আবার টর্চ জ্বাললাম। আঁতকে উঠলাম। কাকটা মশারির চাল ফুটো করে গলা আর বুক ঢুকিয়ে দিয়েছে। দুটো লম্বা ঠোঁট আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি আর এতটুকু দেরি না করে টর্চ দিয়ে জোরে এক ঘা বসিয়ে দিলাম। আঘাতটা বোধহয় মাথায় না লেগে পিঠে লাগল। দারুণ যন্ত্রণায় ডানা ঝাপটে মশারি থেকে উড়ে গিয়ে সশব্দে মেঝেতে পড়ল।

আমি তবু বেরোতে পারলাম না। মশারির মধ্যেই কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে রইলাম। হাতের মুঠোয় ধরা টর্চটা। ঐ রাক্ষুসে কাকের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার ওটাই এখন আমার একমাত্র অস্ত্র।

সকালে উঠেই মেঝের দিকে তাকালাম। কাকটা নেই। অবাক হলাম। যে কাকটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে মুখ খুবড়ে পড়ল, সে উড়ে পালাল কি করে? কাকটা ঘরে ঢুকলই বা কি করে? তখনই মনে পড়ল—তাই তো পাশের ছোটো ঘরটায় তিনটে খাঁচায় তিনটে কাক ছিল। বোধহয় একটার খাঁচা খোলা ছিল। বেরিয়ে পড়েছিল।

পাশের ঘরে ঢুকতে যেতেই ধাক্কা খেলাম। দরজায় তো শেকল তোলা।

তা হলে?

শেকল খুলে ভেতরে ঢুকে দেখি তিনটে খাঁচারই দরজা বন্ধ। আর তার মধ্যে তিনটে কাকই ঘাড় বঁকিয়ে বিরক্ত হয়ে আমাকে দেখছে।

একটু বেলায় নিশীথ এসে যখন জিজ্ঞেস করল, রাতে কোনো অসুবিধে হয়নি তো? তখন সব ঘটনা খুলে বললাম। শুনে ওর মুখ-চোখের ভাব এমনই হয়ে গেল যে আমি রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম, কি হলো? এত কী ভাবছ?

নিশীথ বললে, ভাবছি অনেক কিছু।

বললাম, আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে কাকটা পালাল কোথা দিয়ে? সব দরজা-জাললাই তো বন্ধ ছিল।

ও বলল, যেদিক দিয়ে ঢুকেছিল সেই দিক দিয়েই বেরিয়ে গেছে। বলে আঙুল দিয়ে কোণের ঘুলঘুলিটা দেখিয়ে দিল।

কিন্তু ব্যাপারটা অন্য। নিশীথ বলতে লাগল, আমি ভাবছি অম্বুজা তোমার ওপর চটল কেন? তোমাকে এখনও দেখেইনি। তুমি যে ডাক্তার সে কথাও বলিনি। তাহলে?

আমি অবাক হয়ে বললাম, ও আমার ওপর চটেছে বুঝলে কি করে?

নিশীথ গভীর গলায় বলল, কাকগুলো সব ওর পোষা। ঐ কাকটাকে ও-ই পাঠিয়েছিল তোমার টুটি ছিঁড়ে দেবার জন্যে। একটু থেমে বলল, শোনো ভাই, তুমি না হয় কলকাতায় ফিরেই যাও। এখানে থেকে দরকার নেই।

বললাম, এসেছি যখন তখন দুদিন থেকেই যাই। রাজনন্দিনী অম্বুজাকে একবার অন্তত চোখের দেখা দেখে যাব।

চোখের দেখা হলো সেদিন বেলা দশটা নাগাদ। ভাগ্যিস হলো, না হলে আমার ওপর রাগের কারণ জানতেই পারতাম না।

নিশীথই সঙ্গে করে এনেছিল।

সে দেখল আমায় অবাক হয়ে। তার চঞ্চল দৃষ্টি আমার গলার কাছ পর্যন্ত এসে থমকে গেল। কেমন যেন হতাশা হলো। ক্রুদ্ধ হলো। বোধহয় ও নিশ্চিত ছিল ওর পাঠানো কাকটা গত রাতে আমার চোখ খুবলে নিয়েছে, নয় তো টুটি কামড়ে দিয়েছে।

আমিও ওকে ভালো করে দেখলাম। এই কি সেই পরমাসুন্দরী মেয়ে যাকে মহারানী কুড়িয়ে পেয়েছিলেন? দেখলে কে বলবে দশ-এগারো বছরের মেয়ে। ফর্সা রক্ত। কিন্তু মুখটা যেন ইঁটের তৈরি। শক্ত কঠিন। সরলতা বা লাবণ্যের ছিঁটেফোঁটা নেই। চোখ দুটো যেন সবসময়ে অগ্রসন্ন। কপালে ভূকুটি সঁটেই আছে। ঐটুকু মেয়ের চুল কোমরের নিচে পর্যন্ত ঝুলছে। খসখসে চুল। পরনে লুঙ্গির মতো করে পরা শাড়ি। গায়ে বেনিয়ান।

নিশীথ বিনীতভাবে বললে, রাজকুমারী, এই আমার বন্ধু অসিত। কলকাতায় থাকে। ওর ব্যবসা পাখি ধরার। চিড়িয়াখানায় যোগান দেয়। আর কাক ধরতেও ওস্তাদ। কাক ধরবার জন্যে পশ্চিমে পাহাড় পর্যন্ত যায়। এই দ্যাখো, কয়েকটা নমুনা এনেছে। বলে খাঁচা তিনটে এনে সামনে রাখল।

রাজকুমারী কিন্তু সেদিকে ফিরেও তাকাল না। কর্কশ পুরুষ কণ্ঠে বললে, তুমি কি জন্যে এখানে এসেছ?

বললাম, আপনি কাক পছন্দ করেন। আমি কাক ধরতে পারি। তাই নিশীথ আসতে বলেছিল।

রাজকুমারী ছংকার দিয়ে বললে, মিথ্যে কথা। তুমি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এসেছ। বললাম, না-না, আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।

উদ্দেশ্য নেই? অম্বুজার দু'চোখ জ্বলে উঠল। উদ্দেশ্য নেই তো কাল সারা দুপুর চোরের মতো আমার ঘরের নিচে ঘুরছিলে কেন?

আশ্চর্য! এই কি একটা দশ-এগারো বছর বয়েসের মেয়ের কথা?

বললাম, আপনার কোন ঘর তা তো জানি না। আমি নতুন এসেছি। এত বড়ো ঐতিহাসিক রাজপ্রাসাদ—তাই ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম।

রাজকুমারী পুরুষের গলায় বলল, ওসব জানি না। যত শীগগির পার এখান থেকে চলে যাও। বলে বাঁ হাতটা তুলে বাইরের পথটা দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল।

বাইরের পথটা আমার তখন দেখার অবসর ছিল না। আমি দেখছিলাম ওর বাঁ হাতটা। বেঁটে বেঁটে মোটা আঙুল। আর হাতটা ছিল লোমে ঢাকা।

নিশীথের মুখটা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। বললে, কাজ নেই ভাই, তোমার এখানে থেকে। তুমি চলেই যাও।

আমি হেসে বললাম, এসেছি যখন তখন অত সহজে যাব না। তুমি এক কাজ করো। ওকে গিয়ে বলো আমার জ্বর এসে গিয়েছে। নড়তে পারছি না। যা হোক করে দু'তিনটে দিন আমায় থাকতেই হবে।

সন্ধ্যাবেলায় টেবিলের ওপর উঠে ঘুলঘুলিটা একটা ইট দিয়ে বুজিয়ে দিলাম। তবুও ভয়ে ভয়ে রাতটা কোনোরকমে কাটালাম। চোখের সামনে কেবলই ভেসে উঠছিল অম্বুজার সেই বীভৎস হাতটা। ও কি মানুষের হাত? এইরকম একটা হাত দেখেও রাজবাড়ির সকলে নিশ্চিন্তে ঘুমোয় কি করে?

সেদিনও দুপুরবেলায় ফের রাজবাড়ির পিছনের দিকে যেতে হয়েছিল। ইচ্ছে করে যাইনি। খাওয়া-দাওয়ার পর চেয়ারটা ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে বসে বসে আমার কর্মপন্থার কথা ভাবছিলাম। থেকে তো গেলাম। কিন্তু কেন থাকলাম? অম্বুজার রহস্য-উদ্ঘাটন? তা সম্ভব কি করে? ওর তো দেখা পাওয়াই ভার। তখন ঠিক করলাম যেমন করে হোক দোতলায় আমায় একবার গোপনে উঠতেই হবে। কিন্তু—

হঠাৎ সোঁ সোঁ করে কিসের একটা আওয়াজ শুনে চমকে ওপর দিকে তাকলাম। বিশাল একটা কাকের মতো কী যেন সেই চরের দিক থেকে সাঁ করে উড়ে এসে রাজপ্রাসাদের পিছন দিকে চলে গেল। জিনিসটা কি দেখার জন্যে তখনই সেই দিকে ছুটলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না।

আমি গোটা বাড়িটার চারিদিক ঘুরে ঘুরে দেখলাম। প্রত্যেকটি গাছের ডালের দিকে তাকাতে লাগলাম। তারপর দোতলার ঘরগুলোর দিকে—যদি কোনো জানলা খোলা থাকে হয়তো তার ভেতর দিয়েই ঢুকে পড়েছে। জানলাগুলোও তো সাবেক আমলের মতো বড়ো বড়ো। গরাদ নেই। শুধু বিবর্ণ রঙের পাল্লা। কোনো কোনোটার পাল্লা ভেঙে ঝুলছে। তবু নাকি এটা রাজপ্রাসাদ। সেখানে একজন রাজাও থাকেন যাকে বড়ো একটা দেখা যায় না। গলার স্বরটুকু পর্যন্ত শোনা যায় না।

হতাশ হয়ে ফিরে আসছিলাম। ভিজে ঘাস—কোথাও মাটি। পায়ে একটা পিঁপড়ে কামড়াতেই দাঁড়িয়ে পড়ে দু-আঙুলের চাপে পিঁপড়েটার ভবলীলা সঙ্গ করে দিলাম। আর

তখনই চোখে পড়ল মাটিতে কয়েকটা পায়ের ছাপ। সে ছাপ বেশ বড়ো। সাধারণ মানুষের মতো নয়। ছাপগুলো দেখে মনে হলো পায়ের আঙুলগুলো অস্বাভাবিক বেঁটে বেঁটে।

দোতলার একটা ঘরের ঠিক নিচে এই পায়ের ছাপ এল কি করে?

আমি পায়ের ছাপের বিশেষজ্ঞ নই। তবু এটুকু বুঝতে পারলাম এই পায়ের অধিকারী যে সে দৌড়ে বনের দিকে গেছে। কিন্তু কোথা থেকে এসেছিল তার কোনো চিহ্ন নেই।

আমি সেখানে বেশিক্ষণ আর দাঁড়াতে সাহস পেলাম না। কি জানি দোতলা থেকে যদি অশুভা দেখে ফেলে তাহলে আর রক্ষে নেই। চিন্তা-ভারাক্রান্ত মনে ঘরে ফিরে এলাম।

একে তো অশুভার চেহারা, তার অদ্ভুত গলার স্বর, আচরণ আমায় ভাবিয়ে তুলেছিল, তার ওপর এই এক উটকো চিন্তা মাথায় ঢুকল। অত বড়ো কালো পাখির মতো জম্বুটা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে এসে হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! ঐ পায়ের ছাপগুলোই বা কার? আমি কি কোনো অলৌকিক জগতে বাস করছি? আমি কি ভুলে যাচ্ছি আমি কলকাতায় থাকি আর আমি একজন ডাক্তার?

সন্ধ্যার পর নিশীথ এল দেখা করতে। মুখটা যেন দুশ্চিন্তায় কালো।

চা খেয়েছ?

বললাম, হ্যাঁ।

কি ঠিক করলে?

বললাম, দুতিন দিনের মধ্যে যাচ্ছি না। তুমি অশুভাকে বলেছ তো আমি অসুস্থ?

তা বলেছি। কিন্তু বিশ্বাস করেছে বলে মনে হলো না।

আচ্ছা, রাজাবাবুর সঙ্গে কাল সেই একবার দেখা হয়েছিল। আর তো দেখিনি এর মধ্যে?

নিশীথ আমার প্রশ্নে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বললে, মেয়েটিকে নিয়ে তো ওঁর সব সময়েই মাথা খারাপ। দিন দিনই কিরকম হয়ে যাচ্ছে। অথচ কোনো উপায় নেই।

রানীমা?

নিশীথ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, দেড় বছর হলো উনি মারা গেছেন।

কেন জানি না শুনে যেন ধাক্কা খেলাম। বুঝতে পারলাম কেন রাজাবাবু নিজেকে গুটিয়ে রেখেছেন।

আচ্ছা, রানীমা—

নিশীথ আমায় থামিয়ে দিয়ে বলল, প্লিজ ভাই, আর প্রশ্ন করো না।

আচ্ছা, আমায় একটু সাহায্য করবে?

নিশীথ যেন বিব্রত হয়ে বলল, কি বলো।

আমায় একবার দোতলায় নিয়ে যেতে পার?

দোতলায় কেন?

এলাম যখন পুরনো রাজপ্রাসাদের দোতলাটাও দেখে যেতে ইচ্ছে করছে। জীবনে তো নতুন বা পুরনো কোনো রাজবাড়িরই দোতলায় ওঠা সম্ভব হয়নি।

নিশীথ ভুরু কুঁচকে বলল, তোমার মতলবটা কী বলো দেখি।

আমি হেসে বললাম, অশুভার ঘরটা একবার দেখতে চাই।

ঐ সাংঘাতিক মেয়েটার ঘর দেখবে! তুমি কি এখনও ওকে বুঝতে পারনি?

বললাম, কিছুটা পেরেছি। পুরোটা পারিনি।

নিশীথ বললে, না ভাই, ও আমি পারব না।

বললাম, আমার এ অনুরোধ তোমায় রাখতেই হবে। বেশ, আমি ওর মুখোমুখি হতে চাই না। আড়াল থেকে ওর একটা ছবি তুলতে চাই।

বাঃ! চমৎকার! তারপর কাগজে কাগজে ছবিটা ছেপে রাজাবাবুর মাথা হেঁট করে দাও। ছিঃ!

আমি ওর হাত ধরে বললাম, আচ্ছা, কথা দিচ্ছি ছবি তুলব না। কিন্তু তুমি আমায় একটিবার দোতলায় নিয়ে চলো। না হয় ওকে যখন ঘরে তালা এঁটে রাখা হয় তখনই নিয়ে যেও। আমি দোতলাটা শুধু একবার দেখব।

নিশীথ অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আমার অনুরোধ ঠেলতে পারল না। রাজী হলো।

ও চলে যাচ্ছিল, আমি ডেকে বললাম, আচ্ছা, তোমাদের এখানে কাকজাতীয় বিরাট কোনো কিছু উড়তে দেখেছ?

নিশীথ অবাক হয়ে বলল, সে আবার কী! এতকাল এখানে আছি অমন কিছু তো দেখিনি। কেন? তুমি কিছু দেখেছ নাকি?

বললাম, ঐরকম যেন কিছু দেখলাম দুপুরবেলায়।

কোন দিক থেকে এল?

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম, ঐ দিক দিয়ে।

তার মানে পুরনো চরার দিক থেকে। কোথায় গেল?

কি জানি। হঠাৎ যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিশীথের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। শুধু বলল, এবার আমাকেও বোধ হয় চাকরি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

### রাজপুরী নয়তো যেন মৃতের পুরী

পরের দিন দুপুরে নিশীথ আমাকে দোতলায় নিয়ে চলল। ও একটা কথাও বলছিল না। বুঝতে পারছিলাম ও চাইছে না আমি ওপরে যাই।

চওড়া চড়ড়া কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়িগুলো ভাঙা ভাঙা। দেওয়ালেও অজস্র ফাঁক-ফোকর। সিঁড়িটা অনেক ঘুরে ওপরে উঠেছে। এক-একটা বাঁকে ছোটো ছোটো খুপরি ঘর—বেশির ভাগই তালাবন্ধ। মর্চে ধরা পুরনো তালা। কবে যে সে তালা শেষ লাগানো হয়েছে তা কেউ বলতে পারে না। সেসব ঘরের দরজাগুলোও ভেঙে পড়ার মতো। কি আছে ওসব ঘরে কে জানে।

দোতলায় উঠে টানা বারান্দা। দু'পাশে ঘর। প্রায় প্রত্যেক ঘরেই লোকজন আছে। এত লোক আছে অথচ এই দু'দিনে তা বোঝাই যায়নি। কয়েকজনকে দেখলামও। কিন্তু তাদের জীবন্ত মানুষ বলে মনে হলো না। মুখে কথা নেই, আমি যে একজন নতুন মানুষ ওপরে এসেছি—তা কোনো কৌতূহলই নেই। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। আশ্চর্য এই যে, এরা যেন সবাই মুখে কুলুপ এঁটে আছে। কথা নেই। সবারই চোখের চাউনিতে ভয় ভয় ভাব—এই বুঝি কিছু হয়। আমার মনে হলো এরা যেন এ জগতের বাসিন্দা নয়।

কোথা থেকে কোথায় এসেছে জানে না। কেউ কাউকে চেনে না। অথচ পরে নিশীথের কাছ থেকে জেনেছিলাম এরা সবাই রাজপরিবারেরই। বসে বসে রাজার অন্তর্দৃষ্টি করছে। তাদের অন্য কোথাও যাবার উপায় নেই বলেই দু'চোখে চাপা আতঙ্ক নিয়ে এখানে পড়ে আছে। আতঙ্ক কাকে নিয়ে তা বুঝতে বাকি রইল না।

বললাম, রাজাবাবু কোন ঘরে থাকেন?

ঐ দিকে। কিন্তু ওখানে যাওয়া নিষেধ।

একটা তালাবন্ধ ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

এটা কার ঘর?

অম্বুজার।

ও এখন ঘরে কি করছে?

নিশীথ গভীরভাবে বলল, জানি না। এবার চলো। আর নয়।

হঠাৎ দরজার ভেতর থেকে ত্রুদ গলা পাওয়া গেল, কে ঘুরছে বারান্দায়?

নিশীথ দরজার কাছে মুখ এনে বলল, আমি নিশীথ।

দরজা খুলে দাও।

নিশীথ আমার হাত ধরে তাড়াতাড়ি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে এল। চলে আসবার সময় দেখলাম অম্বুজার ঘরের এদিকে একটা জানলা আছে। পাছে খোলে সেজন্য শেকল বাঁধা।

আমরা সবে সিঁড়ি দিয়ে নামছি, দরজায় দুমদাম শব্দ। সেই সঙ্গে ত্রুদ মোটা গলায় চিৎকার, দরজা খোলো, দরজা খোলো।

সন্ধ্যার পর নিশীথ যথারীতি এল। ও যেন এ দুদিনে কেমন হয়ে গেছে। আমার চেয়েও যেন ও-ই বেশি ভয় পেয়েছে। বিনা ভূমিকায় বলল, শোনো, ঐ কাক-টাকের কথা কাউকে বলো না যেন। সবাই ভয়ে অস্থির হয়ে যাবে।

মনে মনে হাসলাম, তাও তো অম্বুজার ঘরের নিচে মাটিতে সেই পায়ের ছাপের কথা প্রকাশ করিনি।

বললাম, বলব আর কাকে? এত বড়ো বাড়িতে লোক বলে কেউ আছে? ওপরে যাদের দেখলাম ওরা তো সবাই এক-একটা মমি। সেই রূপকথায় রাক্ষসের গল্প পড়েছিলাম রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে মড়ার মতো করে রেখেছিল, সেই রকম।

নিশীথ চুপ করে রইল।

বললাম, আচ্ছা, অম্বুজা ঘরে একলা থাকে কেন? সঙ্গে কেউ থাকলে তো পালাতে পারবে না।

নিশীথ বলল, ও কাউকে নিয়ে শুতে চায় না। অবশ্য এতগুলো আত্মীয় রয়েছে, তাদের কাউকে বললে শোবেও না।

কেন?

কেন তা তো দেখতেই পাচ্ছ। তা ছাড়া—এই পর্যন্ত বলে নিশীথ থেমে গেল।

থামলে কেন?

তা ছাড়া এ বাড়ির সকলের ধারণা হয়েছে ওর সঙ্গে যে শোবে সেই মরে যাবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, সে আবার কি?

হ্যাঁ, রানীমা, ওকে খুব ভালোবাসতেন। তাই ওর কাছেই সেই ছোটোবেলা থেকে বরাবর



শুতেন। কিন্তু হঠাৎ দেড় বছর আগে ঐ মেয়ের পাশে শুয়েই মরে গেলেন। অথচ কোনো রোগ হয়নি। তারপর আরও তিনজন মেয়েকে ওর ঘরে শোবার জন্যে পাঠানো হয়েছিল। জলজ্যান্ত মেয়ে। পরপর তিনটেই মরে গেল।

কিসে মরত?

কেউ বলতে পারল না। কোনো রোগ ছিল না। শুধু সকালে দেখা যেত ঠোট নীল হয়ে গেছে। একটু থেমে বলল, বোধ হয় সাপে কামড়েছিল।

কথাটা যে সেও বিশ্বাস করে না তা ওর গলার টোন শুনেই বোঝা গেল।

এটাও আমার কাছে নতুন তথ্য। বিষে নীল হয়ে যেত। এমনি সময়ে হঠাৎ একজন প্রহরী বাস্তু হয়ে নিশীথকে ডেকে নিয়ে গেল। নিশীথ চা খাচ্ছিল, অর্ধেক খেয়েই ‘আমি আসছি’ বলে উঠে গেল। আমি হতভম্বর মতো বসে রইলাম। না জানি আবার কী রহস্যজনক খবর শুনব।

খবরটা রহস্যজনকই বটে। সেদিন দুপুরে দরজা খোলা পেয়ে অম্বুজা যখন পালাচ্ছিল তখন সে প্রহরীর টুটি কামড়ে দিয়েছিল, হাসপাতাল থেকে খবর এসেছে সে এই মাত্র মারা গেছে।

অত অল্প ক্ষতে মরবার কথা নয়, রক্তপাতও বেশি হয়নি। তবু মরল। ডাক্তাররা বলেছে তীব্র বিষক্রিয়ায় মৃত্যু।

আমি চমকে উঠলাম। অম্বুজার দাঁতে এত বিষ! কি করে?

### আবার দোতলায়

গভীর রাতে সেদিন যখন আমি দোতলার সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়িলাম তখন ভরা অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকার। সন্ধ্যার পর থেকেই বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে যায়। মনে হয় গোটা বাড়িটাই যেন কোনো অশুভ শক্তির মুঠোর মধ্যে চলে গেছে। কারও কিছু করার নেই। শুধু অপেক্ষা করে থাকা কবে সেই চরম সর্বনাশের মুহূর্তটি আসবে।

এ ক’দিনে অম্বুজা সম্বন্ধে আমার এই ধারণাই হয়েছে—দশ-এগারো বছরের বালিকাটি নিমিত্তমাত্র। তার আড়ালে লুকিয়ে আছে একটা ভয়ানক দানব। সেই দানবটিকে দেখতে চাই।

সমস্ত প্রাসাদটা নিবুঁম। মাঝে মাঝে বাগানের কোনো গাছে রাতজাগা পাখি ডানা ঝটপটিয়ে উঠছে। তারাও কি কোনো কিছুই ভয় পাচ্ছে?

আমি হাতের মুঠোয় টর্চটা ধরে সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে উঠতে লাগলাম। সেদিন দিনের বেলায় নিশীথের সঙ্গে এসে সিঁড়ি, ঘরগুলো সব চিনে রেখেছি।

নিঃশব্দে একটার পর একটা সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। হঠাৎ হঠাৎ থেমে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে আমার পিছনে কেউ যেন আসছে। যে কোনো মুহূর্তে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু পিছু ফিরে দেখি কেউ নেই।

থাকবেই বা কে? সবাই তো ঘুমে অচেতন।

আরো কয়েক ধাপ উঠতেই একেবারে আমার গায়ের কাছে বাঁ দিকে কেমন যেন একটু শব্দ হলো। আমি চমকে তাকাতেই দেখলাম সেই তালা দেওয়া একটা ঘুপচি ঘরের দরজার ওপর দুটো চোখ জ্বলছে। একটু ঠাণ্ড করতেই আঁৎকে উঠলাম। কাক। সেই ভয়ংকর কাক।

সেদিনের রাতের ঘটনার পর থেকে আমার কেমন কাকের ওপর ভয় ধরে গেছে।

আমি নিঃশব্দে আরও দু'ধাপ উঠে এলাম। আবার একটা ঘুপচি ঘর। আবার একটা কাক। এইরকম পরপর পাঁচটা। কাকগুলো কোনো শব্দ করছে না। শুধু আমায় লক্ষ্য করছে।

একই ধরনের এত কাক এলো কোথা থেকে?

তখনই মনে পড়ল অম্বুজার কাক পোষার কথা। শুধু পোষাই নয়, কাকগুলো সিঁড়ির ধাপে ধাপে বসে যেন পাহারা দিচ্ছে।

আমি দোতলার টানা বারান্দায় উঠে এলাম। সেই ঘরগুলো যেখানে আগের দিন মানুষজন দেখেছিলাম সব বন্ধ। শুধু দরজাই বন্ধ নয়, জানলাগুলোও। এত ভয়?

আমি এগিয়ে এসে দাঁড়িলাম অম্বুজার ঘরের সামনে। দরজা বাইরে থেকে তালা বন্ধ। আমি দরজায় কান পেতে শুনলাম ঘরের ভেতরে একটা মৃদু শব্দ হচ্ছে—ধূপ ধূপ ধূপ—এত রাতে অম্বুজা একা কী করছে?

আমি তখনই এদিকের সেই শেকলবাঁধা জানলাটার কাছে চলে এলাম। একটা খড়খড়ি সামান্য একটু ফাঁক করে দেখতে লাগলাম। ঘরের মধ্যে একটা পিলসুজের ওপরে মস্ত একটা পেতলের প্রদীপ জ্বলছে। আর একটা লম্বা ধূপ নিঃশব্দে পুড়ছে। অম্বুজা মাতালের মতো নাচছে।

তার সেই অদ্ভুত নাচ দেখতে দেখতে আমার চোখ পড়ল ধূপকাঠিটার দিকে। ওটা সাধারণ ধূপকাঠি নয়। গলগল করে ধৌওয়া বেরোচ্ছে। আর আশ্চর্য—সেই ধৌওয়া অম্বুজার নাচের তালে তালে একটা অস্পষ্ট মূর্তি ধরে কৈঁপে কৈঁপে নাচছে। সে মূর্তি কোনো মেয়ের কি ছেলের, মানুষের কি দানবের বোঝা গেল না।

আমি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে সেই ধূপের ধৌওয়ার অলৌকিক নাচ দেখছিলাম। কতক্ষণ ঐভাবে আচ্ছন্নের মতো কেটেছে জানি না। একসময়ে ধূপটা নিঃশেষ হয়ে গেল। একগাদা ছাই মেঝের ওপর পড়ে রইল। অম্বুজা সেই ছাই কপালে মেখে হঠাৎ মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে তিনবার কাকে যেন প্রণাম করল। আমি তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে যাচ্ছি।

হঠাৎ এ কী.....এ কী!

অম্বুজা ছুটে গেল খোলা জানলাটার দিকে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁপ দিল দু'হাত তুলে। এদিকে ওর ঘরের দরজায় তালা খুলছে।

অম্বুজাকে ধরবার এই মস্ত সুযোগ মনে করে আমি তখনই সিঁড়ির দিকে ছুটে গেলাম। কিন্তু—এ আবার কী!

গোটা কুড়ি বিদকুটে দেখতে কাক লাইন করে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে।

কি করব—কোন দিক দিয়ে পালাব ভাবছি, কাকগুলো সার বেঁধে তাদের লম্বা লম্বা ঠোট ফাঁক করে আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। বুঝলাম এখনি ওরা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমায় খুবলে খুবলে শেষ করে দেবে। অগত্যা আমি আমার একটি মাত্র অস্ত্র টর্টটাকে সহায় করলাম। বোতাম টিপলাম। টর্চের জোরালো আলো ওদের চোখে পড়তেই ওরা যেন একটু ঘাবড়ে গেল। সেই সুযোগে দালান থেকে সিঁড়ির ধাপ লক্ষ্য করে জোরে লাফ মারলাম। ওই কাকগুলোকে ডিঙিয়ে একটা চওড়া সিঁড়ির ওপর ছমড়ি খেয়ে পড়লাম। কাঠের সিঁড়ি। জোর শব্দ হলো। ভাবলাম এখনি বুঝি লোকজন ছুটে আসবে। কিন্তু কেউ এল না। ভয়ে সবাই দরজায় খিল এঁটে শুয়ে রইল।

আমি উঠে নিচের তলায় আসার আগেই কাকগুলো আক্রমণ করল। মাথার ওপর, কাঁধে, পিঠে কালো কালো ডানার ঝাপটা—উঃ কী দুর্গন্ধ ওদের পাখায়! আমি টর্টটা হাতের মুঠোয়

ধরে এলোপাখাড়ি ওদের পিটোতে পিটোতে কোনোরকমে নিচে নেমে ছুটে ঘরে ঢুকে খিল বন্ধ করে দিলাম।

খিল বন্ধ করেও নিশ্চিত হতে পারিনি। সারারাত কাকগুলো আমার দরজা ঠুকরেছে।

পরের দিন সকালবেলায় চা খাবার সময়ে নিশীথ এল। তার প্রথম কথাই হলো, কবে যাচ্ছ?

হেসে বললাম, আর দু'একটা দিন।

ও খুশি হলো না। বলল, যে জন্যে তোমাকে আনলাম তার তো কিছুই হলো না।

বললাম, রোগীকে ভালো করে দেখতেই পেলাম না তো চিকিৎসা করব কী?

তা শুধু শুধু এখানে বসে করছটা কি?

বললাম, তোমাদের অম্বুজার রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা করছি।

নিশীথ অবাক হয়ে বললে, এ কি খুন-খারাপির ব্যাপার যে রহস্যভেদ করবে?

বললাম, খুন-খারাপি হয়নি? রানীমার মৃত্যু হলো কিসে? রাস্তিরে ওর পাশে যে-ই শোয় তার মৃত্যু হয় কেন? কেন ওদের ঠোট বিঘে নীল হয়ে যায়? কেন গ্রহরীটা মরল? কেন ডাক্তার বললে, বিষক্রিয়ায় ওর মৃত্যু হয়েছে? রাজবাড়ির কেউ একবারও ভাবল না কেন—কোথা থেকে এই বিষ এল? একবারও তোমরা চিন্তা করে দেখলে না কেন—কেমন করে একটা দশ-এগারো বছরের মেয়ের গলার স্বর পুরুষের মতো হতে পারে? কেমন করে তার বাঁ হাতের আঙুলগুলো অস্বাভাবিক মোটা মোটা হয়? শুধু ঐ হাতটাই বা কেন বনমানুষের মতো লোমশ? কেন তোমরা কেউ তলিয়ে দেখলে না ঘর থেকে পালিয়ে কোথায় যেতে চায় অম্বুজা? ঘরের ভেতরে একা ও কী করে তারও কি খোঁজ রাখ? রাখ না। তা যদি রাখতে তা হলে বুঝতে মেয়েটা সামান্য একটা রোগী নয়। সে আরও ভয়ংকর। একটা বাচ্চা নিষ্পাপ মেয়ের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে একটা দানবশক্তি। সেই দানবের আমি তল্লাশ করব। দেখব কোথা থেকে সে এল, কেন এল?

নিশীথ হাঁ করে আমার কথাগুলো শুনে গেল—যেন কথাগুলো বিশ্বাস করবে কি করবে না বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ ও বললে, কাল অনেক রাতে দোতলায় সিঁড়িতে একটা জোর শব্দ পেয়েছিলে?

মনে মনে হেসে বললাম, কই না তো।

ওরে বাপরে! মনে হলো কেউ যেন কাউকে সিঁড়ির ওপর আছড়ে ফেলল।

তুমি বেরিয়েছিলে নাকি দেখতে?

নিশীথ শুধু একটা কথাই বলল, পাগল!

বললাম, অম্বুজা কি জানে আমি এখনও এ বাড়িতে আছি?

বোধহয় না। জানলে কি আর তোমার রক্ষে ছিল?

জানলে কি করতে পারত?

নিশীথ অনামনস্কভাবে বলল—ঠিক বলতে পারি না। তবে কিছু ক্ষতি ও করতে পারেই। নইলে বাড়িসুদ্ধ লোক কি আর এমনি এমনি একটা দশ-এগারো বছরের মেয়েকে ভয় পায়!

এক সময়ে নিশীথ চলে গেল। আমি ঘর থেকে আর বেরোলাম না। বসে বসে একটা খাতায় অম্বুজার ব্যাপারটা লিখতে লাগলাম। শেষে লিখলাম—আমি জানি আজ রাস্তিরেই ঘটবে সেই চরম ঘটনাটা যা এখনও আমি কল্পনা করতে পারছি না। আপনা-আপনি ঘটবে না। ঘটাব আমিই।

## বিপদের মুখে

রাত একটা।

শুধুমাত্র টর্চটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। গোটা বাড়িটা নিবুস। সব ঘরের জানলাগুলো পর্যন্ত বন্ধ। আমি ধীরে ধীরে উঠান পেরিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়িলাম। এবার যেতে হবে বাঁয়ে রাজবাড়ির পিছন দিকে। খুব সাবধানে পা ফেলে গোড়ালি-ডোবা ঘাসের ওপর দিয়ে এগিয়ে চললাম। নিজের সামান্য পায়ের শব্দে নিজেই চমকে উঠছিলাম। মনে হচ্ছিল আমার পিছনে যেন কেউ আমারই মতো পা টিপে টিপে আসছে। এ কথা মনে হতেই বুক কেঁপে উঠছিল। একবার ভাবলাম ফিরে যাই। কী দরকার এভাবে গিয়ে? কিন্তু তখন আর ফেরবার উপায় নেই। অশ্বজার ঘরের ঠিক নিচে এসে দাঁড়িয়েছি। পায়ে কী একটা নরম নরম লাগল। চমকে তাকিয়ে দেখলাম সাদা মতো কি একটা পড়ে আছে। সাবধানে হাতের আড়ালে টর্চটা জ্বাললাম। একটা মড়া বেড়াল, গলার কাছে রক্ত জমে কালো হয়ে আছে।

শিউরে উঠলাম। বুঝতে পারলাম হতভাগ্য বেড়ালটা বোধহয় কাল রাতে অশ্বজার ঘরে ঢুকে পড়েছিল।

ঘড়িটা দেখলাম। একটা বেজে কুড়ি মিনিট। গতকাল অশ্বজা যখন জানলা থেকে লাফিয়ে পড়েছিল রাত তখন পৌনে দুটো। তাহলে এখনও প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো সময় আছে। অবশ্য রোজই যে একই সময়ে লাফিয়ে পড়বে তার কোনো মানে নেই। আমি একটা বেশ ঘন ঝোপ দেখে তার আড়ালে লুকিয়ে রইলাম।

মশার কামড় থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে মাথা ঘিরে রঙিন বিছানার চাদরটা জড়িয়ে নিয়েছি। টর্চটা হাতের ঘামে ভিজ়ে গেছে।

কতক্ষণ এইভাবে কেটে গেল। ঘড়ি দেখবার জন্যে টর্চ জ্বালতেও সাহস পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ দোতলার ঠিক সামনের ঘরে খুঁট করে শব্দ হলো। দেখলাম অন্ধকারের মধ্যেই এদিকের জানলাটা খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে দুটো লম্বা পা বেরিয়ে এল।

জানি অশ্বজা এখনি লাফিয়ে পড়বে—কিন্তু ঐটুকু মেয়ের অত বড়ো পা!

লাফিয়ে পড়ল তবে এতটুকু শব্দ হলো না।

ও মাটিতে পড়ার আগেই আর একটা কাণ্ড ঘটল। আমি যে ঝোপটার মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম, ঠিক তার পিছনেই ছিল একটা লম্বা দেবদারু গাছ। হঠাৎ সেই গাছের সমস্ত পাতা কাঁপিয়ে শৌঁ শৌঁ করে একটা শব্দ। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখি সেদিনের সেই উড়ন্ত বিরাট কাকের মতো জন্তুটা ডানা নাড়তে নাড়তে পশ্চিম দিকে চলেছে। আর মন্ত্রমুগ্ধের মতো পিছনে পিছনে ছুটছে অশ্বজা বনের মধ্যে দিয়ে। তারপরেই দেখি রাজবাড়ির আনাচে-কানাচে থেকে এক বাঁক কাক উড়ে চলল অশ্বজার পিছু পিছু। আমার মনে হলো আগের বড়ো প্রাণীটা অশ্বজাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আর বাকি কাকগুলো অশ্বজাকে পাহারা দিতে দিতে চলেছে। আশ্চর্য এই কাকগুলো কি রাতেও দেখতে পায়? আমি আর এতটুকু দেরি না করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে যতটা সম্ভব নিচু হয়ে দূর থেকে অশ্বজাকে লক্ষ্য করে ছুটতে লাগলাম।

কিন্তু অশ্বজার সঙ্গে ছুটে পারি সাধ্যা কী! ও তো ছুটছে না, যেন উড়ে যাচ্ছে। তার অস্বাভাবিক লম্বা লম্বা পাগুলো (যা কখনোই ওর পা হতে পারে না) হিলহিল করে নড়ছিল। তার পরনের কাপড়খানা বাতাসে ভাসছে। মাথার উপর কাকের বাঁক—সামনে সেই বিরাট কাকটা...

আমি আর নিচু হয়ে ছুটতে পারছি না। এখন আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছুটছি। অশ্বজাকে

ধরতেই হবে। আর ধরতে গিয়ে আমার কী পরিণতি হবে তা ইচ্ছে করেই ভাবতে চাইছি না। বোধহয় একেই বলে নিয়তির ডাক।

কখনও জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, কখনো জলার ওপর দিয়ে, কখনো এবড়ো-খেবড়ো জমির ওপর দিয়ে ছুটছি...অশ্বজাকে কিছুতেই চোখের আড়াল করা চলবে না।

কতদূর চলে এসেছি তার হিসেব নেই। এইটুকু জানি চলেছি সোজা পশ্চিম দিকে। একবার যেন মনে হলো দূরে সাদা মতো কি চকচক করছে। তবে কি সেই ভয়ংকর চরের কাছে এসে পড়েছি?

সেই তিনশ' বছর আগে এই জায়গার সবটাই তো চর ছিল। তারপর একদিন চাঁদ রায় এসে এই চরে বসবাস শুরু করেছিলেন। এই রাজপ্রাসাদ গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তিনিও সব চরটা দখল করে নিতে পারেননি। খানিকটা বাদ ছিল। সেখানে নিষেধ ছিল কেউ যেন না যায়। এমনকি রাজা নিজেই রাজপ্রাসাদের পশ্চিম দিকের জানলাগুলো খুলতেন না। কেন খুলতেন না তার উত্তর কারো জানা নেই।

তবে কি অশ্বজাকে অনুসরণ করতে করতে সেই পশ্চিমের চরের কাছে এসে পড়েছি? সর্বনাশ! কিন্তু তখন আর থামবার উপায় নেই। আমি বুঝতে পারছিলাম কোন এক অশুভ শক্তি যেন আমায় টেনে নিয়ে চলেছে।

আমার গায়ে জড়ানো সেই চাদর কখন উড়ে গেছে, জামার বোতাম খোলা, চুলগুলো মুখের ওপর এসে পড়েছে। বুকটা এমন ওঠানামা করছে যেন মনে হচ্ছে বুকের মধ্যে ভূমিকম্প হচ্ছে। কেন জানি না চোখ দুটোও যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

একটা ছোটোখাটো ঝোপের মধ্যে দিয়ে ছুটছিলাম। গায়ে আর জোর নেই। হঠাৎ কিসে পা জড়িয়ে পড়ে গেলাম। তখনই ভয়ংকর ব্যাপারটা ঘটে গেল।

একটা কাক দলছুট হয়ে পিছিয়ে পড়েছিল। লক্ষ্য করিনি কখন সেটা আমার মাথার ওপরে ঘুরছিল। আমাকে পড়তে দেখে হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলায় কা-কা-করে ডেকে উঠল।

আমি পালাবার জন্যে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িলাম। সেটাই হলো আমার মারাত্মক ভুল। অমনি অশ্বজা ছোটো বন্ধ করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমায় দেখে ঘুরে দাঁড়াল। লক্ষ্য করলাম মুহূর্তমধ্যে অশ্বজার শরীরটা যেন বদলে যাচ্ছে। প্রথমে তার চোখ দুটো জ্বলতে লাগল। তারপর তার শরীর থেকে বেরিয়ে এল লম্বা একটা কী! কঙ্কালসার দুখানা হাত বের করে আমার দিকে সেটা এগিয়ে আসতে লাগল। ঐ হাড়িসার হাত দুটো ছাড়া তার সর্বাঙ্গ যেন কালো কাপড়ে মোড়া। মুখটাও দেখা যাচ্ছে না। শুধু দুটো জ্বলন্ত চোখ। সেই চোখ দুটো যেন বাতাসে ভাসতে ভাসতে আমার দিকে ছুটে আসছে।

আমি প্রাণপণে ছুটে লাগলাম। কোনদিকে যাচ্ছি তাও জানি না। শুধু একটাই চেষ্টা যেন চরটার দিকে না যাই। কিন্তু কি আশ্চর্য কাকগুলো আর নেই। কঙ্কালটা অশ্বজার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসামাত্র সেই অলৌকিক কাকগুলো উধাও।

আমি ছুটছি—আর পিছনে একটা হ হ করে শব্দ। শব্দটা যে ঐ ভয়ংকর মূর্তিটার কাছ থেকেই আসছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই—ধরে ফেলল বলে...মৃত্যু নিশ্চিত...

হঠাৎ দেখলাম সেই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে যেন একটা কুঁড়ে ঘরের মতো। আমি শুধু 'কে আছ বাঁচাও' বলে আর্তনাদ করে আছড়ে পড়লাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখলাম কতকগুলো শুকনো খড়ের ওপর আমি শুয়ে আছি। মাটির ঘর, মেঝেটাও মাটির। ঘরের মধ্যে একটা পিদিম জ্বলছে টিমটিম করে।

আমার কোনো চোট লাগেনি বলে বেশিক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকিনি। এদিক-ওদিক তাকাতে দেখলাম একটু থুথুড়ে বুড়ি কতকগুলো শেকড়-বাকড় দরজার বাইরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে আর ঘরের কোণে একটা ধুনি থেকে ক্রমাগত ধোঁওয়া উড়ছে। ঐ ধোঁওয়ায় আমার শরীরটা যেন তাজা হয়ে উঠল।

আমার জ্ঞান ফিরতে দেখে বুড়ি কাছে এল। পিদিমের আলোয় আমি তাকে চিনতে পারলাম। এখানে আসবার সময়ে একেই দেখেছিলাম। কতকগুলো ছেলে একে ইঁট মারছিল। পান্নি থেকে নেমে আমি ছেলেগুলোকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

বুড়ি একবার বেরিয়ে গিয়ে একটু পরেই একটা মাটির ভাঁড়ে খানিকটা দুধ নিয়ে এল। একটা কথাও না বলে বুড়ি ভাঁড়টা আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি ভাঁড়টা নিয়ে দুধটুকু খেয়ে ফেললাম। কেমন একটু বোটকা বোটকা গন্ধ লাগল। বোধহয় ছাগলের দুধ। কিন্তু বেশ গরম। দুধ কখন কি করে গরম করল কে জানে।

এবার বুড়ি আমার কাছে এসে বসল। বললাম, আমি কোথায়?

বুড়ি খোনা খোনা স্বরে বলল, আঁমার ঘঁরে।

যে আমাকে তাড়া করে আসছিল সে কোথায়?

বুড়ি তিনটে দাঁত বের করে বোধহয় একটু হাসল। বলল, ভঁয় নৌই। ওঁরা চঁলে গেঁছে। কোথায় গেছে?

যেঁ যাঁর নীঁজের জাঁয়গায়।

সেটা কোথায়?

এর উত্তরে বুড়ি ধীরে ধীরে সমস্ত কাহিনী আমায় জানাল।

### অম্বুজা রহস্য

কলকাতায় ফিরে এসেছি। আবার চলছে আমার ডাক্তারি, মানে মানসিক রোগীদের চিকিৎসা। নিশীথ আমাকে যে কারণে বাগআঁচড়ার রাজবাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তা সফল হয়েছে। নিশীথ নিয়ে গিয়েছিল রাজকন্যা অম্বুজার রোগ সারিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু তার যা ব্যাপার দেখলাম সেটা রোগ নয়, আরও ভয়ংকর কিছু। আমি তার কাছেই ঘেঁষতে পারিনি তো; তার চিকিৎসা করব কী! তবে অম্বুজার রহস্য আমি ধরে দিতে পেরেছি। আর এই রহস্যর জাল খোলবার জন্য আমাকে যা-যা করতে হয়েছিল তা কলকাতায় ফিরে এসেও ভুলতে পারি না।

কলকাতায় আমার চেম্বারে বসে এক-এক সময়ে আমি যখন বাগআঁচড়ার সেই ভাঙাচোরা রাজবাড়িটার কথা ভাবি তখন মনে হয় সেসব যেন একটা দুঃস্বপ্ন ছিল। কোথায় গেল রাজা চন্দ্রভানু রায়—তাঁর পরিবারের সেইসব মমির মতো বোবা মানুষগুলো, কোথায় গেল অম্বুজা আর সেই ভয়ংকর কাকগুলো?

সেদিন শেষ রাত্রে সেই থুথুড়ে বুড়ির দয়ায় আমি বেঁচে গিয়েছিলাম। কেন ও আমায় বাঁচাল? আমার মনে হয় ওকে সেইসব দুষ্ট ছেলেদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম বলেই। একথা তো চিরসত্য—সংসারে কিছু কিছু অকৃতজ্ঞ লোক থাকলেও তুমি যদি কোনো দিন কারোর উপকার কর তা হলে হয়তো তার কাছ থেকেও বিপদের সময়ে উপকার পেতে পার।

যাই হোক সেদিন রাতে বুড়ির দেওয়া গরম ছাগলের দুধ খাওয়ার পর যখন আমি বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম তখন তার মুখে থেকেই অম্বুজার কাহিনী শুনেছিলাম। সে কাহিনী হয় তো আজ অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে তবু তা বর্ণে বর্ণে সত্যি।

সেদিন ফোকলা দাঁতের ফাঁক দিয়ে খোনা খোনা গলায় ধীরে ধীরে কেটে কেটে অস্পষ্ট উচ্চারণে বৃদ্ধা যা বলেছিল আমি কলকাতায় ফিরে এসে একটা ডায়রিতে তা নিজের ভাষায় লিখে রেখেছিলাম। ঘটনাগুলো বৃদ্ধা বেশ গুছিয়ে বলতে পারেনি। তাই আমিও যা লিখে রেখেছি তার মধ্যে অনেক ফাঁক থেকে গেছে। আসলে তিনশো বছর আগের কাহিনী তো—কেউ প্রত্যক্ষদর্শী নেই। এ মুখ থেকে অন্য মুখ, এ কান থেকে অন্য কান এইভাবেই কিংবদন্তীর জন্ম হয়। যাট বছর আগে আমার দেখা অম্বুজাও সেই কিংবদন্তীর একটি অস্পষ্ট নায়িকা হয়ে গেছে।

একদিন গঙ্গার স্রোত বইতে বইতে অন্য দিকে সরে গেলে এই বাগআঁচড়ার কাছে কয়েক মাইলব্যাপী চর পড়েছিল। আগে কাছেপিঠের গ্রাম থেকে মৃতদেহ সংকারণের জন্যে গঙ্গায় নিয়ে আসা হতো। কিন্তু গঙ্গা দূরে সরে যেতে তাদের অনেকেই মৃতদেহ ঐ চরে পুঁতে দিয়ে যেত। ভাল করে চাপাও দিত না, কোনোরকমে কাজ সেরে সরে পড়ত। তারপর শেয়াল-শকুনে সেইসব মৃতদেহ টেনে বের করে ছিন্নভিন্ন করে ফেলত। তাই ঐ চরের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকত মড়ার খুলি, কঙ্কাল। এইরকম দৃশ্য চোখে পড়ার ভয়ে দিনের বেলাতেও কেউ ওদিকে যেত না। আর রাত হলে ঐ চরে নেমে আসত বিভীষিকা। কত রকমের শব্দ শোনা যেত—কখনও নিঃশব্দ চরের বৃকে জেগে উঠত হু হু শব্দ, কখনও ঝড়ের গোঙানি। সময়ে সময়ে নাকি দেখা যেত চরের এখানে-ওখানে আগুন জ্বলছে। লোকে বলত ঐ চড়াটা হচ্ছে প্রেতাঙ্গাদের অবাধে ঘুরে বেড়াবার জায়গা। আশপাশের গ্রামে একটা চলতি ছড়াই আছে—

ভুলে কভু যেও নাকো চরে

ভূতে এসে টুঁটি টিপে ধরে।

তা কথটা সত্যি। রাতের বেলায় মানুষ তো দূরের কথা—কোনো পাখি, কিংবা শেয়াল কিংবা কুকুরও যদি ঐ চরে যায়, পরের দিন পাওয়া যেত তার মৃতদেহ। চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে—জিভটা ঝুলছে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

এই ভয়ংকর চরেই একদিন নদীয়া থেকে এল এক দুঃসাহসী জমিদার নাম চাঁদ রায়। তিনি শুরু করলেন চাষ। গড়ে তুললেন রাজপ্রাসাদ। হলেন এক মহাশক্তিধর রাজা। যত শক্তিধরই হন গোটা চরটা দখল করতে পারলেন না। পশ্চিম দিকে প্রায় আধ মাইলের মতো চর পড়ে রইল তাঁর সীমানার বাইরে।

রাজা চাঁদ রায় দোতলার পশ্চিম দিকের সবচেয়ে সুন্দর ঘরটি নিজের জন্যে রাখলেন। ঘরে খাট-পালংক সাজিয়ে সবমাত্র ঢুকেছেন তখনই ঘটল একটা ঘটনা।

গরমের জন্যে তিনি সেদিন সব জানলা খুলে রেখে দিয়েছিলেন। হঠাৎ মাঝরাতিরে মনে হলো যেন ঝড় উঠেছে। তিনি জানলা বন্ধ করবার জন্যে ধড়মড় করে উঠলেন। কিন্তু কোথাও ঝড়ের কোনো লক্ষণ দেখতে পেলেন না। হঠাৎ পশ্চিম দিকের জানলার ওপর চোখ পড়তেই তিনি থমকে গেলেন। দেখলেন দূরে চড়ার বৃকে বালির ঝড় উঠেছে। মাঝে মাঝে আগুনের ঝলক। এরকম অদ্ভুত দৃশ্য দেখে তিনি হতভম্ব। তিনি হয়তো আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখতেন কিন্তু মনে হলো সেই ধূলিঝড় যেন এইদিকে ধেয়ে আসছে। চাঁদ রায় তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

আবার একদিন রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে দেখলেন পশ্চিম দিকের ঐ চড়ার বৃকে দাঁউ দাঁউ করে আগুন জ্বলছে। তিনি তো অবাক। বালির চড়ায় আগুন কি করে সম্ভব? তিনি তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করে দিলেন।

পরের দিন রাজসভাপণ্ডিতকে সব কথা বললেন চাঁদ রায়। রাজসভাপণ্ডিত রাজজ্যোতিষীকে ডেকে পাঠালেন। তিনি ছক কেটে অঙ্ক কষে জানালেন, বড়োই অশুভ লক্ষণ। মহারাজ, পশ্চিম দিকের জানলা অন্তত রাতের বেলায় খুলবেন না।

তাই হলো। রাত্তিরে চাঁদ রায় আর ওদিকের জানলা খুলতেন না।

তারপর আবার একদিন—অনেক রাতে চাঁদ রায়ের ঘুম ভেঙে গেল। শুনতে পেলেন একটা ঠকঠক শব্দ। ধড়মড় করে উঠে বসলেন। শব্দটা আসছে মাথার কাছে পশ্চিম দিকের জানলায়। তিনি জানলার কাছে উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখনও জানলার কপাটে শব্দ হচ্ছে ঠক-ঠক-ঠক।

জানলা খুলবেন কিনা ভাবতে লাগলেন। তিনি ছিলেন দুর্দান্ত সাহসী। তাই মনে জোর সঞ্চয় করে জানলাটা খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে লাফ মেরে পাঁচ পা পিছিয়ে এলেন। দেখলেন একটা বিশাল কাক জানলার ওপর বসে রয়েছে। তার ডানা দুটো এতই বড়ো যে গোটা জানলাটা ঢেকে গেছে। তার চোখ দুটো রক্তবর্ণ। যেন জ্বলছে। বড়ো বড়ো বাঁকানো ঠোঁট দুটো ফাঁক করে কর্কশ স্বরে সেটা তিনবার শব্দ করল ক্যাক—কোঁ—ক্যাক, তারপরেই ঠোঁট দিয়ে জানলার শিকগুলো কামড়াতে লাগল।

চাঁদ রায়ের মতো দুর্ধর্ষ রাজাও ঐরকম কাক দেখে আর ঐ ডাক শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। দু'বার হুশ হুশ শব্দ করে কাকটাকে তাড়াবার চেষ্টা করলেন কিন্তু কাকটা নড়ল না। সে ঠোঁট দিয়ে শিকটা ভাঙবার চেষ্টা করতে লাগল। তখন চাঁদ রায় দেওয়ালের কোণ থেকে তাঁর বর্শা নিয়ে এসে কাকটার দিকে ছুঁড়ে মারলেন।

অব্যর্থ লক্ষ্য।

বর্শাটা কাকের বৃকে গিয়ে বিধল। সঙ্গে সঙ্গে পাখা ঝটপট করতে করতে কাকটা নিচে পড়ে গেল।

পরক্ষণেই সেই কাকের দেহ থেকে একটা কঙ্কাল দুলতে দুলতে জানলার দিকে এগিয়ে এল। ভয়ে চাঁদ রায় তখনই জানলা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু পরের দিন আহত বা নিহত কোনো অবস্থাতেই কাকটাকে দেখা গেল না।

চাঁদ রায় আবার সভাপণ্ডিত, রাজজ্যোতিষীকে ডেকে সব কথা বললেন। তাঁরা অনেক চিন্তা করে বললেন কাক যে তিনটে শব্দ উচ্চারণ করেছিল সেটার অর্থ কী আগে জানা দরকার।

কিন্তু কাকের ভাষা কে বুঝবে?

সে সময়ে দেশে কাকচরিত্রজ্ঞ কিছু অসাধারণ গুণী লোক থাকত। তারা অন্য পশুপাখির ভাষা বুঝতে না পারলেও কাকের ভাষা বুঝত। কেননা কাক যখন ডাকে তখন অনেকটা বুঝতে পারা যায় কি বলতে চাইছে। অন্য পাখিদের চেয়ে কাকের ডাক অনেক স্পষ্ট। একটু চেষ্টা করলেই বোঝা যায় কি বলতে চায়।

বাগআঁচড়ায় সে সময়ে একজন কাকচরিত্র বিশেষজ্ঞ ছিল। তাকে ডেকে আনা হলো। সে নিজে কাকটার ডাক শোনেনি। কিন্তু স্বয়ং রাজা যা শুনেছিলেন সেই তিনটে শব্দ—ক্যাক—কোঁ—ক্যাক শুনে আর কাকের বর্ণনা জেনে লোকটি বললে, মহারাজ, এই কাক আসলে একটা অশুভ আত্মা। সে আপনার ওপরে খুবই ক্রুদ্ধ। ঐ তিনটে শব্দের মধ্যে দিয়ে



সে বলতে চেয়েছিল এই চর দখল করে মহারাজ যে ঘোরতর অন্যায় করেছেন তার প্রতিফল শীঘ্রই পাবেন।

মহারাজের মুখ শুকিয়ে গেল। কিন্তু দুর্বল হলেন না। বললেন, আমি অন্যায় করিনি। এ চরে চাষ করে, লোকবসতি তৈরি করে আমি জনসাধারণের উপকারই করেছি। প্রেতাঙ্ঘাদের জন্যে তো খানিকটা চর ছেড়ে রেখেছি। ওখানে ওরা যা খুশি তাই করুক। কাজেই আমাদের ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। আমি রাজপ্রাসাদ ভেঙে সমস্ত বসতি তুলে দিয়ে আবার চর করে দিতে পারব না।

এ যেন প্রেতাঙ্ঘাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা। তার ফল ফলতেও দেরি হলো না। দিন সাতেকের মধ্যেই একজন প্রজা কাঁদতে কাঁদতে এসে বলল, মহারাজ, আমার ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এই রকম পরপর খবর আসতে লাগল। মহারাজ ভেবে পান না ছেলেগুলো কীভাবে কোথায় গেল। যারা হারিয়ে গেল তারা কিন্তু আর ফিরল না।

তারপর একদিন একজন এসে বলল সে গতকাল গভীর রাতে হরিহর মণ্ডলের ছেলেকে একা একা বেরিয়ে যেতে দেখেছে। আর তার আগে আগে উড়ে যাচ্ছিল মস্ত একটা কাক। আবার কাক! চাঁদ রায় চমকে উঠলেন।

হ্যাঁ, মহারাজ! মস্ত বড়ো কাক। সে যখন উড়ছিল তখন তার ডানায় শব্দ হচ্ছিল গোঁ গোঁ করে।

কোন দিকে গেল?

ঐ চরের দিকে।

হরিহর মণ্ডলের ছেলে আর ফেরেনি।

রাজা চাঁদ রায় নিরুপায় হয়ে ব্রহ্মশাসন, যেখানে ব্রাহ্মণদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, সেখান থেকে সব ব্রাহ্মণদের ডেকে পাঠালেন। বললেন, মহাযজ্ঞ করুন, শাস্তি স্বস্ত্যয়ন করুন। যত খরচ হয় হোক।

শুধু ব্রহ্মশাসনের ব্রাহ্মণরাই নয়, নদীয়া, ভাটপাড়া থেকেও নামকরা পুরোহিতদের আনালেন। তা ছাড়াও কাছে-পিঠে যত ওঝা, গুণিন আছে সবাইকে ডাকালেন। যেমন করে হোক প্রেতের কবল থেকে রাজ্যকে বাঁচাতে হবেই।

রাজকন্যা সুভদ্রা সকাল দশটার সময়ে স্নান সেরে নিরম্বু উপবাস করে খড়্গ পূজো করছিল। এটা তার নিতানৈমিত্তিক কাজ। যে খাঁড়াটা সে পূজো করে তার একটা ইতিহাস আছে। রাজা চাঁদ রায় প্রতি বছর কালীপূজোর রাতে ছিন্নমস্তার পূজো করতেন। এ পূজো বড় সাংঘাতিক। একটু খুঁত থাকলে আর রক্ষে নেই। তা সেবার ঠাকুর বিসর্জন দিতে যাবার সময়ে খাঁড়াটা কেমন করে জানি পড়ে যায়। সকলে হায় হায় করে ওঠে। এ খুবই দুর্লক্ষণ। না জানি কী হয়।

ব্রহ্মশাসনের ব্রাহ্মণেরা বিচার করে বললেন, এ প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া এখন যাবে না। নতুন ঠাকুর গড়ে নতুন খাঁড়া দিয়ে আবার পূজো করতে হবে।

দ্বিতীয়বার পূজোর পর প্রতিমা বিসর্জন দেবার সময়ে আগের প্রতিমাও বিসর্জন দেওয়া হলো। সেইসঙ্গে আগের খাঁড়াটাও বিসর্জন দেওয়া উচিত ছিল। সেটা কারো আর খেয়াল ছিল না। তখন সুভদ্রা সেই খাঁড়াটা নিজের ঘরে এনে রোজ পূজো করতে লাগল।

কেন সে পূজা করত তা সে কাউকে বলেনি। অনুমান করা যায় খাঁড়া নিয়ে যে অনিচ্ছাকৃত ভ্রুটি হয়ে গেছে, এই পরিবারের মেয়ে হয়ে তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করত।

এই পরিবারের মেয়ে—কিন্তু তার শরীরে এ বংশের রক্ত ছিল না। খুব ছোটবেলায় মহারাজ তাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, সেই থেকে সুভদ্রা রাজার দুলালীর মতো মানুষ হয়ে আসছে। এখন তার বয়স এগারো।

এগারো বছরের মেয়ে হলে কি হবে, তার বুদ্ধি, অনুভূতি একটা বড়ো মেয়ের মতোই। প্রতিদিনই সে শুনেছে একটা করে লোক নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। ভয়ে তার মুখ শুকনো। তার বাবাকেও একটা বিরাট কাক আক্রমণ করতে এসেছিল। ক্ষতি করতে পারেনি। এবার কি তবে তার পালা?

এদিকে যাগ-যজ্ঞ শুরু হয়েছে। সাত দিন পূর্ণ হলে তবেই প্রেতদের উৎখাত করা যাবে। সবে চার দিন যজ্ঞ চলছে। লোকে লোকারণ্য। সবাই সেই অভূতপূর্ব যজ্ঞ দেখছে। কত মণ ঘি যে পুড়ল তার হিসেব নেই। সেই যত্নহতির সঙ্গে সঙ্গে চলছে মিলিত কণ্ঠের গম্ভীর মন্ত্র উচ্চারণ।

তারই মধ্যে একদিন—

সুভদ্রা তার নিজের ঘরে একাই শুত। কারো সঙ্গে শুতে তার ইচ্ছে করে না—

এই পর্যন্ত বলে বড়ি তার ঠাণ্ডা কনকনে হাত দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, তিনশো বছর আগে এই সুভদ্রার সঙ্গে চন্দ্রভানু রায়ের মেয়ে অম্বুজার মিলটা দেখছ? দুঁ-জনেই ঝঁকলা শুঁতে চাইত। দুঁজনেই কুঁড়িয়ে পাওয়া মেয়ে। দুঁজনেই সঁমান বঁয়সী।

বললাম, হুঁ, তাই তো দেখছি। তারপর?

সেদিনও সুভদ্রা বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। তার ঘরের সামনেই একটা ছোটো ছাদ। তার মনে হলো কেউ যেন ছাদের ওপর নিঃশব্দ পায়ে চলে বেড়াচ্ছে। নিঃশব্দ কিন্তু তার পায়ের ভারে ঘরটা কাঁপছে।

সুভদ্রা কিছুক্ষণ কান পেতে চুপ করে পড়ে রইল। না, ভুল শোনেনি। আবার সেই ভারী ভারী পা ফেলার শব্দ। এবার আরও স্পষ্ট। সুভদ্রা উঠে পড়ল। একটা পিদিম জ্বালল। তারপর সাবধানে দরজার খিল খুলে ছাদে বেরিয়ে পড়ল। পিদিম হাতে সুভদ্রা এক পা করে এগোয় আর পিছু ফিরে তাকায়। এমনি করে গোটা ছাদটা দেখল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। তখন ও নিশ্চিত হলো শব্দটক কিছুই না। তার শোনারই ভুল।

তবু যেন তার কিরকম মনে হতে লাগল। কাছেপিঠে কেউ যেন আছে। যে কোনো মুহূর্তে পেছন থেকে লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ে।

সুভদ্রা আর বাইরে থাকতে চাইল না। তাড়াতাড়ি খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। আর তখনই ভয়ে আঁতকে উঠল সে। পিদিমের আলোয় দেখল এতক্ষণ যাকে ছাদে খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে বিরাট দুটো ডানা ছড়িয়ে বসে আছে তারই বিছানার ওপর।

সুভদ্রার হাত থেকে পিদিমটা পড়ে নিভে গেল।

সেই মুহূর্তে ঘরের মধ্যে মৃত্যুর দূত কাকরূপী প্রেত আর মাত্র পাঁচ হাত তফাতে দাঁড়িয়ে সে। কাকটা গোল গোল লাল চোখ ঘুরিয়ে তাকে দেখছে আর তার বড়ো বড়ো ঠোঁট দুটো ফাঁক করছে।

সুভদ্রা বুঝতে পারল এই ভয়টাই সে করছিল। একদিন তার বাবাকে মারবার জন্যেই কাকটা এসেছিল। কিন্তু মারতে পারেনি। এবার তার পালা।

কাকটা বসে বসেই তার ডানা দুটো তিনবার নাড়ল। খাট থেকে নামল। বড়ো বড়ো নখওলা দুটো পায়ে ভর করে এগিয়ে আসতে লাগল।

আর রক্ষে নেই। সুভদ্রা চিৎকার করে উঠল। কিন্তু এত বড়ো রাজপ্রাসাদের ছাদ, দেওয়াল, সিঁড়ি ডিঙিয়ে সে চিৎকার তার বাবার কানে পৌঁছল না।

নিজেকে লুকাতে সুভদ্রা অন্ধকার ঘরের এক কোণে গিয়ে গুঁড়ি মেরে বসে পড়ল। কিন্তু কাকটার জ্বলন্ত দৃষ্টি এড়াতে পারল না। কাকটা সেই দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। সুভদ্রা সরে আর একটা কোণে গিয়ে দাঁড়াল। তার গায়ে লেগে কি একটা ঠক করে মাটিতে পড়ল। ছিন্নমস্তার সেই খাঁড়াটা। কাকটা তখন তার ওপর ঝাঁপ দিয়েছে। মুহূর্তে সুভদ্রা খাঁড়াটা দু'হাতে তুলে নিয়ে জোরে এক কোপ বাসিয়ে দিল। অন্ধকারে কোপটা কাকটার মাথায় লাগল না। লাগল একটা ডানায়। ডানাটা কেটে মাটিতে পড়ে লাফাতে লাগল। আর কাকটা এই প্রথম বিকট একটা শব্দ করে একটা ডানায় ভরে দিয়ে ঐক্যবৈক্যে বেরিয়ে গেল। সুভদ্রা মনের সমস্ত শক্তি একত্র করে খাঁড়াটা হাতে নিয়ে তার পিছু পিছু ছুটল। ওটাকে মারতেই হবে।

কিন্তু কাকটাকে আর দেখতে পেল না। এদিক-ওদিক তাকাল। ইঠাৎ—

ওটা কি?

দেখল রাজবাড়ির বাগানে একটা আমগাছের ডালে ঝুলছে একটা কঙ্কাল। তার একটা হাত কাটা।

বুড়ি এই পর্যন্ত বলে তার বক্তব্য শেষ করল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সুভদ্রার কি হলো?

বুড়ি একটু থেমে মনে করবার চেষ্টা করে যা বলল তা এই—পরের দিন থেকে বেচারি মেয়েটা পাগল হয়ে গেল। এদিকে যাগ-যজ্ঞও শেষ। চরে আর ভূতের উপদ্রব নেই। আর কোনো মানুষ রাতে নিশির ডাক শুনে চরের দিকে গিয়ে প্রাণ হারায় না। কিন্তু—

বুড়ি আবার একটু থেমেছিল। তারপর বলেছিল, কিন্তু সুভদ্রা পাগল হয়ে আর রাজবাড়িতে থাকত না। ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে কোথায় হারিয়ে গেল। আর তাকে পাওয়া গেল না। হারিয়ে গেল!

আমি সেই তিনশো বছর আগের এক না দেখা রাজকন্যার জন্যে দুঃখ পেলাম।

আমরা দুজনেই চুপ করে আছি। বুড়ির ঘরের কোণে পিদিমটা তখনও জ্বলছে। বললাম, সেই সুভদ্রার সঙ্গে আজকের এই অম্বুজার কি কোনো সম্পর্ক আছে?

বুড়ি তার তিনখানা মাত্র দাঁত নাড়িয়ে একটু হাসল। বললে, কিঁ মঁনে হইয়?

বললাম, মনে হয় যেন আছে।

তঁবে আবার জিজ্ঞেস করছ কেন? ঐক জন্মের সুভদ্রা আঁর ঐক জন্মেতে অম্বুজা। সঁব নিয়তির খেলা।

এবার বুড়ি আরও একটু পরিষ্কার করে যা জানালো তা এইরকম—

চন্দ্রভানু নিজেকে চাঁদ রায়ের বংশধর বলে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে আসছিল বলেই এমন একটি মেয়েকে কুড়িয়ে পেয়েছিল যাকে নিয়ে তার অশান্তির শেষ ছিল না। তার মিথ্যে রাজপুরী মৃত্যুপুরী হয়ে উঠেছিল। মিথ্যে কথার এই শাস্তি। তবু যেহেতু তিনি বেশ কয়েকটা দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারই পুণ্যে তিনি কিছুটা শাপমুক্ত হয়েছিলেন পরে।

নিষ্পাপ মেয়ে অম্বুজার ওপর তার জন্মলগ্ন থেকেই ভর করে রইল চরের সেই কঙ্কালটা যে কাক হয়ে সুভদ্রার ক্ষতি করতে গিয়ে ছিন্নমস্তার খাঁড়ার আঘাতে একটা ডানা হারিয়েছিল।

সেই রাগ পুষে রেখে এতকাল পর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেল অম্বুজারূপী সুভদ্রার ওপর। সেই অপদেবতা তার ওপর ভর করে থাকার জন্যেই অম্বুজা অত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল। সেই অম্বুজারূপী সুভদ্রা কাককে এতই ভয় পেয়েছিল যে প্রতি রাতে নাচের মধ্যে দিয়ে ধূপের ধোঁয়ায় তাকে পূজো করত। কিন্তু কাকরূপী শয়তান সেই পূজোয় ভুলত না। অম্বুজাকে সেই ভয়ংকর চরের দিকে টেনে নিয়ে যেত।

নিরুপায় অম্বুজা তখন দেখাতে চেষ্টা করল সে নিজেই কাকের কত ভক্ত। তাই সে নানা জায়গা থেকে কাক যোগাড় করে রাজপুরী ভরিয়ে ফেলল। লোকে ভাবত অম্বুজার এটা একটা উৎকট শখ। কিন্তু অম্বুজার আসল উদ্দেশ্য জানত না।

পোষা কাকগুলো তার এতই বাধ্য হয়ে উঠেছিল যে অম্বুজা যেভাবে তাদের চালাত সেই ভাবেই তারা চলত। তাকে পাহারাও দিত। অম্বুজার এমনও গোপন ইচ্ছে ছিল যে সুবিধে পেলে তার এই পোষা কাকগুলোকে দিয়ে ঐ শয়তান কাকটাকে শেষ করে দেবে।

কিন্তু পারেনি। পারবে কি করে? শয়তান কাকটা তো সাধারণ কাক নয়।

এই পর্যন্ত বলে বুড়ি আবার থেমেছিল।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু অম্বুজা তো পালিয়ে গিয়েও ফিরে আসত। শয়তান কাকটা কি চর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারত না?

বুড়ি হেসে বলল, কিঁ করো পারবে? এইখানে এই বঁনের ধাঁরে আমিঁ বঁসে আমিঁ য়েঁ। আমাকে ডিঁঙিয়ে যাঁবে আমিঁন সাঁধি কৌনো ডুঁত-ধ্রৌঁতের নেঁই।

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, বুড়িমা, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

কঁরো। কঁরো। তাঁড়াতাড়ি কঁরো। রাঁত ফুরিয়ে আসছে।। আমিঁ য়ুম্বো।

জিজ্ঞেস করলাম, আমায় যে তাড়া করে আসছিল সে কোথায়? অম্বুজার কি হলো?

বুড়িমা আবার হাসল। বলল, ওঁরা চলে গ্যাছে য়েঁ যাঁর জায়গায়।

মানে?

বুড়িমা বলল, তুমি তৌঁ রাজকন্যাকে সাঁরাতে এসেছিলে। তাঁই নাঁ?

বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু পারিনি।

বুড়িমা আবার ফিক করে হাসল। বললে, পেরেছ। পুরোপুরি সাঁরিয়ে দিঁয়েছ।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

হ্যাঁ গোঁ। তাঁগি় তুমিঁ ভঁয় নাঁ পৈঁয়ে ঐঁ গঁভীর রাঁতে পিঁছু নিঁয়েছিলে। তাঁগি় তুমিঁ পঁড়ে গিঁয়েছিলে। তঁবেই নাঁ ধ্রৌঁতটা অঁম্বুজার ভিতর থেঁকে বৈঁরিয়ে এসে তৌঁমায় তাঁড়া কঁরে আসছিল। আঁর য়েঁই অঁম্বুজাকে ঐঁকবার ছেঁড়েছে, আঁর ওঁর ভিতর টুঁকতে পাঁরবে নাঁ।

বলে বুড়িমা তার শণের নুড়ির মতো মাথাটা দোলাতে লাগল।

ব্যাঁস! রাজকন্যেঁ ভাঁলো হুঁয়ে গৌঁল। আঁর ধ্রৌঁতটাকে পাঁঠিয়ে দিঁলাম ওঁর স্থাঁনে। বলে হলদেটে শুকনো আঙুল তুলে চরটা দেখিয়ে দিল।

অম্বুজা তা হলে এখন কোথায়?

যঁথাস্থাঁনে।

যথাস্থানটা কোথায় তা জিজ্ঞেস করতে আর সাহস হলো না।

কিন্তু আঁর নঁয়। ওঁঠো। তৌঁমায় রাজবাড়ির দিঁকে ঐঁগিয়ে দিঁই।

বুড়িমা ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করে আমায় নিয়ে বেরিয়ে এল।

রাজবাড়ির দিকে যেতে যেতে বুড়ি হঠাৎ অন্যদিকে পা বাড়াল।

ঐঁদিকে ঐঁকটু ঐঁসো।

এটা সেই জায়গা যেখন থেকে শ্রেতটা তাড়া করেছিল।

ঐ দ্যাখো! বলে বুড়ি দূরে মাটির দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

দেখলাম মাটিতে উপড় হয়ে পড়ে আছে রাজকন্যা অম্বুজা। ঠিক যেন একগাদা ফুলের মালা।

ও কি মরে গেছে?

বুড়ি বললে—না। ওঁ একেবারে ভাঁলো হয়ে গেছে। ঘুমোচ্ছে। তুমি ওঁকে কোলে তুলে নিয়ে রাজবাড়িতে চলে।

আমি স্বচ্ছন্দে অম্বুজাকে কোলে নিয়ে রাজবাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম।

কিছুদূর গিয়ে বুড়িমা বলল, আর যেতে পারব না। রাজামশাই তোঁ আমায় তাঁড়িয়ে দিয়েছেন।

আমি বুড়িমাকে প্রণাম করলাম। বললাম, আর একটা কথা। আপনি কে বলুন তো!

বুড়িমা হঠাৎ গলা চড়িয়ে উৎকট হাসি হেসে উঠল। বলল, আমি? তিনশো বছরেরও বেশি হঁলো আমি ঐ চরে বাঁস করতাম। তাঁরপর মানুষজন দেখব বলে রাজবাড়ির কাছে থাকতাম। লোকে বলে আমি ডাইনি। ছেলেরা টিল মারে। রাজা খেঁদিয়ে দিলে আমায়। তঁবু আমায় থাকতে হঁবে এখানে। নইলে প্রেঁতদের ঠ্যাকাবে কেঁ?

বলে বুড়িমা হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল। একটা ঝোড়ো বাতাসে তার পাকা চুলগুলো উড়তে লাগল। সেই ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে একরকম ভাসতে ভাসতে বুড়িমা চরের দিকে চলে গেল।

রাজবাড়িতে যখন ঘুমন্ত অম্বুজাকে কোলে নিয়ে পৌঁছলাম তখন ভোর হয়েছে।

আজ এই প্রথম আমি হাঁকডাক করে রাজবাড়িতে ঢুকলাম।

কোথায় নিশীথ! আর কত ঘুমোবে তোমরা! ওঠো, দ্যাখো কাকে নিয়ে এসেছি।

রাজবাড়ির ঘুম ভাঙল। দোতলার জানলাগুলো ফটাফট খুলে গেল। সবাই অবাক হয়ে দেখছে এত ভোরে কে হাঁকডাক করছে।

রাজামশাই যে রাজামশাই যাকে বড়ো একটা দেখাই যেত না তিনিও নেমে এসেছেন। চোখ রগড়াতে রগড়াতে নিশীথও এসে হাজির।

কী ব্যাপার! রাজকন্যাকে কোথায় পেলে?

আমি সব ঘটনা ওঁদের বললাম। শুনে ওঁরা অবাক।

রাজকুমারী অম্বুজার তখন ঘুম ভেঙেছে। একজন অপরিচিত লোকের কোলে রয়েছে দেখে সে ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমায় চিনতে পারল না।

রাজকন্যাকে দেখিয়ে রাজামশাইকে বললাম, এই নিন মহারাজ আপনার কন্যাকে। আর ভয় নেই। ও এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

অম্বুজা রাজামশাইকে চিনতে পারল। বহুকাল পর “বাবা” বলে রাজামশাইয়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রাজামশাই আমার দিকে তাকিয়ে আনন্দে কৃতজ্ঞতায় ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলেন।

আমি বিদায় নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম।

## ভৈরব

ছোটনাগপুরের পাহাড়-ঘেরা এই ছোট্ট জায়গাটায় সেদিন যেন ধূসর সন্ধ্যা কেমন একরকম গা-ছমছম-করা রহস্যময় রোমাঞ্চ নিয়ে নেমে এসেছিল।

এমনটা অন্যদিন হয় না। অন্যদিনও এই সময় ধূজটিবাবু সর্বাস্থে গরম চাদর জড়িয়ে, হাতে দস্তানা পরে টাক মাথার উপর মাংকি-ক্যাপ চাপিয়ে লাঠি ঠুকঠুক করে এসে বসেন। এখন সবে অক্টোবরের মাঝামাঝি। শীত পড়েনি, পড়ব পড়ব করছে। এখনই ঐ কচি শীতের বিরুদ্ধেই ধূজটিবাবুর এই রণসাজ। তাঁর এই শীতবস্ত্রের বর্ম দেখে মহীতোষ মজুমদারের স্ত্রী হাসেন। কিন্তু যাঁকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা তিনি নির্বিকার। তাঁর কোনো লজ্জা-সংকোচ নেই। মহীতোষবাবু এক সময়ে পুলিশ অফিসার ছিলেন। অসময়ে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেছেন। তাঁর পুলিশি জীবনের নানা ঘটনা শুনতে ধূজটিবাবু ভালোবাসেন। সেই লোভে এই কদিন ধরে রোজ সন্ধ্যাবেলা উনি এখানে আসেন।

কেন যে মহীতোষবাবু পুলিশের চাকরির মতো লোভনীয় কাজ রিটায়ার করার আগেই ছেড়ে দিয়েছিলেন সে কথা একমাত্র বাড়ির লোক ছাড়া আর কাউকে বলেননি। কেননা বললেও তা কেউ বিশ্বাস করবে না। শুধু চাকরি ছাড়াই নয়—একেবারে দেশ ছাড়া হতে হয়েছিল।

এখানে উনি এসেছেন মাস ছয় হলো। শান্ত, নিরিবিলা জায়গা। ভদ্রলোকের বাস তেমন নেই। কেননা শহর বলতে যা বোঝায় তা এখান থেকে ক্রেশখানেক দূরে। মহীতোষবাবুর বাংলোর অল্প দূরে একটা পুরনো দোতলা বাড়ি। ঐ একটিই দোতলা বাড়ি। ওপরের জানালাগুলো সব সময়েই বন্ধ। একতলায় লোক থাকে। তারা বাঙালী নয়, মিশুকোও নয়। তবে কয়েক দিন হলো ধূজটিবাবু নামে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ঐ বাড়িতে এসেছেন। তিনি নিজেই এসে মহীতোষবাবুর সঙ্গে আলাপ করেছেন।

উনি অবশ্য সকালের দিকে আসেন না। বিকেলেও শীতের ভয়ে বড়ো একটা দূরে কোথাও যান না। ঠাণ্ডার ধাত। একটুতেই নাকি বুকে কফ জমে, গলা বসে যায়। তিনি অল্প কথা বলেন, তবু বিদেশে এই বাঙালী অতিথিকে পেয়ে মহীতোষবাবু ও তাঁর স্ত্রী খুব খুশী।

স্বামী-স্ত্রী ছাড়া এ বাড়িতে আর একজন আছে। তার নাম লক্ষ্মণ। লম্বা-চওড়া, যাকে বলে দশাসই চেহারা—তাই। কুচকুচে কালো রঙ। আর পাথরের মতো বোবা। কাজ করে অসুরের মতো। ভোরবেলা আসে। কাজ করে রাতের খাবার নিয়ে চলে যায় নদীরে ওপারে। ধূজটিবাবু ওকে প্রথম দেখেই আঁতকে উঠেছিলেন। ফিসফিস করে বলেছিলেন, ঐ লোকটার কাছ থেকে সাবধান থাকবেন মশাই। আমি বলছি, ও মানুষ খুন করতে পারে।

এ কথা শুনে মহীতোষবাবুর স্ত্রী শিউরে উঠেছিলেন, কিন্তু এক সময়ের দৌর্দণ্ডপ্রতাপ

মহীতোষবাবু ভয় পাননি। ভয় পেয়েই বা কি করবেন। সন্দেহ করে না হয় ছাড়িয়ে দিলেন। তারপর লোক পাবেন কোথায়?

রোজ সন্ধ্যাবেলা ধূজটিবাবু এসে মহীতোষবাবুর কাছে তাঁর পুলিশি জীবনের যত খুন-খারাপির গল্প ছেলেমানুষের মতো শোনেন। লণ্ঠনের আলো থেকে চোখ আড়াল করার জন্যে উনি একটা কিছু বই কিংবা কাগজ চিমনির গায়ে ঠেকিয়ে রাখেন। একটা ঘটনা বলা শেষ হয়ে গেলে উনি নাকে কেমন একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করেন। অর্থাৎ ঘটনাটা তাঁর পছন্দ হলো না। অন্য ঘটনা শুনে চান। যেন তিনি কোনো বিশেষ ঘটনা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সময়ে সময়ে মহীতোষবাবুর মনে হতো ধূজটিবাবু হয়তো বা কোনো ছদ্মবেশী লেখক—প্লট খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

শেষে আজ মহীতোষবাবু তাঁর জীবনের সেই একান্ত গোপনীয় রোমাঞ্চকর কাহিনীটা বলতে শুরু করলেন, যে কাহিনীর নায়ক দুটি স্কুলের ছাত্র—মহীতোষ আর ভৈরব।

কাহিনী শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন যেন কতকগুলো অশুভ লক্ষণ দেখা দিল। দেওয়ালে একটা ছবি টাঙানো ছিল সেটা হঠাৎ ঝনঝন করে পড়ে ভেঙে গেল। এই সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির ছাদে কি একটা পাখি বিস্মী শব্দে ডেকে উঠল। সে ডাক শুনে মহীতোষবাবুর মতো লোকও চমকে উঠলেন। তার পরই মনে হলো যেন প্রচণ্ড ঝড় উঠছে। তিনি জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, কিন্তু কালিঢালা অন্ধকার আকাশ ছাড়া ঝড়ের কোনো লক্ষণই দেখতে পেলেন না।

এসব কি হচ্ছে? মনে মনে মহীতোষবাবু যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বললেন না। নিজেকে একটু ওড়িয়ে নিয়ে তিনি গল্প বলতে শুরু করলেন।

ভৈরব ছিল তাঁর ইস্কুলের বন্ধু। একই সঙ্গে পড়তেন তাঁরা। কতই বা বয়েস হবে তখন, তেরো-চোদ্দ? ভৈরব ছিল একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। তার স্বভাবের সঙ্গে মহীতোষের স্বভাবের কোনো মিল ছিল না। তবু ভৈরব কেন যে মহীতোষকে খুব ভালোবাসত তার কারণ অজানা।

পড়াশোনায় ভৈরবের মন ছিল না। ঐ বয়েসেই সে তুকতাক, ঝাড়ফুক শেখার জন্যে গ্রামে গ্রামে ঘুরত। ওঝাদের বাড়ি গিয়ে বসে থাকত। সে ওঝারা সাপের ওঝা নয়, ভূত ছাড়াবার ওঝা।

ওর চেহারাটাও ছিল তেমনি। কালো ষণ্ডাগণ্ডা। ছোট করে কাটা চুল। সে চুলে কখনও তেল পড়ত না। আর চোখ দুটো ছিল পাথরের চোখের মতো নিষ্প্রাণ। ঐ চোখের দিকে তাকিয়ে মাস্টারমশাইরা পর্যন্ত ওর সঙ্গে কথা বলতে পারতেন না।

এমন ছেলেকে কেউ ভালোবাসতে পারে না। মহীতোষও পারতেন না। কিন্তু ছুটির পর ভৈরব একরকম জোর করে মহীতোষকে টেনে নিয়ে যেত নির্জন জায়গায়, বিশেষ করে শ্মশান কিংবা কবরখানায়। সেখানে বসে ও যে সব কথা মহীতোষকে শোনাতো তাতে বেচারি মহীতোষের রক্ত জল হয়ে যেত। যেমন ও বলত ও নাকি ভূত নামানো প্রায় শিখে ফেলেছে। অমুক গ্রামের অমুক ওঝা ওর গুরু।

একদিন বলল, খুব ইচ্ছে করে তিব্বত যেতে। ওখানকার লামারা নাকি প্রেতসিদ্ধ। মহী ভাই, চ'না, তোতে আমাতে একবার তিব্বত ঘুরে আসি।

শোনো কথা! তিব্বত যেন এপাড়া-ওপাড়া! শুধু গিয়েই, ক'দিন থেকে ফিরে আসা।

চল না মহী! লেখাপড়া শিখে ভালো ছেলে হয়ে বাড়ি বসে থেকে কি হবে। তার চেয়ে যদি প্রেতসিদ্ধ হতে পারিস তাহলে দুনিয়ার সবকিছু চলে আসবে এই হাতের মুঠোয়।

এসব কথায় মহীতোষ সাড়া দিতে পারতেন না। ভৈরবের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত এড়িয়ে যেতে লাগলেন। ছুটি হতে না হতেই তিনি ছুটে বাড়ি পালাতেন।

একদিন ভৈরব মহীতোষকে একা পেয়ে ওঁর হাতটা শক্ত করে চেপে ধরল। ওর ডান হাতে একটা বাড়তি ছোট আঙুল ছিল। সেটা আবার ছুরির ফলার মতো বাঁকা। দেখলে গা শিউরে উঠত। সেই বেঁটে আঙুলটার তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে মহীতোষের হাতে দাগ কেটে দিয়ে বলল, কিরে! আমায় এড়িয়ে যাচ্ছিস? কিন্তু মনে রাখিস, আমায় দূরে ঠেলে দিলেও আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবি না। আমি তোকে কাছে টানবই।

ছেড়ে দে ভাই, আমায় ছেড়ে দে। বলে কোনোরকমে সেদিন মহীতোষ ওর হাত ছাড়িয়ে পালিয়েছিলেন।

আবার একদিন পাকড়াও করেছিল ভৈরব। বলেছিল, তুই না যাস আমি একাই তিব্বত যাব। সেখানে যদি মরেও যাই তবু তোকে দেখা দেবই। আমার গুরু বলেন প্রেত-আত্মা খুব ইচ্ছে করলে দেহ ধারণ করে কিছুক্ষণের জন্যে দেখা দিতে পারে। তবে তার জন্যে আত্মাকে প্রচণ্ড কষ্ট পেতে হয়। মুক্তিও আটকে যায়। তা যায় যাক, তবু তোর সঙ্গে দেখা করতে আসব।

এই পর্যন্ত বলে ভৈরব একটু থেমেছিল। তারপর বলেছিল, তবে একটা কথা, দেখা করতে এলে তুই যদি আমায় অপমান করিস, আমায় তাড়িয়ে দিস তাহলে বন্ধু বলেও খাতির করব না। তোকে মেরে আমার সঙ্গী করে নেব।

মহীতোষ তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছেন।

বল, কথা দে, দেখা দিলে কাছে ডাকবি?

নিষ্কৃতি পাবার জন্যে মহীতোষ তাড়াতাড়ি বলেছিলেন, এখন মরা-টারার কথা কেন ভাই? এখনও ঢের সময় আছে।

ভৈরব দাঁতের ফাঁকে হেসে বলেছিল, তা আছে। কিন্তু ঐ আর কি ‘যদি’-র কথা বললাম। বল, দেখা করতে এলে ফিরিয়ে দিবি না।

না।

প্রতিজ্ঞা?

হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা।

আমায় তখন দেখলে চিনতে পারবি তো? ডান হাতে এই আঙুল—বলে ডান হাতটা মুখের কাছে তুলে ধরেছিল। অমনি ওর ঐ ক্ষুদ্রে আঙুলটা তিরতির করে কাঁপতে লেগেছিল। আর কপালের বাঁ দিকে এই কাটা দাগ। মনে থাকবে তো?

হ্যাঁ ভাই, থাকবে। খুব থাকবে। বলে কোনোরকমে পালিয়ে এসেছিলেন।

এরপর হঠাৎই একদিন ভৈরব বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ। আর তার খোঁজ পাওয়া গেল না।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে একরকম ছুটেই ঢুকলেন মহীতোষবাবুর স্ত্রী। তাঁর মুখে-চোখে ভয়ের ছাপ, ছাদে কিসের শব্দ হচ্ছে!



মহীতোষবাবুও চমকে উঠলেন।

ছাদে শব্দ?

হ্যাঁ, শোনো।

মহীতোষবাবু কান পাতলেন। খুব মৃদু একটা শব্দ। কে যেন ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মহীতোষবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অন্ধকারে ছাদের দিকে তাকিয়ে চোঁচিয়ে উঠলেন, ছাদে কে?

উত্তর পেলেন না। শব্দটা থেমে গেল। একটা পরে লক্ষ্মণ এসে দাঁড়ালো। সে জানাল, ছাদে একটা খারাপ ধরনের পাখি বসেছিল। সেটাকে ও তাড়াতে গিয়েছিল।

তবু ভালো।

পরক্ষণেই মহীতোষবাবু ভাবেন, তাই বা কেন? এত দিন পর হঠাৎ খারাপ পাখি কোথা থেকে এল?

এত যে কাণ্ড হচ্ছে পরম ধৈর্যবান শ্রোতাটির মধ্যে কিন্তু কোনো চাঞ্চল্য নেই। সেই যে অন্ধকারে মুখ আড়াল করে গল্প শুনে যাচ্ছিলেন, টুঁ শব্দটি নেই। বোধ হয় ঘটনাটা তাঁর ভালোই লাগছে।

তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে—মহীতোষবাবু আবার তাঁর কাহিনী শুরু করলেন। ভৈরবের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। তখন তিনি কলকাতার কাছাকাছি এক জায়গার থানার ও সি। একদিন একটা মার্ডার কেস এল। মহীতোষবাবু লাশ দেখলেন। প্রবল আক্রোশে কেউ লোকটাকে একেবারে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। এমন তো কত লাশই দেখেছেন তিনি। কিন্তু কেন যে এই মৃতদেহটা দেখে থমকে গিয়েছিলেন তা বুঝতে একটু সময় লেগেছিল।

মৃতের বয়েস বছর বাহান্ন-তিন্লান্ন, কালো কুচকুচে রঙ। এই বয়েসেও পেশল চেহারা। নাক খ্যাবড়া। মুখটা যেন চেনা চেনা লাগল। তারপর ডান হাতে ছটা আঙুল দেখেই মহীতোষবাবু চমকে উঠেছিলেন। আঙুলটা আবার ছুরির ফলার মতো বাঁকা।

কপালের রক্তটা মোছো তো। হুকুম দিয়েছিলেন একজন কনস্টেবলকে। রক্তের ছোপ মুছে ফেলতেই দেখা গেল কাটা দাগ। বুঝতে বাকি রইল না এ তাঁর সেই ছোটবেলাকার ক্লাস ফ্রেন্ড ভৈরব। জানা গেল ও নাকি এ অঞ্চলের এক কুখ্যাত সমাজবিরোধী। নিজেদের মধ্যে রেষারেষির জনেই প্রাণ হারিয়েছে।

ভৈরব যে তাঁর চেনা মহীতোষবাবু তা প্রকাশ করলেন না। লাশ পোস্টমর্টেমের জন্যে পাঠিয়ে বাসায় ফিরে এলেন। গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন, একদিন যে প্রেতসিদ্ধ হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল, শেষ পর্যন্ত সে হয়ে গেল কিনা একটা ডাকসাইটে সমাজবিরোধী।

যাই হোক এই খুনের তদন্তের ভার পড়েছিল মহীতোষবাবুর ওপরেই। কোথায় কোথায় ভৈরব থাকত, তার দলে আর কে কে আছে, কেই বা ওকে খুন করল এইসব তদন্ত শুরু করতে হলো। কিন্তু বিশেষ কোনো ক্লু পাওয়া গেল না। তা ছাড়া এইসব সমাজবিরোধীদের খুনের কেস নিয়ে মাথা ঘামাবার ইচ্ছেও তাঁর বিশেষ ছিল না। কেসটা ক্রমে ধামা চাপা পড়ে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে তাঁর জীবনে একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটতে শুরু করল।

একদিন।

রাত বেশ গভীর। নিস্তব্ধ অঞ্চলটা। মনে হলো কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে ঠুক ঠুক।

ঘুম ভেঙে গেল মহীতোষবাবুর। কিন্তু কিছু আর শোনা গেল না। ভাবলেন, বোধ হয় স্বপ্ন দেখছেন। পাশ ফিরে চোখ বুজলেন। একটু পরেই আবার সেই শব্দ। এবার বিছানায় উঠে বসেই হাঁকলেন, কে?

উত্তর নেই।

পাঁচ মিনিট পরে আবার সেই শব্দ। এবার জোরে।

মহীতোষবাবু উঠতে যাচ্ছিলেন, ওঁর স্ত্রী বাধা দিলেন, যেও না।

মহীতোষবাবু হচ্ছেন পুলিশ অফিসার। এত অল্পে ভয় পেলে কি তাঁর চলে।

দাঁড়াও দেখি। বলে উঠে আলমারি খুলে রিভলবারটা নিয়ে দরজা খুলতে গেলেন, আর ঠিক তখনই দরজার বাইরে থেকে একটা অল্পবয়সী ছেলের গলা শোনা গেল, মহী, আমি এসেছি, খুব দরকার।

গলার স্বর শুনে মহীতোষবাবু অবাক! যেন অনেক দিন আগের খুব চেনা গলার স্বরটা। তাড়াতাড়ি দরজা খুললেন। কিন্তু কেউ কোথাও নেই।

মহীতোষবাবুর বাড়ির সামনে সরু এক ফালি প্যাসেজ আছে। প্যাসেজটা গিয়ে পড়েছে বড়ো রাস্তায়। এই প্যাসেজ দিয়েই যাওয়া-আসা করতে হয়। দরজার সামনে কেউ নেই দেখে মহীতোষবাবু প্যাসেজের উপর টর্চ ফেললেন। দেখলেন সেখানে একটা লোক দাঁড়িয়ে। খালি-গা, পরনে একটা লুঙ্গি। মাথায় ফেট্রি বাঁধা। মুখটা রক্তে জবজবে।

এ আবার কে? এত রাত্তিরে এখানে কেন? পুলিশের লোক বলে লোকটা কি নালিশ জানাতে এসেছে?

তাকে কিছু বলতে যাবেন, স্পষ্ট দেখলেন লোকটা হাতের ইশারায় তাঁকে ডাকছে।

মহীতোষবাবু রিভলবারটা শক্ত করে ধরে এগিয়ে গেলেন। এগিয়ে গেলেন একেবারে ওর তিন ফুটের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে এক চাঙড় বরফ যেন তাঁর মেরুদণ্ড দিয়ে নেমে গেল। হাত-পা অসাড় হয়ে এল।

কে এ? এ তো ভৈরব। সেই যে খুন হয়েছিল। যার খুনের কিনারা এখনও হয়নি। আশ্চর্য! সে কি করে—

পরক্ষণেই দেখলেন ও এগিয়ে যাচ্ছে রাস্তার দিকে। হাতের ইশারায় কেবলই ডাকছে, এসো—আমার সঙ্গে এসো।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো তিনি ওর পিছনে পিছনে চললেন। ও গলি থেকে পথে নামল। রাস্তা নির্জন—অন্ধকার। আগে আগে চলেছে ভৈরবের ছায়ামূর্তি। পিছনে মহীতোষবাবু। মাঝেমাঝেই সে পিছন ফিরে দাঁড়াচ্ছে আর ইশারায় ডাকছে।

ও কোথায় কী উদ্দেশ্যে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে কে জানে! মহীতোষবাবু চলেছেন তো চলেছেনই। একটা কথাই শুধু ওঁর মনে পড়ছে, দরজা ঠেলবার সময়ে ছোটো ছেলের গলায় ভৈরব বলেছিল, খুব দরকার।

কিসের দরকার? তবে কি ও ওর খুনীর কাছে নিয়ে যেতে চায়?

এ কথা মনে হতেই মহীতোষবাবু খুব ভয় পেলেন। এভাবে একা যাওয়া তাঁর উচিত

নয়। তখনই তিনি ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু ঠিক কোথায় এসে পড়েছেন তা বুঝতে পারলেন না। তাঁর মাথাটা বিমবিম করে উঠল। পা দুটো যেন অসাড় হয়ে এল। তিনি আর হাঁটতে পারলেন না। ফুটপাথের ওপরেই বসে পড়লেন।

জ্ঞান ফিরে এল ভোরবেলায়। তখন একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।

এই পর্যন্ত বলে মহীতোষবাবু থামলেন। ধূজটিবাবু সেই যে শীতের ভয়ে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে গুটিসুটি আধ-শোওয়া হয়ে ছিলেন, তেমনিই রয়েছেন। সাড়াশব্দ নেই। ঘরের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তিকর হাওয়া থমথম করছে। বাইরে কতকগুলো কুকুর কেন যে এই বাড়িটা লক্ষ্য করেই ক্রমাগত ঘেউ ঘেউ করতে লাগল কে জানে!

ঘরে এই মুহূর্তে মহীতোষবাবু আর ধূজটিবাবু ছাড়া অন্য কেউ নেই। তবে কেন কুকুরগুলো—

না, ঘরে আরো একজন কখন নিঃশব্দে এসে দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মহীতোষবাবুর কথা শুনছে কেউ তা খেয়াল করেনি।

কে? ও লক্ষ্মণ। মহীতোষবাবু যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। দে তো বাবা, জানলাগুলো বন্ধ করে। বড ঠাণ্ডা বাতাস আসছে।

লক্ষ্মণ কোনো উত্তর দিল না। দৈত্যের মতো বিরাট চেহারা নিয়ে ধূপ ধূপ করে পায়ের শব্দ তুলে জানলাগুলো বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে চলে গেল।

তারপর—

কি মশাই, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?

বলে যান। মুখ না তুলেই কফ-জড়ানো স্বরে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন ধূজটিবাবু।

তারপর থেকে প্রায়ই রাত দুপুরে দরজায় শব্দ। মহীতোষবাবুকে উঠতে হতো। দেখতেন দরজার বাইরে ভৈরব দাঁড়িয়ে।

একদিন বিরক্ত হয়ে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতে গিয়েছিলেন। উঃ ভৈরবের সে কী রাগ! কী দৃষ্টি! চোখ দুটো যেন হলদে বোতামের মতো অভিব্যক্তিশূন্য অথচ ভয়ঙ্কর। মনে হচ্ছিল তক্ষুণি বুঝি মহীতোষবাবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ছটা আঙুল দিয়ে টুটি চেপে ধরবে।

বাধ্য হয়ে মহীতোষবাবুকে বাড়ি বদলাতে হলো। কিন্তু সেখানেও ভৈরব হাজির। এমনি করে যেখানেই যান ভৈরবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান না। একদিন তো সবে সন্ধ্যাবেলা—লোডশেডিং। বাড়ি ফিরছিলেন মহীতোষবাবু। দেখলেন গলির মুখে ভৈরব কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। এখন আর নাম ধরে ডাকে না। শুধু ওর সেই ভয়ঙ্কর হলুদ বোতামের মতো চোখ দিয়ে যেন গিলতে আসে।

তাই, শেষ পর্যন্ত বলতে পারেন একেবারে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। কী বলব মশাই, ভৈরবের ভয়ে রাতে ঘুমতে পারতাম না। এখানে এসে মনে হচ্ছে নিস্তার পেয়েছি।

গল্প আমার এখানেই শেষ। বলে মহীতোষবাবু একটা সিগারেট ধরালেন। আরামে একটা সুখটান দিলে বললেন, এসব কথা কাউকে বলিনি—বলতে চাই না। বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। নেহাৎ আপনি—

কথা শেষ হলো না মহীতোষবাবুর। তাঁর মনে হলো ঘরটা যেন হঠাৎ কুয়াশায় ভরে উঠছে।

এ কী! এত কুয়াশা কোথা থেকে এল? জানলাগুলো তো সব বন্ধ।

এমনি সময় সেই কুয়াশার মধ্যে থেকে ধূজটিবাবু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। হলদে বোতামের মতো দুটো চোখ কুয়াশার ভেতরেই খিকি খিকি জ্বলছে। একটানে খুলে ফেললেন হাতের দস্তানাটা। লঠনের ঘোলাটে আলোয় দেখা গেল শীর্ণ একটা হাত ক্রমশ এগিয়ে আসছে। সেই হাতে ছটা আঙুল। ছুরির ফলার মতো অতিরিক্ত সেই আঙুলটা কাঁপছে তিরতির করে। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠতে গেলেন মহীতোষবাবু কিন্তু কুয়াশায় দম বন্ধ হয়ে গেল।

দু'দিন পর সুস্থ হয়ে উঠলেন মহীতোষবাবু। কি যে ঘটেছিল কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। জানলেন সেই রাতে লক্ষ্মণই ডাক্তার ডেকে এনে তাঁকে বাঁচায়। কিন্তু ধূজটিবাবুর পাত্তা আর পাওয়া যায়নি।

সেদিন বিকেলে সেই দোতলা বাড়িতে ধূজটিবাবুর খোঁজ নিতে গেলেন মহীতোষবাবু। অবাঙালী বৃদ্ধ একজন বললেন, দু'দিন আগে হঠাৎ ভোরবেলায় সেই বাঙালীবাবু চলে গেছেন। তিনি এঁদের কেউ নন। চিনতেনও না। কলকাতা থেকে নাকি এসেছিলেন কয়েক দিনের জন্য। কোথাও থাকার জায়গা পাচ্ছিলেন না বলে বাইরের ঘরটা ভাড়া নিয়েছিলেন।

মহীতোষবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

# বামনের কঙ্কাল

## সিঁড়িতে পায়ের শব্দ

সেদিন অনেক রাতে অস্পষ্ট একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম।

কৃষ্ণপক্ষ। খোলা জানলা দিয়ে দেখলাম চাঁদের ম্লান আলো লুটিয়ে পড়েছে বরাকর নদীর জলে। ওদিকে গভীর শালবন থমথম করছে।

আমি বিছানায় বসে কান পেতে রইলাম।

না, কোনো শব্দ নেই।

তবে কি আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভুল শুনেছিলাম?

তার পরেই চমকে উঠলাম। আবার সেই শব্দ—খট খট খট....কেউ যেন কাঠের পা নিয়ে কাঠের সিঁড়ির উপর দিয়ে মাতালের মতো টেনে টেনে ওঠবার চেষ্টা করছে।

হঠাৎই শব্দটা থেমে গেল। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলাম। কিন্তু শব্দটা আর শোনা গেল না।

আশ্চর্য! কে আসছিল সিঁড়ি দিয়ে উঠে? কেনই বা দোতলা পর্যন্ত উঠল না? চোর-ডাকাত? চোর-ডাকাত যদি হয় তাহলে কি তাদের পায়ের শব্দ ঐরকম হয়?

কিছুই বুঝতে পারলাম না।

তা হলে?

হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনা বৃকের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। তবে কি—একবার ভাবলাম দরজা খুলে সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে দেখি। কিন্তু সাহস হলো না। মশারির মধ্যে চুপ করে বসে রইলাম।

## ভয়ংকরী বুড়িমা

বরাকর জায়গাটা পশ্চিমবঙ্গ আর বিহারের বর্ডারে। বরাকরের এদিকে কুলটি আর ওপারে কুমারভূবি।

বহুকাল আগে আমার পিতামহ বরাকর নদীর নির্জন প্রান্তে শালবনের কাছে একটা দোতলা বাড়ি করেছিলেন। শুনেছি প্রতি বছর তিনি সপরিবারে এখানে হাওয়া বদলাতে আসতেন। কিন্তু এখন লোকে চেঞ্জ বা হাওয়া বদলাতে কেউ বড়ো একটা বিহার বা ছোটোনাগপুরে যায় না। যায় দূর দূর দেশে। সেইজন্যে নির্জন নদীর ধারে পূর্বপুরুষের এই বাড়ির প্রতি কারও আর আকর্ষণ নেই। নিরিবিলি জায়গাটা ভয়ের জায়গা হয়ে উঠেছে। চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাপি কি না হতে পারে।

এ বাড়িতে আমিই এখন একা থাকি। আমার পক্ষে এরকম নির্জন নির্বাক্তব জায়গাই ভালো। কেন এইরকম জায়গায় পড়ে আছি সে কথা বলার আগে নিজের বিষয়ে কিছু বলে নিই।

অমি ঠিক সাধারণ মানুষের মতো নই। ঘর-সংসার করিনি। ছোটবেলা থেকে সাধু-সন্ন্যাসীদের ওপর তীব্র আকর্ষণ। তখন থেকেই সাধু-সন্ন্যাসীদের ওপর লেখা নানা রকমের বই পড়তাম। যতই পড়তাম ততই তাঁদের ওপর আগ্রহ বেড়ে যেত। তারপর আমিও একদিন বাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসীদের দলে ভিড়ে পড়লাম। কত যে সন্ন্যাসীর সঙ্গে মিশেছি তার হিসেব নেই। কিন্তু তাঁরা কেউ আমায় পাতা দেননি। বলেছেন—তুই ছেলেমানুষ। তোর এখনও সময় হয়নি। বাড়ি ফিরে যা।

বাড়ি ফিরে আসিনি। আবার অন্য সন্ন্যাসী ধরেছি।

একবার এক তান্ত্রিকের সঙ্গে পেয়েছিলাম। তিনি আবার শবসাধনা করতেন। নির্জন ভয়ংকর শ্মশানঘাটে গভীর রাতে একটা মড়ার ওপর বসে সারারাত মন্ত্র পড়ে যেতেন। এই সাধনা খুবই কঠিন। নানারকম ভয়াবহ ঘটনা ঘটত। তাতে ভয় পেলেই মৃত্যু। আর ভয় না পেলে সিদ্ধি। তুমি মহাশক্তির অধিকারী হয়ে উঠবে। আমার সাধ হলো আমিও শবসাধনা শিখব। তান্ত্রিক গুরুকে একথা বলতেই তিনি লাল লাল চোখে কটমট করে তাকিয়ে আমার গালে এক চড় মেরে বললেন—ছেলেখেলা! বেরো এখান থেকে।

সে কী চড়! এক চড়ে মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

ওখান থেকে চলে এসে আবার ঘুরতে ঘুরতে একটা গ্রামের বাইরে নির্জন শ্মশানে এক বুড়ির সন্ধান পেলাম। লোকে তাকে ‘বুড়িমা’ বলে ডাকত। কিন্তু কেউ তার কাছে ঘেঁষত না। বলত ও নাকি ভয়ংকরী বুড়িমা!

শ্মশানটা একটা মজা নদীর পাশে। টোপা পানা আর কলমীর দাম ডাঙার কাছে। এদিকে-ওদিকে মরা কুকুর, বেড়াল, ছাগল পড়ে আছে। দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত। এছাড়া পড়ে রয়েছে শ্মশানযাত্রীদের ফেলে যাওয়া ভাঙা কলসি। একটা বিকট মড়ার খুলিও দেখলাম জলের ধারে পাকুড় গাছটার গোড়ায়। গা শিউরে উঠল।

এখানেই একটা বটগাছের নিচে বুড়িমার দেখা পেলাম। ছেঁড়া ময়লা একটা কাঁথা জড়িয়ে পড়ে আছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল জট পাকিয়ে গেছে। সর্বাস্থে মড়া-পোড়ানো ছাই মাখা। কাঁথা জড়ানো থুথুরি বুড়িকে দূর থেকে দেখে মনে হয়েছিল যেন একটা ময়লা কাপড়ের পুঁটলি।

যাই হোক বুড়িকে প্রণাম করার অনেকক্ষণ পর মনের ইচ্ছে জানালাম। বুড়ি থু করে আমার গায়ে থুথু দিয়ে খোনা গলায় বললে—দূর হ—দূর হ। নইলে মঁরবি।

বুড়ির মুখে প্রথমই মরার কথা শুনে খুব উৎসাহ পেলাম। বুঝলাম এখানে সাংঘাতিক কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে। কাজেই আমি ওখান থেকে নড়লাম না।

ওখানেই পড়ে থাকি। রোজই গাল খাই, মড়া-পোড়ানো কাঠ ছুঁড়ে নির্দয়ভাবে মারে, পিঠ ফেটে রক্ত পড়ে। তবু নড়ি না।

এমনি করে এক মাস, দু-মাস গেল। এর মধ্যে কতরকমের ভয় পেলাম। কতরকমের বুক-কাঁপানো শব্দ। এক-এক সময়ে তিনখানি মাত্র দাঁত নিয়ে বুড়ি হি হি করে ভয়ংকর হাসি হেসে ওঠে। আমি তখন তার দিকে তাকিয়ে মা-মা করে ডাকি। অমনি ভয় কেটে যায়।

ক্রমে বোধ হয় আমার ধৈর্য দেখে বুড়িমা নরম হলো। ভূত-প্রেতের কত কথা শোনালাম।

বলল—এই শ্মশান বহুকালের জাঁনিস? লক্ষ চিতা জ্বলছে। এই পবিত্র ‘থানে’ ভূত, প্রেত, পিশাচ কী নেই? ভূত ছাড়াও আছে গৌদান, আছে বৌকি। মানুষ মরলে চোখে দেখা যায় না। তঁবু তারা থাকে।

বুড়িমা ফোকলা দাঁতে ফক ফক করে কথা বলে।—অনেক রকমের প্রাণী-ভূত আছে তাদের বুদ্ধি মানুষের চেয়ে কম কিন্তু শক্তি বেশি। এরা হলো ডাঁকিনী, শঁখিনী। আর এক ধরনের অপদেবতা আছে। তারাও সাংঘাতিক। এঁদের বলে হাঁকিনী। মন্ত্রবলে এঁদের বঁশ করতে পারলে এঁদের যা করতে বলবে তাই করবে। কিন্তু একটু অসাবধান হলেই এরা তৌকেই মেরে ফেলবে।

আমি অবাক হয়ে এই প্রেত-সিদ্ধ বুড়িমার কথা শুনি। শ্রদ্ধা বিশ্বাস বাড়ে।

শেষে একদিন ভয়ে ভয়ে শব-সাধনা শিখিয়ে দেবার জন্যে বললাম। এই উদ্দেশ্যেই তো আমার আসা। আমার কথা শুনে বুড়িমা তো চটে আশুন। অনেক কষ্ট করে শেষ পর্যন্ত বুড়িকে রাজী করলাম। বললে, এঁত কঁরে ধঁরছিস, ঠিক আঁছে দৌবো। তঁবে ক্ষেঁতি হঁলে বাঁচাতে পারব না।

আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললাম, সাধনা করতে গিয়ে যদি প্রাণ যায় যাক।

বুড়িমা একটু মুচকে হাসল। বললে, তবে যা বাজার থেকে জিনিসগুলো কিনে নিয়ে আয়।

দু-তিনদিন ধরে বুড়িমার ফর্দমতো জিনিসগুলো শহরে গিয়ে কিনে আনলাম। কিন্তু আসল জিনিস কই? শব? শব তো আর বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না।

আজ বেশ ক’দিন ঘাটে একটা মড়াও আসেনি। মড়া এলেই কি পাওয়া যাবে? যারা মড়া নিয়ে আসে তারা তো মড়া পুড়িয়ে চলে যাবে। এক যদি প্রবল বৃষ্টি হয়, চিতা জ্বালতে না পেরে মড়া ভাসিয়ে দেয় তাহলে হয়তো সেই শব পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে সম্ভাবনাই বা কোথায়?

বুড়িমা মুচকে মুচকে হাসতে লাগল। আমার কান্না পেল। বললাম, তা হলে কি হবে বুড়িমা?

আমার করুণ অবস্থা দেখে বুড়ির যেন দয়া হলো। বলল, তা হলে এক কাজ কর। আমায় গলা টিপে মেরে ফ্যাল। তারপর আমার শবের ওপর বসে—

প্রথমে ভেবেছিলাম বুড়ি বুঝি মস্করা করছে। কিন্তু যখন সে কাঁদো কাঁদো হয়ে তার বড়ো বড়ো বাঁকানো রক্তশূন্য নখসুদ্ধ হাত দিয়ে আমার হাত ধরে (উঃ কী ঠাণ্ডা!) বললে, আমি বলছি তুই আমায় মার। আমার শরীলটা তা হলে শবসিদ্ধ হবে। ওরে, আমি একটা সৎকাজ করে মুক্তি পাব।

তখন আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। বললাম, না-না, খুন করে আমি ফাঁসি যেতে পারব না।

বুড়িমা বললে, দূর পাঁগল! পুলিশ টের পাবে কি করে? এখানে জন্মনিষি নেই। নে, শেষ কঁরে দে আমাকে। বলে সরু খসখসে চামড়ার গলাটা বাড়িয়ে দিল।

আমি খুন করতে পারব না, বলে ছুটে পালাবার চেষ্টা করতেই বুড়িমা খপ করে আমার হাতটা চেপে ধরল। সে যে কী শক্ত হাত তা বোঝাতে পারব না। ঐ থুরথুরে বুড়ি এত শক্তি কোথায় পেল?

বুড়িমা বলল, যেঁতে হবে না। আমাকে মারতেও হবে না। আজ থেকে তিন দিন পর

অঁমবস্যার রাঁতে একটা মঁড়া এসে ভিড়বে ঘাঁটে। তাঁকে নিয়েই তুঁই বসবি।

মড়া আসবেই তুমি জানলে কি করে?

আঁমি জানতে পারি।

কোথা থেকে আসবে?

এঁখান থেকে চাঁর পো (এক মাইল) পঁথ দূঁরে গাঁদধরপুরের চাঁমারদের একটা চৌদ্দ-পনেরো বঁছরের ছেঁলে মরবে। আঁমি তাকে দেখেছি। ভাঁরি সুলক্ষণ আছে।

কিন্তু সে মরবেই জানলে কি করে?

বঁললাম তো আঁমি জানতে পারি। সে ক্ষ্যামতা আঁমার না থাঁকলে তুঁই এঁসেছিস কঁয়ানো আঁমার কাছে?

শুনে কিরকম যেন ভয় পেয়ে গেলাম।

বুড়িমা মনের অবস্থাটা ঠিক টের পেল। বলল, এই দাঁখ এঁখুনি তুঁই ভঁয়ে ভঁিরমি খাচ্ছিস। তৌঁর দ্বাঁরা কিছু হবে না।

তবু যে সেই ভীতু ‘আমিটা’ কী করে সব কাজ প্রায় নিখুঁতভাবে করতে পেরেছিলাম তা ভেবে আজ অবাক হই।

সেদিনই গভীর রাতে বুড়িমা বললে, আঁমি একটু ঘূঁরে আঁসি। তুঁই একা থাঁকতে পাঁরবি তো?

ভয় চেপে রেখে বললাম, পারব। তুমি যাচ্ছ কোথায়?

রেগেমেগে বুড়িমা বললে, অঁত খৌঁজে তৌঁর দঁরকার কী?

বেশ। কখন ফিরবে বলবে তো?

রাঁত থাঁকতে থাঁকতেই ফিরব। তৌঁর তৌঁ দেখছি শীত কঁরছে। দাঁড়া। বলে চটের বস্তা থেকে একটা ছেঁড়া ময়লা দাগধরা বিছানার চাদর এনে দিয়ে বললে, এঁটা গায়ে দেঁ। আঁরাম পাঁবি।

ম্যা গো! এ চাদর পেলে কোথায়?

পাঁব আঁবার কৌঁথায়? ঘাঁটে মঁড়া আসে। তাদের গাঁ থেকে খুঁলে নিই।

ঘেমায় কুঁকড়ে গেলাম। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করতে সাহস পেলাম না।

দেখলাম বুড়িমা নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বড্ড তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল।

বুড়িমা চলে যেতেই গা থেকে চাদরটা বাঁ হাতের দুটো আঙুলে ধরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

কিছুক্ষণ কেমন যেন বিহুল হয়ে বসে রইলাম। তার পরেই গা-টা ছমছম করতে লাগল। এই ভয়াংকর নির্জন শ্মশানভূমিতে নিশীথ রাতে কখনো একা থাকিনি। সামনে উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছ। তার একটা পাতাও নড়ছে না। মাঝে মাঝে বুনো ঝিকুড় ফুলের বিশ্রী গন্ধ। অন্ধকার আকাশে ঝিকমিক করছে তারা। যেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছে হাজার হাজার চোখ মেলে। হঠাৎ মাথার ওপর বটগাছের পাতাগুলো নড়ে উঠল। আমি শিউরে উঠলাম। যদিও জানি কোনো বড়ো পাখি পাখা ঝাপটাল, কিন্তু কত বড়ো পাখি সেটা যে এত জোরে পাতা নাড়াতে পারে? তখনই লক্ষ্য পড়ল নদীর ধারে সেই খুলিটার দিকে। মনে হলো খুলিটা যেন হঠাৎ খুব বড়ো হয়ে গেছে। ওটাকে তো রোজই দেখি। এত বড়ো তো ছিল না। গভীর রাতে কি খুলিও বড়ো হয়ে ওঠে? ওটা আবার গড়াতে গড়াতে আমার কাছে চলে আসবে না তো? আমি ভয়ে চোখ বুজিয়ে বসে রইলাম।



প্রায় রাত তিনটের সময়ে বুড়িমা ফিরে এল। কোথা থেকে, কোন পথে, কেমন করে এল জানি না। শুধু দেখলাম আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাড়াতাড়ি চাদরটা জড়িয়ে নিলাম।

বুড়িমা বললে, কিঁরে ভঁয় পাঁসনি তো?

বললাম, না। তোমার কাজ হলো?

বুড়িমা সংক্ষেপে বলল, হ্যাঁ।

কি এমন জরুরি কাজে তাকে যেতে হলো তা জিজ্ঞেস করতে সাহস হয়নি।

দু'দিন পর তিন দিনের দিন অল্প রাতে বুড়িমা ঢুলছিল। হঠাৎ জেগে উঠে বলল, দাঁখ তো নদীর ধারে বোঁধ হয় শঁব লেঁগেছে।

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখলাম সতিই নদীর ধারে বড়ো পাকুড় গাছটার শেকড়ের মধ্যে একটা মড়া আটকে রয়েছে। ছুটে গিয়ে বুড়িকে জানাতেই বুড়ি বললে, ওটা তুলে নিয়ে আঁয়।

বোঝো কথা! জীবনে আমি অনেক মড়া পুড়িয়েছি কিন্তু তিনদিনের বাসি মড়া এই গভীর রাতে একা একা জল থেকে তুলে আনা যে কী কঠিন কাজ তা যে করে সেইই জানে। কিন্তু শব-সাধনা করতে গেলে এসব আমাকে করতেই হবে।

ছপাৎ ছপাৎ করে আমি জলে নেমে এগিয়ে গেলাম। হাঁটুজল। মড়াটার কাপড় পাকুড়গাছের শেকড়ে আটকে ছিল। কোনোরকমে ছাড়িয়ে মড়াটা দু'হাতে পাজাকোলা করে তুললাম। মুখের ওপর অন্ধকারে হাত পড়তেই নরম নরম কী ঠেকল। বুঝলাম জিব। ও বাবাঃ! মড়াটার জিব বেরিয়ে গেছে।

যাই হোক সেটা তুলে নিয়ে এলাম। বুড়িমা ইতিমধ্যে কুশ বিছিয়ে মড়াটার জন্যে শয্যা তৈরি করে রেখেছে। বলল, ওটাকে পূঁব দিকে মাঁথা করে শোঁওয়া।

সেইভাবে শুইয়ে বললাম, জিব বেরিয়ে গেছে কেন?

বুড়িমা খুব সহজভাবেই বলল, বোঁধ হয় কেঁউ গঁলা টিপে মেরেছে।

শুনে কেন জানি না বুকটা ছাঁত করে উঠল। চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলেটাকে গলা টিপে কে মারল?

একটা গভীর সন্দেহ বুকের মধ্যে খচখচ করতে লাগল।

বুড়িমা যেন আমার মনের কথাটা বুঝে নিয়ে বলল, ভাঁবিস নে। ছোঁড়াটার সঁদগতি হয়ে গেল। নে, এঁবার ওঁর মুখে এঁলাচ, লঁবঙ্গ, কঙ্গুর, পান আর এঁকটু মদ দেঁ।

এ সবই এনে রাখা হয়েছিল। মৃতের মুখে একে একে সব দিলাম।

এঁবার শঁবটাকে উপুড় কঁরে দে।

দু'হাতে আঁকড়ে ধরে উপুড় করে দিলাম। এরপর সারা পিঠে চন্দন মাখানো, পায়ের তলায় আলতা দিয়ে ত্রিকোণ চক্র আঁকা, আরও কিছু কিছু আনুষ্ঠানিক কাজ করে গেলাম। তারপর বুড়িমার আদেশমতো শবের পিঠে কস্মল চাপিয়ে ঘোড়ার মতো চেপে বসলাম।

বুড়িমা শবের ২:০০-পা শক্ত করে বেঁধে দিয়ে বললে—এঁবার যাঁ যাঁ মস্ত্র বলেছি চোঁখ বুঁজে আঁওড়াবি। দেখিস ভয় পাঁসনি। ভয় পেলোই মঁরবি। নে বল, ওঁ ফট্। বল, ওঁ হঁ মৃতকায় নমঃ।

বুড়ির মুখ দিয়ে যে এমন সংস্কৃত কথা বার হবে ভাবতে পারিনি। অবাক হলাম। কিন্তু বুড়িমা তখন অধৈর্য হয়ে তাগাদা দিচ্ছে, কী হলো? বল্।

মন্ত্র পড়তে লাগলাম। মন্ত্র কি একটা-দুটো? মন্ত্রের যেন শেষ নেই। মন্ত্র জপতে জপতে চোয়াল ধরে গেল। গলা শুকিয়ে গেল। তবু জপেই চললাম।

রাত দু'প্রহর হলো। চারিদিকে চাপ চাপ অন্ধকার। নদীর জল কালো অন্ধকারে ঢেকে গেছে। দূরে কাষাড় ঝোপে শেয়াল ডেকে উঠল। হঠাৎ আমার মনে হলো এই নির্জন শ্মশানে আমি একা মৃতদেহের ওপর বসে আছি। বুড়িমা নেই।

জানি ভয় পেলে চলবে না। তাই মন শক্ত করে মন্ত্র আওড়েই চললাম। তার পরেই মনে হলো মড়াটা যেন থর থর করে কাঁপছে। শুনেছি এরপর শব আমাকে ফেলে দিয়ে উঠে বসবে। কিন্তু পড়ে গেলে চলবে না। সেই ভয়ংকর অবস্থা কল্পনা করে আমি সিন্ধির প্রথম ধাপে পৌঁছেই শবের ওপর থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটে পালালাম শ্মশান থেকে। পিছনে শুনলাম বুড়িমা হাসছে খল-খল করে।

শবসাধনার এখানেই আমার ইতি। আর কখনো আমি ওমুখো হইনি।

এই হলো আমার জীবনের এক দিকের ইতিহাস। এখন আমি নিরিবিলিতে আমার ঠাকুরদার পরিত্যক্ত দোতলা বাড়িতে একাই থাকি। জায়গাটা নির্জন। কিছু আদিবাসীদের ঘর। তারা চাষবাস করে। একটা ছোটোখাটো মূদির দোকান। ওরই একপাশে তরি-তরকারি বিক্রি হয়। এরাই হলো আমার প্রতিবেশী। আমি চিরদিন সাধু-সন্ন্যাসীর পিছনে ঘুরেছি। কাজেই লোকালয় আমার পছন্দ নয়। পৈতৃক টাকা-পয়সাও কিছু আছে। তাই নিয়ে একা একা বেশ আছি। তবে বড্ড অলস জীবন। কিছু করতে চাই। তার মানে চাকরি-বাকরি বা ব্যবসা-বাণিজ্য নয়। অন্য কিছু। কিন্তু সেই অন্য কিছুটা কী ভেবে পাই না।

এমনি সময়ে একদিন—

### জলেশ্বরের আবির্ভাব

বেলা তখন দুপুর। খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করছি হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। আমার এখানে বড়ো একটা কেউ আসে না। তাই কে এল ভাবতে ভাবতে নিচে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই দেখি একজন বিপুলকায় সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে। তার মাথায় জটা, গৌঁফদাড়ি। দু'চোখের দৃষ্টি প্রখর। আমায় দেখে গৌঁফের ফাঁকে একটু হাসল। গমগমে গলায় বলল, আমায় চিনতে পারছ?

চিনতে একটু সময় লেগেছিল। তারপরই চিনতে পেরেছিলাম।

তুমি জলেশ্বর না?

যাক চিনতে পেরেছ তা হলে?

আমি ওকে সাদরে ওপরে নিয়ে এসে বসালাম।

আমি যখন সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি তখন সেই দলে জলেশ্বরও ছিল। বাঙালি সাধু, তাই আমাদের ভাব হয়ে গেল। ও বেশ চালাক-চতুর আর করিৎকর্মা ছিল। তবে বড্ড বদমেজাজী। একদিন অন্য এক সাধুর সঙ্গে তর্কাতর্কির সময়ে জলেশ্বর তাকে এমন চড় মেরেছিল যে সাধুটি মরেই গেল। ওর এই হিংস্র প্রকৃতি দেখে আমি ভয় পেয়েছিলাম। অন্য সন্ন্যাসীরা তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তার জন্যে ওর এতটুকু দুঃখ-কষ্ট হয়নি। আমার সম্বন্ধে ওর খুব কৌতূহল ছিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার বাড়ির খবর নিত। আমারে যে বেশ কিছু টাকা-পয়সা আছে জেনে ও জিজ্ঞেস করত তবে কেন সংসার

না করে সন্ধ্যাসী হয়েছি। তারপর ও যখন শুনল সন্ধ্যাসীদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরার আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো শবসাধনা করে সিদ্ধিলাভ করা তখন ও-ও একই ইচ্ছের কথা বলেছিল। তবে এও বলেছিল, শবসাধনা এসব সন্ধ্যাসীদের কন্ম নয়। যদি শিখতে চাও তো চলো অন্য কোথাও যাই।

তারপর ও তো দল থেকে সরে গেল। তার পরের কথা আর জানি না। জানলাম এতকাল পর। শবসাধনার চেষ্টা এখনও ও চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তেমন সুযোগ হচ্ছে না।

তারপর ও জিজ্ঞেস করল আমি কী করছি। বললাম, কিছু না।

ও বলল, কিছুই যদি না কর তাহলে নির্বান্ধব জায়গায় একা পড়ে আছ কেন?

এমনিই। বলে একটু হাসলাম।

জলেশ্বর আমার কথা বিশ্বাস করল না। বলল, নিশ্চয় কিছু করছ। তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছ।

একটু থেমে বলল, আমার কাছে লুকোচ্ছ কেন? আমরা দুজনেই তো একই পথের পথিক।

তখন বলব কি বলব না ভারতে ভারতে বুড়িমার কাছে আমার শবসাধনার কথা বলে ফেললাম। শুনে ও গুম হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তবু তো তুমি কিছু করেছ। আমি তো এগুতেই পারছি না। অথচ হাত গুটিয়ে বসে থাকা আমাদের চলে না। একটা কিছু করতেই হবে।

কি করব ভেবেই পারছি না। ও শবসাধনা আমার দ্বারা হবে না।

শোনো আমি একটা মতলব দিচ্ছি। চেষ্টা করে দ্যাখো।

জিজ্ঞেস করলাম, কী?

মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার।

অবাক হয়ে বললাম, তুমি পাগল হলে নাকি? মড়া বাঁচাতে পারলে তো ভগবান হয়ে যাব।

ও বলল, তুমি কি তা কিছুই করতে পারনি? তা হলে শব নড়ে উঠেছিল কি করে? চমকে উঠলাম। তাই তো!

বললাম, তুমিও তো চেষ্টা করে দেখতে পারো।

জলেশ্বর গম্ভীরভাবে বলল, চেষ্টা করতাম। শুধু দুটো জিনিসের অভাব। এক—মৃতদেহ পাওয়া, দুই—উপযুক্ত জায়গা। আমার থাকার আপাতত কোনো নির্দিষ্ট জায়গা নেই। সেদিক দিয়ে তোমার জায়গাটি বেশ। তুমি ফের চেষ্টা করো। আমিও জায়গা দেখছি। চললাম। একদিন এসে খোঁজ নিয়ে যাব।

### মৃতদেহের সন্ধানে

জলেশ্বর তো চলে গেল। কিন্তু আমার মাথায় একটা অদ্ভুত ভাবনা ঢুকিয়ে দিয়ে গেল। যদি সত্যিই আমি মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করতে পারি, তাহলে আমায় দ্যাখে কে? আমি তো প্রায় সর্বশক্তিমান ভগবান হয়ে উঠব। আর কেনই বা পারব না? বুড়িমার দৌলতে শবসাধনার হাতে খড়ি তো হয়েই আছে। মৃতদেহকে নড়াতে তো পেরেছিলাম।

তখনই মনস্থির করে ফেললাম এই এক্সপেরিমেন্টটা আমায় করতেই হবে। আর এই বাড়িরই একতলার ঘর এই কাজে যথেষ্ট উপযুক্ত হবে।

কিন্তু প্রধান সমস্যা মৃতদেহ পাব কোথায়? ও জিনিসটা তো দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না।

ভাবতে ভাবতে ছোটবেলায় পড়া রূপকথার একটা গল্প মনে পড়ে গেল। এক রাক্ষুসী মরা বাঘের হাড়গোড় যোগাড় করে তাকে বাঘের আকৃতি দিয়ে মস্ত পড়ে জ্যাস্ত বাঘ করে তুলেছিল। হঠাৎ আজ মনে হলো হাড় জোড়া দিয়ে জ্যাস্ত বাঘ করার মস্তগুলো কি নিতান্তই লেখকের কল্পনা? এমনও তো হতে পারে তখনকার দিনের মায়াবিনীরা সত্যিই এমন মস্ত জানত যাতে হাড়ের ওপর দিব্যি রক্ত-মাংস লাগিয়ে তাতে প্রাণ দেওয়া যেত।

একথা মনে হতেই ভাবলাম হাড়গোড় যোগাড় করা যদি সম্ভব নাই হয় একটা কঙ্কাল যোগাড় করে দেখা যাক।

কিন্তু কঙ্কাল পাব কোথায়?

অনেকেরই জানা আছে হাসপাতালে যেসব বেওয়ারিশ মৃতদেহ পড়ে থাকে সেগুলোকে পুঁতে দেওয়া হয়। কিন্তু ইদনিং এইসব মৃতদেহ নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়েছে। কিছু লোক হাসপাতালের জমাদার প্রভৃতিদের গোপনে টাকা দিয়ে এইসব মৃতদেহ নিয়ে যায়। তারপর আরও গোপনে অ্যাসিড দিয়ে গলিয়ে পচিয়ে গোটা কঙ্কালটা বের করে নেয়। তারপর হাসপাতালে যেখানে অ্যানাটমি শেখানো হয় সেখানে অনেক টাকায় বিক্রি করে দেয়। ডাক্তারি পড়তে গেলে গোটা কঙ্কালের দরকার হয়।

এইবার আমি ঐরকম কঙ্কাল-ব্যবসায়ীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। এর জন্যে আমাকে হাসপাতালে হাসপাতালে গিয়ে জমাদারদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করতে হয়েছে। তারপর ঐরকম একজন ব্যবসায়ীর গোপন ডেরার সন্ধান পেয়ে সেখানে গেলাম।

ব্যবসায়ীটি এ তল্লাটে একজন রাজমিস্ত্রি বলে পরিচিত। সে তো প্রথমে ভালো করে যাচিয়ে নিল আমি পুলিশের লোক কিনা। যখন জানল প্রাইভেটে ডাক্তারি পরীক্ষা দেবার জন্যেই আমি একটা গোটা কঙ্কাল খুঁজছি তখন সে দরজা-জানলা বন্ধ করে দু-তিনটে কঙ্কাল বের করে দেখাল। কিন্তু সবকটাতেই খুঁত আছে। হয়তো খুলিটা একটু ফাটা কিংবা একটা আঙুল ভাঙা। এতে আমার কাজ হবে না বলে যখন হতাশ হয়ে চলে আসছি তখন ছুঁচলো মুখ লুঙ্গিপরা লোকটা দুর্গন্ধপূর্ণ অন্ধকার গুদোম ঘর থেকে একটা বেঁটে কঙ্কাল এনে দেখাল। কঙ্কালটা যেন ন-দশ বছরের ছেলের। খড়ির সঙ্গে কী সব ওযুধ মাখানো। লোকটা নিচু গলায় বলল—এটা কাউকে দেখাই না স্যার। এত পুরনো কঙ্কাল বড়ো একটা পাওয়া যায় না। জম্মু-কাশ্মীরের কাছে পুরনো কবর খুঁড়ে এটা পাওয়া গেছে। ওখানকার লোকে বলে এটা এককালের সাংঘাতিক বামন দৌলত খাঁর কঙ্কাল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, এটা বামনের কঙ্কাল?

হাঁ স্যার, দেখছেন না কিরকম মোটা মোটা আঙুল, দেহের তুলনায় কত বড়ো মাথা, বুকের খাঁচাটা কত চওড়া। এ জিনিস পাবেন কোথায়?

এ কঙ্কাল কোনো এক দৌলত খাঁরই হোক আর নসরৎ খাঁরই হোক ও নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমি ওটাই যথেষ্ট বেশি দাম দিয়ে কিনে নিলাম।

কিন্তু এটা অতদূরে আমার বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাব কি করে? কোলে করে তো নিয়ে যাওয়া যায় না।

সে ব্যবস্থা ব্যবসায়ীই করে দিল। ওর চেনাশোনা একটা ছইঢাকা গোরুর গাড়ি ডেকে আনল। কঙ্কালটা আপাদমস্তক কবল দিয়ে মুড়ে নিরাপদে বাড়ি নিয়ে এলাম।

## কঙ্কাল সাধনা

আমার বাড়ির নিচের তলার একটা ঘর বেশ অন্ধকার। সেখানেই পুরু করে খড় বিছিয়ে তার ওপর কঙ্কালটা রাখতে গেলাম। কিন্তু কঙ্কালটা যেন হাত থেকে পিছলে পড়ে গেল। আশ্চর্য হলাম। পড়ে যাবার তো কথা নয়। আমি তো দু'হাত দিয়ে ধরেছিলাম। আর পড়বি তো পর উপুড় হয়ে।

আমি হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে করে কঙ্কালটা চিৎ করে দিলাম। চিৎ করে দিতেই মন হলো কঙ্কালটার চোখের গর্তদুটো যেন কেমন। গর্তের ভিতরে কি যেন চিকচিক করছে। ভাবলাম বুঝি চোখের কোটরে এক ঝাঁক জোনাকি বাসা বেঁধেছে। একটা কাঠি দিয়ে খোঁচালাম। কাঠিটা চোখের গর্ত দিয়ে দিব্যি নেমে গেল। কিছু মাটি ঝরে পড়ল। প্রথমে চিকচিক করতে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম—এ আবার কীরে বাবা! এখন নিশ্চিত্ত হলাম। জানলা বন্ধ করে, দরজায় শেকল তুলে দিয়ে ওপরে উঠে এলাম। মনে মনে বললাম, এখানে আরাম করে কিছুদিন ঘুমোও।

ওপরে উঠে এসেও মনটা কেমন খচখচ করতে লাগল। চোখের কোটরে যে কিছু চিকচিক করছিল সে কি সত্যিই আমার দেখার ভুল? নাকি ভয়ংকর কিছুর ইঙ্গিত?

পরের দিনই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র (বুড়িমা যা যা আনিয়েছিল) কেনার জন্যে শহরে গেলাম। কিন্তু মাংস, মদ, গুড়, তিল, কুশ, মাষকলাই, পিদিম জ্বালাবার জন্যে খাঁটি সর্ষের তেল, এলাচ, লবঙ্গ, কর্পূর, জ্বাতি খয়ের, আদা, পান, যজ্ঞকাষ্ঠ, পঞ্চগব্য প্রভৃতি কিনে আনলাম। শবের (এখন শবের বদলে কঙ্কাল) ওপরে বসবার জন্যে হরিণের চামড়ার বদলে কষ্মলের আসনের ব্যবস্থা হলো।

তারপরে একটা বিশেষ দিন দেখে শাস্ত্রমতে প্রচুর পরিমাণ মাংস ভাত খেলাম। রাত্রেও খাবার কোনো ক্রটি রাখলাম না। তারপর রাতের অন্ধকারে কঙ্কালটি দু' হাতের ওপর শুইয়ে নদীতে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে আনলাম। কঙ্কালটা আকারে ছোটো হলেও বেশ ভারী। বইতে কষ্ট হচ্ছিল। যাই হোক কোনোরকমে বাড়ি এনে কাচা শুকনো কাপড় দিয়ে মুছিয়ে দিলাম। তারপর কুশের অভাবে খড়ের বিছানায় বুড়িমার সেদিনের নির্দেশ মতো কঙ্কালটাকে পূর্ব দিকে মাথা করে উপুড় করে শুইয়ে দিলাম (মনে পড়ল কঙ্কালটা আমার হাত থেকে পড়েছিল উপুড় হয়েই)। সর্বাঙ্গে চন্দন মাখিয়ে দিলাম। কেবলমাত্র হাড়ের ওপর কি চন্দন মাখানো যায়? গড়িয়ে পড়তে লাগল। তা আমি আর কি করব? সবটাই তো একটা পরীক্ষার ব্যাপার। এরপর ধূপ জ্বালালাম। তারপর কঙ্কালের ওপর কষ্মলের আসন পেতে ঘোড়ায় চড়ার মতো বসলাম। অমনি হাড়গুলো নড়বড় করে উঠল। আমার তখনই কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। কেননা আমি জানি ফাঁকি দিচ্ছি। শবসাধনার নামে কবেকার একটা বামনের কঙ্কাল নিয়ে ছেলেখেলা করছি। শবসাধনার নামে আমি কঙ্কাল সাধনা করছি।

তবু আমি নানারকম প্রাথমিক ক্রিয়াগুলি সেরে ফেললাম। তারপর চোখ বুজিয়ে গম্ভীরস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করলাম, ওঁ ফট্। তারপর বললাম, ওঁ হুঁ মৃতকায় নমঃ। হে মৃত ব্যক্তি, তুমি যে-ই হও তোমাকে নমস্কার। তারপর তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিলাম।

এইভাবে অনেক রাত পর্যন্ত ধ্যান করতে লাগলাম। অন্ধকার ঘরে শুধু পিদিমের আলো জ্বলছে। ধূপের ঘোঁয়াগুলো অদ্ভুত আকৃতি নিয়ে চোখের সামনে নাচতে লাগল। আমার কেমন ভয় করতে লাগল। একটু পরেই মনে হলো কঙ্কালটা যেন নড়ছে। আমার মাথা ঝিমঝিম

করতে লাগল, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, ঘামে গা ভিজ়ে গেল।

দরকার নেই বাবা। মনে মনে এই কথা বলে এক লাফে নেমে পড়লাম।

ওটাকে ঐভাবে ফেলে রেখেই বাইরে থেকে দরজায় শেকল তুলে ওপরে উঠে এলাম। দরজা বন্ধ করার সময় স্পষ্ট গুনলাম কঙ্কালটার হাড়গুলোয় খট খট করে শব্দ হচ্ছে।

### ভয়ংকরের জাগরণ

এ ঘরে ঢুকি না বটে কিন্তু কী একটা তীব্র আকর্ষণ আমায় ঐ ঘরের দরজা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। আর এই আকর্ষণটা তীব্রতর হয়ে ওঠে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে।

একদিন, তখন বেলা পড়ে এসেছে, নিচের তলাটা এরই মধ্যে অন্ধকার—আমি যেন আমার অজান্তেই দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ানলাম। গোটা বাড়িটা নিঝুম, নিস্তব্ধ। হঠাৎ মনে হলো ঘরের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ। চমকে উঠলাম। এ তো মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। কিন্তু—

কিন্তু এ ঘরে মানুষ কোথায়? তবে কি কোনো জন্তু—

না-না, এ জন্তু নয়, জন্তু ঢুকবেই বা কি করে? এ নিঃশ্বাস মানুষের। আমার মেরুদণ্ড দিয়ে একটা হিমশ্রোত বয়ে গেল। সর্বাস্থে কাঁটা দিয়ে উঠল। বুঝতে পারলাম ঘরে জীবিত কেউ আছে।

ভয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এলাম। তারপর দরজা বন্ধ করে বিছানার ওপর পা গুটিয়ে বসে রইলাম।

এই বাড়িতে বেশ কিছুকাল ধরে একাই থাকি। কোনো দিন ভয় পাইনি। আজ মনে হলো এত বড় বাড়িতে আমি আর একা নই। অন্য কেউ আছে, সে আর যাই হোক মানুষ নয়। আমার গা-হাত-পা কাঁপতে লাগল।

সাধারণত মাঝরাতে আমার ঘুম ভাঙে না। কিন্তু সেদিন ঘটল ব্যতিক্রম।

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো মাথার কাছে বন্ধ জানলাটা বাইরে থেকে কেউ খোলবার চেষ্টা করছে। চমকে উঠে বসলাম—চোর নাকি?

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে কান পেতে রইলাম।

কিছুক্ষণ কোনো শব্দ নেই। তার পরেই শব্দ—খট—খট—

কেউ যেন জানলার পাল্লা ধরে টানছে।

আমি সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করে উঠলাম, কে?

শব্দটা থেমে গেল। কিন্তু মিনিট দুই পরেই অন্যরকম শব্দ হলো—ধূপ। কিছু একটা ভারী জিনিস যেন জানলা থেকে পড়ে গেল। অথবা কেউ লাফিয়ে পড়ল। তারপরেই শুকনো পাতা মাড়িয়ে কিছু যেন দ্রুত চলে গেল।

সে রাতে আর ঘুম হলো না। কে এসেছিল দোতলার জানলায়—কেনইবা জানলা খোলবার চেষ্টা করছিল কিছুই বুঝতে পারলাম না। হাতের কাছে টর্চ ছিল। কিন্তু জালবার সুযোগ হয়নি।

সত্যিই কি চোর কিংবা ডাকাত উঠেছিল? কিন্তু চোরই হোক বা ডাকাতই হোক উঠবে কি করে? এ দিকের দেওয়াল থেকে জল পড়ার কোনো পাইপ নেই। আর দেওয়াল বেয়ে দোতলায় ওঠা কোনো মানুষের সাধ্য নয়। তবে কি লোকটা মই নিয়ে এসেছিল?

তা হতে পারে। কিন্তু নামবার সময়ে লাফ দিয়ে পড়ল কেন?

কী জানি।

পরের দিন সকালে জানলার নিচে কোনো ফেলে যাওয়া মই দেখতে পাইনি।

এইভাবে নানা সংশয়ে সন্দেহে আমি যখন দোদুল্যমান তখনই আর একদিন রাতে এই কাহিনীর প্রথমেই যে ঘটনার উল্লেখ করেছি সেই ঘটনাটা ঘটল।

ইদানিং রাতে ভালো করে ঘুম হতো না। কেবলই মনে হতো আবার বুঝি কেউ জানলার কপাট খোলবার চেষ্টা করছে। চোর-ডাকাতে করছে জানলেও নিশ্চিত হয়ে পারতাম। কেননা চোরের কাছ থেকে সাবধান, সতর্ক হওয়া যায়। কিন্তু অন্য কিছু হলে—

দ্বিতীয় রাতের ঘটনায় কেউ একজন যেন কাঠের পা নিয়ে খট খট করে দোতলায় উঠে আসছিল। কে আসছিল? যে সেদিন জানলা ভেঙে ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করছিল সেই কি?

যে আসছিল সে যে আমার মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন? আমাকে তার কীসের দরকার?

একথা মনে হতেই ভয়ে আমার চুলগুলো খাড়া হয়ে ওঠে।

পরের দিন সকালেই নিচের ঘরের সামনে গিয়ে দেখি দরজা তেমনি শেকল তোলাই রয়েছে। কিন্তু খিড়কির দরজাটা খোলা।

আশ্চর্য! কে খুলল দরজাটা? পিছনের দরজা তো বন্ধই থাকে।

আমি তখনই বেরিয়ে পড়লাম। এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে নদীর ধারে চলে এলাম। হঠাৎ নজরে পড়ল বালির ওপর পায়ের চিহ্ন। সে পদচিহ্ন পূর্ণবয়স্ক মানুষের নয়, কোনো বালকেরও নয়। এক বিঘতেরও কম লম্বা কিন্তু বেশ গভীর। গভীরতা দেখে বোঝা যায় যার পায়ের চিহ্ন সে ওজনে ভারী। তা ছাড়া লক্ষ্য করলাম আঙুলগুলো অস্বাভাবিক ফাঁক ফাঁক। হাড়গুলো তুলনায় সরু।

আমি সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করে চললাম শালবনের দিকে। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে বেশিদূর চিহ্নগুলো খুঁজে পেলাম না।

ফিরে আসব ভাবছি হঠাৎ জঙ্গলের একপাশে পাঁচ-ছটা বাদুড় মরে পড়ে আছে দেখলাম। সব কটাই খণ্ড-বিখণ্ড। এতগুলো বাদুড় একসঙ্গে কি করে মরল আর কেই বা সেগুলোকে অমন করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে তা বোধগম্য হলো না। পরিষ্কার বোধগম্য না হলেও কেমন একটা সন্দেহ মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগল। যিনি একদিন আমার জানলা ভাঙতে গিয়েছিলেন কিংবা গভীর রাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে চেষ্টা করেছিলেন সেই বামন-দেবতাটির কাজ নয় তো? ভাবতেও সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

এতদিন নির্জন বাড়িতে একা একা বেশ ছিলাম। কী কুক্ষণে জলেশ্বর এসে আমার মাথায় মরণখেলার নেশা ঢুকিয়ে দিয়ে গেল!

বাড়ি ফিরেই শেকলবন্ধ দরজার কাছে এসে দাঁড়লাম। দরজা খুলতে সাহস হলো না। জানলাটা একটু ফাঁক করে দেখলাম তিনি খড়ের বিছানায় দিবা শান্তভাবে শায়িত রয়েছেন।

ক'দিন পর সেটা ছিল বোধহয় রবিবার। আমার বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরে বাজারের দিকে যেতে যে ফাঁকড়া রাস্তাটা একটা বাঁক খেয়ে শালবনের দিকে গেছে সেই মোড়ে পৌঁছাতেই দেখলাম লোকের জটলা। সবারই মুখে-চোখে আতংকের ছাপ। ভাবলাম সাত-সকালে কী এমন ঘটল?

একে-ওকে জিজ্ঞেস করে যা জানলাম তা রীতিমতো ভয়ংকর ব্যাপার। গত রাতে কয়েকজন লোক শালবনের পাশ দিয়ে মড়া নিয়ে কবরখানার দিকে যাচ্ছিল। শববাহীরা আগে আগে চলছিল। পিছনে জনা তিনেক। তাদের হাতে লণ্ঠন, শাবল, কোদাল। হঠাৎ তারা নাকি দেখে মানুষের মতো একটা জীব—প্রায় কঙ্কালসার, তাদের পথ আগলে দাঁড়াল।

আমার বুকটা কেঁপে উঠল। কোনোরকমে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, লোকটা লম্বায়-চওড়ায় কিরকম?

সেও অদ্ভুত মশাই! এই আমার কোমর পর্যন্ত।

শুনে আমি টোক গিললাম।

তারপর?

তার চোখ দুটো চিকচিক করে জ্বলছিল। হঠাৎ অন্ধকারে শালবনের মধ্যে ঐরকম একটা বীভৎস মূর্তি দেখে সকলে চিংকার করে উঠেছিল। অদ্ভুত জীবটা অমনি লাফ দিয়ে মড়ার মাচায় উঠে মড়াটা টেনে নিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সবাই স্বচক্ষে দেখেছে মশাই।

তারপর?

শবযাত্রীরা তো 'পিশাচ' 'পিশাচ' বলে ভয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

আমি একরকম হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

তারপর আজ সকালবেলায় মড়াটা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় শালবনের ধারে পাওয়া গেছে। পুলিশ জায়গাটা ঘিরে আছে। একবার যান না। দূর থেকে দেখে আসুন।

উত্তর না দিয়ে আমি বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম শাস্ত্রের নিয়ম ঠিকমতো না মেনে শবসাধনার বদলে কঙ্কাল সাধনা করতে গিয়ে এই অদ্ভুত জীবের সৃষ্টি করে ফেলেছি। শুধু অদ্ভুত জীবই নয়, ওটা আবার ভয়ংকর মাংসাশী হয়ে উঠেছে। ও যে এখন কতজনের সর্বনাশ করবে তার ঠিক নেই। আমিও নিস্তার পাব না।

বাড়ি পৌঁছেই আমি নিচের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়লাম। দরজা বন্ধই আছে। জানলা ফাঁক করে দেখলাম বামন বাবাজি তাঁর কঙ্কালখানি নিয়ে শান্তভাবে পড়ে আছেন। বুঝলাম সারারাত ঘুরে শেষে এই ঘরেই এসে একটু বিশ্রাম নেন। এই ঘরটা যেন ওনার নিজের হয়ে গেছে।

সেদিন সকালবেলায় পাড়ার মুদির দোকান থেকে চাল-ডাল কিনতে গেলাম। দেখি কয়েকজন বসে গম্ভীরভাবে কি নিয়ে আলোচনা করছে। আমায় দেখে মুদির দোকানের মালিক রাজেন ঘোষ বললে, এই যে মল্লিকমশাই, খবর সব শুনেছেন তো?

বুঝতে পারলাম কি বলতে চাইছে। তবু না বোঝার ভান করে বললাম, কী খবর?

সে কি মশাই, গোটা গাঁয়ে হৈ-চৈ পড়ে গেছে, লোকে ভয়ে কাঁপছে আর আপনি কিছুই জানেন না?

আমতা আমতা করে বললাম, ও হ্যাঁ, শুনেছি বটে কোথা থেকে একটা পিশাচ দেখা দিয়েছে।

শুধু পিশাচ? ওটা না পুরোপুরি পিশাচ, না ব্রহ্মদত্তি, না ভূত। পশু-পাখি, জীবজন্তু যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে। এমনকি মড়া পর্যন্ত। এবার জ্যাস্ত মানুষ ধরে ধরে খাবে।

আমি চুপ করে শুনে গেলাম। বেশি কথা বলতে সাহস পেলাম না। কিন্তু মারাত্মক খবরটা দিল র্যাশনের দোকানের কমল গড়াই। বললে তার স্ত্রী নাকি অনেক রাতে আমার বাড়ির কাছে ঘোরামুরি করতে দেখেছিল স্রেফ হাত দুয়েক লম্বা একটা জ্যাস্ত কঙ্কালকে। মাথাটা তার ইয়া বড়।



আশ্চর্য হয়ে বললাম, আমার বাড়ির কাছে?

হ্যাঁ। আপনি একটু সাবধানে থাকবেন।

চাল-ডাল কিনে চুপচাপ বাড়ি চলে এলাম।

একদিন বিকেলে আকাশ ছেয়ে মেঘ করেছে। সেই সঙ্গে শুরু হলো ঝড়। জানলা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি, ছাদের আলসেতে আমার কাপড় শুকোতে দিয়েছিলাম, সেটা উড়ে যাচ্ছে।

কী আশ্চর্য! আমি কাপড়টা গিট বেঁধে দিইনি?

কাপড়টা দিব্যি বাতাসে ঢেউ খেলিয়ে উড়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে কাপড়টা উদ্ধার করতে ছুটলাম। কাপড়টা গিয়ে একটা আমগাছের ডালে আটকে গেল। কোনোরকমে ডিঙি মেরে একটা কঞ্চির সাহায্যে ওটা পেড়ে নিলাম।

প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে বাড়ি ফিরে দোতলায় উঠতে যাচ্ছি—খট খট শব্দ। তাড়াতাড়ি থামের আড়ালে লুকোলাম। দেখলাম কঙ্কালটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। ভাগ্যি আমি ওপরে ছিলাম না।

অদ্ভুত আকৃতির কঙ্কালটা তার দেহটা টানতে টানতে আর বিরাট মাথাটা নাড়তে নাড়তে নির্দিষ্ট ঘরের দিকে চলে গেল। হয়তো এবার ও নিজেই শেকল খুলে ঘরে ঢুকবে।

ও তাহলে দোতলাতেও উঠতে আরম্ভ করেছে। এইটে আরও ভয়ের ব্যাপার। ও আমাকে খুঁজছে। কেন? নিশ্চয় আমার সঙ্গে গল্প করার জন্যে নয়।

আমার হাত-পা হিম হয়ে গেল। এরপর একা বাড়িতে এই মূর্তিমান আতঙ্কটির সঙ্গে থাকব কি করে? না থেকেই বা যাব কোথায়? চিরকালই তো আমি লোকালয় থেকে দূরে থেকেছি। কিন্তু একটা কথা ভেবে পাচ্ছি না—কঙ্কালটা এমন হিংস্র হয়ে উঠল কেন? এর পেছনে কি কোনো ইতিহাস আছে?

যার কাছ থেকে এটা কিনেছিলাম সে বলেছিল এটা নাকি এককালের সাংঘাতিক বামন দৌলত খাঁর কঙ্কাল।

সে কতকাল আগের? কী এমন সাংঘাতিক কাজ করেছিল দৌলত খাঁ?

ভাবলাম ওর ইতিহাস আমায় জানতেই হবে। আর এটা জানাতে পারে সেই ব্যবসায়ীটিই।

সেইদিনই আমি ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করতে অনেক দূরে এক অখ্যাত গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

### পর্বতনিবাসী দৌলত খাঁ

ব্যবসায়ীর নাম ইদ্রিশ আলি। এদিনও সে পরনে লুঙ্গি জড়িয়ে একজনের সঙ্গে বাড়ি মেরামতির খরচ-খরচার হিসেব কষছিল। আমাকে চিনতে পারেনি। একটু বসতে বলে লোকটির সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে আমার দিকে তাকাল।

বলুন স্যার।

আমার পরিচয় দেবার পর ও মনে করতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর বদলে ফিস ফিস করে বলল, জিনিসটা ভালোই দিয়েছিলাম কি বলুন? আপনার ডাক্তারি শেখা হচ্ছে তো?

প্রকৃত ঘটনা চেপে গিয়ে বললাম, এ তো সাংঘাতিক জিনিস ভাই। ওটা মাঝে মাঝে নড়ছে।

ইদ্রিশ আলি চমকে উঠল। বলেন কী?

বললাম, হ্যাঁ, সত্যি। নইলে এতদূর ছুটে আসব কেন?

ইদ্রিশ অবাক হয়ে বললে, কিন্তু আমার কাছে এতদিন ছিল, কখনও তো নড়তে দেখিনি।

তারপর বলল, যাই হোক সাবধান, ওটা শুনেছি দৌলত খাঁর কঙ্কাল। সাংঘাতিক বামন ছিল। কত যে খুন করেছিল তার হিসেব নেই। ওটা কিন্তু আর ফেরত নিতে পারব না।

বললাম, ফেরত দেবার কথা ভাবছি না। আমি এসেছিলাম ঐ দৌলত খাঁর কথা জানতে। খুব কৌতূহল হচ্ছে। আপনি কি কিছু জানাতে পারেন?

ইউদ্রিশ আলি বললে, ঐ যতটুকু বললাম তার চেয়ে বেশি জানি না। জানবার ইচ্ছেও নেই। আমি গোপন ব্যবসা করি এই পর্যন্ত। তাছাড়া দৌলত খাঁর ব্যাপার তো বহুকাল আগের।

বললাম, ওর সম্বন্ধে আর কেউ বলতে পারেন কি?

ইদ্রিশ একটু ভেবে বললে, যার কাছ থেকে এটা পেয়েছিলাম হয়তো একমাত্র সেইই বলতে পারে।

তার ঠিকানাটা আমায় দেবেন? বলেই পাঁচটা একশো টাকার নোট ওর হাতে গুঁজে দিলাম।

ইদ্রিশ যে খুশি হলো তা ওর চোখ-মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম।

ও বললে, তা না হয় দিচ্ছি। কিন্তু সে তো অনেক দূর। সেই জম্মু-কাশ্মীর পহেলগাম্ ছাড়িয়ে আচ্ছাবাল্। আপনাকে অবশ্য প্রথমে জম্মুতেই নামতে হবে। তারপর—

বললাম, যত দূরই হোক দৌলত খাঁর ইতিহাসটা আমায় জানতেই হবে।

ইদ্রিশ ঠিকানা লিখে দিল। ঠিকানাটা নিয়ে আমি চলে আসছিলাম, ইদ্রিশ পিছু ডাকল, আরে ও মশাই! শুধু ঠিকানা পেলেই হবে? যারা কবর খুঁড়ে পুরনো কঙ্কাল বের করে তারা যে কী সাংঘাতিক তা ভাবতে পারবেন না। পুলিশের স্পাই মনে করে ওরা হয়তো জ্যাস্ত পুঁতে ফেলে আপনাকেই কঙ্কাল বানিয়ে দেবে।

আমি হতাশ হয়ে বললাম, তা হলে উপায়?

দাঁড়ান, একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, বলে আমার সামনে বসেই উর্দুতে একটা চিঠি লিখে দিল। তারপর খামের ওপর একটা লাল ছাপ মেরে দিল।

এবার নিশ্চিত মনে যান। দেখবেন চিঠিটা যেন না হারায়। তবু যদি বিপদে পড়েন তাহলে বলবেন, ইদ্রিশের মাথায় একগাদা উকুন হয়েছে, মনে থাকবে?

হেসে বললাম, হাঁ ধন্যবাদ।

বুঝলাম কথাটা সাংকেতিক।

ইদ্রিশ ফের ডেকে বলল, আর শুনুন, এইভাবে ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা ‘বাবু’ সেজে গেলে সন্দেহ এড়াতে পারবেন না। ফকির সেজে যাবেন। বলবেন দেশভ্রমণ করেন। নানা জায়গার কবরের উপর কেতাব লিখবেন।

আমি বললাম, তাই করব। কিন্তু ফকির কেতাব লিখবে!

কেন? ফকির হলে বুঝি পড়া-লেখা জানতে নেই?

তা বটে। ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলাম।

ফকির, সন্ন্যাসী সাজা আমার পক্ষে কোনো ব্যাপার নয়। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই তো আমি সাধু-সন্ন্যাসী সেজে ঘুরে বেড়িয়েছি, এবার না হয় ফকির সাজলাম। বড়ো বড়ো

চুল তো ছিলই। অল্প দাড়ি, একটু ছেঁটে কেটে ঠিক করে নিলাম। কালো একটা আলখাল্লা পরলাম। কালো একটা বড়ো বুলি, চোখে সূর্য্য, গলায় কাচ-পাথরের মালা। ব্যস, একেবারে নির্ভেজাল ফকির বনে গেলাম। তারপর একদিন শেয়ালদা থেকে জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেসে চড়ে বসলাম। মনে বেশ আনন্দ। কত দিন পর দেশভ্রমণে চলেছি। তা ছাড়া ঐ হতভাগা কঙ্কালটার হাত থেকেও কিছুদিন রেহাই পাব।

পাক্ষা দু'রাতির কাটিয়ে জম্মু। সেখানে সকালে বাসে উঠে শ্রীনগর। রাতিরটা একটা ছোটোখাটো হোটেলে কাটিয়ে পরের দিন পহেলগাম্। সেখান থেকে 'মটান' হয়ে 'আচ্ছাবাল্'।

আঁকারীকা পাহাড়ী রাস্তা। মাঝে মাঝে ঝর্ণা। গোড়ালি ডোবা সরু নদী। কখনও কখনও ছোট ছোট ঘরবাড়ি। এখানেই রয়েছে মোগল বাগান। কাছের ভূঙ্গী নদীর জলধারা পাহাড় ভেঙে এখানে ঝর্ণা হয়েছে। আর এখানেই ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান-কন্যা মোগল উদ্যান তৈরি করলেন যার সুন্দর সবুজ লনে কেয়ারি করা অজস্র রঙ-বেরঙের ফুলের মাধুর্য ছড়িয়ে আছে, স্বপ্নের মতো।

কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করার মতো মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না। জালালুদ্দিনের ঠিকানা খুঁজে বের করতেই হবে। জানতে হবে বামন দৌলত খাঁর ইতিহাস। এটা খুব সহজ কাজ নয়।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর জালালুদ্দিনের সন্ধান পেলাম। এখানে ছোটো একটা সরাইখানা চালায়। যেমন লোক দেখানো রাজমিস্ত্রির কাজ ইন্ড্রিশের।

একটা ছোটো ঘরে বসে ছিল তিনজন। লম্বা-চওড়া চেহারা। চোয়াল শক্ত। চোখগুলো সাপের মতো। এরা যে শুধু পুরনো কবর খুঁড়ে কঙ্কাল চুরি করে তা নয়, বোধ হয় আরও কিছু ভয়ানক কাজটাজ করে।

চিঠিটা একজনের হাতে দিয়েই খামের ওপর নাম পড়ে সে আর একজনকে দিল। তার একটা চোখ কানা। সম্ভবত সেই জালালুদ্দিন, কেননা চিঠিটা সেই খুলে পড়ল।

চিঠিটা পড়ে সে প্রথমে একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। তারপর চিঠিটা অন্যদের হাতে দিল। চিঠিটা তিনজনেই পড়ল। এবার আমাদের কথাবার্তা শুরু হলো। ওরা উর্দু-হিন্দি মিশিয়ে কথা বলছিল। ভাঙা ভাঙা বাংলাও জানে। ওদের প্রশ্ন করার ভঙ্গি থেকে বুঝলাম, আমি যে কেতাব লেখার জন্যে দৌলত খাঁর ইতিহাস জানতে চাইছি তা ওরা বিশ্বাস করছে না। শুধু অবিশ্বাস করাই নয় আমি যে একটা প্রতারণা এমন সন্দেহও করছিল। আমি ওদের বোঝাতে চাইলাম, চিঠিটি ইন্ড্রিশ আলি নিজে লিখেছে। হাতের লেখা মিলিয়ে দ্যাখো।

সে কথার উত্তরে একজন বলতে চাইল, চিঠিটা জাল হতে পারে।

বললাম, কিন্তু লাল ছাপটা?

ওটা ইন্ড্রিশের বলেই মনে হয়।

তা হলে?

ওরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। সন্দেহ তবু ঘোচে না। আমাকে পুলিশের লোক ভেবেছে। আমি যে পুলিশের লোক নই তা প্রমাণ করতে না পারলে আমায় মরতে হবেই। আমি করুণ চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আচ্ছা ফকিরসাহেব, ইন্ড্রিশ কি আর কিছু বলেছে আপনাকে?

কই না তো। বলেছে এই চিঠিখানা দিলেই তুমি যা জানতে চাইছ তা জানতে পারবে।

ওদের একজন খেঁকিয়ে উঠে বলল, ব্যস! আর কিছু বলেনি?

না, আবার কী বলবে?

ওরা তিনজন চোখে চোখে কথা বলে নিল। বুঝলাম বিপদ আসন্ন।

ওরা বলল, চলুন ফকিরসাহেব, বিশ্রাম করবেন। বলে আমায় পাশের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিল।

আমি প্রমাদ গুণলাম। বুঝলাম আমার আর মুক্তি নেই। আমায় ওরা বিশ্বাস করছে না।

দুদিন কেটে গেল বন্দী অবস্থায়। আমার কেবলই মাথায় ঘুরছিল ইদ্রিশ কি আর কিছু বলেছিল?

না। আর কি বলবে?

ও হ্যাঁ, বলেছিল ফকিরের বেশ ধরতে হবে! তা তো আমি ধরেছি। কিন্তু আর তো কিছু বলেনি।

সেদিন দুপুরবেলায় ওদের একজন ঘরে ঢুকে উর্দু-হিন্দি মিশিয়ে যে কথাটা বললে, বাংলা করলে তা দাঁড়ায় এইরকম—

কি ফকিরসাহেব, কি মতলবে এসেছ খোলাখুলি বলো তো।

বললাম, ইদ্রিশের চিঠিতেই তা লেখা আছে।

ও চিঠি জাল।

না, জাল নয়।

জাল যদি নাই হয় তা হলে ইদ্রিশ আর কি বলেছে বলো।

না, ও আর কিছু বলেনি।

লোকটা হা হা করে হেসে উঠল। বলল, তা হলে তুমি ধাপ্পাবাজ। আর ধাপ্পাবাজের শাস্তি কি জানলা দিয়ে তাকিয়ে দ্যাখো।

দেখলাম দুজন লোক একটা জায়গায় কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে।

হায় ভগবান! ওরা আমার কবর খুঁড়ছে।

লোকটা দরজায় তালা বন্ধ করে চলে গেল। আর আমি আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে গুম হয়ে রইলাম। কী কুক্ষণে ঐ বামনের কঙ্কালটার ইতিহাস জানতে এসেছিলাম! এর চেয়ে ওটার হাতে মরণ ভালো ছিল। তবু নিজের বাড়িতে মরতে পারতাম। কিন্তু...ইদ্রিশ যেন আরও কি বলেছিল। ইস্! মনে পড়েছে না তো। হ্যাঁ, বলেছিল চিঠি পড়েও যদি ওরা বিশ্বাস না করে তা হলে বলো—

কী যেন বলতে বলেছিল...ইদ্রিশের কি একটা রোগ হয়েছিল? উদ্রি? ভিরমি? মাথার গণ্ডগোল? না—না, রোগটোগ নয়, তা হলে? তা হলে যে কী তা কিছুতেই মনে পড়ল না—একটা সাংঘাতিক কথা....

সামান্য একটা কথা ঠিক সময়ে কিছুতেই মনে না পড়লে তার যে কী অপরিসীম যন্ত্রণা—

এমনি সময়ে দরজা খুলে তিনজনই ঢুকল। হাতে ছোরা।

ফকিরসাহেব!

হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে ইদ্রিশ কিছু একটা বলেছিল, কিন্তু আমি মনে করতে পারছি না। আমায় একটু সময় দাও।

না। তুমি মিথ্যাবাদী! বলে একজন আমার চুলের মুঠি ধরতেই আমার স্মৃতির দরজা হাট করে খুলে গেল। আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, মনে পড়েছে....মনে পড়েছে—ইদ্রিশ বলেছিল ওর মাথায় একগাদা উকুন হয়েছে।

বাস! যেই একথা বলা অমনি যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ল। ওরা ছোঁরা ফেলে দিয়ে আমার পায়ে আছড়ে পড়ল। বলল, ফকিরসাহেব ক্ষমা করো। আমাদের ভুল হয়েছিল।

তারপর আমার দারুণ খাতির, খানাপিনা, আদর-আপ্যায়ন—

সে সব মিটতে জালালুদ্দিন দৌলত খাঁর সুদীর্ঘ ইতিহাস আমায় যা শোনাল তা সংক্ষেপে এইরকম—

অনেক দিন আগে একবার নেপালের রাজা হিমালয়ের সংলগ্ন গাড়োয়াল রাজ্য আক্রমণ করেন। গাড়োয়ালরাজ যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে নিজের রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যান। নেপালীরা রাজপ্রাসাদ, দুর্গ দখল করে যথেষ্ট অত্যাচার চালায়।

গাড়োয়ালরাজ উপায়ান্তর না দেখে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করেন। আর ইংরেজদের সাহায্যে নেপালীদের তাড়িয়ে গাড়োয়ালকে ফের স্বাধীন করেন। কিন্তু এর জন্যে ইংরেজকে গাড়োয়ালের অনেকখানি দিয়ে দিতে হয়। এই অংশ ব্রিটিশ গাড়োয়াল নামে পরিচিত হয়। বাকি অংশ স্বাধীন গাড়োয়াল।

গাড়োয়ালরাজ কিন্তু তাঁর রাজধানীতে আর ফিরে এলেন না। রাজধানী থেকে বত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অলকানন্দার অপর পারে টিহরীতে নতুন করে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর নতুন পরিচয় হলো টিহরীরাজ।

গাড়োয়ালের মধ্যে দেবপ্রয়াগ একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে একটি পুরনো মন্দির আছে। তার মধ্যে রামসীতার মূর্তি। এই মন্দিরের অধিকারী টিহরীর রাজা। মন্দিরে অনেক ধনসম্পত্তি লুকনো আছে। টিহরী রাজ্যের নিয়ম—রাজার মৃত্যু হলে তাঁর নিজের ব্যবহারের সব জিনিস এই মন্দিরে রাখা হয়।\*

এই গাড়োয়ালের এক পর্বতগুহায় একটা অদ্ভুতদর্শন লোক ছিল। আকারে বেঁটে। মাথাটা দেহের তুলনায় অনেক বড়ো। সেই মাথায় রৌওয়া রৌওয়া চুল। ভয়ংকর দুটো চোখ। আঙুলে হিংস্র জন্তুদের মতো বাঁকানো নখ। সে লোকালয়ে বড়ো একটা আসত না। জীবজন্তু মেরে খেত। ক্ষুদ্রে রাক্ষসজাতীয় আর কি।

যারা তাকে দেখেছিল তারা ভয়ে পালাত। তার কি জাত কি ধর্ম তা কেউ জানত না। তার একমাত্র পরিচয় ছিল ‘পাহাড়ী শয়তান’। কত যে তার বয়সে কেউ বুঝতে পারত না। কে যে কেন তার নাম দৌলত খাঁ রেখেছিল তাও জানা যায় না।

ক্রমে সে লোকালয়ে আসতে আরম্ভ করল। ইচ্ছে করলেই অসাধারণ তৎপরতায় সে মানুষ খুন করতে পারত।

ওদিকে নেপালরাজ প্রতিশোধ নেবার জন্যে নানারকম ফন্দি আঁটছেন। তিনি যখন দৌলত খাঁর মতো হিংস্র বামনের কথা শুনলেন তখন গোপনে তাকে ডেকে পাঠালেন। তার ওপর ভার দেওয়া হলো টিহরীরাজ্যে সন্ত্রাস চালাতে হবে যাতে টিহরীরাজ জন্ম হন।

দৌলত খাঁর এটা বেশ মনের মতো কাজ হলো। অহেতুক নরহত্যা ওর দারুণ আনন্দ। গভীর রাতে সে টিহরীর পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। যাকেই পায় তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে নৃসিংহ অবতারের মতো পেট চিরে ফেলে। অথচ তাকে কেউ ধরতে পারে না। ধরতে পারে না তার কারণ রাতের অন্ধকারে সে তার ছোট্ট দেহটা নিয়ে চটপট লুকিয়ে পড়তে পারে। শুধু তাই নয়, দু’মিনিটের মধ্যে গাছে ওঠা বা উঁচু পাঁচিলে ওঠা তার পক্ষে কিছুই নয়।

এমনি ভাবে কত যে সে নরহত্যা করেছে তার হিসেব নেই।

\* দ্রঃ হিমালয় : দেবপ্রয়াগের পথে—জলধর সেন।

এমনি সময়ে নেপাল থেকে রাজার এক চর ওর কাছে এসে বলল, রাজার ইচ্ছে দেবপ্রয়াগে টিহরীরাজের রামসীতার মন্দিরে যে বিপুল ধনসম্পত্তি আছে তা এনে দিতে হবে।

দৌলত খাঁর ধনদৌলতে লোভ ছিল না। টাকা-পয়সা নিয়ে কী করবে? তার আনন্দ ছিল লুঠ-পাট, খুন-খারাপিতে।

নেপালরাজের আদেশ পাওয়া মাত্র সে একদিন রামসীতার মন্দিরে অভিযান চালালে। সেই মন্দিরে একজন সাধক থাকতেন। দৌলত খাঁ তাঁকে হত্যা করতে গেল আর ঠিক তখনি মন্দিরের ভেতর থেকে একটা বিষধর সাপ সাধকের কোলের ওপর দিয়ে এসে দৌলত খাঁকে কামড়ে দিল। মরবার মুহূর্তে দৌলত খাঁ বুঝে গেল ঐ সাধকই তাকে মেরেছে।

এই হলো দৌলত খাঁর ইতিহাস। তারই কঙ্কাল আমার বাড়িতে দিব্যি অধিষ্ঠান করছে।

### জলেশ্বরের পুনরাবির্ভাব

এক বুক দুর্ভাবনা নিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে এলাম। কঙ্কালটা কেন যে এত ভয়ংকর হিংস্র তা বুঝতে পারলাম। এও বুঝলাম যেহেতু একজন সাধক তার মৃত্যুর কারণ সেজনে দৌলত খাঁর হাত থেকে আমারও নিষ্কৃতি নেই। অথচ দিনের পর দিন দৌলত খাঁর কঙ্কালের সঙ্গেই আমায় থাকতে হবে। কিভাবে ওটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব তা ভেবে পেলাম না।

এখানে পৌঁছবার পর দিনই শহরে গিয়ে মিস্ত্রি ডেকে এনে দোতলায় সিঁড়ির মুখে আর প্রত্যেকটা জানলায় মোটা গ্রিল বসিয়ে নিলাম। অনেকটা নিশ্চিত হলেও পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারলাম না। লোহার গ্রিল দিয়ে চোর-ডাকাত ঠেকানো যায়, কিন্তু প্রেতাঙ্গা? আধুনিক গেট, গ্রিল কি ওদের আটকাতে পারে?

তাহলে?

আমি গ্রামের মানুষ। ভূত-প্রেতের বহু ঘটনা জানি। ওঝারা কি করে ভূত তাড়ায় তাও আমি দেখেছি। তাই তখনই একটা উপায় মাথায় খেলে গেল। বাঁশঝাড় থেকে একটা কাঁচা বাঁশ কেটে এনে তার দু'প্রান্ত খানিকটা পুড়িয়ে নিলাম। তার পর বাঁশটা একতলার সিঁড়ির মুখে আড়াআড়ি করে ফেলে রাখলাম। ওঝাদের মুখে শুনছি কোনো অশরীরীর ক্ষমতা নেই এই বাঁশ ডিঙেয়।

এবার প্রায় পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে ঘরের দরজায় কোলপসিবল গেট, গ্রিল বন্ধ করে একরকম স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে বসে থাকি। রান্না থেকে আরম্ভ করে সব ব্যবস্থাই দোতলায় করে নিয়েছি। ঠিক করেছে খুব দরকার না হলে নিচে আর নামব না।

ভেবেছিলাম এই দুর্ভেদ্য দুর্গে এবার আমি নিশ্চিত্তে রাত কাটাতে পারব। কিন্তু পারিনি। প্রায় রাত্তিরে আমার ঘুম ভেঙে যায়। শুনতে পাই একতলার বারান্দায় কেউ যেন দাগিয়ে বেড়াচ্ছে অনেকটা খাঁচায় বদ্ধ হিংস্র সিংহের মতো। কেউ যেন দোতলায় ওঠবার বার বার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না।

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে থাকি বিছানায়। তার পরেই খিড়কির দরজা খোলার শব্দ। কেউ যেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

বাকি রাতটুকুর জন্যে নিশ্চিত্ত। ও এখন পথেঘাটে জঙ্গলে শিকার খুঁজে বেড়াবে।

কিন্তু....এভাবে কত দিন চলতে পারে? এমনি সময়ে একদিন দুপুরে হঠাৎ জলেশ্বর এসে হাজির। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল থেকে সাদা দাঁতগুলো বের করে হাসছে।

এই লোকটাকে আমি সহ্য করতে পারি না। লোকটা নিষ্ঠুর, হিংসুটে, বদমেজাজী। সেই নিরীহ সাধুটাকে এমন চড় মেরেছিল যে সে বেচারি মরেই গিয়েছিল। লোকটা মতলববাজও। আমার কত টাকা-পয়সা আছে তা জানতে কৌতূহলী খুব।

তবু আমার এই দুঃসহ নিঃসঙ্গতার মধ্যে ও যখন এসে দাঁড়াল তখন খুশিই হলাম। ওর হাত দুটো ধরে সাবধানে বাঁশটা ডিঙিয়ে ওপরে নিয়ে এলাম।

এখানে আবার বাঁশ কেন?

আমি সত্যি কথাটা চেপে গিয়ে বললাম—হ্যাঁ, ওটা সরিয়ে রাখতে হবে।

ও ওপরে এসে কাঁধের ঝুলিটা বিছানায় রেখে দু'পা তুলে জাঁকিয়ে বসল।

আমি ওকে এ ক'দিনের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা বলব কিনা ভাবছিলাম। ও যা সাংঘাতিক লোক, আমার অন্তত অর্ধেক সিদ্ধির কথা জানলে হিংসেয় জ্বলে মরবে। আর ওর হিংসের ফল আমার পক্ষে ক্ষতিকর হবেই। আবার না বলেও পারছিলাম না। নিজের কৃতিত্বের কথা সবাই জাহির করতে চায়।

বলব কি বলব না ভাবছি, শেষ পর্যন্ত জলেশ্বরই পথ পরিষ্কার করে দিল।

তোমার দরজায় কোলাপসিবল গেট কেন? আরে! জানলাতেও দেখছি গ্রিল! চোরের উৎপাত হচ্ছে নাকি?

আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। আবেগে উৎসাহে বললাম, চোর-ডাকাত নয় ভাই, আরও আরও ভয়ংকর। বলে হড়বড় করে সব ঘটনা বলে গেলাম। বললাম না শুধু দৌলত খাঁর কাহিনী।

শুনে জলেশ্বরের চোখ দুটো লাফিয়ে উঠল, বল কী হে!

জলেশ্বর কঙ্কালটা দেখতে চাইল। ওকে নিয়ে নিচের ঘরে গেলাম। ও কিছুক্ষণ ওটা দেখল। তারপর ওপরে এসে বলল, এ তো সাংঘাতিক জিনিস। বামনের কঙ্কাল তো পাওয়াই যায় না।

এর পর সরাসরি বলল, এটা নিয়ে তুমি খুব অশান্তিতে আছ বলে মনে হচ্ছে। এটা না হয় আমাকে দিয়ে দাও। অত টাকা অবশ্য আমার নেই—

ওকে দিয়ে দিতে পারলেই আমি নিশ্চিত হতাম—দেওয়াই বোধ হয় উচিত ছিল। কিন্তু কেন যেন দিতে মন সরল না।

আশ্চর্য! যে জিনিসটা আমার নিত্য ভয়ের কারণ, যার গতি হলে আমি স্বস্তি পেতাম—সেটা আমি ওকে দিতে পারলাম না। যেটাকে আমি তিল তিল করে তৈরি করেছি, যাকে নিয়ে ভয়ংকর পরীক্ষা করেছি, সেটা যেন একমাত্র আমারই সম্পত্তি। আরও স্পষ্ট কথা হলো এই যে, জলেশ্বর মানুষটা লোভী। আমার তৈরি জিনিস দেখে বাগাবার চেষ্টা করছে।

জলেশ্বর বলল, কি ভাবছ এত? ওটা আমায় দাও। পুরো টাকা আর একদিন এসে দিয়ে যাব।

আমি পরিষ্কার গলায় বললাম, না, ওটা আমি দিতে পারব না।

জলেশ্বর যেন গালে চড় খেয়ে থমকে গেল, মুখটা রাগে, অপমানে থমথম করতে লাগল। বললে, ঠিক আছে। তোমার জিনিস তোমারই থাক। এই বলে জলেশ্বর গুম হয়ে বসে রইল।

বসে রইল তো বসেই রইল। ওঠার আর নামই করে না। এদিকে বেলা পড়ে আসছে। একটু পরেই সম্ভ্য হবে। তখন ও যাবে কি করে? অথচ ও আমার সঙ্গে থাকুক আমি তা মোটেই চাই না।

এমনি সময়ে ও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। হেসে বলল, আজ রাতটা যদি তোমার কাছে থাকি অসুবিধে হবে?

আমাকে বলতেই হলো, কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না।

তবু জলেশ্বরের মতো সাংঘাতিক একটা লোককে নিয়ে একসঙ্গে রাত্রিবাস করা যে কী ভয়ংকর ব্যাপার তা অন্যে বুঝতে পারবে না। ভয়ে ভয়ে প্রায় গোটা রাতটা জেগে কাটলাম।

মুখের ওপর রোদ এসে পড়তেই ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। দেখি জলেশ্বর আগেই উঠে গেছে। নিজেকে ধিক্কার দিলাম, ছি ছি অতিথি আগে উঠে যাবে আর বাড়ির কর্তা পড়ে পড়ে ঘুমোবে? ছিঃ! ওর মুখ ধোওয়ার জল দিতে হবে, সকালের জলযোগের ব্যবস্থা করতে হবে—

ভাবতে ভাবতে ওর খোঁজ করতে গেলাম। কিন্তু দোতলা একতলা কোথাও তার দেখা পেলাম না। ভাবলাম হয়তো নদীর ধারে গেছে। অপেক্ষা করে রইলাম। কিন্তু সে আর ফিরল না।

অবাক কাণ্ড! এভাবে না জানিয়ে চলে যাবার কারণ কি?

একতলায় এসে ঘুরতে ঘুরতে কোণের ঘরের সামনে এসে দেখি দরজাটা খোলা। কঙ্কালটা নেই।

কঙ্কালের কি হলো বুঝতে বাকি রইল না। জলেশ্বরকে খুব দোষ দিই না। সে চেয়েছিল, আমি দিইনি। কাজেই চুরি করা ছাড়া তার উপায় ছিল না।

যাই হোক কঙ্কালটার একটা গতি হলো। সৎপাত্রে পড়েছে। তবুও নির্মম সত্য এই যে, জলেশ্বর ওটা চুরি করেছে। ও চোর। আমারই কাছে এক রাত থেকে আমারই সাধনার ধন নিয়ে পালিয়েছে। ও বিশ্বাসঘাতক! ওর ক্ষমা নেই।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে।

জলেশ্বরের আর দেখা নেই। দেখা দেবেই বা কোন লজ্জায়? কিন্তু আমার কৌতুহল ক্রমশ বেড়েই উঠছে। এটা নিয়ে ও কি করছে? সিদ্ধি হয়েছে? নাকি চড়া দামে কোথাও বেচে দিয়েছে? ওর তো অসাধ্য কিছুই নেই।

আর দৌলত খাঁ সাহেব? তিনি কি একটার পর একটা জীবহত্যা করেই চলেছেন? সেটা ছিল বৃথাবার। ভোরের দিকে মেঘ করেছিল বলে বেলা বুঝতে পারিনি। হঠাৎ বাইরের দরজায় জোর ধাক্কাধাক্কি। ধড়মড় করে উঠে নিচে নেমে গেলাম। দেখি বেশ কয়েকজন লোক জড়ো হয়েছে। উত্তেজনায় তারা থমথম করছে।

কি ব্যাপার?

মুদির দোকানের রাজেন ঘোষ, র্যাশনের দোকানের কমল গড়াই, আরও কয়েকজন এগিয়ে এসে বলল, একটা ডেড বডি পড়ে আছে।

ডেড বডি! চমকে উঠলাম।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কার?



তা তো জানি না। আপনার বাড়ির পিছনে তেঁতুল গাছটার তলায়। আপনি চেনেন কিনা দেখে যান।

ভয়ে ভয়ে গিয়ে দেখলাম।

না দেখলেই ভালো হতো। বীভৎসভাবে বিকৃত একটা মৃতদেহ। ঘাড়টা ভেঙে ঝুলছে। মুখ-চোখ ক্ষতবিক্ষত। চেনার উপায় নেই। তবু যে চিনলাম তা তার বিরাট দেহ আর দাড়ি-গোঁফ দেখে।

কিন্তু মুখে বললাম, না, চিনি না।

বাড়ি ফিরে নিচের ঘরের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম দরজা খোলা। জলেশ্বরকে শেষ করে মাটিতে শুয়ে আছে দৌলত খাঁর কঙ্কালখানা....আগের মতোই।

### শেষ গতি

কিন্তু এভাবে একটা ভয়ংকর কঙ্কালকে নিয়ে তো চলতে পারা যায় না। প্রতি রাত্তিরেই ও বেরিয়ে যায়। আবার রাত থাকতে থাকতেই এই ঘরে অধিষ্ঠান করে। এখানেই যেন ওর ডেরা। অবশ্য ওর সৃষ্টির মুহূর্ত থেকেই ও তো এই ঘরটাকেই জানে। এটাই ওর সূতিকাগার—এটাই ওর নতুন জন্মভূমি।

এখন আর এক দৃশ্যচিন্তা—এটাকে নিয়ে কি করব? কোথায় ফেলব?

সেদিন অনেক রাতে গায়ে একটা হিমশীতল স্পর্শ পেয়ে ঘুমটা অতর্কিতে ভেঙে গেল। চমকে উঠলাম। এ কী! ঘরের মধ্যে বুড়িমা। ফিক ফিক করে হাসছে।

কি এঁত ভাবছিস? ওঁটা আঁমাকে দিয়ে আঁয়। সঁদগাঁতি করে দেব।

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। বুড়িমা যেন ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেছে। একি স্বপ্ন? হতে পারে। কিন্তু তার বরফের মতো ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শটা যে এখনও গায়ে লেগে রয়েছে।

যাই হোক দু-একদিন পরেই আমি গোব্বার গাড়ি করে কঙ্কালটা নিয়ে বুড়িমার সেই শ্মশানে এসে হাজির হলাম। যেখানে আমি দিনের পর দিন কাটিয়েছি।

আশ্চর্য! বুড়িমা যেন জানত আমি আসব। হেসে বলল, এঁসেছিঁস! আঁয়! শঁখ মিঁটেছে? দেঁ ওঁটা।

কম্বলে ঢাকা কঙ্কালটা বুড়িমার সামনে রাখলাম। বুড়িমা বলল, ঐ যে একটা চিতা জ্বলছে। ওখানে শুইয়ে দে। দাঁড়া দাঁড়া, আগের কাজটা আগে সারি। বলে একটা কাঠ দিয়ে কঙ্কালটার মাথায় জোরে আঘাত করল। অমনি ফাটা মাথা থেকে একরাশ কালো কালো পোকা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ভঁয় পঁাস নে। এঁবার দেঁ চিতায় তুলে।

তাই দিলাম। আর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বামনের কঙ্কালটা ধোঁয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

# সুলতানের কবর

## দেওয়ালে হাতের ছাপ

কোনো মূল্যবান জিনিস বাড়ি থেকে হঠাৎ কর্পূরের মতো উবে গেলে মানুষ কতদিন তার খোঁজ করতে পারে? বড়ো জোর এক মাস, দু'মাস। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে। মনকে বোঝায় নিশ্চয় ওটা চুরি গেছে। চুরি হয়ে গেলে আর ফিরে পাবার উপায় নেই।

আমার যে জিনিসটা ট্রাক্টের ভেতর থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল, তা কেমন করে গেল তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনি। জিনিসটা আমার একটা ডায়েরি। বাড়িতে আমি একা। আমার কোনো দিনই এমন বন্ধু-বান্ধব ছিল না যে কাউকে পড়তে দেব। পড়তে দেওয়া দূরের কথা, কাউকে পড়েও শোনাইনি। অথচ ডায়েরিটা উধাও হয়ে গেল!

ডায়েরিটা অন্যের কাছে এমন কিছু মূল্যবান নয়। কিন্তু আমার কাছে ওর মূল্য অপরিসীম। আবার এটাও ঠিক ঐ ডায়েরিতে এমন কিছু গোপন তথ্য ছিল যা পড়লে যে কেউ লুক্ক হতে পারে। তারপর হয়তো আমাদেরই মতো ছোটোখাটো একটা অভিযান চালাতে গিয়ে—  
যাক সে কথা।

তা সেই ডায়েরিটার জন্যে সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, সম্ভব-অসম্ভব কোনো জায়গাই বাদ দিইনি। আর এই কাজ করেছি কয়েক বছর ধরে। তারপর একদিন হতাশ হয়ে হাত গুটিয়ে নিয়েছিলাম।

এরপর সেদিন আমার এই তিরাশি বছর বয়েসে হঠাৎই সেই ডায়েরিটা খুঁজে পেলাম।

কোথায় পেলাম জান? আমার বইয়ের আলমারির ওপর। কেউ যেন এইমাত্র ওটা ওখানে রেখে দিয়ে গেছে। অথচ ঐ জায়গায় আমি কত দিন ধরে কত বার খুঁজেছি!

বুঝতে পারি না আমার ট্রাক্টের নিচে যেখানে সেই ১৯৩৫ সালে ওটা রেখে দিয়েছিলাম, তারপর যে কোনো কারণেই হোক ঐ ডায়েরিটা ছুঁতে আর ভরসা পাইনি, সেই ডায়েরিটা ওখান থেকে কে কিভাবে বের করে নিল? আর এতগুলো বছর পর কেই বা সেটা আমার নাকের ডগায় রেখে দিয়ে গেল? রেখে দিয়ে গেল এমন একটা সময়ে যখন দুরারোগ্য রোগে আমি একরকম শয্যাশায়ী। যখন আমি মৃত্যুর জন্যে দিন গুনছি।

ডায়েরিটা কেমন করে উধাও হয়ে গিয়েছিল, সে রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না। ওটা যে পেয়েছি এটাই আমার মস্ত বড় লাভ। মৃত্যুর আগে অন্তত আর একবার ডায়েরিটা পড়ে নিতে পারব।

রাতে শোবার আগে রতন আমায় যেমন নিয়মিত ওষুধ আর ঘুমের বড়ি খাইয়ে দেয়, তেমনি খাইয়ে পাশের ঘরে শুতে চলে গেল।

ভেবেছিলাম বহুকাল পরে ডায়েরি ফিরে পাওয়ার আনন্দে নিশ্চিন্তে ঘুমোব। কিন্তু তা হলো না। গভীর রাতে একটা ঘটনা ঘটল।

আমার বিছানার কাছেই একটা ছোটো টেবিলে কিছু দরকারি ওষুধ-পতর, টর্চ আর একটা টাইমপিস থাকে। মাঝে মাঝে যখন ঘুম ভেঙে যায় তখন টাইমপিসটা দেখি—কটা বাজল। প্রহর গুনি কখন ভোর হবে।

আজ হঠাৎ একটা খসখস শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। রতন কি এ ঘরে ঢুকেছে? মশারির মধ্যে থেকে হাত বাড়িয়ে টর্চটা নেবার আগেই দেখলাম ঘরের মধ্যে একটা দীর্ঘ ছায়ামূর্তি। ক্রমে সেটা মানুষের মতো আকৃতি নিল। পরিষ্কার দেখলাম তার গায়ে রাজপোশাক ঝলমল করছে। কোমরে মস্ত বড়ো তরোয়াল, পায়ে ভেলভেটের নাগরা। মনে হলো বিগত যুগের কোনো সুলতান।

নিশ্চয় ভুল দেখছি মনে করে উঠে বসে দু'চোখ রগড়ে নিলাম।

না, ভুল নয়। সত্যিই কোনো সুলতান দাঁড়িয়ে আছেন মাত্র দশ হাত দূরে দেওয়ালের কাছে। তাকিয়ে আছেন আমার দিকে আগুনঝরা চোখে। হঠাৎ দেওয়ালে আঙুল দিয়ে কিছু যেন লিখলেন তিনি। তারপরই ম্যাজিকের মতো অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আমি উঠতে গোলাম, কিন্তু পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। এত কাল পরে উনি হঠাৎ কেন এবং কি করে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে উঠে এসে আমার এই গরিবখানায় দেখা দিলেন বুঝতে পারলাম না। তবে উনি যে ক্রুদ্ধ হয়েছেন তা বুঝতে ভুল হয়নি।

সকালবেলা রতন গরম কফি নিয়ে এসে ডাকাডাকি করতে ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। তারপর কফি খেয়ে সুলতান যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে এগিয়ে গোলাম।

কী আশ্চর্য! দেওয়ালে ফারসী ভাষায় কাঁপা কাঁপা হাতে অস্পষ্ট কয়েক ছত্র লেখা।

ফারসী ভাষা কিছুটা শিখেছিলাম তাই পাঠোদ্ধার করে ফেললাম। লেখা হয়েছে—‘সাবধান! এই ডায়েরির কোনো অংশ কাউকে পড়ে শোনাবে না। এমনকি তোমার কাজের লোকটিকেও না। যদি শোনাও তাহলে তোমার স্বাভাবিক মৃত্যুর আগেই আমার হাতে মরতে হবে।’ নিচে সই নেই। তার বদলে আছে হাতের ছাপ। আঙুল তো নয় শুধু সরু সরু কয়েকটা হাড়।

### জেকব অ্যান্টনী

সেই ক্রুদ্ধ, নিষ্ঠুর সুলতানের আত্মা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন আমি যেন ডায়েরির লেখা কাউকে পড়ে না শোনাই। কিন্তু ডায়েরির গোপন কথা নিয়ে লিখতে পারি কিনা সে বিষয়ে কিছু বলেননি। আর লিখলেও যদি তিনি আমার কোনো ক্ষতি করেন তো করুন। ভয় পাই না। কেন না আমি তো মৃত্যুর দরজায় পাঁ বাড়িয়েই আছি। তাই ডায়েরির কথা গুরু করি।

সুলতান সৈফুদ্দীন হামজা শাহ বা ফিরোজ শাহ ছিলেন গৌড়ের সুলতান। সময় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে। তিনি যে কী নিষ্ঠুর ছিলেন তা পরে বলব। এখন আগের ঘটনায় আসি।

জেকব অ্যান্টনী যার সঙ্গে আমি গৌড়-পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষে গোপন অভিযান চালিয়েছিলাম,

সে ছিল একজন খ্রিস্টান পর্যটক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ। যেখানে যত প্রাচীন ধ্বংসস্থাপ আছে সেখানে সে অভিযান চালাত। বৃটিশ গভর্নমেন্ট তাকে পুরনো জায়গা খোঁড়াখুঁড়ির অনুমতিও দিয়েছিল। তাতে দরকার হলে সে লোকজন নিয়েও অনুসন্ধান চালাতে পারত।

আমি থাকতাম দেশের বাড়িতে। মা-বাবা মারা গেছেন আমার ছোটবেলায়। আমার কেউ কোথাও ছিল না। ফলে বেশ বেপরোয়া আর দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিলাম। বাবার কিছু টাকা ছিল। ছিল মাথা গৌজবার জায়গা। আর ছিল কিছু ধানজমি। কাজেই একা মানুষের বেশ কেটে যেত।

এছাড়া করতাম গাইডের কাজ। আমাদের এলাকায় অনেক পুরনো মন্দির আছে। আছে বর্ধমান মহারাজাদের রাজবাড়ি। সারা বছর টুরিস্টরা আসত। তাদের আমি খুব আগ্রহভরে সেইসব মন্দির আর রাজপরিবারের ইতিহাস শোনাতাম। অবশ্য বাবার কাছ থেকেই সব শুনেছিলাম। বাবা এক সময়ে রাজ এস্টেটে কাজ করতেন। টুরিস্টরা খুশি হয়ে আমাকে কিছু কিছু দিত। সেটাও আমার লাভ।

আমার নেশা ছিল বনে-জঙ্গলে যেখানে যত ভাঙা মন্দির-মসজিদ আছে সেখানে ঘুরে বেড়ানো। কত কী যে লক্ষ্য করতাম তা লিখে বোঝাতে পারব না।

সেদিনও বাড়ি থেকে একটু দূরে নদীর ধারে ঘুরছিলাম। এখানে লম্বা সার দেওয়া বহু প্রাচীন ইটের গাঁথনি আছে। অনেক জায়গাতেই ইট নেই। হয়তো ভেঙে পড়ে গেছে। কিংবা চুরি গেছে। এখানে বড়ো একটা কেউ আসে না। তাই আমি বেশ একা একা ঘুরে বেড়াই। এই ইটের সারগুলো দেখে আমার কত কী মনে হয় যা কাউকে বলা যায় না। লোকে পাগল বলবে।

হঠাৎ জুতোর মসমস শব্দ শুনে চমকে ফিরে দেখি প্যান্ট-কোট পরা, মাথায় হ্যাট একজন লোক মুখে চুরুট গুঁজে এই দিকে আসছে। তার কাঁধে চামড়ার মস্ত ব্যাগ।

আমাকে দেখে চুরুট সরিয়ে হেসে বলল, What are you doing here young man? লোকটার গায়ের রঙ কালো। ঠোঁটের ওপর পুরু গৌফ। বেশ সুস্থ-সবল বেঁটে-খাটো চেহারা। দু'চোখে ধূর্ত চাউনি। দেখলেই মনে হয় শুধু কর্মঠই নয়, সাহসীও।

উত্তরে আমি বললাম, আপনি কোথা থেকে আসছেন? আপনাকে তো কখনো দেখিনি। লোকটা ঝপ করে ঘাসের ওপর বসে ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে ঢকঢক করে খানিকটা খেয়ে নিয়ে বলল, আমার নাম জেকব অ্যান্টনী। আপাতত এসেছি কর্ণসুবর্ণ থেকে। কর্ণসুবর্ণ কোথায় জান তো?

বললাম, জানি বৈকি। মুর্শিদাবাদ জেলায়। ঐতিহাসিক জায়গা। এক সময়ে বাংলার রাজধানী ছিল।

ভেরি গুড। তুমি তাহলে হিস্টোরিকাল জায়গা-টায়গার খবর রাখ?

হ্যাঁ। ঐতিহাসিক জায়গাগুলো দেখতে আমার খুব ইচ্ছে করে।

ভেরি গুড, ভেরি গুড।

আপনি আমাদের দেশে কী করতে এসেছেন?

জেকব হেসে বলল, বাঃ! আসব না? তোমাদের এই কালনা তো বহু পুরনো জায়গা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে কালনার বানান কি লিখত জান?

আমি মাথা নাড়লাম।

Culna—কুলনা।

আমি অবাক হয়ে গেলাম।

জেকব বলতে লাগল, এখানে মুসলমান আমলের বেশ কয়েকটা ভাঙা মসজিদ আছে। বর্ধমান রাজাদেরও অনেক কীর্তি আছে।

আমি বলে উঠলাম, বর্ধমানের রাজাদের দুটো সমাজবাড়িও আছে। একটা পুরনো সমাজবাড়ি, আর একটা নতুন সমাজবাড়ি।

What? সমাজবাড়ি?

হ্যাঁ। রাজপরিবারের প্রয়াত সদস্যদের অস্থিভস্ম এই দুই সমাজে রাখা আছে।

শুধু হাড় আর ছাই? ওতে আমি ইন্টারেস্টেড নই। আমি চাই কফিনের মধ্যে রাজা-রাজড়াদের বড়ি—ডেডবডি।

বলতে বলতে জেকবের দু'চোখ ঝকঝক করে উঠল, সেরকম কিছু আছে?

মাথা নাড়লাম। বললাম না।

জেকব যেন আমার কথায় হতাশ হলো। এইভাবেই জেকবের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। কথায় কথায় জেকব জানাল, দু'দিন আগে সে এখানে এসেছে। উঠেছে একটা হোটেলে। এর মধ্যে পুরনো মন্দির, মসজিদগুলো দেখে নিয়েছে। এখন ঘুরতে ঘুরতে এই নদীর ধারে এসেছে। আমি সেই ইটের সারগুলো দেখিয়ে বললাম, এগুলো কি বলতে পারেন সাহেব?

জেকব দু'একটা ভাঙা ইট পরীক্ষা করে বলল, মনে হচ্ছে কোনো রাজবাড়ির ভাঙা পাঁচিল।

নো-নো সাহেব, এগুলো হচ্ছে নীল চাষের জায়গা। আগে ইটের বড়ো বড়ো চৌবাচ্চা করে নীল গাছ ভিজিয়ে রাখা হতো। নীলকর সাহেবরা আমাদের দেশের গরিব চাষীদের ওপর কত যে অমানুষিক অত্যাচার করেছে তা জান না?

জানি, জানি। শুধু জানতাম না তোমাদের কালনাতেও নীলচাষ হতো।

এরপর আরও দু'দিন জেকব আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরল। আমার সৌভাগ্য, আমাকে ওর খুব ভালো লেগেছে। তারপরই সে আমায় সেই লোভনীয় প্রস্তাবটা দিল। বলল, মালদা গিয়েছ? গৌড়-পাণ্ডুয়া দেখেছ?

বললাম, না।

সে কী! গৌড়-পাণ্ডুয়া না দেখলে বাংলার সুলতানদের ইতিহাস জানা যায় না। সারি সারি ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও লুকিয়ে আছে কত ঐশ্বর্য সে তুমি না দেখলে ভাবতে পারবে না।

আমি বললাম, আপনি গৌড়-পাণ্ডুয়া গিয়েছেন?

জলন্ত চুরুটটা দাঁত থেকে সরিয়ে জেকব হেসে বললে, এক-আধবার নয়, থার্টিন টাইমস।

এত বার গিয়েও আবার যাবেন?

হ্যাঁ। তার কারণ আমি শুধু টুরিস্টদের মতো চোখের দেখা দেখি না। আমি কিছু খুঁজে বেড়াই।

কী খোঁজেন?

তা আমি এখন বলব না। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

আমি সানন্দে বলে উঠলাম, নিশ্চয় যাব।

তবে একটা কথা, আমি যেখানে যেখানে যাব, যা যা করব তা শুধু তুমি দেখে যাবে। কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে পারবে না। আর কাউকে কোনো দিন বলবে না।

ঠিক আছে।

আর আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে ফল খারাপ হবে মনে রেখো।  
বললাম, ঠিক আছে।

তা হলে কালনায় আর থেকে লাভ নেই। কালই বেরিয়ে পড়ব।

কোথায় যাব প্রথমে?

মালদা। সেখান থেকে গৌড়-পাণ্ডুয়া। তারপর একটু থেমে বলল, মালদহ নাম কেন বলতে পার?

মাথা নাড়লাম।

জেকব বলল, কেউ কেউ বলেন ‘মলদ’ নামে একটি ট্রাইব বা সম্প্রদায় ছিল। ঐ ‘মলদ’ থেকে নাম হয়েছে মালদহ। আবার কেউ কেউ বলেন, ফারসী ‘মাল’ আর বাংলা ‘দহ’ এই দুই শব্দ মিলে হয়েছে মালদহ। ‘মাল’ শব্দের মানে ধনদৌলত। ‘দহ’ শব্দের মানে সাগর। তাই মালদহের মানে ‘ধন-সাগর’। এই নামই বুঝিয়ে দেয় মালদহের মধ্যে প্রাচীন ঐশ্বর্য এখনও কত লুকিয়ে আছে।

বলতে বলতে জেকবের দু’চোখ লোভীর মতো চকচক করে উঠল।

আমার সেটা ভালো লাগল না। যারা টুরিস্ট, যারা প্রত্নতত্ত্ববিদ, যারা মাটি খুঁড়ে প্রাচীন ইতিহাস খুঁজে বেড়ায়, ধন-ঐশ্বর্যের কথায় তারা এমন লুন্ধ হবে কেন?

যাই হোক পরের দিনই আমরা মালদা রওনা হলাম।

### কাকদর্শন

আজ এই ১৯১৯ সালে যাঁরা গৌড়-পাণ্ডুয়া দেখতে যাবেন তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না সেই ১৯৩৫ সালে সেখানকার অবস্থা কিরকম ছিল।

চারদিক ফাঁকা। এদিকে-ওদিকে ধু ধু মাঠ। দু’ধারে বাবলা গাছ। কোথাও বা আমবাগান। কাঁচা ধুলোভরা রাস্তা জনমানবশূন্য। মাঠের ওপর দিয়ে দুপুরবেলা হু হু করে গরম বাতাস বয়। মনে হয় যেন কত যুগের মৃত, ক্ষুধা আত্মারা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। যেন বলছে, আর ওদিকে এগিয়ে না। ওখানে শুধু এখন আমাদের রাজত্ব। আমাদের বিরক্ত কোরো না। ভালোয় ভালোয় ফিরে যাও।

গৌড়-পাণ্ডুয়ার মুখে যে কয়েকটা আদিবাসীদের মাটির ঘর ছিল, সূর্য ডোবার আগেই সেসব ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ হয়ে যেত। কেউ আর বেরোত না। একটা অজানা ভয়। সে ভয় কিসের তা কেউ বলতে পারত না। শুধু মনে হতো মৃত নিষ্ঠুর সুলতানদের অতৃপ্ত আত্মারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। জীবিত অবস্থায় যেমন তেমন মৃত্যুর পরও কখন যে কার ওপর তাঁদের কোপ ও দৃষ্টি পড়বে কেউ তা বলতে পারত না।

জেকব অ্যান্টনী অবশ্য এসব বিশ্বাস করত না। সে বলত ওসব মূর্খ ভীতু মানুষদের মনের ভুল—অন্ধ কুসংস্কার।

আমিও তো তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা ঘটল—

থাক সে কথা। এখন আমার সেই ডায়েরি থেকে লিখি।

৫ মার্চ ১৯৩৫

নতুন কিছু দেখার আনন্দে মন নাচছে। আজ রানাঘাট স্টেশন থেকে লালগোলা প্যাসেঞ্জারে

উঠে লালগোলায় নামলাম। তারপর লালগোলা ঘাট। সেখান থেকে স্টীমারে পদ্মা পার হলাম। সে কী রোমাঞ্চ! এসব পথে কখনও আসিনি। জেকব একমনে কীসব নোট করছে। আমার সঙ্গে কম কথা বলছে। আমরা নামলাম গোদাগাড়ি ঘাটে। সেখান থেকে মিটার গেজের ট্রেনে মালদা ফোর্ট স্টেশন। আবার জলযাত্রা। এবার মহানন্দা নৌকোয় পার হয়ে এসে পৌঁছলাম মালদা টাউনে।

নামেই টাউন। টাউনের চাকচিক্য কিছু নেই। প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতির চাদর জড়িয়ে শহরটা যেন নতুন যুগের মানুষদের অবাক হয়ে দেখছে।

এখানে হোটেল-টোটেল বিশেষ নেই। অথচ হোটেল ছাড়া উঠব কোথায়? সঙ্গে দুজনেরই হালকা বেডিং। আমার কাঁধে একটা ব্যাগ। তাতে টর্চ তো আছেই তা ছাড়া আছে জামা-কাপড় চটি-জুতো তেল সাবান গায়ের চাদর দড়ি ছুরি ইত্যাদি।

একজন দোকানদারকে বলতেই সে একটা হোটেলের ঠিকানা দিল। হোটেলটা গোলাপট্রিতে। বিহারী ঠাকুরদের হোটেল। নতুন হয়েছে। এখানে সবচেয়ে পুরনো হোটেল কালীর থানের উত্তর দিকে। সেখানেও জায়গা ছিল। কিন্তু পছন্দ হলো না জেকবের।

## ৭ মার্চ

এখানে আসতে বেশ ধকল গিয়েছিল। তাই জেকব যখন বললে, একটা দিন রেস্ট নাও, তখন খুব খুশি হলাম। কিন্তু সে নিজে রেস্ট নিল না। চা খেয়েই বেরিয়ে গেল, ঘণ্টা চার পরে ফিরল। বললাম, কোথায় গিয়েছিলে?

উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে শুধু বলল, এই একটু—

ওর এড়িয়ে যাওয়াটা আমার ভালো লাগল না। বুঝলাম বয়েসে কম বলেই আমকে উপেক্ষা।

মরুক গে। নতুন জায়গা দেখব বলে এসেছি। সেটুকু দেখা হলেই আমি খুশি।

সকালেই চা, টোস্ট আর ডিমের ওমলেট খেয়ে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে নিলাম। জেকবের পরামর্শে একটা ওয়াটার-বটল কিনে নিয়েছি। জেকব বললে, ওখানে খুব জলকষ্ট। কাছাকাছি এমন কোনো গেরস্থালি নেই যে জল চেয়ে পাওয়া যাবে।

এতক্ষণে জিগ্যেস করতে সাহস পেলাম, আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?

উত্তরে সংক্ষেপে বললে, গৌড়।

আর পাণ্ডুয়া?

জেকব তখনই উত্তর দিল না।

বুঝলাম প্রশ্ন করাটা পছন্দ করছে না।

একটু পরে বলল, যদি দরকার বুঝি তাহলে অন্য দিন। গৌড়-পাণ্ডুয়া একসঙ্গে আমরা বলি বটে কিন্তু গৌড় একদিকে, পাণ্ডুয়া অন্যদিকে।

আমি সত্যিই বোকা, তাই একটু আগেই ধমক খেয়েও ফের প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা মালদহর নাম কি ইংরেজবাজার?

উত্তরে জেকব শুধু বললে, গাড়িতে উঠে পড়ো।

বাস। আর কথা নয়। গাড়িতে উঠে পড়লাম।

গাড়ি মানে একাগাড়ি। এক ঘোড়ার একাগাড়ি। আগেই ঠিক করে রাখা হয়েছিল। উঠে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

সময়টা মার্চ মাস। অর্থাৎ ফাল্গুন মাস। শীত নেই। গরমের কষ্টও নেই। আকাশ পরিষ্কার।

সকাল সাতটায় একা ছাড়ল। বেশ তেজী ঘোড়া। মালদহ ছাড়ার একটু পরেই মকদুমপুরে একটা শিবমন্দিরের কোল ঘেঁষে যে রাস্তাটা মোচড় খেয়ে সোজা দক্ষিণে চলে গেছে, সেই দিকে আঙুল তুলে জেকব বলল, ঐ যে শিবমন্দির, ওটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জনৈক রাজা রায়চৌধুরী। এই রাস্তাটার নাম ‘গৌড় রোড’। কোম্পানির আমলে এর নাম ছিল ‘নবাবগঞ্জ রোড’। আবার নবাব বা সুলতানী আমলে ছিল ‘শাহী সড়ক’। আমি তখনই তা নোট করে নিলাম। মনে মনে খুশি হলাম, জেকব অনুগ্রহ করে মুখ খুলেছে।

বেশ যাচ্ছিলাম। সকালের রোদটি মিষ্টি লাগছিল। দু’পাশে ধু ধু প্রান্তর। ঝিরঝিরে হাওয়া। জানলাম গৌড়-নগরে ঢুকতে খুব দেরি নেই। ‘পুরনো গড়’ পার হলেই গৌড় দর্শন শুরু হবে।

এই সময়ে উটকো একটা বিপত্তি শুরু হলো। কোথা থেকে একটা কাক উড়ে এসে আমাদের মাথার ওপর চক্রর কাটতে লাগল। আর বিকট শব্দে ক্যা-ক্যা করতে লাগল।

কাক যে অত বড়ো হয় জীবনে কখনো দেখিনি। পাহাড়ের দেশ হলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু এ তো একেবারে আমাদের সুজলা সুফলা বাংলাদেশ। শুধু বিরাট আকারই নয়, ডাকটাও ভয়ঙ্কর! চোখ দুটো ঘুরছে। মনে হচ্ছিল এখনই ঠোট দিয়ে ঠোঁকর মারবে।

গাড়োয়ান দু’বার চাবুক তুলে শূন্যে ঘোরাল। কাকটা পালাল বটে কিন্তু একটু পরেই আবার তেড়ে এল।

এ তো আচ্ছা জ্বালা হলো!

কাকটা এবার জেকবের মাথার কাছে ঘুরতে লাগল। জেকব মুখ তুলে ভুরু কুঁচকে কাকটার দিকে তাকাল। কাকটা পালিয়ে গেল।

জোরসে হাঁকাও। জেকব গাড়োয়ানকে হুকুম করল। গাড়োয়ান জোরে চাবুক কষাল ঘোড়াটার পিঠে।

কেন যে জেকব জোরসে হাঁকাতে বলল, কেনই বা গাড়োয়ান গাড়ি ছুটিয়ে দিল তার কারণ বুঝতে পারলাম না। সামান্য কাকের ভয়ে?

কাকটা বোধহয় সামান্য ছিল না। হঠাৎ ঘোড়াটা চিহি চিহি করে ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সেই বিকটাকার কাকটা জেট বিমানের মতো ডাইভ দিয়ে জেকবের মাথার ওপর নেমে আসছে।

এবার জেকব যা করলে তা ভাবতেও পারিনি। হঠাৎ পকেট থেকে রিভলভার বের করে কাকটাকে লক্ষ্য করে দু’বার গুলি ছুড়ল। আমি স্বচক্ষে দেখলাম দুটো গুলিই কাকটার পেটে লাগল। কিন্তু কাকটা মরল না। এক ফোঁটা রক্তও পড়ল না। দিব্যি উড়ে পালাল।

আমারই মতো জেকব অবাক হয়ে উড়ন্ত কাকটার দিকে তাকিয়ে রইল। গাড়োয়ান ফিরেও তাকাল না। সে জোরে গাড়ি ছোঁটাচ্ছে, যেন তাড়াতাড়ি জায়গাটা পার হতে পারলে বাঁচে।

আমি দুটো জিনিস ভেবে অবাক হলাম—দু’দুটো গুলি খেয়েও কাকটা উড়ে পালাল কি করে? আর জেকব সঙ্গে রিভলভার রাখে! এ তো তাহলে সোজা লোক নয়।

আমাকে হতভম্ব হয়ে থাকতে দেখে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্যে জেকব আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে চুরট ধরিয়ে বলল, ভয় কি? আমি তো আছি।

হঠাৎ জেকব ভয়ের কথা কেন বললে তা বুঝতে পারলাম না। সত্যি বলতে কি আমি



তো ভয় পাইনি। ভয়ের তো কোনো ঘটনা ঘটেনি। আমি শুধু অবাক হয়েছিলাম কাকটা দু'দুটো গুলি খেয়েও মরল না দেখে।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে জেকব সহজভাবে বললে, তখন তুমি কী যেন জানতে চাইছিলে? ও হ্যাঁ, মালদারই নাম ইংরেজবাজার কিনা। শুনে রাখো ইংরেজরা এদেশে আসার পর মহানন্দা নদীর পশ্চিম পাড়ের জমি কোনো এক রাজা রায়চৌধুরীর কাছ থেকে মাত্র তিনশো টাকায় কিনে নেয়। সেখানে ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে তারা ইংলেজাবাদ শহর গড়ে তুলল মোঘলদের অনুকরণে। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে গড়ল ইংরেজবাজার। সাধারণ লোকের মুখে মুখে কথটা দাঁড়াল 'ইংলেজাবাদ'। কথটা আসলে ইংরেজবাজার। এরই নাম মালদহ।

নীলকুঠির ইংরেজরা এখানে রং তৈরি করত। তাই রং + ইংরেজ + বাজার = 'রংরেজবাজার' হয়ে গিয়েছিল।

আমি নোট করে নিলাম।

একটা ছুটছে। খোয়া বের করা গৌড় রোডে একঘেয়ে শব্দ হচ্ছে খটা-খট-খটা-খট। মাঝে মাঝে খোলা মাঠের ওপর দিয়ে ঈষৎ গরম দমকা বাতাস ধুলো উড়িয়ে আসছে। বাতাসটা যেন কেমন! এ ধরনের বাতাসের সঙ্গে অন্তত আমার পরিচয় নেই। সকালে যে ফুরফুরে বাতাসে আরাম পাচ্ছিলাম, এখন সেই বাতাস আর নেই। এখন শুধু শরীরেই নয়, মনের ভেতরেও যেন কেমন অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হচ্ছে আর গিয়ে কাজ নেই, ফিরে যাই। কেন যে এমন মনে হচ্ছে তা বুঝতে পারলাম না।

গৌড় আসতে আর মাত্র কয়েক মাইল। লক্ষ্য করলাম—ঘোড়াটার ছোটার গতি কমে আসছে। গাড়োয়ান বুঝতে পারছে না। সে কেবল চাবুক কষাচ্ছে।

শেষে ঘোড়াটা চিহি চিহি করে ডাকতে ডাকতে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুতেই আর তাকে নড়ানো গেল না।

গাড়োয়ান গাড়ি থেকে নেমে ঘোড়াটাকে দেখল। না, কোনো অসুখ করেনি। তেমন ক্লান্তও নয়। তাহলে আর যেতে চাইছে না কেন?

গাড়োয়ান অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু ঘোড়া আর নড়ল না।

গাড়োয়ান তখন নিরুপায় হয়ে বলল, বাবু, ঘোড়া তো আর যেতে চাচ্ছে না।

কেন? বিরক্ত হয়ে জিগ্যেস করল জেকব।

কী জানি। বুঝতে পারছি না। এর আগেও তো ঢের সওয়ার এনেছি। এমন হয়নি।

তারপরই হঠাৎ ওর কি মনে হলো। বলল, বাবু, হাওয়াটা আজ বড্ড ভারী। আপনারাও না হয় নাই গেলেন।

কেন? ফের জিগ্যেস করল জেকব।

গাড়োয়ান ইতস্তত করে বলল, যেখানে যাচ্ছেন সে জায়গাটা তো ভাল নয়। সুলতানদের আমলে কত খুন-জখম হয়েছে। ওখানে তো কবরের পর কবর। তেনারা তো আজও আছেন। ঘুমিয়ে থাকেন। জেগে উঠলে আর রক্ষে নেই।

যত বোগাস কথা! বলে বিরক্ত জেকব চুরুট ধরাল।

তাহলে আমাদের উপায়?

একান্তই যখন যাবেন তখন এ পথটুকু হেঁটেই চলে যান। ঐ তো 'পিয়াসবারি দীঘি' দেখা যাচ্ছে। এখান থেকেই তো গৌড়ের শুরু।

তাকিয়ে দেখলাম বহুদূরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে জলের মতো কি যেন চিকচিক করছে।

## ফকির সাহেব

৭ মার্চ বেলা ১১টা

আরও একটা মুশকিল হয়েছে। গাড়োয়ানকে বলা হয়েছিল গৌড়ে দু'তিন দিন থাকতে হবে। এর জন্যে ওকে মোটা রকম টাকা দেওয়া হবে। ওকে থাকতে বলার কারণ গৌড় থেকে ফেরার জন্যে কোনোরকম গাড়ি পাওয়া যায় না। গাড়োয়ান টাকার লোভে রাজি হয়েছিল। কিন্তু ঘোড়াটা ঐরকম বিগড়ে যাওয়ায় গাড়োয়ান কিছুতেই থাকতে চাইল না। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, এক্কার মুখ মালদার দিকে ফেরাতেই ঘোড়া দিব্যি ছুটতে লাগল।

জেকবের দিকে তাকিয়ে দেখি ও খুব চিন্তাশ্রিত। জিগ্যেস করলাম, কি ভাবছেন? কিছু না। হাঁটো।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা সেই 'পিয়াসবারি'র কাছে এসে পৌঁছলাম। স্বচ্ছ টলটলে জল। আমরা দীঘির পাড়ে গিয়ে বসে একটু বিশ্রাম করলাম।

কী চমৎকার জল, না?

জেকব একটা চুরট ধরিয়ে হেসে বলল, হ্যাঁ, খুবই ভাল জল। নাম পিয়াসবারি। একটু থেমে বলল, তা বলে খেও না যেন।

কেন?

আবুল ফজল তাঁর 'আকবরনামায়' একটা কিংবদন্তীর কথা লিখেছেন। কিংবদন্তীটি অনুযায়ী এই যে জল দেখছ এটা বিষাক্ত। মোগল আমলে মৃত্যুদণ্ডের আসামীদের কয়েক দিন ধরে জল খেতে দেওয়া হতো না। তারপর যখন তেষ্টায় বুক ফেটে যেত, যখন জল জল করে চিৎকার করত তখন তাদের এই দীঘির ধারে এনে ছেড়ে দেওয়া হতো। এই টলটলে জল দেখে তারা উন্মাদ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত জলে। অঞ্জলি ভরে জল খেত। কিন্তু তারপরেই তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত।

ইস! চমকে উঠলাম আমি। এই জল কি এখনও বিষাক্ত?

বলতে পারি না। খেয়ে দেখিনি। তবে আকবর নাকি ঐ নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

আমি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম দীঘিটার দিকে। দীঘির পাড়ের গাছগুলো যেন কেমন শুকনো শুকনো। গরু ছাগল চরছে বটে কিন্তু তাদের জল খেতে দেখলাম না।

বোতল থেকে ঢকঢক করে জল খেয়ে আমরা উঠে পড়লাম।

সেখান থেকে কাছেই আদিবাসীদের গ্রামে নিয়ে চলল জেকব। তেরবার এখানে এসেছে। অনেক আদিবাসীদের সঙ্গেই চেনাজানা আছে। আদিবাসীদের মাতব্বরকে কিছু টাকা দিয়ে আড়ালে তার সঙ্গে কী সব কথা বললে। দু'দিনের জন্যে থাকারও ব্যবস্থা হলো। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম আদিবাসীরা জেকবকে দেখে খুশি হলো না।

পিয়াসবারি থেকে গৌড়পথ সোজা এগিয়ে গেছে। ঐ পথ থেকে ডান দিকে আর একটা রাস্তা চলে গেছে। এরই মুখে রামকেলী গ্রাম। বৃন্দাবন যাবার পথে এখানে এসেছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। এখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন সুলতান হোসেন শাহের দু'জন মন্ত্রী দবির খাস ও সাকর মল্লিক। শ্রীচৈতন্যদেবের পুণ্যস্পর্শে মন্ত্রীরা হয়ে গেলেন পরম বৈষ্ণব। নতুন নাম হলো তাঁদের রূপ ও সনাতন গোস্বামী।

আমরা এগিয়ে চলেছি। জেকব অন্যমনস্ক। তবে আমার প্রতি সদয়। জিগ্যেস করলে মাঝে মাঝে উত্তর দিচ্ছে। এইভাবেই দেখলাম মদনমোহন জীউ-এর মন্দির, সনাতন গোস্বামীর

প্রতিষ্ঠিত শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, বিশাখাকুণ্ড। দেখলাম রূপ গোস্বামীর তৈরি রূপসাগর। তারপরেই দক্ষিণে কিছুদূর দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বিশাল এক ভগ্ন প্রাসাদ। এইটিই ইতিহাস-বিখ্যাত বারদুয়ারী।

এর একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে খুব উঁচু প্রাচীর। এর নাম 'দাখিল দরওয়াজা'। শাহী নগরকেন্দ্রের অর্থাৎ রাজবাড়ি প্রবেশের উত্তর দরজা ছিল। বিশাল সে দরজা। অবাক হয়ে দেখতে হয়। ঐ দরজার মাথায় দাঁড়িয়ে গৌড়ের সুলতানরা বিজয়ী সৈনিকদের অভিবাদন গ্রহণ করতেন কান-ফটানো তোপধ্বনির সঙ্গে।

আমি যখন অবাক হয়ে এইসব দেখছি, জেকব তখন মাটিতে বসে ব্যাগ থেকে খাতা-পতুর বের করে কী সব নকশা দেখছে।

সেলাম আলেকুম!

চমকে চেয়ে দেখি একমুখ পাকা দাড়ি আলখাল্লা পরা দীর্ঘকায় ফকিরের মতো একজন দাঁড়িয়ে আছে।

গাইড? ফকির বললে।

জেকব ভয়ানক বিরক্ত হয়ে বললে, না না, গাইডের দরকার নেই।

ফকির মিনতি করে বললে, সব ভাল করে দেখিয়ে দেব বাবু। যা খুশি তাই দেবেন। বলছি তো গাইড লাগবে না। তুমি যাও এখন।

ফকির বললে, নিজেরা হয়তো ঘুরে ঘুরে সব দেখবেন। কিন্তু শুধু দেখে কি হবে? বহুৎ কহানী হয়, যা আমি জানি, আপনারা জানেন না। কতজনের কত দুঃখ, চোখের জল, কত খুন....ফিরোজ মিনারের নাম শুনেছেন তো?

'ফিরোজ' নামটা শুনেই জেকবের দু'চোখ ঝকঝক করে উঠল। ওর মাথায় বুঝি কোনো মতলব খেলল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এখানে সুলতানদের কবরগুলো কোথায় আছে বলতে পার?

কত কবর চান? দিল্লীর খাঁর কবর, ফতে খাঁর কবর, সুলতান হোসেন শাহর কবর, নসরৎ শাহের কবর, তার ছেলের কবর, আরও কত খানদানি রাজপুরুষদের কবর। আরও পুরনো কবর যদি দেখতে চান তাহলে 'বাংলাকোট' চলুন।

জেকব উৎসাহিত হয়ে বললে, তুমি আগে ফিরোজ মিনার চলো। সুলতান ফিরোজের কথা জানতে চাই।

বেলা বারোটো বাজে। আমরা দাখিল দরওয়াজাকে ডান দিকে রেখে চলেছি দক্ষিণমুখী। পাশে পরিখা আর গড়। গড়ে চাষ হচ্ছে। দেখলে মনে হয় কী শান্ত নিশ্চিত জীবন!

ফকির তার আলখাল্লা পরা দীর্ঘ দেহ নিয়ে আগে আগে চলেছে আমাদের পথ দেখিয়ে। জেকবের সন্ধানী দৃষ্টি চারদিকে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। একটু পরেই মিনারের মাথা দেখা গেল। আমরা মিনারটার সামনে গিয়ে দাঁড়লাম। গাইড যা বলল তা থেকে জানলাম মিনারটির নাম ফিরোজ মিনার। অনেকে মনে করেন এটি বিজয়স্তম্ভ, আবার অনেকের মতে এটি 'মোবিনমঞ্চ'। মোবিনমঞ্চ মানে কী আমি তা জানি না। গাইডকে জিগ্যেস করার সময়ও পাইনি। ভয়, বেশি প্রশ্ন করলে জেকব হয়তো বিরক্ত হবে। লোকটাকে এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। মিনারটা অনেকটা দিল্লির কুতুব মিনারের মতো। তবে অত উঁচু নয়। পাঁচটি থাক। অর্থাৎ প্রায় পাঁচতলা। সবার ওপরে রয়েছে কারুকার্যময় গম্বুজ।

সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ মিনারটি নীল রঙের টালিতে গাঁথা। গাইড জানাল মিনারটি

তৈরি করেছিলেন হাবসী বংশীয় সুলতান সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ। ফিরোজ সাহ অত্যন্ত খেয়ালী ও জাঁকজমকপ্রিয় সুলতান ছিলেন। প্রচুর ঐশ্বর্য ছিল তাঁর।

জেকব এতক্ষণ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে গাইডের কথাগুলো শুনছিল। যেন তার শোনার দরকার নেই। সবই সে জানে। ‘প্রচুর ঐশ্বর্য’, ‘খেয়ালী’ আর ‘জাঁকজমকপ্রিয়’ কথা তিনটে শুনে সে এবার গাইডের দিকে তাকাল।

আমি এমন বইও পড়েছি যাতে লেখা আছে সুলতান ফিরোজ শাহ নিজের কবরগৃহ কিরকম হবে, কি কি জিনিস দিয়ে সাজানো হবে তার ব্যবস্থা নিজেই করে গিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তুমি কিছু জান ফকির সাহেব?

গাইড মাথা নাড়ল—না।

তবে আর তুমি কি ছাই জান? বলে জেকব অবজ্ঞার দৃষ্টিতে গাইডের দিকে তাকাল।

গাইডের মুখটা অপমানে থমথম করতে লাগল। তবু সে তার কর্তব্য করল। ফিরোজ মিনার নিয়ে যে কিংবদন্তী আছে তা গড়গড় করে বলে গেল। কাহিনিটা এইরকম—

সুলতান ফিরোজ শাহর খেয়াল হলো অবিলম্বে খুব উঁচু একটা মিনার তুলতে হবে। তামাম গৌড়-সুলতানের কীর্তির মধ্যে যেটা শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় বস্তু হয়ে থাকবে। আর মিনারের কারুকার্য হবে অসাধারণ।

সঙ্গে সঙ্গে নগরের শ্রেষ্ঠ রাজমিস্ত্রিকে ডাকা হলো। রাজমিস্ত্রি কাজে লেগে পড়ল। এক মাস যেতে না যেতেই সুলতান খবর নিতে পাঠান, কত দূর হলো?

এতো বড়ো মিনার তৈরি করা তো যাদুমন্ত্রের ব্যাপার নয়। সময় তো লাগবেই। কিন্তু অবঝু অর্ধেক সুলতানের আর তর সয় না! কিসের এত তাড়া কে জানে!

শেষে একদিন রেগেমেগে তাজ্জামে চড়ে লোকলস্কর নিয়ে নিজেই চলে এলেন। কাজ দেখে তিনি হতাশ হলেন। বড্ড ধীরে কাজ হচ্ছে।

কেন এত দেরি হচ্ছে? চিৎকার দিলেন সুলতান।

রাজমিস্ত্রি বোঝাতে চাইল, এসব কাজ তাড়াছড়ো করে হয় না। যে জিনিস বহু যুগ ধরে কীর্তি হয়ে থাকবে তা তৈরি করার সময়ে যথেষ্ট সময় দিতে হবে।

সুলতান রাজমিস্ত্রির এই কৈফিয়তে খুশি হলেন না। তাঁর ভ্রাতা জোড়া কপালে লাফিয়ে উঠল। দু’চোখে ক্রোধের বহির্শিখা। তিনি হুকুম দিলেন, মিনার যতদূর উঠেছে সেখান থেকে ঐ অপদার্থটাকে ছুড়ে ফেলে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে রাজমিস্ত্রিকে ওপরে টেনে নিয়ে গিয়ে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হলো। তালগোল পাকিয়ে পড়ে রইল রাজমিস্ত্রির রক্তাক্ত দেহটা।

কতখানি উঁচু হয়ে উঠেছিল মিনারটা তখনই, মিস্ত্রির তালগোল পাকানো দেহটা নিঃশব্দে তা প্রমাণ করে দিল।

সুলতান কিন্তু এসব নিয়ে মাথা ঘামান না। আদেশ করলেন তখনই আরও ভালো রাজমিস্ত্রি নিয়ে আসতে।

এই হলো ফিরোজ মিনারের কাহিনি। কথা শেষ করে গাইড তার পাকা দাড়িতে হাত বোলাতে লাগল।

জেকব গাইডের কাছে এগিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বলল, ফকির সাহেব, এই ফিরোজ শাহের কবরটা কোথায় বলতে পার? তোমায় অনেক টাকা দেব।

হঠাৎ গাইডের ভ্রাতা জোড়া বেঁকে উঠল। কেন বলুন তো বাবু?

আমি সেই কবরে ঢুকব।

গাইড বলল, ওসব মতলব ছাড়ুন বাবুসাহেব। এইজন্যেই যদি এখানে এসে থাকেন তাহলে বহুৎ ভুল হবে। বাড়ি ফিরে যান।

জেকব তাকে ভেঙে উঠে বলল, তোমার বিদ্যের দৌড় বোঝা গেছে। এবার কেটে পড়ো। এই নাও, বলে একটা টাকা ওর দিকে ছুড়ে দিল।

জেকবের ব্যবহার আমার যে কী খারাপ লাগছিল তা লিখে বোঝাতে পারব না।

গাইড মুখে কিছু বলল না। শুধু কেমন একরকম ভাবে জেকবের দিকে তাকাল। তারপর হুঁশিয়ার বাবুসাব, হুঁশিয়ার বলে হন হন করে এগিয়ে গেল। টাকাটা ছুঁলও না।

হঠাৎ মাথার ওপর বিকট একটা শব্দ কাঁ-কাঁ-কাঁ। চমকে তাকিয়ে দেখি একটা কাক মাথার ওপরে ঘুরপাক খাচ্ছে।

আরে সেই কাকটাই তো!

কাকটা এবার জেকবের মাথা লক্ষ্য করে ঠোট উঠিয়ে নেমে এল। স্পষ্ট দেখলাম কাকটার বুকে ছোটো ছোটো সাদা দাগ। বোধহয় গুলির দাগ।

জেকব তখনই রিভলভার বের করে কাকটাকে মারতে যাচ্ছিল, দূরে দাঁড়িয়ে গাইড হেসে বলল, আপনার গুলিতে কোনো কাজ হবে না বাবু। ওটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখুন।

বলেই ডান হাতটা তুলে একবার শূন্য ঘোরাল। সঙ্গে সঙ্গে কাকটা দূর আকাশে উড়তে উড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই যেসব ঘটনা দেখলাম, ডায়েরি লিখতে লিখতে তা মনে করে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। এখন তো ১৯৩৫ সাল। ইংরেজ আমল। এই যুগেও এমন সব অসম্ভব অলৌকিক ঘটনা ঘটে। কাকটা তো বটেই, কিন্তু ঐ ফকিরই বা কে? তার হাতের ইশারাতেই কাকটা চলে গেল! তা ছাড়া কেনই বা সে জেকবকে বলে গেল—হুঁশিয়ার!

এখনও কিছুই বুঝতে পারছি না।

## গভীর রাতের বিভীষিকা

৭ মার্চ বেলা দুটো

ফিরোজ মিনার দেখে এখানেই বসে আমরা দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম। মালদা থেকে লুচি, তরকারি আর মিষ্টি আনা হয়েছিল। রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা অবশ্য আদিবাসীটির ঘরে। জেকব মূর্গির টাকা আগাম দিয়ে দিয়েছে।

খাওয়া শেষ হলে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে জেকব বলল, তোমার সঙ্গে এবার কয়েকটা কথা স্পষ্টাস্পষ্ট বলে নিই।

ওর কথা বলার সুরে আমার বুকটা কেঁপে উঠল।

ও বলতে লাগল—তের বার আমি এখানে এসেছি শুধু গৌড় দেখবার জন্যে নয়। আমি অনেক পুরনো বই খুঁজে খুঁজে পড়েছি। অনেক সুলতানের কবরের কথা পেয়েছি। কিন্তু ফিরোজ শাহের কবরের কথা পাইনি। কোনো কোনো বইয়ে ফিরোজ শাহের কথা থাকলেও তা বিভ্রান্তিকর। এখানকার গাইডরাও সঠিক জানে না কোনটা আসল ফিরোজ শাহের কবর। মৃতের পরিচয় লেখা থাকে যে সব পাথরে, যাকে বলে ‘স্মারকপ্রস্তর’, তা এই প্রায় পাঁচশ বছরে ভেঙে পড়ে গেছে। কাজেই প্রকৃত ফিরোজ শাহের কবর কোনটি কেউ তা স্পষ্ট

করে বলতে পারে না। কিন্তু আমি খুব পুরনো দুটো ফারসী বইয়ে সেই কবরের হদিস পেয়েছি। তার নকশাও করে এনেছি। খেয়ালী সুলতান নিজেই নিজের কবরগৃহ করে গিয়েছিলেন এক গোপন জায়গায়। কথাটা শুনে রাখ শুধুই কবর নয়—‘কবরগৃহ’। সেখানেই রয়েছে সুলতানের দেহ আর তাঁর প্রচুর ঐশ্বর্য—যেমন মিশরে সম্রাটদের মমির সঙ্গে রাখা হতো।

আমি সেই ঐশ্বর্যের লোভেই এবার এসেছি। তোমাকে এনেছি আমার স্বার্থে। তুমি আমাকে সাহায্য করবে। কেন না ঐ ঐশ্বর্য একা উদ্ধার করা আমার একার সাধ্য নয়। বুঝেছ?

আমি রাগে দুঃখে ভয়ে চুপ করে রইলাম। হায়! শেষ পর্যন্ত একটা চোরের সঙ্গে আমি এখানে এলাম!

চুপ করে থেকো না। জেকব চেষ্টা করে উঠল। যা বলব তাই শুনবে। নইলে গুলি করে তোমায় মেরে এখানে পুঁতে রেখে যাব। কাক-পক্ষীতেও টের পাবে না। তারপর একটু থেমে বলল, আর যদি আমার কথা শোনো তাহলে যা পাব তার কিছু তোমাকে দেব। তাতে তোমার সারা জীবন ভালোভাবেই কেটে যাবে।

আমি বুঝতে পারছি আমি ঐ চোরটার হাতের মুঠোয় চলে গিয়েছি। আর নিকৃতি নেই। আমি ওর কথামতো চললেও শেষ পর্যন্ত ও এই অপকর্মের সাক্ষীকে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখবে না।

তাহলে? কি করব এখন?

চোখে জল আসছে....আর লিখতে পারছি না।

৮ মার্চ সকাল ৮টা

গতকাল রাতে ডায়েরি লিখতে পারিনি। যে সব ঘটনা ঘটে গেল তা এতই অসম্ভব আর আকস্মিক যে কিছু লেখার মতো অবস্থা ছিল না। আজ কিছুটা ধাতস্থ হয়ে তারপর লিখছি।

কাল রাত নটার মধ্যে গরম গরম মুর্গির ঝোল আর ভাত খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে শুয়ে পড়লাম। আদিবাসীদের মোড়ল বা সর্দার মাণ্ডির বৌ খুব চমৎকার মাংস রন্ধেছিল। ওরা থাকে পিছনের দিকে। খুবই গরিব। তাই জেকব টাকা দিয়ে এদের বশ করে নিয়েছে।

আমার আর জেকবের জন্যে পাশাপাশি দুটো দড়ির খাটিয়া। মশারি টাঙিয়ে শুয়ে পড়লাম। জেকবও শুয়ে পড়েছে। দুপুর থেকে এখনও পর্যন্ত আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেনি। খুব গভীর। বোধ হয় মতলব ভাঁজছে। এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচতাম। কিন্তু উপায় নেই। জেকব জানতে পারলে গুলি করে মারবে।

শরীরের দিক থেকে না হলেও মনের দিক থেকে খুব ক্লান্ত ছিলাম। সেই অদ্ভুত কাকটা, ঘোড়াটার থমকে দাঁড়িয়ে পড়া, বৃদ্ধ ফকির গাইডের কথা, ফিরোজ শাহের নির্মম ব্যবহার, গাইডের ঈশিয়ারি, সবচেয়ে বেশি জেকবের শাসানি আমার মনটাকে ভেঙে দিয়েছিল। বড়ো অসহায়, বড়ো ক্লান্ত লাগছিল। তাই বিছানায় শোওয়ারামাত্র ঘুমিয়ে পড়লাম।

রাত তখন কত জানি না হঠাৎ আজানের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। চারদিকে যত মসজিদ ছিল, সব জায়গা থেকেই আজানের ধ্বনি ভেসে আসতে লাগল। আমি শুয়ে শুয়েই টর্চের আলোয় রিস্টওয়াচটা দেখলাম। রাত দুটো। এত রাতে কেউ আজান দেয় নাকি? তা ছাড়া— তা ছাড়া এখানে যতদূর ঘুরেছি কোথাও একটা আস্ত মসজিদ চোখে পড়েনি। সবই ধ্বংসস্তুপ। তা হলে আজান কে দিচ্ছে—কোথা থেকে দিচ্ছে?

একবার ভাবলাম জেকবকে ডেকে জিগ্যেস করি। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলতে প্রবৃত্তি হলো না।

মরুক গে যাক বলে আবার শুয়ে পড়লাম। আজানের ধ্বনিও হঠাৎ থেমে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠলাম, ঘোড়ার খুরের শব্দ! দু'একটা নয়, কয়েক শো ঘোড়া যেন ছুটে আসছে, খটা খট খটা করে। এই গভীর রাতে কোথা থেকে যে এত ঘোড়া আসছে ভেবে পেলাম না। তারপরেই শুনলাম চারপাশের প্রান্তর জুড়ে ঘোড়াগুলোর দাপাদপি সেই সঙ্গে তরোয়ালের বনবনা।

আমি আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। উঠে দরজার কাছে গেলাম। আদিবাসীদের ঘরে বড়ো একটা জানলা থাকে না। তারা নাকি মনে করে অশুভ আত্মারা জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে। মোহন মাণ্ডির ঘরেও জানলা নেই। আমি দরজাটা একটু ফাঁক করে শব্দ লক্ষ্য করে তাকালাম। ঘুরঘুটে অন্ধকার। তার মধ্যে দিয়েই দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে তাকালাম। দেখলাম এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য! গোটা প্রান্তর জুড়ে অসংখ্য ঘোড়ার কালো কালো ছায়া। তাদের পিঠে এক একটা কালো কালো মূর্তি। সারা মাঠ জুড়ে তারা দাপাদপি করছে।

তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। কী অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম! এ সবই কি চোখের ভুল?

হঠাৎ দুটো ঘোড়ার খুরের শব্দ আমাদের ঘরের দিকে এগিয়ে এল। আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলাম। ঘোড়া দুটো যেন কাছেই কোথাও এসে থামল। তারপরেই শুনলাম একটা মর্মান্তিক আর্তনাদ—‘জহরা অব্ হোনা’, ‘জহরা অব্ হোনা—আমি বিপদগ্রস্ত’, স্পষ্ট মানুষের গলায়, ‘আমি জালালুদ্দীনের পুত্র শামসুদ্দীন। আমাকে হত্যা করতে এসেছে আমারই দু'জন ক্রীতদাস। আমাকে বাঁচাও।’

তারপরেই একটা অস্পষ্ট গোঙানি দুপুর রাতের বাতাসে মিশে গেল।

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে রইলাম। আর কোনো শব্দ নেই। মনে মনে ভাবতে লাগলাম এ রাত কি ভোর হবে না? এসব কী শুনলাম! সুলতান শামসুদ্দীনকে হত্যা করেছিল তাঁরই দুই ক্রীতদাস। সে তো ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ের কথা! এত বছর পর আজ সেই শামসুদ্দীনের মৃত্যুভয়ে আড়ষ্ট গলা শুনলাম! এইরকম গভীর কোনো রাতে তাঁর দুই বিশ্বস্ত ক্রীতদাস কি ঘোড়ায় চড়ে এসে তাঁকে খুন করে গিয়েছিল?

ছোটীবাবু!

চমকে উঠলাম। একেবারে ঠিক দরজার বাইরে কে যেন ডাকল।

‘ছোটীবাবু’ বলে কে কাকে ডাকল?

একটু পরে আবার সেই থমথমে গলা, ছোটীবাবু!

আমাদেরই কাউকে কেউ ডাকছে।

কিন্তু কে ডাকছে?

বরাবরই আমার খুব সাহস। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে খুব সাহস যে ভালো নয় তা তখনও বুঝিনি।

আমি উঠে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়লাম। কিন্তু তখনই দরজা খুললাম না। অপেক্ষা করে রইলাম আবার কেউ ডাকে কিনা শোনার জন্যে।

একটু পরেই আবার সেই গলা। এবার খুব কাছে। মনে হলো যে ডাকছে সে দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। এবার আমি নিশ্বাস বন্ধ করে দরজাটা খুলে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঠান্ডা বাতাস গায়ে ছুঁচের মতো বিঁধল।

কিন্তু—

কিন্তু কই? কেউ তো নেই?

কী করব ভেবে না পেয়ে আমি একবার এদিক-ওদিক দেখে নিলাম।

না, কেউ নেই।

হঠাৎ আবার সেই কণ্ঠস্বর, ছোট্টাবু!

এবার যেন একটু দূরে।

আমি মস্তমুগ্ধের মতো সেই স্বর লক্ষ্য করে অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে চললাম।

অন্ধকার, শুধু অন্ধকার। জীবনে অন্ধকার ঢের দেখেছি, কিন্তু ওরকম নিশ্চিহ্ন অন্ধকার কখনো দেখিনি। এক হাত দূরেরও কিছু দেখা যায় না। অন্ধ যেভাবে হাঁটে আমি সেইরকমভাবে অনিশ্চিতের পথে এগিয়ে চললাম। মাঝে মাঝে শুধু সেই কণ্ঠস্বর—ছোট্টাবু!

এগিয়ে চলেছি অন্ধকারে সাঁতার কাটতে কাটতে। কিছুক্ষণ আগেও যেখানে এত ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনেছিলাম—অস্ত্রের বনবনা শুনেছিলাম, কোন ভোজবাজির মতো সব থেমে গেছে। তবে কি সবই মনের ভুল? তাই যদি হয় তাহলে এই যে নিশুতি রাতে অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে চলেছি, এও কি মনের ভুল?

হঠাৎ মনে হলো কে যেন আমার গায়ের ওপর গরম নিশ্বাস ফেলল। আমি চমকে উঠলাম। তারপরেই মনে হলো কেউ যেন আমার পাশ দিয়ে দৃপ্তভঙ্গিতে হেঁটে গেল। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না।

এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সামনে উঁচুমতো ওটা কী একটা একঠেঙে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে?

ঠাণ্ডর করে দেখলাম।

আরে! এ তো ফিরোজ মিনার!

এতদূরে এলাম কি করে? কে আমাকে এখানে ডেকে আনল? কেন আনল? যে ডেকে আনল সে গেলই বা কোথায়?

হঠাৎ হু হু করে একটা বাতাস মিনারে ঠোঁকর খেয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমার সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠল। আর তখনই যে দৃশ্যটা দেখে আমি চমকে উঠলাম তা বোঝানো কঠিন। স্পষ্ট দেখলাম বুড়ো মতো লুপ্তি করা একটা লোক মিনারের গা বেয়ে টিকটিকির মতো তরতর করে একেবারে গম্বুজের মাথায় উঠে গেল আর তারপরেই—

ইস! কেউ যেন তাকে পেছন থেকে ঠেলে ফেলে দিল।

ধড়াস করে কী যেন পড়ল আমার পায়ের কাছে। একটা মানুষের থেঁতলানো দেহ। সর্বাস্থ খরখর কেঁপে উঠল। আর তখনই কে যেন খুব কাছ থেকে ডাকল, ছোট্টাবু!

দেখলাম আমার সামনে হাত দশেক দূরে যেখানে রাজমিস্ত্রির দেহটা আছড়ে পড়েছিল সেখানে দাঁড়িয়ে আছে কালকের সেই গাইড। পরনে কালো লম্বা আলখাল্লা। গলায় চকচকে নানারকম পাথরের মালা। লম্বা চুল পিঠ পর্যন্ত ঝুলছে। সব কিছু কালোর মধ্যে সাদা ধবধবে



দাড়ি বাতাসে উড়ছে। হাতে একটা লোহার চিমটে।

গাইডই তাহলে আমায় এত দূরে টেনে নিয়ে এসেছে!

গাইড বললে, মাং ডরো ছোটীবাবু। ভয় পেও না। এই যা সব শুনেছ, যা দেখলে এসব এখানে হামেশাই ঘটে। কোনো সুলতান বেগম উজির সেনাপতিই খোদার নাম নিয়ে শান্তিতে মরেনি। শুধু কাটাকাটি, খুন, রক্তপাত। এন্তেকাল হবার পরও তাদের আত্মার শান্তি হয়নি।

একটু থেমে সে আবার বললে, কিন্তু যে জন্যে তোমাকে ডেকে এনেছি সে কথা বলি। তুমি ঐ বড়বাবুকে ছেড়ে পালাও। ও মানুষটা ভালো নয়। তোমার ক্ষতি করবে। কাল ও যেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে চাইবে তুমি সেখানে কিছুতেই যেও না। সে জায়গা বড়ো সাংঘাতিক।

বললাম, কিন্তু ফকির সাহেব, আমি যদি ওর কথা না শুনি তাহলে ও আমায় মেরে ফেলবে। ওকে আমার বড় ভয়।

ফকির যেন নিজের মনেই বললে, ছোটীবাবু, ভয় কি শুধু ওনাকেই? ভয় যে আরও আছে ... ঠিক আছে যদি তোমাকে যেতেই হয় তাহলে আমার এই চিমটেটা তোমার কাছে রাখো। এটা দিয়ে কাউকে আঘাত করতে যেও না।

এই বলে ফকির তার হাতের চিমটেটা আমাকে দিল।

তারপর বলল, তবে তুমি যখন এখান থেকে চলে যাবে, এটা রেখে যেও।

কোথায় রাখব?

ফকির বললে, পিয়াসবারির পাড়ে।

এতক্ষণে জিগ্যেস করলাম, ফকির সাহেব, আপনি এই গভীর রাতে কোথা থেকে এলেন?  
ফকির বললে, আমি তো দিন রাত এখানেই থাকি।

দিনরাত কি করেন?

দিনের বেলা গাইড। রাতের বেলা পাহারাদার।

আপনি পাহারা দেন?

ফকির সাহেব হাসল একটু। কালো মুখের মধ্যে থেকে ধবধবে সাদা উঁচু উঁচু দাঁতের সারি ঝিকিয়ে উঠল। আমার গা শিউরে উঠল। কে ও?

সাহস করে বললাম, কী পাহারা দেন? এখানে কিইবা আছে?

তামাম গৌড় সাম্রাজ্য পাহারা দিই। এখানে কী নেই? অনেক কিছু আছে।

কবে থেকে পাহারা দিচ্ছেন?

ফকির বললে, ৯৮৫ আলহিজরা। যেদিন আফগান শূর সুলতান মুজাফফর খানতুরবতিকে হত্যা করা হলো সেদিন থেকে।

আমি চমকে উঠলাম, মুজাফফর খানতুরবতিকে খুন করার সময় যদি ৯৮৫ আলহিজরা হয় তাহলে সেটা ১৫৮০ সালের কথা!

অবাক হয়ে তাকাতে দেখি ফকির অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

## কবর-গৃহের সন্ধানে

৮ মার্চ বেলা এগারোটা

বেলা এগারোটা নাগাদ জেকব মোহন মাণ্ডি আর কয়েকজন আদিবাসীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ওদের হাতে কোদাল, শাবল, গাঁইতি। তাছাড়া জেকবের কাঁধে যে ঝোলাটা রয়েছে তার মধ্যেও নিশ্চয় কিছু যন্ত্রপাতি আছে।

জেকব আমাকে আদেশ করল, আমার পাশে পাশে হাঁটো। পিছিয়ে পড়ার চেষ্টা করবে না।

ও ভেবেছে আমি হয়তো পালিয়ে যাবো। পালিয়ে গিয়ে হয়তো ওর মতলব ফাঁস করে দেব।

আমি তাই নিষ্প্রাণ পুতুলের মতো ওর পাশে পাশে চললাম। কোথায় যাচ্ছি কত দূরে যাচ্ছি তা জানি না। মনে পড়ল গত রাতের কথা। ফকিরের সেই কথাগুলো, ছোটিবাবু, বড়বাবু যেখানে নিয়ে যেতে চাইবে সেখানে যেও না।

কিন্তু উপায় নেই। যেতে হচ্ছে। ভরসা শুধু ফকিরের দেওয়া চিমটেটা।

জেকব ব্যঙ্গ করে বলেছিল, ওটা আবার পেলে কোথায়?

বলেছিলাম, মাঠে কুড়িয়ে পেয়েছি।

ঠাট্টা করে বলেছিল, রেখে দাও। সাপ-ব্যাঙ সামনে পড়লে মারতে পারবে।

ক্রমে আমরা ভাঙা প্রাসাদ, মসজিদ ছাড়িয়ে একটা প্রান্তরে এসে পৌঁছলাম। জেকব এগিয়ে চলেছে। যেন ইতিমধ্যেই জায়গাটা চিনে রেখেছে। নির্জন প্রান্তর। দূরে দূরে গরু, মোষ চরছে। এপাশে-ওপাশে দু'তিনটে দীঘির মতো পুকুর। এসবই একদিন সুলতানদের কেউ না কেউ তৈরি করেছিলেন। আজ তাঁদের কথা কেউ জানে না।

ফাল্গুন মাস। এরই মধ্যে রোদের তেজ বেড়ে উঠেছে। জেকব ব্যাগ থেকে একটা টুপি বার করে মাথায় চাপিয়ে নিল। একে তো বেঁটে কালো চেহারা। তার ওপর যখন টুপি মাথায় পরে গটগট করে হাঁটছিল তখন ওকে মনে হচ্ছিল একটা ক্ষুদ্রে শয়তান।

কিছুদূর এগিয়ে একটা ভাঙা পাঁচিল দেখা গেল। বোঝা গেল এক সময়ে অনেকখানি জায়গা ঘিরে মস্ত উঁচু পাঁচিল ছিল। কিন্তু এখন শুধু খানিকটা দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা সেই খাড়া পাঁচিলের পাশ দিয়ে মাঠের মতো একটা খোলা জায়গায় ঢুকলাম। জেকব তার নোটবই বের করে দেখে নিল। তারপর ফিতে ফেলে কিছুদূর মাপজোক করল। এবার সে মনের আনন্দে টুপিটা খুলে ফেলল। তারপর আদিবাসীদের একটা বিশেষ জায়গা খুঁড়তে বলল।

আমি তো কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। এ তো সমতল জায়গা। কবরের চিহ্নমাত্র নেই। এখানে খুঁড়ে কি লাভ?

ততক্ষণে আদিবাসীরা গাঁইতি চালাতে আরম্ভ করেছে।

প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলল খোঁড়া। অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা বিশাল গর্ত হলো। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল ধুলো আর ইটের টুকরো।

জেকব কয়েকটা ভাঙা ইট কুড়িয়ে নিয়ে পরীক্ষা করল। তারপর আদিবাসীদের হাতে কতকগুলো টাকা গুঁজে দিয়ে বলল, আরও টাকা পাবে। গভীর করে খোঁড়ো।

ঝপাং ঝপাং করে গাঁইতির ঘা পড়তে লাগল। একটা মানুষের মতো গভীর গর্ত তৈরি হলো। জেকব সেই গর্তের মধ্যে নেমে পড়ল। কিন্তু প্রতিমুহূর্তেই আমার ওপর ওর সতর্ক দৃষ্টি।

আরো জোরে গাহাত চালাও।

আদিবাসীরা টাকার লোভে জীবন পণ করে গাঁইতি চালাতে লাগল।

এবার মাটি অনেক ঢিলে। গাঁইতির এক এক ঘা পড়ে আর হুড়মুড় করে ইট-মাটির চাঙড় ভেঙে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কোদালে করে সেগুলো তুলে বাইরে ফেলে দিতে লাগল। এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ভেতরটা ফাঁকা। ওখানে কিছু আছে।

লক্ষ্য করলাম আদিবাসীদের গাঁইতি চালানো যেন আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে আসছে। ওরা কি ক্লান্ত হয়ে পড়ছে?

কিন্তু না। ওরা বার বার আকাশের দিকে তাকাচ্ছে।

তারপর হঠাৎই গাঁইতি রেখে দিয়ে ওরা জেকবকে ব্যস্ত হয়ে বলল, আমরা এখন চললাম। জেকব প্রচণ্ড রেগে বলল, চললে মানে? আর একটু খুঁড়লেই ভেতরে ঢুকতে পারব। এখন চললাম বললে হবে না।

ওরা একসঙ্গে বলল, না। সন্ধে হয়ে আসছে। সন্ধের আগেই আমাদের ঘরে ঢুকতে হবে।

তারপর আকাশের দিকে আঙুল তুলে নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করল।

তাকিয়ে দেখলাম ঘন কালো মেঘ উত্তর-পশ্চিম কোণে জমে উঠেছে। একে তো চারিদিক নিস্তরঙ্গ, লোকজনের চিহ্নমাত্র নেই। যে গরু-মোষগুলো মাঠে চরছিল তারাও ফিরে গেছে। আদিবাসীরা শুধু পালান না, ছুটতে লাগল। সে ছোট্টা যেমন তেমন ছোট্টা নয়, প্রাণভয়ে ছোট্টা।

অনেক পরে জেনেছিলাম ওদের সংস্কার, ফাল্গুনের বিকেলে যদি মেঘ ওঠে, ঝড় হয় তাহলে তা বিপদের সংকেত।

জেকব ব্যাজার হয়ে বললে, সব ভীতুর একশেষ। একটুর জন্যে কাজটা শেষ হলো না।

এমন সময় মাঠের ওদিক থেকে গোঁ গোঁ করে শব্দ উঠল। আমরা চমকে উঠলাম। প্রচণ্ড ঝড় আসছে।

এই ধু-ধু মাঠের মধ্যে ঝড়ের মুখে পড়লে রক্ষে নেই। তাই আমরাও ঘরমুখো ছুটতে লাগলাম।

## মৃত্যুওহা

### ৯ মার্চ রাত দুটো

সারা রাত ঝড়ের দাপট ছাড়া আর কোনো ঘটনা ঘটেনি। পরশু দিন রাতে যে আজানধ্বনি বা ঘোড়ার ছোট্টাছুটির শব্দ শুনেছিলাম, গত রাতে সেরকম শুনিনি।

আজ সকালে উঠেও দেখি আকাশের মুখ ভার। জেকবের মুখ ততোধিক ভার। মাঝে মাঝে শোঁ শোঁ করে দমকা বাতাস দিচ্ছে। এ এক অকাল দুর্যোগ।

জেকবকে দেখছি ঘরের মধ্যে ছটফট করছে। খোঁড়ার কাজ অসমাপ্ত পড়ে আছে। এখানকার চোর-ডাকাতদের ভয় নেই। তারা আর যাই হোক মৃতের কবরকে সম্মান করে কিংবা ভয় করে। ভয় বিদেশী চোরদের। এইসব বিদেশী চোর-ডাকাতের অভাব নেই। সন্ধান পেলে তারা ঢুকে পড়বে। আর একবার ঢুকে পড়তে পারলে ফিরোজ শাহের ধনরত্ন সব ফাঁক করে দেবে। তাছাড়া ঝড়ের সঙ্গে যদি বৃষ্টি নামে তাহলে তো সব কাজ পণ্ড। কবরের মুখে জল ঢুকে গেলে বসে থাকতে হবে জল শুকানো পর্যন্ত। কিন্তু জেকব আর একটা দিনও বসে থাকতে চায় না।

জেকব আমার সঙ্গে একটা কথাও বলছে না। আমি যেন ফালতু লোক। অথচ আমায় ছেড়েও দিচ্ছে না। ছেড়ে দিলে তো আমি বাঁচি।

শেষ পর্যন্ত ঝড় একটু থামলে বেলা তিনটে নাগাদ আবার সকলে রওনা হলাম। আদিবাসীরা কিছুতেই যাবে না। ওরা বলছে, মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে সন্ধে হয়ে যাবে।

জেকব ওদের বোঝাল পাঁচটার আগেই তাদের ছেড়ে দেবে।

পাঁচটার আগেই ওরা চলে গেল। অবশ্য তখন খোঁড়ার কাজ শেষ। ধুলোয় ঢাকা একটা বেঁটে দরজার সামনে এসে আমরা দুজনে দাঁড়িয়েছি। বোঝা গেল সমাধিগৃহে ঢোকবার এটাই দরজা। দরজাটায় চমৎকার কারুকার্য করা। এত বছরেও সেসব কাজ নষ্ট হয়নি। কিন্তু দরজাটা এত নিচু কেন?

বুঝতে পারলাম এই পবিত্র সমাধিগৃহে যাতে মাথা নিচু করে ঢুকতে হয় তারই জন্যে এই ব্যবস্থা।

জেকব নিজের মনেই যেন বললে, যাক, এখানে আমরাই প্রথম। আজ পর্যন্ত কোনো চোর এ জায়গার সন্ধান পায়নি।

ইতস্তত করে বললাম, এই সন্ধেবেলা আমরা ঢুকব?

জেকব খেঁকিয়ে উঠে বলল, তবে কি চোরদের জন্যে দরজা খুলে রেখে যাব? টর্চ বের করো।

দরজাটার কড়ার সঙ্গে একটা মোটা শেকল বাঁধা ছিল। জং ধরে গিয়েছিল। জেকব ঝুলি থেকে দুটো যন্ত্র বার করে শেকলে চাপ দিতে লাগল। অনেকক্ষণের চেষ্টায় শেকল ভাঙল না বটে কিন্তু কড়া দুটো উঠে এল।

এবার ওর সঙ্গে আমাকেও দরজা ঠেলতে বলল। দু'জনে জোরে ধাক্কাধাক্কি করতেই একটা বিকট শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল। একরাশ ধুলোর সঙ্গে একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এসে ঢুকল। আমরা দু'জনেই নাকে রুমাল চাপা দিলাম।

মিনিট পাঁচেক পরে আমরা টর্চ জ্বলে ভেতরে ঢুকলাম। কালো পাথরের টালি দিয়ে গাঁথা মেঝে। ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

আমার গা-টা ছমছম করতে লাগল। পাঁচশো বছর পর এ কোন প্রেতপুরীতে আমরা ঢুকছি!

হয়তো ভয়ের কোনো কারণই থাকত না যদি না মাত্র পরশু রাত্রেই আমার সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হতো। এখানে আসার আগে থেকেই আমি কিছু অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছি। এক নম্বর সেই কাকটা—গুলি খেয়েও যেটা মরেনি। দ্বিতীয় নম্বর কেন একার ঘোড়াটা

পিয়াসবারি দীঘির আগেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল? কেন আর এক কদমও এগোল না। তৃতীয়ত—ফকির সাহেব। যে নাকি সারা রাত্রি গোটা গোড় পাহারা দিয়ে বেড়ায়। কাজেই এই কবরগৃহ যে শুধুই একটা পুরনো কবরস্থান তা নাও হতে পারে। এটা যে ভয়ঙ্কর জায়গা, এখানে এলে যে বিপদ অবশ্যস্বাবী, ফকির সে কথা বলে আমায় সাবধান করে দিয়েছিল।

এসব কথা মনে হতেই আমার পা দুটো অসাড় হয়ে গেল। আর এক পাও এগোতে সাহস হলো না।

জেকব ধমক দিয়ে বললে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তাড়াতাড়ি এসো।

তার সেই কণ্ঠস্বর চাপা ঘরের চার দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে গমগম করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট শুনলাম, কাছেই কোথায় মৃদু শব্দ হলো। শব্দটা শুনে মনে হলো কিছু যেন নড়ে উঠল। কেউ যেন সংকীর্ণ জায়গার মধ্যে পাশ ফিরল।

শব্দটা জেকবও শুনেছিল। দেখলাম সেও কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তারপরই যেন নিজের মনেই বলল, ও কিছু না।

আমাকে আদেশ করল, আমার পাশে পাশে এসো।

আমি বললাম, জুতোটা খুলব?

দরকার নেই।

অগত্যা পবিত্র কবরগৃহে জুতো পরেই এগিয়ে চললাম। একটাই ভরসা—ফকিরের দেওয়া লোহার চিমটেটা আমার মুঠোয় শক্ত করে ধরা।

জেকব চারদিকে টর্চের আলো ফেলছে। হঠাৎ ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এ কী! এ ঘরে এত কবর!

আমিও অবাক হলাম। দু'পাশে সাতটা মাঝারি সাইজের কবর।

কিন্তু তা তো হবার কথা নয়। জেকবের লক্ষ্য কোনো এক ফিরোজ শাহের কবর। তিনি সুলতান ছিলেন। প্রচুর ঐশ্বর্য। অত্যন্ত খেয়ালী। মরার আগে তিনি নাকি কোনো গোপন জায়গায় নিজের সমাধিঘর তৈরি করে রেখেছিলেন। সেখানে নিশ্চয় তিনি শুধুই রাজপোশাক পরে শুয়ে থাকবেন না। সঙ্গে সোনাদানা, ধনরত্নও থাকবে। আর নিশ্চয় সেই কবরগৃহ হবে তাঁর একারই।

তাই যদি হয় তাহলে এই কবরগুলো কাদের? তবে কি এটা সুলতান ফিরোজ শাহের কবর নয়?

জেকব যেন আমার মনের কথা টের পেয়ে বলল, এগুলো হয়তো তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের।

তাহলে সুলতানের কবরটা কোথায়?

জেকব চারদিকে টর্চের আলো ফেলতে লাগল। অন্ধকার এতই জমাট যে টর্চের আলো বেশিদূর যাচ্ছিল না। হঠাৎ চোখে পড়ল দেওয়ালের একদিকে প্রায় চার হাত উঁচুতে একটা ছোটো দরজা। আমরা তাড়াতাড়ি সেইদিকে এগিয়ে গেলাম। হ্যাঁ, দরজাই। তবে এটাকে দরজা না বলে একটা বড় জানালা বলা যেতে পারে। তবে জানালা নয়। জানালা হলে গরাদ থাকত। এতে দরজার মতোই মস্ত দুটো পেতলের কড়া লাগানো আছে। আর কড়া দুটো সিল করা। দরজার গায়ে ফারসীতে কী যেন লেখা আছে। অক্ষর উঠে গেছে। জেকব ভালো করে পড়তে পারল না। তবে সে নিশ্চিত এই ঘরেই সুলতান আছেন।

তখনই সে যন্ত্রপাতি দিয়ে সিল ভেঙে ফেলল। আমার বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। স্পষ্ট অনুভব করলাম আমার পিছনে কারা যেন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে। চকিতে পিছন ফিরলাম। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। শুধু একটা তপ্ত হাওয়া আমার শার্টটাকে দুলিয়ে দিয়ে গেল। এই বন্ধ ঘরে হাওয়া কোথা থেকে আসবে তা বুঝতে পারলাম না। আমি চিমটেটা আরও শক্ত করে ধরলাম।

ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং করে বার কয়েক ঝাঁকানি দিতেই দরজাটা খুলে গেল। মুখটা পকেট থেকে রিভলভার বার করে জুতো পায়েই ভেতরে লাফিয়ে পড়ল। বুঝল না কার জন্যে রিভলভার? কে আছে ঘরে? কে থাকতে পারে তাকে রিভলভার কিছু করতে পারে না।

আমিও টর্চ জ্বেলে ভেতরে ঢুকছিলাম। জেকব কড়া গলায় বললে, তুমি বাইরে থাকো। ডাকলে তবে এসো।

আমি যেন বেঁচে গেলাম। সেই কুঠুরির বাইরে দাঁড়িয়েই আমি ভেতরটা এক ঝলক দেখে নিলাম। সাজানো-গোছানো ঘর। দেওয়ালে দেওয়ালে ফারসীতে কোরানের বাণী। একটা উঁচু বেদীর ওপর স্থাপিত কষ্টিপাথরের মত চকচকে কালো পাথরের বিশাল একটা কবর। কবরের গায়ে নীল, সাদা, হলুদ, সবুজ মিনার কাজ। এ ঘরে ঐ একটিই কবর। কবরের দৈর্ঘ্য দেখলেই বুঝতে অসুবিধে হয় না এখানে যিনি শুয়ে আছেন তিনি লম্বায় ছয় ফিটেরও বেশি।

সমাধির ওপর টাঙানো রয়েছে সাদা সিল্কের সামিয়ানা। জীর্ণ, বিবর্ণ। চারটে লাল থামে সামিয়ানার চার কোণ দড়ি বাঁধা। ঝুলছে সোনার চেন।

লক্ষ্য পড়ল কবরের চারপাশে হাতির দাঁতের ক্যাশবাক্সের মতো বড় বড় বাস্ক। দেখলাম জেকব একটা বাস্ক ভেঙে ফেলল। তারপরে ভেতর থেকে বের করতে লাগল হীরে, পান্না, চুনি—রাশি রাশি।

তখনই গোটা তিনেক বাস্ক ঝুলির মধ্যে ঢুকিয়ে নিল।

এবার সে উঠে একটা হাতুড়ি নিয়ে কবরটার দিকে গেল। ও যে কী করতে যাচ্ছে ভেবে শিউরে উঠলাম। অমন সুন্দর কারুকার্যকরা কবরটা ও হাতুড়ির গায়ে ভেঙে ফেলবে! তার নিচ থেকে টেনে তুলবে কফিন। ওর ধারণা কফিনের মধ্যে মৃতদেহ ধুলো হয়ে গেলেও নিশ্চয় আরো অনেক ধনরত্ন আছে।

জেকব কবরের গায়ে জোরে হাতুড়ির ঘা মারল। আমি সে দৃশ্য দেখতে পারলাম না। ওখান থেকে পিছিয়ে আগের ঘরে এসে দাঁড়লাম।

অন্ধকার কবরের রাজ্যে একা দাঁড়িয়ে থাকা যে কী ভয়ঙ্কর তা যে কখনো দাঁড়িয়েছে সে ছাড়া আর কেউ কল্পনা করতে পারবে না।

ওদিকে হাতুড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। বুঝতে পারছি পাথরের কবর চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ হাতুড়ির শব্দ ছাপিয়ে কাঁচ করে একটা অস্বাভাবিক শব্দ। আমি চমকে উঠে সেইদিকে এগিয়ে গেলাম। দেখি যে ঘরে জেকব কবর ভাঙছিল সেই ঘরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিকট আর্তনাদ। তারপরেই হাড়-হিম-করা গোঙানি।

এ যে জেকবের গলা তা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না।

কী হলো জেকবের?

আমি ছুটে গেলাম বন্ধ দরজাটার কাছে। প্রাণপণে ঠেলতে লাগলাম। কিন্তু দরজা এতটুকু নড়ল না।

আমি দরদর করে থামতে লাগলাম। কী করব এখন? কি করে জেকবকে বাঁচাব? আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম।

কিন্তু এভাবে এখানে যে একা দাঁড়িয়ে থাকা মোটেই ভালো নয় একথা মনে হতেই উঠ জেলে বাইরের দরজার দিকে ছুটলাম।

দেখি বাইরের দরজাটাও আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

আমি প্রাণপণে ছুটে যখন দরজার কাছে গেলাম তখন পাল্লা দুটো প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। কোনোরকমে কাত হয়ে আমি বেরিয়ে এলাম।

পুলিশকে খবর দেওয়া আমার উচিত ছিল। নইলে জেকবের মৃতদেহ খুঁজে পেলে পুলিশ আমাকেই ধরবে। ভাববে ধনরত্নের লোভে আমিই জেকবকে খুন করেছি।

কিন্তু থানা-পুলিশ করতে সাহস পেলাম না। সেই রাতেই মোহন মাণ্ডিকে সব কথা বললাম।

ও বলল, এমনটা যে হবে তা আমরা জানতাম। কাল ভোরবেলায় গরুর গাড়ি ঠিক করে দেব। আপনি চলে যান।

### ১০ মার্চ বিকেল চারটে

আজ দুপুরে গরুর গাড়ি করে নিরাপদে মালদহর হোটеле ফিরে এসেছি। তবে একা। ফকিরের দেওয়া চিমটেটা পিয়াসবারির ধারে রেখে আসতে ভুলিনি।

### সমাপ্তি

ডায়েরি এখানেই শেষ।

১৯৩৫ সালের লেখা ডায়েরি। ৬৪ বছর পর সেটা খুঁজে পেয়ে নতুন করে কাহিনিটা লিখে ফেললাম।

রতন এক পেয়ালা কফি নিয়ে এল। আমি তখন দেওয়ালের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কিছু খুঁজছিলাম।

রতন বললে, ওখানে কী খুঁজছেন?

বললাম, কিছু না।

তারপর কফির পেয়ালায় চুমুক দিলাম।

আসলে সুলতানের হাতের লেখাটা খুঁজছিলাম। নেই। অদৃশ্য হয়ে গেছে!

# গভীর রাতের আগন্তুক

॥ এক ॥

বাড়িটার নাম ‘মহলেশ্বরী’।

না, বাড়ি নয়, প্রাসাদ—জীর্ণ দোতলা প্রাসাদ।

চুঁচড়ো থেকে আক্না, পঞ্চাননতলা, ভৈরবপুর ডিঙিয়ে ভাস্তারার দিকে চলে গেছে চমৎকার পিচঢালা রাস্তা। সারাদিন বাস যায় আসে। এ ছাড়া ছোট্টে লরি। মাঝে মাঝে প্রাইভেট কারও। বড়ো শাস্ত্র পরিবেশ। দুদিকে মাঠ। মাঠের ওদিকে ছবির মতো দেখা যায় গ্রাম।

বাসরাস্তা থেকে ডান দিকে একটা সরু ধুলোভরা পথ চলে গেছে। দুপাশে বাবলা গাছ, আর তোলকলমীর ফুল-বাহার।

এই কাঁচা রাস্তার শেষে যে জায়গাটা সেখানে কিছু লোকবসতি আছে। খুবই গরিব তারা। চাষ করে, মজুর খাটে। ওরই মধ্যে রয়েছে দু-একটা চায়ের আর ছোটোখাটো মুদির দোকান। কোনো একসময়ে এখানকার জমিদার নন্দীদের প্রভাবে জায়গাটার নাম ছিল ‘নন্দীগ্রাম’। পরে নীলকর সাহেবরা এখানে নীলের চাষ করতে এলে তাদের দৌলতে নন্দীগ্রামের নাম ঘুচে গিয়ে নতুন নাম হয় ‘নীলগঞ্জ’। এই নামটা অবশ্যই অনেক পরের।

নন্দীদের বিরাট তেতলা বাড়িখানা এখনও দিব্যি টিকে আছে। দোতলার সার সার ঘরগুলোর জানলা যে শেষ পর্যন্ত কবে বন্ধ করা হয়েছিল কে জানে! এখনও পর্যন্ত তা খোলা হয়নি। গোটা বাড়িটার চারদিকে অনেকখানি জায়গা জীর্ণ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পিছনের দিকে নন্দীদের নিজস্ব ঘাট-বাঁধানো পুকুর। পুকুরে এখনও জল টলটল করছে। পুকুর-পাড়েই একটা বেলগাছের নিচে নন্দীদের শিবমন্দির। আগে বাড়ির বৌ-ঝিরা এখানে শিবরাত্রিতে পূজো দিত। রাত জাগত।

বাড়িতে ঢোকান মুখেই লোহার পাত-আঁটা ভারী কাঠের পাল্লা দেওয়া দরজা। দুটো পাল্লার একটা ভেঙে পড়ে আছে এক পাশে। তাতে জঞ্জাল জমে উঠেছে।

এরপর সিংদরজা। দোতলাসমান উঁচু। তার ওপর নহবৎখানার ভগ্নাবশেষ। একসময়ে প্রহরে প্রহরে বাজত রাগ-রাগিণীর আলাপ।

নিচের তলাটা অবশ্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তার কারণ নিচের কয়েকটা ঘর ভাড়া দেওয়া আছে—না, না, বাস করার জন্যে নয়, গুদামঘর হিসেবে।

নিচের ঘরগুলোর সামনে দিয়ে চলে গেছে শ্বেতপাথরের বাঁধানো অন্দরে যাবার পথ। সেই পথ দিয়ে ভেতরে ঢুকলে যেন গোলকর্থাধার মধ্যে পড়তে হয়। ঘরের পর ঘর—গলির পর গলি। সব ঘরেই তালা ঝুলছে।



বাড়ির ঠিক পিছনে বিরাট আমবাগান। তার ডালপালা প্রেতাত্মার বীভৎস হাতের মতো খুলে পড়েছে ছাদের ওপর। সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ দেখলে কেমন ভয়-ভয় করে। আশ্চর্য এই, এত যে সতেজ আম-গাছ, কিন্তু আম ফলতে দেখেনি এ অঞ্চলের লোক। কেন আম ফলে না?

তা নিয়েও নানা জল্পনা। থাক, এখন সেকথা।

বাড়িটার নাম একটু অদ্ভুত—‘মহলেশ্বরী’। শোনা যায় এবাড়ির কোনো এক মহীয়সী রানীমাই নাকি এবাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। তাই ঐ নাম।

বাড়িতে বহুদিন ধরে কেউ থাকে না। কাছে-পিঠের মানুষ সন্দের পর এবাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না।

কেন ঘেঁষে না তার উত্তর মেলে না। বলে—রাজরাজড়াদের অভিশপ্ত বাড়ি। কত খুন, গুম খুন হয়েছে তার কি ঠিক আছে?

কিন্তু এসবের কোনো প্রমাণ নেই—জনশ্রুতি মাত্র।

জনশ্রুতি-গল্পকথা ছাড়া কী? নইলে একালের ছেলে-ছোকরারা সারা দুপুর ঐ মার্বেল পাথরের বারান্দায় বসে তাস পিটোতে পারে? নাকি কেউ গুদামঘর করে ব্যবসা করতে পারে? তাছাড়া দালালরাও আসে কলকাতা থেকে। ঘুরঘুর করে বাড়িটা কেনার জন্যে। এই বাড়ি ভেঙেই দিবা হাল ফ্যাশানের বহুতল বাড়ি করা যায়।

কিন্তু এ বাড়ির মালিক বড়ো কড়া। তিনি এবাড়ি কিছুতেই বিক্রি করবেন না। এ তাঁর পূর্বপুরুষের বাড়ি। তিনি যতদিন বেঁচে আছেন এ বাড়ির একখানি ইটও কেউ খসাতে পারবে না।

তাঁর পাত্তা পাওয়াও কঠিন। কোথায় কখন থাকেন কেউ বলতে পারে না। দেশভ্রমণ তাঁর নেশা।

তিনি এবাড়িতে বহুকাল আসেননি। আসার দরকারও নেই। তিনি জানেন এ বাড়িটার সম্বন্ধে অনেক দুর্নাম আছে। ভয়ে কেউ অস্তুত জবর-দখল করতে এগোবে না। চোরও আসে না দামী-দামী জানলা খুলে নিতে।

এই প্রাসাদের কাছেই আছে আরও কয়েকটা ভাঙা বাড়ি। সেসব বাড়িতে এক সময়ে থাকত নীলকর সাহেবরা। নীলের চাষ করে তারা লাল হয়ে গিয়েছিল। পিছনেই বিরাট বাঁওড়।

ভাবতে ভারি অদ্ভুত লাগে—একদিকে থাকত সাহেবরা, কাছেই বাঙালি জমিদার। সাহেবদের ছিল বন্দুক, পিস্তল; জমিদারদের ছিল বাঁধা লেঠেল। তাঁদের ঘরে ঘরেও থাকত বন্দুক, আর তরতরে-ধার তরোয়াল।

সাহেব আর বাঙালি জমিদারদের সম্পর্ক কিরকম ছিল কে জানে!

সম্পর্ক যেমনই থাক, কয়েক বছর আগে জমি চাষ করতে গিয়ে বেরিয়েছিল রাশিরাশি কঙ্কাল। আর সাহেব-মেমরাও যে ভুতের ভয় পেত তার অনেক লোমহর্ষক কাহিনি শোনা যায় নব্বই বছরের বুড়ো ওঝা সনাতন সোঁর মুখে।

সেদিন তখন সন্দের মুখ। ‘মহলেশ্বরী’র অন্দরমহলে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। তারই মধ্যে কেউ একজন এক-একটি ঘরের তালা খুলে ভেতরে ঢুকছে। তারপর বেরিয়ে এসে বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক-একসময়ে নিজের মনেই বলছে—বাঃ! চমৎকার!

লোকটি এগিয়ে গেল দ্বিতীয় মহলের দিকে। হঠাৎ যেন শুনতে পেল কিসের শব্দ।

শব্দটা আসছিল পাশের ঘর থেকে। একটা যেন ঝটাপটির শব্দ। লোকটির দু'চোখ অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে উঠল উদ্ভেজনায। চাবির থোক থেকে বেছে বেছে একটা চাবি লাগিয়ে দরজাটা খুলল। ভেতরে ভ্যাপসা গন্ধ। টর্চের আলো ফেলল। দেখল দুটো চামচিকে ঝটাপটি করছে।

ধুস্! যেন হতাশ হলো লোকটি। বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আবার তালা লাগালো। ঠিক তখনই পিছনে পায়ের শব্দ। কেউ আসছে। চমকে উঠে ঘাড় ফেরালো।

বাবু!

কি হলো, এখানে কেন? বাবু বিরক্ত হলেন।

বড্ড অন্ধকার। আলো জ্বেলে দিই?

না। তুই তোর কাজে যা।

ভূতটি কিছু বুঝতে পারল না। খানিকক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর চলে গেল বাইরে। ভাবল, যেমন অদ্ভুত বাড়ি, তেমনি অদ্ভুত তার মনিব। অথচ তিনি এমন ছিলেন না। এখানে এসে পর্যন্ত যেন কেমন হয়ে গেছেন।

## ॥ দুই ॥

### নিয়তির হাতছানি

বাবুর নাম দিবাকর নন্দী। তিনি আর্টিস্ট। দারুণ ছবি আঁকেন। ছবি আঁকা নিয়েই থাকেন। কাজকর্ম কিছু করেন না। করার দরকারও নেই। প্রচুর টাকা। বিয়েও করেননি, একা মানুষ। সঙ্গে শুধু অনেক দিনের পুরনো ভৃত্য সদাশিব।

দিবাকরের শখ দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো। সঙ্গে ছবি আঁকার সরঞ্জাম। যেসব জায়গার প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখার মতো, সেখানেই তিনি ছুটে যান। কখনো বড়ো হোটেল, কখনো ঘরভাড়া করে থাকেন, যত দিন ভালো লাগে। ভালো লাগার পালা ফুরোলেই তিনি সদাশিবকে হেঁকে বলবেন, সদাশিব প্যাক আপ।

এইভাবেই তিনি কাশ্মীর, রাজস্থান, দার্জিলিং, সিমলা, কন্যাকুমারী, উটকামণ্ড প্রভৃতি নানা জায়গা ঘুরে সম্প্রতি এসেছিলেন নেপালের কাঠমাণ্ডুতে।

মানুষটি খুশমেজাজের। তিনি যে এক সময়ের রাজপরিবারের না হোক, বনেদী জমিদার পরিবারের বংশধর সেটা তিনি মাটিতে লোটানো ধুতির কোঁচা, সিল্কের পাঞ্জাবি, বিলিতি সেক্টের গন্ধ মাখানো রুমাল, ঘাড় পর্যন্ত ঝোলা কুচকুচে কালো চুল আর চওড়া জুলপি দেখিয়ে বুঝিয়ে দেন।

তাঁর একটু যে খুঁতখুঁতুনি তা তাঁর কটা রঙের গোঁফ আর চোখের কটা মণিটা নিয়ে। ও দুটো যে কেন কালো না হয়ে কটা হলো তা তিনি বুঝতে পারেন না।

অবশ্য একসময়ে বাঙালিদের কটা চুল, কটা গোঁফ, কটা চোখের মণি খুব গৌরবের ছিল। কেননা সাহেবরা খুব পছন্দ করত।

বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দিবাকর নন্দী সফ্র গোঁফে আঙুল বোলাতে বোলাতে সদাশিবকে উদ্দেশ্য করে বলেন, বুঝলি সদাশিব, এই যে কটা গোঁফ দেখছিস এ সবার ভাগ্যে হয় না।

সদাশিব বোকার মতো তাকিয়ে থেকে বলে, এজ্ঞে।

আজ যদি সাহেবরা এ দেশে থাকত, তাহলে তারা আমার এই গোঁফের মর্যাদা দিত।

সদাশিব হেসে বলে, এজ্ঞে, তা বৈকি।

দিবাংকর নন্দী বরাবর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিই আঁকেন। কিন্তু সম্প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির একটু পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তনের পিছনে সামান্য একটু ঘটনা আছে।

তাঁর একটা বিশেষ শখ কিউরিওর দোকানের খোঁজ পেলেই সেখানে ছুটে যাওয়া। আর খুব পুরনো—এখন যা পাওয়া যায় না—এমন জিনিস সংগ্রহ করা। সেবার গ্যাংটকে গিয়ে অমনি একটা দোকানে পুরনো জিনিস হাতড়াতে হাতড়াতে কতকগুলো অয়েল-পেন্টিং পেয়েছিলেন। তার মধ্যে একটা ছবি দেখে তিনি আঁকে উঠেছিলেন। ছবিটা অদ্ভুত। কালো ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপর ধূসর রঙে আঁকা একটা আবছা মুখের আভাস। মুখটা অনেকটা একজন ক্রুদ্ধ মহিলার মুখের মতো। ভয়ঙ্কর সে মুখ। কিন্তু তা মানুষেরও নয়, দেবদেবীরও নয়।

ছবিটা তাঁকে এতই আকর্ষণ করেছিল যে তিনি তখনই তা কিনতে গেলেন। কিন্তু ওটার যা দাম তত টাকা তাঁর পকেটে ছিল না। তিনি তখনই টাকা আনতে বাড়ি ছুটলেন। কিন্তু ফিরে এসে ছবিটা আর পেলেন না। বিক্রি হয়ে গেছে।

তাঁর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু কি আর করা যাবে! তারপর থেকে অনেক জায়গায় ছবিটার খোঁজ করেছিলেন। কিন্তু পাননি। ছবিটা যেন তাঁর ঘাড়ে ভর করেছিল। কিছুতেই ছবিটার কথা ভুলতে পারছিলেন না।

আসলে ছবিটা তাঁকে খুব ভাবিয়ে তুলেছিল। তিনি ভাবতে লাগলেন—ঐ ছবিটা যিনি এঁকেছিলেন তাঁর আঁকার উদ্দেশ্য কি ছিল? ঐরকম ছবি শুধু শুধু কেউ আঁকে? তবে কি ঐ অজ্ঞাত শিল্পী নিজের চোখে ঐরকম কিছু দেখেছিলেন? আর যা দেখেছিলেন তা বললে লোকে বিশ্বাস করবে না বলে ছবির মধ্যে দিয়ে তা ফুটিয়ে তুলেছিলেন?

ছবিটা যখন কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না তখন তিনি ঠিক করলেন নিজেই ঐরকম ছবি আঁকবেন। কিন্তু যখনই রঙ-তুলি নিয়ে বসেন তখনই সব কেমন ঘুলিয়ে যায়। ছবিটার সূক্ষ্ম কাজ কিছুতেই মনে করতে পারেন না।

এ তো বড় জ্বালা!

তিনি তখন বুঝতে পারলেন, ঐরকম কিছু স্বচক্ষে না দেখলে ও ছবি আঁকা যাবে না।

কিন্তু ঐরকম কিছুর দেখা কোথায় পেতে পারেন? অলৌকিক ব্যাপার তো যেখানে সেখানে ঘটে না। তাছাড়া আজকের যুগে ওসব ব্যাপার আশাই করা যায় না।

এই সময়ে তাঁর মনে হলো দেশের বাড়ির কথা। তাঁদের সেই ‘মহলেশ্বরী’। ঐ বাড়ি সম্বন্ধে অনেক কিছুই তিনি ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছেন। অনেক অপঘাত-মৃত্যু নাকি একসময়ে ঐ বাড়িতে হয়েছিল।

তিনি ভাবলেন যদি সত্যিই কিছু অলৌকিক ব্যাপার এখনও ঘটে তাহলে ওখানে গিয়ে থাকতে পারলে নিশ্চয় কিছু দেখতে পাবেন। ভাগ্য প্রসন্ন হলে সেই ছবিটার মতো ভয়ঙ্কর মুখেরও দর্শন মিলতে পারে।

কিন্তু একটাই অসুবিধে—বাড়ির নিচের তলাটা ভাড়া দেওয়া আছে। তাদের তুলতে না পারলে ওখানে গিয়ে লাভ হবে না।

তিনি তখনই কলকাতায় ওঁর একটি মাত্র বন্ধু সুরঞ্জনকে অনুরোধ করে চিঠি লিখলেন, যেন সে ভাড়াটে তোলায় চেষ্টা করে। জানিয়ে দিলেন, তিনি এখন দেশের বাড়িতে গিয়েই থাকবেন।

চিঠি লিখতে গিয়ে তিনি একবার শুধু থমকে গেলেন। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো কোথাকার

কোন একটা সামান্য ছবির জন্যে এ তিনি কী করতে চলেছেন! এটা কি পাগলামো হচ্ছে না?

কিন্তু এই শুভচিন্তা শুধু মুহূর্তের জন্যে। চিঠি তিনি লিখলেন। এবং নিজে হাতে পোস্ট করে দিলেন।

সুরঞ্জন মাসখানেক পরে জানালেন, অনেক চেষ্টা করলাম, ভাড়াটে উঠবে না। তবে যদি হাজার পঁচিশ টাকা ছাড়তে পার তা হলে উঠবে।

দিবাকর তখনই বন্ধুর কাছে টাকা পাঠিয়ে দিলেন।

ভাড়াটেরা উঠল। দিবাকর হাসিমুখে সদাশিবকে বললেন, প্যাক আপ।

তখনও তিনি জানতেন না নিয়তি তাঁকে কিভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

## ॥ তিন ॥

### দিবাকরের আনন্দ

দিবাকর নন্দী মনের আনন্দে নিজের গ্রামে ফিরে এলেন। আনন্দ তো হবেই। ভাড়াটে উঠিয়ে বহুকাল পর স্বদেশে এসেছেন। আর তাঁর বিশ্বাস—এখানে থাকতে থাকতে একদিন-না একদিন তেমন কিছু দেখতে পাবেনই যা হবে তাঁর নতুন ছবি আঁকার প্রেরণা।

তিনি যখন ছোটোবেলায় এ বাড়িতে থাকতেন তখন কিছু দেখতে পাননি। তার কারণ তখন এ বাড়িতে লোকজন ছিল অনেক। ঐ বাড়িরে মধ্যে সেরকম কিছু দেখা যায় না। আর এখন? এখন অত বড়ো বাড়িখানা খাঁ খাঁ করছে। বিশেষ করে দোতলায় উঠলে গা হুমহুম করে। বহুকাল দোতলার দরজা খোলা হয়নি।

তিনি স্বদেশে ফিরলেন। তাঁকে গ্রামের লোক অবাক হয়ে শুধু দেখল। কেউ আলাপ করতে এগিয়ে এল না। বোধহয় তাঁর চালিয়াতি, তাঁর সাজসজ্জা আর অহঙ্কার দেখে কারো ভালো লাগেনি। তিনিও কারো দিকে ফিরে তাকালেন না। যেন এইসব গেঁয়ো ভূতরা তাঁর সঙ্গে মেশার অযোগ্য।

নিজের বাড়িতে ঢুকে তিনি প্রথমে নিচের তলার একটা ঘর খুললেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এখানে ভাড়া দেওয়া ছিল বলে ঘরটা কিছুটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

তিনি ভাবলেন, নিচের তলায় কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে তারপর দোতলার ঘরগুলো খুলে দেখবেন কোন ঘরে তিনি পাকাপাকিভাবে থাকবেন।

বেলা দুটোর মধ্যে সদাশিবকে দিয়ে নিচতলাটা ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে নিয়ে এবার তিনি দোতলায় উঠলেন।

মনের আনন্দে শিস দিতে দিতে দিবাকর উঠলেন। টানা বারান্দার পাশে সার সার ঘর। খড়খড়ি দেওয়া জানলাগুলো সব বন্ধ। ঘরগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে তিনি মনে করবার চেষ্টা করলেন তাঁর ছোটোবেলায় কে কোন ঘরে থাকতেন।

একটা ঘরের সামনে এসে তিনি শিস দিতে দিতেই তাল খুললেন। দু' হাত দিয়ে ভারী কপাট ঠেললেন। ভেতরে যুটযুটে অন্ধকার। অন্ধকারে আন্দাজ করে তিনি পা বাড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে আঁৎকে উঠে দু' পা পিছিয়ে এলেন। দেখলেন সামনের দেওয়ালে ঝুলছে মস্ত একটা ছবি। অন্ধকারেও বুঝতে বাকি রইল না, এটা সেই গ্যাংটকের ছবি। সেই তুচ্ছ কোনো মহিলার ভয়াবহ প্রেতাশ্রার ছবি। জুলজুল করছে। কিন্তু সে ছবি তো এতো বড়ো ছিল

না। আর সে ছবি এখানে এলই বা কি করে?

তিনি তখনই হাঁকলেন, সদাশিব, টর্চটা নিয়ে চট করে এসো তো!

সদাশিব পড়িমড়ি করে টর্চ নিয়ে ওপরে উঠে এল। দিবাকর টর্চ জ্বাললেন। দেখলেন কোথাও কোনো ছবি নেই। ফাঁকা দেওয়াল।

তিনি মনে মনে হাসলেন। ধুস! চোখের ভুল।

চোখের ভুলই হোক, আর যাই হোক এবাড়িতে ঢুকেই ছবিটা দেখে তিনি একটু যেন খুশিই হলেন। ভাবলেন—তাহলে হয়তো এখানে আসা তাঁর ব্যর্থ হবে না।

যাই হোক, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই তিনি দোতলার দুখানা ঘর সাজিয়ে গুছিয়ে নিলেন। একটা ঘরের দেওয়ালে টাঙালেন তাঁর ভালো ভালো ছবিগুলো। অন্য ঘরের দেওয়ালে টাঙালেন বেশ কিছু দুস্ত্যাপ্য বিশ্ববিখ্যাত আর্টিস্টের ছবি। যেমন—রেমব্রান্ট, মাতিস, ভ্যানগগ, পল ক্লি আর লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ‘লাস্ট সাপার’ ছবিটি। এসব ছবি যে অরিজিনাল অর্থাৎ আর্টিস্টের নিজের হাতে ছবি আঁকা নয়—আসলের নকল মাত্র, দিবাকর তা বুঝতেন। তবু সার্থক নকল এই ছবিগুলোরও শুধু দামই নয়, যথেষ্ট আকর্ষণও আছে।

এবাড়িতে কিছু পুরনো জিনিসও দেখতে পেলেন। যেমন একটা ঘরে দেখলেন বহু পুরনো একটা অয়েল পেন্টিং। গায়ে সার্টিনের কোট আর কোমরে বাঁধা উড়ানি। ছবিটা ছোটোবেলা থেকেই দেখেছেন। কিন্তু তিনি এই বংশের কে ছিলেন তার পরিচয় জানা যায়নি।

আর একটা ঘরে ছিল একগাদা ঝাড়বাতি। একসময়ে যখন ইলেকট্রিক ছিল না তখন ফরাশ ঘরে ঘরে এগুলো জ্বালিয়ে দিত। সেসব অবশ্য তিনি দেখেননি। কিন্তু সেই ঘড়িটা? সেটা কোথায় গেল?

দিবাকর এঘর-ওঘর খুঁজতে লাগলেন। হ্যাঁ, এই যে রয়েছে ঘড়িটা। দেওয়ালের এককোণে কালো আবলুশ কাঠের কারুকার্যকরা তাকের ওপর রয়েছে ওটা। বুল জমে গেছে। ঘড়িটার বৈচিত্র্য ছিল। ডায়ালের সংখ্যাগুলো ছিল রোমান হরফে আর কাঁটাগুলো ছিল সোনালী রঙের। তীক্ষ্ণ তীরের মতো। ঘড়িটা প্রতি ঘণ্টায় গির্জার ঘণ্টার মতো গভীর আওয়াজ দিত। সেই শব্দ এ বাড়ির যেখানে যেই থাক, শুনতে পেত।

বাড়ির নিচের তলায় একটা ঘরে পাওয়া গেল বিরাট একটা কাঠের সিন্দুক। মস্ত একটা জং-ধরা তালা লাগানো। এ-সিন্দুক ছোটোবেলা থেকেই তিনি দেখে আসছেন। কিন্তু কোনোদিন সেটা খুলে কেউ দেখত না। কারও আগ্রহ ছিল না। আজ তিনি খুললেন। দেখলেন তার মধ্যে একগাদা পুরনো কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ। অনেকগুলো পঁজি; কিছু পুজোর সরঞ্জাম, যেমন—পিলসুজ, ঘণ্টা, পঞ্চপ্রদীপ, শাঁখ, একটা বিরাট পাঁঠাকাটার খাঁড়া।

এইসব দেখতে দেখতে তিনি আনন্দে রোমাঞ্চিত হলেন। শিস দিতে লাগলেন।

## ॥ চার ॥

### সদাশিবের আতঙ্ক

দিবাকরের আনন্দ কিন্তু বেচারি সদাশিবের আতঙ্ক। এতদিন সে মনিবের সঙ্গে অনেক ভালো ভালো জায়গায় ঘুরেছে। কিন্তু এমন হতচ্ছাড়া জায়গায় এসে যে তাকে থাকতে হবে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। তার এমনিতেই একটু ভুতের ভয় আছে। এখন এই বাড়িতে এসে কি জানি কেন সবসময়ে কাঁটা হয়ে থাকে। তার ঘরটাও নিচে একটেরে—সিঁড়ির ঠিক

পিছনে। চিৎকার করে মরে গেলেও কেউ শুনতে পাবে না।

ভয়ে যে সে কাঁটা হয়ে থাকে তার কারণও আছে।

প্রথমত, বাড়িটাই কেমন বিচ্ছিরি। এত বড়ো বাড়ি, কিন্তু জনপ্রাণী নেই! এ কিরে বাবা! সব যেন মরে হেজে গেছে। মরে গিয়ে ভূত হয়ে সবাই যেন এক-একটা ঘরে অদৃশ্য হয়ে বাদুড়ের মতো ঝুলছে।

তারপর সেই প্রথম দিন—দোতলার ঘর খুলেই মনিব এমনভাবে টর্চ নিয়ে আসতে বললেন যে দিনের বেলাতেই তার বুকে কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল। বাবু টর্চ জ্বেলে দেখে হেসে বললেন বটে “কিছু না”, কিন্তু নিশ্চয়ই তিনি কিছু দেখেছিলেন। মুখে কবুল করলেন না।

এর ওপর এখানে আসার ঠিক তিন দিনের মাথায়—

রাত তখন সব সাড়ে সাটটা কি আটটা, সে রান্না করতে করতে নিজের ঘরে এসেছিল দেশলাইয়ের খোঁজে। হঠাৎ দেখল কে যেন পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। সদাশিব তখনই সিঁড়ির মুখে ছুটে গিয়ে হাঁকল, কে?

কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। আবছা মূর্তিটা কিন্তু তখনও উঠছে।

চোর মনে করে সদাশিব পিছনে ধাওয়া করল। কিন্তু ঠক করে দেওয়ালে মাথা ঠুকে যেতেই সে দেখল কেউ কোথাও নেই। অন্ধকারে তারই মাথা ঠুকে গেছে।

এতক্ষণে দেশলাইটার কথা মনে পড়ল। দেশলাইটা হাতেই রয়েছে। দেশলাই জ্বেলে সাবধানে নিজের ঘরে এসে ঢুকল।

চোখের ভুল নিশ্চয়। নইলে চোরটা পালালো কোথা দিয়ে! তবু তার মনে হতে লাগল—চোর বটে তো! না অন্য কিছু?

নিশ্চয়ই অন্য কিছু। নইলে ফের একদিন ঐরকম দেখবে কেন?

রাত তখন নটা। সে বাবুর রাতের খাবার নিয়ে ওপরে উঠছিল। সিঁড়িটাও বিচ্ছিরি। সোজা নয়, সাপের মতো ঐক্বেঁক্বে উঠে গেছে। তেমনি অন্ধকার। বাঁকের মুখে তেমন কিছু আছে কিনা দেখার উপায় নেই।

সে উঠছিল। হঠাৎ মনে হলো অল্প দূরে কালোমতো কিছু একটা যেন সিঁড়ির ওপরে পড়ে রয়েছে।

কি ওটা?

সদাশিব একটু দাঁড়িয়ে পড়ল। বুঝতে চেষ্টা করল জিনিসটা কি?

তারপরেই ও চমকে উঠল। দেখল জিনিসটা নড়ছে। শুধু নড়াই নয়, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। ক্রমে বুঝতে পারল একটা যেন মানুষের শরীর। শরীরটা হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। পরিষ্কার দেখল পরনের কাপড়টা সারা গায়ে জড়ানো—মেয়েরা যে ভাবে শাড়ি পরে।

সে চিৎকার করে উঠল। পরক্ষণেই মূর্তিটা যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সদাশিবের সামলাতে একটু সময় লাগল। তারপর খাবার নিয়ে ওপরে গেল। ভাবল মনিবকে ব্যাপারটা বলবে। কিন্তু বলতে পারল না। কেননা তার মনিব মানুষটা অদ্ভুত। তিনি ভয় পান না। ভয় পেতে ভালোবাসেন। তিনি নাকি ভয়ের খোঁজেই এখানে এসে বাস করছেন!

কিন্তু একটা দুর্ভাবনা থেকেই গেল—এই যে সে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অত জোরে চিৎকার করল তবুও তা বাবুর কানে পৌঁছল না!

দুদিনের এই ঘটনায় সদাশিব যে ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকবে তাতে সন্দেহ কি?

আরও একটা ব্যাপার ইদানীং ঘটছে। সেটা অবশ্য এ বাড়িতে নয়।

মাঝে মাঝে অনেক রাতে তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। একদিন অমনি ঘুম ভেঙে গেলে সে শুনতে পেল অনেক দূরে একটা শব্দ—খটাখট্—খটাখট্—খটাখট্ ....

শব্দটা যেন পাকা রাস্তায় হচ্ছে। নিস্তব্ধ রাস্তার শব্দটা বেশ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু কিসের শব্দ ঠিক বুঝতে পারল না। এক একসময় এক একরকম মনে হলো। একটু পরেই শব্দটা থেমে গেল।

এমনি শব্দ পরপর তিন দিন শুনল। শব্দটা তার কোনো ক্ষতি করছে না। কিন্তু কেবলই মনে হতে লাগল খুব শীগগিরই এ বাড়িতে কোনো বড়ো রকমের ক্ষতি হবে। শব্দটা যেন সেই কথাই জানিয়ে দিচ্ছে।

সদাশিব ঠিক করল, এবার কিছু হলেই সে বাবুকে জানাবে—তা বাবু বিশ্বাস করুন আর নাই করুন।

সদাশিব এখন পারতপক্ষে সন্ধ্যাবেলা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে চায় না। বাবুর খাবার নিয়ে যখন যায়, তখন এক হাতে থালা আর এক হাতে লণ্ঠন। লণ্ঠনে নিজের ছায়া দেখে নিজেই শিউরে ওঠে। এ তো মহা মুশকিল হলো!

ইদানীং বাবুরও বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করছে সে। তাঁর সেই হাসিখুশি ভাবটা আর নেই। একটুতেই রেগে যান। সবসময়ে কি যেন চিন্তা করছেন। আগে বেশ ছবি আঁকতেন। মাঝে মাঝে তাকে ডেকে বলতেন, সদা, দেখ তো ছবিটা কেমন হচ্ছে! সে তো ছবির ভাবি বোঝে। তবু বলত, খাসা।

এইটুকু শুনেই বাবু খুশি হতেন। কিন্তু এখানে এসে পর্যন্ত বাবুকে আর ছবি আঁকতে দেখেনি। এখন রাস্তার কি একটা খাতা পড়েন মন দিয়ে। মাঝে মাঝে তা থেকে কাগজে কি লেখেন।

বাবুর হুকুম—রাত নটার সময় খাবার দিতে হবে। তার আগেও নয়, পরেও নয়। খেয়েদেয়ে ঘরে খিল দিয়ে বাবু কি যে করেন তা ভগবান জানেন। তবে রাত দুটো-তিনটে পর্যন্ত তাঁর ঘরে আলো জ্বলতে দেখেছে। অথচ এর আগে উনি কখনো এত রাত জাগতেন না।

সেদিন অমনি রাত নটার সময়ে খাবার নিয়ে ওপরে বাবুর ঘরে গেছে। বাবু তো রেগে কাঁই। বললেন, এত তাড়াতাড়ি খাবার আনতে কে বললে?

সদাশিব মনে করিয়ে দিল রাত নটাতেই তো সে খাবার দিয়ে যায়।

মুখের ওপর উত্তর শুনে বাবু কখনো যা করেন না তাই করলেন। থালাটা ছুড়ে ফেলে দিলেন।

সেদিন সদাশিব যত না দুঃখ পেয়েছিল তার চেয়ে বেশি পেয়েছিল ভয়। সে রাতে বাবু খাননি বলে সদাশিবও কিছু মুখে তুলতে পারেনি।

তিন দিন পর আবার এমন একটা ঘটনা ঘটল যা দেখে সদাশিব এবার তার অমন বাবুকেও ভয় পেতে লাগল।

সেদিন দুপুরবেলা, বাবু কতকগুলো পুরনো ছেঁড়া কাগজ রোদ্দুরে দিয়েছিলেন। একটা ছাগল এসে কাগজগুলো চিবুতে লাগল। বাবু দেখামাত্রই ছুটে এসে ছাগলটাকে এক হাতে তুলে গলা টিপে ধরলেন। ছাগলটা ব্যা ব্যা করে ধড়ফড় করতে করতে মরে গেল।

উঃ! তখন বাবুকে কী ভয়ঙ্করই না দেখাচ্ছিল! অথচ মানুষটা কখনো একটা পিঁপড়েকেও পা দিয়ে টিপে মারেননি।

এইসব যতই দেখছে সদাশিব ততই ভয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। তার তখন কেবল এই কথাটাই মনে হতে লাগল—এ বাড়িতে কারো আসা দরকার। কিন্তু কেই-বা তাঁর আছে?

আছে একজনই—বাবুর সেই কলকাতার বন্ধু। আঃ! তিনি যদি একবার এখানে আসতেন! তিনিই তো ভাড়াটে উঠিয়ে বাড়িটা খালি করে দিয়েছেন। তবেই না বাবু এখানে আসতে পারলেন। তা তিনি কি একবার বন্ধুকে দেখতে এখানে আসবেন না?

## ॥ পাঁচ ॥

### সুরঞ্জনের সাবখানবাণী

একেই বোধহয় বলে টেলিপ্যাথি।

সদাশিব যেভাবে মনে মনে সুরঞ্জনকে ডাকছিল, সে আর না এসে পারে?

সুরঞ্জনকে পেয়ে দিবাকর খুব খুশি। অভিমান করে বললেন, এখানে এসেছি আজ দশ দিন। এত দিনে মনে পড়ল?

সুরঞ্জনও উশ্টো অভিমান জানালেন, এসে পর্যন্ত একটা চিঠিও দাওনি ভাই। শেষে থাকতে না পেরে চলে এলাম।

বেশ করেছ। অ্যাই সদা—

সদাশিব এসে দাঁড়ালো।

দেখছিস, কে এসেছে? আমার ফ্রেন্ড—দি ওনলি ফ্রেন্ড। ফ্রায়েড রাইস আর মাংস লাগা।

সদাশিব খুশি হয়ে চলে গেল। দিবাকর সুরঞ্জনকে নিয়ে দোতলায় উঠল।

শুনেছি কলকাতায় কোথাও কোথাও নাকি খুব পুরনো জিনিস কিনতে পাওয়া যায়? সোফায় বসে দিবাকর জিঙ্গেস করল।

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে নিলামের বিজ্ঞাপনে দেখি।

তা ভাই, খোঁজ পেলে আমায় জানিও তো।

কেন? পুরনো জিনিস নিয়ে কি করবে?

এমনিই। একটা ছবির খোঁজ করছি।

এই সময়ে সদাশিব কফি আর টোস্ট দিয়ে গেল। সে ভারি খুশি। তার মনিব আবার আগের মতান হয়ে গেছেন।

সুরঞ্জনের পরনে শার্ট, ট্রাউজার। বেশ স্মার্ট চেহারা। সবসময়ে হাসিখুশি। কোনো এক বড়ো অফিসের ছোটোখাটো অফিসার। কিন্তু কে ভাবতে পারে এই মানুষই আবার তত্ত্বমন্ত্র করেন, প্রেতাত্মা নিয়ে পড়াশোনা করেন!

একসময়ে দিবাকরের সঙ্গে কলকাতায় পড়তেন। খুব ভাব ছিল। তারপর দুজনে দু'দিকে ছিটকে গেলেন যে যাঁর কাজে। তবে যোগাযোগটা ছিল বরাবর।

খাওয়া-দাওয়ার পর দিবাকর বললেন, তোমার চেষ্টাতেই বাড়িটা উদ্ধার করা গেছে। এসো গোটা বাড়িটা ঘুরে দেখাই।

দিবাকর সারা দুপুর সুরঞ্জনকে বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখালেন।

বাড়ির পিছনে এক জায়গায় ভাঙা ছাদমতো ছিল। সেখানে এসে সুরঞ্জন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

কি দেখছ?



এখানে কি ছিল বলতে পার?

শুনেছি ঘোড়ার আস্তাবল ছিল। আমার পূর্বপুরুষেরা ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসতেন। পরে বোধহয় ফিটন-টিটন ছিল। ঐ দেখ না একটা ভাঙা চাকা এখনও পড়ে আছে।

সেখান থেকে দোতলায় ফিরে এসে সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করলেন, তা তুমি হঠাৎ এখানে চলে এলে কেন?

বন্ধুর প্রশ্নে দিবাকর বললেন, আমার দেশ—আমার পূর্বপুরুষের বাড়ি। এখানে এসে থাকব না তো সারা জীবন ভেসে ভেসে বেড়াব?

দিবাকর কথাটা হেসেই বললেন, কিন্তু সুরঞ্জন হাসলেন না। বললেন, আমায় সত্যি কথাটা বলো তো, আসল উদ্দেশ্যটা কি?

দিবাকর তখন গ্যাংটকের দোকানে সেই ছবির কথা থেকে শুরু করে সবকিছু বন্ধুকে জানালেন। বললেন, ছবিটা হাতছাড়া হয়ে গেল। তাই আমি নিজেই ঐরকম একটা ছবি আঁকতে চাই। ঐ ছবিটা ভাই আমায় পেয়ে বসেছে।

এই ছবিটার জন্যেই কি তুমি কলকাতায় খোঁজ করতে বলছ?

এগজ্যাক্টলি।

তা সেই ছবি আঁকার জন্যে এখানে এসে থাকার কারণ কি?

একটু চুপ করে থেকে দিবাকর বললেন, তুমি ছবি আঁক না, তাই বুঝবে না নিজে চোখে না দেখলে—নিজের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে স্পর্শ করতে না পারলে কখনো ওরকম ছবি আঁকা যায় না। ঐরকম কিছু এ বাড়িতে দেখতে পাব, এই আশাতেই আমি এখানে এসেছি।

তুমি নিশ্চিত এখানে কিছু পাবে?

হ্যাঁ। অতীতে এ বাড়িতে অনেক গুপ্তহত্যা হয়ে গেছে বলে শুনেছি। স্থানীয় লোকেরাও নাকি এ বাড়িটা এড়িয়ে চলে। হতে পারে এটা ওদের সংস্কার। কিন্তু এই ক’দিনে আমি যেন কিছুর আভাস পাচ্ছি। আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি।

পেয়েছ কিছু?

ঐ যে বললাম, আভাস পাচ্ছি। যেমন প্রথম দিন ওপাশের ঘরে ঢুকতেই অন্ধকারে স্পষ্ট দেখলাম সেই ছবিটা দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে। তবে অনেক বড়ো। অত বড়ো ছবি কেউ দেওয়ালে টাঙায় না।

তারপর?

তারপর সদাশিবকে টর্চ আনতে বললাম। আলো জ্বলে দেখি সব ফাঁকা।

একটু থেমে বললেন, তুমি—শুধু তুমি কেন, সবাই বলবে চোখের ভুল। তা হতে পারে। কিন্তু তবু কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়।

সুরঞ্জন হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন।

চলো তো ঘরটা দেখে আসি।

দুজনে পাশের ঘরে গেলেন। বন্ধ দরজা-জানলা খোলা হলো। ধুলোর গন্ধ, মাকড়সার জাল, একটা বিছানাশূন্য খাট ছাড়া আর কিছুই দেখার নেই।

সুরঞ্জন অনেকক্ষণ ধরে ঘরটা পরীক্ষা করলেন। তারপর ফিরে এসে সোফায় গুম হয়ে বসে রইলেন।

দিবাকর বন্ধুর পিঠি চাপড়ে বললেন, কি হলো? কিছুর সন্ধান পেলে নাকি?

সুরঞ্জণ গম্ভীর গলায় বললেন, আমার মনে হচ্ছে তুমি নিজেকে বিপদের মধ্যে জড়িয়ে ফেলছ। আমি নিজে প্রেতচর্চা করি। খবরের কাগজে আমার কথা অনেক লেখা হয়েছে। আমি বলছি এ বাড়িটা বিপজ্জনক।

দিবাকর উল্লাসে চোঁচিয়ে উঠলেন, তুমি তাহলে বলছ—এখানে সত্যিই কিছু আছে। বেঁচে থাকো ভাই, বেঁচে থাকো। আমি তো তাই চাই।

না, না, দিবাকর! গৌয়াতুমি কোরো না। আমি বলি তুমি এ বাড়িটা ছেড়ে দাও।

দিবাকর গলা ফাটিয়ে হেসে উঠে জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, নো ... নো .. নো...

নিচে রান্নাঘরে বসে দিবাকরের ঐরকম উৎকট হাসি শুনে সদাশিব চমকে উঠল।

হাসি থামিয়ে দিবাকর সুরঞ্জণকে আর একটা নতুন খবর দিলেন। একটা দেরাজের ভেতর থেকে একটা পুরনো ডায়েরি পেয়েছেন। শুধু ডায়েরিই নয়, দেরাজের মধ্যে আরো ছিল সাহেবদের একটা টুপি, একটা ছড়ি, মহারানী ভিক্টোরিয়ার একটা ছবি, আর মেমেরা যেরকম পরে সেরকম একটা গাউন। সম্ভবত দেরাজটা কোনো সাহেববাড়ির। কিভাবে সেই দেরাজ জমিদারবাড়িতে এল তার মীমাংসা তিনি এখনও করে উঠতে পারেননি, তাও জানালেন। হয়তো এ বাড়ির সঙ্গে সাহেবদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

ডায়েরিটা একজন মেমসাহেবের লেখা। অনেকগুলো পাতা নেই। ছিঁড়েও গেছে অনেক জায়গায়। ডায়েরিটা তিনি পড়ছেন। ভারি ইন্টারেস্টিং।

সুরঞ্জণ বললেন, ডায়েরিটা পড়াও আমাকে।

দিবাকর জোরে জোরে মাথা নাড়লেন। বললেন, আগে আমি শেষ করি। তারপর তুমি একদিন এসে সারাদিন বসে বসে পড়ো।

সুরঞ্জণ হেসে বললেন, তার মানে তুমি ওটা হাতছাড়া করতে চাও না।

ঠিক তাই। ওটা অমূল্য সম্পদ। এই রহস্য নিকেতনের চাবিকাঠি।

সুরঞ্জণ কলকাতা ফিরে গেলেন। বলে গেলেন, কোনো বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই যেন খবর দেয়।

সেই দিনই। রাত তখন সবে সাড়ে আটটা। দিবাকর নিজের ঘরে বসে ডায়েরিটা পড়ছিলেন, সদাশিব এসে দাঁড়ালো।

কি খবর সদাশিব! খাবার রেডি?

না, বাবু, একটু দেরি আছে।

বেশ, যাও।

সদাশিব তবু গেল না।

কিছু বলবে নাকি?

হ্যাঁ, বাবু।

বলে ফ্যালো।

এ বাড়িটা ছেড়ে অন্য কোথাও গেলে হয় না?

দিবাকর নন্দী অবাক হয়ে বললেন, কেন? এ তো আমার নিজের বাড়ি।

তা তো জানি। কিন্তু এ বাড়িতে—সদাশিবের কথা আটকে গেল।

থামলে কেন? বলো।

এ বাড়িতে ভয়ের ব্যাপার আছে।

দিবাকরের দু' চোখ খুশিতে চনমন করে উঠল।

তাই নাকি? কিরকম ভয় বলো তো শুনি। আমি তো ভয়ের জন্যেই এখানে পড়ে আছি। কিন্তু এমনই কপাল, ভয়ের টিকিটি দেখতে পেলাম না আজ পর্যন্ত।

সদাশিব অবাক হয়ে শুনল। তার মনিব বলে কী! মানুষটা সত্যিই পাগল হয়ে গেল নাকি?

তা তোমার ভয়ের বাণী একটু শোনাও। দিবাকর ডায়েরির পাতা থেকে মুখ তুলে তাকালেন।

সদাশিব মাথা নিচু করে বললে, সন্দের পর প্রায়ই দেখি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে কেউ যেন উঠে যাচ্ছে। চোর ভেবে আমি পিছু ধাওয়া করেছিলাম। কিন্তু আদ্রেক সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে সে যে কোথায় মিলিয়ে যায় তা আর দেখতে পাই না।

এরকম কতদিন দেখেছ?

এজ্ঞে তা এসে পর্যন্ত।

তাই নাকি! তা আমি তো বাছা একদিনও দেখতে পাই না।

এর আর উত্তর কী দেবে? একটু চূপ করে থেকে সদাশিব বলল, আমার ঘরটা সিঁড়ির কাছেই। ও ঘরে আমি থাকতে পারব না।

দিবাকর খুব খানিকটা হেসে বললেন, ও এই ব্যাপার? তা ঠিক আছে। তুমি দোতলাতেই শুয়ো।

সদাশিব তবু দাঁড়িয়ে রইল। দিবাকর জিজ্ঞেস করলেন, আর কিছু বলবে?

এজ্ঞে রোজ রেতে আমি একটা শব্দ শুনতে পাই।

শব্দ! কিসের শব্দ?

খুব দূরে—মানে বড়ো রাস্তায়। ঠিক যেন একটা ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছে।

তা তো যেতেই পারে।

সদাশিব মাথা চুলকে বলল, কিন্তু রোজ রাতদুপুরে ঘোড়ার গাড়ি যাবে? একটু পরেই কিন্তু শব্দটা থেমে যায়! .

থেমে যায়, না মিলিয়ে যায়?

এজ্ঞে?

বলছি শব্দটা একেবারে হঠাৎ থেমে যায়, না দূরে মিলিয়ে যায়?

এজ্ঞে থেমে যায়।

দিবাকর বিরক্ত হয়ে বললেন, ও তোমার শোনার ভুল। যাও, রান্না করো গে।

সদাশিব মাথা হেঁট করে তখনই চলে গেল।

অন্ধকার সিঁড়ি। সব কয়েক ধাপ নেমেছে, হঠাৎ সদাশিব শব্দ হয়ে গেল। দেখল নিচ থেকে ধীরে ধীরে একটা কালো কাপড় পরা মূর্তি ওপরে উঠে আসছে ....

সেই মুহূর্তে সদাশিব কি করবে ভেবে পেল না। এদিকে মূর্তিটা তখন একেবারে ওর সামনে এসে পড়েছে।

এইরকম বিপদের সময় বিজ্ঞান্ত মানুষ হয় পিছু ফিরে দৌড়ায়, না হলে মরণপণ করে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সদাশিব পিছু ফেরার সময় পেল না। সে মরিয়া হয়ে মূর্তিটার ওপর ঝাঁপ দিল।

ঘরে বসে দিবাকর হুড়মুড় করে কিছু পড়ার শব্দ পেয়ে তখনই টর্চ হাতে ছুটে গেলেন।

দেখলেন একেবারে সিঁড়ির তলার ধাপে সদাশিব পড়ে পড়ে গোঙাচ্ছে।

দিবাকর তাকে টেনে তুললেন। কি হয়েছে? পড়লে কি করে?

সদাশিব সিঁড়িতে বসেই অতি কষ্টে সব কথা বলে গেল। শেষে বলল, মুখটা দেখেছে। মেয়েমানুষের মুখের মতো অনেকটা। কিন্তু ভয়ঙ্কর।

মেয়েমানুষের মুখ! চমকে উঠলেন দিবাকর। তবে কি সেই ছবির মুখের অধিকারিণী নিজেই এখানে এসেছে দেখা দিতে?

॥ ছয় ॥

### মিসেস ফেনটনের ডায়েরি

দিবাকর যে ডায়েরিটা পেয়েছিলেন সেটা রোজ রাতিরে একাগ্রমনে পড়েন। ডায়েরিটার অনেক জায়গাতেই ছেঁড়া। কোথাও কোথাও লেখা বিবর্ণ হয়ে গেছে। পড়া দুষ্কর। ডায়েরিটা লিখেছিলেন মিসেস ফেনটন নামে উত্তর আয়ারল্যান্ডের এক মহিলা। সালটাও পরিষ্কার নয়। শুধু কোনোরকমে ১৮ পর্যন্ত পড়া গেছে।

ডায়েরিটার বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক চ্যাপটারের মাথায় একটা মেমের স্কেচ আঁকা। সম্ভবত মেম নিজেই নিজের স্কেচ করেছেন। মেমের বয়েস আনুমানিক পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ।

ডায়েরির বেশির ভাগ জুড়েই তাঁর ঘরগেরস্থর কথা। ডায়েরিটা বাংলায় অনুবাদ করলে এইরকম দাঁড়ায়—এক জায়গায় লিখেছেন...আমি যখন অফিসারের স্ত্রী হয়ে প্রথম কলকাতায় এলাম তখন আমার কাজের জন্যে আটজনের একটা দল পাঠানো হলো। তার মধ্যে একজন রাঁধুনি, তার সঙ্গে তার মশলাদার বা সহকারী। একজন খানসামা যে টেবিলে খাবার পরিবেশন করবে এবং সেইই বাজার-হাট করবে মেমসাহেবের (অর্থাৎ আমার) হুকুম অনুসারে। এটা ধরেই নেওয়া হতো প্রতি টাকায় সে দু' আনা নেবে। এছাড়া টাকা-পয়সার হিসেবেও তঞ্চকতা করত। যেমন একটা মুগি তিন আনাতে পাওয়া যেত কিন্তু সে হিসেবে দেখাত আট আনা থেকে বারো আনা। তিন টাকার একটা শস্যের কিনে লিখত পাঁচ টাকা। একটা পাঁঠার পা আট আনায় কিনে দু' টাকা বলত। দুজন খিদমদগার সবসময়ে আমার পাশে পাশে থাকত কিছু বলামাত্র তা করার জন্য। খানসামার কাজ ছিল শুধু টেবিলে খাদ্য পরিবেশন করা। খিদমদগার লক্ষ্য রাখত কেউ কাঁটাচামচ পকেটে ঢুকিয়ে সরে পড়ছে কিনা। কেননা ওগুলো ছিল রূপোর। দরজি, ভিস্তিওয়ালা সর্বক্ষণ অপেক্ষা করে থাকত কখন কোন কাজে ডাক পড়বে।

কিন্তু নন্দীগ্রামে এসে জমিদারবাড়ি 'মহলেশ্বরী'তে গিয়ে সেখানকার রানীদের পরিচারিকার সংখ্যা, সৌন্দর্য আর সপ্রতিভ ভাব দেখে চমকিত হয়েছি। সবাই সুন্দরী। পুরুষরাও সুন্দর। কারো কারো গোঁফ কটা। ভারি ভালো লাগত।

এঁদের খানদানি কায়দা-কানুন দেখলে ভাবি এঁরাই যদি এমন হন তাহলে না জানি মোগল বাদশাহের হারেম কিরকম ছিল।

এর পর খানিকটা ছেঁড়া। তারপর লেখা...এ বাড়িতে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মহিলা এ বাড়ির রানীমা। বয়েস পঞ্চাশ-এর কাছাকাছি। কিন্তু অপূর্ব সুন্দরী। ঠিক যেন হিন্দুদের গডেস দুর্গা। আমি তাঁর একটা ছবিও এঁকেছি। ভাবছি কোনো একটা অনুষ্ঠান উপলক্ষে এটি তাঁকে প্রেজেন্ট করব।

এ বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন যে কত তার শেষ নেই। আমি এতদিন আসছি তবু সবাইকে চিনতে পারি না। নামও ভুলে যাই। ছোটো পুত্রবধূ ঘোড়শীই আমার বান্ধবী। ভারি মিষ্টি মেয়েটা।

এ বাড়িতে বড়ো তরফ, মেজো তরফ, ছোটো তরফ নামে এক-একটা পরিবার আছে।

এ বাড়িতে একজন বিবাহিতা মেয়ে আছে—বছর চব্বিশ বয়েস। বেশ সুন্দরী কিন্তু খুব তেজী আর মেজাজী। সে সবসময়ে ভুরু উঁচিয়েই আছে। খুব কম কথা বলে। তাকে আমার তেমন ভালো লাগে না। তবে যখন জানলাম যে, কোনো বিশেষ কারণে তাকে বাপের বাড়িতেই থাকতে হয় আর তার স্বামী আসে মাসে মাত্র দু-তিন বার, আর তাকে—বিশেষ করে স্বামীকে কেউ পছন্দ করে না, বরঞ্চ খুব অনাদর, অবহেলা করে তখন তার প্রতি আমার সহানুভূতি হলো, শুধু তাই নয়, সেদিন এক মারাত্মক খবর শুনলাম—এ বাড়িরই কোনো ছেলে মেয়েটার (মেয়েটার নাম বিজলী) স্বামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে যাতে সে এ বাড়ি ঢুকতে না পারে। উঃ! কী নিষ্ঠুর! আর কেউ তার প্রতিবাদ করছে না। কাজেই মেয়েটা যে সবার ওপর বিরক্ত হবে এ তো স্বাভাবিক।

কিন্তু ষড়যন্ত্র কিসের কারণে তা এখনো পরিষ্কার জানতে না পারলেও আভাসে ইঙ্গিতে এইটুকু জেনেছি যে, জামাই নাকি খ্রিস্টধর্মাবলম্বী হতে চায়।

এখন মনে পড়ছে ভবানীপ্রসাদ নামে একজন ইয়ং স্মার্ট, হ্যান্ডসাম ছেলে প্রায়ই আমাদের ওখানে যায়। খ্রিস্টধর্ম নিয়ে আলোচনা করে। তাহলে এই ভবানীপ্রসাদই কি এ বাড়ির জামাই—বিজলীর স্বামী?

এর পর ছেঁড়া।

তারপর এক জায়গায় লেখা...আজ আরও কিছু খবর জানলাম। এ বাড়ির মেজো তরফের এক ছেলে বটুকেশ্বর খুব উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। সে তাদের এই ভগ্নিপতি ভবানীপ্রসাদকে সহ্য করতে পারে না। একটা কারণ তার খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের ইচ্ছা। এ ছাড়াও বোধহয় বৈষয়িক কারণও আছে। তাকে খুন করবার ষড়যন্ত্র হচ্ছে জেনে বিজলী গভীর রাতে তার স্বামীকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দেয়। ঘোড়ায় চেপে ভবানীপ্রসাদ পালায়। দশ মিনিট পরে শিকার পালিয়েছে জেনে ক্রুদ্ধ বটুকেশ্বর গাড়ি নিয়ে তার পিছনে ধাওয়া করে। কিন্তু তাকে ধরতে পারেনি। ভবানীপ্রসাদ সেই থেকে নিরুদ্দেশ। ফিরে এসে বটুকেশ্বর এই দূরসম্পর্কের বোনটির ওপর অকথ্য নির্যাতন করে।

আমি অবাক হই বটুকেশ্বরের এই স্পর্ধা দেখে। আর দুঃখ পাই অন্য সকলের মুখে কুলুপ আঁটা দেখে। আশ্চর্য, কেউ প্রতিবাদ পর্যন্ত করে না। এক-একসময়ে ভাবছি এ বাড়িতে আর আসব না। কিন্তু রানীমা বা ঘোড়শীর একটা আশ্চর্য আকর্ষণী শক্তি আছে যে!

এর পর অনেক কটা পাতা নেই। তারপর এক জায়গায়....কোথায় কলকাতা আর কোথায় এই নন্দীগ্রাম! জানলা দিয়ে সারা দুপুর নীলচাঁষ দেখি। রাত্রে আমার সঙ্গে কেউ না থাকলে ঘুমোতে পারি না। শেয়ালের ডাক তো আছেই, তার ওপর আছে নানারকম নিশাচর পাখির ডাক। তা ছাড়া এখানে সবাই অল্পবিস্তর ভূতের ভয় পায়। আশ্চর্য কিছু নয়। জায়গাটা বড়ো বিশ্রী।

আমিও এসে পর্যন্ত সন্দের পর যেখানে সেখানে ছায়া দেখি। প্রথমে গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু সেদিন রাত্রে বাথরুম যেতে গিয়ে পিছনের ঘোরানো সিঁড়িতে মানুষের মতো কিছু একটাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখলাম, সেদিন সত্যিই ভয় পেলাম। তবে একথা কাউকে বলিনি। কেননা

তা অনেকে বিশ্বাস করবে না। কেউ কেউ সত্যিই ভয় পাবে।...

এইটুকু পড়ে দিবাকরের দুচোখ খুঁশিতে নেচে উঠল। যাক, এতক্ষণে ডায়েরিতে একটু ভয়ের গন্ধ পাওয়া গেল।

এমনি সময়ে ঢং ঢং করে গম্ভীর আওয়াজে সেই ঘড়িটায় বারোটো বাজল।

## ॥ সাত ॥

### আবার রহস্যময় ছবি

দুস্থাপ্য কিছু ছবির বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল স্টেটসম্যান পত্রিকায়। দিবাকরের অনুরোধ মতো তারই কাটিং পাঠিয়েছেন সুরঞ্জন।

সেটা পেয়েই দিবাকর চলে এলেন কলকাতায়। বন্ধুর সঙ্গে হাজির হলেন পার্কস্ট্রিটের একটা ছোটোখাটো দোকানে। সেখানে এক বৃদ্ধ অ্যাংলো একটা বড়ো টেবিলে ছবিগুলো সাজিয়ে রেখেছে।

অ্যাংলো লোকটা জানাল এইসব ছবি যোগাড় করতে তাকে সারা ভারতবর্ষ ঘুরতে হয়। এবার সে বিভিন্ন রাজবংশের বেশ কিছু ছবি পেয়েছে।

দিবাকরের বড় আশা যদি সে গ্যাংটকের সেই ছবিটা পায়। যদিও সে ভালো করেই জানে একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে সে ছবি আর পাওয়া সম্ভব নয়।

ছবিগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ একটা ছবি হাতে নিয়ে দিবাকর থমকে গেলেন। সুরঞ্জনও ঝুঁকে পড়লেন।

এ তো সাংঘাতিক ছবি! না-না, এ ছবি নিও না। এ ছবি নিয়ে তুমি কি করবে? কিন্তু দিবাকর ছবিটা দেখে এতই বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন যে তখনই কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। তারপর যখন একটা কথাও না বলে দোকানদারকে ছবিটা প্যাক করে দিতে বললেন তখন নিরুপায় সুরঞ্জন শেষ বারের মতো চেষ্টা করলেন, তা ছাড়া ছবিটা ড্যামেজড। এই দ্যাখো, এখানে রং উঠে গেছে।

ও আমি ঠিক করে নেব।

ছবিটা ভালো করে প্যাক করিয়ে দাম চুকিয়ে দিবাকর সুরঞ্জনের বাড়ি চলে এলেন। সুরঞ্জন বললেন, এ ছবিটা তুমি না নিলেই পারতে।

কেন?

আমার ভালো লাগছে না। কেমন যেন মনে হচ্ছে, গ্যাংটকের দোকানের সেই অশরীরী ছবিটার সঙ্গে এই ছবিটার যোগাযোগ আছে। দিবাকর, আমি বলছি একটা অদৃশ্য নিয়তি তোমাকে ঐ ছবিটা দেখিয়েছিল। সেই নিয়তিই তোমায় টেনে এনেছে তোমার পূর্বপুরুষের বাড়িতে। সেই নিয়তির প্রভাবেই এই ছবিটা তুমি বাড়ি নিয়ে যাচ্ছ। যেন তুমি তোমার সর্বনাশকে বরণ করে ঘরে তুলছ। আমার কথাটা অমন করে হেসে উড়িয়ে দিও না ভাই, অনুরোধ করছি।

দিবাকর হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন, আমিও কিছু একটার গন্ধ পাচ্ছি। সেটা আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

সুরঞ্জন হতাশ হয়ে গেলেন। শুধু দিবাকরকে সেদিনটা থেকে যেতে বললেন। কিন্তু দিবাকর রাজী হলেন না। বললেন, বাড়ি ছেড়ে আমি থাকতে পারি না।

সুরঞ্জন ঠাট্টা করে বললেন, হ্যাঁ, বড়োলোক মানুষদের ভাবনা অনেক।

বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে দিবাকর বললেন, টাকা-পয়সা চুরির কথা ভাবছি না। তার চেয়ে ঢের বেশি ক্ষতি হবে যদি—একটা ছবি চুরি যায়।

সুরঞ্জন হেসেই বললেন, আমাদের দেশে চোর-ডাকাত-ছিনতাইবাজের অভাব নেই। কিন্তু দামী ছবির মর্ম বুঝে চুরি করার মতো উচ্চস্তরের চোরের সংখ্যা কম।

দিবাকর বললেন, তাহলে আসল কথাটা বলি শোনো। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যের সময় আমাদের বাড়িতে কেমন একরকম গা-ছমছমানি ভাব হয়। সেটা আমার খুব ভালো লাগে। তাই সন্ধ্যে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আমি বাড়িতে ঘুরে বেড়াই। সারাদিন শুধু সময় গুনি কখন বাগানের দেবদারু গাছের মাথায় দিনান্তের শেষ রোদটুকু ল্লান হয়ে আসবে, কখন জামরুল গাছের পাতার আড়ালে কি একটা বিশেষ পাখি ককিয়ে ককিয়ে ডেকে উঠবে, কখন সন্ধ্যে নেমে আসবে আমাদের ঐ ‘মহলেশ্বরী’র আলসের গা বেয়ে।

সুরঞ্জন হেসে বললেন, এ যে দেখছি রবীন্দ্রনাথের ‘ক্ষুধিত পাষণ’ গল্প!

দিবাকর গভীরভাবে বললেন, সে গল্প আমি পড়িনি। তবে রোজ সন্ধ্যায় ঐ ভয়-ভয় ভাবটা আমার চাই-ই। ওটা আমার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভাই। অনেক দেরি হয়ে গেল। আজ চলি। তুমি এসো একদিন।

দিবাকর নতুন কেনা ছবিটা তাঁর বেডরুমে টাঙিয়ে রাখলেন। তারপর কখনো কাছ থেকে, কখনো দূর থেকে বারবার ছবিটা দেখতে লাগলেন।

বড়ো অদ্ভুত ছবি। একজন মেয়েকে একটা লোক গলা টিপে মারছে। যে খুন করছে তার পিছনের দিকটাই শুধু দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে তার লোমশ ডান হাতটা।

ছবিটা মন দিয়ে দেখলে কতকগুলো চিন্তা মাথায় আসে—

প্রথমত, মেয়েটার মুখের অবস্থা। ঘাড়টা বাঁ দিকে একটু হেলে আছে। পাথরের মতো চোখদুটো বেরিয়ে এসেছে। মণি দুটো স্থির। এমনকি গলায় চাপ দেবার সময়ে শরীরটা যে ঠেলে উঠেছে, ছবিতে সেটুকু পর্যন্ত পরিষ্কার। অসাধারণ আর্টিস্ট।

দ্বিতীয়ত, মেয়েটার বয়েস বছর তিরিশ। স্বাস্থ্যবতী। মুখটা বড়ো। চোয়াল চওড়া। চুল পিঠ পর্যন্ত ছড়ানো। মেয়েটা কোন দেশী? ইউরোপীয়ান যে নয় তাতে সন্দেহ নেই। বোধহয় বাঙালি। বড়োলোকের ঘরের মেয়ে বা বৌ তা তার গলার হার দেখলেই বোঝা যায়।

তৃতীয়ত, ছবিটা এত উজ্জ্বল যে মনে হয় এটা সম্প্রতি আঁকা। কিন্তু ছবিতে ঘরের মধ্যে ঝাড়লগ্নন টাঙানো, দেখলে বোঝা যায় এটা অনেককাল আগের পটভূমিতে আঁকা। ঘরটা জলসাঘর হতে পারে—বেডরুমও হতে পারে।

চতুর্থত, এ ছবি হঠাৎ আঁকার কারণ কি? কেউ একজনকে খুন করছে, সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তের ছবি কি কোনো আর্টিস্ট শখ করে আঁকতে চায়? অবশ্য যদি না সে নিজে চোখে সে দৃশ্যটা দেখে থাকে!

দিবাকরের তখনই গ্যাংটকের দোকানে সেই ছবিটার কথা মনে পড়ল। সেও যেন অনেকটা এইরকম।

## ॥ আট ॥

## ছবি-রহস্য

অদ্ভুত ব্যাপার তো!

ছবিটা দেখতে দেখতে দিবাকর একদিন অবাক হলেন। দিনের বেলায় যে ছবিটা কেমন নিষ্প্রাণ, ম্যাডমেডে—একটা ছবিমাত্র মনে হয়, রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবির রঙ উজ্জ্বল হতে থাকে।

এক-একদিন রাত দুটো-আড়াইটে পর্যন্ত ছবিটার সামনে বসে থাকেন দিবাকর। এ কি সত্যিই অলৌকিক ব্যাপার?

একদিন অমনি ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেখলেন এক অস্বাভাবিক দৃশ্য। লোমশ সেই হাতখানার লোমগুলো একটা একটা করে যেন খাড়া হয়ে উঠছে।

পরের দিন গভীর রাতে ছবিটা দেখতে গিয়ে দিবাকরের নিজের গায়ের লোমই খাড়া হয়ে উঠল।—একি আশ্চর্য ব্যাপার! মেয়েটার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে!

আর ঠিক তখনই রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে দূরে কিসের যেন একটা শব্দ শুনতে পেলেন। ভালো করে শোনবার জন্যে তিনি কান পাতলেন। খুব দূরে একটা খটখট শব্দ।

তিনি ছুটে জানলার কাছে গেলেন। কিন্তু শব্দটা আর পেলেন না।

রোজ সন্ধ্যার সময়ে ঘরে ঘরে একা ঘুরে বেড়াবার মতো এই আর একটা নেশা এখন দিবাকরকে পেয়ে বসেছে—প্রতি রাতে ছবিটা লক্ষ্য করা।

একটা কথা তাঁর প্রায়ই মনে হয়—শিল্পীর চোখের সামনেই যদি খুনটা হয়ে থাকে তাহলে তিনি বাধা দিলেন না কেন?

উত্তরও যেন খুঁজে পান—হয়তো বাধা দেবার সুযোগ পাননি।

বেশ, তাহলে ছবি আঁকার কারণ কি?

তারও উত্তর একটা এই হতে পারে যে, খুনের সত্যি ঘটনাটা হুবহু এঁকে রাখা—যেমন এখনকার দিনে লোকে ক্যামেরায় ধরে রাখে।

কিন্তু অত করবার দরকার কি ছিল?

পুলিশকে—

চিন্তায় বাধা পড়ল। হঠাৎ সদাশিব হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, বাবু, আবার সেই শব্দ।

শব্দ! কই? বলে উঠে জানলার ধারে গেলেন।

হ্যাঁ, শুনলেন। স্পষ্টই শুনলেন সেই শব্দ। খটাখট-খটাখট—ঠিক যেন একটা ঘোড়া দূরন্ত গতিতে ছুটে আসছে।

ও তো ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। ফিটনে-টিটনে চড়ে কেউ যাচ্ছে। একটু থেমে আবার বললেন, এতে ভয় পাবার কি আছে? আচ্ছা যাও, ওঘর থেকে বন্দুকটা এনে দাও।

সদাশিব কাঁপতে কাঁপতে বন্দুকটা এনে দিল। দোনলা বন্দুক। ভেতরে জার্মান কার্টিজ পোরা।

যাও শোওগে। কোনো ভয় নেই। আমি জেগে আছি।



ইতিমধ্যে শব্দটা থেমে গেছে। সেই পুরনো ঘড়িটায় বাড়ি কাঁপিয়ে শব্দ হলো ঢং—  
ঢং। রাত দুটো।

পরের দিন দিবাকর আবার ছবিটা নিয়ে বসলেন। সেই একই প্রশ্ন মাথায় ঘুরতে লাগল—  
আর্টিস্ট যখন স্বচক্ষে খুন হতে দেখলেন তখন পুলিশকে জানানেন না কেন?

তখনই পাণ্টা প্রশ্ন—পুলিশকে জানাননি এটা জানা যাচ্ছে কি করে?

উত্তর : পুলিশকে জানানো হলেও এ ছবি আঁকার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়  
না। এ ছবি যে উদ্দেশ্যমূলক তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তাহলে পুলিশকে না জানানোর কারণ কি?

এর একটা উত্তর হতে পারে—এখানকার মতো তখন সম্ভবত পুলিশি ব্যবস্থা ছিল না।  
অন্তত এই নন্দীগ্রামে। কিংবা থানা-পুলিশ করতে সাহস পাননি।

তাহলে কি মনে করে নিতে হবে প্রত্যক্ষদর্শী শিল্পী আশা করেছিলেন এই ছবি দেখে  
কেউ না কেউ একদিন মেয়েটাকে শনাক্ত করতে পারবে, মেয়েটা যে আত্মহত্যা করেনি,  
খুনই হয়েছিল, সেটা প্রমাণ করে দেবে? হয়তো খুনীকেও ধরতে পারবে।

কিন্তু হায়! এ তো বহুকাল আগের ব্যাপার। কে এই হতভাগিনী মহিলা, কে ঐ খুনী,  
কেই বা সেই প্রত্যক্ষদর্শী আর্টিস্ট, আজ আর তা জানার উপায় নেই। খুনী কি শেষ পর্যন্ত  
ধরা পড়েছিল? তাই বা কে জানে? যদি ধরা না পড়ে থাকে তাহলে একজন নারীকে খুন  
করে খুনী দিব্যি বেঁচে রইল? তার শাস্তি কিছুই হলো না? এ কি ভগবানের বিচার!

সারারাত ধরে দিবাকর এইসব আবোলতাবোল ভেবে চললেন।

হঠাৎই আজ দিবাকরের চোখে পড়ল খুনীর বাঁ হাতে একটা তাবিজ বাঁধা। এ থেকে  
সিদ্ধান্ত করলেন খুনী বিদেশী নয়, অন্তত ভারতীয়। তারপর চুলের রং আর আঁচড়াবার ঢং  
আর মাথার গড়ন দেখে তাঁর সন্দেহ রইল না যে খুনী বাঙালি।

আবার প্রশ্ন—ছবিটা যে আঁকল সে কে? নিশ্চয় নিহত মেয়েটার কোনো কাছের মানুষ!  
তা নইলে এত দরদ দিয়ে কখনো ছবিটা আঁকত না। কিন্তু সে কে হতে পারে?

ভাবতে ভাবতে দেখলেন, মেয়েটার মুখে সেদিনের মতো ঘাম ঝরছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর  
মাথাটা ঘুরে গেল। তিনি কোনো রকমে উঠে গিয়ে ঘাড়ে, মুখে জল দিলেন। আবার ঠিক  
তখনই শোনা গেল সেই শব্দ—খটা-খট—খটাখট-খটাখট—

একটা ফিটন গাড়ি যেন বড়ো রাস্তা থেকে নেমে এই রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে।  
দিবাকর বন্দুক হাতে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কেননা এত রাতে ফিটন হাঁকিয়ে  
যেই-ই আসুক সে অন্তত গল্প করতে আসবে না।

শব্দটা কিন্তু মাঝপথে এসে থেমে গেল।

পরের দিন থেকে তাঁর নতুন এক ধরনের অনুভূতি শুরু হলো। তাঁর মনে হলো যেন  
ছবিটা তাঁকে কিছু ইঙ্গিত করছে। যেন তাঁকে বলছে, খুনীকে ধরো। ওকে শাস্তি দাও। খুন  
করে বিধাতার রাজ্যে কেউ যেন নিষ্কৃতি না পায়।

দিবাকরের মনে হলো এক যুগ পরে একমাত্র তিনিই পারবেন মেয়েটিকে শনাক্ত করতে  
আর খুনীকে ধরতে। পারবেনই। কেননা তিনি তো অনেক তথ্যই পেয়ে গেছেন এর মধ্যে।  
তা ছাড়া—

আচ্ছা, ডায়েরিতে কিছু পাওয়া যায় না? সবটা তো পড়ে উঠতে পারেননি। অনেক পাতা অস্পষ্ট বলে তো বাদ দিয়ে গেছেন।

সেই দিনই ডায়েরিটা নিয়ে দিনের আলোয় বসলেন। বিবর্ণ অক্ষরগুলো কষ্ট করে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পড়বার চেষ্টা করতে লাগলেন।

॥ নয় ॥

### ডায়েরির শেষ পাতা

...ধন্য মেয়ে বিজলী! স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে তাকে বাড়ি থেকে গোপনে সরিয়ে দিয়েছিল সেই অপরাধে উচ্ছৃঙ্খল বটুকেশ্বর তার গায়ে হাত তুলেছিল। বাড়ির কেউ প্রতিবাদ করেনি। তাই হিন্দু জমিদারবাড়ির মেয়ে হয়েও সে কলকাতায় গিয়ে দারোগাকে নালিশ জানিয়ে এসেছিল। এটা নাকি এ বাড়ির মেয়েদের পক্ষে গর্হিত অন্যায়! সবাই ছি ছি করছিল। দারোগা বটুকেশ্বরকে ধরতে এলে সে পালায়।

কিন্তু কিছুদিন থেকে বটুকেশ্বরকে নাকি বাড়ির আশেপাশে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। যোড়শী শঙ্কিত। সে বলছে, বোধহয় বাড়িতে খারাপ কিছু ঘটবে।

তারপর আর পড়া গেল না। প্রায় শেষ পাতাটার কোনোরকমে পাঠোদ্ধার করা...কি সাংঘাতিক, কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেল সেদিন! ভাবতেও পারিনি আবার ডায়েরি লিখতে পারব। থ্যাঙ্ক গড্!

...বিকেলে গিয়েছিলাম নন্দীবাড়িতে। অন্দরমহলে গিয়ে দেখি কোনো বৌ-ই নেই। এমনকি রানীমাও। আশ্চর্য! গেল কোথায় সব?...আমি যদি জানতাম সেদিন হিন্দুদের শিবপূজোর দিন—ওদিন বাড়ির মেয়েরা সব বাড়ির পিছনে শিবমন্দিরে পূজো দিতে গেছে তাহলে কি আমি ওবাড়িতে যাই? জানতাম না বলেই আমি এমহল, ওমহল খুঁজে বেড়াচ্ছি, কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, ফিরে যাব ভাবছি, হঠাৎ একটা ঘর থেকে চাপা গোঁ গোঁ শব্দ! কি ব্যাপার দেখার জন্যে দরজাটা একটু ঠেললাম। কিন্তু দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। আবার ঠেললাম। চাঁচালাম, কে আছ, দরজা খোলো। কি হয়েছে?

দরজা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একজন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমার মুখটা চেপে ধরে পাশের ঘরে ঠেলে ফেলে শেকল আটকে দিল। আমাকে শাসিয়ে গেল, একটু পরে আমারও মৃত্যু হবে। সাক্ষী রাখবে না।

আমি ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছিলাম ঘরের মধ্যে একটা থামের সঙ্গে বিজলীকে বাঁধা হয়েছে। আর যে যুবকটি তাকে খুন করার চেষ্টা করছে, সে আর কেউ নয়, বটুকেশ্বর। ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে হতভাগিনী বিজলীকে একা পেয়ে গিয়েছিল।

...আমি তবু কোনোরকমে উঠে দাঁড়িলাম। জানলাটা একটু ফাঁক করলাম। আর তখনই সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখতে পেলাম—বিজলীর গলা টিপে তাকে শেষ করে দিচ্ছে। তারপরই অচৈতন্য হয়ে পড়লাম!...কি করে কখন নিজের বাড়িতে আনা হয়েছিল জানি না।

আমার ইচ্ছে ছিল এই নিয়ে কাগজে লিখি, কলকাতায় খবর দিই। কিন্তু আমার স্বামী অতিশয় শাস্ত স্বভাবের। তিনি বললেন, আমরা তো ইংলন্ডে ফিরে যাচ্ছি। ক'টা দিন মুখ

বুজে থাকো। ওসব হাস্যামার দরকার নেই। তা ছাড়া আসামীও তো পালিয়েছে। ওকে ধরা যাবে না।

...কিন্তু আমি ভাবছি বেচারী বিজলীর স্বামী ভবানীপ্রসাদের কথা। সে যখন শুনবে তখন কি করবে? হয়তো তাকে সবাই ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলবে। আর সে তাই বিশ্বাস করবে। সে জানতেই পারবে না তার স্ত্রীকে খুন করা হয়েছে। খুনীকে ধরার চেষ্টা বা প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করা তো দূরের কথা!...

ডায়েরিটা এখানেই শেষ।

পড়তে পড়তে দিবাকরের দুচোখ ঝকঝক করে উঠল। এই তো সব ইতিহাস বেরিয়ে এসেছে...তাহলে মিসেস ফেনটনই ছবিটা এঁকে গিয়েছিলেন।

কিন্তু এই যে কাহিনি মিসেস ফেনটন লিখে গেছেন সে কাহিনিটা যেন—

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে কাহিনিটা যেন তাঁর জানা। অ-নে-ক অ-নে-ক দিন আগের ঘটনা। কিন্তু কার কাছ থেকে জেনেছিলেন, কবে জেনেছিলেন তা মনে করতে পারলেন না।

## ॥ দশ ॥

### গভীর রাতের আগন্তুক

দিন সাতেক পর।

ছবিটার যে জায়গার রঙ চটে গিয়েছিল, দিবাকর বসেছিলেন সেখানে রঙ লাগাতে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সেখানে রঙ ধরাতে পারছিলেন না। হয়তো পুরনো ছবিতে রঙ ধরছিল না। কিংবা তিনি খুবই অন্যমনস্ক ছিলেন। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল কাহিনিটা তাঁর খুব জানা। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিলেন না কোথা থেকে জেনেছিলেন। কাহিনিটা শুধু জানাই নয়, কয়েকটা মুখও তাঁর যেন স্পষ্ট মনে পড়ছিল...

ছবিটায় রঙ ধরাতে না পেরে তিনি শেষমেশ ঠিক করলেন নিজেই নতুন করে পুরো জিনিসটা আঁকবেন। তখনই ছবি আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত হলেন দিবাকর। পুরনো ঘড়িটায় তখন বিকট শব্দ করে রাত দুটো বাজল।

ছবি এঁকে চলেছেন দিবাকর। কিন্তু আশ্চর্য, তুলির টান দিতে গিয়ে তাঁর হাত কাঁপছে! এ আবার কি? এমন তো কখনো হয় না।

তবু তিনি জোর করে তুলি টানতে লাগলেন। কিন্তু একি! তাঁর তুলিটা যে গোটা একটা মানুষের পিছনের অংশ এঁকে চলেছে! মনে হচ্ছে কেউ যেন অদৃশ্যভাবে তাঁর হাত ধরে অন্য কারো ছবি আঁকিয়ে নিচ্ছে।

দূরে কি কিছু শব্দ শোনা যাচ্ছে?

হ্যাঁ, শব্দই। খটাখট—খটাখট—খটাখট—

আজ আর দিবাকরের বুঝতে বাকি রইল না যে ওটা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ।

না, গাড়ি বা ফিটন নয়, কেউ ঘোড়া ছুটিয়ে দুরন্ত গতিতে এই দিকেই আসছে। কিন্তু দিবাকরের মন তখন ছবির দিকে। তিনি অবাক হয়ে দেখছেন তাঁরই তুলিতে যে ছবিটা ফুটে উঠেছে সেটা—

ঘোড়ার শব্দ ক্রমশই কাছে এগিয়ে আসছে—

দিবাকরের দুচোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। এ কি! এ কার মূর্তি! এ কার মুখ!

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ এবার আরো কাছে এসে পড়েছে।

দিবাকর স্তম্ভিত। এই কি সেই খুনী? কিন্তু এ কার ছবি?

তাঁর মেরুদণ্ড দিয়ে যেন এক চাণ্ডড় বরফ নেমে গেল। অতীত ফিরে এসেছে! এ যে তাঁর নিজেরই ছবি!

ঠিক তখনই ঘোড়ার শব্দ তাঁর বাড়ির কাছে এসে থামল। ভারী পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। তারপরই মনে হলো দরজার ওপর চলছে দুমদাম শব্দ।

ভাবানীপ্রসাদ! তুমি আবার এসেছ! বলেই দিবাকর বন্দুক আনার জন্যে উঠে দাঁড়াতে গেলেন। কিন্তু অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন।

পরের দিন সকালে পাড়ার লোক দেখল একজন অপরিচিত লোক বসে আছেন ইজিচেয়ারে, যে চেয়ারে সুদর্শন যুবক দিবাকর রোজ বসতেন।

এই নতুন ভদ্রলোক অতি বৃদ্ধ! একমাথা পাকা চুল। মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে, চোখের কোণে কালি, দু-চোখে ক্লান্ত শূন্য দৃষ্টি। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখা গেল বৃদ্ধটি বোবা।

ঠিক সেইদিনই ভোরে কলকাতার বাসায় সুরঞ্জন এক দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে উঠে বসলেন। তাঁর যেন মনে হলো বন্ধু দিবাকরের কোনো বিপদ ঘটেছে। তিনি তখনই ট্যাক্সি নিয়ে ছুটে এলেন। এসে হতবাক! মাত্র ক'দিনের ব্যবধানে তাঁর বন্ধুর একি দশা হয়েছে! এ যেন দিবাকর নয়, আদ্যিকালের আর একজন কেউ!

আষাঢ় ১৪০২

## ভয়

রেলপথ ও বাসরাস্তা থেকে অনেক ভেতরে যেখানে গোরুর গাড়ি কিংবা সাইকেল ছাড়া যাওয়া রীতিমতো কষ্টসাধ্য, সেসব গ্রামে এখনও এমন সব অলৌকিক ঘটনা ঘটে যা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া আর কেউ জানে না। খবরের কাগজে বা কোনো লেখকের কলমে ‘সত্য ঘটনা’ বলে তা ছাপা হয় না।

নদীয়া জেলার এমনি একটি গ্রাম মুকশিম পাড়া। ঝোপ-জঙ্গল, বাঁশঝাড়, ভাঙাচোরা বাড়ি, পুরনো মসজিদ, জীর্ণ কবরখানা আর গোটা দশেক পুকুর ছাড়া আর কিছু নেই। তবু এখানেই বংশানুক্রমে বাস করে চাষাভুষো, মিস্ত্রি-মজুর আর মধ্যবিত্ত মানুষ।

গ্রামে একটা মারাত্মক প্রবাদ—না শুধু প্রবাদ নয়, বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে গ্রামে কোনো অপঘাত মৃত্যু হলে গভীর রাতে একটা অদ্ভুত হাড়-কাঁপানো ডাক শোনা যায়। সে ডাক যে কিসের আজ পর্যন্ত কেউ তা বলতে পারেনি। কেউ বলে কোনো পাখির ডাক, কেউ বলে অন্য কিছু। পাখির ডাক যদি হবে তাহলে কেবল ঐ অঘটন ঘটান দিনেই? পাখির এমন অলৌকিক ক্ষমতা?

যাই হোক এ ডাকের রহস্য ভেদ করার সাহস আজ পর্যন্ত কারো হয়নি। সবাই ভাবে একটা কথাই—কী দরকার?

শুধু এইটুকুই নয়—ঐ ডাক শোনা গেলে সে বছর গ্রামে তিনটে অপঘাতে মৃত্যু হবেই। তার মধ্যে দুজন মানুষ, একটা প্রাণী।

যেবার হরেকেষ্ট কামারের বোটা শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে, এক ক্রোশ পথ হেঁটে গিয়ে লাইনে মাথা দিল, সেবারও রাতের অন্ধকারে বন-বাদাড় কাঁপিয়ে ঐ ডাক শোনা গিয়েছিল। আর তার তিন মাস পর জনার্দন চক্রবর্তীর ছোটো ছেলে সন্ধ্যাবেলায় কাটোয়া থেকে তার ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে আসতে পোলের ওপর উঠেই মুখ খুবড়ে পড়ল। আর উঠল না। ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ার দুজনেই শেষ। অথচ ঘোড়াটা ছিল যেমন তেজি, ছেলেটাও ছিল তেমনি জোয়ান। সে রাত্রেও নাকি ঐ ডাক শোনা গিয়েছিল। চমকে উঠেছিল গ্রামের লোক—আবার কে গেল? চমকাননি শুধু জনার্দন চক্রবর্তী। বাড়িতে বসে হঠাৎ অসম্ভব কিছু একটা দেখেছিলেন। না, চোখের ভ্রম নয়। তখন ঠিক সন্ধ্যা। ইজিচেয়ারে শুয়ে তিনি তামাক খাচ্ছিলেন। হঠাৎ বাইরে শুনলেন ঘোড়ার খুরের শব্দ। সে শব্দ তাঁর চেনা। বুঝলেন কাটোয়া থেকে ছেলে দেখা করতে আসছে। আনন্দে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। শব্দটা এগিয়ে আসছে বাইরে থেকে দেউড়ির ভেতর। কিন্তু কী আশ্চর্য ঘোড়াটা দেখা যাচ্ছে না। শব্দটা আরও এগিয়ে এল—আরও। থামল দরজাটার সামনে।

তারপর যেন দেখলেন একটা কালো ঘোড়া দাঁড়িয়ে। তার চোখ দিয়ে জল অর মুখ দিয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে।

তিনি হাঁকলেন—ভৈরব! সোমশঙ্কর কোথায়? তুমি একা কেন?

উত্তরে কাঁপতে কাঁপতে ভৈরব মাটিতে পড়ে গেল।

চিৎকার করে উঠেছিলেন জনার্দন চক্রবর্তী। আলো নিয়ে ছুটে এসেছিল বাড়ির লোকজন। কিন্তু কাছেপিঠে ঘোড়ার চিহ্নমাত্র নেই।

এই গ্রামেরই একটা ঘটনা শুনেছিলাম আমার প্রতিবেশীকন্যা রুমার মুখে। আমার বাড়ি বর্ধমান জেলার একটা মহকুমা শহরে। রুমা সেবার পার্ট টু পরীক্ষা দিয়ে তার মামার বাড়ি ঐ মুকশিম পাড়ায় গিয়েছিল দিন পনেরোর জন্যে। গ্রামের ওসব কাহিনী তার জানা। মাথা ঘামায় না বিশেষ। মামীমাকে বলে—এত বার আসি, একবারও ঐ ডাক শোনার সৌভাগ্য হলো না।

মামীমা বলে ওঠেন—সে ডাক শুনে কাজ নেই মা। থাকো শহরে, লেখাপড়া, গানবাজনা নিয়ে। তুমি কি করে বুঝবে কী ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে হয় আমাদের! একটা অপঘাত মৃত্যু আর তারপরেই ঐ মরণডাক! তারপরেই আবার একটা, হয় মানুষের নইলে কোনো পোষা জন্তুর মৃত্যু।

এ বাড়িতে রুমার মামা-মামী ছাড়া আছে দুই মামাতো ভাই—নান্টু আর পিন্টু। নান্টু রুমার চেয়ে বছর দু'একের বড়ো। বয়েস বছর বাইশ। পিন্টু তিন বছরের ছোটো। মাধ্যমিক পড়ে।

নান্টু কাটোয়া কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে গ্রামেই থাকে। চাকরি-বাকরির আশা নেই। বেকার জীবন। তাই পরোপকার করে বেড়ায়।

মামার আছে প্রচুর ধানজমি, বাঁশবাগান, পুকুর। এর আয়েতেই সংসার চলে। কয়েকমাস হলো তিনি গম ভাঙার মেশিন কিনেছেন। ইচ্ছে—পরে ছেলেরা যদি ওটা চালিয়ে যায়।

রুমা এখানে এলে ওর যত গল্প নান্টুদার সঙ্গে। যত ভাব তত ঝগড়া। হাজার হোক পিঠোপিঠি ভাই-বোন তো!

কিন্তু নান্টুদাকে বাড়িতে বেশিক্ষণ পাওয়া যায় না। দুপুরে সেই যে খাওয়া-দাওয়া করে বেরিয়ে যায়, ফেরে রাত নটা-সড়ে নটায়।

ওর আড্ডা দেবার জায়গা অন্য পাড়ায়। সেটা প্রায় বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে। আসলে সেই পাড়াটাই এই গ্রামের যাকে বলে 'প্রাণকেন্দ্র' তাই।

অত রাতে যখন সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফেরে তখন বাড়ির লোকের দুর্ভাবনার শেষ থাকে না। কেন না তাদের বাড়ির কাছাকাছি জায়গাটা শুধু নির্জনই নয়, কেমন গা-ছমছমে। ঐ যে বাঁশবন, ঐ যে ভেঙে পড়া বাড়িগুলো, ঐ যে জোড়া পুকুর—মনে হয় ওরই আশেপাশে কী এক অজানা রহস্য ঘাপটি মেরে বসে আছে। কখন কার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে কেউ তা জানে না।

এ অঞ্চলে ছিঁচকে চোরের উৎপাত থাকলেও বড়ো ধরনের চুরি-ডাকাতি বা খুন-খারাপি হয় না। খুন-খারাপি না হলেও এখানে অপঘাত মৃত্যু খুব বেশি। এ যেন গ্রামের ওপর একটা অভিশাপ।

বাড়ির লোকের ভয় করলেও, নান্টুর ভয়-ডর বলে কিছু নেই। বর্ষার সন্ধ্যায় অন্য পাড়ায় কেউ মরেছে। গরিব-দুঃখীর ঘরের মড়া। ফেলবার লোক নেই। সেই রাত্তিরেই দু'-তিনটে ছেলে নান্টুকে খবর দিয়ে যায়। বাড়ির আপত্তি নান্টু শোনে না। একটা গামছা কাঁধে

ফেলে চলে মড়া ফেলতে। তাও শ্মশানটা কি কাছেপিঠে? তারপর আবার পল্লীগ্রামের শ্মশান জনমানবশূন্য।

তাই রুমা নান্টুকে বেশিক্ষণ পায় না। সকালে নান্টু ওঠে একটু বেলা করে। চা-মুড়ি খেয়েই আবার বেরিয়ে যায়।

তবু ওরই মধ্যে রুমা নান্টুকে আটকে দেয়। বলে—কত দিন পর এলাম। সামনের সপ্তাহে চলে যাব। তুই কি আমার সঙ্গে গল্পও করবি না?

তখন হয়তো নান্টু একজন রোগীকে ভালোভাবে দেখবার জন্যে হেলথ-সেন্টারের ডাক্তারকে চিঠি লিখছে। হেসে বলে—আমার কোনো গল্প নেই।

রুমা ঐ ‘ডাকের’ কথাটা জিজ্ঞেস করে। নান্টু বলে—ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। বলেই আবৃত্তি করে—“জন্মিলে মরিতে হবে/অমর কে কোথা কবে।” পড়েছিস তো?

তা পড়েছি। তার সঙ্গে ঐ ডাকের সম্পর্ক কি?

যে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে মৃত্যু আছে তা সে স্বাভাবিক হোক আর অপঘাতই হোক সে কোনো কিছুতেই ভয় পায় না।

কিন্তু ঐ যে ‘ডাকের’ কথা সবাই বলে? রুমা তার পয়েন্ট থেকে সরে আসতে চায় না।

নান্টু বলে—বললাম তো ‘ডাক’ নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।

আবার তুই এড়িয়ে যাচ্ছিস। তুই মাথা ঘামাতে না পারিস, ডাকটা তো শোনা যায়? তা যায়!

রুমা যেন একটু শিউরে উঠল। তার এই দুর্দান্ত দুঃসাহসী দাদাটিও তাহলে স্বীকার করে ডাক শোনা যায়।

তুই শুনেছিস?

তা একবার-দু’বার শুনেছি।

কোথায়?

এখানে-ওখানে। রাত্তিরবেলায় ডাকে। কে আর তার খোঁজ করতে যায়?

কিসের ডাক বলে তোর মনে হয়?

কোনো পশু-পক্ষী হবে। কত বন-জঙ্গল তো কাটা হচ্ছে। কিছু দুর্লভ পশু-পাখি হয়তো কোথাও ছিল। এখন প্রাণ বাঁচাতে এখানে-এখানে ছটকে পড়েছে।

রুমা যেন এই যুক্তিতে খুশি হলো না। বলল—তাহলে কেবল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই তোর ভাষায় পশু-পক্ষীটি ডাকবে?

নান্টু বিরক্ত হয়ে বলল—অতশত আমি জানি না। জানতে চাইও না। একটু চা কর দিকি।

তা করছি। কিন্তু তুই একটা সত্যি কথা বল, এই যে এত রাত্তিরে একা একা বাড়ি ফিরিস, ভয় করে না?

নান্টু এদিক থেকে ওদিক মাথা নাড়ল। বলল—নাঃ।

কখনো ভয় পেয়েছিস?

নান্টু একটু হাসল। তারপর যেন অনেক দিন আগের কোনো স্মৃতি হাতড়ে নিয়ে বলল—তা একবার পেয়েছিলাম।

বল বল।

আগে চা নিয়ে আয়।

চা খেতে খেতে নান্টু যে ঘটনাটা শোনাল তা এইরকম—

একবার ও পাশের গ্রামে গিয়েছিল এক বিয়ে উপলক্ষে। তবে নেমস্তম্ভ খেতে নয়, বরপক্ষ যাতে দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত বাপের ওপর জুলুম না করে তার ব্যবস্থা করতে। ওর দলবল আছে, দুট্টু লোকে তাই খুব ভয় পায় ওকে।

বিয়েবাড়ি থেকে ফিরতে বেশ রাত হয়েছিল। একটা সাইকেল করে আসছিল। পল্লীগ্রামের নির্জন পথ। দু'পাশে ঝোপ-ঝাড়। নিস্তব্ধ পরিবেশ। হঠাৎ সাইকেলের চেনটা গেল খুলে।

সাইকেল থেকে নেমে ও অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চেনটা লাগাল। তারপর সাইকেলে উঠতে যাবে হঠাৎ সামনের দিকে তাকাতেই চমকে গেল। কি ওটা?

দেখল বাঁ দিকের বটগাছের ডাল থেকে সাদা কাপড় জড়ানো কি যেন ঝুলছে। বেশ লম্বা। দুটো পা-ও যেন দেখতে পেল। ওর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের ঝুলি থেকে টর্চটা বের করে জ্বালল। দেখল সাদা কাপড় জড়ানো একটা দেহ। বাতাস নেই। তবু দুলছে। যেন বলছে—এই যে আমি।

ও বুঝল কেউ গলায় দড়ি দিয়েছে। কিন্তু লোকটা কি গলায় দড়ি দেবার জন্যে গ্রাম ছেড়ে এত দূরে এসেছিল? আর মুখটাই বা কাপড় জড়ানো কেন?

ওর বন্ধমূল ধারণা হলো, লোকটাকে খুন করে কয়েকজনে মিলে এখানে ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছে।

ও মশাই! দাঁড়ালেন কেন? বেশ তো যাচ্ছিলেন, যান না।

চমকে উঠেছিল ও। গলার স্বরটা যেন কেমন জড়ানো।

তখনই টর্চের আলো ফেলল শব্দ লক্ষ্য করে। দেখল রাস্তার উণ্টোদিকে একটা তেঁতুল গাছের তলায় জনা পাঁচেক লোক শুয়ে রয়েছে।

এই পর্যন্ত বলে নান্টু থামল। বলল—ঐ একবারই গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। হ্যাঁ, কেমন যেন ভয় পেয়েছিলাম।

রুমা বললে, তারপর কি হলো?

কি আর হবে? সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। রাত তখন দুটো।

কিন্তু লোকগুলো?

নান্টু হেসে বললে—ওরা দূর গ্রাম থেকে মড়া নিয়ে আসছিল। ক্লান্ত হয়ে পড়ায় মড়াটা রেখে গাছতলায় একটু শুয়ে ছিল। শেয়াল-কুকুরে খাব তাই মড়াটা গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিল।

ওঃ এই! রুমা যেন হতাশ হলো। কিন্তু নান্টু কেমন একরকম গলার স্বর করে বলল—তবে একটা জিনিস, কিছুতেই বুঝতে পারলাম না একটা মড়া কি ভাবে অত উঁচু ডালে ঝোলানো সম্ভব হলো? কথাটা মনে হলো আরো খানিকটা এগিয়ে এসে। আর, তখনই যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম—‘বলো হরি হরি বোল’। সেই সঙ্গে অনেকগুলো পায়ের শব্দ। আর আশ্চর্য ঠিক আমার সাইকেলের পেছনে।

এত তাড়াতাড়ি মড়া নামিয়ে কি করে আমার ছুটন্ত সাইকেলের পিছনে এসে পড়তে পারে ভেবে পেলাম না।

রুমা কি বলতে যাচ্ছিল এই সময়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল তিনটে ছেলে।



নান্টুদা, গিরি গয়লানী হরিপদর ছেলেটার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। শীগির এসো।

নান্টু লাফিয়ে উঠে বললে—মাথা ফাটিয়েছে কেন?

গিরির গাছের দুটো আম পেড়েছিল। তাই—

দুটো আম পেড়েছিল বলে ও মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে! ওর তো বড্ড বাড় বেড়েছে।

ও একমাত্র তোমাকেই ভয় করে। তুমিই ওকে শায়েস্তা করতে পার।

তার আগে ছেলেটার ব্যবস্থা করি। হ্যাঁ রে, খুব রক্ত বেরোচ্ছে?

হ্যাঁ। অনেকটা কেটে গেছে।

তাহলে তো এখনি কাটোয়া হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। মা, আমি বেরোচ্ছি। কখন ফিরব ঠিক নেই। বলই নান্টু ওদের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

রুমা নিজের মনেই বলে উঠল—বাস! নান্টুদার খাওয়া-দাওয়া এ বেলার মতো হয়ে গেল।

গিরি গয়লানীর কথা রুমা অনেক বার শুনেছে। একবার দেখেও ছিল। কালো মোটা চোখগুলো গোল গোল। ঠোঁটটা পুরু। ঝুলে পড়েছে। মাথার চুলে জট। ভয়ানক বদমেজাজী। এমনিতে ওর হাতটান আছে। কারো বাড়িতে ঢুকলে ঘটিটা-বাটিটা হাতিয়ে নেয়। সেইজন্যে কেউ ওকে বাড়ি ঢুকতে দেয় না। একবার পাড়ার একটা বাচ্চা ছেলেকে চুরি করে বাইরে পাচার করার চেষ্টা করেছিল। নান্টু তার দলবল নিয়ে ছেলেটাকে উদ্ধার করে। সেই থেকে নান্টুর ওপর তার বেজায় রাগ। একবার তো ওকে কাটারি ছুঁড়ে মেরেছিল। একটুর জন্য নান্টু বেঁচে গিয়েছিল। আবার এই নান্টুই তাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। সাবধান করে দিয়ে বলেছিল—ফের যদি চুরি-চামারি কর তাহলে গাঁ থেকে তোমায় তাড়াব। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

গিরি গয়লানী সেদিন নান্টুর মৃত্যু-কামনা করে শাপশাপাস্ত দিয়েছিল। তাই শুনে নান্টুর মা কঁদেকেটে বলেছিল—কেন তুই ডাইনিটাকে ঘাঁটাতে যাস? তোকে গাল-মন্দ করে। আর আমার বুক কাঁপে।

নান্টু মায়ের কথায় কান দেয় না। শুধু হাসে।

সেই গিরি আজ একটা ছেলের মাথা ফাটিয়েছে। নান্টু তো ছুটল। আবার কি অনর্থ বাধায় কে জানে!

রুমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

## ॥ দুই ॥

রুমা আমায় তার এবারের অভিজ্ঞতার কথা বলেছিল।—জেঠু, সব ঘটনাটা শোনার আগে আমার মামার বাড়িটা কিরকম জানতে হবে।

বলে একটা কাগজ টেনে নিয়ে একটা ঘর আঁকল। ঘরটা বেশ বড়ো। পাশেই একটা ছোটো ঘর। বড়ো ঘরের পেছনে লাগোয়া রান্নাঘর। উষ্টোদিকে বাথরুম।

দুটো ঘরের সামনে অনেকখানি উঠোন। উঠোনের মাঝখানে ধানের মড়াই। ডানদিকে গোয়াল। তার পাশেই ধান কোটার টেকি। উঠোনের পাশ দিয়ে বাইরে যাবার দরজা। দরজাটা বেশ মজবুত। সমস্ত উঠোন ঘিরে উঁচু পাঁচিল। যাতে চোর পাঁচিলে উঠতে না পারে।

আর এই দরজা দিয়ে বেরিয়েই বাঁ দিকে বাঁশঝাড়। ওপাশে পুকুর। এবার বাড়ির পেছন দিকটা দেখুন।

বলে একটা দোতলা বাড়ি আঁকল। তারপর বলতে শুরু করল—এটা বহুদিনের পুরনো বাড়ি। কিন্তু মাঝে মাঝে মেরামত হয় বলে এখনও টিকে আছে। দোতলার ঘরের জানলাগুলো সব বন্ধ। দোতলার ঐ দিকের বারান্দাটা দেখুন ভেঙে পড়েছে। তাই বারান্দার দিকের দরজাটা পেরেক দিয়ে আঁটা। অন্যমনস্ক হয় কেউ খুলতে পারবে না। এত বড়ো বাড়ি—কিন্তু লোকজন নেই। দরজায় দরজায় তালা। এটা দত্তবাবুদের বাড়ি। তাঁরা কলকাতায় থাকেন। শুধু পুজোর সময়ে মাসখানেকের জন্যে আসেন। নিচে বিরাট পুজো-দালান। এখনো সে আমলের ঝাড়-লগ্নন ঝোলে। এ বাড়িতে দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো ছাড়া দীপান্বিতার রাতে হয় ছিন্নমস্তার পুজো। সে বড়ো সাংঘাতিক পুজো। গায়ের লোকে বলে ঐ পুজোয় একটু খঁত হলে নাকি রক্ষা নেই। দু'বার বলি বেধে গিয়েছিল। সেই দু'বারই এবাড়ির দু-দুটো জোয়ান ছেলে মরেছিল। একজন জলে ডুবে আর একজন সাপের কামড়ে। শুনেছি সেবারও সেই ডাক নাকি শোনা গিয়েছিল। ঐই পুজো যে কত কালের তা কেউ বলতে পারে না। পুজো-দালানের এক কোণে যে বিরাট হাঁড়িকাঠটা রয়েছে সেটা দেখলেই বোঝা যায় এক সময়ে এখানে মোষ বলি হতো।

আমি অবাক হয়ে রুমার কথা শুনছিলাম। ও বলতে লাগল—মামার বাড়ির বড়ো ঘরের এই জানলাটা দিয়ে দত্তবাবুদের পুজো-দালানটা স্পষ্ট দেখা যায়। মামীমা বলেন কত রাতে ঐ নির্জন দালানে ঘণ্টা বাজতে শোনা গেছে। কখনও বলিদানের বাজনা বেজে ওঠে।

এসব আমি অবশ্য বিশ্বাস করি না। আসলে বহুদিন ধরে একই জায়গায় থাকতে থাকতে, নানা কাহিনী শুনতে শুনতে মানুষের ইন্দ্রিয়গুলো সেইসব ব্যাপারে সহজেই বিশ্বাসে সজাগ হয়ে থাকে। মামীমাদেরও তাই হয়েছে আর কি।

একটু থেমে বলল—যাক ও কথা। এই বড়ো ঘরে মামা-মামী শোন। অন্য দিকটায় একটা চৌকি পাতা আছে। কেউ এলে ঐ চৌকিতে শোয়। যেমন আমি শুই। চৌকির ধারেই জানলা। যে জানলা দিয়ে রাস্তার ধারের বাঁশঝাড়টা দেখা যায়।

পাশের ছোটো ঘরটায় ওরা দু'ভাই শোয়। সেখানেও জানলা দিয়ে যেমন বাঁশঝাড় দেখা যায় তেমনি অন্য জানলা দিয়ে ঐ পুজো-দালানটাও দেখা যায়। এছাড়া ঐ পাশে একটা ছোট ঘর আছে। সেখানে পুরনো জিনিসপত্তর থাকে। এই ঘরেরই দেওয়ালে টাঙানো আছে কাপড় জড়ানো একটা তরোয়াল। তরোয়ালটা কার ছিল, কবে থেকে আছে তা কেউ জানে না। তবে বাড়ির সবার কাছে তরোয়ালটা খুব পবিত্র।

জেঠু, বাড়ির পজিশানটা আপনার কাছে ক্রিয়ার হলো তো?

যদিও খুব পরিষ্কার হয়নি তবু বললাম—হ্যাঁ, হয়েছে। এবার ঘটনাটা বলো।

রুমা এবার যা বলে গেল তা এইরকম—

পাড়ায় নাকুর এক বন্ধুর বোনের বিয়ে। দরকারি কিছু জিনিস কেনাকাটার দায়িত্ব পড়েছিল নাকুর ওপর। নবদ্বীপ থেকে বেলাবেলি কিনে আনতে হবে। সকালবেলায় বেরিয়ে গেল ও। বলে গেল বেলা একটার মধ্যে ফিরবেই।

জিনিসপত্তর কিনে বিয়েবাড়িতে রেখে একটার মধ্যে ফিরতেই হবে। কেন না বাড়ি ফিরে স্নান করে প্রস্তুত হয়ে আবার বিয়েবাড়ি যেতে হবে। ওখানেই দুপুরের খাওয়া। তারপর বিয়েবাড়ির তদারকি, বরযাত্রী আসবে, তাদের আপ্যায়ন করা। নষ্ট করার মতো সময় নেই।

কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল নান্টু ফিরল না। বাড়ির সবাই ভাবল নিশ্চয় নবদ্বীপ থেকে ফিরতে দেরি হয়েছে, তাই বিয়েবাড়িতেই স্নানটান সেরে নিয়েছে। একেবারে সব কাজকর্ম মিটিয়ে সেই রাতের বেলা ফিরবে।

রাত যখন এগারোটা তখন পিন্টু বাড়ি ফিরল একা।

সবাই অবাক।—দাদা কোথায়?

পিন্টু বলল—জানি না। সন্ধ্যাবেলা দাদাকে একবার ওখানে দেখেছিলাম। তারপর আর দেখিনি! বোধহয় খায়ওনি। সবাই খোঁজাখুঁজি করছিল। শেষে সবাই ভাবল বোধহয় বাড়ি চলে এসেছে। সারা দিন খুব খাটুনি গেছে তো।

সে আবার কী! জলজ্যান্ত ছেলোটা গেল কোথায়? যদি অন্য কোথাও যায়ই, বিয়েবাড়িতে তো বলে যাবে।

সে রাত্রে বাড়িতে কারো গলা দিয়ে ভাত গলল না। বিছানায় শুয়ে যে যার মতো চিন্তা করতে লাগল। আর কান পেতে রইল দরজায় কখন কড়া নাড়ার শব্দ শোনা যাবে।

রুমারও ঘুম আসছিল না। দেখল পিন্টুও ঘুমোয়নি। এপাশ-ওপাশ করছে। ও পিন্টুর কাছে গিয়ে বসল। রাত তখন দেড়টা। ঘরের এক কোণে ওদের পোষা বেড়ালটা চোখ বুজিয়ে ঝিমুচ্ছে। অনেক দিনের বেড়াল। খুব ভীতু। হলো দেখলেই পালায়। কিন্তু চেনা মানুষের কাছে খুব সহজ।

রুমা জিজ্ঞেস করল—বিয়েবাড়িতে নান্টুদাকে কখন দেখিছিলি?

তখন ফার্স্ট ব্যাচ বসেছে। এই ধর রাত আটটা।

ও কি করছিল?

পরিবেশন করছিল।

তারপর?

তারপর মনে হলো বাইরে থেকে দু'জন লোক এসে ওকে ডাকল।

দু'জন লোক ডাকল?

হ্যাঁ।

চেনা লোক?

আমি চিনি না।

তারপর?

তারপর পরিবেশন করা রেখে তাদের সঙ্গে কথা বলতে গেল। আর দেখিনি।

বেড়ালটা আস্তে আস্তে রুমার কোলে এসে বসল।

রুমা অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না। শেষে বলল—এ কথাটা তো এতক্ষণ বলিসনি?

বলে কি হবে? সবার দুর্ভাবনা আরো বাড়বে। শেষে আমাকেই এত রাতে খুঁজতে বেরোতে হবে। একটু থেমে বলল—বেরোতে আমি এখনি পারি। কিন্তু কোথায় খুঁজব? পিন্টু আবার একটা থামল। তারপর রুমার হাত দুটো চেপে ধরে বলল—কী যে ভয় করছে রুমাদি!

ভয় কিসের? এখানে তো ওর কোনো শত্রু নেই।

তা হয়তো নেই। তবে ওকে যে সবাই ভালোবাসে, সবার উপকার করার জন্যে ছুটে যায়—এটা হয়তো কারও কারও ভালো লাগে না। হিংসে করে। তাছাড়া গোপন রাগও থাকতে পারে।

বিষেবাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াতেই লোক দুটো বলল—নাটু, একজন স্টোভ বাস্ট করে পুড়েছে। এখানে কিছু করা যাবে না। বিচ্ছিন্নভাবে পুড়েছে—কেউ এগোচ্ছে না। ওকে কাটোয়ার হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তুমি না নিয়ে গেলে ও আর বাঁচবে না।

নাটু তখনই ওদের সঙ্গে চলে গেল। প্রায় একরকম দৌড়তে দৌড়তেই গেল। তাতেও প্রায় মিনিট পনেরো লাগল। গিয়ে দেখল এক জায়গায় বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে। জায়গাটা দেখেই নাটু হকচকিয়ে গেল। ভাবতেও পারেনি এই গিরি গয়লানীর বাড়ি। লোকগুলো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে শুধু গোঙানি।

কে পুড়েছে?

ওর সঙ্গে একজন এতক্ষণে বলল—গিরি।

আমায় আগে তো বলনি?

লোকটা কাঁচুমাচু হয়ে বলল—বলিনি ইচ্ছে করেই। যদি তুমি না আস। গিরি যে তোমায় কী চক্ষে দেখে তা তো আমরা জানি।

ভিড় ঠেলে নাটু ঘরের মধ্যে ঢুকল। ঢুকতেই কেরোসিন তেল আর পোড়া চামড়ার উৎকট গন্ধ। দেখল ঘরের এক জায়গা কেরোসিন তেলে ভিজে গেছে। ভাঙা স্টোভের টুকরোগুলো ছড়িয়ে। মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে গিরি। তার চুলগুলো পুড়ে গেছে, মুখের চামড়া পুড়ে কালো হয়ে গেছে। গলার কাছে দগদগ করছে যেন পুরনো ঘা। সে বীভৎস দৃশ্য দেখা যায় না।

নাটু তখনই একজনকে জিপ আনতে পাঠাল।—আমার নাম করে বলবি। এখুনি দরকার।

জিপ এল প্রায় এক ঘণ্টা পরে। গিরির সেই বিরাট বপুর অনেক জায়গাতেই পুড়ে গিয়েছিল। তাই কলাপাতায় জড়িয়ে ধরাধরি করে জিপে তোলা হলো।

তোমরা কে কে যাবে?

এত রাতে এরকম একজন রুগীকে নিয়ে কাটোয়া পর্যন্ত যেতে কেউ রাজী হলো না। ছলছলো করে সরে পড়ল। নাটু একবার ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল। তারপর একাই অত ভারী দেহটা নিজের কোলের ওপর শুইয়ে নিয়ে চলল।

রাত একটা বেজে গেছে। বিস্তী রাস্তা। জিপটা ঝাঁকানি খেতে খেতে চলেছে। গিরি অসহ্য যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে তো গোঙাচ্ছেই।

জনপ্রাণীশূন্য রাস্তা। দু'পাশে রেনট্রগুলো অন্ধকারকে আরও যেন ভয়াবহ করে তুলেছে। মাঝে মাঝে দু'পাশে ধানক্ষেত। বাবলা গাছের লাইন চলেছে তো চলেছেই। গাড়ির হেডলাইট অন্ধকারের বুক চিরে খানিকটা পথ করে নিচ্ছে। তার পিছনেই আবার জমাট অন্ধকার।

গিরি গয়লানীর বয়েস পাঁচের কোঠায়। শরীর বেশ ভারী। প্রায়ই নাটুর কোল থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। তখনই আত্ননাদ করে উঠেছে। নাটু প্রাণপণ শক্তিতে গিরির পা দুটো সীটের ওপর তোলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পা দুটো যেন শক্ত আর বেঁকে গেছে। নাটু ভাবল—মহা মুশকিল, এখনও অর্ধেক পথ আসেনি। এইভাবে কতক্ষণ নিয়ে যাওয়া যায়? তারপর পোড়া দেহ থেকে রস গড়িয়ে তার জামা-প্যান্ট ভিজিয়ে দিচ্ছে। দু'হাতে বুঝি রসই লেগেছে। তাই চটচট করছে। শুধু তাই নয়। গিরির সারা গা থেকে বিস্তী পোড়া গন্ধ ছাড়ছে। বমি আসছে।

এদিকে ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে তো চালাচ্ছেই। সেও যদি দুটো কথা বলে তা হলেও একটু অনামনস্ক হওয়া যায়। কিন্তু এমনই কর্তব্যপরায়ণ ড্রাইভার যে একবারও পিছু ফিরে তাকাচ্ছে না।

হঠাৎ গাড়িটা ঝাঁকানি দিয়ে থেমে গেল। ড্রাইভার ব্রেক কষেছে।

নান্টু ঝুঁকে পড়ে দেখল একটা লোক একেবারে সামনে পড়ে গেছে। অন্ধের জন্যে বেঁচে গেছে।

কিন্তু লোকটার ভূক্ষপ নেই। একবারও পিছন ফিরে তাকাল না। হন হন করে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলল।

ড্রাইভার আবার গাড়ি চালাতে লাগল। হর্ন বাজিয়েই চলেছে। কিন্তু লোকটা পথ থেকে সরছে না। গাড়ি যতই এগোচ্ছে লোকটা ততই জোরে হাঁটছে।

আশ্চর্য!

এতক্ষণে নান্টু দেখল লোকটা বেজায় লম্বা। প্রথম যখন গাড়ির একেবারে সামনে দেখেছিল তখন এত লম্বা মনে হয়নি। কিন্তু এখন—

ড্রাইভার হর্ন বাজিয়েই চলেছে। তারপর হঠাৎই ড্রাইভার স্পিড তুলে দিল। নান্টু চৈচিয়ে উঠল—করছ কী! চাপা পড়বে, গাড়ি থামাও। কিন্তু ড্রাইভার শুনল না। যতটা সম্ভব স্পিড তুলে গাড়িটাকে মাঝ পথ দিয়েই উড়িয়ে নিয়ে গেল।

না, লোকটা আর নেই। চাপাও পড়েনি। পাশে সরেও যায়নি। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

নান্টুর কপালে মিনমিন করে ঘাম ফুটে উঠল। ড্রাইভারকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল আর তখনই মনে হলো গিরির জ্ঞান ফিরে এসেছে। তার মুখের দিকে তাকাতেই দেখল গিরি গোল গোল চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে। শুধু তাকিয়ে থাকা নয়, যেন দু'চোখ বিস্ফোরিত করে তাকে চেনবার চেষ্টা করছে। যে মুহূর্তে চিনতে পারল তখনই তার চোখের ভাষা বদলে গেল। চোখের মণি দুটো আগুনের ভাঁটার মতো ঘুরতে লাগল। উঃ! কী ভয়ংকর সে চাউনি! নান্টু তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফেরাল। বুঝতে পারল গিরি তার চিরশত্রুকে যেন এত দিন পর হাতের মুঠোয় পেয়েছে।

কষ্ট হচ্ছে? সাহস করে নান্টু কথা বলতে চাইল। গিরি উত্তর দিল না। গোঙানিটা থেমে গেল। কিন্তু তার হিংস্র দৃষ্টি নান্টুর মুখ থেকে সরল না।

ভয় নেই। তোমায় কাটোয়া হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি বেঁচে যাবে।

গিরি তবু নিরুত্তর। একবার উঃ করে উঠল।

লাগছে? বলে নান্টু তাড়াতাড়ি তার পোড়া পিঠের নিচ থেকে হাতটা সরিয়ে নিল।

গিরি এবার চোখ বুজল।

নান্টু ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল—কাটোয়া আর কতদূর ভাই?

অগ্রদ্বীপ পেরোয়নি এখনও।

ও বাবা! এখনও মাঝে দাঁইহাট আছে।

এদিকে সে আর পা ঠিক রাখতে পারছে না। গিরির দেহটা ক্রমেই তার পা থেকে সীটের নিচে নেমে যাচ্ছে। নান্টু ঘাড় নিচু করে গিরির দেহটা তুলতে যেতেই হঠাৎ গিরি দু'হাত দিয়ে নান্টুর গলাটা আঁকড়ে ধরল।

নান্টু ভাবল বুঝি পড়ে যাবার ভয়ে গিরি ওর গলাটা ধরেছে। কিন্তু—একী! গিরির

দুটো হাত যে ক্রমেই তার কণ্ঠনালীর দিকে এগিয়ে আসছে। নান্টু এক ঝটকা মেরে ঘাড়টা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল। পারল না। কী শক্ত গিরির হাত দুটো। সেই শক্ত হাত দুটো হঠাৎ টিপে ধরল নান্টুর গলা। টিপে ধরেই গিরি তার শেষ শক্তি দিয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করল যাতে ওর মরণ টিপুনির থেকে নান্টু গলা বাঁচাতে না পারে।

নান্টু আর দয়া-মায়া না করে বাঁচবার জন্যে তার হাত দুটো জোর করে ঠেলে দিল। দু'হাতে গলিত কুষ্ঠের মতো চটচটে রস লেগে গেল। একটা আর্তনাদ করে গিরি কোলের ওপর এলিয়ে পড়ে ক্রমাগত গোঙাতে লাগল।

শয়তান কোথাকার! মরতে বসেও শয়তানি যায় না। বজ্জাত গয়লানী, তুই ভালো হয়ে ফিরে আয়। এবার তোকে জেলে পুরব। নইলে আমার নাম নান্টু নয়।

ভোরবেলায় চিপ কাটোয়া হাসপাতালে ঢুকল। গিরিকে ভর্তি করিয়ে নাম-ঠিকানা লিখে ডাক্তারদের বলে এল—এ গরিব মানুষ বলে অবহেলা করবেন না। এর নিজের কেউ নেই। কিন্তু জানবেন আমি আছি। বলে দৃষ্ট পায়ে গটগট করে জিপে এসে বসল।

জিপে বসতেই তার শরীরটা কিরকম করে উঠল। গা গুলোতে লাগল। শরীরে কেমন কাঁপুনি।

ড্রাইভার ভাই, একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে দাও। শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে।

## ॥ চার ॥

বেলা প্রায় নটার সময়ে নান্টু বাড়ি ঢুকল। সবাই বসে আছে তার পথ চেয়ে। এমনকি বিয়েবাড়ি থেকেও দু'-একটা ছেলে ছুটে এসেছে খবর নিতে। নান্টুকে ফিরতে দেখে সবাই নিশ্চিত।

কুমা ছুটে গিয়ে বলল—তোর আক্কেল কিরে নান্টুদা?

নান্টু উত্তর দিল না। সোজা নিজের ঘরের দিকে চলল। নান্টুর আদরের বেড়ালটা ল্যাজ তুলে নান্টুর পায়ের কাছে ঘুরছিল। নান্টু এক লাথি মেরে সরিয়ে দিল। এমন নিষ্ঠুর আচরণ সে কখনো করেনি।

এতক্ষণে বাড়ির সকলের লক্ষ্য পড়ল নান্টুর দিকে।

ইস! এ কী অবস্থা! চুল উষ্ণখুষ্ণ, চোখ নেশাখোরের মতো লাল, উদভ্রান্ত দৃষ্টি। জামায় এখানে-ওখানে বিস্ত্রী ছোপ।

সারা রাত কোথায় ছিলি? কি হয়েছে?

পরে বলব। আগে একটু শোব।

কোনোরকমে জামাটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্যান্ট পরেই সে মেঝেতে শুয়ে পড়ল। প্যান্টটা ছাড়ারও দরকার ছিল। কিন্তু পারেনি।

আধঘণ্টা পর সে উঠে বসল। তখন সবাই তার পাশে বসে। বার বার জিজ্ঞেস করায় সে শুধু সংক্ষেপে গিরি গয়লানীকে কাটোয়া হাসপাতালে ভর্তি করে দেবার কথা বলল। আর কিছু বলল না।

মামীমা বললেন—কিছু খাবি? সারারাত তো কিছু খাসনি।

নান্টু মাথা নাড়ল।

খাবিনে কেন?

খেতে ইচ্ছে করছে না।

তবে একটু চা করে দিই খা।

রুমা তখনই চা করে এনে দিল। চায়ের সঙ্গে চিড়ে ভাজা।

চিড়ে ভাজা ছুলো না। চা-টা মুখে দিতে গিয়ে নামিয়ে রাখল।

কি হলো? চা খাবি না?

না। পোড়া গন্ধ।

পোড়া গন্ধ! সবাই অবাক হয়ে তাকাল।

তোমরা এখন বিরক্ত কোরো না। বলে গুম হয়ে বসে রইল।

হঠাৎ নান্টুর কি যে হলো কেউ বুঝতে পারল না।

যা চান করে নে গে।

নান্টু তেল মেখে বাঁশবাগানের ধারের পুকুরে ডুব দিতে গেল। কিন্তু ডুব দিল না।

ফিরে এল।

চান করলি না?

বাড়িতে করব।

কেন পুকুরে স্নান করবে না সে কথা জিজ্ঞেস করতে কারও সাহস হলো না। বাড়িতে স্নান করে খেতে বসল। কিন্তু খেতে পারল না। বলল—পোড়া গন্ধ।

তারপরই বিছানায় শুয়ে পড়ল।

সবাই বুঝল গিরির পোড়া দেহটা অতদূর নিয়ে গিয়েছিল, সেই গন্ধটাই লেগে রয়েছে।

বিকеле ঘুম থেকে উঠল। এখন অনেকটা স্বাভাবিক। রুমা ওর কাছে-কাছেই রয়েছে।

খুব ইচ্ছে সারা রাত নান্টুদা একা ঐ মুমূর্ষু মেয়েটাকে নিয়ে কীভাবে গেল সব কথা শোনার।

গিরিকে কেউ পছন্দ করে না। বিশেষ করে নান্টুদার ওপর গিরির কীরকম রাগ সকলেই

তা জানে। সেই গিরিকে বাঁচাবার জন্যে একমাত্র তার নান্টুদাই ছুটল এ কী কম কথা!

তবু এই মুহূর্তে ওকে জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছিল না।

বেড়ালটা অভিমান ভূলে নান্টুর গা ঘেঁষে বসল। নান্টু আদর করতে লাগল।

সকালে তুই ওকে এমন লাথি মারলি—রুমা বলল।

লাথি মেরেছিলাম নাকি?

বাঃ! এরই মধ্যে ভূলে গেলি?

মনে পড়ছে না তো।

অন্য দিন পুকুরে সাঁতার কাটিস। আজ পুকুরে গিয়েও ফিরে এলি কেন?

এ কথার উত্তর দেবার আগেই নান্টু হঠাৎ বেড়ালটার গা থেকে হাতটা টেনে নিল।

কি হলো?

বেড়ালটার মুখে কালো দাগটা দেখেছিস?

হ্যাঁ। ও দাগ তো ওর জন্ম থেকে।

নান্টু একটু গভীর হয়ে বলল—বোধহয় কোনোদিন পুড়ে গিয়েছিল।

পুড়ে গিয়েছিল! তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে নান্টুদা। কেবলই পোড়া দেখছিস।

নান্টু চুপ করে রইল। তারপর বলল—আমিও বোধহয় পুড়ে মরব কোনো দিন।

কী যে বলিস!

পোড়া যে কী ভয়ংকর তা না দেখলে বুঝতে পারবি না।

খুব পুড়েছে?

না। তেমন নয়। শুধু মুখের অর্ধেক, গলা, পিঠের খানিকটা।

তবে হয়তো বেঁচে যাবে।

নান্টু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—নাঃ বাঁচবে না।

কেন?

আমি বুঝতে পারছি।

তুই ডাক্তার না গণ্যকার?

ওসব কিছু নয়। কিন্তু আমি জানি।

রুমা আর কিছু বলল না। সবই যেন তার হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে।

নান্টু হঠাৎ যেন নিজের মনেই বলতে লাগল—একটা ঢাঙা মতো লোক গভীর রাতে রাস্তার মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে। একটা গাড়ি বার বার হর্ন দিচ্ছে, কিন্তু সে পথ ছাড়বে না। রাস্তার মাঝখান দিয়েই হাঁটছে লম্বা লম্বা পা ফেলে। ড্রাইভার আর কি করবে, চোখ বুজিয়ে টপ স্পিডে সোজা গাড়ি চালিয়ে দিল। কিন্তু লোকটা চাপা পড়ল না। পাশেও সরে যায়নি। অথচ তাকে আর দেখা গেল না।

কথা শেষ করে নান্টু কেমন একরকম ভাবে পিছনের পুজো-বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল।

এমনি সময়ে বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। রুমা দরজা খুলে দিল। ফিরে এসে বলল—নান্টুদা, তোকে ডাকছে।

যেন চমকে উঠে নান্টু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

মিনিট দুই পরে রুমা শুনল নান্টুদা রেগে উঠে বলছে—না, আমি পারব না। তোরা যা।

যারা এসেছিল তারা অবাক হয়ে ফিরে গেল।

কি বলছিল ওরা? রুমা জিজ্ঞেস করল।

গিরি আজ সকালে মরেছে। বডি নিয়ে আসতে হবে। না, না, আমি পারব না। বলে নান্টু ঘরে ঢুকে পড়ল।

যে ছেলে দুপুরে খেয়েদেয়ে বেরিয়ে যেত আর ফিরত রাত নটায়, সেই ছেলেই সেই যে ঘরে এসে ঢুকল আর বেরোল না।

সবাই লক্ষ্য করল নান্টুর গোটা মুখ কিরকম কালো হয়ে গেছে। নিজের ঘরে চৌকির ওপর বসে আছে উবু হয়ে। একেবারে চুপ। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ও ভয় পেয়েছে।

বাড়ির মধ্যে একমাত্র রুমাই নান্টুর মেজাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সাহস করে কথা বলতে পারে। তাই ও-ই সাবধানে বলল—কি হয়েছে তোর? একটু বাইরে থেকে ঘুরে আয় না। আমিও না হয় তোর সঙ্গে যাচ্ছি।

তুই যাবি? তবে চল।

দুজনে বেরোতে যাচ্ছিল, নান্টু বলল—তুই থাক, আমিই যাচ্ছি। বলে টর্চটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।



পিছন থেকে রুমা বলল—আজ যেন রাত করিস না।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নান্টু।—কেন?

এমনি বললাম। কাল ধকল গেছে। আজ ভালো করে খাসনি—

ঠিক আছে। বলে নান্টু বেরিয়ে গেল।

কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল। অবাক রুমা জিজ্ঞেস করল—এরই মধ্যে বেড়ানো হয়ে গেল?

নান্টু উত্তর দিল না। শুধু বলল—সদর দরজাটা বন্ধ করে দে। আর দ্যাখ তো কেউ ওখানে ঘুরছে কিনা।

কোথায় ঘুরছে?

দেখলাম কেউ যেন বাঁশঝাড়ের মধ্যে দিয়ে আমার পিছু পিছু এসে পুজো-বাড়িটার দিকে চলে গেল।

সে আবার কী! আচ্ছা, দেখছি। বলে রুমা টর্চ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, পিন্টু বলল—দাঁড়া রুমাদি। আমিও তোর সঙ্গে যাব।

পনেরো মিনিট পরে দুজনেই ফিরে এল। রুমা বলল—দূর! কেউ কোথাও নেই।

নান্টু গভীর মুখে বলল—সে কি আর তোদের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে? সে আমাকেই চায়।

রাত্রে শোবার সময়ে মাকে বলল—মা, আজ রাত্রে তোমাদের ঘরেই শোব। মামীমা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—বেশ তো শুবি। ওরে রুমা, তোর নান্টুদার বিছানাটা আমাদের ঘরে করে দে।

রুমা বিছানাটা করতে যাচ্ছিল, নান্টুর বুঝি লজ্জা হলো। বলল—থাক। আমার ঘরেই শুই। কি আর হবে!

মামী বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, কিসের কি হবে? তা ছাড়া পিন্টুটা একা শোবে?

ও ঘর থেকে পিন্টু বলে উঠল—একলা শোব তো কি হবে? ভূতে ধরবে?

পিন্টুর এই সামান্য কথায় নান্টু যেন চমকে উঠল। কিন্তু কিছু বলল না। শুতে চলে গেল।

ঘণ্টাখানেক পর। রাত প্রায় এগারোটা। রুমা ডাকল—মামীমা!

হুঁ।

আমার মনে হচ্ছে যে কোনো কারণেই হোক নান্টুদা খুব ভয় পাচ্ছে। নইলে ওর মতো সাহসী ছেলে—ও এ ঘরে শুলেই পারত।

তবে ডাক।

রুমা মশারি থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে নান্টুকে ডাকতে গেল। দেখল এই গরমে ও ঘরের সব জানলা বন্ধ। নান্টুদা ঘুমোয়নি। খাটে বসে এক মনে গায়ত্রী জপ করছে যা সে কখনো করে না। পাশে পিন্টু নিশ্চিন্তে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

নান্টুদা এমন একাগ্র মনে গায়ত্রী জপ করছে যে তার ধ্যান ভাঙাতে ইচ্ছে হলো না। রুমা পা টিপে টিপে নিজের ঘরে ফিরে এল।

এটা ছিল সোমবার। গিরি গয়লানীর মারা যাবার প্রথম দিন।

## ॥ পাঁচ ॥

মঙ্গলবার।

আজ বন্ধুর বোনের বৌভাত। কাছেই শ্বশুরবাড়ি। ওরা বিশেষ করে এদের দু'ভাইকে যেতে বলেছে।

বিকেল পর্যন্ত নান্টু টানা ঘুম দিয়েছে। শরীরটা এখন বেশ ঝরঝরে।

মা বলল—বৌভাতে যাবি। তাড়াতাড়ি সেজেগুজে নে।

মুহূর্তে নান্টুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বলল—না, আমি যাব না।

মা অবাক হয়ে বলল—কেন?

তুমি বুঝতে পারছ না মা, আমার সামনে ভয়ানক বিপদ।

কিসের বিপদ?

তা আমি বোঝাতে পারব না।

তুই কি সত্যি ভয় পেয়েছিস?

হ্যাঁ।

রুমা কান খাড়া করে রইল। এবার যদি ও সব ঘটনাটা বলে।

কিসের ভয়?

তা জানি না। শুধু এইটুকু বলতে পারি কাল সন্ধ্যা থেকে কেউ যেন আমাকে লক্ষ্য করছে—আমাকে ডাকছে একটা ভয়ংকর কালো মুখ।

ওসব মনের ভুল।

মনের ভুল নয় মা। তুমি তো জান আমি আজ পর্যন্ত কত মড়া নিয়ে গিয়েছি, পুড়িয়েছি, সারা রাত জেগে ঐ সদানন্দ স্যাকরার মড়া আগলেছি। তখন তো এমন ভয় পাইনি।

এখনই বা ভয় কিসের? বিয়েবাড়ি গেলেই পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলে সব ভুলে যাবি।

তা হয়তো যাব। কিন্তু তারপর? ফেব্রার সময়ে ঐ গিরি গয়লানীর বাড়ির কাছ দিয়েই তো ফিরতে হবে। বৌভাত তো গিরির পাড়াতেই। অন্ধকারের মধ্যে ওর শেকলতোলা শূন্য ঘর আর আম গাছটা দেখলেই—নান্টুর শরীরটা কেঁপে উঠল।

মা তবুও অভয় দিয়ে বলল—ওদিক দিয়ে না এসে একটু ঘুরে যমপুকুরের পাশ দিয়ে আসবি। তাছাড়া পিন্টুও তো তোর সঙ্গে থাকবে।

তাই যা নান্টুদা। নে—নে দেরি করিস না।

অগত্যা পিন্টুকে নিয়ে নান্টু বেরিয়ে পড়ল।

রাত প্রায় এগারোটো। দু'ভাই নির্জন রাস্তা দিয়ে হনহন করে আসছে। পাশেই যমপুকুর। গভীর কালো জল। নান্টুর মনে হলো—পুকুরটার ঐ রকম বিস্ত্রী নাম রাখা হলো কেন?

অদ্ভুত ব্যাপার। এই গ্রামেই তার জন্ম। এই পুকুরের পাশ দিয়ে ও কতবার গিয়েছে। কোনো দিন এইরকম কৌতূহল হয়নি। হঠাৎ আজই।

কি রে দাদা, কথা বল কিছু?

কথা? কথা যোগাচ্ছে নারে। আচ্ছা 'যমপুকুর' নাম হলো কেন? নিশ্চয় অনেক লোক ডুবেছে। তুই কি বলিস?

হতে পারে।

অপঘাতে মৃত্যু তো।

তাছাড়া কি।

নান্টু চুপ করে হাঁটতে লাগল। তারপরই হাঁটার বেগ বাড়িয়ে দিল।

কি রে দাদা, অমন করে ছুটছিস কেন?

গন্ধ পাচ্ছিস না? একটা মানুষ-পোড়ার চিমসে গন্ধ?

নিশ্বাস টেনে পিন্টু বলল—কই না তো?

তবে হয়তো আমারই মনের ভুল।

হঠাৎ পাশের ঝোপটা যেন জোরে নড়ে উঠল। নান্টু চাপা উত্তেজনার চেষ্টায়ে উঠল—  
কে? কে ওখানে?

সঙ্গে সঙ্গে পিন্টু টর্চের আলো ফেলল। ঝোপঝাপ দুলিয়ে কিছু যেন একটা পুকুরের  
দিকে চলে গেল।

দেখতে পেলি?

পিন্টু বলল—না।

কি মনে হয়?

বোধহয় শেয়াল।

শেয়াল! শেয়াল এখন আর আছে নাকি?

দু'—একটা থাকতে পারে। তুই হাঁট তো।

সারা পথ আর কেউ কথা বলেনি। বাড়ি যখন পৌঁছল রাত তখন বারোটা বাজে।

## ॥ ছয় ॥

বুধবার।

আজ সকাল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। একটা শৌঁ শৌঁ করে বাতাস ত্রুন্ধ অপদেবতার  
নিশ্বাসের মতো বাঁশঝাড়ের পাতা কাঁপিয়ে দাপাদাপি করছিল।

ঘুম থেকে উঠল নান্টু। বেজার মুখ। চা খেল। কিন্তু কারো সঙ্গেই কথা বলছিল না।

সবাই ঘরে বসেছিল। একসময়ে নান্টু বলল—কাল রাতে কোনো পূজো ছিল?

রুমা বলল—এখন পূজো থাকার তো কথা নয়। তবে এখানে এসময়ে কোনো বিশেষ  
পূজো হয় কিনা জানি না। কেন?

নান্টু বলল—কাল অনেক রাতে ঢাকের শব্দ পাচ্ছিলাম। অনেকগুলো ঢাক বাজছিল।  
ঠিক যেন বলিদানের বাজনা!

নান্টুর মা ধমক দিয়ে বলল—তুই ওঠ তো। বুড়োদের মতো সকাল থেকে দেওয়ালে  
ঠেস দিয়ে বসে ঢাকের শব্দ শুনছে।

নান্টু উঠল না। কেমন অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে রইল সেই পূজোবাড়ির দিকে। অস্বাভাবিক  
আতংকে ভরা চোখ।

রুমা বলল—নান্টুদা, তুই একটু ও পাড়ায় যা। আজ হটবার। কিছু বাজার করে আন  
তো।

দূর বাজার! তোরা যাস। বলেই মাটিতে শুয়ে পড়ল।

বেলা এগারোটা।

এই একটা জিনিস রুমা লক্ষ্য করছে আজ নান্টুদা খুবই অনমনস্ক। সবসময়েই কি যেন ভাবছে আর যেখানে-সেখানে শুয়ে পড়ছে।

মামীমা অধৈর্য হয়ে বললেন—তোর কী হয়েছে বল তো? কি ভাবছিস? ওরকম ঢিস ঢিস করে শুয়ে পড়ছিস কেন?

সে কথার উত্তর না দিয়ে নান্টু যেন আপন মনেই বলল—অপঘাতে মৃত্যু। তিনদিন হলো। আজ ওর ঘাট।

তাই নিয়ে তোর ভাববার কী আছে?

তারও কোনো উত্তর না দিয়ে নান্টু বলতে লাগল—গভীর রাত। নির্জন রাস্তা। একটা গাড়ি ছুটছে। সামনেই একটা লম্বা মতো লোক। রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে হাঁটছে...পাশেও সরে যায়নি...তাকে আর দেখা গেল না। তারপরেই একটু মুমূর্ষু রুগী কটমট করে তাকাল...দু'হাত দিয়ে গলাটা টিপে ধরল...

বলেই নান্টু ধড়মড় করে উঠে পড়ল—কেউ কড়া নাড়ছে না?

রুমা বলল—তুই বোস। আমি দেখছি।

ভালো করে দেখে খুলবি। বলেই সে একছুটে ঘরে গিয়ে ঢুকল—যেন লুকোতে চাইল।

দরজা খুলে রুমা দেখল নান্টুর দুই বন্ধু। তারা জিজ্ঞেস করল—নান্টু কোথায়?

রুমা ইতস্তত করে বলল—ঘরে আছে। শরীর ভালো নেই।

কেন? ওর আবার কী হলো?

বলতে বলতে ওরা ঘরে ঢুকে পড়ল।

জানিস নান্টু, তাজ্জব ব্যাপার। আজ সকালে দেখলাম গিরি গয়লানীর ঘরের সামনে ভিড়। তার অত সাধের আমগাছটার একটা শক্ত ডাল ভেঙে পড়েছে। কি করে ভাঙল কে জানে! কাল তো ঝড়ও হয়নি।

অন্য বন্ধুটি বলল—আরও অবাক কাণ্ড—ওর ঘরে শেকল তোলা ছিল। দেখা গেল দরজাটা হাট করে খোলা।

নান্টুর ভয়াবহ উদ্ভ্রান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে রুমা তাড়াতাড়ি বলল—ও কিছু নয়। চোরটোর ঢুকেছিল।

চোর! বন্ধুরা বলে উঠল—ওর ছিল কী যে চোর চুরি করতে ঢুকবে? তাছাড়া গিরির জিনিস চুরি করে কেউ রেহাই পাবে মনে করেছ? পেত্নী হয়ে ঘাড় মটকাবে। যার ওপর ওর একবার রাগ হবে, মরেও তাকে রেহাই দেবে না। বেরোবি নাকি?

নান্টু মাথা নাড়ল।—না। শরীর খারাপ।

ওরা চলে গেল।

দুপুরে খেয়েদেয়ে নান্টু টেনে ঘুমল। এমন নিশ্চিন্ত ঘুমল যেন তার মনে আর ভয় নেই। বিকেলবেলা প্যান্ট আর হাওয়াই শার্টটা পরল।

নান্টুর মা খুশি হয়ে বলল—বেরোচ্ছিস?

হ্যাঁ। দেখি কি হয়।

হওয়া-হওয়ার আবার কী? যা ঘুরে আয়।

রুমা বলল—আমিও যাব?

নাঃ। তুই আর কতদিন পাহারা দিবি? পাহারা দিয়েও কি আমায় ধরে রাখতে পারবি? বলেই বেরিয়ে গেল। কিন্তু পনেরো মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল।

কি রে, এর মধ্যেই ফিরে এলি?

নাস্টু উত্তর দিল না।

রুমা জিজ্ঞেস করল—কতদূর গিয়েছিলি?

এদিক থেকে ওদিক।

মানে?

একদিকে বাঁশঝাড়, অন্যদিকে দত্তদের পুজো-দালান। দুটোই দেখলাম।

হঠাৎ কি দেখতে গিয়েছিলি?

আমার বিপদটা কোনদিক থেকে আসবে। সেই রাস্তার ওপর অশরীরী মানুষটা আমায় বুঝিয়ে দিয়েছিল গিরি বাঁচবে না। ঠিক তখনই গিরি আমার গলা টিপে মারতে গিয়েছিল। তার অর্থ ওর হাতেই আমার মৃত্যু আছে। কাল রাত্তিরে পুজো-দালানে বলির বাজনা আমায় জানিয়ে দিল—আমার মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে।

নাস্টুর মা'র মুখ শুকিয়ে গেল। রুমা আঁকে উঠল। এসব কথা কি কোনো সুস্থ ছেলের লক্ষণ? একি শুধুই একটা অলৌকিক ভয়, না আরও কিছু?

তখন সন্ধ্যাবেলা।

মা বলল—ছানাটুকু খেয়ে নে।

নাস্টু উদাসভাবে বলল—দা-ও। খেয়েনি।

এমনভাবে বলল যেন শেষ খাওয়া খেয়ে নেবে।

খানিকটা খেয়ে বলল—উঃ! পোড়া গন্ধ।

বলে বাকিটা ফেলে দিল। বেড়ালটা বসে ছিল কাছে। চেটেপুটে খেয়ে নিল।

ঘরে টি.ভি. চলছিল।

বড়ো ঘরে বসে সবাই টি.ভি. দেখছিল। এই ঘরেরই উত্তর দিকে জানলা দিয়ে দেখা যায় সেই রহস্যময় পুজো-দালানটা। একসময়ে যেখানে বলি বেধে গিয়ে সর্বনাশ হয়েছিল। আজও নাকি মাঝে মাঝে গভীর রাতে ঢাক বাজে, ডিম ডিম করে। অনেকেই শুনেছে। দক্ষিণ দিকের জানলা দিয়ে দেখা যায় এবাড়ির উঠোনের ওপর মস্ত ধানের গোলাটা। তারই পাশ দিয়ে দু'পা গেলেই সদর দরজা।

ঘরের মেঝেতে সবাই বসে। পিন্টু শুয়ে আছে খাটে। নাস্টু বসে আছে খাটে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে। বেড়ালটা রয়েছে মেঝেতে। সবাই টি.ভি. দেখছে। কিন্তু নাস্টু দেখছে না। সে অন্যমনস্ক। তার চোখ ছুটেছে একবার এ জানলার দিকে, একবার অন্য জানলা দিয়ে দরজার দিকে। বাইরে জমাট অন্ধকার। সে যেন সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

ঘড়িতে টং টং করে রাত আটটা বাজল। দূরে জঙ্গলের মধ্যে কি একটা জন্তু ডেকে উঠল—যেন বড়ো কোনো সাপ কিছু ধরেছে।

হঠাৎ ঝন ঝন করে শব্দ। শব্দটা এল দরজার দিক থেকে। নাস্টু চমকে উঠল। রুমাও।

নাস্টুর চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। অথচ অন্যেরা একমনে টি.ভি. দেখছে।

বোধ হয় তারা শুনতে পায়নি।

কিসের শব্দ হলো? নান্টু ভয়ে ভয়ে জিঞ্জিস করল।

ও কিছু না। সাহস দিয়ে রুমা বলল—গোয়ালে বালতি ছিল, বোধহয় গরুর পায়ে লেগে—

কিন্তু শব্দটা তো দরজার দিক থেকে এলো।

ঠিক আছে। আমি দেখছি।

না-না, তুই যাসনে। মামার বাড়ি দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসে কেন প্রাণটা খোয়াবি?

তুই চুপ কর তো।

বলে রুমা টর্চটা নিয়ে উঠে পড়ল।

পিন্টু বলল—কিরে রুমাদি?

কিছু না। কিসের যেন একটা শব্দ হলো।

দাঁড়া আমিও দেখি।

ওরা দু'জনে চলল। নান্টুর কি মনে হলো সেও পিছু পিছু চলল।

দরজা বন্ধই ছিল। খিল খুলে পিন্টু আর রুমা বাইরে বেরিয়ে তন্নতন্ন করে দেখল।

কিছু চোখে পড়ল না। অথচ রুমা নিজেও শব্দটা শুনেছে। আর তা এই দরজার বাইরেই।

ঘরে ফিরে এল তিনজনেই।

হঠাৎ নান্টু তাড়াতাড়ি প্যাঁৎ ছেড়ে গামছাটা পরে নিল।

ওর মা বলল—গামছা পরছিস কেন? পায়খানা যাবি?

হ্যাঁ, শরীরটা কেমন করছে।

লগ্ননটা নিয়ে যা। আর পিন্টু না হয় দাঁড়াক।

পায়খানা একটা বাড়ির ভেতরে আছে। আর একটা বাইরে। নান্টু ভেতরের পায়খানায় যেত না। বলত—ওটা মেয়েদের জন্যে। রাত দুপুরেও কত দিন একা একা বাইরের পায়খানায় গিয়েছে। কিন্তু আজ দরজার খিল খুলেও যেতে পারল না।

তবে ভেতরের পায়খানায় যা।

নান্টু উত্তর না দিয়ে ওর ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। পায়খানা গেল না।

এ ঘরে আয় না।

নান্টু এল না।

রাত সাড়ে দশটা।

সবাই খেয়ে নিল। নান্টু খেল না। বলল—শরীর খারাপ করছে।

কি হচ্ছে?

আমি জানি না মা—জানি না।

আজ আমাদের ঘরে শো।

একটু পরে।

হঠাৎ ভয়ংকর একটা শব্দ ভেসে এল। ঠিক কোন দিকে থেকে এল বোঝা গেল না। মনে হলো কিছু একটা শূন্যে ভাসতে ভাসতে ডেকে গেল। পাখির ডাক কি এইরকম হয়?

কিন্তু ডাকটা ঐ মুহূর্তের জন্যে। রুমা নিজে কানে শুনেছে। এই কি সেই মরণডাক? নান্টুদা শুনতে পায়নি তো?

বিছানা পাতা হয়ে গেছে। মশারি টাঙানো হচ্ছে...বাইরে চাপা অন্ধকারের মধ্যে অটুট স্তব্ধতা যেন স্থির হয়ে চেপে বসে আছে।

রুমা উত্তরের জানলা দিয়ে পূজো-দালানটার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল বনবন করে যে শব্দটা একটু আগে সে নিজেও কানে শুনেছিল আর এখনি যে বিকট শব্দটা শুনল সে দুটো কিসের শব্দ হতে পারে!

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে হলো চারিদিক যেন কেমন থমথম করছে যেমন ঝড়ের আগে হয়। এতক্ষণ ঝোপেঝাড়ে দু'একটা ঝিঝি ডাকছিল, সে ডাকটাও হঠাৎ থেমে গেল। গাছগুলোর পাতা একটু একটু নড়ছিল, তাও যেন থমকে গেল। আর—এ কী! নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কেন? শুধু কি তারই না সকলের?

হঠাৎ বাঁশঝাড় কাঁপিয়ে যমপুকুরের দিক থেকে একটা অদ্ভুত হাড়-কাঁপানো শব্দ ভেসে এল—ওঁ-ওঁ-ওঁ...হ-হ-হ—

শব্দটা ক্রমেই এই বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে...

যাতে নান্টু শুনতে না পায় সেইজন্যে রুমা এক ঝটকায় জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে ছুটে গেল পাশের ঘরে। দেখল নান্টু চৌকিটা চেপে ধরে থরথর করে কাঁপছে।

মামীমা...মামা...পিন্টু...শীগগির এসো।

কিন্তু কে আসবে? সেই ভয়ংকর অপার্থিব শব্দে সবাই নিম্পন্দ হয়ে গেছে। তারা জানে এই সেই মরণডাক। এই ডাক শোনা যায় তখনি গ্রামের কেউ একজন অপঘাতে মরবে। তারপর মরবে আর একজন মানুষ—পুরুষ কিংবা স্ত্রী, শিশু কিংবা বৃদ্ধ। তারপর কোনো গৃহপালিত জীব।

নান্টু-নান্টু, কি হয়েছে? মা পড়িমরি করে ছুটে এল।

মা-মা, ও আমায় নিতে এসেছে। তুমি আমায় বুকের মধ্যে চেপে ধরো। আমায় যেতে দিও না।

নান্টুর মা অতবড়ো ছেলেকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে রইল।

শব্দটা যেন শূন্য থেকে নেমে এবাড়ির দক্ষিণ দিকের বন্ধ জানলায় ঝাপটা মেরে পূজো-দালানের মধ্যে দিয়ে মিলিয়ে গেল।

একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে নান্টু মায়ের বুক থেকে মাটিতে ঢলে পড়ল।

ও মা! কী হলো গো! আত্ননাদ করে উঠল নান্টুর মা।

একটু জল—জল নিয়ে আয় পিন্টু।

পিন্টু ছুটে গিয়ে এক ঘটি জল নিয়ে এল। জলের ঝাপটা দিতে দিতে নান্টুর জ্ঞান অল্প অল্প ফিরে এল। কিন্তু তারপরেই শুরু হলো পেটের যন্ত্রণা। পেটের যন্ত্রণা থেকে মাথার যন্ত্রণা, মাথার যন্ত্রণা থেকে পিঠ।

ও মা! এ আমার কী হলো?

স্থানুর মতো চৌকির ওপর বসে আছেন নান্টুর বাবা।

রুমা উত্তেজিতভাবে বলল—মামা, এখনি ডাক্তার ডাকা দরকার।

বিহুল গলায় মামা বলল—এত রাতে ডাক্তার কোথায় পাবে?

এদিকে নান্টুর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। অথচ কেউ বুঝতে পারল না একটা সুস্থ-সবল ছেলে, হঠাৎ তার কী হলো?

তবু ডাক্তারের খোঁজে তো যেতে হবে। ঐ দেখুন গোটা মুখটা কিরকম ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।

যাচ্ছি। বলে শ্রৌট মামা গায়ে পাঞ্জাবি চড়িয়ে, টর্চ লাঠি নিয়ে বেরোতে যাচ্ছিলেন, পিন্টু বললে—তুমি শোওগে। আমি যাচ্ছি।

চমকে উঠল রুমা।—তুই ছেলেমানুষ। এত রাতে একা যাবি?

যেতেই হবে। দাদাকে তো বাঁচাতে হবে।

বলে তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট পরে নিয়ে কোণের ছোট্ট ঘরে গিয়ে দাঁড়াল।

নানা পরিত্যক্ত জিনিসের মধ্যে দেওয়ালে ঝুলছে তরোয়ালটা। ধীরে ধীরে সেটা পেড়ে নিল। কাপড়ের ঢাকাটা খুলে ফেলতেই তরোয়ালের ইস্পাতটা ঝকঝক করে উঠল। সাইকেলটা নিয়ে পিন্টু বেরিয়ে পড়ল। রুমা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। দু'হাত জোড় করে মনে মনে বলল—ঠাকুর, রক্ষা করো।

অন্ধকার, শুধু অন্ধকার। তারই মধ্যে দিয়ে দু'চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে সাইকেল ছুটিয়ে চলেছে পিন্টু। বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরেছে হ্যান্ডেল। ডান হাতে খোলা তরোয়াল। তরোয়ালটা ঘোরাচ্ছে বাঁ দিক থেকে ডান দিক। যেন সমস্ত পার্থিব-অপার্থিব বাধা কাটিয়ে পথ করে নিচ্ছে।

রাস্তার ধারের দোফলা আমগাছটার একটা ডাল ঝুঁকে পড়েছিল রাস্তার ওপর। হঠাৎ কী যেন মাথার ওপর পাখা ঝাপটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পিন্টু তরোয়ালের উশ্টো পিঠ দিয়ে ডালে আঘাত করল। আর তখনই এক ঝাঁক বাদুড় জাতীয় কিছু পাখা জাপটে তার মাথার ওপর উড়তে লাগল।

পিন্টু জোরে সাইকেলটা চালাতে লাগল। কিন্তু সেগুলো যেন তার মাথা লক্ষ্য করেই এগিগে আসতে লাগল। পিন্টু এবার মাথার ওপর তরোয়ালটা ঘোরাতে লাগল।

এক মাইল দূরে ডাক্তারের বাড়ি। কেমন যেন আত্মভোলা হয়ে গিয়েছিল পিন্টু। বুঝতে পারছিল না কতদূর এসেছে।

হঠাৎ কাছেই জলের ওপর ঝপ করে কিছু পড়ার শব্দ শুনেই ডান দিকে তাকাল। যমপুকুর।

হায়! এতক্ষণে যমপুকুর! তখনই সে একটা শব্দ শুনে চমকে গেল। কেউ যেন পুকুরটায় ডুব দিচ্ছে আর উঠছে।

আশ্চর্য! এত রাতে কে পুকুরে স্নান করছে?

পিন্টু সেদিকে তাকাল না। সোজা সাইকেল চালিয়ে চলল।

সত্যিই যে এত রাতে ডাক্তার আসবেন কেউ ভাবতে পারেনি। পরিচিত ডাক্তার। নান্টুর অসুখ গুরুতর শুনে না এসে পারেননি। তখনই ওষুধের ব্যাগ আর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন।



পিন্টুর হাতে খোলা তরোয়াল দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন—ও যে সত্যিকারের তরোয়াল! হঠাৎ তরোয়াল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছ!

পিন্টু বলল—সুভাষদা, এত রাতে একা আসতে ভয় করছিল। এ তরোয়াল আমাদের পূর্বপুরুষের। এর কোনো মহিমা আছে কিনা জানি না। তবে এটা হাতে তুলে নিতেই প্রচণ্ড সাহস পেলাম।

সুভাষ ডাক্তার নান্টুকে পরীক্ষা করে গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি দুটো ইনজেকশন দিলেন। তারপর বসে রইলেন নান্টুর মাথার কাছে।

সারা রাত কাটল এইভাবে। ভোঙ্কর দিকে নান্টুর নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল।

সুভাষ ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আর ভয় নেই। একটা জোর ধাক্কা খেয়েছিল। সেটা সামলে গেছে। তবে পিন্টু আমাকে ডেকে না নিয়ে এলে ওকে বাঁচানো যেত না।

চা খেয়ে হাসিমুখে সুভাষ ডাক্তার ভোরবেলা বেরিয়ে এলেন।

হঠাৎ উনি চমকে উঠলেন—ইস! এ কী!

সবাই দেখল এতদিনের বেড়ালটা দরজার পাশে মরে পড়ে আছে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত।

কেউ যেন গত রাত্রে প্রচণ্ড আক্রোশে ওটাকে গলা টিপে মেরেছে।

# অলৌকিক জন্মাদ

## রহস্যের সূত্রপাত

খুব বেশি দিন না হলেও দেখতে দেখতে পনেরো বছর হয়ে গেল আমি কলকাতায় পুলিশের কাজ করছি। এই পনেরো বছরে কত চোর-ডাকাত ধরলাম, কত খুনিকে আদালতে পাঠলাম। কত মারামারি—কত রক্তপাত! ফলে মনটা যেমন কঠোর তেমনি ভয়শূন্য হয়ে গেছে। সঙ্গে রিভলবারটা থাকলেই হলো।

শুধু চোর-ডাকাত-খুনি নিয়ে কারবার হলে মনে তেমন দাগ কাটত না। ওসব তো প্রায় সব পুলিশ অফিসারদের জীবনেই ঘটে। কিন্তু আমার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশত জীবনে এমন কিছু অবিশ্বাস্য ভয়াবহ অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে যা কোনোদিন ভুলতে পারব না। এই ঘটনাগুলো লিখে রাখার জন্যেই আপাতত এক মাসের ছুটি নিয়ে নিরিবিলা দেশের বাড়িতে এসেছি।

জায়গাটা নিরিবিলা। কিন্তু বাড়টা নিরিবিলা নয়। আমাদের এই দোতলা বাড়টা খুবই পুরনো। বাড়ির পিছনে অনেকদূর পর্যন্ত আমবাগান আর বাঁশঝাড়। এখনও গভীর রাতে শেয়াল ডাকে, খটাস বনবেড়াল ঘুরে বেড়ায় নিশ্চিন্তে। বাড়ির পশ্চিমে একটা পচা পুকুর। তার এদিকে একটা ভাঙা শিবমন্দির। ছোটোবেলায় ঐ পুকুরপাড়ে, আসশ্যাওড়ার ঝোপে কত চোর-পুলিশ খেলেছি। তখন কি ভেবেছিলাম বড়ো হয়ে আমাকেই চোর-ডাকাত ধরে বেড়াতে হবে!

বাড়িটার সবচেয়ে আকর্ষণ বিরাট ছাদ। এই ছাদে কত ঘুড়ি উড়িয়েছি, ছোটোছুটি দাপাদপি করেছি। আজও এ বাড়ির ছোটো ছেলেমেয়েরা ছাদেই খেলা করে।

এ বাড়িতে পাকাপাকিভাবে থাকে আমার মেজো আর ছোটো ভাই তাদের স্ত্রী, পুত্র-কন্যাদের নিয়ে। এখন কলকাতা থেকে আমি এক মাসের জন্যে এসেছি স্ত্রী আর বারো বছরের দুটো নোটনকে নিয়ে। আমার ভাগে যে দুখানি ঘর তা উত্তর দিকে। একখানি ঘর আমার একেবারে নিজস্ব। ঐ ঘরে বসে আমি দেশ-বিদেশের যত অপরাধ-কাহিনি পড়ি। আর এখন এই ঘরে বসেই লিখছি আমার জীবনে ঘটে-যাওয়া বেশ কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা।

আমার ঘরের জানলা দিয়ে তাকালে প্রথমেই চোখে পড়ে আমাদের উঠানের ওপর নারকেল গাছটা। সেই ছোটবেলা থেকে দেখছি গাছটাকে। এখনও দিবি আছে। নারকেল গাছটা যেন আমাদের পরিবারেরই একজন হয়ে গেছে। গাছটাকে আমরা সবাই ভালবাসি। তারপরেই চোখে পড়ে সেই বিশাল আমবাগান আর বাঁশঝাড়ের জঙ্গল। যতদূর দেখা যায় শুধু গাছের সবুজ মাথা। যখন সন্দের অন্ধকার নেমে আসে তখন ঐ বাগান-জঙ্গলকে কেমন রহস্যময় বলে মনে হয়। কেমন ভয় করে। মনে হয় যেন কোনো অজানা আতঙ্ক ওৎ পেতে আছে গাছগুলোর ডালে ডালে।

লেখাটা শুরু করা উচিত ছিল অনেক আগেই। কিন্তু হঠাৎ নেপালের কাঠমাণ্ডুতে বেড়াতে

যাবার সুযোগ এসে গেল। এখন বর্ষাকাল। বর্ষাকালে কেউ বড়ো একটা পাহাড়ে যায় না। কিন্তু আমারই সহকর্মী কলকাতার পুলিশ অফিসার প্রণবশ যাচ্ছে জেনে আমিও তার সঙ্গে নিলাম। সর্বসাকুল্যে ওখানে আমরা দশ দিন ছিলাম। ওখানে নানা জায়গায় ঘুরেছি। বেশ উপভোগও করেছি। কিছু ভয়াবহ অভিজ্ঞতাও হয়েছে। তা তো হবেই। পুলিশ আর গোয়েন্দা যেখানেই যায়, তাদের মনোমতো একটা কিছু ঘটে থাকেই। যাই হোক মোটামুটি আনন্দ করে দেশের বাড়িতে ফিরে এসেছি। একটি লাভ হয়েছে। একটি নেপালী ছেলে পেয়েছি। বছর তেরো-চোদ্দ বয়েস। খুব কাজের ছেলে। নাম রাজু সুন্না। একে পেয়ে আমার স্ত্রী আর নোটন খুব খুশি। রাজু একে নোটনের প্রায় সমবয়সী, তার ওপর বিদেশী। তাই ওর সঙ্গে নোটনের যত ভাব তত কৌতূহল ওর বিষয়ে।

এখন সন্ধ্যাবেলা।

একটু আগেও বৃষ্টি হয়ে গেছে। গায়ে একটা হালকা চাদর জড়িয়ে লিখতে বসেছি। লোডশেডিং বলে লঠনের আলোয় লিখছি। ভালোই লাগছে। কেননা এই সব খুনখারাপি, অলৌকিক কাহিনি লিখতে গেলে এইরকম লঠনের টিমটিমে আলোরই প্রয়োজন। পরিবেশটা বেশ জমে। বাড়ির বৌরা নিচে রান্না করছে আর গল্প করছে। আমার ঘরে আমি একা। লিখছি। ফাটা দেওয়ালের গায়ে একটা টিকটিকি অবাক হয়ে আমার লেখার কাজ দেখছে।

হঠাৎ পিছন থেকে নিঃশব্দ পায়ে কেউ এসে লঠনটা নিভিয়ে দিল। মুহূর্তে ঘর অন্ধকার। সঙ্গে সঙ্গে একটি বালক-কণ্ঠের প্রাণখোলা হাসি। বুঝলাম আমার দুষ্টু ছেলে নোটনের কাজ। ভয় দেখাবার জন্যে আলো নিভিয়েছে। কিন্তু—ঘরে আরও যেন কেউ রয়েছে।

অন্ধকারেই হাঁকলাম—কে রে? কে রে?

কোনো উত্তর নেই। নোটনের হাসিও থেমে গেল।

—নোটন, তোর সঙ্গে আর কে আছে রে?

উত্তর নেই।

হঠাৎ নোটন চিৎকার করে কেঁদে উঠল—ও গো মা গো! বাবা গো!

কী হলো! নোটন অমন করে কেঁদে উঠল কেন? পুরনো বাড়ি। কিছু কামড়ালো নাকি? অন্ধকারেই আমি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলাম। টেবিলে ধাক্কা লেগে লঠনটা পড়ে গেল। কেরোসিন তেলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল।

অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আন্দাজে নোটনের কাছে যাবার চেষ্টা করলাম। তার আগেই ওর কান্না শুনে নোটনের মা, ওর কাকা-কাকীমারা আলো নিয়ে ছুটে এসেছে। দেখলাম দেওয়ালের এক কোণে দাঁড়িয়ে নোটন তখনও ভয়ে কাঁপছে।

—কি হয়েছে?

প্রথমে উত্তর দিতে পারছিল না। তারপর শুধু বলল—ঘরে কিছু ঢুকেছিল।

—ঘরে কে ঢুকবে? কখন ঢুকবে?

—আমরা ঢোকার পরই—

—আমরা?

এতক্ষণে ঘরের মধ্যে দ্বিতীয়জনকে দেখতে পেলাম। সেও দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

—কিন্তু ঘরে আর কে ঢুকবে? কাকে দেখে অমন ভয় পেলি?

নোটন বলল—আমি স্পষ্ট দেখেছি দুটো জ্বলজ্বল চোখ দরজার কাছে।

এই অসম্ভব অবাস্তব ব্যাপার নিয়ে আমরা আর মাথা ঘামালাম না। দোতলার এই ঘরে জুলন্ত চোখবিশিষ্ট জন্তু-জানোয়ারের ঢোকা সম্ভব নয়। সদর দরজা সন্ধে হতেই বন্ধ হয়ে যায়।

এবারে রাজু সুঝার দিকে তাকালাম। সে একে রোগা ডিগ্‌ডিগে, কম কথা বলে, তার ওপর এইরকম কান্নাকাটিতে কেমন ভাবাচাকা খেয়ে গেছে। ওর চোখের স্বাভাবিক চাউনিটাও একটু অদ্ভুত রকমের। ছোটো ছোটো সরু চোখ। চোখের মণি দুটো একটু বেশি উপর দিকে ওঠা। ফলে সাদাটাই বেশি দেখা যায়। যেন চোখ উল্টে আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি অন্ধ। ওর চোখের দিকে তাকালে বোঝা যাবে না ও রেগে আছে না ভয় পেয়েছে কিংবা খুশি হয়েছে।

রোগা রোগা সরু হাত, দেহের তুলনায় নারকেলের মতো লম্বাটে মাথাটা বেশ বড়ো। রোঁয়া রোঁয়া পাতলা চুল। খালি-গা হলে বুকের পাঁজরাগুলো একটা একটা করে গোনা যায়। কর্ণের হাড় বেরিয়ে আছে। মনে হয় একটু ঠেলা দিলেই ছটিকে পড়ে যাবে। কিন্তু এই শরীর নিয়েই সে যে কী অসম্ভব তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না।

সুঝা বাংলা বলতে না পারলেও বাংলা মোটামুটি বোঝে। খুব কম কথা বলে। যেটুকু বলে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে। মাঝে মাঝে সে নেপালী ভাষাও বলে ফেলে। যেমন—‘চাঁকে বলে ‘চিয়া’, ‘কমলালেবু’কে বলে ‘সন্তলা’।

একটা জিনিস লক্ষ্য করছি—যদিও আমিই ওকে এখানে নিয়ে এসেছি তবু ও আমাকে যেন এড়িয়ে চলে। ডাকলে চট করে আসে না। সাড়াও দেয় না। যেন শুনতেই পায়নি। কেন এমন ব্যবহার তা বুঝতে পারি না। তবে নোটনের সঙ্গে ওর খুব ভাব। দুজনে গল্প করে, খেলা করে। নোটনের মাকেও পছন্দ করে। নোটন কখনো ওকে ডাকে ‘রাজু’ বলে। কখনও ডাকে ওর পদবী ধরে—‘সুঝা’।

এই ক’দিনেই আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে—ও আমাকে জন্দ করতে চায়। একটা ঘটনা বলি।—প্রায়ই আমার মাথার যন্ত্রণা হয়। তার জন্যে সবসময়ে কাছে ওযুধে রেখে দিই। যন্ত্রণাটা এবার অনেক দিন হয়নি। কিন্তু নেপাল থেকে ফিরে এসে উপরি উপরি তিন দিন যন্ত্রণা হলো। প্রথম দু’দিন ওযুধ খাবার জন্যে সুঝাকে জল দিতে বলেছিলাম। বেশ দেরি করে জল এনে দিয়েছিল। ওর সামনেই ওযুধ খেয়েছিলাম। কিন্তু তৃতীয় দিন ও জল এনে দিল না। ধমক দিলেও এমন ভান করল যেন ও আমার কথা শুনতেই পায়নি। কিন্তু আশ্চর্য ওযুধের প্যাকেটটা খুঁজে পাওয়া গেল না। ওযুধ খাওয়া হলো না। সারারাত্রি যন্ত্রণায় ছটফট করলাম। পরের দিন দেখলাম ওযুধের প্যাকেটটা পিছনের জঙ্গলে পড়ে আছে। কেউ জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। সবাইকে ডেকে দেখালাম। কিন্তু কে ফেলেছে কেউ বলতে পারল না। নোটন আড়ালে সুঝাকে জিজ্ঞেস করেছিল। সুঝা উত্তরে মাথা নেড়ে বলেছিল—নেহি। তবুও বোঝা গেল ওযুধটা ও-ই ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু কেন? ও তো নিতান্ত ছোটো শিশুটি নয়।

আরও আশ্চর্যের কথা—পরে জেনেছিলাম সেদিন সুঝাই চুপি চুপি একা ঘরে ঢুকে আলোটা নিভিয়ে দিয়েছিল। নোটন যে ওকে চুপি চুপি ঘরে ঢুকতে দেখে কৌতূহলের বশেই ঘরে ঢুকেছিল, সুঝা তা টের পায়নি। ঘর অন্ধকার করে সুঝা আমাকে ভয় দেখাতে যাচ্ছে ভেবে নোটন জোরে হেসে উঠেছিল।

কিন্তু যে ছেলেটা আমার কথা শুনতে চায় না, ডাকলে সাড়া দেয় না, কাছে ঘেঁষে না, সে কেন ঘর অন্ধকার করে আমার সঙ্গে মজা করতে এল?

এ কথা নিয়ে বাড়িতে কারও সঙ্গে আলোচনা করিনি। নিজের কাছেও সদুত্তর পাইনি।

এ ছাড়া অন্ধকার ঘরে কেন কি দেখে নোটন অমন ভয় পেয়ে টেঁচিয়ে উঠেছিল তাও ঠিক আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি। সত্যিই ও ঘরের মধ্যে জ্বলন্ত চোখ দেখেছিল কিনা, কিংবা কার চোখ তাও অমীমাংসিত থেকে গেছে।

### ভয়ংকর ঘটাকর্ষ

সুঝাকে পাবার পিছনে একটা বিশেষ ঘটনা আছে।

নেপালের কাঠমাণ্ডুতে যে হোটেলে প্রণবশ আর আমি উঠেছিলাম, সে হোটেলটি একেবারে শহরের মধ্যে। হোটেলের বেশ কয়েকজন অল্পবয়সী ছোকরা কাজ করত। আমাদের যে দেখাশোনা করত সে নেপালী হলেও বাংলা বুঝত আর মোটামুটি বলতেও পারত। সে বলত—এখানে বাঙালি বাবুরাই বেশি বেড়াতে আসে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাংলা শিখে গেছি।

ওর নাম জং বাহাদুর। ও বাংলা জানায় খুব সহজেই ওর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলাম। শুনে কষ্ট হলো ওদের মতো যারা হোটেলের কাজ করে তারা খুবই গরিব। তাই অল্পবয়সী ছেলেরাও কাজের খোঁজে ইন্ডিয়ায় চলে যায়। শিলিগুড়ি, কলকাতাই তাদের লক্ষ্য।

আমার তখনই মনে হলো কলকাতায় আমার বাসার জন্যে ঐরকম একটা কাজের ছেলের দরকার। কলকাতায় তো চট করে কাজের ছেলে পাওয়া যায় না। তাই জং বাহাদুরকে বলেছিলাম—তোমার মতো একটা ছেলে পেলে আমিও নিয়ে যাই।

জং বাহাদুর বলেছিল—দেখব।

তারপর ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কাঠমাণ্ডুতে দেখবার কী কী আছে?

ও এক নিশ্বাসে অনেকগুলো জায়গার নাম করে গেল—বুড়ো নীলকণ্ঠ, স্বয়ম্ভু মন্দির, দক্ষিণাকালী বাড়ি, গুর্জেশ্বরী মন্দির, দেবী কুমারী বা জীবন্ত দেবী আর পশুপতিনাথ তো আছেনই।

জিজ্ঞেস করেছিলাম—এখানে উৎসব কী কী হয়?

ও চটপট উত্তর দিয়েছিল—ত্রিবেণী মেলা, শ্রীপঞ্চমী, মাঘী পূর্ণিমা, মহাশিবরাত্রি, হোলি, নববর্ষ—

বাধা দিয়ে বলেছিলাম—তা তো বুঝলাম। কিন্তু এখন কোনো উৎসব হয় কি?

—হয় বৈকি। খুব উৎসাহের সঙ্গে ও উত্তর দিয়েছিল—নাগপঞ্চমী, ঘটাকর্ষ।

জিজ্ঞেস করেছিলাম—ঘটাকর্ষ কি?

ও হঠাৎ চোখ বুঝিয়ে দু' হাত জোড় করে কারও উদ্দেশে যেন নমস্কার করল। তার পর যা বলল তার মানে হলো—এ পুজোটা হচ্ছে দানব আর অশুভ আত্মাদের সম্ভ্রষ্ট করার জন্যে। এই জুলাই-আগস্ট মাসে নেপালের পাহাড়ে পাহাড়ে অশুভ শক্তির ঘুরে বেড়ায় দানবের মূর্তি ধরে। তাদের সামনে পড়লে মানুষ, জীবজন্তু কারো রক্ষা নেই। তাদের আটকাবার ক্ষমতাও কারো নেই। তাই সেই দানব-দেবতাদের পুজো দিয়ে সম্ভ্রষ্ট করে সসম্মানে বিদেয় করার চেষ্টা। এই জন্যেই ঘটাকর্ষ পুজো।

এইসব অশুভ আত্মা, দানব-দেবতার কথা শুনে ঘটাকর্ষ পুজো দেখবার খুব ইচ্ছে হলো আমাদের। ওকে বলাতে ও খুব উৎসাহ করে কোথা দিয়ে কেমন করে যেতে হবে তার

হৃদিস বলে দিল। শেষে গলার স্বর নিচু করে বললে,—এখানে যাবেন যান। কিন্তু কেউ বললেও যেন দক্ষিণের ঐ উঁচু পাহাড়টার নিচে যাবেন না।

জিঞ্জেস করলাম—কেন? ওখানে কী আছে?

ও একটু চুপ করে থেকে বললে, ঐ পাহাড়ের নিচে একটা নদী আছে। সেই নদীর ধারে একটা গুহায় ঘণ্টাকর্ণের এক ভয়ংকর মূর্তি আছে। ওখানেও ঘণ্টাকর্ণের পূজো হয়। কিন্তু সে পূজো খুব গোপন। বাইরের লোক তো দূরের কথা—সব নেপালীরাও ওখানে যেতে পারে না। গেলে আর তাদের ফেরা হয় না।

প্রণবেশ ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে বললে যে, আমাদের দেশে যেমন নির্জন জায়গায় তান্ত্রিক, কাপালিকরা গোপনে কালীপূজো করে, এও সেইরকম। তান্ত্রিক, কাপালিকরা যেমন ভয়ংকর প্রকৃতির লোক হয়, এরাও সম্ভবত সেইরকম।

যাই হোক দিন তিনেক পরে জং বাহাদুরই একটা জিপের ব্যবস্থা করে দিল। ড্রাইভার আমাদের কাছাকাছি দু'তিন জায়গায় ঘণ্টাকর্ণ পূজো দেখিয়ে আনবে।

বঁটেখাটো ফর্সা ধবধবে নেপালি ড্রাইভার। ঠিক যেন একটা মেশিন। চমৎকার ড্রাইভ করে নিয়ে গেল পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে।

দু'জায়গায় ঘণ্টাকর্ণ পূজো দেখলাম। পাহাড়ের নিচে খানিকটা সমতল জায়গায় বেশ লোকের ভিড়। সেখানে মাদলের মতো একরকম বাজনা বাজছে দ্রিম দ্রিম করে। সারা গায়ে কালো কাপড় জড়িয়ে মুখে ভয়ংকর একটা মুখোশ এঁটে একটা মূর্তি তেড়ে তেড়ে যাচ্ছে। আর একজন পুরোহিতের মতো লোক ফুল ছুড়ে ছুড়ে তাকে মারছে। জানলাম এইরকম করেই নাকি পূজোর মধ্যে দিয়ে অশুভ শক্তির দানবকে তাড়ানো হয়। ঘণ্টাকর্ণের নকল ভয়ংকর মূর্তি ছাড়া আর কিছুই তেমন মনে দাগ কাটল না।

এবার আমাদের হঠাৎ ইচ্ছে করল সেই পাহাড়ের নিচে নিষিদ্ধ পূজোটা দেখার। কিন্তু ড্রাইভার রাজি হলো না। ওখানকার কথা তুলতেই ভয়ে ওর মুখ শুকিয়ে গেল। ওকে আমরা অনেক করে বোঝালাম যে, কোনোরকম ভয় নেই। ভূত, প্রেত, দানব, অশুভ শক্তি যাই থাকুক না কেন, এই রিভলভারের কাছে সব ঠান্ডা হয়ে যাবে বলে কোটের পকেট থেকে রিভলভার বের করে দেখালাম। তাছাড়া আমরা যে দুজনেই কলকাতার পুলিশের অফিসার তাও জানিয়ে দিলাম।

তাতেও ও যখন ইতস্তত করছিল তখন একটা পঞ্চাশ টাকার নোট ওর কোটের পকেটের মধ্যে গুঁজে দিলাম। আমাদের পঞ্চাশ টাকা মানে নেপালের পঁচাশি টাকা। এবার কাজ হলো। গরিব মানুষ ওরা। টাকা পেলে যমের দুয়োর পর্যন্ত যেতে পারে।

অগত্যা বিমর্ষ মনে ও গাড়িতে স্টার্ট দিল। গাড়িতে একটা কালীঠাকুরের ছবি ছিল। ড্রাইভার সেই ছবিতে বার বার মাথা ঠেকাল। তারপর গাড়ি চালাতে লাগল।

চারিদিকে জঙ্গলভরা পাহাড়। তারই মধ্যে দিয়ে খুব সাবধানে জিপটা চালিয়ে নিয়ে চলল ড্রাইভার। কখনো অনেক উঁচুতে উঠছে, কখনও নিচে নামছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক যাবার পর আমরা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। ডান দিকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মতোই সবুজ ধানক্ষেত। বাঁ দিকে যে সরু নদীটা ঝির ঝির করে বয়ে যাচ্ছে, ড্রাইভারের কাছ থেকে নাম জেনে নিলাম—বিষ্ণুমতী নদী। ড্রাইভার সেই নদীর উদ্দেশে নমস্কার করল।

আবার সামনে পাহাড়। পাহাড়ের পর পাহাড়। পাইন গাছে ঢাকা।

হঠাৎ ড্রাইভার জোরে ব্রেক কষল। আমরা ঝাঁকানি খেয়ে চমকে উঠলাম।  
কি হলো?

অমন শব্দসমর্থ ড্রাইভার ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল—বিল্লি!  
বিল্লি! বেড়াল! তা একটা বেড়াল দেখে এত ভয় পাবার কী আছে?

দেখলাম বনবেড়ালের মতো মস্ত একটা কালো বেড়াল পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত  
দৃষ্টিতে জিপের দিকে তাকিয়ে আছে।

মনে পড়ল এ দেশের সংস্কারের কথা। নেপালে কোথাও বেড়াল দেখা যায় না। এ  
দেশে কেউ বেড়াল পছন্দ করে না। তাদের মতে বেড়ালের চেয়ে কুকুর ভালো। বেড়াল  
কোনো উপকার করে না। বরঞ্চ ক্ষতি করে। সিদ্ধিদাতা গণেশের বাহন যে ছুছন্দ (ইঁদুর)  
, তাদের বেড়াল হত্যা করে। কাজেই বেড়াল গৃহস্থের অকল্যাণ করে। আর যদি কালো  
বেড়াল হয় তাহলে রক্ষে নেই। কেননা, এদের বিশ্বাস, কালো বেড়াল অশুভ আত্মার ছদ্মরূপ।

যাই হোক প্রণবেশ গাড়ি থেকে নেমে বেড়ালটাকে তাড়িয়ে দিল। বেড়ালটা ফাঁস করে  
কামড়াতে এসেছিল কিন্তু দ্বিতীয় বার তাড়া খেয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল।

অনিচ্ছুক ড্রাইভার আবার গাড়ি চালাতে লাগল।

গাড়ি চলেছে ধীরে ধীরে পাহাড়ের ওপর ঘুরে ঘুরে। কিছুক্ষণ চলার পর গাড়ি নামতে  
লাগল। নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেছে পথ। খুব সাবধানে  
গাড়ি চালাচ্ছে ড্রাইভার। পাসেই গর্ত। স্টিয়ারিং একটু এদিক-ওদিক হলেই আর রক্ষে নেই।  
গাড়িটা ডান দিকের আরও সরু পথ ধরে চলল। পাহাড়ের গায়ে অজস্র সল্লা, চিলোনী,  
মহুয়া আর বাজ গাছের জটলা।

প্রায় দেড় ঘণ্টা যাবার পর এক জায়গায় সরু রাস্তাটা তিন দিকে চলে গেছে। হঠাৎ  
ড্রাইভার সেখানে ব্রেক কষল। আমরা কিছু বুঝে ওঠবার আগেই দেখি রাস্তার দিকে তাকিয়ে  
ড্রাইভার প্রণাম করছে।

কাকে প্রণাম করছে?

মুখ বাড়িয়ে দেখি ঠিক মোড়ের মাথায় একটা মস্তবড়ো খুঁটের ওপর লাল এক টুকরো  
ন্যাকড়া, ওদেশের একরকম হলদে রঙের জায়ে আর জবার মতো লাল লালি গোলাপ ফুল,  
সরু সরু ডালসুন্ধু পাতা। ড্রাইভার সেইগুলোর উদ্দেশ্যেই প্রণাম করছে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস  
করে যেটুকু বুঝতে পারা গেল তা হচ্ছে এগুলো আমাদের দেশে তুক করার মতো। আজকাল  
অবশ্য তুকতাক বড়ো একটা দেখা যায় না। কিন্তু ছোটোবেলায় আমরা গ্রামে দেখেছি। রাস্তার  
মোড়ে এইরকম মস্তপূত তুক সাজিয়ে রেখে দিত এক শ্রেণীর হিংস্র স্বভাবের মানুষ লোকের  
চরম ক্ষতি করার জন্যে। এই তুক মাড়ালে সর্বনাশ হয়। এও সেইরকমের তুক। ড্রাইভার  
জানাল এই তুক করেছে ভয়ংকর স্বভাবের তান্ত্রিক যে এই বিশেষ ঘণ্টাকর্ণ পূজো করে।  
রাস্তার মোড়ে তুক সাজিয়ে রেখে লোককে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে—কেউ যদি ভুল করেও  
এতদূর এসে পড়ে, তারা যেন আর না এগোয়।

কাজেই আমাদের ড্রাইভার আর এগোতে নারাজ। অগত্যা আমরা নেমে পড়লাম। জেনে  
নিলাম এই পাহাড়টা থেকে এক কিলোমিটার নেমে গেলেই বিষ্ণুমতী নদী। সেই নদীর তীরেই—

ড্রাইভার আর কিছু বলতে চাইল না। আমরা নামতেই ও গাড়ি ঘুরিয়ে নিল যাতে  
দরকার হলেই স্টার্ট নিতে পারে। এমনও বিপদ হতে পারে যখন গাড়ি ঘোরাবার আর সময়  
থাকবে না। শুধু তাই নয়, গাড়িটা রাখল আরও এগিয়ে নিরাপদ দূরত্বে। আমাদের পরিষ্কার

বলে দিল বেশি দেরি হলে সে এখানে গাড়ি নিয়ে থাকবে না। কেননা বেশি দেরি হলে বুঝে নেবে আমরা আর বেঁচে নেই। নিষিদ্ধ পূজো দেখতে যাওয়ার শাস্তি মৃত্যু।

কথাটা শুনে আমাদের গা শিউরে উঠল। সত্যিই কি সব জেনেগুনে আমরা মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছি?

যাই হোক পকেটের ভেতর থেকে রিভলভারটা বের করে, মুঠোর মধ্যে ধরে আমরা নামতে লাগলাম।

ঢাল পথে আমরা হুড়মুড় করে নেমে চললাম। নিস্তব্ধ পাহাড়ে পথ। দু'পাশে যেন পাথরের আকাশচুম্বী খাড়া প্রাচীর। এখানে মরে পড়ে থাকলে কাক-পক্ষীতেও টের পাবে না।

প্রায় দশ মিনিট ধরে নামার পর আমরা নিচে বিষ্ণুমতী নদী দেখতে পেলাম। তবে তো আমরা এসে পড়েছি।

পাহাড়ী নদী। জল কম। শীর্ণ। নদীর বুকে ছোটো-বড়ো নানারকমের নুড়ি।

হঠাৎ প্রণবশ আমার হাতটা চেপে ধরল।

—কি হলো?

—ওগুলো কি? বলে প্রণবশ নদীর ওপারে আঙুল তুলে দেখাল।

যা দেখলাম। মাথার চুলগুলো পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠল। গোটা পনেরো মাথার খুলি ছড়িয়ে রয়েছে নদীর ওপারে। মাথার খুলিগুলো আকারে ছোটো।

আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। এত মড়ার মাথার খুলি এল কোথা থেকে?

আমরা আরও একটু নামলাম। দশ হাত নিচেই নদী। ওপরে পাহাড়টা আলসের মতো ঝুঁকে রয়েছে। মনে হচ্ছে যেন মস্ত একটা গুহার মুখ!...এ যে কয়েকজন লোক...কী ভয়ংকর সব চেহারা! কিন্তু কারও মুখে কথা নেই। অথচ ব্যস্ত। সবার গলায় ছোটো ছোটো পাতার মালা।

হঠাৎ দেখি দু'জন লোক একটা ছেলেকে ধরে নদীর দিকে আসছে। হস্তপুষ্ট ছেলেটি। ফর্সা রঙ। সুন্দর দেখতে। বয়েস বছর দশেক। খালি গা। শীতে কাঁপছে। গলায় লাল ফুলের মালা ছেলেটির মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেছে।

—কি ব্যাপার? প্রণবশকে ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলাম।

—স্নান করাতে নিয়ে আসছে।

—ধরে নিয়ে আসছে কেন? গলায় মালা কেন?

প্রণবশ স্নান হাসল। বলল—বুঝতে পারছ না?

এবার আর বুঝতে বাকি রইল না। ঘণ্টাকর্ণ পূজোয় ছেলেটাকে বলি দেবে। বলি এই প্রথম নয়। এ যে ছোটো খুলিগুলো দেখলাম, ওগুলোও হতভাগ্য ছেলেদের।

মুহূর্তেই কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। বড়ো পাথরের আড়ালে আমরা শিকারী কুকুরের মতো নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম। দুজনের হাতে মুঠোয় শক্ত করে ধরা রিভলভার।

ওরা যখন ছেলেটাকে স্নান করিয়ে ফিরছে, আমরাও তখন সাবধানে হেঁটে হেঁটে নদী পার হলাম। এখনও পর্যন্ত ওরা আমাদের দেখতে পায়নি।

আমরা যথেষ্ট তফাৎ রেখে এগোচ্ছি। একটু দূরে গিয়ে ওরা থামল। এটা সেই ঝুলে পড়া পাহাড়ের মুখ। দেখলাম পাহাড়ের গুহার অন্ধকারে পাথরের মস্ত একটা পিদিম জ্বলছে। ভেতরে বোধ হয় ঘণ্টাকর্ণের মূর্তি। মূর্তিটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সামনে পূজোর আয়োজন। একজন মোটাসোটা লোক পূজো করছে। গায়ে লাল চেলি। গলায় লাল ফুলের মালা। সামনে—



ঐ যে হাঁড়িকাঠ। আর ওটা কী? একটা বেঁটেখাটো মানুষের কংকাল বুলছে গুহটার বাঁ দিকে। বাতাসে কংকালটা দুলছে। এইরকম একটা কংকাল প্রকাশ্যে টাঙিয়ে রাখার কারণ কী বুঝতে পারলাম না।

প্রায় দশ মিনিট পর লোকটা পুজোর আসন থেকে উঠল। এবার লোকটাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। জীবনে কখনো তান্ত্রিক বা কাপালিক দেখিনি। এই প্রথম দেখলাম। বড়ো বড়ো হিংস্র ভয়ংকর চোখ। কপালে সিঁদুর ল্যাপা। পেশিবহুল হাতে রুদ্রাক্ষের মালা।

লোকটি এগিয়ে আসতেই আরও যে চার-পাঁচজন বসেছিল তারা উঠে দাঁড়াল। তান্ত্রিক বলিদানের নির্দেশ দিল।

এবার ছেলেটাকে ধরে আনা হলো। পাছে চৈঁচায় তাই মুখটা কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা। প্রণবেশ অর্ধৈর্ঘ্য হয়ে চাপা গলায় বলল, আর দেরি নয়। অ্যাকশান।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, আর একটু দেখি। হ্যাঁ, শোনো—তুমি আটকাবে তান্ত্রিকটাকে। আর আমি সামলাব ঐ পাঁচজনকে।

হাঁড়িকাঠে ছেলেটার মাথা আটকে দেওয়া হলো। এবার স্বয়ং তান্ত্রিক বিরাট একটা খাঁড়া হাতে নিয়ে এগিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে পাথরের আড়াল থেকে আমরা দু'জনে দু'দিকে রিভলভার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

প্রণবেশ একেবারে তান্ত্রিকটার মুখোমুখি। আমি একা বাকি পাঁচজনের সামনে রিভলভার ঘোরাতে লাগলাম।

এই অকস্মাৎ আক্রমণে ওরা প্রথমে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল। তার পরেই ওরা আমার দিকে তেড়ে এল। আমি একটা ব্ল্যাক ফায়ার করলাম। পাহাড় কাঁপিয়ে গুলির শব্দটা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে মিলিয়ে গেল। ওরা ভয়ে পিছিয়ে গেল। তারপর প্রায় পাঁচ মিনিট ওরা আর এগোচ্ছে না। মাথার ওপর গাছের ডালে একটা মস্ত কাক ক্যাক ক্যাক করে ডেকে উঠল। কাক যে এত বড়ো হয় তা জানা ছিল না। বোধ হয় পাহাড়ী কাক বলেই এত বড়ো।

চকিতে প্রণবেশের দিকে তাকালাম। তান্ত্রিক আর প্রণবেশ পাঁচ হাতের ব্যবধানে মুখোমুখি নিশ্চল দাঁড়িয়ে। তান্ত্রিকের হাতে খাঁড়া। কিন্তু—এ কী! প্রণবেশ নেতিয়ে পড়ছে কেন? দেখি তান্ত্রিক ভয়ংকর দৃষ্টিতে প্রণবেশের দিকে তাকিয়ে আছে। তার দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে। বুঝলাম তান্ত্রিক হিপনোটাইজ করছে। আর প্রণবেশের হাত থেকে রিভলভার খসে পড়ছে।

তখনই আমি বাঁ হাতের রিভলভারটা অন্যদিকে তাক করে প্রণবেশকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিলাম। ওর হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিলাম। এখন আমি একা। শুধু দু' হাতে দুটো রিভলভার। প্রণবেশ হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে মাটিতে বসে পড়েছে। তান্ত্রিক সেই একইভাবে আমার দিকে তাকাল। কিন্তু প্রণবেশের চেয়ে আমার মনের জোর বোধহয় বেশি। আমি ওর চোখের দিকে না তাকিয়ে হুংকার দিয়ে বললাম—পিছু হটো।

ওরা শুনল না। কাপালিকও ছুটে এল আমার দিকে। আমি দ্রুত দশ পা পিছিয়ে গেলাম। কাকটা আবার বিকট শব্দে ডেকে আমাদের মাথার ওপর উড়তে লাগল। ওদের ভয় দেখাবার জন্যেই আমি উড়ন্ত কাকটাকে গুলি করলাম। দু'-পাক ঘুরে কালো ডানায় রক্ত মেখে কাকটা এসে পড়ল তান্ত্রিকের মাথায়। আমি লাফিয়ে গিয়ে বুকে রিভলভার ঠেকালাম। অন্যরা ভয়ে পালাতে লাগল। মুহূর্তে পাহাড়ের আড়ালে কে যে কোথায় গা ঢাকা দিল আর তাদের দেখা গেল না। প্রণবেশও ততোক্ষণে সামলে উঠেছে। তখন উদ্যত রিভলভারের সামনে তান্ত্রিক

আর ছেলোটাকে নিয়ে আমরা ওপরে উঠে এলাম। রিভলভারের সামনে তান্ত্রিক বাবাজি আর মেজাজ দেখাল না।

তান্ত্রিকের এই অবস্থা দেখে আমাদের এই ড্রাইভার ভয়ে বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর হঠাৎ তার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বোধহয় বোঝাতে চাইল তার দোষ নেই। সে নিরুপায়। তার ওপর তাঁর যেন ক্রোধ না পড়ে।

ড্রাইভারকে বললাম—সোজা থানায় চলে।

কিন্তু—লিখতে লজ্জা করছে, শেষ রক্ষা হয়নি। মাঝপথে হঠাৎই আমাদের অপ্রত্যাশিতভাবে ঢুলুনি এসেছিল। তন্দ্রা ছুটলে দেখি জিপের মধ্যে ছেলোটা রয়েছে। কিন্তু তান্ত্রিক নেই। তাকে আমাদের দু'জনের মাঝখানে বসিয়েছিলাম। তবু কী করে যে পালাল বুঝতে পারলাম না।

থানায় গিয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে সব কথা বললাম। পুলিশকর্তা আমাদের সাহসের জন্যে ধন্যবাদ দিলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন খোঁজখবর নিয়ে ছেলোটাকে ওর বাপ-মায়ের কাছে পৌঁছে দেবেন।

হোটেলে ফিরে জং বাহাদুরকে সব ঘটনা বললাম। আশ্চর্য! সে মোটেই খুশি হলো না। মুখের ওপর রীতিমতো ক্রোধের ছায়া নেমে এল। যেন ওখানে গিয়ে আর ছেলোটাকে বাঁচিয়ে আমরা অন্যায় কাজ করেছি। শুধু থমথমে গলায় বলল, কাজটা ভালো করলেন না স্যার। ফল পাবেন। বলেই চলে গেল।

পরের দিন আমাদের ঘরে জল দিতে এল একজন বয়স্ক লোক। বাহাদুরের কথা জিজ্ঞেস করায় ও জানাল দু'দিনের ছুটি নিয়ে ও কোথায় গিয়েছে।

মরুক গে। যে কেউ একজন আমাদের দেখাশোনা করলেই হলো।

দু'দিন পর জং বাহাদুর ফিরে এল। দেখি কপালে ওর সিঁদুরের লম্বা তিলক। বুঝলাম কোনো ঠাকুর-দেবতার মন্দিরে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ এমন কী ঘটল যার জন্যে ছুটি নিয়ে ঠাকুরবাড়ি যেতে হলো? তখনই—কেন জানি না সন্দেহ হলো সেই তান্ত্রিকের আখড়ায় যায়নি তো?

যাই হোক ওকে আর কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

যাবার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা হোটেলে ঢুকছি, দেখি একটা রোগা-পটকা ছেলে দরজার কাছে বসে আছে। জিজ্ঞেস করায় সে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলল, সে বাড়ির কাজ খুঁজছে। যদি দরকার হয় তাহলে আমাদের সঙ্গে কলকাতায় যেতে পারে।

জং বাহাদুরকে ডাকলাম। শুনে বলল, আপনি তো কাজের ছেলে খুঁজছিলেন। তা এ যখন না ডাকতেই এসে পড়েছে তখন নিয়ে যান।

ওর চেহারা দেখে বললাম, এর শরীর তো এই। ও কি কাজ করতে পারবে?

এ কথা শুনেই ছেলোটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। ঐ প্রবল শীতে জামা খুলে ফেলে বার কতক ভন্ট খেলো। দু'বার দুমদাম করে বড়ো বালতিটা নিয়ে পানি পানি করে নিচে নেমে গেল। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে এক বালতি জল নিয়ে দৌড়ে এসে পড়ল। আশ্চর্য! এক ফোঁটা জল চলকে পড়েনি। দেখে যত না খুশি হলাম, তার চেয়ে বেশি হলাম অবাক। ছেলোটো কি ম্যাজিক জানে, না পাহাড়ী ছেলে বলেই এই গোপন শক্তি?

ইতস্তত করছি—জং বাহাদুর বলল, ভাবছেন কী, নিয়ে যান একে। এর কাজ দেখবেন।

ওকে নিয়ে যখন গাড়িতে উঠছি, দেখি বাহাদুর দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে। সে হাসিটা যেন কীরকম! ঠিক বিদায়ের হাসি নয়।

## অশুভ সংকেত

আমার বন্ধু প্রণবশ নেপাল থেকে ফিরে কলকাতাতেই থেকে গেল। আমি রাজু সুঝাকে নিয়ে চলে এলাম দেশের বাড়িতে। প্রণবশকে ছুটির মধ্যে অতি অবশ্য একবার আমার দেশের বাড়িতে বেড়াতে আসতে বলেছি। ও আসবে বলেছে।

যদিও জুলাই মাস। বৃষ্টির সময়। আকাশ মেঘলা। কিন্তু ঝড়ের সময় নয়। আশ্চর্য! স্টেশনে নেমে সুঝাকে নিয়ে রিকশা করে অর্ধেক পথ যেতেই হঠাৎ ঝড় উঠল। সে কী ঝড়! সঙ্গে সঙ্গে মেঘের তর্জন-গর্জন। স্টেশনে ফিরে যাবার উপায় নেই। ঐ ঝড়ের মধ্যেই রিকশার পর্দা দু'হাতে চেপে ধরে আমরা এগোতে লাগলাম। কিছুক্ষণ ধরে একটা কীরকম পচা ভ্যাপসা গন্ধ পাচ্ছিলাম। এখন বুঝলাম গন্ধটা আসছে সুঝার গা থেকে। আমার ভেতরটা কীরকম ঘুলিয়ে উঠছিল। কিন্তু উপায় কি? গরিবের ঘরের ছেলে। নোংরা। ভালো করে সাবান মেখে স্নান করতে পায় না। গন্ধ তো হবেই। তাছাড়া ওর গায়ের জ্যাকেটটাও জঘন্য।

যাই হোক রিকশাটা যখন ঝড়ের মধ্যেই বাড়ির কাছে এসেছে তখন হঠাৎ আকাশের বুক চিড়ে বিদ্যুৎ বলকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কানের পর্দা ফাটিয়ে প্রচণ্ড শব্দে কাছেই কোথাও বাজ পড়ল। জীবনে কখনও বাজ পড়া দেখিনি। এই প্রথম দেখলাম। আর আমার প্রথম-দেখা বজ্রটি একটা আগুনের গোলা হয়ে প্রথমে আমাদেরই বাড়ির নারকেল গাছটার ওপর পড়ল। তারপর বাড়ির আলসে ভেঙে বেরিয়ে গেল।

চারিদিকে ভয়াবহ চিংকারের মধ্যে দিয়ে আমাদের রিকশাটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। আমি বিহ্বল—সমস্ত। শেষ পর্যন্ত আমাদের বাড়িতেই বজ্রপাত!

কিন্তু—আশ্চর্য, সুঝার কোনো বিকার নেই। সে তার ডাবডাববে সাদা চোখ নিয়ে শুধু আমার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন প্রতিটা মুহূর্ত ও আমাকে ওর লক্ষের মধ্যে রাখতে চাইছে।

এইভাবেই বিজী একটা দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে রাজু সুঝা আমাদের বাড়ি ঢুকল। ‘ঢুকল’ না বলে বরঞ্চ বলি আমাদের বাড়িতে নিজের অধিকার পাকা করে নিল।

এখানে এসে প্রথম কদিন আমার চেনাজানা প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করলাম।

হেরম্ব ভট্টাচার্যের কথা মনে ছিল না। বৃদ্ধ মানুষ। সারা জীবন ঠিকুজি, কুষ্ঠী, কররেখা গণনা করেই কাটালেন। ভালো জ্যোতিষী বলে ওঁর খুব নামডাক ছিল। আমি এ-সবে বিশ্বাসী কোনোদিনই ছিলাম না। তাই তাঁর কাছে যেতে ইচ্ছে করত না। কিন্তু উনি আমাকে ছোটবেলা থেকেই চিনতেন। বাবার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব ছিল। আমি কোথায় থাকি, কি করি না করি সব খবরই রাখতেন। বোধহয় ভেতরে ভেতরে আমার ওপর টান ছিল।

সেদিন সকালে বাজার করে ফিরছি, দেখি হেরম্ব জ্যাঠা রাস্তার ধারে বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে পাঁজি দেখছেন। আমায় দেখে সোজা হয়ে বসে বললেন—সুশান্ত না? কবে এলে?

অগত্যা বারান্দায় উঠতে হলো। প্রণাম করলাম। উনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার কাজকর্মের কথা জিজ্ঞেস করলেন।

পুলিশের অফিসার হয়েছি শুনে তিনি যেন বিশেষ খুশি হলেন না। শুধু বললেন, ওসব চাকরি বড়ো দায়িত্বজনক। বিপদের সামনে এগোতে হয়। না এগোলে দুর্নাম, এগোলে জীবন সংশয়।

হেসে বললাম, তবু তো পুলিশের কাজ কাউকে-না কাউকে করতেই হবে। কেউ পুলিশের কাজ না নিলে চোর-ডাকাতদের ধরবে কে?

আমার কথায় হেরম্ব জ্যাঠা একটু অপ্রস্তুতে পড়লেন। সসংকোচে বললেন, আমি ও ভেবে বলিনি। আসলে এইসব কাজে বিপদ আছে। তুমি আমাদের ঘরের ছেলে বলেই তোমায় বললাম। নইলে আমার কি?

আমি নিতান্তই ওঁকে খুশি করবার জন্যে ভান করে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, দেখুন তো আমার শিগগিরই জীবন সংশয়ের যোগ আছে কিনা।

খুশি হওয়া তো দূরের কথা, উনি যেন একটু বিরক্ত হলেন। বুঝলেন আমি মজা মারছি। তিনি আমার হাতের দিকে তো তাকালেনই না, শুধু চোখের দিকে মিনিট দুয়েক তাকিয়ে থেকে বললেন, ভবিষ্যৎবাণী করাটা ছেলেখেলা নয় সুশাস্ত। অন্য কেউ হলে উত্তরই দিতাম না। তুমি বলেই বলছি—জীবন সংশয়ের সম্ভাবনা অতি সন্নিহিত।

আমি হেসেই বললাম, কবে?

উনি গম্ভীরভাবে বললেন, এক মাসের মধ্যে।

আমি আবার হাসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, বাঁচবার উপায়?

এই সময়ে বাড়ির ভেতর থেকে তাঁর ডাক পড়ল। স্নানের সময় হয়েছে। তিনি ঘরে যেতে যেতে বললেন—এক মাসের মধ্যে কখনও একা থাকো না। বলেই চলে গেলেন। আমি নিশ্চিত হলাম। এক মাসের মধ্যে একা থাকার সম্ভাবনা নেই।

### অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা

যদিও হেরম্ব জ্যাঠার কথাটা উড়িয়ে দিয়েছিলাম তবু প্রথম ক’দিন মাঝে মাঝেই চিন্তা করতাম—কেন তিনি ঐরকম ভবিষ্যৎবাণী করলেন! তিনি তো অন্তত আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাবেন না। তাহলে?

কারও কারও ভবিষ্যৎবাণী তো মিলেও যায় বলে শুনেছি। তাহলে—তাহলে কি সত্যিই এক মাসের মধ্যে এমন কোনো বিপদ আসছে যাতে আমার মৃত্যু হতে পারে?

কিন্তু তা সম্ভব কী করে? বিশেষ এটা তো কলকাতা নয় যে পথেঘাটে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এটা শান্ত নির্বিক্ষণ গ্রাম। আমার নিজের দেশ। এখানে সবাই আমার চেনাজানা। কলকাতায় হলে না হয় বোঝা যেত চোর-ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে আমার মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু এখানে? এখানে আমি ছুটিতে। কোথাও ডাকাতি হলেও নিশ্চয় আমার ছুটিতে হবে না। তাহলে এখানে বাকি এই ক’টা দিনের মধ্যে আমার মৃত্যুর সম্ভাবনা কোথায়? যাই হোক দিন দুয়েকের মধ্যেই আমার মন থেকে হেরম্ব জ্যাঠার কথাটা দূর হয়ে গেল।

কয়েক দিন কেটে গিয়েছে। সুঝা এ কয়দিনেই আমাদের বাড়ির একজন হয়ে উঠেছে। যদিও ও এখন নিয়মিত তেল মেখে সাবান দিয়ে স্নান করে, নোটনের পুরনো জামাগুলো পরে, তবু যখনই ও আমার ঘরে ঢোকে তখনই হঠাৎ মুহূর্তের জন্যে সেই বিশ্রী গন্ধটা পাই। একদিন স্ত্রীকে গন্ধর কথা বললাম। স্ত্রী অবাক হয়ে বলল—কই না তো!

আমার স্ত্রী বা বাড়ির অন্য কেউ যখন গন্ধ পায় না তখন বুঝলাম ওটা আমারই ভুল। প্রথম দিনের সেই বিশ্রী গন্ধটা এখনও আমার নাকে লেগে আছে।

নারকেল গাছটা ছিল বহুকালের। কোন ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি। এত দিন পর

তার মৃত্যু হলো বজ্রাঘাতে আমারই চোখের সামনে। দেখতে পাই পাতাগুলো কিরকম জ্বলে গেছে। একটা একটা করে বালদাসুন্ধু পাতা সশব্দে খসে পড়ছে। মনটা খারাপ হয়ে যায়।

কিন্তু এসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে মন খারাপ করলে চলবে না। যে জীবনকাহিনিটা লিখতে আরম্ভ করেছি, তাড়াতাড়ি সেটা শেষ করতে হবে। ছুটি ফুরোতে আর বেশি দিন নেই। আর এও জানি কলকাতায় গিয়ে কাজের মধ্যে পড়লে লেখা আর শেষ হবে না।

কিন্তু তাড়াতাড়ি শেষ করব বললেই তো আর শেষ করা যায় না। এই যে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ঘটনাটা ঘটল, যত সামান্যই হোক, তবু তো ভুলতে পারছি না। কেন সুঝা চুপি চুপি আমার ঘরে ঢুকেছিল, কেনই বা আলো নিভিয়ে দিয়ে আমায় ভয় দেখাতে চেয়েছিল, ঘরের মধ্যে কী এমন দেখে নোটন চিৎকার করে উঠেছিল? যতই সম্ভাব্যজনক উত্তর পাই না, ততই কৌতূহল বাড়ে, ততই কেন যেন সুঝাকে লক্ষ্য করি। ওকে বোঝবার চেষ্টা করি। ছেলেটা ঠিক আর-পাঁচটা ছেলের মতো নয়। ওর অদ্ভুত কাজকর্মের কিছু নমুনা নেপালের হোটলে দেখেছিলাম। অবাক হয়েছিলাম বটে তবু কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। এখানে এসেও একদিন ঐরকম একটা ঘটনা ঘটিয়ে বসল।

দুপুরবেলায় নোটন ছাদে ঘুড়ি ওড়ায়। নেপালে ঘুড়ি ওড়ে কিনা জানি না তবে সুঝা কখনো ঘুড়ি দেখেনি। তার খুব উৎসাহ। নোটনের সঙ্গে সেও ছাদে দাপাদপি করে বেড়ায়।

সেদিন দুপুরে খেয়েদেয়ে নিজের ঘরে বসে লিখছিলাম। হঠাৎ বাড়ির পিছনে মড়মড় শব্দ করে কী যেন ভেঙে পড়ল। চমকে উঠলাম। কী ভাঙল! কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি তো? ছুটে গেলাম ছাদে। ততক্ষণে আমার স্ত্রী, আমার ছোটো ভাই আর ভাইয়ের স্ত্রীও ছাদে ছুটে এসেছে। যে অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম তাতে সর্বস্ব কেঁপে উঠল। আমাদের বাড়ি থেকে বিশ-ত্রিশ হাত দূরে একটা আমগাছ। দেখি তারই একটা ডাল ধরে সুঝা ঝুলছে। ঝুলছে নয়, দোল খাচ্ছে। আর নোটন লাটাই হাতে করে স্তম্ভিত হয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে।

কী ব্যাপার?

ব্যাপারটা এই—নোটনের ঘুড়িটা আমগাছে আটকে গিয়েছিল। কিছুতেই ছাড়াতে পারছিল না। তখন নাকি সুঝা পাঁচিলে উঠে এক লাফ দিয়ে আমগাছে গিয়ে পড়ল। ঘুড়িটা খুলে নিচে ফেলে দিল। আর তার পরেই গোটা ডালটা মড়মড় করে ভেঙে পড়ে। রাজু ততক্ষণে আর একটা ডাল ধরে ঝুলতে থাকে।

আমাদের দেখে একটু যেন হেসে সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতো ডাল থেকে দোল খেতে খেতে এক ঝাঁকানি দিয়ে ছাদে এসে পড়ল।

ওর এই তাজ্জব কাণ্ডকারখানা দেখে আমার রাগ হয়ে গেল। চিৎকার করে বললাম, হতভাগা, তুই নিজে মরবি, আমাকেও জেলে পাঠাবি? বলে ঠাস্ করে গালে একটা চড় বসিয়ে দিলাম। কিন্তু—গাল কোথায়? মনে হলো যেন এক টুকরো শক্ত কাঠে চড় বসলাম।

রাজু এক ফোঁটা চোখের জল ফেলল না। শুধু তার সেই অদ্ভুত চোখের মণিটা ওপর দিকে ঠেলে আমার দিকে তাকাল।

বাড়ির সবাই ওর এই দস্যুপনায় বিরক্ত হয়েছিল। কিছু না বলে তারা নেমে গেল। আমি ফের ধমক দিয়ে বললাম, এরকম করলে তোমায় আমি দূর করে দেব মনে রেখো।

রাজু সুঝা কোনো জবাব দেয়নি।

ঘটনাটার কথা কদিন পর আর কারও মনে রইল না। সুঝা দিব্যি বাড়ির কাজ করতে লাগল। নোটনের সঙ্গে খেলাধুলোও চলতে লাগল। কিন্তু আমার মন থেকে কিছুতেই একটা

সংশয় ঘুচল না—ঐ রোগা হালকা ছেলেটার ভারে আমগাছের শক্ত ডাল ভেঙে পড়ে কী করে? নিজেকেই বোঝাই—হয়তো ডালটা পলকা ছিল, ভেঙে পড়তই। রাজু উপলক্ষ মাত্র।

একটা জিনিস ইদানিং লক্ষ করছি—যে রাজুকে আমি নিয়ে এসেছিলাম সুদূর নেপাল থেকে—যার আদর-যত্নের অভাব এতটুকু রাখিনি, সেই রাজু সুঝার ওপর আমার কেমন বিতৃষ্ণা জাগছে। কেন জানি না ওকে আর সহ্য করতে পারি না। মনে হচ্ছে ওকে না আনলেই হতো। ও চলে গেলেই বাঁচি। আর আমার ওপরও রাজুর রাগ যে ক্রমশই বাড়ছে তাও বুঝতে বাকি থাকে না। সেই বিরাগ এখন চাপা আগুনের মতো ওর চোখে-মুখে ফুটে উঠছে। আমাকে একলা পেলে ও ওর ডাবডেবে চোখের সাদা অংশটা এমন বিস্তীর্ণ বড়ো করে তাকায় যে আমার কেমন ভয় করে। সন্দেহ হয়—ও কি সত্যিই মানুষের বাচ্চা?

আমার জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে যে অলৌকিক উপন্যাসখানা লিখছি, তার মধ্যে রাজু সুঝার কথা লিখব কিনা ভাবছি। ভাবছি এই জন্যে যে, হয়তো সুঝার ব্যাপার-সাপারগুলো কোনো অলৌকিক কাণ্ড নয়। হতে পারে অস্বাভাবিক। তাও অসম্ভব কিছু না। কেননা সুঝা এদেশের ছেলে নয়। কোথায় হিমালয়ের কোলে পাহাড়-পর্বত-জঙ্গলঘেঁষা নেপালে ওর জন্ম। ওখানেই তার ছেলেবেলা কেটেছে। ওখানেই ও বড়ো হয়ে উঠছে। হয়তো ওর মা নেই, বাবা নেই, আত্মীয়-স্বজন নেই। নিতান্ত পেটের দায়ে আমার সঙ্গে এসেছে। কাজেই ও যদি লাফ দিয়ে গাছের ডাল ধরে ঝোলে কিংবা অস্বাভাবিক তাড়াতাড়ি কাজ করে তাহলে অবাক হবার কিছু নেই। নোটনের মতো বাঙালি ঘরের আদুরে ছেলের সঙ্গে ওকে মেলাতে গেলে ভুল হবে। এও মনে রাখতে হবে ছেলেটা চোর নয়, টাকা-পয়সার দিকে বা খাওয়ার দিকে লোভ নেই। সবচেয়ে বড় কথা নোটনের সঙ্গে খুব ভাব। কাজেই ছেলেটার মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা থাকলেও ভয় পাবার মতো অলৌকিক কোনো ব্যাপার নেই। তবু আমার ডায়েরিতে ওর প্রতিদিনের আচার-আচরণ লিখে রাখছি।

এই যেমন সেদিন সন্ধ্যাবেলা—আমার মেজো ভাই, ছোটো ভাই এক নেমন্তন্ন বাড়িতে গেছে। আমার স্ত্রী আর দুই ভাইয়ের বৌ নিচে রান্নাঘরে। নোটন বাইরের ঘরে পড়ছে। আমি আমার ঘরে বসে লিখছি।

পল্লীগ্রাম। এর মধ্যেই যেন নিশুতি হয়ে গেছে। রাত্তায় লোকচলাচল বিশেষ নেই। বাড়ির পিছনে দীর্ঘ আমগাছের বাগানটা অন্ধকারে গা মিশিয়ে যেন কোনো কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

আমি একমনে লিখছি। হঠাৎ পিছনের দরজার কাছ থেকে ছোটো বৌমার উত্তেজিত গলা শোনা গেল—সুঝা, কী করছ? চমকে পিছন ফিরে দেখি আমার ঠিক পিছনে রাজু দাঁড়িয়ে আছে দু' হাত বাড়িয়ে। ওর চোখের কটা রঙের মণি দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। মুখের ওপর একটা হিংস্র ভাব যা কখনো দেখিনি।

—কী চাই? ধমকে উঠলাম।

সুঝা শান্ত গলায় শুধু বলল, ম্যাচিস। ম্যাচিস অর্থাৎ দেশলাইটা চায়।

—দেশলাই নিয়ে কী করবে?

উত্তরে ও জানাল ওর ঘরে নাকি আলো নিভে গেছে। মোম জ্বালবে।

ততক্ষণে ছোটো বৌমা ঘরের ভেতর এসে দাঁড়িয়েছে। সুঝাকে তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, কখন আলো নিভল? এই তো দেখলাম আলো জ্বলছে।

আমি কিরকম ভয় পেলাম। একটা ফয়শালা করতেই হয়। চেয়ার থেকে উঠে বললাম,

চল্ তো দেখি কেমন আলো নিভেছে?

ও দোতলার সিঁড়ির ঘরে থাকে। গিয়ে দেখি সত্যিই ঘরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার।

ছোটো বৌমা বললে, অবাক কাণ্ড! সুঝা এ ঘরে যখন ঢুকে আসে, আমি তার পরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছি। দেখেছি ওর ঘরে আলো জ্বলছে।

বললাম, তার পরেই হয়তো আলো নিভে গেছে।

ছোটো বৌমা কঠিন সুরে বললে—না। সুঝা বলছে আলো নিভে গেছে বলেই নাকি দেশলাই চাইতে এসেছিল। মিথ্যে কথা। আবার বলছি ও যখন এঘরে এসে আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি দেখেছি তখনও আলো জ্বলছিল।

আমি আর কিছু বললাম না। রাজুর হাতে দেশলাই দিয়ে ওকে চলে যেতে বললাম।

পরের দিন ছোটো বৌমা আমার ঘরে এসে চুপি চুপি বলল, দাদা, রাজুর ব্যাপার-স্বাপার আমার ভালো ঠেকছে না। ও দেশলাই নিতে আসেনি। আমি স্পষ্ট দেখেছি ও আপনার গলা টিপে মেরে ফেলতে এসেছিল।

হেসে বললাম, না-না, তাই কখনো ও পারে? কেনই বা আমাকে মারবে? তা ছাড়া ঐ তো দু'খানা হাড়-বের করা চেহারা—

ছোটো বৌমা বলল, ঐ দু'খানা হাড়েই ও কিন্তু ভেঙ্কি দেখায় ভুলবেন না। যাই হোক আমার বিবেচনায় যত শিগগির পারেন ওকে বিদেয় করুন।

বলে চলে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, এ কথা আর কাউকে না বলাই ভালো। ভয় পাবে। শুধু আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। বলেই চলে গেল।

এই একটা নতুন ভাবনা শুরু হলো। সুঝা কি সত্যিই আমায় মেরে ফেলতে চায়? কিন্তু কেন? ওকে সেদিন মেরেছিলাম বলে? ওর এত বড়ো সাহস হবে বাড়িতে এত জনের মধ্যে আমায় মারার? তা হতে পারে না। ও হয়তো সেদিনের মতো ভয় দেখাতেই এসেছিল। ছোটো বৌমা দেখে ফেলায় ধরা পড়ে গেছে।

এর ঠিক তিন দিন পরে ছোটো ভাইয়ের কাছে চিঠি এল, সামনের সপ্তাহে ছোটো বৌমার বোনের বিয়ের দিন হঠাৎ ঠিক হয়েছে। দিন দশেকের জন্যে ওরা যেন চলে আসে।

ছোটো বৌমা মহা আনন্দে ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ি চলে গেল। যাবার সময় আমায় গম্ভীর মুখে বলে গেল রাজুকে তো সরাবেন না। ওর কাছ থেকে সাবধানে থাকবেন।

আমিও চাই রাজুকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু সরাবার তো স্পষ্ট কারণ থাকা চাই। তা ছাড়া ও যাবে কোথায়? নেপালের সেই কাঠমাণ্ডুতে? ওখানে কি ও একা যেতে পারে? তা হলে ওকে একা কোথায় তাড়িয়ে দেব?

ছোটো বৌমা আমায় সাবধানে থাকতে বলল। কিন্তু নিজের বাড়িতে সবার মাঝখানে কী এমন সাবধান হতে পারি?

## আরও কাণ্ড

সেদিন আবার একটা কাণ্ড হলো।

দুপুরবেলা। আমি আমার ঘরে একা বিছানায় বসে লিখছি। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। হঠাৎ মনে হলো ফ্যানের হাওয়াটা কিরকম এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। একভাবে গায়ে লাগছে না। তাকিয়ে দেখি পাখাটা এদিক থেকে ওদিকে দুলছে।

অবাক হলাম। এ আবার কি! ফ্যানটা এমন দুলছে কেন? ভাবলাম নিশ্চয় ভূমিকম্প হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে ভূমিকম্পের কথা জানাতে গেলাম। আর ঠিক তখনই পাখাটা ভীষণ শব্দ করে আমার বিছানার ওপর খুলে পড়ল সেই শব্দে সবাই ছুটে এল আমার ঘরে। সবাই বলল, খুব ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছি। কিন্তু আর কারো ঘরে পাখা এতটুকু দোলেনি। সবাই খুব আশ্চর্য হয়ে গেল।

আমি লক্ষ করলাম সবাই ছুটে এসেছে। আসেনি শুধু রাজু।

কী মনে হলো জিজ্ঞেস করলাম, সুঝা কোথায়?

কেউ বলতে পারল না। আমি তখনই ছাদে উঠে গেলাম। দেখি হতভাগা সরু পাঁচিলের ওপর হাঁটতে হাঁটতে পেয়ারা খাচ্ছে। পেয়ারা তো সব ছেলেই খায়। কিন্তু ও গোটা পেয়ারাটা মুখে পুরে ছাগলের মতো চিবোচ্ছে। আর সারা মুখে পেয়ারার বিচিগুলো বিচ্ছিরিভাবে লেগে রয়েছে।

—এখানে কি করছ? মেজাজ গরম করেই ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

ও কোনো উত্তর না দিয়ে পাঁচিল থেকে নেমে বাঁদরের মতো ছাদের ওপর লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল।

ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ডাকা হলো। সে তো দেখে অবাক। বলল, যে আঁকশিতে পাখাটা ঝুলছিল সেটা ঠিকই আছে। পাখাও খারাপ হয়নি। তা হলে পড়ল কি করে?

পড়ল কী করে সে কথা আলাদা। আমার কিন্তু মনে হলো আমাকে মারবার জন্যেই যেন কোনো অদৃশ্য শক্তি একাজ করেছিল। আমার কোনো শুভ শক্তি আমাকে এ যাত্রাতেও বাঁচিয়ে দিল।

ছোটো ভাইরা ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে গেলে বাড়িটা অনেকখানি ফাঁকা হয়ে গেল। ওদের জন্যে হঠাৎ মন কেমন করতে লাগল। মনে হলো ওরা না গেলেই ভালো হতো। আর তো মাত্র সপ্তাহ দুয়েক আছি। সবাই একসঙ্গে থাকলে ভালোই লাগত। বিশেষ করে ছোটো ভাইয়ের স্ত্রী ঐ যে আমায় চুপি চুপি সাবধানে থাকার কথা বলে গিয়েছিল, সে কথা মনে করে আমার অস্বস্তি হতে লাগল। যাক, ক’দিন পরেই তো ওরা আসছে। তা ছাড়া বাড়িতে আমার স্ত্রী, নোটন ছাড়াও মেজো ভাই, মেজো ভাইয়ের স্ত্রী রয়েছে। কাজেই আমার কোনো অসুবিধা নেই।

সুঝা বড়ো একটা এদিকে আসে না। আমার ঘরের সামনের বারান্দা দিয়ে যখন যায় তখন একবার ঘাড় ঘুরিয়ে এমনভাবে আমাকে দেখে যেন আমি ওর দু’চক্ষের বিষ। আমার মনেও একটা পৈশাচিক ভাবের উদয় হয়। ইচ্ছে করে ওর সরু গলাটা টিপে ধরি।

মাত্র দু’দিন পরেই মেজো বৌমার বাপের বাড়ি থেকে জরুরি খবর এল—ওর বাপের বাড়ির জমিজমা ভাগ হচ্ছে। সেইজন্যে কয়েক দিনের জন্যে মেজো বৌমাকে যেতে হবে। পরের দিনই মেজো ভাই, মেজো বৌমা ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে গেল। যাবার সময়ে মেজো বৌমা হেসে বলে গেল, দিদি তো রইলেন। আপনার অসুবিধে হবে না এক সপ্তাহের মধ্যেই চলে আসব।

যাক মেজো ভাইরাও চলে গেল। এত বড়ো বাড়িটা এখন যেন আমায় গিলতে আসছে। এখন শুধু আমার স্ত্রী আর নোটন। রাজু তো দিব্যি বহাল তবীয়তে আছেই।

ওরা না থাকায় আমার স্ত্রীর কোনো অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হলো না। এত বড়ো বাড়িটা খালি হয়ে গেল, তার জন্যে তার কোনো কষ্টও নেই। জোড়া বটতলায় শিগগিরই



মেলা বসবে, অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আসবে। তাঁদের দেখতে যাবে সেই আনন্দেই মশগুল।

আর নোটন? সে তো রাজুর সঙ্গে দিবা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে।

কিন্তু আমি? আমার যে শুধু খরাপই লাগছে তা নয়—সত্যি কথা বলব, পুলিশের লোক হয়েও আমার কেমন ভয় করছে। কিসের ভয় তা ঠিক বুঝতে পারি না। ঐ একফোঁটা ছেলে রাজু সুঝাক? পাগল হয়ে গেলাম নাকি? ওকে ভয় পেতে যাব কেন? ওর সাধ্য কী আমার ধারে-কাছে যাবে!

### রহস্যময় রাজু

আমাদের এই গ্রামে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে। বিশেষ করে এই সময়ে জোড়া বটতলায় বিরাট ‘মোচ্ছব’ হয়। ‘মোচ্ছব’ চলতি কথা। আসল কথা হচ্ছে ‘মহোৎসব’ (মহা উৎসব)। বহুকাল থেকে এই জোড়া বটতলায় এক পক্ষ কাল ধরে মেলা বসে। জোড়াবটের নিচে একটি ঠাকুর আছে। ঠাকুরের কোনো বিশেষ মূর্তি নেই। একটা পাথর আগাগোড়া সিঁদুর মাখানো।

এই মেলা উপলক্ষ করে পাশাপাশি গ্রাম-গঞ্জ থেকে বহু লোক আসে। কাছেই বিরাট একটা দীঘি। সেখানে স্নান করে সবাই জোড়া বটতলায় পূজা দেয়। সেদিন সবাই দীঘির পাড়েই রাঁধাবাড়া করে খায়। মেলায় নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক থেকে শুরু করে বাদামভাজা, পাঁপড়ভাজা সবই থাকে। মিষ্টির দোকানের তো ছড়াছড়ি। সবচেয়ে আকর্ষণের ব্যাপার—এই মেলায় দূর-দুরান্তর থেকে দুর্গম পথ পেরিয়ে সাধু-সন্ন্যাসীরা আসেন। ভস্মমাখা দেহে, কপনিমাত্র পরে তাঁরা ধুনি জ্বালিয়ে সারা রাত ধ্যান করেন। মাঝে মাঝে নাগা সন্ন্যাসীদেরও দেখা যায়। শোনা যায় তাঁরা হিমালয় থেকে নেমে আসেন।

এইসব ভিড়ভাড়া মেলা, ঠাকুর পূজা, সাধুদর্শন আমার ভালো লাগে না। আমি পুলিশ অফিসার। আগেই বলেছি আমরা সন্দিক্ত স্বভাবের। পুলিশের কাজ করতে করতে মনের কোমল বৃত্তিগুলো, ভাবাবেগ সব নষ্ট হয়ে গেছে। এখন সবকিছুই হাস্যকর বলে মনে হয়। কিন্তু আমার স্ত্রীর আবার উন্টো। তিনি বাচ্চা ছেলেদের মতো মেলা দেখতে ভালোবাসেন। পূজো না দিলে তাঁর তৃপ্তি নেই। সাধু-সন্ন্যাসী পেলেই তাঁদের পায়ে আছড়ে পড়েন।

এখানে মেলা বসছে শুনে স্ত্রী বললেন, আমি যাব।

বললাম, যাও। দয়া করে সঙ্গে আমায় যেতে বোলো না।

স্ত্রী হেসে বললেন, তোমাকে দরকার নেই। আমি নোটন আর সুঝাকে নিয়ে যাব।

—সেই ভালো, বলে লেখায় মন দিলাম। একটু পরে গৃহিণী ফিরে এসে বললেন, সুঝা যেতে চাচ্ছে না।

বললাম, না গেল তো নাই গেল।

বাঃ! ছেলেটা এখানকার মেলা দেখেনি। দেখবে না?

বললাম, তার যেতে ইচ্ছে না করলে কি করবে?

স্ত্রী বললেন, তুমি একটু বল না।

বিরক্ত হয়ে বললাম, ওকে আমি কিছু বলতে পারব না।

অগত্যা গৃহিণী বিমর্ষ মুখে চলে গেলেন।

হঠাৎই আমার মনে হলো—রাজু যেতে চাইল না কেন? বাড়িতে এখন ওর এমন কী রাজকার্য আছে?

বিকেলে গৃহিণী ফিরে এসে ঘটা করে মেলা দেখার কথা বললেন। অনেক সাধু-সন্ন্যাসী দেখেছেন। শুনে শুনে পঞ্চাশ জন সাধুর পায়ের ধুলো নিয়েছেন। খুব ভালো লেগেছে। পরে হঠাৎ গলার স্বর খাটো করে বললেন, সুঝা তো যাব না বলল। কিন্তু ও গিয়েছিল। আমি ওকে দেখেছি। কিন্তু ও আমাকে দেখেও এড়িয়ে গেল।

এর উত্তর আমি আর কী দেব? চুপ করে রইলাম। শুধু বললাম, ও বড়ো পাকা ছেলে। দিন দিন বেয়াড়া হয়ে উঠছে।

গৃহিণী আর কিছু বললেন না। চলে গেলেন।

মেজো, ছোটো ভাইরা কেউ নেই। বাড়িটা বড্ড খালি-খালি লাগছে। কলকাতায় দু'খানা মাত্র ঘরে আমার সঙ্গে শুধু নোটন আর নোটনের মা থাকে। মাত্র তিনজন। সে একরকম সয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখানে এত বড়ো বাড়িতে মাত্র আমরা তিনজন আর হতচ্ছাড়া ঐ রাজুটা—মোট চারজন। বড্ড ফাঁকা লাগে। এই সময়ে প্রণবশ যদি এসে পড়ত তাহলে খুব ভালো হতো। বলেও ছিল—আসবে। কিন্তু এল কই?

সেদিন বিকেলে ছাদে পায়চারি করছিলাম। সূর্য ডুবে গেছে। কিন্তু অন্ধকার হয়নি। হঠাৎ বাড়ির পিছনের জঙ্গল থেকে এক ঝাঁক পাখির ভয়াব্র চঁচামেচি শুনে চমকে উঠলাম। পাখিগুলো অমন করে চঁচাচ্ছে কেন দেখবার জন্যে ছাদের ঐ দিকে গিয়ে দাঁড়লাম।

আমাদের বাড়ির পিছন দিয়ে একটা সরু ধুলোভরা রাস্তা এঁকেবেঁকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সেই দীঘির দিকে গেছে। পাঁচিলের কাছে গিয়ে দেখলাম রাজু ঐ রাস্তা দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছে। আর গাছে গাছে যত পাখি ছিল, সব ওর মাথার ওপর গোল হয়ে ঘুরছে আর কিচ্‌মিচ্‌ করছে। রাজু কিন্তু সেদিকে তাকাচ্ছে না। হনহন করে হেঁটে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল।

আমি অবাক হলাম। এই ভর-সন্ধ্যাবেলা রাজু জঙ্গলের মধ্যে গেল কেন? কেনই বা পাখিগুলো অমন করে আতঙ্কিত চিৎকার করছিল? অনেক ভেবেও কোনো জুৎসই উত্তর খুঁজে পেলাম না।

নিচে নেমে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, রাজুকে কোথাও পাঠিয়েছ?

স্ত্রী বললেন, না তো।

বললাম, তাহলে ওকে জঙ্গলে ঢুকতে দেখলাম কেন?

স্ত্রী অবাক হয়ে বললেন, জঙ্গলে! জঙ্গলে কেন যাবে?

—সেটাই তো আমার প্রশ্ন। আর ও যখন ঐদিকে যাচ্ছিল তখন এক ঝাঁক পাখি ওর মাথার ওপর উড়ছিল আর চিৎকার করছিল।

—কী যে বল!

—ঠিক আছে। ও এলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো।

—ও তো বাড়িতেই ছিল। দাঁড়াও দেখছি। বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাজুকে নিয়ে ফিরে এলেন, এই তো। এখানেই রয়েছে।

আমি অবাক। দশ মিনিট আগে ছাদ থেকে ওকে আমি স্বচক্ষে জঙ্গলে ঢুকতে দেখেছি। এর মধ্যে কখন ফিরে এল? তবে কি আমি ভুল দেখলাম? এতখানি ভুল হওয়া কি সম্ভব?

তবু জিজ্ঞেস করলাম, তুই কোথায় ছিলি?

ও ভাঙা হিন্দিতে বলল, আমার ঘরে।

—তুই পেছনের রাস্তা দিয়ে জঙ্গলের দিকে যাসনি?

ও খুব সংক্ষেপে রুক্ষ গলায় বলল, নেহি।

আমার বেজায় রাগ হলো। আর সঙ্গে সঙ্গেই রাগ প্রকাশের ছতোও খুঁজে পেলাম। বললাম, সেদিন তোর মাইজি ওদের সঙ্গে মেলায় যেতে বলল। তুই বললি যাবি না। কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে একা গিয়েছিলি। অথচ সেকথা বলিসনি। কেন? কেন একা একা মেলায় গিয়েছিলি?

ও আগের মতোই ঘাড় শক্ত করে শুধু বলল, নেহি।

আমার স্ত্রী টেটিয়ে উঠে বললেন, তুই তো আচ্ছা মিথ্যাবাদী! আমি নিজে চোখে দেখলাম যেখানে সাধুরা বসেছিল সেখানে ঘুরছিলি। আর বলছিস কিনা—

ও ফের ঘাড় নাড়ল—নেহি।

স্ত্রী বললেন, তুই ডাहा মিথ্যাবাদী। নোটনকে জিজ্ঞেস কর। সেও দেখেছে।

—নেহি—নেহি—বলতে বলতে রাজু যেন পালিয়ে গেল।

সেদিন রাত্রে স্ত্রী প্রথম বললেন, শোনো, রাজুকে আমার কেমন যেন লাগছে।

আমি চুপ করে রইলাম।

স্ত্রী আবার বললেন, কিছু বলছ না যে?

—কি আর বলব? আমিও টের পাচ্ছি। ওর ঐ রোগা-পটকা শরীর নিয়ে দুমদাম করে কাজ করা, ছাদ থেকে লাফিয়ে গাছের ডাল ধরে ঝোলা, ছাদের সরু পাঁচিলের ওপর দিয়ে হাঁটা, হাঁটতে হাঁটতে মস্ত বড়ো হাঁ করে গোটা পেয়ারা চিবনো, ওর অস্বাভাবিক চোখ, আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকানো, মেলায় যাব না বলে লুকিয়ে লুকিয়ে যাওয়া, সন্ধ্যাবেলায় দীঘির পথে জঙ্গলে ঢোকা, ওকে দেখে ভয় পেয়ে পাখির ঝাঁকের তাড়া করা—অথচ ও নাকি জঙ্গলের পথে যায়নি, ঘরেই ছিল—সবই রহস্যময়।

স্ত্রী শিউরে উঠে বললেন, কী হবে গো! আমার যে কেমন ভয় করছে। ওকে তাড়াও।

—ও নিজে থেকে চলে না গেলে কি তাড়ানো যায়? কোথায় যাবে?

স্ত্রী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, এত বড়ো বাড়িতে এভাবে থাকতে আমার খুব ভয় করছে। কেবলই মনে হচ্ছে খারাপ কিছু ঘটবে। কবে যে ওরা সবাই আসবে—

পরের দিন হঠাৎ আমার স্ত্রীর বাপের বাড়ি থেকে ওর এক ভাই এল। ওর মা খুব অসুস্থ। এখনি আমার স্ত্রীকে নিয়ে যাবে।

শুনে চমকে উঠলাম। ওর মা অসুস্থ বলে নয়, আমাকে একা থাকতে হবে বলে।

যাবার সময়ে স্ত্রী ব্যাকুল হয়ে বললেন, বাধ্য হয়ে যেতে হচ্ছে। তোমায় একা ফেলে যেতে কিছুতেই মন সরছে না। খুব সাবধানে থেকো। যত তাড়াতাড়ি পারি চলে আসব।

আমি মুখে হাসি টেনে বললাম, কিছু ভেবো না। আমি একজন পুলিশ অফিসার। কেউ না থাক সঙ্গে রিভলভার আছে।

বললাম বটে কিছু ভেব না। কিন্তু নিজেই কিরকম দুর্বল হয়ে গেছি।

রিভলভার? রিভলভার কি সব ক্ষেত্রে কাজ দেয়?

### গভীর রাতে পায়ের শব্দ

নোটনকে নিয়ে আমার স্ত্রী চলে যাবার পরই আমি যেন কিরকম অসহায় হয়ে পড়লাম। আমি কিছুতেই আর এ বাড়িতে টিকতে পারছি না। কেবলই মনে হচ্ছে ভয়ংকর কিছু যেন ঘটতে যাচ্ছে। একটা কথা ভেবে অবাক হলাম—কী অদ্ভুতভাবে একে একে সবাইকে চলে

যেতে হলো। ছোটো ভাই গেল, মেজো ভাই গেল, শেষ পর্যন্ত আমার স্ত্রী-পুত্রও গেল। ব্যাপারটা কি? মনে হলো কোনো অশুভ শক্তি পরিষ্কার মতলব করে একে একে সবাইকে সরিয়ে দিচ্ছে। একটি মাত্রই উদ্দেশ্য—আমাকে একা রাখা। আর তখনই আমার জীবনহানির ব্যাপারে হেরস্ব জ্যাঠার সাবধানবাণী মনে পড়ল—এক মাসের মধ্যে জীবন সংশয় হতে পারে। এই সময়টায় যেন কখনো একা না থাকি।

কথাটায় তকন গুরুত্ব দিইনি। এখন গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। ভয় পাচ্ছি।

আবার এটাও পরিষ্কার নয়—কিসের জন্যে ভয়? এখানে আপাতত একা থাকলেও পাড়া-প্রতিবেশী আছে। দু'বেলা তারা আমার খোঁজ-খবর নেয়। আমিও যাই তাদের বাড়ি। কোথাও কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। বিপদের আভাস পর্যন্ত নেই, যত ভয় শুধু আমার বাড়ির ভিতরেই। এইটুকু নিশ্চিতভাবে বুঝেছি ঐ নেপালী ছোঁড়াটাই আমার কাছে অস্বস্তির কারণ। ওর হাবভাব, চাল-চলন কেমন যেন অদ্ভুত। তার চোখ দুটো ঠিক মানুষের চোখ নয়। তার চোখের দৃষ্টিতে মরা জন্তুর চাউনি। অথচ সে বাড়ির কাজকর্ম করে, আমার ছেলের সঙ্গে খেলা করে, ঘুড়ি ওড়ায়।

তাহলে? তাকে ভয় কিসের জন্যে?

এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারি না। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি শ্রীযুক্ত বাবু সুশান্তকুমার সরকার, কলকাতার পুলিশ অফিসার—এই আমি কিন্তু এই খালি বাড়িতে টিকতে পারছি না। প্রতি মুহূর্তে এখন অকাল অপমৃত্যুর ভয় পাচ্ছি। স্পষ্ট দেখছি—দুয়ারে মৃত্যুর দূত দাঁড়িয়ে। প্রণবশটাও যদি এই সময়ে এসে পড়ত!

ওরা চলে গেছে বেলা বারোটোর সময়ে। যাবার আগে আমার স্ত্রী দু'বেলার মতো রোঁধে দিয়ে গেছে। কাজেই আজকের দিনটা চলে যাবে। কাল থেকে আমাকেই যা হোক কিছু রাখতে হবে।

ওরা চলে যাবার পর আমি সারা দুপুর ঘরে বসে রইলাম। আর লক্ষ্য রাখলাম সুন্নার দিকে। বাঁচোয়া সে একবারও আমার সামনে আসেনি। যদিও জানি সে বাড়িতেই আছে।

কেমন করে জানলাম ও বাড়িতে আছে? ঠিক বলতে পারি না। তবে ইদানিং টের পাই ও বাড়িতে থাকলে বাড়ির মধ্যে বাতাসটা কিরকম ভারী হয়ে থাকে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ও বাড়িতে থাকলে পরিষ্কার বুঝতে পারি এ বাড়ির প্রত্যেকটা ইট, কড়ি, বরগা, এমনকি কুয়োর জল পর্যন্ত থিরথির করে কাঁপে। আজ এখনও কাঁপছে। তাই বুঝতে পারছি ও বাড়িতেই আছে। কিন্তু কোথায় আছে, কী করছে জানি না।

হঠাৎ আমার দম বন্ধ হয়ে এল। মাথাটা কিরকম বিমবিম করতে লাগল। আমি সচকিত হলাম—পায়ের শব্দ পাচ্ছি...সে শব্দ কখনোই তেরো বছরের ছেলের পায়ের শব্দ নয়—যেন একটা ভারী বোঝা টেনে নিয়ে যাবার শব্দ!...বুঝলাম রাজু সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। ও এল। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে ও একবার দাঁড়াল। আমার ঘরের দিকে তাকাল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলো। আমার বুকের মধ্যে রক্ত চলকে উঠল।

ও কি আমায় দেখে হাসল? ও কি হাসতে জানে? ওকে তো কখনো হাসতে দেখিনি। ওটা কি হাসি? দাঁতের মতো কতকগুলো কী যেন ওর ঝুলে-পড়া ঠোঁটের ওপর বিক্বিক্ব করে উঠল। আমি ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

তারপরেই শুনলাম ধূপধাপ শব্দ করে ও ছাদে চলে গেল। ছাদটা ওর বড়ো প্রিয় জায়গা।

বিকেলে জোর করে একটু বেরোলাম। কতক্ষণ আর ঘরে একা চুপটি করে বসে থাকা যায়?

কোথায় যাব? কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে কী খেয়াল হলো বাড়ির পিছনের বাগানের দিকে যে সরু রাস্তাটা গেছে, সেই রাস্তায় হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

কাজটা ভালো করিনি। কেননা তখন সন্দের মুখ। অন্য কিছুই ভয় না পেলেও সাপের ভয় তো আছে। টর্চটাও আনিনি।

কিন্তু কেন এই অসময়ে এই পথে এলাম? বোধহয় মনের মধ্যে কালকের বিকেলের ঘটনাটা কৌতূহলী করে তুলেছিল। ঐ যে রাজু সুব্বা ঐ পথে যাচ্ছিল আর পাখির ঝাঁক ভয়ে চিৎকার করে ওকে তাড়া করছিল! বোধহয় ভেবেছিলাম ঐ পথে কী আছে তা দেখতে হবে।

বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছি, হঠাৎ দেখলাম একটা লোক—হ্যাঁ, লোকই—আমার সামনে সামনে হেঁটে চলেছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এই সন্কেবেলায় কে ওদিকে যাচ্ছে? একটু ঠাওর করতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ও রাজুই। ঐ যে ওর নারকেলের মতো মাথা, রৌওয়া রৌওয়া চুল।

কিন্তু রাজু হঠাৎ এত বড়ো হয়ে গেল কি করে? আমি কি তবে ভুল দেখছি? চোখ বগড়ে স্পষ্ট করে তাকালাম। হ্যাঁ, রাজুই।

আমি ওকে ডাকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু না ডেকে ওর কাছে যাবার জন্যে জোরে হাঁটতে লাগলাম। অবাক কাণ্ড—যতই জোরে এগোচ্ছি ততই ও দ্রুত সরে সরে যাচ্ছে।

একটা কুকুর আসছিল সামনে দিয়ে। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, কুকুরটা রাজুকে দেখেই কেঁউ কেঁউ শব্দে ভয়ানক চিৎকার করে ছুটে পালিয়ে গেল।

কুকুরটা অকারণে ভয় পেল কেন? রাজু তো ওর দিকে ফিরেও তাকায়নি। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম।

সন্কে সাতটা বাজতে-না-বাজতেই রাজুর ঘরে ওর খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে নিজের ঘরে ঢুকে খিল বন্ধ করে দিলাম।

রাজু তখন বাড়ি ছিল না। ও আজকাল কখন কোথায় যায় কিছুই জানায় না। ও আমাকে কেয়ারই করে না।

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসেনি। রাত নটা নাগাদ বাইরের দরজায় খিল দেবার শব্দ পেলাম। বুঝলাম শ্রীমান রাজু ফিরলেন। অমনি আমার বুকের মধ্যে কেমন করতে লাগল। এই রহস্যময় ছেলেটার সঙ্গে আমায় একা সারারাত কাটাতে হবে! আগে মনে হতো ও আমার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। এখন মনে হচ্ছে ও সবই করতে পারে। ওর ঐ হাড়-বের-করা শরীরে অমিত শক্তি। যদি চোখের ভুল না হয়ে থাকে তা হলে আজই সন্কেবেলায় আমবাগানের দিকে যেতে গিয়ে দেখেছি ওর অস্বাভাবিক লম্বা দেহটা। অস্বাভাবিক মানে—ওর বয়সী ছেলে অত লম্বা হতে পারে না। আর ও মোটেই লম্বা নয়। অথচ সে যে রাজুই তাতে সন্দেহ মাত্র ছিল না। এখন বুঝতে পারছি রাজু বলে যে ছেলেটাকে বিশ্বাস করে বাড়িতে এনেছিলাম সে অন্য ছেলেদের মতো নিতান্তই রক্তমাংসে গড়া বালকমাত্র নয়। ওর ভেতর একটা পিশাচ লুকিয়ে আছে। এখন আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছে—প্রথম দিন সন্কেবেলা আমি যখন লিখছিলাম, রাজুই তখন নিঃশব্দে পিছন থেকে এসে আলো নিভিয়ে দিয়েছিল আমায় গলা টিপে মারবার জন্যে। এমনিতে সে স্বাভাবিক। কিন্তু যখন হিংস্র হয়ে ওঠে

তখন ওর চোখের দৃষ্টি বদলে যায়। চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। সেদিন নোটন যে জ্বলন্ত চোখ দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল সম্ভবত সে চোখ রাজুরই।

এরপরই ছোটো বৌমা রাজুকে দেখেছিল ঘরের মধ্যে দু'হাত বাড়িয়ে ঢুকতে। রাজু যে আমাকে মারতেই ঢুকেছিল ছোটো বৌমা সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ।

কিন্তু কেন? কেন আমায় মারতে চায়? ও যদি সত্যিই কোনো অশুভ আত্মার দেহ হয় তাহলে ও কেন নিজে থেকেই এল আমার সঙ্গে সুদূর নেপাল থেকে এই গ্রামে? আমাকে মেরে ফেলার জন্যে? আবার সেই একই প্রশ্ন থেকে যায়—কেন? কার কাছে আমি কী অপরাধ করেছি?

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ইঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে হলো কেউ যেন দরজা ঠেলছে। আমি কান খাড়া করে রইলাম। তারপর পরিষ্কার শুনলাম কেউ যেন ভারী ভারী পায়ের শব্দ করে আমার ঘরের সামনে চলাফেরা করছে। ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তবুও মড়ার মতো পড়ে রইলাম। একটু পরে শুনলাম পায়ের শব্দটা নিচে নেমে যাচ্ছে।

তারও কিছুক্ষণ পরে শুনলাম নিচের খিড়কির দরজাটা কেউ খুলল।

দরজা কে খুলতে পরে রাজু ছাড়া? এত রাত্রে ও কোথায় বেরুচ্ছে?

এবার আমি এক লাফে উঠে পড়লাম। সাহস সঞ্চয় করলাম। মনকে বোঝালাম—এটা বিজ্ঞানের যুগ—আর আমি একজন নামকরা পুলিশ অফিসার। আমি ভয় করব অলৌকিক ব্যাপারকে? রাজু আর যাই হোক তবু তো সে রক্তমাংসে গড়া একটা বালক মাত্র! সে খায়, ঘুমোয়, আমার ছেলের সঙ্গে খেলা করে। তা হলে তাকে এত ভয় কিসের?

রিভলভারটা বালিশের তলা থেকে তুলে নিয়ে আমি দরজা খুলে বেরোলাম। লাইট জ্বালালাম না।

সিঁড়ির ঘরের সামনে এসে দেখি রাজুর ঘরের দরজা ঠেসানো। আস্তে আস্তে ঠেললাম। কাঁচ করে একটা শব্দ হলো। সেই সামান্য শব্দেই বুকেটা কেঁপে উঠল। দরজা খুলে গেল। টর্চের আলো ফেললাম। কেউ নেই।

নিচে নেমে এসে দেখলাম খিড়কির দরজা হাট করে খোলা। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম কী করি? ঠিক করলাম রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে দেখি। এই তো সোজা রাস্তা—কোথায় কতদূর ও যেতে পারে?

বেরোছিলাম—তখনই মনে হলো ও যদি বাগানের রাস্তায় গিয়ে থাকে?

না, ও রাস্তায় আমি এত রাত্রে যাব না। ঐভাবে দরজাটা ঠেসিয়ে রেখেই ওপরে উঠে এলাম। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম।

ভেবেছিলাম যতক্ষণ না ও ফেরে ততক্ষণ জেগে থাকব। কিন্তু কখন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খোয়াল ছিল না।

সকালে উঠে দেখি রাজু অন্য দিনের মতোই ঘরদোর ঝাঁট দিচ্ছে। ও আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। ভাবলাম ওকে জিজ্ঞেস করি কাল রাত্রে ও কোথায় গিয়েছিল? কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলতেও সাহস হলো না। কটা দিন যত দূরে দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

কিন্তু নিচে নেমে আসতেই চমকে উঠলাম। উঠোনের ঠিক মাঝখানে ওটা কি?

অবাক কাণ্ড! কে একটা বলিদানের হাঁড়িকাঠ পুঁতে রেখেছে।

এর মানে কি? বাড়িতে হাঁড়িকাঠ কেন? কার এত বড়ো সাহস এটা এখানে পুঁতল?

তখনই হাঁকলাম, রাজু!

রাজু এসে দাঁড়াল। ভাবলেশহীন মুখ। ওর চোখের সাদা অংশটা ড্যাভড্যাভ করে নড়ছে।

—তুই ওটা এখানে পুঁতেছিস?

—নেহি! বলে সে তখনই চলে গেল।

ওর এত দূর স্পর্ধা আমার সামনে আর দাঁড়াল না! অনুমতি না নিয়ে চলে গেল!

আমি তখনই হাঁড়িকাঠটা উপড়ে বাইরে ফেলে দিলাম।

### রাত্রে বাগানের পথে

নোটন আর নোটনের মা চলে গেছে মাত্র তিন দিন। কবে ফিরবে জানি না। যদি নোটনের দিদিমার খারাপ কিছু হয় তাহলে কবে ফিরবে কে জানে! ছোটো ভাইরা চলে গেছে এক সপ্তাহ হয়ে গেল। বিয়ে কি এখনও মেটেনি? মেজো বৌমাদের বিষয়-সম্পত্তি ভাগ হতে আর কতদিন লাগবে? আমি তো আর এভাবে একা থাকতে পারি না। অথচ আমাদের পাড়াতে প্রতিবেশীরা রয়েছে। তাদের কাছে যাই আসি। ওদের এত কাছে থেকেও আমি কী নিদারুণ আতংকের মধ্যে রয়েছি, ওরা তা ভাবতেও পারে না। ওদের কিছু বলতেও পারি না। কেননা বললে ওরা কেউ বিশ্বাস করবে না।

আমি এখন নিজের ঘরেই স্টোভ জ্বেলে যা হোক কিছু রুঁধে নিই। একা রান্নাঘরে যেতে সাহস হয় না। রাজুর খাবারটা রান্নাঘরে রেখে আসি। আমি যে ভয়ে ভয়ে আছি রাজু তা বুঝতে পারে।

এখন আবার মাঝে মাঝেই আর একটা প্রশ্ন জাগে, হাঁড়িকাঠটা পোঁতার কারণ কী? উত্তর পাই না। তখন আবার মন থেকে ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলি।

বিকলে একটু বেরোই। বড়ো রাস্তাটা ধরে হাঁটি। সন্ধ্যে হবার আগেই বাড়ি এসে ঢুকি। তখন বাইরে থাকতে ভয় করে। আবার বাড়িতে থাকতেও ভয়। বাড়িতে তো সেই মূর্তিমান আতঙ্কটি রয়েছে। সে বাড়ি থাকলেও ভয়—বাড়ি না থাকলেও ভয়। কোথায় কী মতলবে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে!

সেদিন রাত তখন সবে নটা। এরই মধ্যে পাড়া নিঝুম। আমি যৎসামান্য রাতের খাওয়া সেরে একটা বই নিয়ে শুয়ে পড়লাম। রাত দশটা নাগাদ লোডশেডিং হয়ে গেল। ব্যস্ ঘুরঘুরে অন্ধকার।

সন্ধ্যের পর থেকেই বাড়ির বাতাসটা ভারী হয়ে আছে। বাতাস ভারী হলেই নিশ্বাসের কষ্ট হয়। একটা চাপা কাশি গলা চেপে ধরে। এখন তাই হচ্ছে। বুঝলাম রাজু বাড়ি আছে। কিন্তু কোথায় আছে জানি না। কেননা সন্ধ্যে পর্যন্ত ও ওর ঘরে ছিল না। বইটা বুকুর ওপর রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ মনে হলো বারান্দার দিকের জানলাটা কেউ খোলার চেষ্টা করছে। আমি রিভলভারটা হাতের মুঠোয় নিয়ে শক্ত হয়ে শুয়ে রইলাম।

শব্দটা থেমে গেল। তারপরই নিচের দরজাটা খোলার শব্দ। আমি লাফিয়ে উঠে রাস্তার দিকে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িলাম। দেখলাম রাজু বেরোচ্ছে পা টিপে টিপে। আরও দেখলাম ও যাচ্ছে পিছনের রাস্তা দিয়ে বাগানের দিকে। তখনই আমি টর্চ আর রিভলভার নিয়ে রাস্তায় নেমে গেলাম।

আমি জানি কতবড়ো মারাত্মক ভুল করে সর্বনাশের পথে এগোছি। কিন্তু আজ আর কোনো বাধাই মানলাম না। আমার পৌরুষ অথবা নিয়তি আমাকে ঠেলে নিয়ে চলল।

বিশ হাত দূরে রাজু চলেছে। আমিও নিঃশব্দে ওর কিছু পিছু চলেছি। রাজু বাগানের ভেতর ঢুকল। আমিও ঢুকলাম। শুকনো পাতায় যাতে শব্দ না হয় তার জন্যে খুব সাবধানে পা ফেলতে লাগলাম। অন্ধকারে রাজু বার বার হারিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু আমি হুঁশিয়ার। আবার রাজুর সেই ঢাঙা চেহারা। আমার গা শিউরে উঠল। কিন্তু না, আজ আমায় একটা ফয়সালা করতেই হবে। কোথায় ও যায় দেখতেই হবে। নিজেকে ঝাঁকানি দিয়ে দেখে নিলাম—আমি ঠিক আছি।

প্রায় মিনিট দশেক এগোবার পর দেখি এক জায়গায় আলো জ্বলছে। পরে বুঝলাম আলো নয়, আগুন। অবাক হলাম। নির্জন বাগানে আগুন জ্বাল কে? ওদিকে রাজুর গতি দ্রুত হচ্ছে। মনে হচ্ছে ওকে যেন কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে কি আমাকেও কেউ টানছে?

আর একটু এগোতেই দেখলাম একজন সন্ন্যাসী ধুনি জ্বেলে এই দিকেই তাকিয়ে আছে। আমি চট করে একটা গাছের আড়ালে সরে গেলাম। চোখের সামনেই দেখলাম রাজু গিয়ে ওঁর পায়ের কাছে লম্বা হয়ে আছড়ে পড়ল। আর ঠিক তখনই ধুনির আগুনের আভাষ সন্ন্যাসীকে ভালো করে দেখতে পেলাম। চমকে উঠলাম—এ কী! এ যে কাঠমাথুর পাহাড়ের সেই তান্ত্রিক! কিন্তু—

কিন্তু কী করে সে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে পথ চিনে চিনে আমার দেশে হাজির হলো? আমার হাত-পা কিরকম অবশ হয়ে এল। বুঝলাম এখানে আর এক মুহূর্ত থাকলে আমি জ্ঞান হারাব। আর জ্ঞান হারালেই তান্ত্রিকের হাত থেকে রেহাই নেই।

আমি পায়ে পায়ে পিছোতে লাগলাম। একবার রাজুর দিকে তাকলাম। দেখি একটি কংকালসার দেহ—দেহ নয়, মৃতদেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

সে রাত্রে কি করে যে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম মনে করতে পারি না। তবু ওরই মধ্যে ইচ্ছে করেই বাইরের দরজায় খিল এঁটে দিয়েছি যাতে রাজু আর বাড়ি ঢুকতে না পারে। নিজের ঘরের দরজাতেও ভালো করে খিল দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ততক্ষণে কারেন্ট এসে গেছে।

ঘুমের ঘোরের মধ্যেই একটা কথা মনে হতে চমকে উঠে বসলাম। মেলার কদিন ঐ বাগানের মধ্যে দিয়েই লোকজন নদীর ধারে জোড়া বটতলায় পূজা দিতে গিয়েছিল। তখন বাগানে কেউ এই তান্ত্রিককে দেখেনি। সব তান্ত্রিক, সাধু সন্ন্যাসীই ছিল নদীর ধারে। সম্ভবত ইনিও ওখানে ছিলেন।

মেলা তো শেষ হয়ে গেছে বেশ কয়েকদিন হলো। সব সাধুরাই ফিরে গেছেন। ইনি যাননি কেন? কেনই বা এখন বাড়ির কাছে আমবাগানে এসে একটা আস্তানা গোড়েছেন? রাজুর সঙ্গেই বা চেনা হলো কী করে? রাজু মেলায় চুপিচুপি একা গিয়েছিল। সে কি তবে তান্ত্রিকের সঙ্গে দেখা করতে? তবে কি রাজু ঐ তান্ত্রিকেরই পাঠানো অলৌকিক জল্পাদ? আমাকে শেষ করে দেবার জন্যে অথবা আমার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে নিজেই ক্রমশ এগিয়ে আসছে আমাদের বাড়ির দিকে? রাজু শুধু ওঁকে নিশানা দিয়ে যাচ্ছে? তাহলে—তাহলে নির্জন বাড়িতে আমাকে বলি দেবার জন্যেই কি হাঁড়িকাঠ পোতা হয়েছিল?



## সিড়ির ঘরে চোর?

পরের দিন সকালে দেখলাম বাইরের দরজার খিল বন্ধই আছে। বুঝলাম রাজু ফেরেনি। অথবা বাড়ি ঢুকতে পারেনি। খানিকটা নিশ্চিত হলাম।

একটু বেলা হলে পাড়ার একটা ছেলেকে ডেকে বললাম, শুনছি একজন সাধু নাকি পিছনের বাগানের শেষের দিকে বসেছেন। একটু দেখে এসো তো। ছেলেটা তখনই যাচ্ছিল, ফের ডেকে বললাম, ওঁর কাছে যাবার দরকার নেই। দূর থেকে দেখো।

ঘণ্টাখানেক পরে ছেলেটা ফিরে এসে জানাল বাগানে কেউ নেই।

—কেউ নেই! তুমি জায়গাটা খুঁজে পেয়েছিলে তো?

ছেলেটি বলল, হ্যাঁ, পোড়া কাঠ, ছাই পড়ে আছে দেখলাম।

নিশ্চিত হলাম। যাক, আপদ বিদেয় হয়েছে। সেই সঙ্গে রাজুও।

কিন্তু সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় ছেলেটি হতুদন্ত হয়ে এসে বলল—সাধুবাবা আবার এসেছেন। ধুনি জ্বালিয়ে বসেছেন। এবার অত দূর নয়, আরও কাছে।

আমি চমকে উঠলাম। ওকে বললাম, ঠিক আছে।

ছেলেটা চলে গেলে আমি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। অদ্ভুত তো ঐ তান্ত্রিকটা। কেমন ধীরে ধীরে তিন মাইল দূরে জোড়া বটতলা থেকে আমাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। কেউ বাধা দেবার নেই। এবার তো বাড়ি এসে ঢুকবে।

তাহলে একা আমি এখন কী করব?

তখনই সাহস এনে মনকে বোঝালাম—এটা যে নেপালের নির্জন অরণ্য বা পাহাড়ের গুহা নয়, এটা যে কলকাতার কাছেই কোনো লোকালয়—একটা হাঁক দিলে দলে দলে লোক ছুটে আসবে, এটা কি তান্ত্রিক বাবাজি জানেন না? নাকি লোকবল, অস্ত্রবলের চেয়েও ওঁর কাছে আরও কোনো অব্যর্থ ভয়ংকর মারণাস্ত্র আছে যা দিয়ে আমায় শেষ করে দিতে অসুবিধে হবে না? চোখের সামনেই তো দেখলাম কী ক্ষমতায় রাজুকে অস্ত্র বানিয়ে আমার বাড়িতে পাঠিয়েছিল! রাজু কি সত্যিই রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ, না কোনো মৃতদেহ? তান্ত্রিকের পায়ের কাছে ও যখন আছড়ে পড়েছিল তখন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম ওর দেহে প্রাণ ছিল না। একটা শুধু চামড়া-ঢাকা কংকাল যেন ঝপ্ করে পড়ে গেল।

আরও সন্দেহ হচ্ছে কাঠমাণ্ডুর হোটেলের জং বাহাদুরও ঐ তান্ত্রিকের দলেরই একজন। তান্ত্রিকের সঙ্গে সেইই হয়তো যোগাযোগ করে রাজু সুব্বা নাম দিয়ে একটা জীবন্ত কংকালকে আমার সঙ্গে পাঠিয়েছিল। আর তখনই চোখের সামনে ভেসে উঠল গুহার মুখে সেই ঝুলন্ত কংকালটা। বাতাসে দুলছে।

যাক, রাজু বিদেয় হয়েছে। আজ দু'দিন ও আর আসেনি। বাগানে তান্ত্রিকের কাছেও ওকে দেখা যায়নি। দেখা গেলে পাড়ার ছেলেটা বলত।

আজ রাত্রে পাড়ার একজনদের বাড়িতে আমার নেমস্তন্ন ছিল। আমি একা থাকি বলে মাঝে মাঝে নেমস্তন্ন পাই।

রাত মাত্র আটটা।

আকাশে ঘন মেঘ থম্‌থম্‌ করছে। এখনি হয়তো বৃষ্টি নামবে।

আমি তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম।

রাস্তা ঘোর অন্ধকার। কোনোরকমে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে বাড়ি এসে তালা খুলে ঢুকলাম।

একতলার উঠোন পার হয়ে ডান দিকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। সবে অর্ধেক উঠেছি—ওপরে সিঁড়ির ঘরে যেখানে সুঝা থাকত সেখানে যেন কার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম।

অবাক হলাম। তালাবন্ধ বাড়িতে কে কিভাবে আসতে পারে? থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। চোর নয় তো? ছাদ দিয়ে উঠে এসেছে?

ইস্! রিভলভারটাও কাছে নেই। এদিকে সদর দরজাটাও ভুলে খুলে এসেছি। এখন ওপরে উঠব, না পালাব? রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কয়েক মুহূর্ত ধরে ভাবলাম। আর ঠিক তখনই সিঁড়ির ওপরে নজর পড়ল। অন্ধকারের মধ্যে দুটো জ্বলন্ত চোখ আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

আমার গায়ের প্রত্যেকটি লোম খাড়া হয়ে উঠল। ও কার চোখ?

কিছু ভেবে দেখবার আগেই দেখি চোখ দুটো নেমে আসছে। শুধু চোখ নয়, একটা ছেলের দেহ। সে দেহে এতটুকু মেদ নেই, মাংস নেই, হয়তো বা রক্তও নেই। শুধু কালো কুচকুচে চামড়া দিয়ে ঢাকা। চিনতে পারলাম নারকেলের মতো মাথাটা দেখে।

রাজু সুঝা!

তিন দিন পর কোথা থেকে রাজুর আবির্ভাব?...কিন্তু—এ কি সেই রাজু, না তার প্রেতাত্মা? দুটো সরু সরু হাত বাড়িয়ে রাজু এগিয়ে আসছে। আগে দু'বার চেষ্টা করেছিল পিছন থেকে। এবার আর চুপি-চুপি লুকিয়ে নয়, একেবারে সামনে—মুখোমুখি।

পালাতে গেলাম। কিন্তু পা দুটো থরথর করে কঁপে উঠল। আমি আর দাঁড়াতে পারছিলাম না। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে আমি সিঁড়ির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছু করার নেই।...

রাজু মুখে একরকম অদ্ভুত শব্দ করতে করতে ক্রমশ আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ওর দুটো হাত তখন আমার গলার কাছে। আমি নিজের দু'হাত দিয়ে ওর সরু সরু হাত দুটো চেপে ধরতে গেলাম—কিন্তু বরফের ছুরির মতো ওর হাত দুটো আমার হাত অবশ করে দিল। আমি শেষবারের মতো চিৎকার করে উঠলাম—বাঁচাও।

কাকে উদ্দেশ্য করে চৈচালাম তা জানি না, তবে সাড়া পেলাম তখনি।

—সুশান্ত, তুমি কোথায়, বড্ড অন্ধকার!

চমকে উঠলাম! এ যে প্রণবেশের গলা!

আমি দ্বিগুণ জোরে আবার চৈচিয়ে উঠলাম—বাঁ—চা—ও!

সঙ্গে সঙ্গে নিচে থেকে জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল সিঁড়ির ওপর।

—এ কী! সুশান্ত! তুমি এখানে দাঁড়িয়ে? কি হয়েছে?

হঠাৎ জ্বলন্ত চোখ দুটো নিভে গেল। টর্চের আলোয় রাজুকে পরিষ্কার দেখা গেল। রাজু আমাকে আর প্রণবেশকে ধাক্কা দিয়ে বিরাট এক লাফ মেরে নিচে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

## শেষ কথা

রাজু সুঝাকে নিয়ে এই অলৌকিক কাহিনিও আমার ডায়রিতে লিখে রেখেছি। তবে শেষটুকু লেখা হয়নি।

পরের দিনই সবাই ফিরে এল। সকলেই আমার এ ক’দিনের ঘটনা শুনল। ছোটো ভাইয়ের স্ত্রী বলল—আমি তখনই বুঝেছিলাম ও ছেলেটা মানুষ নয়, সাংঘাতিক কিছু। যাক, খুব বেঁচে গেছেন।

আমার স্ত্রী তখনো ভয়ে নির্বাক।

তখনও তিনদিন ছুটি বাকি ছিল। ভেবেছিলাম প্রণবশকে নিয়ে এই তিনটে দিন এখানেই কাটিয়ে যাব। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় সেই ছেলেটা এসে খবর দিল—সাধু আজও এসে বসেছে। এবার বাড়ির আরও কাছে।

শুনে সবারই মুখ শুকিয়ে গেল। এ কি আশায় শেষ না করে এখান থেকে যাবে না? সেদিনই আমার স্ত্রী সুটকেসে গুছিয়ে নিলেন। বললেন—আর নয়। কাল ভোরের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরে চলো। ওসব পাহাড়ে তান্ত্রিকদের হাত থেকে সহজে নিস্তার পাওয়া যায় না।

ভয়ে ভয়ে ভোরবেলাতেই একরকম পালিয়ে এলাম বলা চলে। যথাসময়ে ট্রেন এল। তাড়াতাড়ি সামনে যে বগি পেলাম তাতেই উঠে পড়লাম।

গার্ড হুইশল দিল। সবুজ ফ্ল্যাগ দুলে উঠল।

হঠাৎ নোটন চৈঁচিয়ে উঠল—বাবা, দ্যাখো দ্যাখো সুঝা!

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি একটা কংকাল যেন অস্বাভাবিক জোর ছুটে আসছে ট্রেন ধরার জন্যে। অন্তত পিছনের বগিতেও যদি উঠতে পারে। কিন্তু তখনই ট্রেন চলতে শুরু করে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে গেল। রাজু অল্পের জন্যে ট্রেনের নাগাল পেল না।

প্রণবশ বলল—সুঝা তোমাকে ছাড়বে না দেখাছি।

নিরাপদে কলকাতায় পৌঁছেছি। কিন্তু এখনও সুস্থির হতে পারিনি। কি জানি রাজু আবার এখানেও এসে না পড়ে!

# জীবন্ত কঙ্কাল

(অলৌকিক জন্মাদ উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব)

॥ এক ॥

### অম্বুজ লাহিড়ির আবির্ভাব

কলকাতায় এসে ঐসব ঘটনা আত্মীয়-বন্ধু কাউকেই বলিনি। কেননা বললে তারা বিশ্বাস করবে না। উল্টে ঠাট্টা-মশকরা করবে। তারা বলবে—এই বিজ্ঞানের যুগে ঐসব গাঁজাখুরি ঘটনা ঘটে নাকি?

উত্তর দিতে পারব না। তবে কিনা আমিও বিজ্ঞানের যুগের মানুষ। আর আমি কলকাতার একটি থানার দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসার। তা ছাড়া সেইসব ঘটনার একজন সাক্ষীও আছে। সে আমারই মতো কলকাতার আর একজন পুলিশ অফিসার এবং আমার বন্ধু প্রণবশ। সে তো আমার সঙ্গেই ছিল।

কলকাতায় ফিরে আমরা প্রথমে ঠিক করেছিলাম ঘটনাটা কাগজে বার করব। পুলিশ অফিসারদের অভিজ্ঞতা শুনে নিশ্চয়ই ছাপবে। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছিলাম তাতে অনেকের অনেক অবাস্তুর প্রশ্নর উত্তর দিতে হবে। তাই মুখে কুলুপ এঁটে থাকাই স্থির করেছিলাম।

শেষ পর্যন্ত প্রণবশই ঘটনাটা ফাঁস করে দিল এমন একজনের কাছে যাকে আমি চিনি না, জানি না।

প্রণবশ একদিন বিকেল বেলায় একজন বেশ ফিটফাট ভদ্রলোককে নিয়ে আমার বাসায় এসে হাজির হলো। বয়েস বছর পঞ্চাশ। নেড়া মাথা। লাল টকটকে মুখ। চোখে সোনালী ফ্রেমের হালকা চশমা। পরনে গেরুয়া আলখাল্লা। নাম অম্বুজবরণ লাহিড়ি। থাকেন সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকের কাছে রংপোতে।

একজন রীতিমতো বাঙালি, কিন্তু বহুকাল ধরে রংপোর মতো পাহাড়ী জায়গায় থাকেন শুনে প্রথমে অবাক হয়েছিলাম। তারপর যখন শুনলাম তিনি ঐখানে থেকে প্রেততত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করছেন তখন রংপোর মতো জায়গায় থাকার একটা কারণ খুঁজে পেলাম। আমরা জানি আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে থেকেও হিমালয়ের কাছেপিঠে বহু তিব্বতী লামা থাকেন যাঁরা তাঁদের বিশ্বাস আর ধর্মবুদ্ধি দিয়ে প্রেতচর্চা করেন এবং অশুভ আত্মাকে খুবই ভয় করেন। আর এই অশুভ আত্মার হাত থেকে বাঁচার জন্যে নানা পুঁথিপত্র পড়েন, মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণ করেন। বুঝতে পারলাম অম্বুজবরণ লাহিড়ি সেই কারণেই

## জীবন্ত কংকাল

রংপোর মতো জায়গায় থেকে লামাদের কাছে ঐসব বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করেন।

প্রণবেশ ফট করে আমাকে জিজ্ঞেস না করেই অম্বুজবাবুকে আমাদের অভিজ্ঞতার কথা ফাঁস করে দিয়েছে এটা জেনে আমার মোটেই ভালো লাগেনি। কেননা আমি ভেবে রেখেছিলাম—ঐসব ঘটনা নিয়ে আমিই বই লিখব। এখন যদি অম্বুজবাবু সব জেনে নিয়ে নিজেই আগেভাগে লিখে ফেলেন তাহলে আমার লেখার কোনো দাম থাকবে না।

আশ্চর্য! অম্বুজবাবু আমার মনের কথাটা কেমন করে যেন টের পেয়ে গেলেন। বললেন—সুশাস্ত্রবাবু, ঘটনাগুলো আমাকে সবিস্তারে বললে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। কেননা আমার কাজ গোপনে গবেষণা করা। বই ছাপা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার খ্যাতিরও দরকার নেই, টাকারও দরকার নেই।

তার এই কথা শুনে আমি শুধু অবাকই হইনি, লজ্জিতও হয়েছিলাম।

তাকে বসতে বলে স্ত্রীকে চা করতে বললাম। ইতিমধ্যে আমি গত জুলাই মাসে কাঠমাণ্ডুতে আর আমার দেশের বাড়িতে যা যা ঘটেছিল তা বলে গেলাম। দেখলাম তার অনেকটাই তিনি প্রণবেশের কাছে শুনেছেন।

চা আর সুজি নিয়ে আমার স্ত্রী হাসিমুখে এসে দাঁড়ালেন। প্রণবেশ আলাপ করিয়ে দিল।

অম্বুজবাবু হঠাৎ আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, দেশের বাড়িতে আপনাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটা আপনার কিরকম মনে হয়?

স্ত্রী বললেন, সাংঘাতিক। বাড়িতে কাজের জন্যে নেপাল থেকে উনি একটি দুর্ভিক্ষপীড়িতর মতো ছেলেকে নিয়ে এলেন আর সেই ছেলেই ভেঙ্কি দেখাল। আমি অবশ্য কিছুদিনের জন্যে বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম, সেই সময়ে খালি বাড়িতে নাকি নানারকম ভয়ের কাণ্ড ঘটেছিল।

ছেলেটার কি যেন নাম ছিল?

আমার স্ত্রী বললেন, রাজু সুব্বা।

আচ্ছা, তার গায়ে কখনো হাত দিয়েছিলেন?

গায়ে হাত দেওয়া মানে মারা বলছেন?

না-না, কখনো ছুঁয়েছিলেন?

ম্যাগো! যা ডিগডিগে চেহারা, ছুঁতে ঘেন্না করত। মনে হতো যেন একটা জ্যান্ত কংকাল।

## জীবন্ত কংকাল

জ্যাস্ত কংকাল! অম্বুজবাবু কথাটা নিজের মনে উচ্চারণ করলেন।

ধন্যবাদ। আপনাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই।

আমার স্ত্রী ভেতরে চলে গেলেন।

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে অম্বুজবাবু বললেন, সুশান্তবাবু, ব্যাপারটার ওপর আমার যথেষ্ট কৌতূহল আছে বলেই আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করব।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, করুন না। তবে ঐ অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা আর মনে আনতেও ইচ্ছে করে না।

অম্বুজবাবু জামার পকেট থেকে মোষের শিঙের তৈরি নসিয়ার ডিবে বার করে এক টিপ নসি নিয়ে বললেন, কাঠমাগুতে বিষ্ণুমতীর তীরে এক তান্ত্রিক একটি ছেলেকে বলি দিতে যাচ্ছিল, আপনি আর আপনার বন্ধু দুজনে মিলে ছেলেটিকে বাঁচান। বলি দিচ্ছিল ঘণ্টাকর্ণের সামনে। আপনারা কি জানতেন নেপালীদের কাছে ঘণ্টাকর্ণ কী ভয়ংকর দেবতা?

হ্যাঁ, শুনেছিলাম জুলাই-আগস্ট মাসে নেপালের পাহাড়ে পাহাড়ে অশুভ শক্তির ঘুরে বেড়ায় দানবের মূর্তি ধরে। তাদের সামনে পড়লে মানুষ, জীবজন্তু কারো রক্ষে থাকে না। তাই সেই দানব-দেবতাদের ভয়ংকর মূর্তি গড়ে তাদের পূজো দিয়ে সন্তুষ্ট করে সসম্মানে বিদেয় করা হয়।

ঠিকই জানেন দেখছি। তাহলে সেই দেবতার কাছ থেকে ছেলেটাকে বাঁচানো মানে দেবতার মুখ থেকে গ্রাস কেড়ে নেওয়া?

বিরক্ত হয়ে বললাম, ওসব আমি জানি না। দেবতার মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়াই হোক আর যাই হোক এ যুগে একটা ছেলেকে বলি দেবে তা আমরা দেখেও এড়িয়ে যাব তা হতে পারে না।

অম্বুজবাবু মৃদু হেসে বললেন, আমায় ভুল বুঝবেন না। আমি বলছি না ছেলেটাকে বাঁচিয়ে আপনারা অন্যায় করেছেন। আমি বলতে চাইছি ছেলেটাকে বাঁচাতে গিয়ে আপনারা তান্ত্রিকের কোপ-দৃষ্টিতে পড়েছিলেন। তাই কিনা?

হ্যাঁ। সে তো স্বাভাবিক। বলল প্রণবেশ।

সেই ক্রোধটা আপনাদের ওপর কিভাবে এল?

যে হোটেলে আমরা উঠেছিলাম সেই হোটেলে জং বাহাদুর নামে একটা 'বয়' ছিল। সে বলেছিল অনেক নেপালী গরিব ছেলে ইন্ডিয়ায় চলে যায় সামান্য চাকরির লোভে। আমি তখন আমাদের বাড়ির কাজের জন্যে একটি ছেলে

## জীবন্ত কংকাল

চেয়েছিলাম। জং বাহাদুর যে সত্যিই একটা ছেলে এনে দেবে ভাবতে পারিনি। কিন্তু তার কংকালসার চেহারা দেখে মনে হয়েছিল সে কোনো কাজই করতে পারবে না। একথা শুনে ছেলেটা তখনই এমন সব কাজ করতে লাগল যা দেখে আমরা তাজ্জব।

হ্যাঁ, সেসব আমি শুনেছি।

তখনও কি জানতাম মশাই, ওটা একটা শয়তানের বাচ্চা! আর জং বাহাদুরই সেই তান্ত্রিকের কাছ থেকে ওটাকে নিয়ে এসেছিল আমাদের সর্বনাশ করার জন্যে?

আচ্ছা, ছেলেটা কি কখনো হাসত? জোরে না হোক, মুচকে?

হাসি? আমার স্ত্রী বলে উঠলেন, ঐ মুখে হাসি ফুটবে? মুখ তো নয় একটুকরো লম্বা পোড়া কাঠ।

আচ্ছা, দৌড়-ঝাঁপ করার পর ওকে কখনও হাঁপাতে দেখেছেন?

না মশাই। ওকে যা মনে হয়েছে তা হচ্ছে ও যেন মাকাতার আমলের জংধরা একটা যন্ত্র।

মাকাতার আমলের জংধরা একটা যন্ত্র! অনুজবাবু নিজের মনেই কথাটা উচ্চারণ করলেন।

আচ্ছা, এর আগে আপনি বলেছিলেন ছেলেটা যেন একটা জীবন্ত কংকাল! তাই না?

আমার স্ত্রী হেসে বললেন, হ্যাঁ।

আচ্ছা, ছেলেটা নানাভাবে ভয় দেখাত না?

ভয় দেখাত কী! আমার স্ত্রী বলে উঠলেন—এক দিন সন্ধ্যাবেলায় ও তো পেছন থেকে এসে ওঁর গলা টিপে ধরতে গিয়েছিল। তারপর—

অনুজবাবু বাধা দিয়ে বললেন—হ্যাঁ, সেসব প্রণবশবাবুর কাছ থেকে শুনেছি। আচ্ছা, কাঠমাণ্ডুতে ঐ তান্ত্রিকের ওখানে একটা কংকাল ঝোলানো ছিল। তাই না?

হ্যাঁ।

কিরকম বয়েসের কংকাল?

আন্দাজ চোদ্দ-পনেরো বছর বয়েসের।

এরপর একটু চুপ করে থেকে অনুজবাবু বললেন—শেষের দিনের ব্যাপারটা একটু শুছিয়ে বলুন তো।



## জীবন্ত কংকাল

আমি সব বললাম। আমার স্ত্রী আর প্রণবেশ আমার কথার ফাঁকগুলো ধরিয়ে দিচ্ছিল।

প্রণবেশ বলল, একটা জিনিস বুঝতে পারছি না মিস্টার লাহিড়ি, ঐ কংকালটার সঙ্গে সুব্বার কি কোনো সম্পর্ক ছিল?

অম্বুজ লাহিড়ি আর এক টিপ নস্যি নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, এক সময়ে আমাদের দেশের শক্তিমান কাপালিক, তান্ত্রিকরা একের মৃতদেহের মধ্যে অন্যের আত্মা চালনা করতে পারতেন একটা বিশেষ সময়ের জন্যে। আবার এমন তথ্যও পেয়েছি, কেউ কেউ কংকালে একটা বিশেষ সময়ের জন্যে মাংস-চামড়া সৃষ্টি করে তার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতে পারতেন। এই কৃত্রিম চামড়া, মাংস কংকালটাকে কোনোরকমে ঢেকে রাখতে পারত কিন্তু শরীরের যে স্বাভাবিক রূপ, লাভণ্য তা দান করতে পারত না।

এই রকম ব্যাপার আমাদের দেশের রূপকথার কোনো কোনো গল্পে আমরা পাই। এইরকম একটা গল্প ছিল, এক ডাকিনী একটা মরা বাঘের হাড়গোড় জড়ো করে মস্ত্র পড়ে প্রথমে বাঘের পূর্ণাঙ্গ কংকাল তৈরি করল। তারপর মস্ত্র পড়ে তার ওপর মাংস, তার ওপর চামড়া বসিয়ে দিল। তারপর করল প্রাণসঞ্চার। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা ভয়ংকর রূপ ধরে উঠে দাঁড়াল।

রূপকথার গল্প হলেও এর মধ্যে মস্ত্র-তন্ত্র সাধনার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আমার ধারণা এইরকমই কাণ্ড ঘটিয়েছিল কাঠমাণ্ডুর সেই মহাশক্তিদ্বার তান্ত্রিক। সেই ঝুলনো কংকালটায় প্রাণসঞ্চার করে তাকে—ম্যাজিসিয়ান যেমন কাউকে হিপনোটাইজ করে যেখানে খুশি পাঠাতে পারে, তাকে দিয়ে যা খুশি তাই করাতে পারে, এই তান্ত্রিকও তেমনি ঐ কংকালটাকে জীবন্ত করে দূরে পাঠিয়ে তার অভীষ্ট কাজ সম্পন্ন করে। আপনাকে মারার জন্যে তাই সেই তান্ত্রিক কংকালটাকে—যার নাম দেওয়া হয়েছিল রাজু সুব্বা—পাঠিয়েছিল। কংকালের ওপর কৃত্রিম রক্ত, মাংস, চামড়া বসানো হয়েছিল বলে তার মুখটাকে আপনাদের পোড়া কাঠের মতো মনে হতো। কৃত্রিম সৃষ্টি বলেই তার মুখে হাসি ফুটত না। একই কারণে আপনার ওকে মনে হয়েছিল একটা ‘মাক্কাতার আমলের জংধরা যন্ত্র’ বলে।

অম্বুজ লাহিড়ি একটু থামলেন। তারপর চশমাটা খুলে হাতে নিয়ে বললেন, তবে এইরকম জীবন্ত কংকালের শক্তিরও সীমা থাকে। একটা দূরত্ব পর্যন্ত যেতে পারে। তারপর আর পারে না। তাই সেই তান্ত্রিককে দেখা গেছে

## জীবন্ত কংকাল

আপনাকে মারার জন্যে সুদূর নেপাল থেকে আপনাদের বাড়ির বাগান পর্যন্ত ধাওয়া করে আসতো। সে এখানে না এলে অত দূর থেকে ছেলেটাকে চালনা করা সম্ভব হতো না।

কিন্তু সুব্বা যে এতদিন আমাদের বাড়ি ছিল, তখন তো তান্ত্রিক আসেনি। নিশ্চয় এসেছিল। আপনারা জানতে পারেননি।

প্রণবেশ বলল, এই জীবন্ত কংকাল কি যেখানে খুশি, যখন খুশি যেতে পারে?

অম্বুজ লাহিড়ি মাথা নাড়লেন। বললেন, না। সবসময়ে সব জায়গায় যেতে পারে না। তা যদি পারত তা হলে তো ঐ তান্ত্রিক অমিত শক্তির অধিকারী হয়ে উঠত। কংকালটাকে দিয়ে যা খুশি তাই করতে পারত। ঈশ্বর এইখানেই নিরীহ মানুষকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

এই বলে একটু থামলেন। তারপর হেসে বললেন, আজ উঠি। কাল দার্জিলিং চলে যাব। একটু কাজ আছে। বলে উঠে পড়লেন।

আমরা ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। আমার স্ত্রী হেসে বললেন, যাক ঐ আপদটার হাত থেকে যে আমরা ঠিক সময়ে রেহাই পেয়েছি এই আমাদের ভাগ্য। যদি ট্রেনে উঠে কলকাতা পর্যন্ত ধাওয়া করে আসত তাহলে কী হতো বলুন তো!

অম্বুজ লাহিড়ি দরজার বাইরে পা রেখেছিলেন, আমার স্ত্রীর এই শেষ কথা শুনে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তিনি আমার স্ত্রীকে বোধ হয় কিছু বলার জন্যে মুখটা ফেরালেন। কিন্তু বললেন না। তবে মুখটা অস্বাভাবিক গভীর দেখাল। মনে হলো যেন দৃষ্টিস্তাপ্রস্তু।

॥ দুই ॥

চাঞ্চল্যকর খবর

দু'দিন পরে।

সকাল বেলায় প্রণবেশ এসেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছেই। আমার স্ত্রী দু' স্নাইস করে এগটোস্ট আর চা দিয়ে নিজেও বসেছে। ইন্সটন পড়ছে পাশের ঘরে।

প্রণবেশ অনেকক্ষণ ধরে অম্বুজ লাহিড়ির গুণকীর্তন করে গেল। উনিও নাকি যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন একজন সাধক। আমি অবশ্য এই প্রথম দেখে ততটা

## জীবন্ত কংকাল

মুগ্ধ হতে পারিনি। একটু যেন অহংকারী বলে মনে হয়েছিল। আর খুব সাদাসিধে নয়।

বললাম, চলে যাবার সময় হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে কিছু একটা বলতে গিয়েও না বলে অমন গভীর মুখ করে কেন গেলেন সেটাই বুঝতে পারছি না। তোমায় কিছু বলেছেন?

প্রণবেশ মাথা নাড়ল। বলল, না। অবশ্য আমারও খটকা রয়েছে। মনে হলো বৌদি ঐ যে বললেন, সুব্বা যদি ট্রেনে উঠে কলকাতা পর্যন্ত আমাদের ধাওয়া করত তাহলে কী হতো বলুন তো? যাক খুব বেঁচে গেছি।—এই কথার উত্তর দিতে গিয়েও উনি কেন চেপে গেলেন!

একথা শুনে আমার স্ত্রীর মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বললেন, সুব্বা সত্যিই এখানে এসে পড়বে না তো?

আমি জোরে হেসে বললাম, অত সহজ নয়। এটা কলকাতা শহর। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি রাস্তা কাঁপিয়ে ছুটছে। লোকের ভিড়। এটা কাঠমাথুর সেই নির্বাকব পাহাড়তলি নয়, নির্জন দেশের গ্রাম হরিদেবপুরও নয়। কেউ ওটাকে কোলে করে নিয়ে এসে হাওড়া বা শেয়ালদা স্টেশনে তুলে দিলেও সল্টলেক পর্যন্ত রাস্তা খুঁজে খুঁজে আসা সুব্বা কেন ওর প্রভু সেই তান্ত্রিকটার পক্ষেও সম্ভব নয়। তার ওপর তোমার স্বামী একজন পুলিশ অফিসার মনে রেখো। হাতের কাছে দুটো টেলিফোন। হেড কোয়ার্টারে একটা ফোন করলেই—কি বল প্রণবেশ?

প্রণবেশ আজকের কাগজটা পড়ছিল। একটু হাসল। তারপরই হঠাৎ কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, আরে! এ আবার কী? বললাম, কী? রহস্যজনক খুন?

লক্ষ্য করলাম প্রণবেশের দু'চোখ যেন বিস্ময়ে বড়ো হয়ে উঠছে।

খবরটা কি ছাই বলো না।

প্রণবেশ তার উত্তর না দিয়ে শুধু একটা খবরের দিকে আঙুল দেখিয়ে কাগজটা আমার হাতে দিল।

ছোট্ট খবরটা এইরকম, গতকাল গভীর রাত্রে চিৎপুর রোড (রবীন্দ্র সরণী) আর বিবেকানন্দ রোডের ক্রসিং-এর মুখে প্রহরারত পুলিশ এক অদ্ভুতদর্শন ছেলেকে একা একা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে দেখে তার কাছে এগিয়ে যায়। তাকে বার বার ডাকলেও সে সাড়া দেয় না। কাছে যেতেই সে অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

## জীবন্ত কংকাল

পড়তে পড়তে আমার শরীর হিম হয়ে এল। আর আমার স্ত্রী ফ্যাকাশে মুখে শুধু আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

মিনিট পাঁচেক আমাদের মুখে কোনো কথা সরল না। প্রণবেশ আর আমি নিঃশব্দে সিগারেট খেতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরে প্রণবেশ আমাকে বলল, কি মনে হয়?

বললাম, কনস্টেবলটি যদি বাড়িয়ে কিছু বলে না থাকে তা হলে নিঃসন্দেহে অদ্ভুত ঘটনা। অবশ্য আমার মনে হয় গুরুত্ব দেবার কিছু নেই যতক্ষণ না ঐ ‘অদ্ভুতদর্শন’ কথাটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে। ‘অদ্ভুতদর্শন’ বলতে পুলিশটি কী বলতে চাইছে? যদি ওটা নিছক কথার কথা হয় তাহলে nothing serious—মাথা ঘামাবার কিছু নেই। কেননা হয়তো বাইরে থেকে আসা কোনো নতুন ছেলে পথ হারিয়ে দিশেহারা হয়ে ঘুরছিল।

কিন্তু ঐ যে বারে বারে ডাকলেও সাড়া দেয়নি। কাছে যেতেই অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়—কথাগুলোর মানে কি?

বললাম, ওর মানে সোজা। সম্ভবত গ্রামের ছেলে। গভীর রাত। পথ হারিয়ে দিশেহারা হয়ে ঘুরছিল। হঠাৎ পুলিশের হাঁকড়ানি শুনে এক দৌড়ে কোনো অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। আর সাড়া দেয়নি? হয়তো ছেলেটা কালা। এছাড়া আর কি হতে পারে?

আমার স্ত্রী ভয়ানক গলায় বললেন, হ্যাঁ গো, সুঝা নয় তো?

আমি জোরে হেসে বললাম, মাথা খারাপ নাকি? সুঝা আসবে আমাদের গ্রাম থেকে এত দূরে কলকাতায় ট্রেনে চেপে?

সেই সন্ধ্যাসীটা ওকে নিয়ে ট্রেনে করে আসতে পারে তো!

তা আসতে পারে কিন্তু আশা করি সন্টলেকে এসে পৌঁছতে পারবে না। কেননা সন্ধ্যাসী ঠাকুরকে আমি ঠিকানা দিয়ে নেমস্তন্ন করে আসিনি।

আমার কথা শুনে গৃহিণী অনেকটা নিশ্চিত হলেন।

গৃহিণী নিশ্চিত হলোও প্রণবেশকে দেখে মনে হলো ও যেন তখনও কী ভাবছে।

বললাম, কী হে! কী এত ভাবছ?

ও তার উত্তর না দিয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল। তারপর ডায়াল করতে লাগল।

হ্যালো, জোড়াসাঁকো থানা? কমলেশবাবু নাকি? আমি প্রণবেশ কথা বলছি।

## জীবন্ত কংকাল

হ্যাঁ, ভালো আছি। না, খুন-খারাপির ব্যাপার কিছু নয়। অন্য একটি ব্যাপার। আজকের কাগজে একটা খবর দেখলাম—

হ্যাঁ। আমাদের জগদীশ ঘোষ ঐরকম কিছু একটা দেখেছিল। ও তো ভয়ে মরে যাচ্ছে। বলছে ভূত ছাড়া কিছু নয়।

ওর কথা বিশ্বাস করেই কাগজে খবর পাঠিয়ে দিলেন?

কী খবর ভাই? এখানে আর-সবাই ওর কথা শুনে খুব ভয় পেয়ে গেছে। ওদের ধারণা অলৌকিক কিছু। শেষে ওদেরই চাপে খবরটা বার করতে হলো। আপনার কী ধারণা?

নিজে চোখে তো দেখিনি। তবে ও যে ভাবে বর্ণনা দিচ্ছে তাতে কিছু যে একটা দেখেছে তাতে সন্দেহ নেই। এতদিন ও এত জায়গায় গভীর রাতে ডিউটি দিয়েছে, কখনও তো এরকম ভয় পায়নি। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কি বলুন।

তোমার মনে আছে কিনা জানি না বেশ কয়েক বছর আগে রেড রোডে এক পুলিশ অফিসার গভীর রাতে জিপ চালিয়ে যেতে যেতে রাস্তার মাঝখানে কিছু একটা দেখেছিলেন। সে খবর কাগজে ছাপা হয়েছিল। পুলিশের ব্যাপার বলেই ওটা আমি ফাইল করে রেখেছি। ইচ্ছে করলে একদিন দেখে যেও।

তা না হয় দেখব। আপনি একবার জগদীশকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন?

তা পারি। কিন্তু তুমি হঠাৎ এ নিয়ে এত ভাবছ কেন? তুমিও কি ঐরকম কিছু দেখেছ?

না। তা নয়। এ নিয়ে পরে কথা বলব।

প্রণবেশ ফোন ছেড়ে দিল।

বললাম, একেবারে জোড়াসাঁকোয় ফোন করে বসলে?

হ্যাঁ। যে দেখেছে সে ঠিক কী দেখেছে তা স্পষ্ট করে জানা দরকার।

মনে হচ্ছে তুমি ব্যাপারটায় খুব গুরুত্ব দিচ্ছ?

এতক্ষণে প্রণবেশ একটু হাসল।

বলল, দেখাই যাক না শ্রীমান জগদীশ কি বলে। কি জানি বাবা, আমার কিরকম ভয় করছে। বলে আমার স্ত্রী উঠে গেলেন।

জীবন্ত কংকাল

॥ তিন ॥

জগদীশের কথা

পরের দিন সকালেই জগদীশ ঘোষ এসে হাজির হলো।

আমাদের দুজনকে অ্যাটেনশান হয়ে লম্বা স্যালুট ঠুকে বেচারি বেচারি মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

ভেবেছিলাম এইরকম নিরীহ কনস্টেবলদের চেহারা যেমন হয় অর্থাৎ কালোকোলো মোটাসোটা হেঁড়ে মাথা বয়স্ক—এরও সেরকম চেহারা হবে। কিন্তু দেখলাম তা নয়, বেশ স্বাস্থ্যবান, স্মার্ট চেহারা, বয়েসও অল্প।

প্রণবেশ বলল, তুমিই তো জগদীশ ঘোষ?

ইয়েস স্যার।

বোসো। কত দিন পুলিশের চাকরি করছ?

ন' বছর পূর্ণ হয়ে পাঁচ মাস।

এখন জোড়াসাঁকোয় পোস্টেড?

ইয়েস স্যার।

এখানে কত দিন এসেছ?

দু'বছর তিন মাস।

এর আগে রাতে টহল দিয়েছ কখনো?

অনেক বার।

পরশুদিন রাতে কোথায় তোমার ডিউটি ছিল?

গণেশ টকীজের কাছে—নতুন বাজার এলাকায়।

সেদিন তুমি কিছু দেখেছিলে?

ইয়েস স্যার।

একটু গুছিয়ে বলো তো শুন।

জগদীশ একটু ভেবে নিয়ে বলল, ঐ দিন রাত্রে আমি আর রাম সিং ডিউটি দিছিলাম। রাম সিং অন্য দিকে গিয়েছিল। আমি একাই বিবেকানন্দ রোডের মুখে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সব দোকানপাট বন্ধ। লোডশেডিং কিনা জানি না, রাস্তায় আলো জ্বলছিল না। কাছেপিঠে জনপ্রাণী ছিল না। আমার কিরকম ভয় ভয় করল। অথচ বিশ্বাস করুন স্যার, এরকম নির্জন রাতে কতবার তো ডিউটি দিয়েছি, কোনোদিন ভয় পাইনি। ভয় তো একমাত্র ডাকাতদের। তা সঙ্গে বন্দুক

## জীবন্ত কংকাল

আছে, রাম সিং আছে। তবু কেন যেন ভয় পেলাম। মনে হলো খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। আমি ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক দেখছি ঠিক তখনই দেখলাম একটা তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলে তরতর করে বিবেকানন্দ রোড ধরে যাচ্ছে। সে দৌড়ছিল না, হাঁটছিল। কিন্তু এত জোর হাঁটা যেন মনে হচ্ছিল দৌড়ছিল।

প্রণবশ বাধা দিয়ে বলল, কোন দিক দিয়ে এল?

সেটা স্যার লক্ষ্য করিনি। টেরও পাইনি। তবে যখন বিবেকানন্দ রোড ধরে বিধান সরণী মানিকতলার দিকে এগোচ্ছিল তখন অনুমান করি সে স্ট্র্যান্ড রোডের দিক থেকেই আসছিল।

স্ট্র্যান্ড রোড শুনেই প্রণবশ আমার দিকে তাকাল। ও বোঝাতে চাইল বোধ হয় স্ট্র্যান্ড রোড মানেই হাওড়ার দিক থেকে।

আমি কোনো মন্তব্য করলাম না।

তারপর?

আমি স্যার, প্রথমে ভেবেছিলাম ভিথিরিদের ছেলেটোলে হবে—যারা ফুটপাথে শোয়। কিন্তু সে যেভাবে জোরে জোরে হাঁটছিল তাতে মনে হলো সে কিছু চুরি করে পালাচ্ছে। তখনই আমি হাঁক দিয়ে দাঁড়াতে বললাম। কিন্তু সে শুনল না। ফের হাঁকড়ে উঠলাম। তবু সে ফিরেও তাকাল না। তখন—  
ফের বাধা দিয়ে প্রণবশ বলল, কিরকম চেহারা ছেলেটার?

কী বলব স্যার, বললে বিশ্বাস করবেন না স্রেফ একটা নড়বড়ে কংকালের ওপর যেন চামড়া ঢাকা।

প্রণবশ আবার আমার দিকে তাকাল।

পরনে কী ছিল?

অন্ধকারে ঠিক দেখতে পাইনি। তবে মস্ত লম্বা ডিলে একটা ফতুয়া মতো। ড্রেসটাও স্যার অদ্ভুত।

বেশ তারপর?

দু'দুবার দাঁড়াতে বললাম। কিন্তু দাঁড়াল না দেখে রেগে ছুটে গেলাম ওর কাছে। বোধ হয় আমার জুতোর শব্দ পেয়ে ও একবারই শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল। স্যার, বলতে গিয়ে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে—তার দু'চোখ যেন টর্চের বাস্তের মতো জ্বলছিল। কোনো মানুষের দৃষ্টি ওরকম হতে পারে না। আর মুখ? স্রেফ একটা ছোট্ট মাথার খুলির ওপর চামড়া বসানো। গাল বলে কিছু নেই। যেন গালের মাংস কেউ চৈঁচে তুলে নিয়েছে। কপালটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

## জীবন্ত কংকাল

তারপর?

যদিও আমার হাত ভয়ে কাঁপছিল তবু আমি বন্দুক তুলে ধরে তেড়ে গেলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে ও দৌড় লাগল। সে দৌড়নো মানুষের মতো দৌড়নো নয়, বাতাসে সাঁতার কাটা। দু' মিনিটের মধ্যে সে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল।

এই পর্যন্ত বলে জগদীশ তার বক্তব্য শেষ করল।

মিনিট পাঁচেক আমরা কেউ কোনো কথা বলতে পারলাম না।

একটু পরে প্রণবেশ বলল, আর কিছু লক্ষ্য করেছিলে?

জগদীশ একটু ভেবে বলল, ও যখন দৌড়ে দৌড়ে হাঁটছিল তখন আকাশের দিকে মুখ করে যেন স্যার বাতাস শুকতে শুকতে এগোচ্ছিল।

আর কিছু?

না স্যার।

আবার যদি ঐরকম কিছু দ্যাখো আমাদের জানাবে।

নিশ্চয় জানাব স্যার। তবে আর যেন ওকে দেখতে না হয়।

প্রণবেশ মুচকে একটু হেসে বলল, ঠিক আছে জগদীশ। তুমি এখন যেতে পার।

জগদীশ আবার আমাদের স্যালুট দিয়ে চলে গেল।

জগদীশ চলে গেলে আমরা দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম।

তারপর প্রণবেশই প্রথম কথা বলল, কী বুঝলে?

রহস্যময়।

যতই রহস্যময় হোক উনি যে রাজু সুব্বাই-সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই।

কিন্তু ও কী করে কলকাতায় আসবে?

প্রণবেশ হেসে বলল, যেমন করে সুদূর নেপাল থেকে তোমাদের দেশের বাড়ি হরিদেবপুরে এসেছিল।

এখানে আসার উদ্দেশ্য কি?

তাও বুঝতে পারছ না? যে কাজটা ও শেষ করবার আগেই কলকাতায় পালিয়ে এসেছিলে, সেই কাজটি শেষ করার জন্যে।

অর্থাৎ আমাকে মারবার জন্যে?

সে তো আমার চেয়ে তুমিই ভালো করে জানো।

কিন্তু রাস্তা খুঁজে খুঁজে এই সল্টলেকে এসে আমায় মারতে পারবে? একটা রোগা-পটকা কংকালের এতখানি ক্ষমতা? না প্রণবেশ, আমি কিছুতেই বিশ্বাস



## জীবন্ত কংকাল

করতে পারব না জগদীশ যাকে দেখেছিল সে সুব্বাই। অনেক কিছু ও বাড়িয়ে বলেছে। আসলে ও একটা রাস্তার ভিথিরির ছেলে ছাড়া আর কিছু নয়।

তাই যদি হয় তাহলে মঙ্গল। ঠিক আছে, এখন আমাদের চোখ রাখতে হবে খবরের কাগজে। গভীর রাতে আর কেউ ওকে অন্য কোথাও দেখতে পায় কিনা।

## ॥ চার ॥

### আবার জবর খবর

প্রায় প্রত্যেক দিন ভোরে বেড়ানো আমার অভ্যাস। বিশেষ করে এই সল্টলেকের ফাঁকা এ. জে. এলাকায় বেড়িয়ে খুব আনন্দ পাই।

আমি পুলিশে কাজ করলেও মনটা কবিত্বপূর্ণ। খোলা মাঠ, নীল আকাশ, ঘন মেঘ, ফুলের বাগান আমার খুবই প্রিয়।

যদিও বাসাটা আমার নিজের নয় তবুও আমার স্ত্রী বাড়ির সামনে সামান্য একটু জায়গা ঘিরে ছোট্ট একটি বাগান করেছেন। আর আমি ছাদের কার্নিসে সার দিয়ে সাজিয়ে রেখেছি নানা জাতের বাহারি ফুলের টব। যেমন—জারবেরা, বোগেনভেলিয়া, ফার্ন, প্রাউন্ড অর্কিড—যার ছোটো ছোটো ভায়োলেট রঙের ফুল।

প্রতিদিন মর্নিং ওয়াক সেরে বাড়ি ঢোকার মুখে একবার করে আলসের ওপর রাখা সার সার টবগুলোকে দেখি। ভারি ভালো লাগে।

ফেরার পথে এক প্রতিবেশী বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় গল্প করতে করতে দেরি হয়ে গেল। তবু বাড়ির গেটে এসে অভ্যাসমতো আলসের দিকে তাকলাম। দেখি একটা টব লাইন ছেড়ে যেন সামনের দিকে সরে এসেছে। একটু অবাক হলাম। ভারী টবটা সরে এল কি করে? এর মধ্যে ঝড়বৃষ্টিও হয়নি যে ঝড়ের ধাক্কায় নড়েচড়ে যাবে।

যাই হোক ঐ সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বাড়িতে ঢুকলাম। ঢুকেই অবাক—এই সাত সকালে প্রণবেশ এসে হাজির হয়েছে।

প্রণবেশ আমার সত্যিকার বন্ধু। আগে দেখাসাক্ষাৎ কম হতো। আমরা যে যার কাজ নিয়ে হিমশিম খাই। অন্য চাকুরেবাবুদের চেয়ে পুলিশ চাকুরেদের অনেক হ্যাপা। কিন্তু জুলাই মাসে দুজনেই এক মাসের ছুটি নিয়ে নেপাল বেড়াতে যাবার পর—আর ঐ রাজু সুব্বার হাস্যমাকে কেন্দ্র করে এখন

## জীবন্ত কংকাল

আমাদের সম্পর্ক আরও নিকট হয়েছে। অফ-ডে থাকলে ও প্রায়ই সকালে আমার এখানে চলে আসে। আমিও মাঝে মাঝে ওর বাসায় যাই। কিন্তু এত সকালে ও কখনও আসে না।

কী হে! ঘুম থেকে উঠেই চলে এসেছ দেখছি! হেসে বন্ধুকে স্বাগত জানাই।

• কিন্তু প্রণবেশ হাসল না। বেশ আদেশের সুরেই বলল, চুপটি করে এখানে বোসো। কথা আছে। তারপর আমার স্ত্রীকে বলল, বৌদি, এবার আমাদের চা দিন।

আমি মজা করে বন্ধুর অনুমতি নিয়ে বাইরের প্যান্ট-জামা ছাড়তে কয়েক মিনিটের জন্যে ভেতরে চলে গেলাম। পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি পরে, মুখ ধুয়ে যখন বাইরের ঘরে এসে বসলাম তখন দেখি গৃহিণী টোস্ট আর চা নিয়ে হাজির।

সবেমাত্র টোস্টে আরাম করে কামড় দিয়েছি অমনি প্রণবেশ ওর ব্রিফকেস থেকে সেদিনের কাগজখানা বের করে মাঝের পাতায় একটা খবরে দাগ দিয়ে গভীর মুখে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

কাগজটা নিয়ে ঝুঁকে পড়লাম খবরটার দিকে। খবরটা এইরকম—

## জীবন্ত কংকালের পুনরাবির্ভাব

গতকাল রাত দুটোর সময়ে দুজন সাংবাদিক খবরের কাগজের অফিসের ডিউটি সেরে গাড়িতে বাড়ি ফিরছিলেন। নিঝুম রাত। জনশূন্য রাজপথ। শেয়ালদা ফ্লাইওভারের কাছে আসতেই তাঁদের চোখে পড়ে একটো তেরো-চোদ্দ বছরের কংকালসার ছেলে আকাশের দিকে মুখ করে বেলেঘাটা মেন রোডের দিকে জোরে হেঁটে চলেছে। সে হাঁটা সাধারণ মানুষের হাঁটার মতো নয়—যেন শূন্যে পা ফেলে দৌড়নো। গায়ে ছিল কালো রঙের হাঁটু পর্যন্ত লম্বা একটা ফতুয়া। তার মাথাটা ছোটো। নারকেলের মতো। খাড়া খাড়া পাতলা চুল। কৌতূহলী সাংবাদিকরা তখনই সোজা না গিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে বেলেঘাটা মেন রোডের দিকে চালান। গাড়ি যতই ছেলেটার কাছাকাছি হচ্ছিল, আশ্চর্যজনকভাবে ছেলেটা ততই দূরে সরে যাচ্ছিল। তারপরই ছেলেটা অন্ধকারে যেন মিলিয়ে গেল। ইতিমধ্যে তাঁরা ফ্ল্যাশে ছেলেটার অনেকগুলো ছবি তুলেছিলেন। কিন্তু অবাক কাণ্ড—একটা ছবিও ওঠেনি।....

খবরটা পড়ে আমার সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল। বুঝতে বাকি রইল না ঐ ‘জীবন্ত কংকালটি’ আর কেউ নয়—নেপালের সেই রাজু সুব্বাই, যে

## জীবন্ত কংকাল

আমার দেশের বাড়িতে বার বার আমাকে মারবার চেষ্টা করেছিল। এখন সে আমাকে মারবার জন্যেই কলকাতায় এসে পড়েছে।

এখন বুঝতে পারছ কী সাংঘাতিক বিপদ এগিয়ে আসছে? প্রণবেশ আমার ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে বলল।

আমার বেশি কথা বলার শক্তি ছিল না। শুধু মাথা দুলিয়ে সায় দিলাম।  
কিন্তু—

প্রায় ধমক দিয়ে প্রণবেশ বলল, এখনও ‘কিন্তু’? এখনও সন্দেহ আছে নাকি?

আমি কোনোরকমে জুড়নো চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, সে কথা বলছি না। বলতে চাইছি—যে হাওড়ার দিক থেকে স্ট্রান্ড রোড, পোস্টা হয়ে চিৎপুর ক্রস করে বিবেকানন্দ রোড ধরে এগোচ্ছিল, সে হঠাৎ শেয়ালদা ফ্লাইওভারের কাছে এল কেন?

প্রণবেশ বলল, আমার ধারণা ও সল্টলেকে পৌঁছুবার ঠিক পথটা ধরতে পারছে না। একটা জিনিস লক্ষ্য করো, জগদীশ ঘোষও বলেছিল আকাশের দিকে মুখ করে ছুটছিল। তার মানে কি? নিশ্চয় আকাশের শোভা দেখতে দেখতে যাচ্ছিল না।

আমি বললাম, তা অবশ্যই নয়।

তাহলে?

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, বুঝতে পারছি না।

প্রণবেশ বলল, আমার ধারণা ও বাতাসে তোমার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে যাচ্ছিল।

কিন্তু দেশের বাড়িতে তো ও বেশ কিছুদিন ছিল। কই তখন তো ওরকম করে চলেনি?

প্রণবেশ বলল, ভুলে যাচ্ছ বন্ধু, তখন তোমায় খোঁজার দরকার হয়নি। তুমি ছিলে ওর নাগালের মধ্যে।

আমি চুপ করে রইলাম। ভাবছিলাম প্রণবেশের কথা যদি ঠিক হয় তাহলে আমরা কি সত্যিই কলকাতা শহরে আছি, না কোনো অলৌকিক জগতের বাসিন্দা হয়ে গেছি?

প্রণবেশ স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে বলল, হাওড়ার দিক থেকে সল্টলেকে আসার অনেকগুলো পথ আছে। তার মধ্যে বিবেকানন্দ রোড, মানিকতলা হয়ে ভি.

## জীবন্ত কংকাল

আই. পি. রোড ধরেও যেমন আসা যায় তেমনি শেয়ালদা উড়ালপালের ফ্রসিং থেকে শেয়ালদার পাশ দিয়ে বেলেঘাটা রোড দিয়ে ভি. আই. পি. রোড ধরেও আসা যায়। মনে করে দ্যাখো এই ক'দিনের মধ্যে তুমি নিশ্চয় ঐ দুটো পথ দিয়েই যাতায়াত করেছ।

বললাম, তা করেছি। অনেক বারই করেছি।

বাস্। তা হলে তো অংক মিলেই গেল।

আমি খানিকটা হতাশার সুরে বললাম, এ কথাটাই তাহলে তুমি আমায় বোঝাতে চাচ্ছ—সেই তাত্ত্বিক আমাকে এখনও ছাড়েনি। রাজু সুব্বাকে লেলিয়ে দিয়েছে কলকাতাতেও। সে পথ না চিনলেও শিকারী কুকুরের মতো বাতাসে আমার যেটুকু গন্ধ এখনও মিশে আছে তাই শূঁকতে শূঁকতে এগিয়ে আসছে।

প্রণবেশ গম্ভীরভাবে বলল, হ্যাঁ।

আমি অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরালাম।

কিন্তু—একটা কথা—

বলো।

হরদেবপুর থেকে ও কলকাতায় এল কি করে? ট্রেনে?

প্রণবেশ হেসে বলল, ট্রেনে যদি আসতে পারতো তাহলে সেদিনই ছুটে এসে ট্রেনে উঠে পড়তো। তোমার মনে আছে কি অম্বুজ লাহিড়ি একটা কথা বলেছিলেন, আমরা যাদের অলৌকিক জীব বা ভূতজাতীয় কিছু বলি তারা অনেক কিছু করতে পারলেও সব কাজ তারা করতে পারে না বা সব জায়গায় তারা যেতে পারে না। কিছু বাধা থাকেই। এটাই রক্ষে। তাই অন্তত ট্রেনে, বাসে, ট্যাক্সিতে সাধারণ মানুষের মতো এরা উঠতে পারে না। এরা পথ ধরেই আসে। অবশ্যই সে পথ নির্জন হওয়া চাই। আর চাই অন্ধকার রাত।

এইখানে আমার একটা পয়েন্ট জানার আছে।

প্রণবেশ বলল, কি তোমার পয়েন্ট বলো।

শুধু রাত্রেই যদি ও হেঁটে আসে তা হলে দিনে কোথায় থাকে?

প্রণবেশ চমকে উঠে বলল, দারুণ পয়েন্টটা তো তুমি তুলেছ! এটা তো আমার মাথায় আসেনি।

বললাম, বুঝতেই পারছি একটা অদ্ভুত ধরনের বিপদ এসে পড়েছে। এখন দেখতে হবে সুব্বা দিনের বেলায় কোথায় থাকে। নিশ্চয় ভি. আই. পি. রোড দিয়ে বেলেঘাটা মেন রোডে ভালো করে খুঁজলে তার সন্ধান পেয়ে যাব।

## জীবন্ত কংকাল

কার্জেই চলো এখনি আমরা জিপটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

প্রণবেশ বলল, খুব ভালো কথা বলেছ। কিন্তু তার আগে আমাদের একটা কাজ করতে হবে। লোকে গাঁজাখুরি ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেবে এই ভয়ে এখন আর মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকলে চলবে না। দু'দিন কাগজে তো খবর বেরিয়েই গেছে। এবার সব থানায় পুলিশদের হুঁশিয়ার করে দিতে হবে। সব আগে লালবাজারকে জানাতে হবে। আর যে কাগজে এই খবরগুলো ছাপা হয়েছে তাদের কাছ থেকে জানতে হবে লোকে খবরটা পড়ে কিছু বলছে কিনা। অর্থাৎ সারা কলকাতা শহরে একটা হৈচৈ তুলতে হবে। আর সেটা করতে হবে আজ দুপুরের মধ্যেই। কেননা আর সময় নেই। এই বলে প্রণবেশ উঠে পড়ল।

বললাম, কখন আসছ তাহলে?

প্রণবেশ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, বেলা একটায়।

ঠিক আছে। আমি রেডি হয়ে থাকব।

প্রণবেশকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসছি, ছাদের কর্নিসের দিকে লক্ষ্য পড়ল। চমকে উঠলাম—সেই টবটা লাইন থেকে আরও খানিকটা বেরিয়ে এসেছে।

## ॥ পাঁচ ॥

### জীবন্ত কংকালের সন্ধান

কাঁটায় কাঁটায় বেলা একটার সময়ে প্রণবেশ জিপ নিয়ে হাজির হলো। আমিও রেডি হয়ে ছিলাম। বেরোতে যাচ্ছি, প্রণবেশ বলল, দাঁড়াও একটা ফোন করে নিই।

বলে যে দুটো কাগজে দু'দিন খবরটা বেরিয়েছিল তার একটাতে ফোন করল। রিং হতেই প্রণবেশ নিউজ এডিটার পরিতোষ শীলকে চাইল।

পরিতোষ প্রণবেশের অনেক দিনের চেনা। প্রণবেশের গলা পেয়ে পরিতোষ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

কি খবর ও. সি. সাহেব? হঠাৎ খবরের কাগজে হামলা? বেয়াড়া কোনো খবর ছেপেছি নাকি?

ঠিক ধরেছ। হেসে বলল প্রণবেশ, আজকাল গাঁজায় দম দিয়ে খবর ছাপছ নাকি?

## জীবন্ত কংকাল

না, এখনও গাঁজার তেমন আমদানি হয়নি। তবে শীগগির হবে।  
কিরকম?

সামনের সপ্তাহে বারাণসীতে কি এক মহাযোগে পুণ্যস্থান আছে। দলে দলে সাধু-সন্ন্যাসী আসতে শুরু করবে। আর তখনই তাঁদের গাঁজার ধোঁওয়ায় সারা কলকাতা অন্ধকার হয়ে যাবে।

পরিতোষের রসিকতায় গুরুত্ব না দিয়ে প্রণবেশ বলল, দু'দিন ধরে হঠাৎ এসব ভুতুড়ে ব্যাপার ছাপতে আরম্ভ করলে কেন? বেশি কাগজ বিক্রির লোভে?

ভুতুড়ে ব্যাপার! ও জীবন্ত কংকালের কথা বলছ তো?  
হ্যাঁ।

কি জানি যে খবর আমরা পেয়েছি তা শুধু অবিশ্বাস্য নয়, অকল্পনীয়। আমাদের স্টাফ রিপোর্টার নিজে চোখে দেখেছে। তাও একজন নয় দুজন। আর অবাক কাণ্ড—এতগুলো ছবি তুলল কিন্তু একটা ছবিও উঠল না।

প্রণবেশ হেসে বলল, কেন বলো তো?

পরিতোষ চাপা গলায় বলল, স্টাফ রিপোর্টারদের মতে চামড়া ঢাকা কংকলটার নাকি শরীর বলে কিছু ছিল না। নইলে একটি ছবিও উঠত না?

প্রণবেশ বলল, তা খবরটা দেখে পাবলিক কি বলছে?

উঃ! আর বোলো না। টেলিফোনের পর টেলিফোন আসছে ঘটনাটা কতখানি সত্যি তা জানতে।

উত্তর কী দিচ্ছ?

বলছি প্রত্যক্ষদর্শীরা যা দেখেছে তাই খবর করে দিয়েছি। ওরা জানতে চায় জীবন্ত কংকালটা কোন দিকে যাচ্ছে। সেটা আর আমি কি করে বলব বলো। আমার সঙ্গে তো কংকালটার কথাবার্তা হয়নি। চোখে দেখারও সুযোগ হয়নি।

কোথায় যাচ্ছে সে খবরটা হয়তো তোমাকে দিতে পারব।

অ্যাঁ! বল কী! ঠাট্টা করছ না তো?

না। ঠাট্টা করলে তোমায় ফোন করে প্রসঙ্গটা তুলতে যাব কেন? দিন দুই অপেক্ষা করো। চমকে ওঠার মতো খবরটা তোমাকেই আগে দেব।

বলে প্রণবেশ রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

কী ব্যাপার? হঠাৎ খবরের কাগজে ফোন?

## জীবন্ত কংকাল

জেনে নিলাম কলকাতার মানুষ খবরটা জেনেছে। এটাই চাইছিলাম।

প্রণবেশ আর আমি জিপ নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। প্রথমে লালবাজার। সেখানে পুলিশের বড়োকর্তারা আমাদের মুখে নেপাল থেকে হরদেবপুর পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা শুনে অবাক। তাঁরা কখনোই এ সব ঘটনা বিশ্বাস করতেন না। গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু যেহেতু আমরা দুজনেই পুলিশে গুরুত্বপূর্ণ পদে আছি, যেহেতু আমরা দুজনেই প্রত্যক্ষদর্শী আর দু'দিন দু'দুটো নামী কাগজে তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীর খবর ছাপা হয়েছে সেজন্যে তাঁরা ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে পারলেন না। এটা যে সত্যিসত্যিই ভৌতিক বা অলৌকিক ব্যাপার তা পুরোপুরি না মানলেও জীবন্ত কংকালটাকে খুঁজে বের করবেনই সে আশ্বাস দিলেন। এবং আমাদের সামনেই কলকাতার সমস্ত থানাকে—বিশেষ করে বেলেঘাটা আর উষ্টোডিসি থানাকে জানিয়ে দিলেন রাস্তায় সতর্ক দৃষ্টিতে যেন লক্ষ্য করা হয় ঐরকম কংকাল জাতীয় কিছু দেখতে পাওয়া যায় কিনা।

আমরা দুজনেই খুশি হলাম। অলৌকিক হোক বা না হোক দায়িত্বটা এখন শুধু আমাদের দুজনের রইল না। পুলিশ টেক-আপ করেছে। কাজেই আমরা অনেকটা নিশ্চিত।

এছাড়া পাবলিকও কাগজ-মারফৎ জেনে গেছে ব্যাপারটা। কাজেই কোথাও যদি জীবন্ত কংকালটাকে কেউ দেখতে পায় তাহলে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা জনসাধারণই নেবে কিংবা থানায় জানিয়ে দেবে। আমাদের আর ভাবতে হবে না।

পাবলিক যে এই ব্যাপার নিয়ে কতটা মেতে উঠেছে, বেলেঘাটা মেন রোডে ঢুকতেই তা বুঝতে পারলাম।

যদিও তখন বেলা প্রায় তিনটে—রাস্তায় লোকজন কম তবু দু'ধারের ফুটপাথে লোকের জটলা। বোঝা গেল আজকের কাগজেই খবরটা পড়ে তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। একজন বলছে, সব গাঁজা। খবরের কাগজগুলো পর্যন্ত আজগুবি খবর ছড়াচ্ছে।

আর একজন প্রতিবাদ করে বলছে, এর আগেও অন্য কাগজে ঐরকম খবর বেরিয়েছে। বাজে কথা হলে দু'দুটো বড়ো কাগজে ঐরকম খবর ছাপা হয়?

আমরা জিপটা থামিয়ে নেমে পড়লাম।

পুলিশ দেখে ওদের কথাবার্তা থেমে গেল। প্রণবেশ এগিয়ে গিয়ে বলল,

## জীবন্ত কংকাল

আপনারা যা নিয়ে আলোচনা করছেন, আমরাও সে বিষয়ে খোঁজ নিতে বেরিয়েছি। লালবাজার সমস্ত থানাকে জানিয়ে দিয়েছে রাতে হোক দিনে হোক এইরকম কাউকে দেখলে তখনই যেন ধরবার চেষ্টা করে।

পুলিশের মুখ থেকে এই কথা শুনে ওরা খুব উৎসাহ পেল। বলল, আমরা স্যার, ঠিক করেছি রাতের বেলা রাস্তায় রাস্তায় পাহারা দেব।

ইতিমধ্যে পুলিশ দেখে আরও লোক জড়ো হয়ে গেছে।

প্রণবেশ বলল, একটা জিনিস মনে রাখবেন—ঐ যার কথা বলা হচ্ছে সে আপনাদের বেলেঘাটায় থাকতে আসেনি। আমরা জেনেছি তার লক্ষ্য সল্টলেক। বেলেঘাটা রোড ধরে ভি. আই. পি. রোডের দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু গভীর রাত ছাড়া সে এগোতে পারে না। কাল রাতে এই রাস্তা দিয়ে পাস করেছে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, আমরা দুটো মোটরবাইক নিয়ে ভি. আই. পি. রোডটা দেখে আসতে পারি।

বললাম, সে তো আমরাও জিপে করে যেতে পারি। তা নয়। দিনের বেলায় সে এগোয় না। কাজেই এখন এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে।

এ কথা শুনে সবাই যেন চনমন করে উঠল।

তা হলে স্যার, আমরা খুঁজতে বেরিয়ে পড়ি?

এমন সময় ভিড়ের ভেতর থেকে একটা অল্পবয়সী ছেলে বলে উঠল, একটু আগে একজনকে একটা ভাঙা পুরনো বাড়ির কার্নিসের ওপর শুয়ে থাকতে দেখেছি।

প্রণবেশ চমকে উঠে বলল, কিরকম দেখতে?

ছেলেটা বলল, ভালো করে দেখতে পাইনি। শুধু দুটো সরু সরু কালো পা দেখতে পেয়েছি। ভাবলাম নিশ্চয় কোনো পাগল।

প্রণবেশ ব্যস্ত হয়ে বলল, কতক্ষণ আগে দেখেছ?

আধঘণ্টা আগে।

জায়গাটা কোথায়?

আর একটু আগে। শেতলা মন্দিরের কাছে।

তুমি আমাদের সঙ্গে জিপে উঠে এসো।

ছেলেটাকে জিপে তুলে নিয়ে আমরা শেতলা মন্দিরের দিকে চললাম। আর একদল ছেলে-ছোকরা লাঠি, টাঙ্গি হাতে নিয়ে হৈ হৈ করে আমাদের পিছনে ছুটে আসতে লাগল।



## জীবন্ত কংকাল

শেতলাতলা ওখান থেকে বেশি দূরে নয়। আলোছায়া সিনেমা হলের কাছেই। তার একটু দূরেই ভি. আই. পি. রোড চলে গেছে উল্টোডিক্কা। আর বাইপাস পার হলেই সল্টলেক। ইস্টার্ন বাইপাসকে ডান দিকে ফেলে যে রাস্তাটা সেটাই হলো সল্টলেকে ঢোকান প্রধান পথ।

ছেলেটা বললে, এইখানে—সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামলাম। জায়গাটা আলোছায়া সিনেমা হল আর শেতলাতলার মাঝখানে। এখানে মেন রোড থেকে বাঁ দিকে একটা রাস্তা চলে গেছে। আর সেই রাস্তার সামনেই একটা বিরাট তিনতলা বাড়ির জীর্ণ কংকাল দাঁড়িয়ে। ছেলেটার পিছু পিছু আমরা এগিয়ে চললাম। ছেলেটা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। ভাঙা পাঁচিলঘেরা কম্পাউন্ডের মধ্যে বাড়িটা। একতলার জানলা-দরজা সব উধাও। দোতলার বিবর্ণ জানলা যে কটা সামনে থেকে দেখা গেল সবই বন্ধ। তিনতলার ওপর বিরাট লম্বা ছাদ। ছাদের আলসেতে ছোটো ছোটো গাছ, ঘাস গজিয়েছে। বাড়ির পিছনে মস্ত একটা বটগাছ। বোঝা যায় বাড়িটার সামনে-পিছনে যতই আধুনিকতার প্রলেপ দেওয়া হোক না কেন জায়গাটা আসলে খুবই পুরনো।

ছেলেটার সাহস আছে বলতে হবে। কিংবা জীবন্ত কংকাল সম্বন্ধে কোনো খবর রাখে না। সে জানে শুধু একটি পাগলই বোধ হয় ঐ পাঁচিলের ওপর শুয়ে আছে। পাগল না হলে কেউ সরু পাঁচিলের ওপর শুতে পারে?

ছেলেটা দিব্যি কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকে পড়ে ছাদের দিকে তাকাল। তারপর হতাশ হয়ে বলল, নাঃ, নেই। চলে গেছে। একটু আগেও ছিল।

চলে গেছে? প্রণবেশ যেন চুপসে গেল।

ছেলেটা বলল, তাই তো মনে হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি না। তবে কাছেই কোথাও আছে—নিশ্চয় আছে। একটা চিমসে গন্ধ পাচ্ছেন না? গন্ধটা আমি তখনও পেয়েছিলাম।

সত্যিই একটা চিমসে গন্ধ গলিতে ঢোকান পর থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল।

প্রণবেশ বলল, ছাদে ওঠা যাবে না?

ছেলেটা মাথা দুলিয়ে বলল, যাবে।

তবে চলো।

এই সময়ে পেছনে যারা লাঠিসোটা নিয়ে আসছিল তারা হুঁসা করতে করতে এসে পড়ল। সত্যি কথা বলতে কি বাড়িটার ভেতরে ঢুকতে অন্তত আমার খুব ভয় করছিল। এখন এত লোক দেখে সাহস হলো।

## জীবন্ত কংকাল

পেছনের লোকগুলো চেষ্টা করে উঠল, আমরাও ওপরে উঠব।

আমরা ওদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে সব মাত্র ভেতরের দিকে পা বাড়িয়েছি এমন সময় তেতলার ছাদ থেকে কি যেন লাফিয়ে পড়ল বটগাছের ওপর।

এক মুহূর্তের জন্যেই দেখতে পেয়েছিলাম বস্তুটাকে। কোনো কিশোরও নয়, জীবন্ত কংকাল নয়, শুধু লম্বা কালো মতো একটা কিছু—যা মানুষ নয়, বাঁদর বা অন্য কোনো জীবের সঙ্গেও কিছু মাত্র সাদৃশ্য নেই। সেই বস্তুটা গাছের ওপর লাফিয়ে পড়া মাত্র—সমস্ত গাছটা ঝাঁকানি খেল। কতখানি ভারী বস্তুর ধাক্কা খেলে অত বড়ো গাছটা অমন নড়ে উঠতে পারে ভেবে অবাক হলাম। তবু কী বিশ্বাস করতেই হবে বস্তুটা আমাদের সেই চেনা তেরো-চোদ্দ বছরের রাজু সুব্বারই জীবন্ত কংকাল? অসম্ভব।

এদিকে বস্তুটাকে যারা গাছে লাফ দিতে দেখেছে তারা হৈ হৈ করে বটগাছের নিচে ছুটে গেল। কিন্তু ঝাড়া এক ঘণ্টা ধরে সবাই মিলে খুঁজেও তাকে পাওয়া গেল না—চোখের দেখাও নয়।

॥ ছয় ॥

## দুর্ভেদ্য দুর্গ

বাড়িতে ভয়ের একটা কালো পর্দা নেমে এসেছে। নোটনের মা সব শুনেছেন। তিনি শুধুই বলেন, কি হবে গো? রাজু শেষ পর্যন্ত কলকাতাতেও ধাওয়া করে এল? তাহলে কি আমাদের বাড়িও খুঁজে পাবে?

এর উত্তর আমি আর কি দেব? যে ভি. আই. পি. রোড পর্যন্ত আসতে পেরেছে সে যে এখানেও আসবে না তা কি করে বলি? তাই চুপ করে থাকি।

মনে মনে এও বুঝেছি, যে আসছে সে এখন আর আমাদের আগের রাজু সুব্বা নয়, যেন অন্য কেউ—আরও হিংস্র—আরও ভয়ানক।

সকালবেলাতেই প্রণবেশ চলে এসেছে আমাদের বাড়ি। লক্ষ্য করছি ক্রমশই দুর্ভাবনায় ওর মুখের ভাব বদলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আমার চেয়ে যেন ওরই ভয় বেশি। ওই যেন আমাকে বাঁচাবার সব দায়িত্ব নিয়েছে। আর আমি? আমি যে কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না। বন্ধুর ওপরই সব ছেড়ে দিয়ে বসে আছি।

প্রণবেশ সকালে এসেই দার্জিলিঙে অম্বুজ লাহিড়িকে ফোন করেছিল। উনি

## জীবন্ত কংকাল

এখন দার্জিলিঙে রয়েছেন। কিন্তু উনি কোথায় বেরিয়েছেন। ঘণ্টাখানেক পরে আবার ফোন করা হবে।

অম্বুজবাবুকে যে এই পরিস্থিতিটা এখনই জানানো উচিত এটাও আমার মাথায় আসেনি। আমি পুলিশ অফিসার। তাই বোধ হয় ভেবে নিয়েছি, লালবাজার যখন দায়িত্ব নিয়েছে তখন আর ভাবনা নেই। ওরাই আমাকে বাঁচাবে। একটা অতি সত্য ব্যাপার যেন বুঝেও বুঝছি না যে, এটা খুনে ডাকাতির ব্যাপার নয় যে পুলিশ ব্যবস্থা করবে। এ যে কী বিস্ময়কর ব্যাপার তা তো কালকেই স্বচক্ষে দেখলাম। ভাঙা বাড়ির তিনতলার পাঁচিলে শুয়ে থাকতে না দেখলেও ছাদ থেকে বটগাছে লাফিয়ে পড়তে যাকে দেখলাম সে কী আমাদের গ্রামের বাড়ির সেই রাজু সুব্বাই! রাজুও ছাদের পাঁচিলের ওপর দিয়ে হাঁটত। ছাদ থেকে লাফ দিয়ে আমগাছের ডাল ধরে ঝুলত ঠিকই কিন্তু সে যেন আমার ছেলে নোটনেরই বন্ধু। কিন্তু কাল যাকে মুহূর্তের জন্যে দেখলাম? তার তো মানুষের আকৃতিও নয়। চার ফুট লম্বা কালো একটা বস্তু। অথচ তারই ভারে অত বড়ো বটগাছটা কেঁপে উঠেছিল।

আবার গত দু'দিন ধরে গভীর রাতে রাস্তায় যাকে দেখা গিয়েছিল তার মানুষের আকৃতি ছিল। তার বর্ণনা শুনে মনে হয়েছিল সে রাজু সুব্বাই।

তাহলে কাল দুপুরে যাকে দেখা গেল সে কি অন্য কিছু? আর অন্য কিছুই যদি হয় তাহলে সেটা কী?

আশ্চর্য! এই সব প্রশ্ন যখন প্রণবেশকে করেছি ও কোনো উত্তরই দেয়নি। শুধু ওর কপালে দৃষ্টিস্তার একটার পর একটা রেখা ফুটে উঠেছিল।

প্রণবেশ এতক্ষণ টেলিফোনের সামনে বসে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল। এবার ঘড়িটা দেখল। বোধহয় এক ঘণ্টা হয়ে গেছে। ও টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল আর তখনই টেলিফোনটা বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি রিসিভারটা তুলে নিয়ে সাড়া দিল, হ্যালো! হ্যাঁ, আমি প্রণবেশ। এক ঘণ্টা আগে আপনাকে ফোন করেছিলাম। তারপর ও সমস্ত ঘটনা বলে গেল।

টেলিফোনের শব্দ শুনে আমার স্ত্রীও এসে দাঁড়িয়েছেন, মুখে-চোখে এক রাশ উদ্বেগ নিয়ে।

দার্জিলিঙ থেকে অম্বুজবাবু সব শুনে কিছু বলে যাচ্ছেন আর প্রণবেশ আমার প্যাডে খসখস করে তা লিখে নিচ্ছে।

প্রায় দশ মিনিট পর প্রণবেশ টেলিফোন রেখে আমার দিকে তাকাল। বলল,

## জীবন্ত কংকাল

নষ্ট করার মতো আর একটা মিনিটও সময় নেই। শীগগির একজন ছুতোর ডাকো।

ছুতোর!

হ্যাঁ। অম্বুজবাবু বলছেন ভয়ংকর বিপদ। জীবন্ত কংকালটা এখানে এসে পড়বেই। আর তা আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে। বাঁচার একমাত্র পথ—এর মধ্যে বাড়ির সমস্ত জানলা-দরজায় কাচ বসাতে হবে। অর্থাৎ কাচের দরজা-জানলা। আর জানলা-দরজার ফ্রেমও বদলাতে বলছে। নতুন করে যে কাঠ দিতে বলছে তা শুধু তিব্বতেই পাওয়া যায়। সে কাঠ এখানে পাওয়া সম্ভব নয়। তার বদলে নিমকাঠের ফ্রেম করা চলবে। কিন্তু সব জানলা-দরজার ফ্রেম এত তাড়াতাড়ি বদলানো যাবে না। তাই উনি বলছেন প্রত্যেক দরজা-জানলায় এক টুকরো নিমকাঠ লাগিয়ে দিতে। আর দরজা-জানলা রাত্তিরে কোনো কারণেই খোলা রাখা যাবে না।

আমি হাঁ করে ওর কথা শুনছিলাম। ও আমার হাত ধরে টান দিয়ে বলল, আর বসে থাকলে চলবে না। চলো ছুতোরের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি।

বেলা দশটার মধ্যেই একসঙ্গে পাঁচজন ছুতোর এসে কাজে লেগে পড়ল। সারা দিন-রাত কাজ করবে। ডবলেরও বেশি মজুরি দিতে হবে। আমি তাতেই রাজী হয়েছি। সারা দুপুর কাঠ কাটা, হাতুড়ি ঠোকার খটাখট শব্দ। এদিকে পাড়ার লোকেও সম্ভ্রান্ত। তারাও কাগজে জীবন্ত কংকালের খবর পড়েছে। তিনি সশ্টলেকের দিকে আসছেন এটা জেনেই ভয়ে কাঁটা। তারপর যখন শুনল কংকালটার টার্গেট আমাদের এই বাড়িটা তখন তাদের মুখের কথাও বন্ধ হয়ে গেল। কংকালটা তাহলে একেবারে তাদের বাড়ির পাশে এসে পড়বে! ভুল করে যদি অন্য কারও বাড়ি ঢুকে পড়ে? তারপর যখন তারা দেখল আমার বাড়ির দরজা-জানলা কাচের করা হচ্ছে তখন তাদের ভয় আরও বেড়ে গেল। আত্মরক্ষার জন্যে যদি একজন পুলিশ অফিসারের বাড়ির দরজা-জানলা হঠাৎ কাচ দিয়ে মুড়তে হয় তাহলে কী ভয়াবহ ঘটনা আজ-কালের মধ্যে ঘটতে চলেছে!

বিকেল চারটে।

আজ ছুটি নিয়ে জানলা-দরজায় কাচ লাগানোর তদারকি করছি—পাড়ার প্রৌঢ় উমেশ সান্যাল এসে দাঁড়ালেন। ভাবলাম আর-সবাইয়ের মতো উনিও বুঝি কাচ লাগানো দেখতে এসেছেন। কিন্তু না—তিনি ভারী গলায় বললেন, বিপদের ওপর বিপদ ডেকে আনতে চান?

## জীবন্ত কংকাল

আমি অবাক হয়ে তাকালাম। জিঞ্জিৎস করলাম, কেন?

শখ করে না হয় ছাদের আলসেতে ফুলগাছের টব বসিয়েছেন। কিন্তু একটা টব যে আলসে থেকে ঝুলছে সে খেয়াল রেখেছেন? কারো মাথায় পড়লে কি হবে?

টবের কথায় চমকে উঠলাম। টবের সারি থেকে একটা টব যে খানিকটা বেরিয়ে এসেছিল ক'দিন আগে তা দেখেছিলাম। তারপর আর খেয়াল করিনি। উমেশবাবুর কথায় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে যা দেখলাম তাতে চক্ষুস্থির! সেই টবটা লাইন ছেড়ে বেরিয়ে এসে একেবারে কার্নিসের ধারে পৌঁছেছে। আমি এতই ঘাবড়ে গেলাম যে উমেশবাবুর সামনেই চিৎকার করে উঠলাম—কেমন করে এটা সম্ভব?

॥ সাত ॥

## ষোরের মধ্যে সারাদিন

পরের দিন সকাল সাতটা।

একটা জিপ এসে দাঁড়াল। বুঝলাম প্রণবেশ এসেছে। ও এত সকালে এলে আমার কেমন ভয় করে। না জানি কী দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে।

খুব ব্যস্তভাবে ঢুকল প্রণবেশ। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম।

ও কোনো ভূমিকা না করে বল, শীগগির আমার জিপে ওঠো।

ভয়-উদ্বেগ মেশানো গলায় বললাম, কেন?

কথা বাড়িও না। উঠে পড়ো।

তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে জিপে উঠে পড়লাম। পনেরো মিনিটের মধ্যে জিপ এসে থামল ইস্টার্ন বাইপাসের মুখে। নেমে পড়লাম জিপ থেকে। রাস্তার মাঝখানে বেশ ভিড় জমে আছে। সশস্ত্র পুলিশও রয়েছে। খবরের কাগজের লোকেরাও এরই মধ্যে ছুটে এসেছে।

ভিড় ঠেলে প্রণবেশ আমাকে নিয়ে গেল জায়গাটায়। ভেবেছিলাম না জানি কী বড়োরকম দুর্ঘটনা ঘটেছে।

কিন্তু সেরকম কিছু নয়। একটা কুকুর পড়ে আছে। মাথাটা তার খঁয়াতলানো। এ আর আশ্চর্য কী! রাস্তির বেলায় রাস্তার একটা কুকুর গাড়ি চাপা পড়েছে। কিন্তু একটু পরেই ভুল ভাঙল যখন প্রণবেশ একটা লাঠি দিয়ে মরা

## জীবন্ত কংকাল

কুকুরটাকে চিৎ করে দিল। দেখলাম তার পেটটা কেউ যেন ধারালো অস্ত্র দিয়ে চিরে ফেলেছে। নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে এসেছে।

বুঝতে পারলে কিছু? প্রণবেশ আমার দিকে তাকাল।

বললাম, এ তো গাড়ি চাপা পড়ে মরা নয়। কুকুরটার পেট চিরে কেউ মেরেছে। তারপর আক্রোশে মাথাটা খেঁৎলে দিয়েছে।

বুঝতে আর অসুবিধে হলো না। শুধু বললাম, তাহলে সুক্সা সন্টলেকের মুখে ঢুকে পড়েছে।

হ্যাঁ। কুকুরটা বোধহয় অদ্ভুত কিছু দেখে তাকে বিরক্ত করছিল—তারই প্রতিফল।

কেমন একটা আচ্ছন্নের মতো বাড়ি এসে ঢুকলাম। তাহলে সতিই আর রেহাই নেই। এখন তাহলে দিন-রাত দরজা-জানলা বন্ধ করে বাড়িতে বসে থাকা। কিন্তু তাই বা সম্ভব কি করে? ডিউটি আছে। ভূতের ভয়ে ছুটি নিয়ে বাড়ি বসে থাকা তো যাবে না।

আশ্চর্য! সারা দিনটা যেন কেমন ঘোরের মধ্যে রইলাম। নোটন ইস্কুলে গেছে। আমার স্ত্রী গম্ভীর বিষম মুখে রান্নাবান্না করে চুপচাপ বিছানায় গিয়ে শুলেন। সারা দুপুর একটা কাক বাড়ির ছাদে বসে কা-কা করে ডেকেই চলল। সামনের বাড়ির দেওয়াল থেকে একটা চাঙর আচমকা ভেঙে পড়ল। ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে এসবই আমি দেখে যাচ্ছি। কিন্তু যেন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখা।

হঠাৎ আমার মনে হলো আমি যেন নেপালের কাঠমাণ্ডু থেকে জিপে করে চলেছি সেই পাহাড়তলিতে যেখানে সেই নিষ্ঠুর তান্ত্রিককে দেখেছিলাম। সেই পাইনগাছে ঘেরা উঁচু উঁচু পাহাড়। জিপ কখনো উঠছে—কখনো নামছে...তারপরই দেখলাম সেই ছেলেটাকে কয়েকজন পাহাড়ী বিষুগ্ধমতী নদীতে স্নান করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলি দেবার জন্যে। পাহাড়ের গুহা থেকে খাঁড়া হাতে বেরিয়ে এল সেই নিষ্ঠুর তান্ত্রিক—পেছনে গুহার গায়ে বাঁশের খুঁটোয় ঝুলছে চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলের সেই কংকালটা....তান্ত্রিক বলি দেবার জন্য খাঁড়া তুলল...আমি বলে উঠলাম, প্রণবেশ—ফায়ার—

চমকে উঠলাম। কোথায় চলে গিয়েছিলাম আমি? এ তো শুধু ভাবা বা মনে করা নয়, সতিই যেন কেউ আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে নিয়ে গিয়েছিল কাঠমাণ্ডুতে। না, ভুল। এই তো আমি আমার ঘরেই বসে রয়েছি ইজিচেয়ারে। তাহলে এমন হলো কেন?

## জীবন্ত কংকাল

হঠাৎ বাইরে তাকিয়ে দেখি এই বেলা চারটেতেই চারিদিকে যেন ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে। আশেপাশের বাড়িগুলো যেন আর নেই। অদৃশ্য। তার জায়গায় শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। একটা কোনো মানুষ-জন নেই—ছেলেদের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে না....কি হলো? কোথায় গেল সব? আমি কেমন ভয় পেয়ে ডেকে উঠলাম, নোটন!

নোটনের মা ব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

ওরকম করে টেঁচিয়ে উঠলে কেন?

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, না। ওকে দেখছি না যে?

ও তো এই মাত্র খেলতে গেল।

বললাম, চারিদিকে ধোঁয়া। এর মধ্যে ও বেরোল কেন?

নোটনের মা বললেন, ধোঁয়া! ধোঁয়া কোথায়? স্বপ্ন দেখছ নাকি?

স্বপ্ন! যাক নিশ্চিত্ত হলাম। কিন্তু এরকম দেখলাম কেন?

আমার স্ত্রী তখনও দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ টেবিলের ওপর নজর পড়ল। চমকে উঠে বললাম, আচ্ছা, টেবিলে ওটা কি?

কোনটে?

ঐ যে!

ওটা তো সিগারেটের প্যাকেট।

সিগারেটের প্যাকেট! ও আচ্ছা।

কি হয়েছে তোমার?

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলাম। বললাম, না, কিছু হয়নি। আমি একটু ঘুরে আসি।

দাঁড়াও। চা করে দিই।

আমি চা খাইনি?

এই তো সাড়ে চারটে। এখনই তো চা খাও।

তবে দাও। বলে ফের ইজিচেয়ারে বসে পড়লাম।

চা খেয়ে বেরোতে যাচ্ছি স্ত্রী বললেন, তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু। সন্ধে হয়ে না যায়।

বললাম, এখনি ফিরব।

বেরোতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু সারা দুপুর যে ঘোরের মধ্যে ছিলাম সেই ঘোরটাকে কাটাবার জন্যেই জোর করে বেরোলাম। বুঝতে পারছিলাম না আজ আমার মনটা কেন ওরকম হচ্ছিল।

## জীবন্ত কংকাল

একে সল্টলেক জায়গাটাই ফাঁকা। তার ওপর আমাদের এ. জে. ব্লকটা আরও ফাঁকা। কে বলবে এটা কলকাতা শহর! এখন এই পড়ন্ত বেলায় রাস্তাগুলো যেন বড়োই নির্জন বলে মনে হচ্ছে। অথচ অন্যদিন তেমন মনে হতো না। তবে কি জীবন্ত কংকালের ভয়ে সবাই এরই মধ্যে বাড়ি ঢুকে গেছে? আশ্চর্য! এমন সাজানো-গোছানো সল্টলেক সিটি—এত সুন্দর সুন্দর বাড়ি—কল্পনা করা যায় গভীর রাতে এই পথেই হবে ভয়ংকর জীবন্ত কংকালের আবির্ভাব?

অবশ্য—অবশ্য সল্টলেক না হয় আজই সুন্দরী সিটি হয়েছে কিন্তু আজ থেকে মাত্র ছত্রিশ বছর আগে এই জায়গাটা ছিল বিস্তীর্ণ জলাভূমি। মাছ চাষের ভেড়ি। তখনকার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর চেপ্টায় ১৯৬২ সালে শুরু হলো গঙ্গার পলিমাটি দিয়ে সল্টলেক ভরাট করার কাজ। ১৯৬৪ সালে বালি দিয়ে ভরাট করে গড়ে ওঠে লবণহ্রদ। জোব চার্নকের পর এই প্রথম কলকাতা তার পূর্ববর্তী জলাভূমির নাগপাশ ভেদ করে নতুন রূপ নিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠল। তারপর আর চার বছরের মধ্যে সেই পরিত্যক্ত জলাভূমির জায়গায় দেখা দিল এক আদিগন্ত সমতলভূমি। চাঁদের পিঠের মতো রুক্ষ—প্রাণীশূন্য। লবণহ্রদের পাঁচ বর্গমাইল প্রান্তরে কোথাও এতটুকু ছায়া নেই—শুধু এদিক-ওদিক ছড়ানো-ছেটানো কনট্রাক্টারদের টিনের চালা। এক ফোঁটা পানীয় জল নেই কোথাও—না আছে পাখি, না প্রজাপতি—না একটা ফড়িং। সেদিন তখনও রাস্তাঘাট তৈরি হয়নি, যানবাহনের প্রশ্নই নেই। স্থানীয় থানার এক দারোগা খুন হয়েছিল এখানে। কাঁকুড়গাছি ছাড়িয়ে কেউ এদিকে আসতে সাহস পেত না। রান্তিরে চাঁদের আলোয় ধু ধু সাদা বালি দেখে মনে হতো এক বিচিত্র মরুভূমি।

হঠাৎ—হঠাৎই যেন গোঁ গোঁ করে কোথা থেকে ছুটে এল ধুলোর ঝড়। না, ধুলো নয়—বালি—শুধু বালি—বালির ঝড়। চমকে উঠলাম—এত বালি এল কোথা থেকে? তারপরেই দেখি ধু ধু সাদা বালির সমুদ্রে দিশেহারা পথিকের মতো আমি একা দাঁড়িয়ে। ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম—কে আছ বাঁচাও!.....

যখন জ্ঞান ফিরল দেখি একজনদের বাড়ির সিঁড়ির ওপর বসে আছি। দু'চারজন ভদ্রলোক আমায় ঘিরে রয়েছেন। একজন বললেন, কেমন আছেন এখন?

অস্ফুট স্বরে বললাম, আমার কি হয়েছিল?



## জীবন্ত কংকাল

বোধহয় মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। আপনি কোথায় থাকেন?

আমি ঠিকানা বললাম। ওঁরা চমকে উঠলেন। বললেন, হেঁটে হেঁটে এত দূর এসেছিলেন!

তারা যখন আমায় সাইকেল রিকশা করে বাড়ি পৌঁছে দিলেন তখন সন্কে হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ঢুকে দরজা-জানলা বন্ধ করে দিলাম।

সাবধানের মার নেই—তাই ভালো করে ঘরের কোণ, খাটের তলা দেখে নিলাম। কেউ ঘরে ঢুকে লুকিয়ে নেই তো?

সমস্ত বাড়িটা যেন থমথম করছে। নোটন পর্যন্ত যেন কেমন বোবা হয়ে গেছে। সে পরিস্কারভাবে কিছু বুঝতে না পারলেও বোঝা যাচ্ছে ভয় পেয়েছে।

স্ত্রীর মুখে হাসি তো নেইই, কথাও নেই। রাত নটার সময়ে শুধু বললেন, আমার মনে হয় তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়া উচিত। অর্থাৎ শুয়ে পড়লেই যেন নিশ্চিন্ত।

তাই হলো। খাওয়া-দাওয়া সেরে যখন শুলাম তখন ঘড়িতে দশটা বেজেছে।

পাশের ঘরে নোটন আর নোটনের মা শোয়। পাশের ঘরে আমি একা। অন্য দিন আমরা আলো নিভিয়ে দিই। নোটনের মা আজ নাইট-ল্যাম্প জ্বলে রাখলেন। আমি নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা আজ এত ভয় পাচ্ছি কেন? নোটনের মাও তো দেখছি ভয় পেয়েছে। কিন্তু কিসের ভয়? ও-ও কি মনে করছে আজ রাত্তিরেই সুব্বা হানা দেবে?

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ মনে হলো খুব গরম লাগছে। পাখা কি বন্ধ হয়ে গেছে? টর্চ জ্বাললাম। না, পাখা তো দিব্যি চলছে। তখন মনে হলো জানলাগুলো সব বন্ধ। তাই—

জানলা খুলতে যাচ্ছিলাম, তখনই মনে হলো—জানলা খোলা তো নিষেধ। কাজেই মশারির মধ্যে নিজেকে আবার গুটিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

সবে চোখ বুজিয়েছি অমননি দুম করে একটা শব্দ—আমাদের বাড়ির মধ্যে। আমি চমকে উঠে বসলাম। পাশের ঘর থেকে আমার স্ত্রী চিৎকার করে উঠলেন, ওগো, শুনছ!

আমি তাড়াতাড়ি উঠে ও ঘরে গেলাম। তারপরে দুজনে মিলে ঘর-বারান্দা খুঁজলাম। কোথাও কিছু নেই।

একবার বাইরেটা দেখে আসব?

স্ত্রী কঠিন স্বরে বললেন, না। দরজা খুলবে না।

## জীবন্ত কংকাল

অগত্যা আবার বিছানায় গিয়ে ঢুকলাম। এবার রিভলভারটা নিয়ে রাখলাম বালিশের নিচে। ঘড়িতে তখন রাত আড়াইটে বেজেছে।

ভোরে উঠেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম সেই ফুলগাছের টবটা ছাদ থেকে পড়ে চুরমার হয়ে গেছে।

॥ আট ॥

### গভীর রাতে পড়া মুখস্থ?

সকালবেলায় পাড়ার উমেশ সান্যাল এলেন। বললেন, খুব বেঁচে গেলেন মশাই। টবটা যদি কারো মাথায় পড়ত তাহলে আর রক্ষে থাকত না। বড়োলোকদের যে কী ফ্যাশান হয়েছে ছাদের আলসেতে, বারান্দায় ফুলের টব ঝুলিয়ে রাখা। কারো মাথায় পড়তে পারে এ কাণ্ডজ্ঞান নেই!

একটু থেমে বললেন, আজকের কাগজ দেখেছেন?

বললাম, দেখেছি। তবে ভালো করে পড়া হয়নি। বললাম না যে ভয়ে এখন কাগজ পড়ি না।

সুখবর আছে। বলে ঝুলি থেকে সেদিনের কাগজটা বের করে দেখালেন।

‘জীবন্ত কংকাল অদৃশ্য’ হেডিং দিয়ে—যে খবরটা ছাপা হয়েছে তা এইরকম—ইস্টার্ন বাইপাসের মুখ থেকে সল্টলেকের প্রায় প্রতিটি পথে পুলিশ সারা রাত্রি টহল দিয়েও জীবন্ত কংকালটিকে দেখতে পায়নি। বোধ হয় ওটি অদৃশ্য হয়েছে।

বাঁচলাম মশাই। বাড়িতে সবাইকে রেখে কাশীতে যে মহাযোগ হতে যাচ্ছে সেখানে এবার নিশ্চিন্তে যেতে পারব। দেশ-বিদেশ থেকে কত সাধু-সন্ন্যাসী কলকাতা হয়ে যাবেন। সে এক দেখার জিনিস মশাই। একবার যদি তেমন কোনো সাধুর দর্শন পাই তাহলে তাঁর পা দুটো আঁকড়ে ধরব। বুঝলেন না ওখানে যেসব সাধু-সন্ন্যাসীরা যান তাঁরা হেঁজিপৈঁজি ভণ্ড সাধু নন। কি বলেন?

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। আমার মনে তখন শুধু একটা কথাই ঘুরছিল, সত্যিই কি রাজু ফিরে গেছে?

সেদিন বিকেল পর্যন্ত প্রণবেশ দু’বার ফোন করেছিল। বিশেষ কাজে আটকে গেছে বলে আসতে পারছে না। জানতে চেয়েছিল ভয় পাচ্ছি না তো?

বলেছিলাম, না। তবে টবটা পড়ে গেছে। ও যেন সে কথায় কোনো গুরুত্বই দিল না।

## জীবন্ত কংকাল

ক্রমে গোটা সস্টলেকের ওপর সঙ্কর অঙ্ককার পায়ে পায়ে নেমে এল। আজ আর বিকেলে বেরোতে ইচ্ছে করেনি। তাড়াতাড়ি সব জানলা-দরজা বন্ধ করে দিলাম। ব্যস! রাতের মতো ঘরে বন্দী হয়ে রইলাম।

আজও রাত নটার মধ্যে খেয়ে দশটার মধ্যে শুয়ে পড়লাম। এত সকাল সকাল শোওয়া আমাদের অভ্যেস নয়। কিন্তু এখন পরিস্থিতি অন্যরকম।

ভাবতে ভাবতে কখন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমটা ভেঙে গেল আচমকাই। ঘরের মধ্যে অসহ্য গুমোট। চারিদিকের বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠেছে। আর তখনই শুনতে পেলাম জনমানবশূন্য নিস্তন্ধ পথের ওপর একটা অস্পষ্ট শব্দ খট—খট—খট।

কেউ যেন রক্তমাংসশূন্য হাড়ের পা ফেলে হাঁটছে। শব্দটা ক্রমে এগিয়ে এল আমাদের বাড়ির কাছে। আজই তা হলে সেই রাত। ও এসে পড়েছে। আমি বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা বের করে উঠে বসলাম।

শব্দটা থেমে গেল।

কোনো সন্দেহ নেই কেউ একজন এসে দাঁড়িয়েছে বাড়ির কাছে। আমি বিছানায় বসেই কাচের শার্সির মধ্যে দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু অঙ্ককারে কিছুই দেখতে পেলাম না।

তার একটু পরেই আমি আঁৎকে উঠলাম। দেখলাম আমার মাথার কাছে জানলার ওপাশে একটা ভয়ংকর মূর্তি—যেন কাঠের তৈরি খসখসে একটা মুখ—নারকেলের মতো ছোট মাথা—খাড়াখাড়া চুল—দুটো চোখ—হ্যাঁ, চোখই। তবে টর্চের বাস্তবের মতো নয়, চোখ দুটো ওল্টানো। শুধু চোখের সাদাটা দেখা যাচ্ছে। এইভাবেই এক-এক সময়ে সুব্বা হরিদেবপুরের বাড়িতে তাকাতো।

সেই মুহূর্তে আমি কি করব ভেবে পেলাম না। দেখলাম ক্ষীণ কংকালসার দেহটা জানলাটা খোলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কাচের শার্সি কিছুতেই ছুঁতে পারছে না।

আমি হঠাৎ লাফিয়ে হুংকার দিয়ে জানলার দিকে ছুটে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

এবার আমি আলো জ্বলে পাশের ঘরে গেলাম। দেখি মশারির মধ্যে আমার স্ত্রী নোটনকে বুকে আঁকড়ে ধরে গোঙাচ্ছেন। আমাকে দেখে সাহসে ভর করে

## জীবন্ত কংকাল

বিছানায় উঠে বসলেন। কোনোরকমে বললেন, সুব্বা ওঁদের জানলার কাছেও এসে দাঁড়িয়ে ছিল।

.

ভোরবেলায় ফোন পেয়েই প্রণবেশ জিপ নিয়ে চলে এল। সব কথা শুনে ওর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। তখনই দার্জিলিঙে ফোন করল। কিন্তু অম্বুজ লাহিড়িকে পাওয়া গেল না। তিনি দার্জিলিঙের বাইরে কোথায় গেছেন কয়েক দিনের জন্যে।

প্রণবেশ বলল, ঘাবড়িও না। রাত্রে আমিও এখানে থাকব।

শুনে বাঁচলাম। বিপদের সময়ে সঙ্গে একজন সাহসী সঙ্গী থাকা দরকার। দরকার পরামর্শ করবার।

সন্দের আগেই প্রণবেশ চলে এল। সঙ্গে কিছু ওষুধ-পতুর এনেছে। বলা যায় না রাস্তিরে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন কাজে লাগবে। কোনোরকমেই দরজা খুলে বাইরে বেরোনো তো চলবে না।

রাত দশটার মধ্যে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়া গেল। যে প্রণবেশ এত ফুর্তিবাজ—এত গল্প করে সেইই আজ যেন বোবা হয়ে গেছে। সব সময়েই কি যেন চিন্তা করছে।

ও আর আমি এক বিছানায় শুয়েছি।

কোনো বাড়ির দেওয়ালঘড়িতে ঠং-ঠং করে দুটো বাজল। সেই শব্দটুকু থেমে যেতে-না-যেতেই নিস্তব্ধ রাস্তায় যেন শব্দ হলো খট্-খট্-খট্—প্রণবেশকে ঠেলা দিতেই ও গম্ভীর গলায় বলল, শুনছি।

ক্রমে শব্দটা আগের দিনের মতোই বাড়ির কাছে এসে থামল। কিন্তু আজ আরও একটা অস্পষ্ট শব্দ কানে আসছিল। মানুষের গলা। কোনো বয়স্ক লোক যেন পড়া মুখস্থ করছে। এত রাত্রে কে কোথায় কী পড়ছে ভেবে ওঠার আগেই পাশের ঘর থেকে নোটনের মা চিৎকার করে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুজনে ছুটে গেলাম ওদের ঘরে। আমাদের দেখেই আমার স্ত্রী আঙুল তুলে জানলাটা দেখিয়ে উত্তেজিত গলায় চৈঁচিয়ে উঠলেন, ঐ-ঐ—ঐদিকে।

সেই নিষ্প্রাণ কালো মুখটাকে মুহূর্তের জন্যে দেখলাম সরে যেতে। তারপর আমার স্ত্রী যা বললেন তা ঐ—

একটা কেমন ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজে ঘুম ভাঙতেই দেখেন মূর্তিটা বাইরে

## জীবন্ত কংকাল

দাঁড়িয়ে জানলাটা ধরবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। যতই পারছে না ততই রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে। কিন্তু এ যেন হরিদেবপুরের সে রাজু নয়। তার চেয়ে ঢের ভয়ংকর—ঢের বেশি হিংস্র।

আমরা ঠিক করলাম বাকি রাতটুকু মশার কামড় সহ্য করেও এ ঘরে বসে কাটিয়ে দেব। সেইমতো দুটো চেয়ার নিয়ে এসে গায়ে চাদর জড়িয়ে আমরা বসলাম।

প্রণবেশ সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছে হঠাৎ মনে হলো বাড়িটা যেন কাঁপছে। তারপরেই ছাদের ওপর কে যেন ভারী পায়ে চলে বেড়াচ্ছে। এইরকম চলল ঘণ্টাখানেক। অথচ আমাদের কারুর কিছু করার নেই। বেরোনো চলবে না। ভোরের দিকে শব্দটা থেমে গেল।

সকালে ছাদে উঠে দেখলাম টবগুলো কে ভেঙেচুরে সারা ছাদে ছড়িয়ে রেখে গেছে।

চা খাবার পর আমরা আলোচনায় বসলাম। যে ভুলটা আমাদের হয়েছিল সেটা বললাম। লালবাজারে একটা ফোন করে দিলেই হতো। আমাদের না হয় ঘর থেকে বেরোবার উপায় ছিল না। কিন্তু পুলিশ তো ছাদে উঠতে পারত।

এটা যে মস্ত ভুল প্রণবেশও তা স্বীকার করল। সেই সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার—ঐ সময়ে কাছাকাছি কোথাও কে পড়া মুখস্থ করছিল? না, তারও উত্তর তখনই খুঁজে পাওয়া গেল না।

॥ নয়।।

## ভয়ংকর রাত

পরের দিন প্রণবেশ সোজা লালবাজারে গিয়ে গত দু'দিনের ঘটনা জানিয়ে সঙ্কের পর থেকে সারা রাত্রির জন্যে বাড়িতে পুলিশ পাহারা চাইল। লালবাজারের বড়োকর্তারা কিন্তু এবার খুব গুরুত্ব দিলেন না। তাঁদের বক্তব্য— গত কয়েক দিন সারারাত পুলিশ সশস্ত্র স্টলেকের সমস্ত রাস্তা টহল দিয়েছে। জীবন্ত কংকালের দর্শন পায়নি। হয় সবটাই এতদিন চোখের ভুল ছিল কিংবা সেটি অদৃশ্য হয়েছে।

প্রণবেশ সে কথা মানতে চায়নি। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে ফের যদি রাস্তার ঐরকম হাস্যামোদ হয়, ফোন পেলেই সশস্ত্র পুলিশ-ভ্যান যাবে।

আজও সঙ্কের আগেই প্রণবেশ চলে এল আমাদের বাড়ি। ও যেন বুঝেই

## জীবন্ত কংকাল

নিয়েছে আমার ঘরে যতদিন না সুব্বা ঢুকতে পারছে ততদিন ও হাস্যামা চালিয়ে যাবে।

আজও রাত দশটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা শুয়ে পড়লাম। নামেই শোওয়া—কারো চোখে ঘুম নেই।

রাত দুটো।

নিস্তব্ধ এ. জে. ব্লকের রাস্তাগুলো, দিনের বেলার ব্যস্ত কোলাহলমুখর বাস-টার্মিনাসটা এখন শ্মশানের মতো পরিত্যক্ত। জনশূন্য রাস্তার বুকে লাইটপোস্টের আলোগুলো যেন পাহারা দিচ্ছে।

হঠাৎ কানে এল কাছেই কোনো বাড়িতে কোনো বয়স্ক মানুষ যেন টেঁচিয়ে টেঁচিয়ে কিছু পড়ছে। আজ যেন গলার স্বরটা গতকালের চেয়ে স্পষ্ট। কিন্তু কি পড়ছে ভালো করে বোঝা গেল না। তার পরেই দেখলাম রাস্তার আলোগুলো কাঁপছে। তারপরেই ধীরে ধীরে ভোস্টেজ ডাউন হয়ে এল। সেই সঙ্গে সেই গম্ভীর গলার পড়াটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

না, বই পড়া নয়। রীতিমতো মন্ত্র উচ্চারণ।—গচ্ছ—গচ্ছ—সংহারো—  
গচ্ছ—গচ্ছ—সংহারো—

মানেটা পরিষ্কার। কেউ যেন কাউকে আদেশ করছে—যাও—যাও বিনাশ করো—মেরে ফেলো।

তারপরেই শুনতে পেলাম সেই শব্দ খট্-খট্-খট্—

জল্লাদ এগিয়ে আসছে আমাকে মারার জন্যে।

শব্দটা আগের মতোই আমাদের বাড়ির কাছে এসে থেমে গেল। আর তখনই কোথাও কিছু নেই আকাশটা ঘন মেঘে ছেয়ে গেল। কয়েকবার চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ চমকানি। তারপরেই উঠল প্রচণ্ড ঝড়। সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রী টেঁচিয়ে উঠলেন, আবার এসেছে—

ছুটে গেলাম পাশের ঘরে। সেই একই দৃশ্য, তবে আরও ভয়ংকর। চোখ দুটো ধক ধক করে জ্বলছে—মুখে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ। আচ্ছ যেন সে ঘরে ঢুকবেই।

আশ্চর্য এই ঝড়েও সে কাবু নয়।

এদিকে ঝড়ের দাপট ক্রমশই বাড়ছে। জানলা-দরজার শার্সিগুলো ঝনঝন করে উঠছে। প্রণবশ টেঁচিয়ে উঠল, শীগগির টেবিল-চেয়ারগুলো দরজার কাছে নিয়ে এসো।

দরজাটা ঝড়ের ধাক্কায় তখন কাঁপছে। আমরা টেবিল-চেয়ার-আলনা যা

## জীবন্ত কংকাল

পেলাম সব নিয়ে এসে দরজার গায়ে ঠেসে দিলাম। ওদিকে জানলাগুলোরও একই অবস্থা। সেখানেও ডেস্ক, ট্রাঙ্ক যেখানে যা ছিল এনে চেপে ধরলাম। তার পরেই শুরু হলো ছাদের ওপর দাপাদপি।

প্রণবেশ ছুটে গেল ফোন করতে। কিন্তু—হায় কপাল! লাইন ডেড।

ক্রমে রাত পুইয়ে গেল। ঝড় থেমে গেল। যাক আজও বেঁচে গেলাম। প্রণবেশ আবার ফোন করার চেষ্টা করল। লাইন বেঁচে উঠেছে। লালবাজার জানাল এখনি ফোর্স যাচ্ছে।

প্রণবেশকে বললাম, এখন আর এসে কী হবে?

ভোর পাঁচটা।

লালবাজারের দুজন বড়োকর্তাকে নিয়ে আমরা আলোচনায় বসেছি। এভাবে তো দিনের পর দিন পারা যায় না। কিন্তু উপায় কি?

হঠাৎ আমার একটা কথ মনে হলো। বললাম, আমরা গ্রামেও দেখেছি কংকালটাকে চালনা করে নেপালের সেই তান্ত্রিক। তার কাজ অনেকটা remote control-এর মতো। সুদূর হরিদেবপুরে নেপাল থেকে সে চলে এসেছিল। একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে সে কংকালটাকে জীবন্ত করে ছেড়ে দেয়। কাজেই সেই তান্ত্রিক কলকাতাতেও যে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। আর সে আছে আমাদের খুব কাছেই।

প্রণবেশ চমকে উঠে বলল, তুমি তো দারুণ পয়েন্ট বলেছ।

মনে করে দ্যাখো প্রণবেশ, গত রাত্রে মোটা গলায় সেই সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ—গচ্ছ—গচ্ছ—সংহারো।

এ সেই তান্ত্রিকেরই কাজ এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

প্রণবেশ বলল, কিন্তু তাকে খুঁজে পাব কোথায়?

বললাম, মাঠে পথে সে বসে থাকবে না। নিশ্চয় কারো বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে। এই সেক্টরের প্রত্যেক বাড়ি খোঁজ করলে এখনও তাকে পাওয়া যাবে।

প্রণবেশ তখনই পুলিশ কর্তাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বেশি খুঁজতে হলো না। উমেশ সান্যালের বাড়ির কাছে আসতেই ঘিয়ের গন্ধ পাওয়া গেল। যেন কেউ হোম করেছে। পুলিশ ঢুকে পড়ল। উমেশবাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, হ্যাঁ, একজন বড়ো সাধুকে তিনদিন হলো তাঁর বাড়িতে নিয়ে

## জীবন্ত কংকাল

এসেছেন। ঠিক ছিল আজ তাঁর সঙ্গে বেনারসে মহাযোগে যাবেন। কিন্তু—  
কিন্তু কি? কোথায় সেই সাধু?  
ভোরবেলা উঠে তাঁকে আর দেখতে পাচ্ছি না।  
প্রণবশ বললে, তা হলে সে নিশ্চয় পালিয়েছে।  
তখনই সব থানায় ফোন করে দেওয়া হলো—পথে, স্টেশনে, গঙ্গার ঘাটে  
কোনো সাধুকে একলা দেখলেই তাকে যেন ধরা হয়।

বেলা দশটা।

তান্ত্রিক ধরা পড়েনি। হয়তো সে ট্রেনে চড়ে নেপালের উদ্দেশে পাড়ি  
দিয়েছে। অথবা অন্য সাধুদের দলে মিশে কাশী চলে গিয়েছে।

গত রাতের ঝড়ে একটা লাইট-পোস্টের তার ছিঁড়ে গিয়েছিল। ইলেকট্রিক  
মিস্ত্রিদের একজন পোস্টে উঠে সারাচ্ছিল। হঠাৎ আমাদের বাড়ির ছাদের দিকে  
চোখ পড়তেই চমকে উঠল।—আরে! ওটা কি?

ছাদে উঠে দেখা গেল—একটা ছোটোখাটো কংকাল পড়ে আছে। এটা যে  
নেপালে সেই তান্ত্রিকের গুহায় আমরা দেখেছিলাম সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ  
নেই।

তান্ত্রিক অনেক দূরে চলে গেছে। রিমোট কন্ট্রোল আর চলবে না। এখন  
এটা শুধুই কংকাল। এটাকে নিয়ে কি হবে?

পুলিশ বলল, দায়িত্ব আমাদের। ওটাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেওয়াই  
ভালো।

তাই হলো। আমাদের উপস্থিতিতে কংকালটাকে পুড়িয়ে তার ভস্ম গঙ্গার  
জলে ভাসিয়ে দেওয়া হলো।

আশা করা যায় এতকাল পর তার গতি হবে। তান্ত্রিকও আর রিমোট  
কন্ট্রোল থেকে কংকালকে চালনা করে কারো ক্ষতি করতে পারবে না।

---



## ছত্রিশগড়ের ভাঙা গড়

দশ নম্বর ঘর

হোটেলের ম্যানেজার ভদ্রলোকটিকে প্রথম দর্শনেই আমার ভালো লেগেছিল। এক একটি মুখ আছে যেটা আগে-ভাগেই যেন জানিয়ে দেয় মানুষটি কেমন হবে। এ ক্ষেত্রেও তাই। হোটেলের ঘর বুক করার জন্যে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াতেই অপরিচিত মানুষটি নিতান্ত চেনা মানুষের মতো হেসে বললেন, নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে আসছেন। একাই এসেছেন বুঝতে পারছি। আর নিশ্চয়ই ওপরে খোলামেলা একটা ঘর চাই যাতে চারদিকে প্রকৃতির শোভা দেখতে পান। তাই তো?

আমি হেসে বললাম, একেবারে ঠিক।

ভদ্রলোক একটা লম্বা খাতা মেলে ধরে বললেন, নিন, এখানে নামধাম লিখুন। ভালো ঘরই দিচ্ছি।

নামধাম লিখতে লিখতে মনে মনে বললাম, ভালো ঘর যে সহজেই পাব তা বুঝতেই পারছি। কারণ ঘর নেবার জন্যে মোটেই ভিড় নেই।

কদিনের জন্যে থাকবেন ভাবছেন?

বললাম, দেখি। ভালো লাগার ওপর সব নির্ভর করছে।

আপনি নিশ্চয় এখানে এসেছেন ছত্রিশ-গড়িয়াদের উৎসব দেখতে?

হেসে বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু আলাপ হতে না হতেই কী করে আসার কারণ পর্যন্ত ধরে ফেললেন? গোয়েন্দা-টোয়েন্দা নন তো?

ভদ্রলোক হেসেই বললেন, আরে না মশাই, ওসব কিছু নয়। আসলে দেখেছি কলকাতায় এক রকমের টিপিক্যাল বাঙালি আছেন যাঁরা প্যান্ট আর হাওয়াই শার্টের সঙ্গে কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনী ব্যাগ ঝোলাতে ভোলেন না। এঁরা প্রায়ই হন কবি, শিল্পী কিংবা গবেষক। আপনার হাতে তো আবার দেখছি এ অঞ্চলের আদিবাসীদের নাচগানের ওপর লেখা ইংরিজি বইও রয়েছে—‘ফোক ডান্স’।

মনে মনে ভদ্রলোকের লক্ষ করার শক্তির প্রশংসা করলাম। মুখে বললাম, হ্যাঁ, বইটা পড়তে পড়তে আসছিলাম, হাতেই থেকে গেছে।

ভদ্রলোক বললেন, কদিনের জন্য থাকবেন? আপাতত এক সপ্তাহ না হয় লিখুন।

আমি তাই লিখে টাকাপয়সা চুকিয়ে দিলাম।

আপনার নামটা জানতে ইচ্ছে করছে।

ভদ্রলোক তখনই ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে দিলেন। বললেন, নাম জানার ইচ্ছে বললে কম হয় মিস্টার বর্ধন, আমার নামটা জানতেই হবে। নইলে এই সাত দিন ধরে কি কেবল ‘মিস্টার মান্না’ ‘মিস্টার মান্না’ করবেন?

হেসে বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন, সুরঞ্জনবাবু। ধন্যবাদ।

সুরঞ্জনবাবু বললেন, দাঁড়ান, এবার আপনার ঘরের ব্যবস্থা করে দিই। লাগেজ তো বেশি নেই দেখছি। বলে টেবিলের ওপর রাখা পেরলের ঘণ্টাটা বাজালেন। একবার.....দু'বার.....তিনবার। কিন্তু কেউ এল না।

নাঃ, এদের একটাকেও পাবার উপায় নেই। আসলে হয়েছে কী, বোর্ডার কম তো, কাঁহাতক আর বসে বসে গামছা নেড়ে মাছি তাড়ায়। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে একটু আড্ডা দিতে বেরিয়েছে আর কি। চলুন, আমিই আপনাকে ঘরটা দেখিয়ে দিই। বলে কী-বোর্ড থেকে চাবি নেবার জন্যে উঠতে যাবেন, একটা গাড়ি এসে থামল।

কে এল রে বাবা? বলে সুরঞ্জনবাবু চেয়ার থেকে অর্ধেক উঠে উঁকি মারলেন।

দেখলাম লম্বা-চওড়া বিরাটবপু একজন ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে ঝকঝকে জুতোয় মস মস শব্দ তুলে এগিয়ে এলেন। ভদ্রলোকের গায়ের রং কালো। পুরু গোঁফ। উজ্জ্বল দৃষ্টি। পরনে দামী সুট। তিনি যে যথেষ্ট ধনী তা তাঁর হাবভাব আর দু'হাতের ছটা আঙুলে হিরে সমেত অন্য দামী পাথরের আংটির বহর দেখলেই বোঝা যায়।

সুরঞ্জনবাবু অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, উনি কী উদ্দেশ্যে এখানে থাকতে চান বলতে পারেন?

মাথা নাড়লাম।

বললেন, আমার ধারণা যদি ভুল না হয় তাহলে উনি হচ্ছেন একজন ঝানু ব্যবসাদার। এখানে এসেছেন নতুন কোনো ব্যবসার তগিদে।

বিপুল চেহারার লোকটি কাউন্টারের সামনে এসে সুরঞ্জনবাবুর দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে বললেন, I am Kartik Virabagu from Ranchi.

কার্তিক! চমকে উঠে বললেন সুরঞ্জনবাবু। বাঙালি?

মিস্টার ভিরাবাগু যেন অনেক কষ্টে একটু হাসলেন। ক্ষণেকের জন্য ওপরের সারিতে তাঁর সোনা বাঁধানো দাঁতটা দেখা গেল। বললেন, হ্যাঁ, আমি বাঙ্গালি খুস্টান আছি। তবে বাঙ্গালা দেশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব কম আছে। আমার যা কিছু বিজনেস্ সব এদিকে। যাই হোক, কয়েক দিনের জন্যে একটা ভালো ঘর দিন। দোতলার দশ নম্বর ঘরটাই আমার পসন্দ।

সুরঞ্জনবাবু অবাক হয়ে বললেন, দশ নম্বর। যত দূর আমার মনে হচ্ছে এ হোটеле এর আগে আপনি কখনও আসেননি। তাহলে দশ নম্বর ঘরটাই চাইছেন কেন? কোনো বিশেষত্ব আছে কি?

মিস্টার ভিরাবাগুর চোয়ালটা শক্ত হল যেন। একটু ভেবে ভাঙাভাঙা বাংলায় বললেন, speciality আছে কিনা জানি না তবে আমার পরিচিতদের মধ্যে আগে যাঁরা এখানে থেকে গেছেন তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, এখানে এলে যেন দশ নম্বর ঘরটা নেবার চেষ্টা করি। কারণ ও ঘরটা নাকি পয়া। অ্যান্ড ইউ নো, আমি যখন নতুন ব্যবসার সন্ধানে এ অঞ্চলে এসেছি তখন ঐ ঘরটাই নেব।

But I am sorry, আমি খুবই দুঃখিত মিস্টার ভিরাবাগু, এ ঘরটা মাত্র ক' মিনিট আগে বুকড্ হয়ে গেছে।

কিন্তু ঐ ঘরটাই যে আমি চাই। তার জন্যে যদি বেশি টাকা দিতে হয় দেব।

বেশি টাকার কথায় অমন হাসিখুশি সুরঞ্জনবাবুর গলার স্বর বদলে গেল। বললেন, একবার

একটা ঘর কাউকে অ্যালট করা হয়ে গেলে ডবল টাকা দিলেও তা আর কাউকে দেওয়া যাবে না।

এররম স্পষ্ট কথায় মিস্টার ভিরাবাণ্ডর দুই চোখ জ্বলে উঠল। তিনি শান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, একটা কথা জিগ্যেস করতে পারি?

করুন।

এই হোটেলের মালিক কি আপনি?

সুরঞ্জনবাবু বললেন, না। আমি কর্মচারী মাত্র।

তা হলে মালিকের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।

তিনি এখানে থাকেন না।

কোথায় থাকেন?

দিল্লিতে।

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক যেন হতাশায় ভেঙে পড়লেন, My God!

একটু ভেবে নরম গলায় বললেন, তা হলে কোনো উপায়ই নেই?

অত বড়ো লোকটার ঐ রকম হতাশ হয়ে পড়া অবস্থা দেখে আমার মনটাও ভিজে গেল। আমার কাছে পয়া-অপয়ার কোনো ব্যাপার নেই। ছত্রিশগড়ের আদিবাসীদের নানারকম পরবের কথা শুনেছি, হাতে অটেল সময়, তাই ছুটে এসেছি এখানে। আদিবাসীদের পরব দেখা ছাড়াও প্রকৃতির দৃশ্য, পুরনো গড় এসব দেখার লোভও আছে। এসবের সঙ্গে পয়া-অপয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। কাজেই দশ নম্বর ঘরটার বদলে যদি নয় নম্বর ঘর পাই তাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। বরঞ্চ আর একজনের উপকার হবে।

মনে মনে কথাগুলো আউড়ে মুখে প্রকাশ করতে যাচ্ছি, সুরঞ্জনবাবু তা বুঝতে পেরে আমায় হাত টিপে নিরস্ত করলেন। ব্যবসায়ী বাবু তা বুঝতে পারলেন না।

সুরঞ্জনবাবু বললেন, আমি খুবই দুঃখিত মিস্টার ভিরাবাণ্ড, এখনই ঐ ঘরটা দিতে পারছি না।

ভিরাবাণ্ড বললেন, তা হলে দোতলায় নর্থ ফেসিং যে কোনো একটা ঘর দিন। বলে পার্স খুলে একগোছা নোট বের করলেন।

সুরঞ্জনবাবু হোটেলের খাতাটা বের করে সামনে ধরলেন। মিস্টার ভিরাবাণ্ড নাম-ঠিকানা ইত্যাদি লিখলেন।

ঘর বুক করা রইল। মালপত্তর নিয়ে একটু পরে আমি আসছি।

বলে চলে যাচ্ছিলেন, ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, হয়তো আরও জনা তিনেক আসতে পারেন। আমার নাম করলে অনুগ্রহ করে তাঁদেরও একটু জায়গার ব্যবস্থা করে দেবেন।

আচ্ছা। বলে সুরঞ্জনবাবু খাতাপত্তর তুলে রেখে কী বোর্ড থেকে চাবি নিয়ে আমাকে ডাকলেন, আসুন।

### অদৃশ্য হাতের চাপ

ঘরের তালা খুলে নিজে হাতে ঝাড়ন দিয়ে বিছানা, চেয়ার, টেবিল, ড্রেসিং আয়না পরিষ্কার করে আমায় সযত্নে ঘরে অধিষ্ঠান করিয়ে দিয়ে সুরঞ্জনবাবু যখন নীচে অফিস ঘরে চলে গেলেন তখন সবে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। আশ্বাস দিয়ে গেলেন সন্ধ্যাবেলায় আবার

আসবেন। আমি ব্যাগ থেকে হালকা একটা চাদর বার করে বিছানায় পেতে নিলাম। টর্টো রাখালাম বালিশের পাশে।

একটা পুরনো বাড়ির ঘর আর কত ভালো হতে পারে? তবু চারদিক খোলা উত্তরমুখী ঘরটা ভালোই। সে আমলের মোটা মোটা গরাদ আর খড়খড়ি দেওয়া বড়ো বড়ো জানলা দিয়ে আলো-বাতাসের অবাধ খেলা চলেছে।

বাড়ির মতো টেবিল চেয়ারও পুরনো। টেবিলের পায়া বোধহয় ভেঙে গিয়েছিল। সম্প্রতি নতুন একটা পায়া লাগানো হয়েছে। ঘরের লাগোয়া বাথরুমে একটা শাওয়ার আছে বটে তবে জল পড়ে না। বাথরুমের জানলার শার্শি বিপজ্জনকভাবে ভাঙা। বিপজ্জনক এই কারণে যে, পাশেই যে আমগাছটা ডাল মেলে দিয়েছে হোটেলের ছাদের ওপর, সেই ডাল ধরে যে কেউ বাথরুমের জানলাটার নাগাল পেয়ে যাবে। তারপর ভাঙা শার্শির মধ্যে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ছিটকিনি খুলতে অসুবিধে হবে না।

ঠিক করলাম সন্ধ্যায় সুরঞ্জনবাবু যদি আসেন তা হলে কালকেই যাতে নতুন কাচ বসানো হয় সে কথা ওঁকে বলব। আর সেই সঙ্গে জিগ্যেস করব হোটেল করার আগে বহুদিনের এই বাড়িটা কী ছিল? অর্থাৎ আজ থেকে পনেরো-বিশ বছর আগে এই সব জায়গায় কৃষ্টিং লোক বাস করলেও পাকা বাড়ি তৈরি করে কোনো ধনী দুঃসাহসী লোক ছেলেপুলে নিয়ে থাকত এমন তো বিশ্বাস হয় না।

বেলা সাড়ে চারটের সময় হোটেলের বয় বেশ বড়ো কাপে চা আর প্লেটে খানকয়েক বিস্কুট দিয়ে গেল। তার সঙ্গে ভাব জমাবার জন্যে জিগ্যেস করলাম, তোমার নাম কী? বিরস মুখে উত্তর দিল, মহেন্দ্র সেনাপতি।

দেশ কোথায়?

ভুবনেশ্বর।

তার মানে ওড়িয়া?

হ।

তা এত দূরে এলে কেন? কাছেপিঠে কি খুঁজলে কাজ পেতে না?

মহেন্দ্র তার উত্তর না দিয়ে নীচে নেমে গেল। বুঝলাম ছোকরা আলাপী না। অবশ্য তার ট্রেতে আরও কয়েক কাপ চা আর বিস্কুট ছিল। অন্য বোর্ডারদের বোধহয় এখনি দিতে হবে।

চা খেয়ে সামনের খোলা বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলাম। আমার ঘরের ডান দিকে আরও তিনখানা ঘর। আলাপ করার মতো তেমন কেউ আছেন কিনা দেখবার জন্য ওদিকে গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম তিনটে ঘরেই তালা ঝুলছে। বুঝলাম ঘরগুলোতে বোর্ডার নেই। অগত্যা চুপচাপ নিজের ঘরের সামনের বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলাম।

পায়চারি করতে করতে কত কথাই মনে হতে লাগল। কোথায় কলকাতা আর কোথায় এই ছত্রিশগড়!

কিছুকাল আগেও কেউ ছত্রিশগড়-এর নাম শোনেনি। শোনেবার কথাও নয়। ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো প্রদেশ ছিল মধ্যপ্রদেশ। চার কোটি পনেরো লক্ষের মতো লোক বাস করত। তার মধ্যে বাঙালিই ছিল দু লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি। তারপর এই সেদিন মধ্যপ্রদেশের বিরাট শরীর থেকে বেশ কিছু অংশ কেটে হান্কা করে দিয়ে তৈরি করা হল আলাদা একটা রাজ্য। যার নাম হল ছত্রিশগড়। এর মধ্যে ঢুকল বিলাসপুর, সুরগুজা, রায়গড়, রায়পুর, দ্রুগ, স্যাডোল আর বস্তারের মতো ভালো ভালো জেলাগুলো।

ছত্রিশগড়! পুরাতত্ত্ব বিভাগের তথ্য অনুযায়ী বুদ্ধদেবের সময়ে আজকের এই ছত্রিশগড়েরই নাম ছিল নাকি মহাকোশল!

তাহলে কোশল থেকে ছত্রিশগড় নাম হল কী করে? দুটো নামের মধ্যে তো এতটুকু মিল নেই।

এই সব প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে আমার বেশ ভালো লাগে।

আসলে ইতিহাসবেত্তারা শুনিয়েছেন অন্য কথা। এক সময়ে ঐ মহাকোশলে রাজত্ব করতেন ছেদী বংশের রাজারা। তাঁদের নাম থেকেই ‘ছেদিসগড়’—তা থেকে হয়ে দাঁড়াল ছত্রিশগড়।

বহু প্রাচীন জায়গা এই ছত্রিশগড় বা ছেদিসগড়। তাই মনে হতে লাগল চারিদিকে এই যে শাল-সেগুনের গভীর অরণ্য, দূরে ঐ যে অস্পষ্ট পাহাড়ের রেঞ্জ, এই যে পুরনো পুরনো ভাঙা বাড়ি—এসবের মধ্যে লুকিয়ে আছে না জানি কত ইতিহাস—কত ভয়ংকর কাহিনি।

এখন শরৎকাল। বেলা ছোটো হয়ে এসেছে। বড্ড তাড়াতাড়ি সন্ধে হয়ে আসছে। এখনও দূরে বাতাসে কাশফুলের মাথাগুলো দুলতে দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ দূরে ঘোর কালো কী একটা বস্তু যেন দৈত্যের মতো মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে বলে মনে হল। এতক্ষণ ওদিকটায় মেঘ ছিল বলে ওটা দেখা যায়নি। এখন মেঘ সরে যাওয়ায় জিনিসটা চোখে পড়ল।

কী ওটা? ছোটো একটা পাহাড়? অথবা দুর্গের আকারে কোনো উঁচু বাড়ি?

যাই হোক, কেন জানি না ঐ দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। কেমন যেন ভয় করে। তাই ঘোর অন্ধকারে ওটা দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হবার আগেই আমি ঘরের দিকে পা বাড়লাম। কিন্তু—

কিন্তু বারে বারেই সেই বস্তুটার দিকে তাকাবার জন্যে মনের মধ্যে উথালপাথাল করতে লাগল। সেই তীব্র আকর্ষণের কাছে আমাকে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতেই হল। ঘরের দিকে আমি দু’পা এগোই আর একবার করে পিছনে ফিরে দেখি।

এক সময়ে আমার এমনও মনে হল ঐ বিশ্রী বস্তুটা অন্ধকারে গা মিলিয়ে দুলতে দুলতে যেন আমাদের হোটেলটার দিকেই এগিয়ে আসছে।

কেন এরকম মনে হল তার কোনো কারণ আজও খুঁজে পাই না। তখনও জানতাম না একটু পরেই আরও কিছু অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হবে।

আমি যখন ঘরের সামনে এসে দাঁড়িলাম তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। খোলা বারান্দায় পায়চারি করতে আসার আগে আমি ঘরের দরজায় শেকল তুলে এসেছিলাম। এখন দরজা খোলবার জন্যে শেকলে হাত দিতে গিয়ে আঁতকে উঠলাম। লোহার মতো একটা কঠিন হাত শেকলটা মুঠোর মধ্যে ধরে আছে যেন দরজা খুলতে দেবে না। আমি চেষ্টা করে উঠলাম, কে?

সঙ্গে সঙ্গে সেই অপরিচিত হাতখানি অদৃশ্য হয়ে গেল। শেকলটা ঝনাৎ করে আপনাই খুলে গেল।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। কোন দিকে সুইচ, কোন দিকে আমার বিছানা, কোন দিকে ড্রেসিং টেবিল সব যেন খুলিয়ে গেল। এদিকে বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা লাফালাফি করছে। এই শরতের সন্ধ্যাতেও কপালে বিনবিনে ঘাম। এখন সর্বাগ্রে দরকার আলো। কিন্তু সুইচটা কোন দিকে?

বেশ কয়েকবার এদিক থেকে ওদিক ঘুরে, দেওয়ালে বার কতক ঠোঙ্কর খেয়ে সুইচটা খুঁজে পেলাম। আলো জ্বলে উঠল, এতক্ষণে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

পুরো এক গেলাস জল খেয়ে আমি বিছানায় বসলাম। তারপর শুয়ে পড়লাম।

এবার ভাবতে লাগলাম, ব্যাপারটা কী হল? আমি শহর কলকাতায় থাকি। এই ধরনের অলৌকিক, অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার মোটেই বিশ্বাস করি না। তা হলে একটু আগে এই যা ঘটল তার ব্যাখ্যা কী? প্রথমটার কথা ছেড়েই দিলাম। ওটা না হয় পরিবেশের প্রভাবে মনের ব্যাপার, কিন্তু শেকল চেপে ধরেছিল যে হাতটা সেটা তো শুধুই মনের ব্যাপার নয়। ‘কে?’ বলে হুংকার দিতেই হাতটা যে সরে গেল সে ব্যাপারটাকে তো ‘কিছু না’, ‘মনের ভুল’ বলে উড়িয়ে দিতে পারব না। তাছাড়া বনাৎ করে শেকলটার খুলে পড়া? আমি তো খুলিনি।

এই সব ভাবছি, এমননি সময়ে সিঁড়ির দিকের দরজায় শব্দ হল ঠুক-ঠুক-ঠুক।

কে আবার এল এখন? মনে পড়ল সুরঞ্জনবাবুর আসার কথা। উনি এলে ভালোই। কিন্তু ওঁকে কি এই যা সব ঘটল, যার কোনো প্রমাণ নেই, তা বলা যাবে?

### পাহাড়ের উপর কেল্লা

সুরঞ্জনবাবু ঢুকলেন হাসতে হাসতে। প্রথমেই বললেন, সিঁড়ির দরজাটা শুধু ভেজিয়ে রেখেছিলেন, খিল দেননি?

অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলাম, তা হবে। সন্ধ্যাবেলাতেই খিল লাগাতে হবে ভাবিনি।

সুরঞ্জনবাবু গার্জেনের মতো উপদেশ দিয়ে বললেন, না-না, সব সময়ে খিল দিয়ে রাখবেন। পাহাড়-জঙ্গলের জায়গা, বিপদ ঘটতে কতক্ষণ?

অবাক হবার ভান করে বললাম, বিপদ? কিসের বিপদ?

সুরঞ্জনবাবু সহজভাবেই বললেন, বিপদ যে কত রকমের হয় আর কখন কোন দিক দিয়ে ঘাড়ে এসে পড়ে তা কেউ বলতে পারে না, সোমেশ্বরবাবু। মোট কথা একটু সাবধানে থাকতে হয়। বাঃ, এর মধ্যেই ঘরটা বেশ গুছিয়ে ফেলেছেন তো!

বলতে বলতে উনি বিছানার ওপর বসে পড়লেন।

বিকলে চা দিয়েছিল?

মাথা দুলিয়ে সাই দিলাম।—তবে ছেলেটা খুব মিশুক বলে মনে হল না। একটু যেন এড়িয়ে চলতে চায়।

আসলে কী জানেন? এ অঞ্চলের লোকেরা যেমন নিরীহ তেমনি ভীতু। ওদের কেবলই ভয় এই বুঝি চাকরি গেল। বড়ো গরিব। অল্পে তুষ্ট। সামান্য বাসি ভাত আর একটু নুন হলেই এরা খুশি। সে তুলনায় হোটেলে তো ওরা রাজভোগ খায়। তাই সব সময় তটস্থ।

এখানকার খাওয়ার স্ট্যান্ডার্ড বোধহয় ভালোই?

সুরঞ্জনবাবু হেসে বললেন, এ বেলা খেলেই বুঝবেন। মাংসে অরুচি নেই তো?

হেসে বললাম, না, মোটেই না।

উনি আমার অনুমতি নিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন।

বললাম, তখন বলেছিলেন এই হোটেলের মালিক দিল্লিতে থাকেন, তা হলে তো আপনার দায়িত্ব অনেকটাই।

সুরঞ্জনবাবু বললেন, তা বলতে পারেন। এক সময়ে রায়পুরে যখন উনি থাকতেন তখন আমার বাবার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব ছিল। নিতান্তই শখ করে রায়পুর-বিলাসপুর থেকে ঢের দূরে এই রকম নির্জন জায়গায় তিনি হোটেল খুললেন। উদ্দেশ্য বাইরে থেকে ভ্রমণবিলাসীরা এসে এখানকার আদিবাসীদের নানা উৎসব, যা একেবারে খাঁটি লোকসংস্কৃতি বলতে পারেন, দেখবার

সুযোগ পায়। আর সে উৎসব বছরে দুটো চারটে নয়, প্রায় প্রতিমাসেই দুটো-তিনটে। আপনিও তো বললেন সেই উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছেন।

বললাম, হ্যাঁ। আমি আদিবাসীদের নিয়ে গবেষণা করি।

তা ছাড়া এখানে নানা খনিজ সম্পদ আছে। যেমন ধরুন কয়লা, ডলোমাইট, বক্সাইট, আয়রন ওর, লাইম স্টোন, টিন, ম্যাঙ্গানিজ—এত খনিজ সম্পদ ভারতবর্ষে আর কোথাও আছে বলে জানি না। আর এই সব খনিজ সম্পদের টানেও ধনী লোকেরা ব্যবসার খাতিরে এখানে আসতে চান। কিন্তু থাকার জায়গা ছিল না। আমার বাবার বন্ধু সেই অসুবিধাটা দূর করলেন। এতটুকু লাভের মুখ চেয়ে নয়, নিতান্তই পরোপকারের জন্য। আর আমাকে দায়িত্ব দিয়ে গেলেন হোটেলটা চালাতে। যাবার সময় একটা অদ্ভুত কথা বলেন, ‘লাভ হলে তোমার, লোকসান হলে আমার।’ বলে সুরঞ্জনবাবু হাসলেন।

বললাম, এ রকম মানুষ বড়ো একটা দেখা যায় না। তা আপনি তো এখানেই থাকেন? হ্যাঁ।

একাই?

হ্যাঁ। একাই বেশ আছি। হোটেলেই খাই। হোটেলেরই ওদিকের একটা ঘরে থাকি। একটু চুপ করে থেকে বললাম, কত বছর হোটেলটা হয়েছে?

তা দশ বছর হল।

রেডি বাড়ি পেয়েছিলেন বলে হোটেল খোলা সম্ভব হলো।

সুরঞ্জনবাবু একটু ভেবে বললেন, তা ঠিক। তাও একরকম বেওয়ারিশ বাড়ি।

আমি চমকে উঠে বললাম, বেওয়ারিশ বাড়ি। মানে?

সুরঞ্জনবাবু বললেন, রতনলালকাকু, অর্থাৎ বাবার সেই বন্ধু অত বড়ো খালি বাড়িটা কিনতে গিয়ে বাড়ির মালিকের সন্ধান পেলেন না। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। তবু কেউ দাবি করল না। স্থানীয় আদিবাসীদের কাছে খোঁজ নিতে যেতেই তারা ভয়ে শিউরে উঠল। ওরা জানাল বাড়িটা ভূতের। দিনের বেলাতেও কেউ ঐ বাড়ির ত্রিসীমানা দিয়ে হাঁটে না।

রতনলালকাকু তবু দমবার পাত্র নন। তিনি আদিবাসীদের সর্দারকে ডেকে জানতে চাইলেন কেন বাড়িটাকে ভূতের বাড়ি বলা হয়। সর্দারের বক্তব্য ইংরেজ সাহেবরা নাকি এখানেই প্রথম লাশকাটা ঘর করেছিল। কত বেওয়ারিশ লাশ এই বাড়ির মাটিতে পৌঁতা আছে তার হিসেব নেই। এমনকি এক যুবরাজের লাশও নাকি এখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এই রকম নানা কথা। গল্পগুলো রতনলালকাকুর মনে ধরল। তিনি ঠিক করলেন স্থানীয় লোকের ভয় দূর করার জন্যে এই বাড়িটাকেই হোটেল বানাবেন। বাইরের পাঁচ-দশ জন লোক যাতায়াত করলেই এখানকার লোকের অহেতুক ভয় দূর হয়ে যাবে।

বুঝলাম।

একটু পরে জিগ্যেস করলাম, আপনি তো অনেক দিন এখানে আছেন। তেমন কিছু—সুরঞ্জনবাবু বললেন, তেমন কিছু বলতে কী জানতে চাইছেন? ভূত-তুত? না মশাই, তেমন কিছু ঘটেনি আজ পর্যন্ত। আশা করি ঘটবেও না। তবে—;

তবে কী?

তবে মাঝে মাঝে উত্তর দিক থেকে, ঐ পাহাড়ের দিক থেকে একটা দমকা বাতাস বয়ে যায়। এখানকার লোকেরা ঐ বাতাসকে বড্ড ভয় পায়। বলে প্রেতের দীর্ঘনিশ্বাস।

বললাম, আপনিও কি তা বিশ্বাস করেন?

পাগল!

একটু থেমেই আবার বললেন, যাক ওসব বাজে কথা। যেজন্যে আপনি এসেছেন অর্থাৎ আদিবাসীদের পালপার্বণ দেখতে, তার কোনো প্রোগ্রাম করেছেন? কবে কোনটি দেখবেন? তা হলে আপনার সঙ্গে একজন অভিজ্ঞ লোক দিতে পারি।

বললাম, সবে তো আজ এলাম। কাল ঠিক করব। আর এ বিষয়ে আপনার সাহায্য নিতেই হবে।

হ্যাঁ, অবশ্যই বলে দেব কোন সময়ে কোন উৎসব। পোলা আর তিজা উৎসব শেষ হয়ে গেছে। এর পরই গণেশ পূজো। তারপর নবরাত্রি, তারপর দশেরা—সুরঞ্জনবাবু থামতেই চান না। অথচ আমার মাথায় তখন অন্য রহস্যের জাল জড়িয়ে আছে।

বললাম, আচ্ছা, মিস্টার ভিরাবাণ্ডর খবর কী? এসেছেন?

সুরঞ্জনবাবু বললেন, না। টাকা জমা দিয়ে গেছেন যখন আসবেন নিশ্চয়। তবে কী জানেন? এঁদের কথার ঠিক নেই। আমাদের মতো সাধারণ মধ্যবিত্তদের পাত্তাই দিতে চান না।

জিগ্যেস করলাম, ওঁকে কোন ঘরটা দেবেন ভাবছেন?

উনি তো এই ঘরটাই নেবার জন্যে জেদাজেদি করছিলেন।

তা দিলেন না কেন? আমার অন্য ঘর হলেও চলত।

সুরঞ্জনবাবু বললেন, তা জানি। কিন্তু যে ঘরটা একজনকে দেওয়া হয়ে গেছে সেটাই তাঁকে পেতে হবে তার কী মানে আছে? আমায় আবার টাকার লোভ দেখাচ্ছিলেন!

তা হলে কোন্ ঘরটা দেবেন?

ভাবছি আপনার পাশের ঘরটা কিংবা তার পরেরটা।

ক'দিন থাকবেন?

এক সপ্তাহের জন্যে বুক করেছেন। শেষ পর্যন্ত কদিন থাকবেন বলতে পারি না।

কথার জের ধরে বললাম, উনি কি ব্যবসার ধান্দাতেই এখানে এসেছেন?

তাই প্রথম মনে হয়েছিল। কারণ বড়োলোকেরা খনিজ সম্পদের খোঁজেই এখানে আসেন।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এঁর অন্য কোনো ধান্দা আছে।

কী রকম?

সুরঞ্জনবাবু পকেট থেকে তাদের মতো একটা রঙিন নকশা সাবধানে বার করে দেখালেন।

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। বললাম, এর অর্থ কী? কোথায় পেলেন এটা?

সকালে কাউন্টারের সামনে যেখানে দাঁড়িয়ে মিস্টার ভিরাবাণ্ড কথা বলছিলেন, উনি চলে যাবার পর সেইখানেই এটা কুড়িয়ে পাই। বোধহয় পার্স খুলে টাকা দেবার সময় পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু জিনিসটা কী?

এটা একটা সাংকেতিক চিহ্ন।

হেসে বললাম, স্কুল লাইফে এই রকম গুপ্তধন সংক্রান্ত ম্যাপ বা সাংকেতিক চিহ্ন নিয়ে অনেক অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়েছি।

সুরঞ্জনবাবু কিন্তু হাসলেন না। বললেন, বইগুলো হয়তো লেখা হয়েছিল কল্পনা করে। কিন্তু তখনকার দিনে অনেক রাজা-মহারাজা জমিদারেরা শত্রুর আক্রমণের ভয়ে ধনসম্পত্তি কোনো গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখতেন যাতে শত্রু প্রাসাদে ঢুকে সেসবের স্বত্বান না পায়।



আবার সেই গোপন জায়গাটা যাতে পরে উত্তরাধিকারীরা খুঁজে পায় তার জন্যে নকশা বা সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবস্থা থাকত।

বললাম, সে তো জানি। কিন্তু এই ছত্রিশগড়ে রাজা-জমিদার কোথায়?

সুরঞ্জনবাবু বললেন, আজ নেই, কিন্তু একদিন ছিল।

ও আচ্ছা, আপনি ছেদী রাজবংশের কথা বলতে চাইছেন?

হ্যাঁ। আজকের ‘ছত্রিশগড়’ নামটা শুধু ‘ছেদিসগড়’ থেকেই হয়নি। ছেদী রাজাদের ছত্রিশটা বিশাল বিশাল গড় অর্থাৎ দুর্গ ছিল। সেসব দুর্গের মধ্যে রতনপুর, বিজয়পুর, মারো, ছুরি, কেন্দ্রা, পেড্ডা এইরকম কতগুলো গড় এখনও দেখা যায়। বাকিগুলি ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। এইসব গড়ে শত্রু আক্রমণকালে গোটা রাজপরিবার তাঁদের সোনাদানা, হিরে, জহরৎ সব নিয়ে আত্মগোপন করে থাকতেন। কাজেই এইসব পরিত্যক্ত গড়গুলোতে—

বললাম, বুঝতে পেরেছি। গোপন ঐশ্বর্য থাকা সম্ভব। তা আপনি কি মনে করে মিস্টার ভিরাবাণ্ড সেই রকম কোনো গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছেন?

অসম্ভব নয়।

আমি একটু ভেবে বললাম, আচ্ছা, উনি এই ঘরটা নেবার জন্যে এত ঝুলোঝুলি করছিলেন কেন?

সে তো শুনলেনই। ঘরটা নাকি পয়া। অদ্ভুত কথা। যিনি আগে কোনো দিন এখানে আসেনইনি, তিনি কী করে জানলেন এই ঘন্টা পয়া? ভদ্রলোক ভেবেছেন আমি এতই বোকা! শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলেন নিজে না এলেও আগে যারা এসেছিল তাদের কাছ থেকেই নাকি শোনা। গুল মারার আর জায়গা পায়নি। সত্যি বলছি সোমেশ্বরবাবু, ভদ্রলোকের এইরকম চালবাজি দেখে আমি খুব বিরক্ত হয়েছি।

একটু থেমে ফের বলতে লাগলেন, এই ঘরটার ওপর তাঁর আগ্রহের কারণ সম্বন্ধে আমার এখন অন্য ধারণা হয়েছে।

সুরঞ্জনবাবু একটু থামলেন।

সাগ্রহে জিগ্যেস করলাম, কী?

প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের মধ্যে হুৎপিণ্ডটা লাফালাফি শুরু করে দিল। সত্যি কথাই বলছি—আমি হঠাৎ ভয় পেলাম। মনে হল এই ঘর সম্বন্ধে কোনো কথা এই রাত্রিবেলা না তুললেই পারতাম। কারণ যে যাই বলুক আজই সম্বন্ধেবেলা এই ঘরের শেকল খুলতে গিয়ে আমার হাতের ওপর যে অদৃশ্য হাতের চাপ অনুভব করেছিলাম তা তো ভুলতে পারিনি।

সুরঞ্জনবাবু বললেন, আপনার ঘরের বারান্দা থেকে সোজা উত্তর দিকে তাকালে অল্প দূরে একটা পাহাড়ের ওপর দুর্গ দেখতে পাবেন। ওটা ঠিক দুর্গ কিনা আমার পিতৃদেব কিংবা রতনলালকাকুও বলতে পারেননি। উচ্চতায় ছোটো কিন্তু অনেকখানি জায়গা নিয়ে পাহাড়ের ওপর ওটা বোধহয় একটা গড়ই ছিল। যে কোনো কারণেই হোক ওটার একটা দিক ভেঙে পড়েছে। গড়টা আগাগোড়া কালো পাথরে তৈরি। পাথরে গড়া বাড়ি ভাঙল কী করে সে এক রহস্য। দ্বিতীয় রহস্য হচ্ছে এখান থেকে খুব দূরে না হলেও এটি দিনের বেলাতেও সব সময়ে খালি চোখে দেখা যায় না। পাথরটার রঙ এমনই যে, মাঝে মাঝেই এটা যেন হারিয়ে যায়। আবার হঠাৎই স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। এই গড় নিয়ে এখানে নানারকমের কাহিনি প্রচলিত আছে।

সুরঞ্জনবাবু একটু থামলেন। বললেন, আমার কথাগুলো শুনতে ইন্টারেস্টিং লাগছে?

বললাম, অবশ্যই। কিন্তু বললাম না আজই বিকেলে সেই দুর্গটি দেখতে পেয়েছিলাম।  
 সুরঞ্জনবাবু ফের একটা সিগারেট ধরিয়ে বলতে লাগলেন, অনেক রকম কাহিনি, উপকথা, গালগল্প চলে আসলেও আসল সত্যটা হল ওখানে কোনো একসময়ে ছেদী বংশের এক যুবরাজ থাকতেন। তাঁকে একদিন ওখানেই অতর্কিতে আক্রমণ করে হত্যা করা হয়। তাঁরই অগাধ ধনরত্ন ওই গড়ের মধ্যে কোথাও লুকানো আছে যার সন্ধান সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, ইংরেজ গভর্নমেন্ট পর্যন্ত তন্নতন্ন করে খুঁজেও পায়নি। কেউ কেউ বলেন গড়ের একটা অংশ ইংরেজরাই কামান দেগে উড়িয়ে দিয়েছিল ধনরত্ন হাতাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সফল হয়নি।  
 হোটেলের এই দশ নম্বর ঘরটির বৈশিষ্ট্য দুপুরবেলায় সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপর থাকে তখন এখান থেকে ঐ ভাঙা দুর্গটির ভেতর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায় যা অন্য কোনো জায়গা থেকে দেখা যায় না।

সুরঞ্জনবাবু একটু থামলেন। তারপর বললেন, মনে হচ্ছে ভিরাবাণ্ড সাহেব নিশ্চয় ওখানে যাবার মতলব করছেন। তবে ওখানে গেলে যে কী মারাত্মক বিপদ ঘটতে পারে তা উনি জানেন না।

কীরকম বিপদ একটু বলবেন?

জবাব দেবার আগে উনি একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন। বললেন, রাত নটা বাজতে চলল এখনও সাহেবের দেখা নেই। তারপরই আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন এমনি সময়ে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ওই ওনারা এসে পড়েছেন। আজ আর কথা বলা যাবে না। বলেই উঠে পড়লেন।

### মিস্টার ভিরাবাণ্ডের রাগ

সুরঞ্জনবাবু চলে যেতেই আমি সিঁড়ির দরজায় খিল দিলাম। হোটেলের ছোকরাটি, কী যেন নাম? হ্যাঁ, মহেন্দ্র সেনাপতি, রাতের খাবার দিয়ে গিয়েছিল। রুটি, আলুর দম আর বাটিভর্তি মাংস। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম।

খাওয়া শেষ হলে সন্ধ্যাবেলার কথা মনে পড়তেই আমার কীরকম ভয় করতে লাগল। একা ঘরে রাত কাটানো! আমি এমনিতে মোটেই ভীতু নই। কিন্তু আজ যে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা তো কোনোদিন ভুলতে পারব না।

আমি ঠিক করলাম যত তাড়াতাড়ি মশারি টাঙিয়ে ঘুমিয়ে পড়া যায় ততই ভালো।

ভাবা মাত্র ঘরের দরজায় খিল দিয়ে মশারি টাঙিয়ে শুয়ে পড়লাম।

সবে ঘুম এসেছে এমনি সময়ে পাশের ঘরে হে ইউগোল শুনে ঘুম ছুটে গেল। প্রথমে কিছুক্ষণ লাগল ব্যাপারটা বুঝে নিতে। তারপর যখন টের পেলাম পাশের ঘরে লোক এসেছে, আর তারা ওই মিস্টার ভিরাবাণ্ড ও তার দলবল তখন রাগে আমার মাথা পর্যন্ত গরম হয়ে উঠল। বড়োলোক বলে কি এটুকু বিবেচনা করবে না যে পাশের ঘরে একজন ঘুমোচ্ছে? ইচ্ছে করছিল চৈচিয়ে ধমকে উঠি। কিন্তু আমার ভদ্রতায় বাধল। তা ছাড়া এই রাত্তিরে চৈচামেচি করলে অশান্তিই বাড়বে। বিশেষ যখন ওরা দলে ভারী।

ভাবতে ভাবতে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে চা খেয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখলাম পাশের রুমগুলো বন্ধ। বুঝলাম অনেক রাত পর্যন্ত দাপাদাপি করে তারা এখনও ঘুমোচ্ছে।

আমি আরও কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই কালো কেব্লাটা দেখবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু দেখতে পেলাম না।

সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ নীচ থেকে ব্রেকফাস্ট সেরে ওপরে এসে সবে বসেছি, এমনি সময়ে মিস্টার ভিরাবাণ্ড এসে ঢুকলেন। ভদ্রতা করে অনুমতি নেবার প্রয়োজনটুকুও মনে করলেন না।

ঘরে ঢুকেই তিনি হাঁকড়ে উঠলেন, এই দশ নম্বর ঘরটা আমি চেয়েছিলাম। এটা দেওয়া হল না কেন?

তঁার ধমকানিটা হজম করতে আমার একটু সময় লাগল। তারপর শান্ত গলায় বললাম, কাকে কোন ঘর দেওয়া হবে সেটা ঠিক করেন হোটেলের মালিক। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এই ঘরটার জন্যে আপনার মতো আমি জেদ ধরিনি।

মিস্টার ভিরাবাণ্ড বললেন, ঠিক আছে। এখন ঘরটা আমায় ছেড়ে দিন।

এবার আমি কঠিন স্বরে বললাম, না, এখন আর তা সম্ভব নয়। আমি গুছিয়ে বসেছি।

মিস্টার ভিরাবাণ্ডের মুখটা চাপা রাগে থমথম করতে লাগল। একটু পরে বললেন, এখানে আপনি কতদিন থাকবেন?

বললাম, ঠিক নেই। আপাতত সাত দিন তো বটেই। দরকার হলে আরও বেশি দিন হতে পারে।

এবার উনি অভদ্রের মতো আমাকে কিছু না বলেই আমার বিছানার ওপর পা ক্রস করে বসে বললেন, ঠিকঠাক বলুন তো কী জন্যে এখানে এসেছেন?

ঠিকঠাক কারণটা জানিয়ে দিলেই কথা কাটাকাটি ব্যাপারটা ঘটত না। কিন্তু ঐ যে ‘মেজাজ’ বলে একটা রোগ আছে না ঐতেই বিপদ বাড়ে।

বললাম, সেটা জেনে আপনার লাভ?

উনি দ্বিগুণ রেগে বললেন, লাভ আছে বৈকি।

কিন্তু আমার কোনো লাভ নেই।

তা হলে আপনি বলবেন না?

বললাম আপনাকে বলতে আমি বাধ্য নই। আপনি আমায় বলবেন কি কোন উদ্দেশ্যে আপনারা এখানে এসেছেন?

এর উত্তর না দিয়ে ভিরাবাণ্ড সাহেব উঠে পড়লেন। দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে উত্তেজিত ভাবে বলে গেলেন, আপনি আমায় চেনেন না। আপনার এই অবাধ্যতার প্রতিফল শিগ্গির পাবেন।

আমি ভেবে রেখেছিলাম আজ সকালে সুরঞ্জনবাবুর সঙ্গে বসে আদিবাসীদের কোন কোন উৎসবে যাব ঠিক করে ফেলব। কিন্তু কাল রাতিরে সুরঞ্জনবাবুর কাছে পাহাড়ের ওপরে ঐ রহস্যময় কালো পাথরের দুর্গটার কথা শুনে আর তার আগে সন্ধ্যাবেলায় শেকল খুলতে গিয়ে সেই অদৃশ্য হাতের চাপ আমাকে এতই ভাবিয়ে তুলেছিল যে, আদিবাসীদের উৎসব দেখার ব্যাপারটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল অদৃশ্য হাতের সঙ্গে ঐ রহস্যময় দুর্গের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা।

একটা প্রাচীন দুর্গ বা প্রাসাদ হলেই যে তা রহস্যময় হয় তা নয়। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় ঐ দুর্গ সমেত পাহাড়টা যখন কোন মস্তবলে দূর থেকে একেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল তখন কিছুক্ষণের জন্যে আমি বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম। আর তখনই দুর্গটিকে মনে

হয়েছিল রহস্যময় বলে। তাছাড়া ঐ দুর্গে গেলে কী বিপদ ঘটতে পারে তা সুরঞ্জনবাবুর কাছ থেকে এখনও শোনা হয়নি। আমি তাই মাঝে মাঝেই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই যদি দুর্গটা ভালো করে আরও একবার দেখতে পাই। কিন্তু হতছাড়া ভিরাবাণ্ড সন্ধ্যাবেলাতেই আমার মেজাজটা খারাপ করে দিল।

বেলা যত বাড়তে লাগল ভিরাবাণ্ডের সঙ্গীরা ততই হৈ-হট্টগোল করতে লাগল। এক সময়ে ওরা আমার দরজা লক্ষ করে ইট-পাটকেল এমনকি কাপড়িশও ছুড়তে লাগল। জানলা লক্ষ করে একটা হাঁসের ডিম এমনভাবে ছুড়ল যে আমার বিছানাটা নষ্ট করে দিল। শেষ পর্যন্ত আমি বাধ্য হলাম নীচে গিয়ে সুরঞ্জনবাবুর কাছে নালিশ করতে। সব শুনে সুরঞ্জনবাবু বললেন, কিছু করার নেই, সোমেশ্বরবাবু। কাছেপিঠে পুলিশও নেই যে ডেকে আনব।

তা হলে আমি কী করব?

সুরঞ্জনবাবু বললেন, একমাত্র উপায় আপনি যদি ঘরটা ছেড়ে দেন। মনে হয় তা হলেই উৎপাত থামবে। কিন্তু আমি বলব আরও একটু ধৈর্য ধরে থাকুন। ওরা থেমে যাবেই। ঘরটা ছেড়ে দিলে ওদেরই জিৎ হবে।

বললাম, ঘর আমি ছাড়ব না।

খুব ভালো। তা ছাড়া আমি যা ভেবেছিলাম তাই ঘটতে চলেছে। খুব সম্ভবত ওরা দু-একদিনের মধ্যে ঐ দুর্গের দিকে যাবে। আমি অবশ্য ওদের নিষেধ করব। শোনা না শোনা তাদের মর্জি।

কিন্তু কেন নিষেধ করবেন কাল আপনার কাছ থেকে শোনা হয়নি।

সুরঞ্জনবাবু বললেন, যদি আজ সময় পাই তা হলে বলব।

বিকেলের দিকে ওরা হৈচৈ করে কোথায় বেরিয়ে গেল। নিশ্চয়ই এই অবেলায় গড়ের দিকে যাবে না।

তা হলে?

জাহান্নমে যাক আর যেখানেই যাক ওরা যতক্ষণ না থাকে ততক্ষণ আমার মঙ্গল।

রোদ একটু পড়ে এলে আমি খোলা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়লাম। তারপর উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে রইলাম উত্তর দিকে—যদি সেই ভয়ংকর গড়টা দেখা যায়। কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও দেখা গেল না। তারপর সন্ধ্যার মুখে যখন ঘরে ঢোকবার জন্যে পা বাড়িয়েছি তখন হঠাৎই উত্তর দিকে আকাশের গায়ে পাহাড়ের ওপর কষ্টিপাথরের মতো কালো গড়টা ভেসে উঠল। কিন্তু মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ঐটুকু দেখেই আমি খুশি হলাম বটে কিন্তু গতকালের মতো ওটা এগিয়ে এল না তো।

আমি ধীরে ধীরে ঘরে এসে ঢুকলাম বটে কিন্তু সেই অলৌকিক গড়টা বারে বারে দেখার জন্য মনটা ছটফট করতে লাগল।

### অন্ধকার পাহাড়ে দেওয়ালি?

সন্দের পর ঘরে একলা মুখ বুজে কী করব ভেবে যখন কুল পাচ্ছি না তখন মনে পড়ল সুরঞ্জনবাবু বলেছিলেন আজ সন্ধ্যায় উনি আসবার চেষ্টা করবেন। উনি এলে সময় কাটাবার কোনো অসুবিধে হবে না। কিন্তু উনি আজ আসবেন কী?

ভাবতে ভাবতেই দরজায় মুদু শব্দে কড়া নড়ে উঠল। আমি দরজা খুলে দিলাম।

ওর ঠোঁটে ভদ্রতাসূচক এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল।

ভাবছিলেন তো বুঝি এলাম না?

হাসলাম। বললাম, আসলে আপনার সঙ্গটুকু পাবার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

ধন্যবাদ। বলে একটু হাসলেন। তারপর বললেন, দুদিন তো কেটে গেলে। আদিবাসীদের উৎসব কবে কোনটে দেখবেন ঠিক করলেন কিছু?

অন্যমনস্কভাবে আমি মাথা নাড়লাম।

সুরঞ্জনবাবু একটু যেন অবাক হয়ে বললেন, এখানকার উৎসবগুলো দেখবার টানেই তো আপনি এখানে এসেছেন।

বললাম, ঠিকই বলেছেন। কিন্তু কষ্টিপাথরের মতো কালো দুগটি আর ছেদী রাজবংশের সেই হতভাগ্য যুবরাজ এখন আমার মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। আপনি ভাবতে পারবেন না সুরঞ্জনবাবু, ওই কালো দুগটি কীভাবে আমাকে টানছে।

সুরঞ্জনবাবু বললেন, তাই বলে ভুলেও যেন ঐ দিকে যাবেন না। তা হলে আর বেঁচে ফিরতে হবে না।

হ্যাঁ, এইরকম একটা বিপদের কথা আপনি সেদিন বলেছিলেন বটে।

না, সেদিন বলার সুযোগ পাইনি। আজও সুযোগ নেই। এখনই হয়তো মিস্টার ভিরাবাণ্ড সদলবলে এসে পড়বেন। আপনার সঙ্গে গল্প করছি দেখলে মোটেই খুশি হবেন না। আর উনি বিরক্ত হলে আমাদেরও শাস্তিতে থাকতে দেবেন না।

উনি বিরক্ত হবেন? কেন?

সুরঞ্জনবাবু হাসলেন একটু। বললেন, এই ঘরটা নিয়ে আপনি আমি দুজনেই ওঁদের শত্রুপক্ষ হয়ে গেছি। আর এই সব শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা তাঁদের শত্রুপক্ষকে ‘টাইট’ দেবার জন্যে অনেক কিছুই করতে পারেন। অথচ আমরা দুজনে ঠেকাতে পারব না।

একটু থেমে বললেন, শুনুন, আমার মুখ থেকে শোনার চেয়ে এই পাতলা বইটা চুপচাপ পড়ে ফেলবেন। অনেক সত্য ঘটনা জানতে পারবেন। তবে দেখবেন বইটা যেন অন্য কারও চোখে না পড়ে। বলে খবরের কাগজে মলাট দেওয়া একটা চটি বই আমার হাতে দিলেন।

পাতা উন্টে আমি তো অবাক। ইংরিজিতে লেখা বই। বহু পুরনো। তাও ছাপা নয়। হাতে লেখা। পুঁথির মতো। তুলোট কাগজের মতো পুরু কাগজে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। বহু জায়গা পোকায় কাটা।

এই বই আপনি কোথায় পেলেন?

বাবার দেওয়াল-আলমারিতে ছিল। সম্ভবত রতনলালকাকু বাবার কাছে রাখতে দিয়েছিলেন। ঐ দুর্গে যে রাতে যুবরাজকে হত্যা করা হয় সে সময়ে একজন ইংরেজ ওখানে গোপনে ঢুকে পড়েছিলেন। আড়ালে, লুকিয়ে লুকিয়ে স্মিথ সাহেব যা কিছু দেখেছিলেন তা নোট করে নিয়েছিলেন। স্মিথ সাহেবের সেই সব নোট নিয়েই এই ডায়েরি। নিন রাখুন। যদি সম্ভব হয় আজ রাতিরেই পড়ে ফেলে কাল সকালে আমায় ফেরত দেবেন।

তা না হয় দিলাম, কিন্তু সেই যে সেদিন সন্ধ্যাবেলা শেকল খুলতে গিয়ে আমার হাতের ওপর অন্য এক অদৃশ্য হাতের চাপ পড়েছিল সে কথা তো ভুলতে পারছি না। তাই সুরঞ্জনবাবুকে বলে ফেললাম, আচ্ছা, আমায় একটা কথা বলুন তো, ঐ কেব্লা আর এই হোটেলবাড়ি— এ দু-এর মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি?

আছে বৈকি। তবে এখন বলতে পারব না। এইটেও আপনি রাখুন। বলে তাসের মতো পুরু রঙিন ছক কাটা একটা কার্ড আমার হাতে দিলেন।

বুঝতেই পারছেন এটা একটা নকশা যেটা ভিরাবাণ্ডের পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল।

এটা ওঁকে দেননি?

না, হাতে হাতে ফেরত দিলে সাহেব বুঝে নেবে আমি ব্যাপারটা জেনে গেছি। তাই দিইনি। এখন অনুগ্রহ করে আপনি এটা সাহেবকে গোপনে দেবার ব্যবস্থা করুন।

ওঁর কথা শুনে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। বললাম, আমি কেমন করে দেব?

সে ব্যবস্থা আছে। ন' নম্বর আর দশ নম্বর ঘরের মধ্যে দেখুন কাঠের পাটিশান। ঐ ঘরে ভিরাবাণ্ড থাকেন। কাঠের পাটিশানের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম ফাঁক আছে। খুঁজলেই দেখতে পাবেন। যখন ঘরে কেউ থাকবে না তখন ঐ ফাঁক দিয়ে কার্ডটা জোরে ঠেলে দেবেন। কার্ডটা হয় ওদের বিছানায় নয় মাটিতে পড়ে থাকবে। ভিরাবাণ্ড ভাবতেই পারবেন না আপনি ওটা ফেলেছেন।

আমি বললাম, তাতে আমাদের কী লাভ?

সুরঞ্জনবাবু বললেন, ভিরাবাণ্ড এখনও জানেন না কেল্লার ঐ সাংকেতিক কার্ডটা তাঁর কাছে নেই। ওটা হঠাৎ পড়ে থাকতে দেখলে নিশ্চয় ঘাবড়ে যাবেন। মনে করবেন এটা কোনো অলৌকিক ব্যাপার। বলেই তিনি সাবধানে চলে গেলেন। যাতে ভিরাবাণ্ডর সামনে পড়ে না যান।

সুরঞ্জনবাবু চলে যেতেই আমার মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। এখন সবে সঙ্গে সাড়ে সাতটা। রাত দশটার আগে ঘুমনো যায় না। তা হলে এই দীর্ঘ সময় কী করব?

একবার ভাবলাম এখন দোতলায় কেউ নেই। এই সুযোগে যদি নকশাটা পাটিশানের ফাঁক দিয়ে চুপি চুপি চালান করে দেওয়া যায় তাহলে একটা বড়ো কাজ হয়।

এই কথা ভেবে আমি ঘরের আলো নিভিয়ে একটা টর্চ নিয়ে পাটিশানের গায়ে কোথায় চিড়টা আছে, খুঁজতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরেই চিড়টা আবিষ্কার করলাম। এইবার বাকি কাজটুকু খুবই সহজ। তবু—

তবু নকশাটা হাতে নিয়েও তখনই পাটিশানের মধ্যে দিয়ে গলাতে গিয়ে হাত কেঁপে উঠল। ভাবলাম কার্ডটা নিরাপদে ন' নম্বর চালাই করে দিলেও ঘরে ঢুকেই আকস্মিক ভাবে ওটা পড়ে থাকতে দেখলে সাহেব যে ক্ষেপে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। আর সেই রাগটা এই রান্তিরে কার ওপর যে অঘটন ঘটবে ভেবে আমি রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম।

কী করব ভাবছি এমনি সময়ে বাইরে গাড়ির শব্দ শুনলাম। বুঝলাম ওনারা এলেন।

এলেন তো বটেই কিন্তু একটা হোটেলের ঐভাবে যে কেউ আসতে পারে তো ভাবা যায় না।

শুধু বুটপরা মিলিত পায়ের শব্দই নয়, সেই সঙ্গে মিলিত গলায় অদ্ভুত সুরে ইংরিজি বাংলা মেশানো গান গাইতে গাইতে সিঁড়ি বেয়ে ক্রমশ উপরে উঠে আসতে লাগল। আমি তাড়াতাড়ি আলো জ্বলে ঘরে খিল লাগিয়ে বসে রইলাম।

গানের কথা মাথাখুঁজি কিছু বুঝতে পারছিলাম না। হেঁড়ে গলায় মিলিত সুর থেকে মাঝে মাঝে যে কয়েকটা কথা কানে আসছিল তা এইরকম.....Let us enjoy.....পরোয়া করি না কাউকে ভাই!.....we don't sleep....ঘুমাতে দেব না কাউকে!.....হিপ্ হিপ্ হু রে!.....

উন্মত্তের মতো গান করতে করতে ওরা যখন আমার ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখন এক এক লাইন গাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার দরজায় প্রতি জনে বুট পরা পায়ে জোরে লাথি মেরে যাচ্ছিল। এ যে কীরকম ভদ্রতা তা বুঝে উঠতে পারলাম না। তা হলে এরা তো দরজা ভেঙে ঢুকে আমায় শেষ করে দিতেও পারে।

অতটা অবশ্য ওরা করল না। ঘরের মধ্যে ঢুকে ওরা বোধহয় হাত ধরাধরি করে নাচতে নাচতে গানটা পুরোপুরি গাইল। গানটা এইরকম—

Let us dear friends, let us enjoy.

পরোয়া করি না কাউকে ভাই,  
করি নাকো ভয়।

We don't sleep-sleep at all.

ঘুমোতে দেব না কাউকে জেনো  
গেলো শুধু ব্রান্ডি আর জল।

হিপ্ হিপ্ হ্র রে!

হিপ্ হিপ্ হ্র রে!

আনন্দে মেতেছি আমরা

আনন্দের গাহি জয়।

আনন্দ করতে জানে যারা

আনন্দেতেই রয়।

Let us enjoy.

এমন স্বর্গীয় সংগীত কার রচনা জানি না, এ গান লেখার উদ্দেশ্য কী তাও জানি না। উদ্দেশ্য যেটা প্রধান তা হচ্ছে আমাকে সব রকমে বিরক্ত করা। আমার ঘুমের মাথা চিবিয়ে যাওয়া।

বেশ, তাই হোক। আমি ঘরের আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।...

তারপর কখন ওদের নাচগান থেমেছিল জানি না, কিন্তু যখন আমার ঘুম ভাঙল তখন গোটা দোতলাটা শান্ত, নিস্তব্ধ।

এরকম মাঝরাতে আমার বড়ো একটা ঘুম ভাঙে না। কিন্তু হঠাৎ আজ কেন ভাঙল ভাবতে ভাবতে আমি অন্ধকার ঘরের চারিদিক দেখতে লাগলাম।

না, অন্য দিনের মতোই সব ঠিকঠাক। আমার ঘরের জানলাগুলো রাস্তার ও খোলা থাকে। হঠাৎ উত্তর দিকের জানলাটার ওপর নজর পড়ল। চমকে উঠলাম। উঠে বসলাম। ভালো করে চোখ রগড়ে দেখলাম—না, ভুল দেখছি না।

অনেক দূরে শাল, সেগুন আর অর্জুন গাছের অরণ্যের ঘন কালো অন্ধকারের মাথার ওপর অনেকগুলো আলো টিপ্ টিপ্ করে জ্বলছে। মনে হচ্ছে যেন ঘোর অমাবস্যায় দেওয়ালির রাতে অজস্র প্রদীপ জ্বলছে।

আবাক হয়ে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়লাম। আবারও মনে হল, না চোখের ভুল নয়। সত্যিই পাহাড়ের ওপর সেই ভাঙা গড়ের অলিন্দে অলিন্দে কে আলো জ্বেলে রেখেছে।

কিন্তু ঐ জনশূন্য অন্ধকার পাহাড়-দুর্গে এই গভীর রাতে কারা প্রদীপ জ্বেলে রাখল? কেন জ্বালল?

আমি স্তম্ভিত হয়ে দেখতে লাগলাম। এই আলোর মালা কি আমার পথের দিশারী?

হঠাৎ আলোগুলি প্রায় একসঙ্গেই নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিক থেকে হু হু করে একটা দমকা বাতাস সবগে বয়ে এসে হোটেল বাড়িটার ওপর আছড়ে পড়ল। আমি ছুটে গিয়ে ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিলাম।

## স্মিথের ডায়েরি

তুলোট কাগজের ওপর হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিটি পড়তে আমার মাত্র এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট লাগল। অবশ্য আমাকে খুব সাবধানে পড়তে হয়েছিল, যাতে পুরনো কাগজ মুড়মুড় করে ভেঙে না যায়। বেশ কয়েকটি পাতার লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছিল। অনেক জায়গায় আবার পোকায় কেটে দেওয়ায় লেখা পরিষ্কার পড়াও যাচ্ছিল না।

একটা জিনিস বুঝতে পারছিলাম, স্মিথ সাহেব শুয়ে বসে আরাম করে চা চুরুট খেতে খেতে বই লেখেননি। রুদ্ধশ্বাস বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে যা যা রোমাঞ্চকর ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিলেন শুধু সেগুলোই নোট করেছিলেন। এমনও হয়েছে কোনো কোনো লাইন শেষ করতেও পারেননি। ফলে বক্তব্য পরিষ্কার হয়নি।

আরও একটা ব্যাপার—কোন সময়ে ঘটনা ঘটছে সেই সাল-তারিখের কোনো উল্লেখ নেই। নেই কোনো রাজার নাম। এমনকি যে যুবরাজকে হত্যা করা হল তার নামেরও কোনো উল্লেখ নেই। কাজেই এরকম ডায়েরির কোনো ঐতিহাসিক মূল্যই নেই।

এর মধ্যে শুধু আছে একটা দুর্গম পাহাড়ের ওপর কালো রঙের বিরাট একটা দুর্গের কথা—যে দুর্গের মধ্যে প্রাণভয়ে গোপনে আশ্রয় নিয়েছিলেন ছেদী রাজবংশের যুবরাজ। যুবরাজ যাতে সিংহাসনে বসতে না পারেন তার জন্যেই ছেদী বংশের অন্য শরিকরা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। যুবরাজ যে শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের ওপর পাথরের ঐ পরিত্যক্ত ভাঙা দুর্গে ঢুকে লুকিয়ে থাকবেন এটা কেউ ভাবতে পারেনি। ভাবতে পেরেছিলেন শুধু মিস্টার স্মিথ। নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে যুবরাজের সঙ্গে কোনো শুভ মুহূর্তে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। সে বিবরণটাও তিনি ডায়েরিতে লিখে গেছেন। তবে তা খুব সংক্ষেপে, একটা কাহিনির খসড়া হিসেবে। কাহিনিটি এইরকম—

ইংরেজরা তখন ভারতবর্ষে একচেটিয়া ব্যবসা চালাবার জন্যে দেশ জুড়ে কুঠি স্থাপনের নেশায় মেতে উঠেছে। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ গোলকুণ্ডা রাজ্যের অন্তর্গত মুসুলিপটম্ বন্দরে কুঠি স্থাপন করেন। কয়েক বছর পরে তারা পুলিকটের উত্তরে আর্সারগাঁও এ কুঠি নির্মাণ করে। ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে বিজয়নগরের অন্যতম উত্তরাধিকারী চন্দ্রগিরির রাজার কাছ থেকে জমি নিয়ে ইংরেজরা বর্তমান মাদ্রাজ শহরে ‘Fort St. George’ নামে নতুন বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে।

এইরকম সময়ে স্মিথ কয়েকজন ইংরেজ ব্যবসায়ীর সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান। উদ্দেশ্য কোন জায়গার কোন কৃষিজাত দ্রব্য নিয়ে ব্যবসা করলে প্রচুর টাকা উপার্জন হতে পারে তার খোঁজখবর নেওয়া।

একদিন এক ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাবার সময়ে একটা বিষধর সাপ স্মিথকে তাড়া করে। স্মিথ তাড়াতাড়ি গাছে উঠে পড়েন। স্মিথ যদি একবার চিৎকার করে উঠতেন তাহলে তাঁর দুর্ভাগ্য এত দূর গড়াত না। কিন্তু সামান্য সাপের তাড়া খেয়ে একজন ইংরেজ যুবক ভয়ে চৈতন্যে উঠবে স্মিথ তা ভাবতেই পারে নি। ফলে অনেকক্ষণ পরে সাপটা চোখের আড়ালে চলে গেলে স্মিথ যখন গাছ থেকে নেমে এলেন তখন তাঁর সঙ্গীরা অনেক দূর চলে গেছেন। স্মিথ যে সঙ্গে নেই তা সঙ্গীরা খেয়াল করেননি। গভীর অরণ্যমধ্যে পরস্পরের কাছ থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন।

বিপদের ওপর বিপদ, পথ হারিয়ে স্মিথ যখন উদ্ভ্রান্তের মতো জঙ্গলের পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখন হঠাৎ তিনি একদল দেশীয় শিকারীর খপ্পরে পড়েন। সেই অরণ্যচারী পাহাড়ী



শিকারিরা এরকম কটা চুল, নীলচে চোখ, সাদা চামড়ার মানুষ এর আগে কখনও দেখেনি। ওরা ওঁকে বন্দি করে বেঁধে নিয়ে এল রাজবাড়িতে।

স্মিথের সুন্দর চেহারা দেখে রাজবাড়ির লোকেরা তাঁর ওপর অত্যাচার না করে আলাদা একটা ঘরে রেখে দিল। তাদের কাছ থেকে বেশ আদরযত্ন পেলেন স্মিথ। তবে চিড়িয়াখানায় নতুন কোনো জন্তু এলে লোকে যেমন খাঁচার বাইরে থেকে অবাক হয়ে দেখে, রাজবাড়ির লোকরাও বিদেশি স্মিথকে তেমনিভাবে জাল ঘেরা ঘরের বাইরে থেকে দেখতে লাগল।

এই রাজবাড়ির যুবরাজ (স্মিথ তাঁর ডায়েরিতে নাম দেননি) ছিলেন একটু অন্য ধরনের মানুষ। ভূগোল, ইতিহাস সম্ভবমতো পড়ে তিনি বিদেশের খবর কিছু কিছু রাখতেন। একমাত্র তিনিই ঘরের মধ্যে ঢুকে স্মিথের সঙ্গে আকারে-ইঙ্গিতে কথা বলতেন। এইভাবে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

[এরপর অনেকগুলো পাতা নেই।]....

এই যুবরাজ যখন বুঝলেন স্মিথ শত্রু নন, তখন তিনি-ই দরজার আগল খুলে দিলেন। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন স্মিথ এখন থেকে রাজবাড়ির বাইরেও ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে পারেন। খোঁজ করতে পারেন তাঁর অন্য সঙ্গীদের। যদি তাদের দেখা পান তা হলে তাদের সঙ্গে চলে যেতে পারেন। যদি দেখা না হয় রাজবাড়িতেই স্বচ্ছন্দে ফিরে আসতে পারেন।

সেই মতো স্মিথ সারা দিন দূরে দূরে জঙ্গলে ঘুরতেন। ঘুরতে ঘুরতে একদিন তিনি অদ্ভুত গড় বা দুর্গ দেখতে পেলেন। একটা পাহাড়ের ওপর কেমনটা। পাহাড়টা ছোটো হলেও জঙ্গলে ঢাকা।

একদিন তাড়াতাড়ি দুপুরের খাওয়া সেরে, একটা ঝকঝকে ফলা বসানো বর্শা হাতে স্মিথ সেই পাহাড়ের নীচে এসে দাঁড়ালেন। সেই যে সেদিন তাঁকে সাপে তাড়া করেছিল, সেই থেকে তাঁর সাপে খুব ভয়। বর্শার ফলা দিয়ে ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করতে করতে তিনি কোনো রকমে পাহাড়ে উঠে গড়ের সিংহদ্বারের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

নামেই ‘সিংহদ্বার’। সত্যিই একদিন পাথরে তৈরি বিরাট সিংহদ্বার ছিল। কিন্তু আজ তার ভগ্নদশা। শুধু সিংহদ্বারটাই নয়—সেই বিশাল প্রাসাদপুরীর একদিকটা একেবারে কে যেন ভেঙে ফেলে দিয়েছে।

কেন?

ডায়েরির এক জায়গায় যা লেখা বাংলায় অনুবাদ করে পাঠকদের উদ্দেশে তা লিপিবদ্ধ করি—

‘...আমি যখন সিংহদ্বার পেরিয়ে প্রাসাদের ভেতরে প্রবেশ করলাম তখন কেন যেন আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল। অজানা ভয়ে আমার গা শিউরে উঠল। অথচ তখনও পর্যন্ত একমাত্র সাপের ভয় ছাড়া অন্য কোনো ভয়ের মুখোমুখি হইনি। প্রাসাদের ঘরগুলি অত্যন্ত ঠান্ডা ছিল। আমার মনে হচ্ছিল হিমশীতল পরিবেশ ছাড়া অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতাই আমার বুকের ধুকপুকানি বাড়িয়ে দিচ্ছিল। আমার এও মনে হচ্ছিল এমন নিস্তব্ধতা বুঝি পৃথিবীর আর কোনো জায়গায় নেই। আর এইরকম অন্ধকার নিস্তব্ধ জায়গাতেই মানুষকে নিশ্চিন্তে গোপনে হত্যা করা সহজ হয়।...’

প্রাসাদের ভগ্ন অংশটা বারবার দেখে আমি স্থিরনিশ্চয় হলাম যে, এই অংশটি কোনো এক সময়ে তোপ দেগে ভাঙা হয়েছে। আর এর কারণ—বহু দিন থেকে চলে আসা জনশ্রুতি—এই প্রাসাদের কোনো অংশে রাজ-ঐশ্বর্য লুকানো আছে। আর এই রকম রাজ-ঐশ্বর্য যেখানেই

গোপনে সঞ্চিত থাকে সেখানেই তার এক মহাশক্তিদর রক্ষকও নিযুক্ত থাকে। এ বিশ্বাস ভারতেও প্রচলিত আছে।

এই ডায়েরি যখন থেকে আমি লিখছি, তখন থেকে কোনো একদিনের জন্যেও সেই রক্ষককে আমি চাক্ষুষ দেখতে পাইনি। সেটা বড়ো আশ্চর্য লাগে। আরও কথা এই যে....’

এরপর ডায়েরির কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তারপর যে অংশ শুরু হয়েছে তাতে স্মিথ সাহেব দেখাচ্ছেন—রাজপ্রাসাদে যুবরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠেছে। আর স্মিথ যথাসম্ভব নিজেকে গোপন রেখে যুবরাজকে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন।

ক’দিন পর রাজপ্রাসাদের মধ্যেই বিপক্ষ দলের সঙ্গে যুবরাজের দলের যুদ্ধ বেধে গেল। যুদ্ধে পরাজিত যুবরাজ কোনোরকম প্রাণ হাতে করে রাজপ্রাসাদ ছাড়লেন। সঙ্গে বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো রইলেন একটি মাত্র মানুষ—স্মিথ।

স্মিথ রাতের অন্ধকারে যুবরাজের হাত ধরে ভয়াবহ অরণ্য অতিক্রম করে তাঁকে এনে তুললেন পাহাড়ের ওপরের সেই পাথরের ভাঙা দুর্গে। যুবরাজকে বোঝালেন—এই পরিত্যক্ত জায়গায় জনমানব ঢোকে না। তোমার পক্ষে এইটেই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়। আমি রোজ একবার করে এখানে লুকিয়ে আসব। তোমার খাবার দিয়ে যাব। একা হলেও ভয় পেও না। এখানে অন্তত একজন প্রচণ্ড শক্তিদর রক্ষক আছে বলে আমি বিশ্বাস করি যে গুপ্ত রাজ-ঐশ্বর্য পাহারা দেয়। তাকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু সে আছে। বিপদে তার কাছে আত্মসমর্পণ করো।

যুবরাজ একটি কথাও বলেননি। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন।

মাটিতেই একটা চাদর পেতে যুবরাজ শুয়ে থাকেন।

তৃতীয় দিন স্মিথ যুবরাজের সঙ্গে দেখা করতে এসে থমকে গেলেন। দেখলেন যুবরাজের মুখে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। তিনি জানতে চাইলেন যুবরাজ কি অসুস্থ?

তার উত্তরে যুবরাজ সভয়ে জানালেন যে গত রাতে তিনি যখন ঘুমোচ্ছিলেন তখন তাঁর গায়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত ওপর থেকে পড়ে। তাজা রক্ত!...রক্ত কোথা থেকে এল সকালে উঠেও তার তল্লাশ করতে পারেননি। তবে পাথরের দেওয়ালে স্মিথ নিজের চোখে অনেকগুলো রক্তমাখা হাতের ছাপ দেখেছেন যা আগে কোনোদিন দেখেননি। স্মিথ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। রক্তের ফোঁটা কেমন করে পড়ল পাথরের ছাদ থেকে? পাথরের দেওয়ালে রক্তমাখা অতবড়ো হাতের ছাপই বা কার?

এবার স্মিথকে যুবরাজ ছাড়লেন না। তাঁর কাছে কাছেই থাকতে অনুরোধ করলেন। স্মিথ থেকে গেলেন। সারা দিন প্রাসাদের ছাদ, প্রত্যেকটি ঘর, অলিগলি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন। কিন্তু কোনো মানুষের অস্তিত্ব খুঁজে পেলেন না। তাঁর ধারণা ছিল এই প্রাসাদে নিশ্চয় গুপ্তধন আছে। আর তা পাহারা দেবার জন্যে মহাশক্তিসম্পন্ন কোনো অশরীরী আত্মা নিযুক্ত আছে। আজ এই রক্ত দেখে সেই ধারণা বদ্ধমূল হল। এমনকি যুবরাজের ঘরে রক্তমাখা হাতের ছাপ দেখে তাঁর এমনও মনে হল কোনো অশুভ ঘটনা খুব তাড়াতাড়ি ঘটতে চলেছে।

ঘটনাটা ঘটল সেই রাত্তিরেই। হঠাৎ অন্ধকার অরণ্যের বুক বিদীর্ণ করে জ্বলে উঠল কয়েকশো মশাল। শত্রুপক্ষ হন্যে হয়ে ক’দিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিল যুবরাজকে। তারপরে কী করে যেন ওরা খোঁজ পেল যুবরাজের। তারপরেই—

ঘটনাটা ঘটে গেল স্মিথের সামনেই। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে আত্মরক্ষার জন্যে অন্ধকারে গা ঢাকা দিলেন স্মিথ।

—ডায়েরি প্রায় এখানেই শেষ। তার পরে যেটুকু আছে তার বেশির ভাগ জায়গাই পোকায় কাটা। তবু তা থেকে যেটুকু উদ্ধার করা সম্ভব হল তা এইরকম—

স্মিথ লিখছেন, যদিও আমি রাজবাড়ির লোকেদের দৃষ্টি এড়িয়ে সেই রাতে অনেক দূরে পালিয়ে এসেছিলাম, এবং পরে একটি নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তবুও মাঝে মাঝে গভীর রাতে পাহাড়ের ওপর সেই গড়ে যেতাম। কী যে এক অসাধারণ শক্তি আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করত তা লিখে বোঝানো যাবে না।

গভীর রাতে সেই কালো পাথরে তৈরি প্রাসাদের সিংহদ্বার অতিক্রম করে ভেতরে ঢুকতেই দেখতে পেতাম একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে।

কে সে আমি আজও জানি না। সে কি যুবরাজের প্রেতাশ্বা, না গুপ্ত রাজভাণ্ডারের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রহরী?

ভয়ে আমার হাত-পা হিম হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসি। কিন্তু —

কিন্তু দুদিন পর আবার যাই। আবার তার দেখা পাই....

আর লিখতে পারি না। মনে হয় এখানেই একদিন আমার মৃত্যু হবে। কারণ ঐ তীব্র আকর্ষণ মৃত্যুর হাতছানি ছাড়া আর কিছু নয়.....।

### জ্যোৎস্না রাতের অলৌকিক মায়াম

দুটি কাজ আমি নির্বিয়ে শেষ করেছি। একটি ডায়েরিটা পড়ে ফেলা। আর একটি দুর্গম দুর্গের ভিতরে ঢোকান সাংকেতিক চিহ্ন আঁকা কার্ডটি পার্টিশানের ফাঁক দিয়ে পাশের ঘরে নিঃশব্দে ফেলে দেওয়া। ছকটা নিশ্চয় ভিরাবাণ্ডর চোখে পড়েছে। কিন্তু সেটা পেয়ে তাঁর মনে যে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা আমি এখনও টের পাইনি।

সুরঞ্জনবাবুকে ডায়েরিটি ফেরত দেবার সময়ে উনি আমাকে জিগ্যেস করলেন, সব কথাই আপনি তো জানতে পারলেন। বোধহয় এর চেয়ে ভালো করে আমি আপনাকে কিছু বলতে পারতাম না।

বললাম, তা ঠিক।

তা হলে বুঝতে পারছেন জায়গাটা বিপজ্জনক কী কারণে?

বললাম, একটা জিনিস আমার কাছে এখনও স্পষ্ট নয়—

আমার কথা চাপা দিয়ে সুরঞ্জনবাবু বললেন, বুঝেছি। জানতে চাইছেন যে প্রেতকায়াকে স্মিথ দেখেছিলেন সেটা কার? রাজভাণ্ডারের কল্পিত অশরীরী রক্ষকের, না যুবরাজের?

বললাম, ওটার মীমাংসার জন্যে আমার আগ্রহ নেই। আমার কৌতূহল পাথরের ছাদ চুঁইয়ে রক্ত পড়া বা দেওয়ালে রক্তমাখা হাতের ছাপ কার?

সুরঞ্জনবাবু বললেন, ওটার উত্তর আমিও খুঁজে পাইনি। পরে আর কেউ সেরকম কিছু দেখেছিলেন কিনা জানা নেই। মনে রাখতে হবে ভৌতিক ব্যাপারটাই তো রহস্যময়। তাই না?

আমি কিছুক্ষণ পরে জিগ্যেস করলাম, বলতে পারেন স্মিথ কোথায় মারা গিয়েছিলেন?

সুরঞ্জনবাবু বললেন, সঠিক বলতে পারব না। তবে ডায়েরিটা নাকি পাওয়া গিয়েছিল পাহাড়ের ওপর ঐ গড়েই।

বললাম, তা হলে তো বোঝাই যাচ্ছে ঐ গড়ের তীব্র আকর্ষণে স্মিথ বারে বারে ছুটে গিয়েছিলেন। তারপর আলোর পোকায় মতো ওখানেই একদিন শেষ হয়ে যান।

সুরঞ্জনবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, হয় তো তাই।

একটু থেমে বললেন, তাই আমি বলি দূর পাহাড়ের ওপর ঐ কেল্লার মায়াবী আকর্ষণে যে ছুটে যাবে তাকে মরতেই হবে।

একটু অবাক হয়ে বললাম, আচ্ছা, সুরঞ্জনবাবু, পাথরের তৈরি ভাঙাচোরা একটা কেল্লা সত্যিই হাতছানি দিয়ে মরণডাক ডাকে?

সুরঞ্জনবাবু একটু হাসলেন। ঠাট্টা করে বললেন, আপনিও তো দেখছি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। ও সব চিন্তা ছাড়ুন। কাল আদিবাসীদের একটা বড়ো পরব আছে। আমি ঘোড়ার ব্যবস্থা করব। কাল চলুন, দেখে আসি।

সুরঞ্জনবাবুর আন্তরিক প্রস্তাব আমার কানে গেল না। বললাম, আচ্ছা, আমার পাশের ঘরের বন্ধুদের সাড়া পাচ্ছি না তো।

সুরঞ্জনবাবু বললেন, ওঁরা কখন যে কোথায় যান আমায় বলে যান না। অথচ আমায় একটু জানিয়ে যাওয়া উচিত। হাজার হোক অপরিচিত জায়গা তো।

ওরা ক'জন আছেন?

পাঁচজন।

সবাই বাঙালি?

হ্যাঁ। সেটাই ভাবনার।

জিগ্যেস করলাম, কেন?

বেশি গভীর জঙ্গলে গিয়ে পথ হারালে বাংলা ভাষায় জিগ্যেস করলে কোনো ফল পাওয়া যাবে না।

সুরঞ্জনবাবু নীচে চলে যাবার অল্পক্ষণ পর সিঁড়িতে ভারী জুতোর শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম আমার প্রতিবেশী বন্ধুরা সদলবলেই ফিরল, তবে বেশ ভদ্রভাবে।

তারা খোলার শব্দ পেলাম পর পর তিনটে ঘরে। তারপর জানলা খোলার শব্দ। তারপর একটা ঘরে গেলাস ভাঙার শব্দ....তারপর সব শান্ত—সব স্তব্ধ।

আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম।

অনেক রাতে হঠাৎ আমার ঘুমটা ভেঙে গেল। দূরে কোথায় যেন ঘোড়ার খুরের শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ এখানে ঘোড়ার খুরের শব্দ এল কোথা থেকে ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল আজই সন্ধ্যাবেলা সুরঞ্জনবাবু আদিবাসীদের পরব দেখতে যাবার জন্যে ঘোড়ার ব্যবস্থা করে রাখবেন বলেছিলেন।

তিনি ভালো কথাই বলেছিলেন, কিন্তু একজন পুরোদস্তুর শহরবাসী যে কোনোদিন ঘোড়ায় চড়েনি সে এই জঙ্গল-পাহাড়ের রাস্তায় কীভাবে ঘোড়া চালাবে সেই অসম্ভব, অবাস্তব ব্যাপারটা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত মাথায় ঘুরছিল। তারই ফলে স্বপ্নের মধ্যে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনেছি।

ঘুম ভাঙতেই দেখলাম উত্তর দিকের জানলা দিয়ে একরাশ চাঁদের আলো এসে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে। এখানে এসে, এমন চাঁদের আলো দেখতে পাব আশা করিনি। ধীর মস্থর পায়ে উঠে বেরিয়ে এলাম। এই আমার সেই প্রিয় বারান্দা। শুধু আমারই প্রিয় তা নয়, এই হোটেলে যেই আসে আগেই সে দাবি করে বসে এই দশ নম্বর ঘরটা—ঐ বারান্দাটুকুর লোভে। আমি ভাগ্যবান তাই এই বারান্দা সংলগ্ন ঘরটা আমিই পেয়েছি।

কৃষ্ণপক্ষের নিস্তব্ধ রাতে চাঁদ যেন দু'হাতে করে মুঠো মুঠো জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিয়েছে

গাছগাছালির পাতায় পাতায় আর আমাদের এই হোটেলের বারান্দায় বারান্দায়। যে ভাগ্যবান সেই দেখতে পায়।

আমি এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ উত্তর দিকে ফিরতেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একদিন আমেরিকার উদ্দেশে পাড়ি দিচ্ছিল বিশাল টাইটানিক জাহাজ। অতলান্ত আটলান্টিকের বুক গভীর রাতে চলতে চলতে মায়াবী জ্যোৎস্নায় ঢাকা মহাসাগরের বুক ফুঁড়ে হঠাৎ বিপুলাকার হিমশৈলকে একেবারে জাহাজের সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জাহাজের ওয়্যারলেসে অপারেটর জ্যাক ফিলিপস যেমন হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন, আমিও তেমনি জ্যোৎস্নার আলোয় হোটেলের একেবারে সামনে সেই দুর্গ-প্রাসাদটাকে দেখে ভয়ে বিহ্বল হয়ে গেলাম।

এই নিয়ে দু'বার ওটাকে এত কাছ থেকে দেখতে পেলাম। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। অল্প পরেই সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপরেও কতক্ষণ খোলা বারান্দায় আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম খেয়াল ছিল না। এক সময়ে হুঁশ হল। রাত বোধহয় তখন তিনটে। আমি ধীরে ধীরে ঘরে এসে ঢুকলাম আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল কিছু একটা যেন ঘর থেকে বেরিয়ে আমার গা ঘেঁষে ছুটে বারান্দার পাঁচিলের দিকে গেল। তারপর পাঁচিলে উঠে শূন্য ঝাঁপ দিল।.....

আমি কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় বসে পড়লাম।

### মৃত্যুর হাতছানি

এবার নিয়ে দু'বার হল এই হোটেলে আমার দশ নম্বর ঘরে ভয়ের ব্যাপার ঘটল। প্রথমবার সেই প্রথম দিনের সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঢুকতে গিয়ে শেকলে হাত দিতেই আমার হাতের ওপর অদৃশ্য হাতের চাপ। আর এদিন ভোর রাতে আমারই ঘরের মধ্যে ছায়ামূর্তির আবির্ভাব। সন্দেহের অবকাশ নেই বিন্দুমাত্র—সেই ছায়ামূর্তিটি আমার গা ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়েছিল। তার পর দোতলার পাঁচিল থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল।

এ সব ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণ থাকে না। কে কী কারণে এই রকম অদ্ভুত আচরণ করল তারও সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। হয় চোখ-কান বুজে বিশ্বাস করতে হয়, নতুবা উড়িয়ে দিতে হয়।

আমি বিশ্বাস করতে চাই না। কিন্তু উড়িয়ে দিতেও পারি না।

আমি প্রথম দিনের ঘটনা সুরঞ্জনবাবুকে বলিনি। কিন্তু দ্বিতীয়বার যে ঘটনা ঘটল তা সুরঞ্জনবাবুকে জানাতেই হবে। কারণ এখন বুঝতে পারছি আমার এই দশ নম্বর ঘরটি আর নিরাপদ নয়।

কোন অশরীরী আত্মা সেদিন কেন আমার হাত চেপে ধরেছিল এ যেমন জানা শব্দ তেমনি জানা শব্দ এই ঘরের মধ্যেই কার ছায়ামূর্তি সারারাত আস্তানা গেড়ে ছিল। এ বাড়ি বা এই ঘরের সঙ্গে এই দুটি ঘটনার কী যোগসূত্র—কে তা বলতে পারে? তবে এটা স্থির বুঝেছি এই ঘরে আমার থাকা আর মোটেই নিরাপদ নয়।

পরের দিনই আমি সুরঞ্জনবাবুকে সব কথা বললাম। শুনে সুরঞ্জনবাবু কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, প্রথম দিনের ব্যাপারটা আমায় আগেই বলা উচিত ছিল।

তাঁর গলার স্বরে আমার ওপর বিরক্তি ঝরে পড়ছিল। কথার ধরনটা যেন কেমন! আমি ক্ষুব্ধ ছিলাম। পান্টা বিরক্তি প্রকাশ করে বললাম, আপনাকে বলেই বা কী হত?

আপনি কি বলতে পারতেন আমার হাতটা যে চেপে ধরেছিল সে কে ছিল? কিংবা এখনই বলুন না যে ছায়ামূর্তিটি ভোরবেলায় আর ঘরে বসে ছিল সে কে?

সুরঞ্জনবাবু কোনোরকম উত্তেজনা প্রকাশ না করে শুধু মাথা নাড়লেন। বললেন, না, এ দুটো ঘটনার কোনো একটির সম্বন্ধেও আমি কিছুই বলতে পারব না। তবু এটা ঠিক, আমি এখানে বহু দিন থাকার সুবাদে এই অঞ্চলের অনেক কিছুই জানা আছে। এই বাড়িতে এর আগেও এইরকম আরো ঘটনা ঘটেছে যা প্রচার হলে হোটেলের কেউ থাকতে সাহস করবে না। যেমন আপনি আর ও ঘরে থাকতে চাইছেন না—এ কথাটা জানাবার জন্যেই সাত-সকালে নেমে এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। ঠিক কিনা?

সলজ্জভাবে স্বীকার করলাম। বললাম, ও ঘরে থাকাটা আমার পক্ষে এখন আর নিরাপদ নয়।

তা হলে?

আমাকে অন্য একটা ঘর দিন।

সুরঞ্জনবাবু ঠোটের ফাঁকে হাসলেন। বললেন দিতে পারি। কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি যে ঘরটার জন্যে মিস্টার ভিরাবাগুর সঙ্গে এত অশান্তি হয়ে গেল, আজ আপনি স্বেচ্ছায় সে ঘর ছেড়ে দিচ্ছেন দেখে সব ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে না? শেষ পর্যন্ত ভূতের ভয়ে আপনি ঘর ছাড়লেন, এটা প্রচার হলে আপনার সম্মান থাকবে?

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, কিন্তু ঐ ঘরে থাকা কি আর সম্ভব?

সুরঞ্জনবাবু বললেন, খুব সম্ভব। বেশ ক’দিন তো ঐ ঘরেই রইলেন। তেমন কোনো অসুবিধে হয়েছে কি? তবে বাকি যে ক’টা দিন এখানে থাকবেন ভাবছেন সে ক’টা দিন চোখ বুজে ভগবানের নাম করে কাটিয়ে দিন। দেখবেন বিপদ আপনার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবে না।

সুরঞ্জনবাবুর পরামর্শ ভালোই লাগল। সত্যিই আজই যদি দশ নম্বর ঘরটা ছেড়ে দিয়ে অন্য ঘরে চলে যাই তা হলে ভিরাবাগু আর তাঁর দলবল যে হাসবে। ভূতের ভয়ে জীবনে কখনও করিনি। আর সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে আজ বাদে কাল যখন কলকাতায় ফিরে যাবো তখন সেই চিরপরিচিত আলো, পাখা, টিভি আর ক্রমাগত ট্রামবাসের যান্ত্রিক শব্দের মধ্যে বসে সুদূর ছত্রিশগড়ের কোনো এক অখ্যাত জায়গায় কয়েকদিনের এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা মনেই পড়বে না।

কাজেই ঘর বদলাবার কথা চিন্তা না করে মনে সাহস নিয়ে ঐ দশ নম্বরেই থেকে গেলাম।

এর পর কয়েকটা দিন উত্তর দিকে তাকাইনি। ভুলতে চেষ্টা করেছিলাম সেই রহস্যময় দুর্গের কথা। এদিকে গত দু’দিন মিস্টার ভিরাবাগুদের গলা শুনতে পাচ্ছি না। তাঁরা এখানে আছেন কি না তাও সঠিক জানি না—জানতে ইচ্ছেও করে না।

এরই মধ্যে অন্যমনস্ক থাকার জন্যে একদিন বস্তার জেলার যুবক-যুবতীদের ‘করমা নৃত্য’ দেখে এলাম। করমা দেবীকে খুশি করার জন্যেই আদিবাসীরা এই নাচ-গানের অনুষ্ঠান করে। সঙ্গে থাকে মাদল, বাঁঝা আর ঢোল। বেশ কয়েকঘণ্টা আনন্দে কেটে যায়।

ও অঞ্চলে একদিন রাউৎ নাচ উৎসবও দেখলাম। আমাদের পশ্চিম বাংলায় যাদের গোয়ালী বলে রাউৎ হচ্ছে সেই জাত। এরা গোসেবা করে। দুধ দই বিক্রি করে। এই রাউৎরা নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের বংশধর বলে মনে করে। আর গোবর্ধনের পূজা করে।

এমনি ভাবে তিন-চারদিন কেটে গেল। বেশ ভুলেই গিয়েছিলাম অলৌকিক ব্যাপারগুলোর কথা।

কিন্তু হঠাৎ সেদিন ঘটল একটা কাণ্ড। সকালবেলাতেই সুরঞ্জনবাবু হস্তদন্ত হয়ে আমার ঘরে এসে হাজির।

জিগ্যেস করলাম কী ব্যাপার? হঠাৎ এইভাবে?

সুরঞ্জনবাবু বললেন, খুব মুশকিলে পড়েছি সোমেশ্বরবাবু। আজ চারদিন হল মিস্টার ভিরাবাণ্ড বা তাঁর সঙ্গীদের কোনো খবর নেই।

অবাক হয়ে বললাম, সে কী। চারদিন কোনো খবর নেই। আমিও ওদের ক'দিন না দেখে অবাক হচ্ছিলাম। কোথায় গেছেন কিছু বলে যাননি?

সুরঞ্জনবাবু বললেন, অনেকেই বলে যান না। আমি নিজে থেকে জিগ্যেস করি না। তবে এইসব অজানা অচেনা জায়গায় আমাকে একটু বলে গেলে ভালো হয়। এ সাধারণ জ্ঞানটুকুও অনেকের থাকে না।

বললাম, চারদিন আগে মিস্টার ভিরাবাণ্ড কখন বেরিয়েছিলেন?

সুরঞ্জনবাবু বললেন, ক'দিন থেকেই ভিরাবাণ্ড বলছিলেন পাহাড়ের ওপর ঐ পুরনো গড়টা দেখতে যাবেন। তা আমি নিষেধ করেছিলাম। উনি কিন্তু গুরুত্ব দেননি। তারপর ঐদিন সকাল সকাল খেয়ে ওঁরা বেরিয়ে গেলেন। ইচ্ছে করেই জিগ্যেস করিনি কোথায় যাচ্ছেন। তবে আমি নিশ্চিত যে উনি সদলবলে ঐ পাহাড়টাতেই গেছেন। তার পর থেকে এখনও ফেরেননি।

বললাম, ওখানে রাস্তিরে থাকার ব্যবস্থা আছে?

আমার বোকার মতো কথা শুনে উনি একটু হাসলেন। বললেন, আমি কখনও ওখানে যাইনি। যাবার দরকারও হয়নি। তবে স্মিথের ডায়েরি তো আপনি পড়েছেন। সেখানে কোথায় কীভাবে যুবরাজ বা স্মিথ নিজে রাত্রিবাস করেছিলেন সেইটুকু থেকে যা জানা যায়।

বললাম, ওখানে পৌঁছে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ফিরতে কত সময়ে লাগতে পারে?

সুরঞ্জনবাবু বললেন, ঘোড়ার চেপে গেলেও ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তারপর অন্ধকারে এগোনো যায় না। তবে ভোরবেলায় বেরিয়ে গেলে সন্ধ্যার মুখে ফেরা সম্ভব।

জিগ্যেস করলাম, আপনার কি ধারণা ওনারা ঐখানেই গেছেন?

ধারণা নয়। জানতে পেরেছি মিস্টার ভিরাবাণ্ড শুধু নিজের সঙ্গীদের নিয়েই নয়, কয়েকজন আদিবাসীদেরও মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে সন্ধ্যা নিয়ে গেছেন।

এ খবর আপনি কার থেকে পেলেন?

আদিবাসী পাড়া থেকে। বলে চিন্তায় যেন ভেঙে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর সুরঞ্জনবাবু বললেন, এই যে আমার হোটেল থেকে চারজন মানুষ তার সন্ধ্যা কয়েকজন আদিবাসী উধাও হয়ে গেল, এর জন্যে পরে হয়তো আমাকেই জবাবদিহি করতে হবে।

তা হলে?

এখন কী কর্তব্য তাই ভাবছি।

বললাম, আমার মনে হয় দু-এক দিনের মধ্যেই ওঁরা ফিরে আসবেন।

সুরঞ্জনবাবু ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, ঐ জায়গা সম্বন্ধে বাস্তবে আপনার কোনো ধারণা নেই বলেই এতটা নিশ্চিত হয়ে এ কথা বলতে পারছেন। কিন্তু আমি বলছি জেনে রাখুন, ওদের একজনও ফিরবে না। ফেরবার হলে প্রথমদিনেই কিংবা তার পরের দিন ফিরে আসত।

এতক্ষণে বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারলাম। বললাম, তা হলে?

সুরঞ্জনবাবু বললেন, সব জেনে সব বুঝে আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। ভাবছি কাল ভোরেরই আমি ওখানে চলে যাব। তারপর যা থাকে কপালে।

আপনি একলা যাবেন!

তা ছাড়া নিশ্চিত বিপদের মুখে কাকে টানব?

বললাম, ঠিক আছে সুরঞ্জনবাবু, আমি আপনার সঙ্গে যাব।

সুরঞ্জনবাবু কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, সোমেশ্বরবাবু, আপনি কি ভালো করে ভেবে বলছেন?

হ্যাঁ। একেবারে মনস্থির করে বলছি। তবে আমার মনে হয় সব ব্যাপারটা সদরে জানিয়ে রাখা আপনার কর্তব্য।

সুরঞ্জনবাবু বললেন, আমি কালই খবর পাঠাচ্ছি।

### অভিশপ্ত গড়

এই অঞ্চলে আদিবাসীরা পাক্কির মতো দোলায় এক-একজন লোক চাপিয়ে দৌড়তে দৌড়তে দূর পথ পার হয়ে যায়। এরা এতই গরিব আর এতই অন্ধে তুষ্ট যে, এই দোলায় নিয়ে যাবার জন্যে যে পারিশ্রমিক চায় তা নিতান্তই সামান্য।

আমরা দুজনে দুটো দোলায় চেপে ভোরবেলায় রওনা হয়ে সেই পাহাড়ের নীচে যখন পৌঁছলাম বেলা তখন বারোটো বেজে কুড়ি মিনিট।

চারিদিক নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে জোর বাতাস বইছে। সেই বাতাসের ঝাপটায় গাছের পাতা খসে পড়ছে টুপটাপ। আশ্চর্য, পাতা খসার শব্দটুকু ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। এত গভীর জঙ্গলেও পাখির ডাক শুনতে পেলাম না। বেঁজি যদিও বা দু-চারটে চোখে পড়ছে তাও তারা যেন সদাত্রস্ত। এত ভয় কিসের ভয় কে জানে!

দোলার বাহকদের প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা করে আমরা পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। যতই উঠতে লাগলাম ততই স্মিথ সাহেবের ডায়েরির কথা মনে পড়তে লাগল। তাতে জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের যে বর্ণনা পড়েছিলাম হুবহু মিলে যাচ্ছে। অথচ সে আজ কত বছর আগের লেখা।

আমার আগে আগে কখনও হেঁট হয়ে, কখনও দু' জানুর ওপর ভর দিয়ে, কখনও বা হামাগুড়ি দিয়ে উঠছেন সুরঞ্জনবাবু। আমি ঠিক তাঁর পিছনে।

পাহাড়ে ওঠা সুরঞ্জনবাবুর অভিজ্ঞতা আছে কিনা জানি না। আমার যা আছে তা দেওঘরের নন্দন পাহাড়, বড়োজোর গিরিডির খ্রিস্টানহিল পর্যন্ত। কিন্তু এ পাহাড় একেবারে অন্য জাতের। একেবারে বুনো পাহাড়। সময়ে সময়ে গাছের শেকড় পর্যন্ত ধরে উঠতে হচ্ছে।

উঠছি আর একবার করে মাথা তুলে দেখছি আরও কতটা উঠতে হবে। কিন্তু সুরঞ্জনবাবু একমনে উঠেই যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে সতর্কভাবে এপাশ ওপাশ দেখছেন পাছে কোনো বুনো জন্তুর সামনে পড়ে যান। এতক্ষণ যে তেমন কোনো জন্তু-জানোয়ারের মুখোমুখি হইনি এটাই আশ্চর্য।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর আমরা পাহাড়ের ওপর উঠলাম। না, নিতান্ত ছোটো পাহাড় নয়।

একবার চারিদিক তাকিয়ে দেখলাম কেমন যেন খাঁ খাঁ করছে। সামনেই কালো পাথরের গড়টা তজনী তুলে যেন আমাদের সাবধান করে দিচ্ছে।



গড়টা প্রায় গোটা পাহাড় জুড়ে। সামনের দিকটা অক্ষত। কিন্তু স্মিথ সাহেব বর্ণিত সিংহদ্বার দিয়ে দু'পা ভেতরে যেতেই দেখা গেল পিছনের দিকটা ভেঙে ঝুলছে।

অনুমান করলাম গুপ্তধন যদি সত্যিই কোথাও থাকে তা হলে ঐ ভাঙা অংশের দিকটাতেই আছে। আর মিস্টার ভিরাবাগুর দলবলকে যদি খুঁজতে হয় তাহলে ঐ দিকেই।

সিংহদ্বারের মধ্যে দিয়ে আমরা দুজনে এগিয়ে চললাম। কয়েক পা যেতেই হঠাৎ টেম্পারেচারটা যেন হু হু করে নেমে গেল। অবাক হয়ে গেলাম। এত ঠান্ডা! মনে পড়ল স্মিথও তাঁর ডায়েরিতে এইরকম শীতের কথা লিখেছিলেন। প্রকৃতির কোন খেয়ালিনায় হঠাৎ জলবায়ুর এই পরিবর্তন তা আমরা বুঝে উঠতে পারলাম না। এই মুহূর্তে এমন একটি প্রাচীন গড়ে এসে ঢুকছি যে গড়ের পাথরে পাথরে তাপমাত্রার বৈশিষ্ট্য আমাদের জ্ঞানের বাইরে। শুধু তাপমাত্রার বৈশিষ্ট্যই নয়, সামনের হলঘরটার মধ্যে ঢুকতেই যে কী করে রাশি রাশি কুয়াশা চারিদিকের অলিন্দ ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে আমাদের ঢেকে ফেলল তাও আমাদের জ্ঞানের বাইরে।

আমরা সেই গাঢ় কুয়াশার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললাম। কোথায় কোন ঘরে বা বারান্দার দিকে চলেছি বুঝতে পারলাম না।

এক সময়ে সুরঞ্জনবাবুকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তাঁর হাতটা ধরতে গিয়ে যখন তাঁর অস্তিত্বটাই টের পেলাম না তখনই বুঝলাম আমরা দুজনে দু'দিকে ছিটকে পড়েছি। আর এই সময় গলা তুলে ডাকতে সাহস পেলাম না। নিঃশব্দেই এগিয়ে চললাম।

হাত দিয়ে দেওয়াল ছুঁতে গিয়ে বুঝলাম অন্য একটা ঘরে আমি ঢুকে পড়েছি। আর এই ঘরে ঢোকামাত্র কুয়াশা কোথায় চলে গেল। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে সুরঞ্জনবাবুকে খোঁজবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোথাও তাঁর কোনো চিহ্ন পেলাম না।

আমি গলার স্বর উঁচু করে ডাকলাম, সুরঞ্জনবাবু! পাথরের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে আমার কণ্ঠস্বর বাতাসে মিলিয়ে গেল।

ভয় পেলাম। কোথায় গেল মানুষটা?

আমি ঘরের দক্ষিণ দিকের অলিন্দে এসে দাঁড়লাম। নীচে নিম্নরূপ বনভূমির মধ্যে থেকে অনেক মিলিত কণ্ঠের অস্পষ্ট গান শোনা গেল। কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। অবাক হলাম। এখানে কারা গান করছে?

কালো পাথরের মোটা একটা থামের পাশ দিয়ে পাক খেয়ে সরু একটা বারান্দা আরও ভেতরে চলে গেছে। সুরঞ্জনবাবুকে খুঁজে বার করবার জন্য সেই পথ ধরে ভেতরের দিকে চললাম। এখানেও একটা ঘর। তবে খুবই ছোটো। ভেতরে ঢুকতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম মেঝের ওপর জুপ করে রাখা হয়েছে একরাশ মোটা মোটা সাদা মোমবাতি।

এমনভাবে মোমবাতিগুলো পড়ে আছে যেন মনে হচ্ছে এই মাত্র কেউ মোমগুলো তৈরি করছিল, হঠাৎ লুকিয়ে পড়েছে। লুকিয়ে পড়েছে কাছেই কোথাও।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমি বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে পড়লাম।

এত মোম কে তৈরি করছিল? কেন করছিল?

তখনই মনে পড়ল সেদিন গভীর রাতে হোটেল থেকে এই প্রাসাদের অলিন্দে অলিন্দে আলো জ্বলতে দেখেছিলাম বটে। এখন দেখছি সে আলো মোমের আলো। আর এইখানেই

তার সৃষ্টি। এত বড়ো গড়কে আলোকসজ্জায় সাজাতে কম বাতি লাগে না জানি, তা বলে এত বাতি!

কিন্তু...যাক সে কথা। প্রশ্ন এখন কে এই বাতি তৈরি করছিল? শহর জনপদ থেকে দূরে এই পরিত্যক্ত নির্জন প্রাসাদে নিশ্চয় কোনো সাধারণ মানুষ একদিনে এত মোম তৈরি করতে পারে না। এখানের স্থায়ী বাসিন্দা ছাড়া কোনো একজনের পক্ষে এত মোম তৈরি করা সম্ভব নয়। তিনি যিনিই হন এতক্ষণ একমনে সেই কাজটিই করছিলেন। হঠাৎ অব্যাহত বাধা এসে পড়ায় তিনি আত্মগোপন করেছেন। আত্মগোপন করার জন্য তিনি বেশি দূরে সরে যেতে পারেননি। কাছেই কোথাও অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছেন। যে কোনো মূহূর্তে ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়তে পারেন।

এ কথা মনে হতেই আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি দরজার দিকে দু'পা পিছিয়ে এলাম। আর তখনই খুব কাছে শব্দ হল—ফোঁস!

চমকে উঠলাম!

না, সাপের গর্জন নয়, কোনো জন্তুরও চাপা রোষ নয়—এ যেন কোনো অপার্থিব জীবের ত্রুন্ধ শ্বাসক্রিয়া! কাছে, খুব কাছে!....

আমি প্রাণভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। তারপর ছুটতে লাগলাম। ছুটছি .....ছুটছি..... ছুটছি—

ঠিক কোন দিকে যাচ্ছি জানি না। একমাত্র লক্ষ্য এই গড় থেকে বেরিয়ে যাবার পথ খোঁজা। সরু বারান্দা। প্রত্যেকটা বারান্দার শেষে একটা করে ঘর।

হঠাৎ একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কে একজন বন্ধ দরজার গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এগিয়ে যেতেই চমকে উঠলাম—সুরঞ্জনবাবু!

সুরঞ্জনবাবু সাড়া দিলেন না। কেমন একরকমভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এ আবার কী! আমি দু' হাতে ধরে তাঁকে নাড়া দিলাম, সুরঞ্জনবাবু!

এতক্ষণে যেন চমক ভাঙল তাঁর। দু' চোখ লাল। কপালের একটা শির ফুলে উঠেছে। বোঝাই যায় প্রচণ্ড মানসিক চাপে শিরটা ফুলে উঠেছে। আমার দিকে তাকালেন।

জিগ্যেস করলাম, কী হয়েছে?

উনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগির মতো বিকৃত স্বরে শুধু উচ্চারণ করলেন, যু—ব—রা—জ—  
কোথায়?

উনি হাত দিয়ে বন্ধ দরজাটা দেখিয়ে দিলেন। আমি বুঝলাম এ নিশ্চয় মানসিক বিকার। নইলে কতকাল আগের সেই ছেদী রাজপরিবারের হতভাগ্য যুবরাজ, তিনি কী করে থাকবেন এ ঘরে? জীবিত তো নয়ই মৃত অবস্থাতেও থাকা সম্ভব নয়। তা হলে কী দেখে সুরঞ্জনবাবুর মতো লোক বলতে পারছেন যুবরাজ পাশের ঘরেই আছেন!

এক ধাক্কা য খুলে ফেললাম শালগাছের কাঠ দিয়ে তৈরি দরজা। ছোট্ট ঘর—যেন কয়েদখানা। একটা পুরনো ভাঙা খাট। তারই সামনে থকথক করছে তাজা রক্ত। আর কিছু নেই।

কোথায় যুবরাজ? আমি সুরঞ্জনবাবুর গা ধরে ঝাঁকানি দিলাম।

উনি রক্ত দেখিয়ে বললেন, ঐ তো। ঐ তো উপড় হয়ে পড়ে আছেন।

ভুল, ভুল। শুধু চোখেরই ভুল নয়, মনেরও ভুল।

সুরঞ্জনবাবু তখনও অপ্রকৃতিস্থ। সেই অবস্থায় তাঁকে ধরে ধরে কোনোরকমে বাইরে নিয়ে এলাম।

বাইরে বেরোতেই সুরঞ্জনবাবু যেন সুস্থ হয়ে উঠলেন।

খুব বেঁচে গেলাম, সোমেশ্বরবাবু।

আমিও।

এবার তাড়াতাড়ি ফেরার পালা।

আদিবাসী বেয়ারারা প্রস্তুত হয়েই ছিল। দোলায় ওঠবার আগে সুরঞ্জনবাবুকে বললাম, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আমাদের আসা, ভিরাবাগুদের দেখা পেলেন?

সুরঞ্জনবাবু মাথা নাড়লেন।

না।

বললাম, তবে প্রাসাদের মধ্যে থেকেও অনেক নীচে আমি মিলিত কণ্ঠে গান শুনেছি। অস্পষ্ট। মনে হচ্ছিল যেন ওঁদেরই গলা।

গান! ওরা গাইছিল?

আমার তাই মনে হয়েছিল।

বিস্মিত সুরঞ্জনবাবু বললেন, চারদিন ধরে এখানে থেকে বেঁচেও যদি থাকেন গান করতে যাবেন কিসের আনন্দে?

বললাম, তা বলতে পারব না। তবে মিলিত গলায় গাইতে শুনেছিলাম।

আদিবাসী বেয়ারা দুজন আমাদের কথা শুনে বলল, হ্যাঁ! সাহেবরা....ই...সাত জনা মিলে সেই তখন থেকে নেচে আর গেয়েই যাচ্ছে।

কোথায়? কোন দিকে?

পাহাড়ের ঠিক পিছন দিকে।

ওরা কি মদ খেয়ে নাচছে? জিজ্ঞেস করলাম।

আদিবাসীরা বলল, না বাবু, বোধহয় পাগল হয়ে গেছে। শুনলাম চারদিন ধরে নেচেই যাচ্ছে। এ কি কোনো মানুষ পারে?

বলেই কাঁধে দোলা তুলে নিল।

বললাম, ওদের সঙ্গে একবার দেখা করলেন না?

দেখা করে সম্ভবত আর লাভ নেই। সদরে খবর দিয়ে এসেছি। পুলিশ এলে এখানে পাঠিয়ে দেব। ওরা যা করার করবে।

## ম্যাকবেথের তরোয়াল

### দুপুর রাতে কলিংবেল

অনেক রাতে সুধীনবাবুর ঘুমটা আচমকা ভেঙে গেল। কলিংবেল বাজছে—কিরিং-কিরিং-কিরিং। নিঝুম গোয়ালপাড়ার বিরাট বাঁশবাগানের শুকনো পাতা আর রাতজাগা পাখিজাগা চমকে দিয়ে শব্দটা যেন দূরে মাঠের দিকে মিলিয়ে গেল। পাশের ঘর থেকে জুলি আর তার মাও এসে পড়েছে। বেলটা ততক্ষণে থেমে গেছে। অন্য একটা ঘর থেকে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়ে এল অভিজিৎ।

কেউ বেল বাজাচ্ছিল না?

সুধীনবাবুই উত্তর দিলেন, হ্যাঁ।

এত রাত্তিরে কে আসবে? বললেন অভিজিৎের মা।

যে-ই আসুক দেখতে তো হবে। বললেন সুধীনবাবু।

বেলটা তো আর বাজছে না। দরজা খেলার দরকার কি?

এতক্ষণ জুলি একটা কথাও বলেনি। গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়েছিল। এবার বলল, বেল আর বাজবেও না।

বোনকে ধমক দিয়ে অভিজিৎ তার বাবার মতোই বললে, তবু তো দেখতে হবে।

তা দেখো গে না। কাউকেই দেখতে পাবে না। থমথমে মুখে বলল জুলি।

অভিজিৎ পা-জামাটা টাইট করে পরে দরজার দিকে এগোচ্ছিল, মা বললেন, খালি হাতে যাসনে। ঐ লাঠিটা নিয়ে যা। বলা যায় না তো—

অভিজিৎ মায়ের কথা শুনল না। লাইট জ্বেলে শুধু টর্চ হাতে দরজার দিকে এগোল। পিছনে সবাই। দরজাটা খুলতেই একটা হাওয়া ঢুকে দরজার পর্দাটাকে দুলিয়ে দিলো।

নাঃ কেউ নেই।

অভিজিৎ টর্চ জ্বেলে বাঁশপাতা মাড়াতে মাড়াতে বাগানটা দেখতে যাচ্ছিল, জুলি বলল, ফিরে আয় দাদা, কাউকে পাবি না।

তবু সে বাঁশবাগানের মধ্যে ঢুকে টর্চের আলো ফেলে দেখল, নারকেল গাছগুলোর মাথাতেও টর্চ ফেলল। শেষে হতাশ হয়ে ফিরে এল।

বাড়িতে ঢুকে ভালো করে খিল বন্ধ করে সবাই বসল সুধীনবাবুর ঘরে। সবার মুখে একটাই কথা, এত রাতে কে বাজাল বেলটা?

অভিজিৎ আলিস্যি ভেঙে বলল, কোনো চোর-ছাঁচোরের কাজ। একবার ধরতে পারলে—জুলি গম্ভীর হয়ে বসেছিল। এবার বলল, চোরই হোক বা যে-ই হোক পালাতে গেলে তো শুকনো পাতা মাড়াবার শব্দ হবে। কোনো শব্দ পেয়েছ কি?

কেউ এর উত্তর দিতে পারল না।

জুলিই ফের বলল, আমি জানি কে বেল বাজিয়েছে।

কে? বাবা-মা দুজনেই ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

বেলটা ক'বার বেজেছিল মনে আছে?

সুধীনবাবু বললেন, বোধহয় দু'বার।

না তিনবার।

জুলির মাও বললেন, হ্যাঁ তিনবার।

জুলি বলল, পর পর তিনবার কে বাজাতে পারে?

সবাই চুপ।

জুলি বলল, এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

অস্ফুট স্বরে জুলির মা বললেন, চঞ্চল।

জুলি বলল, তোমরা আরও ভুলে গেছ গত তিন বছরের মধ্যে গভীর রাতে আরও দু'বার এমনিভাবেই বেল বেজেছিল। আর আমার যদি ভুল না হয়—

বলতে বলতে জুলি পাশের ঘরে চলে গেল। তারপরই চাপা উত্তেজনা-ভরা গলায় ডাকল, মা, দেখে যাও।

সুধীনবাবু আর জুলির মা ছুটে পাশের ঘরে ঢুকলেন।

দ্যাখো।

দুজনেই অবাক হয়ে দেখলেন, আলমারির মধ্যে চঞ্চলের যে বাঁধানো ছবিটা ছিল তার কাচটায় চিড় ধরেছে।

ও মা! আঁতকে উঠলেন জুলির মা। বললেন, এর আগেও তো দু'বার ছবির কাচ এইভাবেই ফেটে গিয়েছিল।

জুলি বলল, আর সেই দু'বারই আমরা কিভাবে বিপদের মুখ থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম মনে আছে তো? ঘটনার আগে এমনিভাবেই বেল বাজিয়ে চঞ্চল দু'বারই সাবধান করে দিয়েছিল।

একটু থেমে জুলি বলল, আজ আবার তিনবার বেল বাজল। জানি না নতুন কোন বিপদ থেকে সাবধান করার জন্যে চঞ্চল এসেছিল।

জুলির কথায় সকলের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল।

### চঞ্চল, ঠাকুরমশাই কথা

জায়গাটার নাম গোয়ালপাড়া। কালনা থেকে নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর কিংবা পূর্বস্থলী, চুপি যাবার বাসরুটে ছোট্ট একটা স্টপেজ এগোলেই সমুদ্রগড় রেল বাজার।

গোয়ালপাড়া গ্রামই বলা যায়। জুলিদের একতলা বাড়িটার পিছনেই বিশাল বাঁশবাগান। তার পিছনে মাঠ। মাঠের ধারে দাঁড়ালে কাটোয়া লাইনের ট্রেন দেখা যায়। জায়গাটার এখন উন্নতি হয়েছে। ইলেকট্রিক লাইট এসেছে, দু-একটা অবস্থাপন্ন বাড়িতে টেলিফোনও বসেছে। কিন্তু ঢের আগে যখন সন্ধে হলেই বাঁশবাগানে শেয়াল ডেকে উঠত, চোর-ডাকাতের ভয়ে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় দরজায় খিল পড়ত, ভুতের ভয়ে সবাই তটস্থ হয়ে থাকত সেই সময় এখানে বাস করতেন সুধীনবাবুর বাপ-ঠাকুর্দা। সুধীনবাবুরা অবশ্য বেশির ভাগ

সময় থাকতেন কলকাতায়। অভিজিৎ আর জুলির পড়াশোনা কলকাতাতেই। এখন রিটার্নার করে সুধীনবাবু বাড়িটা হাল ফ্যাশানের করে নিয়ে এখানেই থাকেন। অনেকগুলো ঘর, ভালো বাথরুম। পাড়াগাঁয়ের এই সবুজ গাছ-গাছালি, খোলা মাঠের হাওয়া, শান্ত পরিবেশ সুধীনবাবুর খুব ভালো লাগে। কিন্তু জুলি আর তার দাদা অভিজিৎ বেশির ভাগ সময়েই থাকে কলকাতায় মামার বাড়িতে।

জুলি এম. এ-পরীক্ষা দিয়েছে। খুব স্মার্ট, বুদ্ধিমতী আর সাহসী। চাকরি করার জন্যে কলকাতার বাইরে যে কোনো জায়গায় তো বটেই, সুযোগ পেলে আমেরিকা পর্যন্ত যাবার ইচ্ছে। অভিজিৎ কলকাতায় থেকে খবরের কাগজে শখের সাংবাদিকতা করে। মাঝেমাঝে চলে আসে গোয়ালপাড়ায় নিজেদের বাড়িতে।

এদের বাড়ি থেকে অল্প দূরে চঞ্চল থাকত তার এক পিসেমশাইয়ের কাছে। বি. এ. পাশ করে বসে ছিল। চাকরি-বাকরি পায়নি। তার মা ছিল না, বাবা ছিল না। পিসেমশাই, পিসিমা বেকার ছেলেটার ওপর খুব চটা ছিল। কিন্তু এই আশ্রয়টুকু ছেড়ে সে যেতই বা কোথায়?

গোয়ালপাড়ায় চঞ্চলের একমাত্র আনন্দের জায়গা ছিল অভিজিৎদের বাড়ি। অভিজিৎ-এর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল। অভিজিৎ ছাড়াও এ বাড়ির সকলে চঞ্চলকে খুব ভালোবাসত।

চঞ্চলের মস্ত গুণ ছিল গল্প বলা—বিশেষ করে ভূতের গল্প। জুলি কলকাতা থেকে এখানে এলেই ডেকে পাঠাত চঞ্চলকে। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় চঞ্চল এ বাড়িতে এসে ভূতের গল্প শোনাতে। ও বলত সবই নাকি ওর নিজের দেখা ঘটনা। সত্যি-মিথ্যে ভগবান জানেন। কিন্তু বানিয়ে বানিয়ে এমনভাবে গল্প বলত, মনে হতো যেন সত্যিই তা ঘটেছে। শুনতে শুনতে জুলির মতো মেয়েও ভয়ে কাঁটা হয়ে যেত।

যদি কেউ জিজ্ঞেস করত, সত্যি ঘটনা? চঞ্চল গম্ভীরভাবে বলত, আলবাৎ। এ তো আমার নিজে দেখা।

বাস, এর ওপরে আর তর্ক চলত না।

কত কথাই মনে পড়ে জুলির। কম সাহসী ছিল ছেলেটা!

একবার হলো কি, গোয়ালপাড়া থেকে মাইল সাত-আট দূরে এক বাড়িতে এমন ভূতের উপদ্রব হলো যে ভাড়াটে বিধবা মহিলা তাঁর মেয়েকে নিয়ে সে-বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়ির সন্ধানে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কথাটা চঞ্চলের কানে এল। কালনা তো রীতিমতো শহর। সেখানে তিন-চারটে স্কুল আছে, কলেজ আছে, সাবডিভিশনাল পুলিশ অফিসার আছে—সেখানে ভূতের উপদ্রব! চঞ্চল ঠিক করল ব্যাপারটা জানতে হবে। জুলির মা বার বার নিষেধ করলেন। কিন্তু চঞ্চল শুনল না! সে কালনায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে সেই বিধবা মহিলার সঙ্গে দেখা করল। ওদের কাছে সেই ভয়ংকর ঘটনার কথা শুনে চঞ্চল এক রাত্রিরের জন্যে সেখানে থাকতে চাইল।

সে একা থাকবে শুনে তারা বারণ করল। কিন্তু চঞ্চল শুনল না। ওদের কাছ থেকে চাবি নিয়ে সন্ধে থেকেই রয়ে গেল সেই ঘরে।

পরের দিন চঞ্চল ফিরে এল গোয়ালপাড়ায়। এসেই পিসেমশাইয়ের বাড়ি না গিয়ে সোজা চলে এল জুলিদের বাড়ি। তাকে নিরাপদে ফিরতে দেখে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে তার! দু'চোখ লাল, চুল উস্কোখুস্কো, মুখে কথা নেই। সবাই তার অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইল। কিন্তু আশ্চর্য যে ছেলে এত গল্প করে সে একটী কথাও বলল না। বার বার জিজ্ঞেস করার পর সে শুধু একটা কথাই বলল, ও কিছু না।

সবাই বুঝল ও যেন অনেক কিছু চেপে যাচ্ছে।

এরপর চঞ্চলের মধ্যে কেমন একরকম পরিবর্তন দেখা দিল। উদাস হয়ে পুকুরপাড়ে না হয় খাঁ খাঁ মাঠে একা বসে থাকে। ক্রমে সবাই ওকে এড়িয়ে চলতে লাগল—কী জানি বাবা!

একমাত্র ও জুলিদের বাড়ি যায়। জুলিরা ওকে আদর করে বসতে দেয়। আগের মতোই গল্প করে। কিন্তু চঞ্চলের গল্প বলা হঠাৎই যেন বন্ধ হয়ে গেছে।

চঞ্চলের আর একটা খেয়াল জাগল এ বাড়ির সবাইকে নিয়ে প্ল্যানচেট করা। এই প্ল্যানচেট নিয়ে ওদের বাড়ির কৌতূহলের সীমা ছিল না। শুধু জুলির মা বলতেন, কী দরকার বাপু ওসব আত্মাত্মাকে ডেকে! ওরা যেখানে শান্তিতে আছে সেখানেই থাকুক।

তারপর এই যে কলিংবেল—যা নিয়ে আজ গভীর রাতে এত দুর্ভাবনা সেটার ব্যবস্থা তো ঐ চঞ্চলদাই করেছিল।

ঘুম আসছিল না জুলির। চোখ বুজিয়ে কেবলই সেইসব কথা মনে পড়ছিল।

তখন সব গোয়ালপাড়ায় ইলেকট্রিক এসেছে। চঞ্চল হাঁকডাক করে বাড়ি ঢুকল।

কী ব্যাপার? জুলির মা জিজ্ঞেস করলেন।

আর চোঁচামেচি, কড়া নাড়া, শেকল নাড়ার দরকার নেই মাসিমা। বোতামটা বাইরে থেকে টিপবে আর ভেতরের লোক জানলা দিয়ে উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করবে—কে?

জুলির মা হাসলেন। বললেন, এত পাগলামিও তোমার মাথায় আসে!

পাগলামি কেন বলছেন মাসিমা? জানলা থাকলে যেমন পর্দার দরকার, দরজা থাকলেই কলিংবেলের দরকার।

জুলির মা বললেন, কোনো দরকার ছিল না।

হ্যাঁ, ছিল। আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। কেউ না বাজাক, আমিই বাজাব।

এরপর চঞ্চল যখন-তখন আসে আর কলিংবেল টেপে। ছেলেমানুষের মতো তার কী আনন্দ!

কয়েক মাস পরে এ বাড়িও যারাই আসে তারাই বেল বাজিয়ে ঢুকতে লাগল। এটা আবার চঞ্চলের বিশেষ পছন্দ হলো না। সবার মতো সে বেল বাজাবে না। জানিয়ে দিল সে যখন বেল টিপবে একসঙ্গে তিনবার।

এই এমনি করে, বলে তিনবার বেল টিপল। বাস আপনাদের আর ডিজ্ঞেস করতে হবে না। বুঝে নেবেন আমি এসেছি।

এরপর থেকে চঞ্চল যখনই আসে ঐভাবে বেল বাজায়। সবাই বুঝতে পারে আর কেউ নয় চঞ্চল এসেছে।

রাত এখন প্রায় তিনটে বাজে। গাড় অন্ধকারের মধ্যে বাঁশবাগানটা স্তব্ধ বিভীষিকার মতো থমথম করছে। দূরের মাঠ আর আকাশ যেন অন্ধকারে এক হয়ে গেছে। বাড়ির সকলে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েছে। এই যে হঠাৎ আজ রাত-দুপুরে কলিংবেলটা তিনবার বেজে উঠল, কে বাজাল তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। কিন্তু জুলি অত সহজে ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। সে জানে এটা একটা অশুভ সংকেত। কিছু একটা ঘটবেই। তাই তার চোখে ঘুম নেই। কেবলই চঞ্চলের কথা মনে পড়ছে।

জুলির মনে পড়ে সেদিনের কথা। চঞ্চল পুরনো ইংরিজি পত্রিকার একটা ছেঁড়া পাতা কোথা থেকে নিয়ে এল।

জুলি—জুলি দেখে যাও।

না জানি কী মহামূল্যবান জিনিস মনে করে জুলি চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতেই এসে দাঁড়াল। একটা ছবি।

অদ্ভুত ছবিটা। গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটা বিশাল দোতলা বাড়ি। জানলাগুলো বন্ধ। বাড়িটা পুরনো। চারিদিকে পাঁচিল ঘেরা। ভেতরে নানারকম বড়ো বড়ো পাথরের মূর্তি। কিন্তু বাড়িটার সামনের দিকে দোতলার জানলার ঠিক নিচে বোধহয় পাথরেরই একটা ভয়ংকর মুখ। সে মুখ মানুষের তো নয়ই, গল্লে-পড়া রাক্ষস-দৈত্য-দানবেরও নয়। ছবিতেও মনে হয় সেটা কোনো অলৌকিক জীবের মুখ।

চঞ্চলের দারুণ উৎসাহ। ছবিটা দেখতে দেখতে তার মুখচোখ কেমন হয়ে যাচ্ছিল।

জুলি জিজ্ঞেস করল, এই বাড়িটা কার? মুখটাই বা অমন কেন?

চঞ্চল হতাশ হয়ে বলল, এর ইতিহাস সবই লেখা ছিল। কিন্তু ছিঁড়ে গেছে। ইস কিছুই জানা গেল না।

পত্রিকাটা তুমি পেলে কোথায়?

চঞ্চল বলল, কলকাতায় গিয়েছিলাম। রিপন স্ট্রিটে একটা কাগজের দোকানে পুরনো পত্রিকা বিক্রি হচ্ছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল। ওটা চাইলাম, তা দিল না। বলল, এক টাকা লাগবে। কী আর করি! এক টাকা দিয়ে ছবিটা কিনে ফেললাম।

তুমি কী চঞ্চলদা!

চঞ্চল অবাক হয়ে বলল, কেন?

নেহাৎই একটা পুরনো ছবি। ইংরিজি ম্যাগাজিনে অমন কত ছবি বেরোয়। তা নিয়ে এত মাতা ঘামাবার কি আছে?

চঞ্চল একটু হাসল। বলল, এ ছবিটা সাধারণ ছবি নয় জুলি। এই যে বাড়িটা—দেখলেই বোঝা যায় এর মধ্যে কোনো অজানা রহস্য লুকিয়ে আছে। নয় কি?

জুলি বলল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আর্টিস্টরা তাদের খেয়ালমতো ছবি আঁকে। তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার কি আছে?

চঞ্চল বলল, আছে। মনে রাখতে হবে এই ধরনের ছবি একজন আর্টিস্ট শুধু শুধু কল্পনা করে আঁকে না। হয় কোনো এক সময়ে বাড়িটা দেখেছিল কিংবা কারও কাছ থেকে বাড়িটার কথা শুনেছিল। ব্যাপারটা তার মনে এমনই গঁথে গিয়েছিল যে, সে একজন আর্টিস্ট বলেই ছবিটা না আঁকে পারেনি। আর বাড়িটা ও তার কাহিনি একজন ইংরেজ সম্পাদকের এতই ভালো লেগেছিল যে তিনি সেই কাহিনি ছবিসুদ্ধ না চেপে পারেননি। আমার দুর্ভাগ্য, ছবিটুকুই পেলাম, কাহিনিটা পেলাম না। সেটা ছিঁড়ে গেছে।

জুলি বলল, একটা পুরনো বড়ো বাড়ি ছাড়া এর মধ্যে আর কী আছে তা তো বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, বাড়িটা অবশ্য একটু অন্য ধরনের। ছাদটা কচ্ছপের পিঠের মতো ঢালু হয়ে গেছে। এই পর্যন্ত। এর বেশি বোঝবার দরকারও নেই। আর্টিস্টের খেয়াল।

চঞ্চল বলল, দেখলে মনে হয় বহু পুরনো এই বাড়িতে কেউ থাকে না।

জুলি বলল, এই পুরনো বাড়িতে কে থাকবে? বন্ধ জানলাগুলো দেখলেই তা মনে হয়।

চঞ্চল হাসল একটু। বলল, সব জানলাই বন্ধ নয়। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো বাঁদিকে একটা জানলা খোলা। দেখেছো।

হ্যাঁ।



হঠাৎ একটা জানলা খোলা কেন?

জুলি বলল, ঝড় বাতাসে খুলে যেতেই পারে।

ঝড় বাতাসে দু'পাটাই এমন সমানভাবে খোলা থাকে? ভালো করে দেখো।

জুলি বলল, তা বটে। কেউ যেন ইচ্ছে করে একটা জানলা খুলে রেখেছে।

এই কথাটাই তোমাকে এতক্ষণ বোঝাতে চাইছিলাম। ছবিটা যে এঁকেছিল কী অসাধারণ তার হাতের কাজ। শুধু তাই নয় জুলি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আর্টিস্ট নিজে কোনো দিন বাড়িটা দেখেছিল। একটু থেমে বলল, তছাড়া দেখো, বাড়ির সামনে আবার সার সার সুপুরি গাছ— যেন বাড়িটাকে আড়াল করে রেখেছে। সব কিছু মিলিয়ে বাড়িটা কেমন রহস্যময়, তাই নয় কি?

তাই তো মনে হচ্ছে।

সবচেয়ে রহস্যজনক মনে হচ্ছে এ বাড়িতে কেউ একজন থাকে। আর সে থাকে দোতলার একটা ঘরে। কিন্তু সে কে? কেন ঐরকম বাড়িতে একা থাকে?

এই বলে চঞ্চল ছবিটার উপর ঝুঁকে পড়ে নিবিষ্ট মনে আরও কী যেন দেখতে লাগল।

কী দেখছ অমন করে? জুলি জিজ্ঞেস করল।

দেখছি বাড়িটা কোথায় হতে পারে?

জুলি বলল, বাড়িটার গঠন দেখে মনে হচ্ছে সে আমলের সাহেবদের বাড়ি।

তা ঠিক। কিন্তু জায়গাটা কোথায়? পেছনে দেখো আবছা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। আর্টিস্ট জঙ্গলের মধ্যে পাইন গাছ দেখাতেও ভোলেননি। আমার মনে হয় দার্জিলিঙের কাছাকাছি কোনো জায়গায়।

কিন্তু দার্জিলিঙের কাছে হলে তো আরও পাহাড় দেখা যেত।

ঠিকই বলেছ। তবে নর্থ বেঙ্গলের কোনো জায়গা হতে পারে। ঐ বাড়িটা দেখতে আমাকে যেতেই হবে।

না-না, নর্থ বেঙ্গল নয়। ছবির কোণে ছেঁড়া জায়গাটা ভালো করে লক্ষ্য করো। কি দেখছ?

জুলি ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে As..... N.....ar.....।

চঞ্চল বলল, তাহলে বলো কোন জায়গার প্রথম কথাটা 'As' দিয়ে।

জুলি বলল, প্রথমেই তো আসাম নামটা মনে হয়।

ঠিক বলেছ। তার পর 'N'—আচ্ছা ওটা থাক। শেষেরটা ধরো 'ar'। কী হতে পারে?

জুলি তখনই আসামের ম্যাপটা খুলে দেখতে লাগল।

নাঃ একটাই জায়গা পাচ্ছি কাছাড়।

চঞ্চল উৎসাহে লাফিয়ে উঠে বলল, ব্যস, ঠিকানা মিল গয়া। কাছাড়—নর্থ কাছাড়।

জুলি হেসে বলল, তুমি সত্যিই পাগল। বাড়িটা আছে কিনা তার ঠিক নেই, হয়তো আর্টিস্টের সবটাই কল্পনা আর তুমি তাই খুঁজতে বেরোবে!

চঞ্চল হাসল না। গম্ভীরভাবে বলল, আমি বুঝতে পারছি ও বাড়ি আর্টিস্টের কল্পনা নয়। সত্যি সত্যিই আছে। আর আমি তা খুঁজে বের করবই!...

তারপর একদিন চঞ্চল ছবিটা বাঁধিয়ে নিয়ে এল। জুলির হাতে দিয়ে বলল, এটা তোমায় দিলাম।

জুলি অবাক হয়ে বলল, আমাকে কেন?

চঞ্চল গস্তীরভাবে বলল, এই ছবিটা নিয়ে সব আলোচনা শুধু তোমার সঙ্গেই হয়েছে। এর মর্ম আর কেউ বুঝবে না।

অগত্যা জুলিকে ছবিটা টাঙিয়ে রাখতে হলো। আর কিছু না হোক পুরনো বাড়ি হিসেবে একটা আকর্ষণ আছে। তাছাড়া এতই সুন্দর ছাপা যে বাড়িটা পুরনো হলেও চকচক করছে।

এ ঘটনা কালনার সেই ভুতুড়ে বাড়ি দেখতে যাবার আগে। কালনার সেই বাড়িতে এক রাত্রির কাটিয়ে আসার পর থেকে চঞ্চলদা কেমন যেন হয়ে গেল। উদ্ভ্রান্ত, অন্যান্যনক। তাদের বাড়িও কম আসত। যে জুলি তার বোনের মতো, বন্ধুর মতো, তার সঙ্গেও কম কথা বলত।

সে একরকম ভালোই হয়েছিল। দিনরাত শুধু ভূত—ভূত—ভূত আর প্লানচেট করা, এসব তার মায়ের মতো জুলিরও ভালো লাগত না।

আগে জুলি কলকাতায় মামার বাড়ি চলে গেলে চঞ্চল রোজ খবর নিয়ে যেত কবে গোয়ালপাড়া আসবে, কিন্তু এবার যখন গেল, চঞ্চল একবারও খোঁজ নেয়নি। ভালোই।

মাস তিনেক পর জুলি গোয়ালপাড়ায় ফিরে এসে শুনল চঞ্চল কোথায় চলে গেছে—নিরুদ্দেশ। ওর পিসেমশাই একদিন নাকি এ বাড়িতে খোঁজ করতে এসেছিলেন জুলির মা-বাবাকে কিছু বলে গেছে কি না।

সেই যে চঞ্চল নিরুদ্দেশ হয়ে গেল আর ফেরেনি আজ পর্যন্ত। কি হলো ছেলেটার? অন্তত জুলি খুব ভাবত ওর কথা। তারপর ধীরে ধীরে চঞ্চল সবার মন থেকে দূরে সরে গেল।

হঠাৎ একদিন রাত দুপুরে কলিংবেলটা বেজে উঠল। পরপর তিনবার। সেদিনও চমকে উঠেছিল সবাই। চঞ্চল ফিরে এসেছে তাহলে।

তারপর যখন দরজা খুলে কাউকে দেখতে পেল না তখনই এ বাড়ির সকলের বুকটা হাহাকার করে উঠল। বুঝল, চঞ্চল আর এ জগতে নেই। কোথায় কোন অজানা জায়গায়, নিঃশব্দ অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে বেঘোরে প্রাণটা হারিয়েছে।

চঞ্চল এদের এতই ভালোবাসত যে নিজের একটা ছবি বাঁধিয়ে রেখে গিয়েছিল। বলেছিল, যেদিন আমি থাকব না, তখনও যদি আমার কথা মনে পড়ে তোমরা আমার এই ছবিটা দেখো। আমি তোমাদের কাছেই থাকব।

সেদিন সকালবেলায় জুলি বিমর্ষ মনে যখন চঞ্চলের কথা ভাবছিল, হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল চঞ্চলের ছবিটার দিকে। কাচটা কিরকম চিড়ে গেছে। ও খুব আশ্চর্য হয়েছিল আলমারির ভেতরে রাখা ছবির কাচ ভাঙল কি করে?

তারপর জুলির কি মনে হলো, প্লানচেট করতে বসেছিল। এ বিদ্যোটা শিখেছিল চঞ্চলের কাছ থেকেই।

চোখ বুজিয়ে একমনে চঞ্চলের কথা ভাবতে ভাবতেই প্লানচেটের চাকাটা সাদা কাগজের ওপর নড়তে শুরু করল। পেন্সিলে বড়ো বড়ো অক্ষরে একটা লেখা ফুটে উঠল ‘যেও না’।

আশ্চর্য! জুলিদের যে এবার পূজোর ছুটিতে গ্যাংটকে যাবার ঠিক হয়েছে, চঞ্চল জানল কি করে?

যে ভাবেই জানুক এই যে প্লানচেটে স্পষ্ট যেতে বারণ করা হয়েছে তাই নিয়ে বাড়ির সবাই দুর্ভাবনায় পড়ল। অভিজিৎ বলল, ও সব গাঁজাখুরি কথা ছাড়ো তো। চঞ্চলের খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, এখন ভূত হয়ে এসে কলিংবেল বাজাবে—প্লানচেটে সাবধান করে দেবে!

কাজেই যেতে হলো। কিন্তু গ্যাংটক থেকে গাড়িতে ছাড়ুলেক দেখতে গিয়ে কীভাবে যে খাদে পড়তে-পড়তে বেঁচে গিয়েছিল তা আজও ভাবলে ভয়ে বুক কঁপে ওঠে।

এর কিছুকাল পরে আবার একদিন রাতে তিনবার কলিংবেল বেজেছিল। অথচ দরজা খুলে কাউকে দেখা যায়নি। আবার ছবির কাছে চিড়। আবার প্ল্যানচেট নিয়ে বসা। আবার নিষেধ—‘ভুল করছ ... বিপদ....’

সেবার জুলি কয়েকজন বান্ধবীর সঙ্গে একটা চাকরির জন্যে চণ্ডীগড়ে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছিল। বাড়িতে সবাই বাধা দিয়েছিল। চাকরি হলে তো সুদূর চণ্ডীগড়ে থাকতে হবে। একজন অল্পবয়সী মেয়ের পক্ষে মা-বাবাকে ছেড়ে বিদেশে একলা থাকা সম্ভব? কিন্তু জুলি অন্য প্রকৃতির মেয়ে। বড্ড বেশি সাহসী আর জেদী। সে বলল, গিয়েই দেখি না। তেমন বুঝলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসব।

কেবল দাদাই বলল, যদি এখনই চাকরি করতে চাস তাহলে না হয় ঘুরেই আয়। পশ্চিমবাংলায় পড়ে থাকলে কোনোদিন চাকরি হবে না। তাছাড়া অ্যাডভেঞ্চার হবে। একলা-একলা স্বাধীন জীবন—দারুণ!

যাওয়া যখন স্থির তখন হঠাৎ জুলির কিরকম মাথা ঘুরতে লাগল। উঠতে গেলেই মাথা ঘুরে পড়ে যায়। শুয়ে শুয়েও মনে হয় ছাদটা যেন দুলছে। কিছুক্ষণের জন্যে অনেকেরই মাথা ঘোরে। কিন্তু এরকম সারাদিন—

ডাক্তার ওষুধ দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন, বাড়ির বাইরে যাওয়া এখন দু-তিন দিন বন্ধ। অথচ আজ পর্যন্ত জুলির কোনোদিন মাথা ঘোরেনি। এ যেন যাওয়াটা পণ্ড করার জন্যই হঠাৎ এই রোগ।

যাওয়া হয়নি, মঙ্গল। যে কম্পার্টমেন্টে জুলিদের রিজার্ভেশন ছিল সেই কম্পার্টমেন্টেই বড়ো রকমের ডাকাতি হয়ে গেল। জুলির বন্ধুরা কাঁদতে কাঁদতে কোনোরকমে বাড়ি ফিরে এসেছিল।

দু-দুবার এরকম হওয়ায় এই অলৌকিক ব্যাপারে জুলির কেমন বিশ্বাস জন্মে গেছে। তার মনে হয় চঞ্চল সত্যি তাদের ভালোবাসে বলেই মৃত্যুর পরও ভুলতে পারেনি। বিপদের ঝুঁকি থাকলে সাবধান করে দেয়।

এইবার তৃতীয় বার।

এবারও ছবির কাছে চিড় ধরা। চিড় ধরা কেন? এটা কি সবাইকে জানানো যে, সে সত্যি এসেছিল?

সারারাত ঘুম হলো না জুলির। ভোরবেলা একটু ঘুম এসেছিল, মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। অনেক বেলা হয়ে গেছে। ওঠ। চায়ের জল চড়িয়েছি।

জুলি হাতমুখ ধুয়ে চা খেল। কিন্তু সারা রাত যে ঘুমোয়নি সে কথা প্রকাশ করল না। কাল রাতেও যে চঞ্চল এসেছিল তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন? আবার কোন বিপদের জন্যে সাবধান করতে চাইছে? আশ্চর্য! এ নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামাচ্ছে না।

জুলি তাড়াতাড়ি হান সেরে দরজা বন্ধ করে প্ল্যানচেট নিয়ে বসল।

আবার লেখা ফুটে উঠল—‘ওর কাছ থেকে সাবধান।’...ব্যস্ত এইটুকু। ‘ও’টা কে? কিছুই বোঝা গেল না। এ বাড়িতে তো কতজনই আসে। এই তো সেদিন কলকাতা থেকে তার দু’ বন্ধু এল। নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, কালনা ঘুরে বেড়াল। একটা নতুন ঝি রাখা হয়েছে। সে তো দু’বেলা আসে। খুব গল্প করে মায়ের সঙ্গে। এত গল্প কিসের? ওর কাছ থেকেই কী সাবধান হতে বলছে?

জুলি আবার কয়েকদিনের জন্যে কলকাতায় গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে একজন অপরিচিত লোক বাইরের ঘরে সোফার ওপর দিব্যি পা তুলে বসে আছে। খালি-গা, গলায় ধবধবে পৈতে, পরনে মোটা সুতোর ধুতি, কাঁধে গামছা। কুচকুচে কালো রঙ। নাকটা বসা।

এমন একজন লোককে তাদের বাড়িতে দিব্যি বসে থাকতে দেখে জুলি তো অবাক।

লোকটা উঁচু উঁচু দাঁত বের করে হেসে বলল, কি খুকি, কলকাতা থেকে এলে? বড়ো হয়েছ, কোথায় শাড়ি পরবে, তা নয় ওসব কী পরেছ? তা' ছাড়া একা একা কলকাতায় যাওয়া-আসা করা ঠিক নয়। তোমার বাবা-মা বারণ করতে পারে না? যাও ভেতরে যাও।

লোকটার কথা শুনে জুলির সর্বাস্ব রাগে জ্বলে উঠল। কোনো কথা না বলে গটগট করে ভেতরে চলে গেল।

মাকে বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, লোকটা কে?

মা জিব কেটে বললেন, ছিঃ, ওভাবে বলে না। উনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। তোমার বাবার গুরুদেবের ছেলে।

তা এখানে কেন?

কাছাকাছি তীর্থস্থানগুলো ঘুরবেন।

যেখানে যত খুশি ঘুরুন, কিন্তু আমাদের বাড়ি কেন?

মা শান্ত গলায় বললেন, নবদ্বীপ, শান্তিপুর তো এখান থেকে কাছে। তা ছাড়া তোমার বাবার গুরুদেব ছিলেন ওঁর বাবা। এখানে ছাড়া আর কোথায় উঠবেন?

তা বলে ঐরকম একটা লোক আমাদের বাড়িতে?

উপায় কি?

কদিন থাকবে?

মা বললেন, তা কিছু বলেননি। তবে জিনিসপত্রের বহর দেখে মনে হচ্ছে কিছুদিন থাকবেন।

জুলি হাতের ব্যাগটা বিছানায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল, আমি তাহলে কালই কলকাতায় চলে যাব।

কিন্তু জুলি কলকাতায় গেল না। ভেবে দেখল, বাড়িতে ঐরকম একটা উটুকো লোককে রেখে চলে যাওয়া উচিত হবে না।

সত্যিই লোকটা অদ্ভুত। পশ্চিম দিকের একটা ঘর ওঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘরে উনি যত রাজ্যের ঠাকুর-দেবতার ছোটো ছোটো মূর্তি সাজিয়ে রেখেছেন। দেওয়ালে দেওয়ালে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রীর ছবি। রোজ অনেক দূরে গঙ্গায় স্নান করা চাই। সকালে উঠেই সারা বাড়িতে গঙ্গাজল ছেটান। তারপর ভালোরকম ভোজনপর্ব সেরে কাছেপিঠে মন্দির-টম্দির দেখতে বেরোবেন, ফিরবেন সন্দের পর। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত ঘণ্টা, শাঁখ বাজিয়ে চলবে তাঁর অতগুলো ঠাকুরের পূজো। সারাদিন ধুনোর ধোঁওয়ায় ঘর অন্ধকার। রাতে ঘুমের দফারফা। লোকটার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। যেন কদিনেই বাড়টাকে নিজের বাড়ি বলে মনে করে নিয়েছেন। কিছু বলার উপায় নেই। হাজার হোক গুরুদেবের ছেলে! তার ওপর ঠাকুর-দেবতা নিয়ে ব্যাপার। কাজেই মুখ বুজে সব সহ্য করে যেতে হয়।

অভিজিৎ তো লোকটাকে দু' চক্ষে দেখতে পারে না, গুজগুজ করে বলে, ওকে আমি তাড়াবই।

এরা ভাই-বোনে যে তাকে দেখতে পারে না, গুরুদেবের পুত্রটি তা ভালো করেই বোঝেন। একদিন জুলির মাকে কথায় কথায় বলেন, বৌমা, তোমরা আমার খুব আদর-যত্ন কর ঠিকই, কিন্তু তোমার ছেলে-মেয়েরা আমায় দেখতে পারে না। ভক্তি-শ্রদ্ধা একেবারে নেই।

সুলেখা তাড়াতাড়ি বলেন, আসলে কী জানেন ঠাকুরমশাই, এরা তো একালের ছেলে-মেয়ে। এদের চালচলন, কথাবার্তা একটু অন্যরকম।

ঠাকুরমশাই বিরক্ত হয়ে বললেন, ওরা তো আমার সঙ্গে কথাই বলে না, আমার ঘরের দিকে তাকায় না পর্যন্ত। এত অবজ্ঞা! এরকম হলে আমি থাকি কি করে?

বাস্তব হয়ে সুলেখা বলেন, না না, ওরা ছেলেমানুষ। ওদের ব্যবহারে কিছু মনে করবেন না। ক্ষমা করবেন।

এবার ঠাকুরমশাই একটু শান্ত হলেন। বললেন, তাছাড়া বৌমা, আমি যতদিন এ বাড়িতে আছি ততদিন তোমাদের কোনো অমঙ্গল হতে দেব না। আমার এই এতগুলো দেবদেবীর পূজো নিষ্ফল নয় জেনো।

তারপরই নিচু গলায় বললেন, যদি চাও তো তোমার গুণধর। ছেলে-মেয়েদের সুমতির জন্যে ছোটোখাটো একটা যজ্ঞ করে দিই। বেশি খরচ পড়বে না।

শুনে তো সুলেখা চমকে উঠলেন। ছেলে-মেয়েদের কানে গেলে রক্ষা থাকবে না। বললেন, ও সব এখন থাক ঠাকুরমশাই। দরকার হলে বলব।

বলাই বাহুল্য ঠাকুরমশাই মনে মনে চটে গেলেন।

এর পর একদিন ঠাকুরমশাই সন্ধ্যার পর বাড়ির সবাইকে ডাকলেন। বললেন, খুব দরকারি কথা আছে।

জুলি তো যাবেই না। অভিজিৎ-এরও যাবার ইচ্ছে নেই। মা-বাবা বারবার বলায় জুলিকে বললে, লোকটা কী বলে শোনাই যাক না।

ধুনোর ধোঁওয়ায় ঘর অন্ধকার। ধোঁওয়াটা একটু পাতলা হয়ে গেলে সবাই ঢুকল। ঠাকুরমশাই একটা কন্ডলের আসনে বসেছিলেন। সামনের মেঝেতে খড়ি দিয়ে আঁক-জোঁক কাটা। চার কোণে চারটে সুপুরি। মাঝখানে একটা ছোটো কাপড়ের টুকরোয় কী সব বাঁধা।

সবাই মেঝেতে বসলে ঠাকুরমশাই গম্ভীরভাবে বললেন, যে জন্যে ডেকেছি শোনো। তোমাদের এই বাড়িতে প্রেতাছা আছে।

মাগো! বলে জুলির মা আঁৎকে উঠলেন।

ঠাকুরমশাই বলতে লাগলেন, এ বাড়িতে এসে পর্যন্ত দেখছি বাতাস বেশ ভারী। এমনটা কেন হলো তা জানবার জন্যে খড়ি পেতে দেখলাম, হ্যাঁ, ঠিক যা ভেবেছি। প্রেতাছা দিবি ডেরা গেড়ে বসে আছে।

অভিজিৎ বলেন উঠল, তা থাক না। ক্ষতি তো করছে না।

ঠাকুরমশাই বললেন, বল কী বাবা! প্রেতাছা বাড়িতে পুষে রেখে দেবে! এখনও পর্যন্ত ক্ষতি করেনি বলে ভবিষ্যতে করবে না জানছ কি করে?

অভিজিৎ যতই বিদ্রূপ করে বলুক, তার মায়ের বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। ঠাকুরমশাই তো একেবারে ভুল বলেনি। তাঁর চঞ্চলের কথা মনে পড়ল। যে তিনবার এসেছে সে যে এখানেই এখন বসে আছে কিনা কে জানে।

ঠাকুরমশাই তখন বলছেন, প্রেতাছা নিয়ে অবহেলা করা ঠিক নয়। ওদের মর্জি বোঝা ভার। আজ চুপচাপ আছে, কালই হয়তো অঘটন ঘটতে পারে।

সুধীনবাবু বললেন, তা আপনি কী করতে চান?

ঠাকুরমশাই বললেন, ছোটোখাটো একটা প্রেত তাড়ানো যজ্ঞ। কম খরচেই করে দেব। আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, কিন্তু ভেবে দেখুন তো সত্যিই কি কোনোদিন ভৌতিক ঘটনা ঘটেনি?

হঠাৎ জুলি উঠে চলে গেল। অভিজিৎ হেসে বললে, পাড়ার কার কার কাছ থেকে শুনেছেন বলুন তো!

ঠাকুরমশাই বললেন, তোমাদের যদি একান্তই অবিশ্বাস হয় তাহলে এসব আলোচনা থাক। বলে নিজেই খড়ির ছক মুছে ফেললেন। জুলি পরে একসময়ে হাসতে হাসতে মাকে বলল, বাবার গুরুদেবের ছেলোট কিম্বা ব্যবসা ভালোই বোঝেন। প্রেতাশ্বা নয়, তিনি নিজেই এ বাড়িতে দিব্যি ডেরা গেড়ে বসেছেন। নড়বার নাম নেই।

অভিজিৎ বলল, বাবা নিতান্ত ভালোমানুষ আর গুরুদেবের ভক্ত তাই কিছু বলতে পারেন না। ঠাকুরমশাই সেই সুযোগটাই নিচ্ছেন।

কোনো যজ্ঞই হলো না। তবু ঠাকুরমশাই দিব্যি থেকে গেলেন। শুধু জুলির মায়ের মনটা খচখচ করতে লাগল—ঠাকুরমশাই খুব ভুল তো বলেননি। একটা যজ্ঞটজ্ঞ করলেই হতো। কিন্তু ছেলে আর মেয়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারলেন না। জুলি শুধু ভাবল, চঞ্চলদা কি এই লোকটারই কাছ থেকে সাবধান হতে ইস্তিত করেছিল?

### সাহেবের আবির্ভাব

সমুদ্রগড় রেলবাজারে নাকি একজন পাগলা সাহেব এসেছে। কোথা থেকে এসে জুটেছে কে জানে। কখনো গাছের তলায় কখনো পুকুরপাড়ে বসে থাকে। কী তার উদ্দেশ্য কেউ তা জানতে পারেনি। খাঁটি সাহেব এ অঞ্চলের লোক সিনেমা টি.ভি.তে ছাড়া এর আগে চোখের সামনে দেখেনি। তাই তাদের কৌতূহলের শেষ নেই।

অভিজিৎ ক’দিন এখানে ছিল না। কলকাতায় গিয়েছিল। তার কানেও সাহেবের কথা গেল। ভাবল দেখাই যাক কিরকম সাহেব। তেমন হলে সাহেবকে নিয়ে তাদের কাগজে সচিত্র ফিচার লিখবে। তাই ক্যামেরাটাও সঙ্গে নিল।

সমুদ্রগড় রেলবাজারটা গোয়ালপাড়ার কাছেই। ঘুরতে ঘুরতে সাহেবের দেখা পেল নসরৎপুরে একটা ভাঙাবাড়ির কাছে। সাহেব সেই বাড়ির ভাঙা চাতালের ওপর খবরের কাগজ পেতে আপন মনে কী লিখছে। অভিজিৎ দেখে অবাক হলো সাহেব যে কলম দিয়ে লিখছে তা ফাউন্টেন পেন বা ডট পেন নয়, সে কলম মাস্কাতার আমলের বড়ো পালকের কলম। বহুকাল আগে যখন ডট পেন তো নয়ই, এমনকি কালিভরা ফাউন্টেন, কাঠের হ্যাণ্ডলে সরু নিবগোঁজা কলমেরও চল হয়নি তখন লোকে লিখত শরের কিংবা পাখির পালক চটেছে কলম তৈরি করে। এ যুগের একজন সাহেব কেন ঐরকম কলম দিয়ে লিখছে কে জানে!

সাহেব ঝুঁকে পড়ে লিখছিল। পাশেই একটা মস্ত পৌঁটলা।

এখন তো কতরকমের বড়ো বড়ো কিট্‌ব্যাগ বিগশপার বাজারে চল হয়েছে—তার জায়গায় পৌঁটলা! এই ধরনের পৌঁটলা করে আগে ধোপারা বাড়ি বাড়ি থেকে কাপড় কাচতে নিয়ে যেত। ফেরিওয়ালা মেয়েদের শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া এমনভাবে পৌঁটলা বেঁধে হাঁক দিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরত। ট্রেনে গেরস্তরা যেত বাস্ক-প্যাটারার সঙ্গে পৌঁটলা নিয়ে। আশ্চর্য! মাস্কাতার আমলের সেই পৌঁটলা আজ সাহেবের কাছে।

অভিজিৎ-এর খুব ইন্টারেস্টিং লাগল। সে সাহেবের সামনে গিয়ে বলল, গুড মর্নিং।

সাহেব একবার চোখ তুলে তাকাল। হেসে বলল, ভেরি গুড মর্নিং। বোসো।

তারপরেই ইতস্তত করে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল, কিম্বা তোমায় কোথায় বসতে দেব? এ তো ডানকানের রাজপ্রাসাদ নয়।

অভিজিৎ অবাক হয়ে বলল, ডানকান কে?

মাই গড! স্কটল্যান্ডের রাজা ডানকানের নাম মনে নেই? সেই যাকে অকৃতজ্ঞ সেনাপতি ম্যাকবেথ নিজে হাতে খুন করেছিল?

কী সব বলছে সাহেব! অভিজিৎ খতমত খেয়ে গেল। একটু সামলে নিয়ে বলল, কী লিখছ?

সাহেব হেসে বলল, হিস্তি—নয়া হিস্তি।

যাঃ বাবা! ইতিহাস লিখছে! এ তো আচ্ছা পাগল। তা এখানে বসে লিখছ কেন?

সাহেব নিরুপায় গলায় বলল, কী করব? কোথায় থাকব? আমায় কেউ জায়গা দেয় না।

ক'দিনের জন্যে এসেছ এখানে?

ফর এ ফিউ ডেজ। কয়েকদিনের জন্যে। আমি টুরিস্ট। বেশিদিন কোথাও থাকা হয় না।

হোটেলের থাকতে পার। টাকাপয়সা নেই?

সাহেব একটু হাসল। তারপর তার লম্বা কোটের বাঁ পকেট থেকে বের করল একটা বড়ো থলি। থলিটা মেঝের উপর উপুড় করতেই ঝনঝন করে পড়ল একগাদা কুইন ভিক্টোরিয়ার মুখওয়ালা খাঁটি রূপোর টাকা। তার মধ্যে আবার অনেকগুলো সোনার গিনি।

অভিজিৎ—এর তো চোখ ট্যারা। এত টাকা পকেটে নিয়ে ঘুরছে।

কিন্তু সাহেব, এসব তো পুরানো আমলের টাকা। এ তো এখন চলবে না।

এবার সাহেব তার ডিলে প্যান্টের ভেতরের গোপন পকেট থেকে বের করল গোছ-গোছ অশোকস্তম্ভ মার্কা নোট।

এ তো অনেক টাকা। তাহলে হোটেলের থাকছ না কেন?

সাহেব বলল, আমি বিদেশী বলে সবাই এমনকি বয়-বাবুচিরাও খুব বিরক্ত করে। কেবল আমার ঘরে উঁকিঝুঁকি মারে। হাসবে দাঁত বের করে।

অভিজিৎ বুঝল বিদেশী বলেই নয়, আসলে পাগলাটে বলেই ওদের এত কৌতূহল।

তুমি আসছ কোথা থেকে?

সাহেব গম্ভীরভাবে বলল, আমি তো বলেছি আমি টুরিস্ট। আমার আসা-যাওয়ার ঠিক নেই। তবে একটা বিশেষ জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি ... বলতে বলতে সাহেব কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

অভিজিৎ আর ঘাঁটল না। তবে ওর বেশ পছন্দ হলো সাহেবকে। খুব ইনটারেস্টিং। একে নিয়ে কাগজে লেখা চলে। আরও ভালো হয় যদি ওকে কয়েক দিনের জন্যে তাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যায়। তাদের বাড়ির দরজা সকলের জন্যেই খোলা। সাতদিন—দশদিন যে কেউ স্বচ্ছন্দে থেকে যেতে পারে।

বাড়ি নিয়ে যাবার প্রস্তাব করতেই সাহেব কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

তোমাদের বাড়ি আমাকে নিয়ে যেতে চাও? হোয়াই? আমাকে নিয়ে গিয়ে তোমার লাভ?

অভিজিৎ বলল, তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। বাবা-মায়েরও নিশ্চয় ভালো লাগবে। আর আমার একজন খুব সুইট বোন আছে। পড়াশোনা করছে। বিলেত যাবার ইচ্ছে। তোমাকে কাছে পেলে খুব খুশি হবে।

সাহেব বললে, তবে চলো।

এই বলে শ্রৌট সাহেব অত বড়ো পোঁটলাটা কাঁধে তুলে নিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে অভিজিৎ-এর সঙ্গে হাঁটিতে লাগল।

এদিকে ঠাকুরমশাই কেবলই জুলির মাকে চাপ দিচ্ছেন, এ বাড়িতে প্রেতাশ্বা আছে। একটা যজ্ঞ করে দিই।

ঠাকুরমশাই দেখেছেন বাড়ির মধ্যে একমাত্র এই মহিলাটিই তাঁর কথা শুনতে চান। তিনিও যেন মনে করেন এ বাড়িতে কেউ থাকে। কিন্তু ছেলে-মেয়ে দুজনেই ভূত তাড়াবার নাম করলেই খেপে ওঠে। ভূতের সঙ্গে নিত্য বাস করতে ভালোবাসে।

আর-একদিন যজ্ঞের কথা বলতেই জুলি তেড়েফুঁড়ে উঠল। গুরুদেবের ছেলের মান-সম্মান না রেখেই বললে, আপনি বার বার ঐ এক কথা বলেন কেন বলুন তো? যজ্ঞটজ্ঞ করে বাবার ঘাড় মুচড়ে দু'পয়সা বাগাতে চান?

ঠাকুরমশাই তো হাঁ। এ বাড়ির মেয়ের মুখে এমন কথা শুনতে হবে কখনো কল্পনা করেননি। তোতলাতে তোতলাতে বললেন, না—না, তোমাদের ভালোর জন্যেই বলি।

জুলি ফুঁসে উঠে বলল, ভূত থাকে থাক। এ নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না, আপনি যেমন খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, ঘুরে বেড়াচ্ছেন তেমনি বেড়ান। আপনি গুরুদেবের ছেলে বলেই কেউ আপনাকে যেতেও বলবে না। তবে সব কিছুর একটা সীমা থাকা দরকার। বলে জুলি কাঁধে একটা ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এত অপমান সত্ত্বেও কিন্তু ঠাকুরমশাই বাড়ি থেকে নড়লেন না। তিনি এখন তীর্থদর্শন সেরে এ-বাড়ি ও-বাড়ি পূজা করে বেড়াচ্ছেন। জুলির মা একদিন বিরক্ত হয়ে সুধীনবাবুকে বললেন, ঠাকুরমশাই তো যাবার নাম করেন না। কী উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না। পাকাপাকিভাবে থেকে গেলেন নাকি?

সুধীনবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কী করব? মুখের ওপর 'যাও' তো বলতে পারি না।

ঢিলে প্যান্ট, লম্বা কোট, মাথায় হ্যাট, কাঁধে মস্ত পোঁটলা, অস্বাভাবিক মোটা মোটা আঙুল, ঝোলা ঠোঁট, মাথাটা নারকেলের মতো এই মানুষটাকে দেখে ভুরু কৌচকান ঠাকুরমশাই। মনে মনে বললেন, এ আপদ আবার কোথা থেকে জুটল।

কিন্তু আর কেউ বিরক্ত হলো না। এ বাড়ির এই একটা গুণ—যে কেউই অতিথি হয়ে আসতে পারে। থাকতে দেবার জায়গার অভাব নেই, খেতে দেবার ক্ষমতাও আছে। এ তো আবার সাহেব। আমাদের এখনও সাহেব-মেমদের প্রতি সমীহভাবটা যায়নি।

জুলি যখন শুনল লোকটার কেউ কোথাও নেই, টুরিস্ট মানুষ—সুদূর স্কটল্যান্ড থেকে ভারতে এসেছে। তারপর দিল্লি, কানপুর, বেনারস, পাটনা হয়ে কলকাতা। তারপর একেবারে এই সমুদ্রগড়ে। তখন দাদার মতোই খুশি হলো। অভিজিৎ-এর উদ্দেশ্য সাহেবকে নিয়ে কাগজে কিছু লেখে। আর জুলি ভাবল লোকটা যদি দু-চারদিন এখানে থাকে তাহলে তার দেশের কথা, বাড়ির কথা—টুরিস্ট জীবনের কথা শোনে।

সাহেব খুশি মনেই থাকল। তার জন্যেও একটা বাথরুমওলা ঘরের ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু কী খাবে? একজন খাস স্কচ সাহেব তো আর ভাত, ডাল, সুজো, মাছের ঝোল খেতে পারবে না। তাহলে?



সাহেবই তাদের বাঁচিয়ে দিলো। বলল, আমার খাবার জন্যে ভাবতে হবে না। বাইরে ইচ্ছেমতো খেয়ে নেব। তোমরা যে দু'দিনের জন্যে থাকতে দিয়েছ এর জন্যে ধন্যবাদ।

শুধু খাওয়াই নয়, সাহেব আলাদা ঘর পেয়ে নিজেই চা বা কফি করে নেয়। ঐ বিরাট পোর্টলার মধ্যে যেমন একগাদা পুরনো বই আছে, কাগজ আছে, কালি কলম আছে তেমন আছে একটা ছোট্ট বিলিতি স্টোভ, চা, চিনি, গুঁড়ো দুধ, আরও কত কি কে জানে।

একটু সময় পেলেই সে একটা খাতায় কী লেখে!

অভিজিৎ বলে, ও ইতিহাস লেখে।

জুলি নিজেই সাহেবের সঙ্গে ভাব জমাতে লাগল। কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাবে, কেন দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিজের লোক কেউ আছে কিনা, তার সঙ্গে যথেষ্ট টাকা আছে তবু কেন এইরকম লক্ষ্মীছাড়া পোশাক, হাত-পায়ের নখগুলো অত বড়ো বড়ো রেখেছে কেন ইত্যাদি।

সাহেব কিন্তু খুব সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছে। সে বলেছে তার দেশ স্কটল্যান্ডে। দেশভ্রমণ করাই তার উদ্দেশ্য। তার নিজের লোক বলতে তেমন কেউ নেই। দেশভ্রমণের মধ্যেও তার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে—এ দেশে খুব পুরনো, পরিত্যক্ত বাড়ির সংখ্যা আর সেগুলোর ইতিহাস সংগ্রহ করা।

জুলি জিজ্ঞেস করেছে, এত দেশ থাকতে বর্ধমান জেলার সামান্য জায়গা এই সমুদ্রগড়ে কেন?

সাহেব বলেছে, তার লক্ষ্যই হচ্ছে গ্রামের পুরনো বাড়ির খোঁজ করা। ইচ্ছে করে সে সমুদ্রগড়ে আসেনি। হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেসে উঠেছিল নর্থ বেঙ্গলে যাবার জন্যে। কিন্তু সমুদ্রগড়ে এসে ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যাওয়ায় সে সমুদ্রগড় স্টেশনে নেমে পড়ে। জায়গাটা ভালো লাগায় এখানেই দু'দিন থেকে যাবে ভেবেছিল। এটাও তো বেশ পুরনো জায়গা। সাহেব যা-ই উত্তর দিক জুলির কিন্তু মনে হয়েছে বাইরে সরল হলেও সাহেব খুব চালাক, অনেক কিছু চেপে গেছে। জুলি আর ঘাঁটাতে চায়নি। মরুক গে। হয়তো দিন দুই থাকবে তার পর আবার পোর্টলা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে।

সাহেবের এই বাড়িতে থাকার দ্বিতীয় দিন রাতে সামান্য একটা ঘটনা ঘটল।

রাত তখন প্রায় এগারোটা। শহরের মানুষের কাছে রাত এগারোটা এমন কিছু নয়। টি.ভি. দেখতে দেখতেই বারোটা বাজে। কিন্তু গোয়ালপাড়ার মতো জায়গায় রাত এগারোটায় চারিদিক নিঝুম হয়ে যায়।

জুলি দিব্যি ঘুমোচ্ছিল, হঠাৎ যেন চাপা চিৎকার কানে এল। কেউ যেন হঠাৎ কিছু দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠল, 'বাপরে!' বলে। ঐ একবারই। তারপর সব নিস্তব্ধ। ঘুমের ঘোরে শোনা। কিছু ভাববার আগেই জুলি আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল।

পরের দিন সকালে ঠাকুরমশাই বৌচকা-বুঁচকি, বড়ো টিনের সুটকেসটা নিয়ে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত।

সুধীনবাবু অবাক হয়ে বললেন, একি ঠাকুরমশাই, চলে যাচ্ছেন নাকি?

ঠাকুরমশাই গম্ভীরভাবে শুধু একটি কথাই উচ্চারণ করলেন, হ্যাঁ।

সে কী! হঠাৎ?

তা আমি বলতে পারব না। বললে তো আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। কী দরকার মিছিমিছি অপমান হওয়া।

এতদিন এখানে থেকে ঠাকুরমশাই হঠাৎ যে এমনি ভাবে সত্যি সত্যিই চলে যাবেন কেউ ভাবতে পারেনি। আর যাবার আগে কিছুতেই বলে গেলেন না যাবার কারণটা কী।

শুধু জুলি লক্ষ্য করেছিল, এক রাত্তিরে ঠাকুরমশাইয়ের দু'চোখ বসে গিয়েছে, মুখে যেন রক্তের আভাসমাত্রও নেই।

হঠাৎই জুলির মনে হলো কাল রাতে ঘুমের মধ্যে মনে হয়েছিল কেউ যেন ভয় পেয়ে চৈঁচিয়ে উঠেছে। সত্যিই তেমন কিছু শুনেছিল কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারল না। ঠাকুরমশাই কি ভয় পেয়ে অমন চিংকার করেছিলেন?

বেলা তখন দশটা। অন্যদিনের মতো জুলি বাড়ির কম্পাউন্ডের মধ্যে অলসভাবে ঘুরছিল। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ল বাড়ির পিছন দিকে। এদিকেই এক পাশে সাহেবের ঘর। অন্য পাশে ঠাকুরমশাইয়ের। মনে পড়ল ঠাকুরমশাই আজই সকালবেলায় হঠাৎ নাটকীয়ভাবে চলে গিয়েছেন। ঠাকুরমশাইকে সে মোটেই দেখতে পারত না। কিন্তু লোকটা ঘর শূন্য করে দিয়ে চলে গেছে মনে হতেই জুলি কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল। কী উদ্দেশ্যে বলা নেই কওয়া নেই বাংলাদেশ থেকে এসে দিবা এখানে থেকে গেলেন তা যেমন জানা গেল না, তেমনি জানা গেল না হঠাৎ এমন কী ঘটল যে বলা নেই কওয়া নেই চলে গেলেন। এখানে আসার উদ্দেশ্য একটা হতে পারে—বাংলাদেশে হয়তো খাওয়া-পরা র কষ্ট হচ্ছিল, তাই এপারে চলে এসে গুরুপুত্রের দোহাই দিয়ে কিছুকাল নিশ্চিন্তে থেকে যাওয়া। কিন্তু এমন করে কেন চলে গেলেন তার কোনো সদুত্তর জুলি খুঁজে পেল না।

এইসব কথা নিজের মনে ভাবতে ভাবতে সে যখন ঘুরছিল তখন হঠাৎ চোখে পড়ল সাহেবের খোলা জানলা দিয়ে দু-তিনটি কাক ঢুকে কী যেন মুখে করে আনছে। তাড়া দিতেই একটা কাকের মুখ থেকে যেটা পড়ে গেল সেটা দেখে জুলি বেশ অবাক হয়ে গেল।

এক টুকরো বড়ো কাঁচা মাংস। মাংসের গায়ে রক্ত লেগে রয়েছে।

জুলি প্রথমে ভাবল সাহেব বোধহয় রৈঁধে খাবে বলে মাংস কিনে এনে রেখেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো এ দু'দিন তো সাহেবকে রাঁধতে দেখা যায়নি। একটা ছোটো স্টোভ আছে বটে তাতে চা করা যায় কিন্তু মাংস রাঁধা যায় না। তাছাড়া সাহেবের কাছে কড়াই, ডেকচি, হাঁড়ি, এসব আছে রলেও তো মনে হয় না। তাহলে? কাঁচা মাংস আনার কারণ কী?

ভাবতে ভাবতে জুলি বাড়ি এসে ঢুকল। আর ঐ চিন্তাটা মাথা থেকে চলে গেল।

সাহেব সকালেই কোথায় বেরিয়েছিল, এইমাত্র ফিরল একটা ইংরিজি খবরের কাগজ হতে করে। বাইরের ঘরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুধীনবাবুকে বসে থাকতে দেখে সাহেব টুপি খুলে সবাইকে 'গুড মর্নিং' জানাল।

সুধীনবাবু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, এত সকালে কোথায় বেরিয়েছিলে?

সাহেব বললে, একটা কাজ ছিল। এবার তো যেতে হবে। তাই কাজগুলো চুকিয়ে ফেলছি।

অভিজিৎ মনে মনে হাসল, কাজ যে কত তা জানতে বাকি নেই। পুরনো ভাঙাবাড়ি খুঁজে বেড়ানো। কত রকমের পাগলই না আছে!

জুলির মা এক কাপ কফি তৈরি করে নিয়ে এসে সাহেবের হাতে দিলেন। সাহেব হেসে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ।

মুশকিল হয় সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে গেলে। সে নিজে থেকে যদি কিছু বলে তাহলে শোনা যায়, কিন্তু কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে হয় উত্তর দেয় না, নইলে এলোমেলো উত্তর

দেয়। যেমন জুলি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, সাহেব তুমি কি স্নান কর না? দু'দিন তো তোমায় স্নান করতে দেখলাম না?

সাহেব উত্তরে বললে, তোমাদের এই জায়গাটা তোমাদের মতোই বড়োই সুন্দর। আমার খুব ভালো লেগেছে। যেখানে যাচ্ছি, সেখান থেকে যদি ফিরে আসতে পারি তাহলে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা করে যাব।

সুধীনবাবু বললেন, ধন্যবাদ। কিন্তু তুমি এখান থেকে কোথায় যাবে?

সাহেব কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রইল। তারপর বলল, আমার যাওয়ার কি কোথাও ঠিক আছে, বাবু? আমি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছি। যা খুঁজছি তা এখনও পাইনি।

জুলি বলল, তাহলে তুমি ঠিক ট্যুরিস্ট নও। ট্যুরিস্টরা নানা জায়গা দেখবার জন্যেই ঘুরে বেড়ায়। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ঘোরে না। কিন্তু দেখছি তোমার ঘুরে বেড়াবার পেছনে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। তাই না?

সাহেব যেন ধরা পড়ে গেল। তাই গম্ভীরভাবে বলল, তা হয়তো ঠিক।

তোমার উদ্দেশ্যটা আমাদের কাছে বলতে বাধা আছে কি?

হ্যাঁ আছে। অবশ্যই আছে। আর আমার সম্বন্ধে বেশি কৌতূহলটা আমি মোটেই পছন্দ করি না। বলতে বলতে সাহেবের মুখটা চাপা রাগে লাল হয়ে গেল।

সাহেবের কাছ থেকে এইরকম উত্তর কেউই আশা করেনি। সবাই যেন গালে চড় খেলো।

হঠাৎ সাহেবের চোখে পড়ল দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবি। সে বসে বসেই ছবিটি দেখতে লাগল। তার মুখের ভাবের পরিবর্তন হলো। মুগ্ধ স্বরে বলে উঠল, বাঃ, চমৎকার ছবি তো!

বলতে বলতেই সাহেব গৃহকর্তার অনুমতি না নিয়েই ছবিটার কাছে উঠে গেল। তারপর গভীর মনোযোগের সঙ্গে ছবিটা দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে সাহেবের দু'চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠল, গা কাঁপতে লাগল। উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করল, এ ছবি তোমরা কোথা থেকে পেয়েছ?

সাহেবের এইরকম উত্তেজনায় সকলেই চমকে উঠল। সুধীনবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, আমাদের একজন ফ্যামিলি ফ্রেন্ড এটা দিয়েছিল।

এ ছবি সে কোথায় পেয়েছিল?

সুধীনবাবুই উত্তর দিলেন, কলকাতার একটা পুরনো কাগজের দোকানে। বিলেতের একটা ইংরিজি ম্যাগাজিনে ছবিটা ছাপা হয়েছিল। ছবির সঙ্গে বাড়িটার ইতিহাসও ছিল। আনফর্চুনেটলি সেটা পাওয়া যায়নি। ছিঁড়ে গিয়েছিল।

ওঃ মাই গড! বলে সাহেব সেখানেই একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

একটু পরে বলল, তোমরা কি প্লিজ তোমাদের সেই ফ্যামিলি ফ্রেন্ডের সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দেবে?

অভিজিৎ বলল, সরি সাহেব, হি ইজ নো মোর। সে আর বেঁচে নেই।

মুহূর্তে ঘরটায় যেন শোকের ছায়া নেমে এল। সবাই চুপ করে রইল।

জুলিই প্রথমে নীরবতা ভাঙল। বলল, জান সাহেব, তোমার মতো সেও ছবিটা দেখে কেমন হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, ঐ বাড়িটা তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে। তারপর সেই যে চলে গেল, আর ফিরল না। কোথায় কিভাবে মরল তা কে জানে!

সাহেব ভুরু কুঁচকে বলল, সে যে মরেছেই তার কোনো প্রমাণ পেয়েছ?

প্রমাণ? কাগজে কলমে প্রমাণ না পেলেও এমন কিছু প্রমাণ এ বাড়ির সকলেই পেয়েছে

যা প্রকাশ করে বলা যায় না। সুধীনবাবু শুধু বললেন, বেঁচে থাকলে সে নিশ্চয় এতোদিনে ফিরে আসত।

সাহেব যেন নিজের মনেই বলল, যদি ঐ বাড়িতে গিয়ে থাকে তাহলে কোনোদিনই ফিরবে না। শয়তান ম্যাকবেথের হাত থেকে কারো নিষ্কৃতি নেই। প্রকাশ্যে বলবে, কিন্তু ছবির এই বাড়ি কোথায় তা সে জানবে কি করে?

জুলি ভুল করে ফেলল। বললে, ছবির এক কোণে ছেঁড়া ছেঁড়া কতকগুলো অক্ষর আছে। তাই থেকেই—

ছেঁড়া ছেঁড়া অক্ষর? সাহেব লাফ দিয়ে উঠে ছবিটার কাছে গিয়ে অক্ষরগুলো দেখতে লাগল। তারপর হতাশ হয়ে বলল, নাঃ, কিছুই বুঝলাম না।

জুলি হেসে বলল, কিন্তু আমাদের সেই ফ্রেন্ডটি বুঝে নিয়েছিল। 'As' for Assam, 'N' for North.....'ar' for Kachar.

সাহেব উত্তেজনায ছুটে এসে জুলির হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, থ্যাক্স ইউ—থ্যাক্স ইউ। জায়গাটার কত খোঁজ করেছিলাম—কোথায় না গিয়েছিলাম—পাহাড়ে, জঙ্গলে, নদীর ধারে ধারে। এমনও দিন গেছে, খেতে পাইনি, জন্তু মেরে কাঁচা মাংস পর্যন্ত খেয়েছি। আজ সে জায়গার সন্ধান পেলাম।

বলতে বলতে হঠাৎ সে উঠে নিজের ঘরে চলে গেল। তারপর একটা কাঠের ছোটো বাস্ক হাতে করে চেয়ারে এসে বসল, বাস্কটা খুলে একটা হলদে হয়ে যাওয়া জীর্ণ কাগজ বের করল। তাতে অনেক কিছুই লেখা। কাগজটা সবার সামনে টেবিলের ওপর রেখে বলল, বাড়িটার বর্ণনা এখানে পরিষ্কার দেওয়া আছে। তোমাদের এখানে এসে সেই বাড়ির ছবিটাই নিজের চোখে দেখলাম। কাগজের বর্ণনার সঙ্গে ছবিটা হুবহু মিলে যাচ্ছে। থ্যাক্স ইউ—থ্যাক্স ইউ।

জুলি বলল, ও বাড়িতে কী আছে? ওখানে যেতেই বা চাইছ কেন?

সাহেব আবার রেগে উঠল। বলল, বেশি কৌতূহল ভালো নয় মিস। ওটা আমার পার্সোনাল ব্যাপার।

জুলি ঘাবড়াল না। বলল, আমাদের বললে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। ঐ বাড়িটা সম্বন্ধে আমাদের বন্ধুটিরও কৌতূহল ছিল। আর সেই কৌতূহল মেটাতে গিয়েই যে সে মরেছে তাতে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।

সাহেব বলল, হ্যাঁ, যদি সে সত্যিই সেখানে পৌঁছে থাকে তাহলে মরেছেই।

জুলি বলল, এই জনোই আমাদের কৌতূহল স্বাভাবিক। তাছাড়া একটু আগেই তুমি বলে ফেলেছ 'শয়তান ম্যাকবেথের হাত থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই।' যদি এতই গোপনীয় হয় তাহলে ও কথাটা বললে কেন?

জুলির কথায় সাহেব থমকে গেল। একটু ভেবে বলল, ম্যাকবেথের নাম শুনেছ কখনও?

জুলি বলল, তা শুনব না কেন? 'ম্যাকবেথ' গ্রেট ড্রামাটিস্ট শেক্সপীয়রের একটা বিখ্যাত নাটকের নাম।

সাহেব অবাক হয়ে বলল, তুমি শেক্সপীয়র পড়েছে?

অবশ্যই। শুধু 'ম্যাকবেথ' কেন? 'রিচার্ড দ্য সেকেন্ড', 'দ্য টেমপেস্ট', কিং লিয়ার', 'জুলিয়াস সিজার'....কত বলব?

গোয়ালপাড়ার মতো একটা গ্রামের মেয়ে শেস্ত্রপীয়রের এতগুলো বই পড়ে ফেলেছে জেনে সাহেব অবাক হলো। সেই সঙ্গে একটু নরমও হলো।

বলল, ম্যাকবেথকে তোমার কিরকম লাগে?

জুলি বলল, দুনিয়ায় যদি একশো জন লোভী, নিষ্ঠুর আর অকৃতজ্ঞ রাজা থাকে তাহলে ম্যাকবেথ তাদের মধ্যে এক নম্বর।

সাহেব বলল, শুধু লোভী আর অকৃতজ্ঞই নয়, লোকটা ছিল একটা পাক্কা শয়তান। অরণ্য অঞ্চলের এক নির্জন প্রান্তরে যে একদল ভয়ংকর দেখতে গালে দাড়ি ডাইনিরা ঘুরে বেড়াত তাদের সঙ্গে বোন সম্পর্ক পাতিয়ে ম্যাকবেথ তাদের ইচ্ছেতেই দেশের আর নিজেরও সর্বনাশ করেছিল।

জুলি বলল, অথচ ম্যাকবেথের মতো অতবড়ো বীর সেনাপতি যদি না সেদিন রাজা ডানকানের পাশে থাকত তাহলে কিছুতেই নরওয়ারের রাজা সোনের হাত থেকে স্কটল্যান্ডকে রক্ষা করতে পারত না।

খামো! হঠাৎ গর্জে উঠল সাহেব। তুমি দেখছি সেই শয়তানটারই গুণগান করে যাচ্ছ। রাজার আর একজন অতি বিশ্বস্ত বীর সেনাপতি ব্যাংকোর কথা তো বলছ না? আর ম্যাকবেথ যে এত বড়ো যোদ্ধা হয়ে উঠেছিল তা শুধু নিজের ক্ষমতায় নয়, ডাইনিদের মন্ত্রপড়া তরোয়ালটার জোরে। তরোয়ালটা সে এক মুহূর্তের জন্যে কাছছাড়া করত না।

জুলি তরোয়ালের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে হেসে বলল, তুমি মিথ্যে রাগ করছ। ম্যাকবেথের কথা তুললে বলেই ম্যাকবেথের কথা বলছিলাম। নইলে ব্যাংকোকে কি উপেক্ষা করতে পারি? আমার তো মনে হয় ম্যাকবেথ নাটকে ব্যাংকোর মতো অত ভালো, অত বিশ্বস্ত, অত হতভাগ্য চরিত্র দুটি নেই।

সাহেব আবার নরম হলো। বলতে লাগল, একবার সেই দৃশ্যটা কল্পনা করো মিস, ম্যাকবেথ আর ব্যাংকোর নেতৃত্বে একদিকে ডানকান-বাহিনী, অন্যদিকে বিদ্রোহী ম্যাকডোনাল্ড আর স্যোনের নরওয়ায়ে বাহিনী। ফাইডের আকাশ শুধু ঘোড়ার খুরের ধুলোয় ধুলোয় অন্ধকার—বিস্তীর্ণ প্রান্তর রক্তে রক্তাক্ত! সেই অসম্ভব যুদ্ধে জয়ী হলো ঐ ম্যাকবেথটা আর সকলের প্রিয় ব্যাংকো। তারপর—

জুলি বলল, তারপর ম্যাকবেথ ফের দেখা করল সেই ছাগলদাড়ি ডাইনি বোনদের সঙ্গে। তারা মুখ টিপে হেসে ম্যাকবেথকে বললে, এবার তুমি রাজা হবে।

ম্যাকবেথ অবাক হয়ে বললে, আমি রাজা হব! কী করে তা সম্ভব? আমি তো সামান্য সেনাপতি। তাছাড়া মহামান্য, মহাপ্রাণ রাজা ডানকানের নিজেরই তো ছেলে আছে।

ডাইনিরা তাকে মন্ত্রণা দিল, একটু বুদ্ধি খরচ করে চেষ্টা করলেই হবে। বলেই ডাইনিরা অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাহেব বলে উঠল, আর মনে করে দেখো তখনই ব্যাংকো বন্ধুকে পরামর্শ দিয়েছিল—সাবধান! ডাইনিদের কথায় ভুলো না বন্ধু।

কিন্তু ততক্ষণে ম্যাকবেথের মনে রাজা হবার লোভ জেগে উঠেছে।

জুলি বলল, রাজা ডানকান ম্যাকবেথের ওপর খুশি হয়ে তাঁকে অন্য একটি জায়গায়—আহা কী যেন নাম—

সাহেব বলল, কডর!

হ্যাঁ, কডরের অধিপতি করে দিলেন। আর সেই অকৃতজ্ঞ লোকটা গোটা স্কটল্যান্ডের রাজা হবার লোভে শেষ পর্যন্ত নিজের হাতে খুন করল রাজা ডানকানকে।

তারপর—তারপর বলো। উত্তেজিত হয়ে উঠল সাহেব।—তারপর কী করল শয়তানটা? যেহেতু ব্যাংকো বলেছিল, বন্ধু, ডাইনিদের কথা শুনো না, সেই কারণে ম্যাকবেথ ভাবল ব্যাংকো বুঝি তার সৌভাগ্যে হিংসে করছে, তাই একদিন রাতে, বন্ধুকে নেমস্তন্ন করে ডেকে মাঝপথে লোক লাগিয়ে খুন করে দিলে।—বলতে বলতে সাহেব পাগলের মতো চৈচিয়ে উঠল, এই অপরাধের কি কোনো ক্ষমা আছে?

জুলি বলল, সে তো জনসাধারণের হাতে ক্ষমা পায়নি। সেও তো খুন হলো।

সাহেব বলল, খুন হয়ে সে কি মনে করেছে পাঁচশো বছর ধরে দিব্যি নিশ্চিন্তে কবরের মধ্যে ঘুমোবে? না, তা হতে দেব না।

সাহেবের এ কথায় সকলেই অবাক হয়ে গেল। এ তো বদ্ধ পাগলের মতো কথা! যে মৃত—কবরের মধ্যে যার হাড়গুলো পর্যন্ত ধুলো হয়ে গেছে, তার ওপর আজ কী প্রতিশোধ নেবে? কেনই বা অতি তুচ্ছ অতি সাধারণ স্কটল্যান্ডবাসী একটা আধপাগলা সাহেব প্রতিশোধ নিতে যাবে?

সে কথাটাও সাহেব ধীরে ধীরে পরিস্কার করে দিল।

একবার উঠে নিজের ঘরে গেল। তারপর সেই মস্ত পৌঁটলা থেকে বের করে আনল পেতলের একটা ছোট্ট ক্যাশবাক্স।

জুলি দেখল ক্যাশবাক্সটার দু' হ্যান্ডলে মোটা সুতো বাঁধা। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, এরকম সুতো বাঁধা কেন?

সাহেব গম্ভীরভাবে বলল, আমার পৌঁটলার গায়ে এটা সেফটিপিন দিয়ে লাগানো থাকে। বলা তো যায় না কখন কে এটা তুলে নেয়।

কী অমূল্য রত্ন আছে এর মধ্যে? ঠাট্টা করে বলল জুলি।

সেটা দেখাবার জন্যেই তো নিয়ে এলাম। বলে খুব যত্ন করে ক্যাশবাক্সের ডালাটা খুলে তার মধ্যে থেকে একটা শক্ত কাগজের খাম বের করল। তার মধ্যে থেকে বেরুল ঠিকুজি কুষ্টির মতো পাকানো একটা কাগজ। সাহেব গম্ভীর গলায় বলল, আজ পর্যন্ত বাইরের কাউকে আমার সত্যিকার পরিচয় দিইনি। আজ তোমাদের কাছে তাই দেব।

এই পর্যন্ত বলে সাহেব কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, আমি হচ্ছি গ্রেট ব্যাংকোর একমাত্র বংশধর।

এই বলেই সে পাকানো কাগজটা সবার সামনে খুলে দেখাল।

এমন একটা অদ্ভুত কথা শোনার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না। সবাই ঝুঁকে পড়ল কাগজটার ওপর। খুব ছোটো ছোটো জড়ানো অক্ষরে অনেকগুলো নামের তালিকা। পড়ার সাধ্য কারো নেই। সাহেব গর্বভরে বললে, এরা সব আমার পূর্বপুরুষ।

জুলি কিছুমাত্র ইতস্তত না করে বলল, তুমি কী বলতে চাইছ আমি তো তার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারলাম না।

সাহেব বললে, না বুঝতে পারার কারণ কী? আমি যে মহামান্য বীর ব্যাংকোর বংশধর তার প্রমাণ তো দেখালাম।

জুলি বলল, কিন্তু সাহেবদাদা, ব্যাংকো বলে সত্যিই কি কেউ ছিল? কবির ঐরকম কত চরিত্র কল্পনায় সৃষ্টি করে থাকেন।

কখনোই না। পোয়েটসরা যা কিছুই সৃষ্টি করে তার অনেকখানিই সত্য। শেক্সপীয়রের অন্য নাটকগুলোর মধ্যে রিচার্ড দ্য সেকেন্ড, জুলিয়াস সিজার, কিং লিয়ার, কিং জন কি সত্যি সত্যি ছিলেন না।? কাজেই প্লিজ বাজে তর্ক কোরো না। আমি যে ব্যাংকোর বংশধর তা বিশ্বাস করতে চাও কোরো, না হলে কোরো না। তাতে আমার কিছু আসে যায় না।। বলে রাগে গৌজ হয়ে বসে রইল।

সুধীনবাবু বললেন, বেশ, আমরা মানলাম তুমি সেই ব্যাংকোরই বংশধর। কিন্তু তুমি যে বললে, এতকাল পর ম্যাকবেথের ওপর প্রতিশোধ নেবে, কী করে তা সম্ভব?

অভিজিৎ এতক্ষণ মুখ টিপে হাসতে হাসতে সাহেবের পাগলামির কথা শুনছিল। এবার বলল, তুমি কি মনে কর সাহেব, ম্যাকবেথের মৃতদেহ স্কটল্যান্ডে সমাধি না দিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে আসামে সমাধি দিতে এসেছিল?

ও নো নো মাই ডিয়ার—আমি ম্যাকবেথের ডেডবডির কথা তো বলিনি।

তাহলে ঐ বাড়িতে কী আছে? কি জন্যে ওখানে যেতে চাইছ? কোনো গুপ্তধন?

আই হেট মানি। ধন-দৌলতকে আমি ঘৃণা করি। দেখবে আমার কত টাকা? বলে সাহেব তার লম্বা কোটের—যে কোটটা সে কখনও ছাড়ে না—পকেটে হাত ঢোকাচ্ছিল, অভিজিৎ বলল, থাক। দেখাবার দরকার নেই। আমরা জানি তোমার অনেক টাকা। তুমি শুধু বলো ঐ বাড়িতে কী আছে।

সাহেব এদিক থেকে ওদিক বার দুই মাথা নেড়ে বলল, সে কথা আমি কিছুতেই বলব না। এইটুকু শুধু বলতে পারি, ঐ বাড়ির মধ্যে সুরক্ষিত ভাবে যে জিনিসটি আছে তার খোঁজে পাঁচশো বছর ধরে কত দেশের কত মানুষ পাগলের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। কেউ তার ট্রেস পায়নি। পেয়েছি শুধু আমি। এই—এই দ্যাখো সেইসব পুরনো পুঁথি—বই।

সবাই ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু সেই দুর্বোধ্য লাতিন ভাষা কেউ বুঝতে পারল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কেউ কথা বলছে না। জুলি আর অভিজিৎ লুকিয়ে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে হাসছে। আর সাহেব একটা পায়ের ওপর অন্য পা-টা তুলে হাতের ওপর থুতনি রেখে কী যেন ভাবছে।

এবার তাহলে কি করবে? জিজ্ঞেস করলেন সুধীনবাবু।

সাহেব মনে মনে বোধহয় সেই রহস্যময় বাড়িতে চলে গিয়েছিল। চমক ভাঙল। বললে, অ্যাঁ, কি করব? কালই এখান থেকে স্টার্ট করব।

একটু থেমে বলল—এখানে তোমাদের ভালো ব্যবহারের কথা কোনোদিন ভুলব না। আমি স্কচ। যে উপকার করে সে যে দেশের মানুষই হোক তার ওপর কৃতজ্ঞ থাকাই আমাদের ধর্ম। তোমরা প্রত্যেকেই ভেরি গুড। তবে—

তবে কি? জুলি জিজ্ঞেস করল।

শুনলে তোমরা দুঃখ পাবে, আমার ঘরের সামনেই যে লোকটি ছিল সে মোটেই ভালো লোক নয়। আমার সম্বন্ধে তার বড্ড বেশি কৌতূহল ছিল। জানই তো বেশি কৌতূহল আমি মোটেই পছন্দ করি না। এই পর্যন্ত বলে সাহেব হঠাৎ থেমে গেল। বলল, ভাবছি কাল সকালেই আমি যাব।

অভিজিৎ হঠাৎ নরম গলায় বলল, সাহেব, একটা রিকোয়েস্ট করব। রাখবে?

সাহেব কথা না বলে অভিজিৎ-এর দিকে তাকাল।

তুমি যদি আমাকে সঙ্গে নাও তাহলে আমি বড়োই খুশি হই। আর সেই সঙ্গে—

কথা শেষ করতে না দিয়েই সাহেব রেগে উঠে বলল, n—o! আমি কাউকে সঙ্গে নেব না।

অভিজিৎ রাগল না। বলল, সঙ্গে নিতে আপত্তি কী? আমি তো ঐ বাড়িটার ধারে কাছে যাব না। শুধু তোমার সঙ্গে গিয়ে অসমটা দেখা নেওয়া আর কি?

সঙ্গে সঙ্গে জুলি বলে উঠল, হ্যাঁ সাহেব, প্লিজ আপত্তি কোরো না। আমিও তাহলে দাদার সঙ্গে যাব।

সাহেব গম্ভীর গলায় বলল, তোমরা ছেলেমানুষি করছ। যে জায়গার খোঁজে আমি একা একা কত বছর ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি, আজ আমি সঙ্গে করে কাউকে নিয়ে যেতে পারি ভাবলে কী করে? সে গোপন জায়গার খোঁজ আমি কাউকে দেব না। এমনকি ওখানে পৌঁছে যদি তোমাদের সেই ফ্যামিলি ফ্রেন্ডকেও দেখতে পাই তাহলে তাকেও তখুনি মরতে হবে। হ্যাঁ, আমার হাতেই মরতে হবে। আমার ক্ষমতা কতখানি তা জান না। আমার পথে বাধা দিতে এসেছিল তিনজন। তিনজনকেই আমি এইভাবে গলা টিপে শেষ করে দিয়েছি। বলে দু'হাত তুলে মোটামোটা আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিল।

জুলির মা আঁৎকে উঠলেন।

জুলি বলল, আমরা তোমায় কথা দিচ্ছি যদি ঐ বাড়ি তুমি খুঁজে পাও তাহলে তার ত্রিসীমানাতেই আমরা যাব না। কারণ ঐ বাড়িতে কী আছে আমরা জানি না, জানবার কৌতূহলও নেই।

জুলির কথায় সাহেব একটু নরম হলো। বলল, তাহলে সেই ভয়ংকর জঙ্গলে তোমরা যেতে চাইছ কেন?

অভিজিৎ বলল, শুধু জায়গাটা দেখবো।

জুলি বলল, দেখ সাহেব, তুমি অনেক জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত ঘুরেছ। তোমার সঙ্গে আমরা যদি ক'দিন থাকতে পারি তাহলে তোমার কাছ থেকে কত গল্প শুনতে পাব। সেটাই আমাদের লাভ। তাছাড়া—জুলি একটু থামল।

সাহেব তাকাল।

তাছাড়া এই দু'দিনেই তুমিও আমাদের ফ্যামিলির একজন হয়ে গেছ। তোমার সঙ্গে গেলে আমাদের এতটুকু ভয় করবে না।

সাহেব অনেকক্ষণ চুপ করে কী ভাবল। তারপর বলল, বেশ, নিয়ে যাব। কিন্তু কতকগুলো কডিশান আছে।

কী শর্ত বলো।

সাহেব বলতে লাগল, প্রথমত সেখানে আমি যেখানে থাকব সেখানে তোমরা থাকবে না।

বেশ রাজি।

দ্বিতীয়ত আমার কাজে কোনো কৌতূহল দেখাবে না। আমি কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি সেদিকে তাকাবে না। সেখানে তোমরা অসুখে পড়লে বা বিপদে পড়লেও আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াব না।

ঠিক আছে। ওখানে আমরা ইনডিপেন্ডেন্টলি নিজের নিজের মতো থাকব।

থার্ডলি, তোমরা নিজেরা ইচ্ছে মতো ফিরে আসবে। আমি কবে ফিরব, না ফিরব, কোনদিক দিয়ে ফিরব সে আমার ব্যাপার।



অভিজিৎ বলল, হ্যাঁ অবশ্যই।

ফোর্থলি, আমি আবার বলছি, যদি দেখি তোমরা আমায় ফলো করছ তাহলে তার পরিণতির জন্যে তোমরা দায়ী থাকবে।

হ্যাঁ। রাজি।

ফিফথলি, খরচ সব তোমাদের। তোমাদের জন্যে আমি একটা রূপিও খরচ করব না।

জুলি আর অভিজিৎ দুজনেই হেসে উঠল। বলল, ওর জন্যে ভেবো না সাহেব। আমরা বেগার (begger) নই।

খুব বিরক্ত হয়েই সাহেব ওদের নিয়ে অসমের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। ওরা চলে গেল আর পরের দিনই কলকাতা থেকে এল গুরুদেবের ছেলের চিঠি। লিখেছে, প্রথমেই জানাই কয়েক দিনের জন্যে কলকাতায় এসেছি। তারপর বাংলাদেশে চলে যাব। পরে জানাই— ঐ ভাবে হঠাৎ চলে আসায় আপনারা নিশ্চয় অবাক হয়েছেন। আমার অভদ্রতাও হয়েছে স্বীকার করি। কিন্তু কেন ঐভাবে চলে আসতে হলো সে কথা সেদিন বলতে ভরসা পাইনি— বিশেষ করে আপনার মেয়ের সামনে! আপনার মেয়ে আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না, অপমান করে। আমার অপরাধ কী, না আমি বলেছিলাম আপনাদের বাড়িতে প্রেতাশ্বার যাওয়া-আসা আছে। সেই কারণে আপনাদেরই মঙ্গলের জন্যে যজ্ঞ-শাস্তি করতে চেয়েছিলাম। আপনারা আমার কথা তো বিশ্বাস করেনইনি, উল্টে আপনার মেয়ে আমাকে যথেষ্ট অপমান করে। সেইজন্যেই কী কারণে চলে আসতে হলো বলতে চাইনি। আজ বলছি।

ঐ সাহেবটি আসার পর থেকেই ওর ওপর আমার সন্দেহ হয়। লোকটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। আমার সামনাসামনি ঘর। তাই লক্ষ্য রাখতে লাগলাম। এই গরমেও দু'দিনের মধ্যে ওকে স্নান করতে দেখিনি। প্যান্ট-জামা ছাড়তে দেখিনি, কোনোদিন রান্না করতে দেখিনি। শুনেছিলাম ও নাকি বাইরে থেকে খেয়ে আসে। বাইরে থেকে খেয়ে আসে কেন? আপনাদের বাড়িতে তো আদর-যত্নের ত্রুটি নেই। আমি তো আপনাদের কাছে বেশ কয়েকদিন থেকে সেই কথাটাই বুঝে গেলাম। তবে কেন সাহেব খেতে চাইত না?

সেদিন রাত তখন এগারোটা হবে। সাহেবের ঘরে খুটখাট শব্দ হচ্ছিল। ভাবলাম এত রাতে সাহেব কী করছে দেখি তো? উঁকি মেরে দেখলাম সাহেবের ঘরের দরজা ঠেসানো। অন্যদিন ঘরে ঢুকেই খিল দিয়ে দেয়। আজ বোধহয় খিল দিতে ভুলে গেছে। খুব কৌতূহল হলো। পা টিপে টিপে ওর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দরজাটা সাবধানে ফাঁক করলাম। অমনি যে দৃশ্য আমার চোখে পড়ল তা দেখে আঁতকে উঠলাম। দেখলাম সাহেব দু'হাতে করে বড়ো বড়ো কাঁচা মাংসের টুকরো খাচ্ছে। মাংসের রক্ত ওর দু'কষ বেয়ে গড়াচ্ছে। আর ঠিক তখনই সাহেব আমাকে দেখে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ও সেই রক্তমাখা হাত তুলে মোটা মোটা আঙুলগুলো ফাঁক করে আমার গলা টিপে ধরতে এগিয়ে এল। আমি ভয়ে 'বাপরে' বলে চিৎকার করে ছুটে ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে দিলাম।

এই হলো ব্যাপার। আমি নিশ্চিত ও মানুষ নয়— রাক্ষস কিংবা দানব কিংবা পিশাচ। আপনাদের আবার সাবধান করে দিলাম। যত শীঘ্র পারেন ওকে তাড়ান। নইলে পুলিশে দিন। নতুবা বিপদে পড়বেন...

চিঠি পড়ে সুধীনবাবু অবাক। জুলির মাও পড়লেন। এ কী সম্ভব? লোকটা একটু পাগলাটে আছে ঠিকই কিন্তু ঠাকুরমশাই যা বলছেন তা সত্যি হলে তো মারাত্মক ব্যাপার। আর এই

লোকের সঙ্গে ওঁর ছেলেমেয়ে দুটো অজানা অচেনা জায়গায় গেল! কোনো ঠিকানা পর্যন্ত নেই! এখন তো ওদের সাবধান করে দেবারও উপায় নেই। তাহলে? গভীর দৃষ্টিস্থায় পড়লেন সুধীনবাবু আর তাঁর স্ত্রী।

### ম্যাকবেথের তরোয়াল

গভীর বন আর পাহাড়ে ঘেরা অসমের এই অঞ্চলটা। চারিদিকে যেন সবুজের মেলা। অসমের একটি জেলা এই উত্তর কাছাড়। পার্বত্য জেলাটির সদর শহর হাফলং। সামনে হেমপেট্রিপেট পাহাড়। দক্ষিণ প্রান্তে বরাইল পর্বতশ্রেণী। মাঠে মাঠে কমলা, আনারস, আর পানের চাষ।

একশো বছরেরও আগে এইসব জনবসতিহীন দুর্ভেদ্য জঙ্গলে বড়ো বড়ো মশা, জোঁক, বিষধর সাপ, হিংস্র দাঁতাল শুয়োর, চিতা আর বুনো হাতির পালের সঙ্গে লড়াই করে জীবনের বড়ো রকমের ঝুঁকি নিয়ে কিছু সাহেব সুদূর ইংলন্ড থেকে এখানে এসেছিল চা-বাগান করতে। তাদের সে প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। অসমের চা-বাগানের চা-এর নাম আজ ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে।

ট্রেন, বাস, কখনও দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বিযাক্ত সাপ আর রক্তচোষা জোঁকের হাত থেকে বাঁচতে বাঁচতে ওরা এক জায়গায় এসে দাঁড়াল। জায়গাটার নাম বোধ হয় দামছাড়া। দুর্গম জঙ্গলে ঢাকা এই দামছাড়া গ্রাম।

সারা পথে সাহেব দূরে দূরে ছিল। ট্রেনে ছিল অন্য কমপার্টমেন্টে। একটি কথাও বলেনি। অস্বাভাবিক গভীর হয়ে ছিল। এমন ভাব যেন এদের চেনেই না। তার জন্যে জুলিরা কিছু মনে করেনি। তারা ছিল নতুন জায়গা দেখার আনন্দে বিভোর হয়ে।

এইবার তারা তিনজনে এসে দাঁড়াল একটা ছোটো টিলার ওপরে।

এতক্ষণে সাহেব কাঁধ থেকে পোঁটলাটা নামিয়ে রেখে কথা বলল।

এখান থেকেই আমরা আলাদা হয়ে যাব।

কিন্তু আমরা থাকব কোথায়?

সাহেব বলল, সেটা তোমরাই ঠিক করবে। তোমরা কোথায় থাকবে তার ব্যবস্থা করা আমার কথা নয়। তবু আমি তোমাদের হেলপ করছি—সোজা চলে যাও কিছু দূর। আমি শিলচরে নেমে জেনে নিয়েছি, বেশ কিছু দূরে লারসিংগার চা-বাগান। সেখানে একটা বাংলা আছে। সেখানেই থাকার ব্যবস্থা করে নাও।

আর তুমি?

সাহেব মুখ কঠিন করে বলল, শর্ত মেনে চলো, নইলে আমার হাতেই বিপদে পড়বে। অভিজিৎ বলল, সরি সাহেব। তুমি যেখানে খুশি যাও। আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করব না।

সাহেব তখনই টিলা থেকে নেমে চলে যাচ্ছিল, জুলি ব্যস্ত হয়ে ডাকল, সাহেব!

সাহেব ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল।

তোমার পোঁটলাটা ফেলে যাচ্ছ।

ওটার আর দরকার নেই।

জুলি অবাক হয়ে বলল, সে কী! এতেই যে তোমার সব আছে।

সাহেব এবার পায়ে পায়ে এগিয়ে এল এদের কাছে। বলল, হ্যাঁ, এতে আমার অনেক

কিছু আছে। কিন্তু তার আর দরকার নেই। আমি ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছি। শুধু সেই বাড়িটা খুঁজে বার করা বাকি। সে বাড়িতে ঢুকতে গেলে কোনো বাড়তি বোঝা নিয়ে ঢোকা যাবে না।

সাহেবের সব কথাই বরাবর অঙ্কুত। এ কথাটা শুনেও তারা অবাক হয়ে গেল।

সাহেব তার বড়ো হলদে বিশ্রী দাঁতগুলো বের করল। বোধহয় হাসবার চেষ্টা করল। তোমরা কিছু জানতে চেয়েছিলে, তা আগে বলিনি। এখন বলতে পারি। কারণ এই মুহূর্তে নির্জন এই টিলার চারিদিকে জনমানবের চিহ্ন নেই। তোমাদের সঙ্গে আমার আর দেখাও হবে না। কলকাতায় ফিরে তোমরা যদি গোপন জিনিসটির কথা ফাঁস করেও দাও তাহলেও আমার ক্ষতি নেই। ততক্ষণে সেই মহামূল্য জিনিসটি আমার মুঠোয় চলে আসবে।

কী সেই মহামূল্য জিনিসটি বলবে কি? জিজ্ঞেস করল অভিজিৎ।

শয়তান ম্যাকবেথের মস্তপুত তরোয়াল।

ম্যাকবেথের তরোয়াল! সে তো কবেরকার কাহিনি। যদি ম্যাকবেথ নামে সত্যিই কেউ থেকেও থাকে তাহলে তার তরোয়াল এতদিন পর—

হ্যাঁ, সম্ভব। ভুলে যেও না এটা ছিল ডাইনিদের মস্তপুত তরোয়াল। ঐ তরোয়াল যার মুঠোয় থাকবে, পৃথিবীতে কোনো শক্তি তাকে মারতে পারবে না। সে তরোয়াল কোনোদিনই নষ্ট হবে না।

জুলি জিজ্ঞেস করল, তাহলে জনতার হাতে ম্যাকবেথ মরল কি করে?

সাহেব বলল, তার আগে তার তরোয়ালটা চুরি করে অন্য তরোয়াল রাখা হয়েছিল। নিরুপায় শয়তানটা নিজের তরোয়াল না পেয়ে বাধ্য হয়ে অন্য তরোয়াল নিয়ে লড়াই করেছিল। তাই তাকে খুব সহজেই মরতে হয়েছিল।

জুলি অবাক হয়ে বললে, আমি খুব ভালো করে শেক্সপীয়র পড়েছি। এসব তো লেখা নেই।

কোনো বইয়েতেই লেখা নেই। আছে শুধু আমার কাছে পুরনো পুঁথিতে। নইলে অকারণে জীবনের সুখ, ঐশ্বর্য, আনন্দ ছেড়ে সেই স্কটল্যান্ড থেকে অসমের এই জঙ্গলে ছুটে আসি?

তুমি কি বলতে চাইছ ম্যাকবেথের সেই তরোয়াল ঐ রহস্যময় বাড়িতেই আছে?

হ্যাঁ, আমার পুঁথি তাই বলছে। আর পুরনো দুষ্প্রাপ্য পুঁথি মিথ্যে বলে না।

জুলি বলল, কিন্তু ম্যাকবেথকে মাটি দেওয়া হলো তার দেশে আর তার তরোয়াল পড়ে রইল অসমে। এ তো অবাক কাণ্ড।

সাহেব বলল, অবাক হবার কিছু নেই। ম্যাকবেথের তরোয়াল আগেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তারপর তা একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে হাতে ঘোরে। সে তরোয়াল যোগ্য লোক ছাড়া যার হাতেই যায় তার সর্বনাশ হয়। শেষ পর্যন্ত তোমাদের এই ভারতবর্ষের কোনো সাধুই একজন পাদ্রীকে বলে দেয়, এই তরোয়ালের হাত থেকে বাঁচতে হলে কোথাও গোপনে লুকিয়ে রাখো।

অভিজিৎ বলল, কেন, তরোয়ালটা ভেঙে ফেলে দিলেই হতো?

সাহেব বলল, ও তরোয়াল ভাঙা যায় না, আগুনে পোড়ে না, সমুদ্রে ডোবে না। তাই পাদ্রীর নির্দেশে এটাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। আর ম্যাকবেথের প্রেতাঙ্গা তার প্রিয় তরোয়ালটিকে আগলে রাখার জন্যে সেই বাড়িতেই আজও রয়েছে। বহুকাল পর আমি আর একবার সেই শয়তানটার মুখোমুখি হতে চাই।

জুলি বলল, তরোয়ালটা যে রাখবে তারই যদি সর্বনাশ হয় তাহলে কোন সাহসে সেটা নিতে চাইছ? ম্যাকবেথের প্রেতাশ্রাও কি সহজে তোমায় নিতে দেবে?

দেবে না তা জানি। তবু ম্যাকবেথের সঙ্গে আমাকে শেষ লড়াই করতেই হবে। দেখব আজ সে কি করে আমায় খতম করে। পথের মাঝে অন্ধকারে একলা পেয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করা এক কথা আর মুখোমুখি লড়াই করা অন্য কথা।

এ কথা শুনে জুলি চমকে উঠল। বলে কী লোকটা? অন্ধকারে একলা পেয়ে লোক লাগিয়ে কাকে খুন করিয়েছিল ম্যাকবেথ? সে তো আর এক মহাযোদ্ধা রাজা ডানকানের সেনাপতি, ম্যাকবেথেরই একান্ত বন্ধু ব্যাংকোকে!

মুখে বলল, তুমি কার কথা বলছ সাহেব? বইয়েতে পড়েছি ম্যাকবেথ তো ঐভাবে মেরেছিল তারই বন্ধু ব্যাংকোকে?

হ্যাঁ, সেই ব্যাংকোকেই আজ প্রতিশোধ নেবার জন্যে এতদূর ছুটে আসতে হয়েছে মানুষের রূপ ধরে। যদি ম্যাকবেথের দেখা পাওয়া যায় ভালো। লড়াই হবে। যদি দেখা না হয় তার তরোয়ালটা নিয়ে আসব। এইভাবেই প্রতিশোধ—

বলতে বলতে হঠাৎ সাহেবের সর্বাঙ্গ খরখর করে কেঁপে উঠল। তারপর সে যেন কেমন অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে গেল। তারপর টিলা থেকে নেমে সামনের গভীর জঙ্গলে মিশে গেল।

স্তুভিত জুলি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, কী দেখলাম রে দাদা? স্বচক্ষেই তো দেখলাম।

অভিজিৎ বললে, এখানে আর এক মুহূর্ত নয়। সন্ধে হয়ে আসছে। তার আগেই বাংলাটা খুঁজে বার করতে হবে।

## রহস্যপুরী

ব্যাপারটা তাহলে কী হলো? বাংলোর একটা ঘরে বসে জিপ্সেস করল জুলি।

ঠিক বুঝতে পারলাম না। কেমন ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল অভিজিৎ।

এই কদিন যে সাহেবটার সঙ্গে এত মিশলাম, এত কথা বললাম, সে তাহলে মানুষই নয়?

অভিজিৎ বলল, তাই তো দেখলাম। কিন্তু এও কি বিশ্বাস করতে হবে? বিশ্বাস করতে হবে একটা জলজ্যান্ত ভূতের সঙ্গে গোয়ালপাড়ায় বাস করেছি? তারই সঙ্গে অজানা অচেনা অসমের এই জঙ্গলে বেড়াতে এসেছি?

শুধু ভূতই নয় দাদা, বলে গেল সে নাকি নিজেই ব্যাংকো! অথচ এর আগে আমাদের বুঝিয়েছে সে ব্যাংকোর বংশধর!

যাই হোক এই অসম্ভব ঘটনা জীবনে কোনোদিন ভুলব না।

আসল অসমের চায়ের লিকার থেকে চমৎকার গন্ধ বেরোচ্ছিল। পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে অভিজিৎ বলল, আর এখানে থেকে কী লাভ? চল কালই আমরা বাড়ি ফিরে যাই।

জুলি বলল, বাঃরে! এত খরচ করে এখানে এলাম। কিছু না দেখেই ফিরে যাব? এখানে আসার উৎসাহ তোরই তো বেশি ছিল।

তা ছিল। কিন্তু সাহেবের ঘটনা দেখার পরই মনটা কিরকম হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে এখানে আর না থাকাই ভালো।

দাদা, তুই একজন ইয়ং সাংবাদিক! খবর খোঁজার জন্যে কোথায় না যেতে হয় তোকে, অ্যাডভেঞ্চার করতে ভালোবাসিস—তুই কিনা ভয় পেয়ে কালই ফিরে যেতে চাইছিস? আমিও তো তোর পাশে দাঁড়িয়ে ঐ দৃশ্য দেখলাম। কই আমার তো ভয় করছে না? আমি ঠিক করে ফেলেছি, টাকা-পয়সা খরচ করে যখন এতদূর এসেছি, দু'দিন ঘুরে বেড়িয়ে তবে ফিরব। চা-টা কী ফার্স্টক্লাস—দাঁড়া বাবুর্চি রাতে কী খাওয়াবে খোঁজ নিয়ে আসি।

বাংলোটো এমনিতে ভালোই। তবে বড্ড নিরিবিলা। বাংলোর মাঝখান দিয়ে চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলার বারান্দা পর্যন্ত। বারান্দার একপাশ ঘেঁষে সার সার রুম। বেশির ভাগ ঘরই ফাঁকা। নিচে ছোটো ঘরে থাকে বয়-বাবুর্চি-কেয়ারটেকাররা। বাড়ির তিন দিকে গা-হুমহুম করা ঘন জঙ্গল। দূরে পাহাড়ের হাতছানি।

এত অল্প লোক কেন জিজ্ঞেস করায় বুড়ো কেয়ারটেকার বলল, এখন তো অফ সিজন্। অগস্ট থেকে অক্টোবর মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা আর দুর্যোগের সময়। যখন জাটিঙ্গা উপত্যকায় গভীর রাতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এসে আঙুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে সেই রহস্যময় দৃশ্য দেখার জন্য কিছু টুরিস্ট আসে এখানে।

জুলি কলকাতায় আমার বাড়িতে জাটিঙ্গার পাখিদের দলে দলে আঙুনে ঝাঁপ দিয়ে মরার রহস্যজনক কাহিনি শুনেছিল। কিন্তু এটা তার কাছে নতুন কিছু বলে মনে হয়নি। আমাদের দেশেও কার্তিক মাসে দেওয়ালি পোকারা আলো দেখলেই কোথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে ঝাঁপ দিয়ে মরে। সেও তো এক রহস্য!

তবু জায়গাটা একবার দেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সে তো অক্টোবর মাসের ব্যাপার।

বুড়ো কেয়ারটেকারের সঙ্গে জুলি খুব তাড়াতাড়ি ভাব জমিয়ে ফেলল। কোথায় কী দেখবার আছে তাও জেনে নিল। কেয়ারটেকার সবশেষে বলল, বেশি জঙ্গলে আর্মস ছাড়া না যাওয়াই ভালো।

রাত নটার মধ্যে গরম গরম মাংস ভাত খেয়ে ওরা শুয়ে পড়ল। পাশাপাশি দুটো সিঙ্গেল সিটেড রুম ওরা পেয়ে গেছে। দুজনেই খুব খুশি। বেশ যে যার মতো থাকতে পারবে।

রাত দশটা বাজল। চারিদিক স্তব্ধ নিব্বম। জুলি রাতের পোশাক পরে আলো নিভিয়ে মশারির মধ্যে ঢুকে গেল। মাথার কাছে রাখল টর্চটা। কি মনে হলো আবার উঠল। তারপর অ্যাটাচড বাথরুমটা ভালো করে দেখে নিয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

দাদা, ঘুমিয়ে পড়েছিস নাকি? শুয়ে শুয়েই জুলি জিজ্ঞেস করল।

পাশের ঘর থেকে অভিজিৎ উত্তর দিলো, না। নতুন জায়গা। ঘুম আসছে না।

বাথরুমটা ভালো করে দেখেছিস?

হ্যাঁ। টর্চটা হাতের কাছে রাখিস।

একেবারে বালিশের পাশে রেখেছি। তুই ভোরবেলা বেরোবি নাকি?

অভিজিৎ বলল, পাগল! ভোরবেলাতেই তো আসল ঘুম। বলতে বলতে সে যে হাই তুলল সে শব্দটুকুও শোনা গেল।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জুলি টের পায়নি। হঠাৎ একসময়ে ঘুমটা ভেঙে গেল। টর্চ জ্বলে ঘড়িটা দেখল। রাত দুটো। এরকম মাঝরাতে তার ঘুম ভাঙে না বড়ো একটা। ভেঙেছিল ক'মাস আগে বাড়িতে তিনবার কলিংবেলের শব্দে। বেশ কিছুদিন পরে, চঞ্চলের কথা মনে পড়ল যে প্ল্যানচেটে সাবধান করে দিয়েছিল। কোথায় গেল ছেলোটো? সে কি সত্যিই অসমে এসেছিল?

হঠাৎ জুলি চমকে উঠল, কিসের শব্দ?

জুলি কান পেতে রইল। কে যেন খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে! কয়েক মুহূর্তে শব্দটা কাছে এসে পড়ল, একেবারে বাংলাটার কাছে। তারপর শব্দটা এগিয়ে গেল গভীর জঙ্গলের দিকে। ক্রমে মিলিয়ে গেল। অবাক হলো জুলি। এত রাতে ঘোড়ায় চড়ে কে ঘুরে বেড়াচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে?

শব্দটা আর শোনা গেল না। জুলি আবার ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে চা খেতে খেতে অভিজিৎকে জিঞ্জেস করল, কাল রাতে কোনো শব্দ শুনেছিলি?

অভিজিৎ জেলি মাখানো টোস্টে কামড় দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বলল, নাঃ। এক ঘুমে রাত কাবার।

তবে কি তারই শোনার ভুল?

পরে দুপুরবেলা কেয়ারটেকারকে জিঞ্জেস করল, কাল রাতে ঘোড়ায় চড়ে এদিকে কে এসেছিল? কেয়ারটেকার তখনই তার উত্তর দিলো না। কয়েক মুহূর্ত জুলির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর শুধু বলল, ও কিছু না।

উত্তরটা শুনে জুলি খুশি হলো না। যেন সত্যিই কেউ এসেছিল। কিন্তু সে কথাটা চেপে গেল।

পরের দিন দুপুরে জুলি অভিজিৎকে বলল, চল, একটু ঘুরে আসি।

অভিজিৎ আলিস্যি ভেঙে বলল, দূর! জঙ্গলের মধ্যে কোথায় ঘুরব? তার চেয়ে ঘুমুলে কাজ দেবে।

অভিজিৎ-এর কথায় জুলি অবাক হলো। এখানে এসে পর্যন্ত দাদার যেন কেমন পরিবর্তন হয়েছে। জায়গাটা তার যেন মোটেই ভালো লাগছে না। শেষে জুলি একাই বেরিয়ে পড়ল।

বেলা দেড়টা। জুলি প্রথমে বাংলোর পিছনের দিকে খানিকটা ঘুরল। তারপর জঙ্গলের পথ ধরল। এ এমন ঘন জঙ্গল যে রোদ পর্যন্ত ঢোকে না। তার লক্ষ্য মাটির দিকে। খুঁজছে ঘোড়ার খুরের ছাপ চোখে পড়ে কিনা। কিন্তু শুকনো পাতা আর কয়েকটা জৌক ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। সরু বনপথ ধরে এগিয়ে চলল জুলি। কোথায় যাচ্ছে তা নিজেও জানে না। তার মনে হতে লাগল একটা অদৃশ্য শক্তি তাকে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কেবলই মনে হতে লাগল আর একটু এগোন যাক। আর একটু—তাহলেই দেখতে পাবে ছবির সেই রহস্যময় বাড়িটাকে। আবার মনের জোরে জুলি এগোতে লাগল। হঠাৎ কোথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি এসে মাথার ওপর ভন ভন করে উড়তে লাগল। চোখে মুখে ঢুকতে লাগল। এ তো মহাজ্বালা!

অগত্যা ফিরতে হলো। কিন্তু এর মধ্যেই জঙ্গল অন্ধকার হয়ে এসেছে। রিস্টওয়াচটা দেখল। সবে বেলা তিনটে। এরই মধ্যে অন্ধকার হয়ে গেল! তা তো হবেই। একে জঙ্গলের পথ। তার ওপর সূর্য পাহাড়ের আড়ালে নেমে যাচ্ছে। জুলির ভয় করল। পথ চিনতে পারবে তো? তাড়াতাড়ি যেভাবে এসেছিল ঠিক সেই ভাবেই হাঁটতে লাগল।

বাংলায় পৌঁছল যখন তখন প্রায় সন্ধ্যা। দেখল দাদা বাংলোর সামনের রাস্তায় অধৈর্য হয়ে ঘুরছে। জুলিকে দেখতে পেয়ে ধমক দিয়ে বলল, কোথায় গিয়েছিলি একা একা?

সব বলছি. ওপরে চল।

চা খেতে খেতে অভিজিৎকে সব বলল। তারপর দুজনে গেল কেয়ারটেকারের ঘরে। যেতেই বৃদ্ধ বলল, কোথায় গিয়েছিলে দিদি? একা একা হাতে অস্ত্র না নিয়ে কখনও

জঙ্গলে যেও না। এখানে হিংস্র লেপার্ড আছে। তারা ডোরাকাটা বাঘের চেয়েও ভয়ংকর।

কিন্তু জুলি বাঘের কথা শুনতে চায় না। শুনতে চায় অন্য কিছু কথ—আরও ভয়ংকরের কথা। জানতে চায় কে তাকে আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল—কেন নিয়ে যাচ্ছিল?

এক সময়ে নিরিবিলিতে জুলি কেয়ারটেকারকে জিজ্ঞেস করল, আংকেল, শুনেছি এখানে কোথায় যেন একটা পুরনো বাড়ি আছে। সেখানে কেউ যেতে সাহস পায় না।

বৃদ্ধ আংকেল চমকে উঠে বলল, চুপ চুপ, ও বাড়ির নাম উচ্চারণ করো না।

কেন?

ওখানে ভয় আছে দিদি। কত বিদেশী কত কাল ধরে ও বাড়টাকে দেখবার জন্যে গিয়েছিল, তারপর তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

কি আছে ওখানে?

লোকে বলে কোনো খুনে সাহেব রাজার প্রেতাত্মা। সন্ধ্যাবেলা ও নাম করতে নেই।

একটু থেমে বলল, তুমি ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনেছ। তা মিথ্যে নয়। সেদিন বলিনি, আজ বলছি, ঐরকম শব্দ প্রায়ই শোনা যায়। লোকে বলে—সাহেব রাজা টহল দিয়ে বেড়ায়। তখন যদি কেউ চোখের সামনে পড়ে তাহলে পরের দিন তার লাশ পড়ে থাকে জঙ্গলের মধ্যে। যাও, তোমাদের ঘরে যাও। আর যত শিগগির পার দেশে ফিরে যাও। একটু থেমে বলল, তুমি কি আজ ঐদিকেই গিয়েছিলে নাকি?

জুলি বলল, বাড়িটা কোন দিকে তা তো জানি না। এমনি হাঁটছিলাম। মনে হচ্ছিল, কেউ যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

হ্যাঁ, সব্বোনাশের পথেই চলছিলে। খুব ভাগ্য আর এগোওনি। রাগ করো না দিদি আসলে তোমাদের বয়েস অল্প, মতিগতি ভালো নয়। বিপদে পড়তে পার।

মতিগতি সত্যিই ভালো নয় ওদের। নইলে বুড়ো আংকেলের কাছে সব শুনেও দুই ভাইবোনে পরের দিনই কেন বেরিয়ে পড়বে সেই রহস্যময় বাড়ির সন্ধান। অভিজিৎ প্রথমে রাজি হয়নি। জুলিই জোর করে ওকে রাজি করাল। বলল, তুই না যাস, আমি একাই যাব।

অগত্যা অভিজিৎকেও যেতে হলো।

আজ বেলা দশটার মধ্যে লাঞ্চ খেয়ে ভাইবোনে বেরিয়ে পড়েছে। বুড়ো আংকেলের কথায় বুঝেছে যে পথে গতকাল গিয়েছিল, সেই পথটাই ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে।

জঙ্গল—তবে এই জঙ্গল সুন্দরবনের জঙ্গল নয়। পাহাড়ি জঙ্গল। পদে পদে পাথরের ঠোঁকর। সূর্য ক্রমশ মাথার ওপরে উঠল। জঙ্গল যেখানে পাতলা, সেখানেই রোদের দেখা মেলে। নইলে অন্ধকার। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একসময়ে জুলির মনে হলো, সে যেন অন্য পথে এসে পড়েছে। কিন্তু এটাও বুঝল সে ইচ্ছে করে অন্য পথে চলে আসেনি। কেউ যেন নিজেকে লুকিয়ে রেখে আগে আগে চলেছে পথ দেখিয়ে। কে নিয়ে যাচ্ছে? কেন নিয়ে যাচ্ছে? কোথায়—কোন সর্বনাশের মুখে টেনে নিয়ে যাচ্ছে? যেই নিয়ে যাক সেই আকর্ষণ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনা যে কিছুতেই সম্ভব নয় ওরা তা ভালো করেই বুঝতে পারছে।

আর একটা আশ্চর্যের ব্যাপার—এরা কেউ কথা বলছে না। মুখ যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। শুধু লতাপাতা, বনঝোপ ঠেলে তারা হাঁটছে তো হাঁটছেই। একধরনের বুনো গন্ধ নাকে আসছে। কখনও কোনো ফুলের তিক্ত কষা গন্ধ।

চলতে চলতে তারা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল। যেন অন্ধকার থেকে আলোর দেশে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। রোদের রঙ বুঝিয়ে দিলো বেলা এখন দুপুর। একটু দূরেই দেখা গেল নুড়িবিছানো সরু জলস্রোতের ধারা। আর তার ডানদিকে হাতিছড়া, দলু ও দামছড়ার ঘন দুর্ভেদ্য জঙ্গল যেন গা-যেঁষাযেঁষি করে মাইলের পরে মাইল জুড়ে কালো পাঁচিলের মতো দাঁড়িয়ে। অরণ্যের সেই স্তব্ধ ভয়ংকর চেহারা দেখলে ভয় পায় না এমন মানুষ বোধহয় নেই।

ওরা গোড়ালিডোবা জল স্বচ্ছন্দে পেরিয়ে ওপারে চলে গেল। ঠিকানা জানা নেই, সঙ্গে ম্যাপ নেই তবু ওরা আন্দাজে নাক-বরাবর সোজা এগিয়ে চলল। আবার শুরু হলো বন। তবে এ বন ওপাশের বনগুলোর মতো তেমন গভীর নয়। এখানে ঢুকতেই আশ্চর্য, কেমন হিমেল বাতাস বইতে শুরু করল। বেশ শীত করতে লাগল।

বড্ড শীত করছে না? অভিজিৎ যেন নিজের মনেই কথা বলল।

হ্যাঁ, বোধহয় আমরা মূতের দেশে এসে পৌঁছলাম।

ঐ দিকটা তাকিয়ে দেখ।

জুলি দেখল বাঁ দিকে পাহাড়ের একটা খাঁজকাটা অংশ যেন খাঁড়ার মতো বুলছে। আর তার পিছনে ঘন কুয়াশা। অথচ এখানে কুয়াশার চিহ্নমাত্র নেই।—আর একটু জোরে হাঁট বোন। আমরা বোধহয় এসে পড়েছি।

জুলি বলল, আমার পা দুটো অবশ হয়ে যাচ্ছে।

তা হোক। এত দূর এসেছি যখন তখন শেষ না দেখে যাব না।

অভিজিৎ যেন হঠাৎ প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হয়ে উঠেছে। জুলিও জোরে হাঁটবার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল।

খাঁড়ার মতো পাহাড়টাকে বাঁ দিকে রেখে মোড় বেঁকতেই ঘন কুয়াশার মধ্যে দেখা গেল অনেকখানি পাঁচিল ঘেরা জায়গা। নামেই পাঁচিল। আসলে জীর্ণ ভাঙা কতগুলো ইট পরপর সাজানো।

ওরা পাঁচিলের কাছে আসতেই দেখল অনেকগুলো দীর্ঘ সুপুরিগাছ—আর তারই আড়ালে দোতলা একটা বাড়ি—যে বাড়িটার ছাদ দু’দিকে এমনই ঢালু যেন মনে হয় কাছিমের পিঠ।

জুলির হাত এমনই কাঁপতে শুরু করল যে যতক্ষণ না অভিজিৎ তার হাতটা নিজের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরল ততক্ষণ কাঁপুনি থামল না।

অভিজিৎ বলল, আমরা তাহলে সেই ছবির বাড়িটা খুঁজে পেলাম। ঐ দেখ—

জুলি দেখল বাড়ির গায়ে সেই একটা বিকট মুখ বসানো। মুখটার মাথার দু’পাশে শিং। ভয়ংকর দুটো চোখ—যে দিক দিয়েই দেখ না কেন মনে হবে তারই দিকে তাকিয়ে আছে। বিকট হাঁ-এর মধ্যে বড়ো বড়ো বাঁকানো দাঁত।

দাদা, ফিরে চল। অনেক পথ হাঁটতে হবে।

অভিজিৎ বলল, এতদূর এলাম। ভেতরটা দেখব না?

বাড়িটা তো দেখা হলো—

কিন্তু ম্যাকবেথের তরোয়াল দেখব না? দেখব না, দোতলায় কে থাকে?

দাদা, ভেতরে ঢোকা মানেই মৃত্যু। একবার মা-বাবার কথা মনে করে দ্যাখ।

সে কথার উত্তর না দিয়ে অভিজিৎ বলল, ঐ দিকে তাকা। ঐ দ্যাখ জানলার দু’পাট খোলা। হুবহু সেই ছবিটা। চলে আয়।



অভিজিৎ বোনের হাত ধরে ভাঙা পাঁচিলের এক পাশ দিয়ে বাড়িটার সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। চওড়া সিঁড়ি। সিমেন্ট বালির চিহ্নমাত্র নেই। তবু ওরা আট ধাপ সিঁড়ি পার হয়ে বন্ধ দরজার সামনে পা রাখল।

দরজাটা ঠেলব? ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল অভিজিৎ।

উত্তর না দিয়ে যেন মরীয়া হয়ে জুলি নিজেই দরজাটা ঠেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা উৎকট শব্দ করে বিরাট দরজাটা খুলে গেল।

দুজনেই অবাক হলো। দরজাটা শুধু ভেজানোই থাকে নাকি?

এক পা এক পা করে তারা ভেতরে ঢুকল। কনকনে মেঝে। এত ঠান্ডা যে পা রাখা যায় না।

বিরাট হলঘর। কিন্তু বসার কোনো ব্যবস্থা নেই। জায়গাটা অবশ্য বসার জন্যে নয়। দেওয়ালে টাঙানো নয়, ছাদ থেকে ঝুলছে বিরাট বিরাট জস্তর কংকাল। কোথাও বাঘের মাথা, কোথাও মোঘের বিরাট মাথা। কবে থেকে ঝুলছে কে জানে—কিন্তু দেখলে মনে হয় যেন সেগুলোকে সদ্য বধ করে মুণ্ডুলো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। অনেকগুলো দরজা। দোতলায় ওঠার একটা বাঁকানো সিঁড়ি। কিন্তু জনপ্রাণীর সাড়া নেই।

ওরা কিছুক্ষণ এ দরজা ও দরজায় উঁকি মেরে দেখল। তারপর অভিজিৎ চেষ্টা করে বলল, কেউ আছেন?

অভিজিৎয়ের গলার স্বর নিস্তব্ধ ঘরে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল।

কেউ নেই দাদা, চল ফিরে যাই।

দোতলায় কেউ আছেই। দাঁড়া আর একবার ডাকি। বলে অভিজিৎ ফের ডাকল, কেউ আছেন?

উত্তর নেই। কিন্তু থপ করে একটা মোটা টিকটিকি কোথা থেকে মেঝেতে পড়েই ওদের দিকে তেড়ে এল। অভিজিৎ জুলির হাত ধরে টান দিয়ে এক লাফে সরে দাঁড়াল। টিকটিকিটা সিঁড়ির পাশ দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

টিকটিকি আবার মানুষকে তাড়া করে? আর অত মোটা!

চল ওপরে যাই।

আমার যেতে ইচ্ছে করছে না দাদা।

বাঃ এতদূর এসে দোতলাটা দেখে যাব না? দেখব না সত্যিই ম্যাকবেথের তরোয়ালটা আছে কিনা? কিংবা স্বয়ং ম্যাকবেথের আত্মা সেটা পাহারা দিতে আসে কিনা। সাবধানে আমার পিছু পিছু আয়।

এক ধাপ এক ধাপ করে ওরা উঠতে লাগল। সিঁড়িটা বাঁ দিকে বেঁকে গেছে। বহু পুরনো আমলের নড়বড়ে সিঁড়ি। আর ক'ধাপ উঠতেই ওরা দোতলায় এসে পৌঁছল। এটাও নিচের মতোই হলঘর। ওপরেও অনেকগুলো ঘর। ওরা সামনের দিকে এগোচ্ছিল, হঠাৎ দুজনেই কান খাড়া করল, সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে কেউ যেন উঠে আসছে। খস—খস—খস—কে আসছে? কোথা থেকে আসছে? কেন আসছে? যেই আসুক ঐ পায়ের শব্দ যে কোনো মানুষের নয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু—

সে সব চিন্তার আগে দরকার কোথাও লুকনো। কোথায় লুকনো যাবে? সিঁড়ি দিয়ে নামা যাবে না। কারণ ঐ সিঁড়ি দিয়েই কেউ উঠে আসছে।

হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল ওদিকে আর একটা সিঁড়ি রয়েছে। তাড়াতাড়ি ঐদিকে ছুটে গেল তারা।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। কিন্তু সিঁড়িটা মাঝপথেই একটা ঘরের সামনে শেষ হয়ে গেছে। আর পালাবার জায়গা নেই।

ওদিকে সেই খস খস শব্দ আসছেই—আসছেই—

উপায় নেই দেখে সামনের দরজায় জোরে ধাক্কা দিল অভিজিৎ। দরজা খুলে গেল। জোরে ধাক্কা দেওয়ায় দুজনেই ছিটকে ভেতরে পড়ে গেল। কোনোরকমে উঠে দাঁড়াতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে তারা আঁতকে উঠল। পর পর ঝুলছে কংকাল। কোনোটারই মাথা নেই। পশ্চিম দিকের একটা ঘুলঘুলি দিয়ে এক ফালি পড়ন্ত বেলার রোদ এসে পড়েছে একটা কংকালের ওপর। তাতেই দেখা গেল থিক থিক করছে পোকা কংকালটার গায়ে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ঘরে এক ফোঁটা বাতাস নেই। কিন্তু কংকালগুলো দুলছে। কংকালগুলো কি প্রথম থেকেই দুলছিল, না এদের দেখে দুলতে লাগল?

ঘটনার আকস্মিকতা একটু সামলে নিতে না নিতেই আবার একটা ভয়ংকর দৃশ্য। দেওয়ালে স্নান অক্ষরে বড়ো বড়ো ইংরেজি হরফে লেখা—‘SLAUGHTER HOUSE’ যার বাংলা হলো কসাইখানা। লাল হরফে লেখা—কিন্তু অক্ষর বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে—ও কি লাল কালি? না—

উঃ মাগো! এত রক্ত! আত্ননাদ করে উঠল জুলি। পালিয়ে চল দাদা, পালিয়ে চল—দুজনে পালাবার জন্যে পিছু ফিরতেই থমকে গেল। আপাদমস্তক সাদা চাদরে ঢাকা একটা থুথুড়ে বুড়ো—যার পিঠটা কুঁজো হয়ে গেছে বয়সের ভারে, পাকা ধপধপে দাড়ি লুটোচ্ছে মাটিতে, কুৎকুতে সবুজ চোখে যার সাপের দৃষ্টি—একটা লাঠি হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে দরজা আগলে।

কে এই বুড়ো? শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই-ই কি বাস করে আসছে এই বাড়ির দোতলার ঘরে? এই কি পাঁচশো বছর আগের মৃত ম্যাকবেথ যার মোকাবিলা করতে চেয়েছিল সাহেব? সাহেব কি এখানে পৌঁছতে পেরেছে?

দুজনে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সেই বুড়োর দিকে। বুড়ো এগিয়ে এল না, তার ঠোট দুটো একটি বারের জন্যেও নড়ল না। শুধু ঘরের বাইরে শকুনের পায়ের মতো তার দুটো বীভৎস পা রেখে কসাইখানার দরজাটা আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিল। অভিজিৎ দরজা খোলবার জন্যে পাগলের মতো ছুটে গেল। কিন্তু ততক্ষণে দরজাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অভিজিৎ দরজাটা খোলার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করল। কিন্তু শক্ত কাঠের দরজা এতটুকু ফাঁকও হলো না। অভিজিৎ মেঝের ওপর আছড়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল—হায় ভগবান!

কিন্তু আশ্চর্য স্থির জুলি। সে বিহ্বল। ভয় পাবার ক্ষমতটুকুও বুঝি তার নেই। এই কসাইখানার বন্ধ ঘরে এর পর তাদের কী ভয়ংকর পরিণতি হবে তা বুঝতে বাকি নেই।

একটা খটাখট শব্দে দুজনেই চমকে উঠল। দেখল সার সার ঝুলন্ত কংকালগুলো যেন মহা উৎসাহে দুলতে দুলতে একটা অন্যের সঙ্গে ঠোকাঠুকি খেলা শুরু করেছে।

এদিকে বেলা পড়ে আসছে। একটি মাত্র ঘুলঘুলি দিয়ে যে এক ফালি রোদ আসছিল সেটুকুও আর নেই। ঘরে অন্ধকার জমাট বাঁধতে শুরু করেছে।

আর কতক্ষণ তাদের পরমায়া? কখন কবে তাদের শিরশ্ছেদ হবে? আজ রাত্রাই না কাল সকালে? কোথায় কত দূরে তাদের গোয়ালপাড়া গ্রামে মা-বাবার কথা মনে করে জুলির চোখে জল এল।

এমনি সময়ে দরজাটা নিঃশব্দে একটু একটু করে খুলে যেতে লাগল। ঘাতক আসছে তাহলে? ২তুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে অভিজিৎ উঠে দাঁড়াল।

দরজাটা খুলে গেল।

না, সেই বৃড়োটা নয়, একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি। জুলি আর অভিজিৎ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ছায়ামূর্তিটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল। অমনি দুজনেই চমকে উঠল—চঞ্চল!

কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে চঞ্চলের! হাড়সর্বশ্ব রোগা! মুখটা ঝাপসা। চঞ্চল যেন ইশারায় ওদের বেরিয়ে আসতে বলল। অভিজিৎ আর দেরি করল না, জুলির হাত ধরে টেনে নিয়ে দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল। দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর তারা চঞ্চলের ছায়ামূর্তির পিছু পিছু যেতে লাগল। কোন ঘরের কোন গোপন দরজা দিয়ে, কোন সুউঙ্গপথ ধরে কি ভাবে যে তারা রাস্তায় এসে দাঁড়াল তা তারা ভেবে পেল না।

ভাবার সময়ও ছিল না, দরকারও ছিল না। সঙ্গে যে রয়েছে বিশ্বস্ত বন্ধু চঞ্চল। তারই পিছু পিছু তারা চলল মাঠ জঙ্গল পেরিয়ে। তারা কি হাঁটছিল? না উড়ছিল?

একবার অভিজিৎ-এর মনে হলো তারা বোধ হয়, বেঁচে নেই। শরীরমুক্ত ‘আত্মা’ হয়ে তারা চঞ্চলের পিছু পিছু হাওয়ায় ভেসে চলেছে। নইলে এত জোরে কেউ হাঁটতে পারে? চলতে চলতেই অভিজিৎ নিজের হাতে চিমটি কাটল। না, বেঁচেই আছে।

জুলি, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে? এতক্ষণে অভিজিৎ কথা বলল।

না। ছোট্ট উত্তর দিল জুলি। হঠাৎ এক সময়ে তারা দেখল চঞ্চল নেই। চঞ্চল—চঞ্চল—চৈচিয়ে ডাকল অভিজিৎ—কোথায় তুমি? সাড়া পেল না।

এখন এই সন্দের মুখে কোন দিকে যাবে? লারসিংগার বাংলাটা কতদূর?

হঠাৎ জুলি আনন্দে চৈচিয়ে উঠল, দাদা, রেলস্টেশন।

তাই তো। এগিয়ে গেল তারা স্টেশনের দিকে। শিলচর স্টেশন! যাক তবু এখানে জীবন্ত মানুষ আছে।

এখানে যখন এসে পড়েছে তখন আর ভাবনা নেই। একটা ঘোড়ায় টানা টান্সা গোছের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। তাদের দিকে গাড়োয়ান এগিয়ে এল। অভিজিৎ জিজ্ঞেস করল, লারসিংগার বাংলা কত দূর?

উত্তর দিল গাড়োয়ান—পনেরো মাইল।

ভাড়া যাবে?

গাড়োয়ান গাড়ির দরজা খুলে দিল। গাড়ি চলতে শুরু করল। বরাইল পাহাড়ের মাথার উপর তখন সূর্য ডোবার লালচে আলো চিকচিক করছে।

কি ভাবছিস জুলি?

চঞ্চলদা এখানেও দেখা দিয়ে গেল। বলতে বলতে তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠল।

তাহলে সে এখানে এই বাড়িতে পৌঁছেছিল?

জুলি উত্তর দিল না। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। অন্ধকারে ঢেকে যাবে চরাচর।

## অভিশপ্ত ৩৭

॥ এক ॥

সামনের মে মাসে আমার সাঁইত্রিশ বছর পূর্ণ হবে। এ কথা মনে করতেই ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। একটা অজানা ভয়ে গায়ে কাঁটা দেয় তার কারণ এই নয় যে, কোনো জ্যোতিষী আমার হাত দেখে মে মাসে আমার বিপদের কথা জানিয়েছেন। অস্ত্রত আমার তা মনে পড়ে না। তবে—

তবে আমার পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়েসের সময় থেকেই খুব অস্পষ্ট কিছু কিছু যেন চোখের সামনে ভেসে উঠতে চায়। যেমন—নির্জন দুপুরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সামনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে অনেক অনেক দিন আগের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সাদা দেওয়ালে ভেসে ওঠে অস্পষ্ট একটা মানুষের চেহারা। সেই চেহারার মধ্যে গোটা মানুষটাকে বোঝা না গেলেও তার নাক চোখ মুখের গঠন যে বিকটাকৃতি ছিল তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। সেই মূর্তি হাত তুলে কাকে যেন কিছু বলছে। যাকে বলছে তার ছায়া এতটা অস্পষ্ট যে কিছুই বোঝা যায়নি।

দেওয়ালে সেই বীভৎস ছায়ামূর্তি দেখার পর থেকে আমার যেন কিছু মনে পড়তে লাগল। কিন্তু তা খুব অল্পক্ষণের জন্য। ফেনার বুদ্ধদেব যেমন বাতাসে ভাসতে ভাসতে যায়, সেই রকমই মুহূর্তের জন্যে চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা বাড়ি। তারপরেই সেটা সরে যায়। দেখা দেয় একটা মৃতপ্রায় রোগী। সেই রোগী ভয়ে চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে আছে খোলা জানলার দিকে। মৃতপ্রায় রোগীটি কী দেখছিল জানলা দিয়ে? ঘরে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। তারপরেই ভোজবাজির মতো সব অদৃশ্য।

যেসব কথা বললাম তা কিন্তু স্বপ্ন নয়। একটুও বানিয়ে বা বাড়িয়ে বলা নয়। যেটুকু দেখেছিলাম তাই লিখলাম। কিন্তু তার সঙ্গে আমার জন্মমাসের কী সম্পর্ক? ভয়ের কারণই বা কী ভেবে পাই না।

তারপর আমি পরের ঘটনাগুলো মনে করবার অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু কাছিম যেমন মাঝে মাঝে তার শক্ত খোলা থেকে একবার মুখ বার করেই খোলের মধ্যে আবার ঢুকিয়ে নেয়, তেমনি আমার স্মৃতিগুলোও একবার ফিরে এসেই পরক্ষণে দূরে মিলিয়ে যায়। মহা মুশকিল। জীবনের একটা সময়ে ভয়ংকর নিশ্চয় কিছু ঘটেছিল। কিন্তু কী ঘটেছিল তা আজ ঠিক মনে করতে পারি না। সেই সময়ের কটা মাস আমার কাছে একেবারে ব্ল্যাক আউট হয়ে গেছে।

এরকম হওয়ার কারণ সেই সময়ে আমি কঠিন ব্যাধিতে পড়েছিলাম। কয়েকদিন জ্ঞান ছিল না। ভগবানের দয়ায় চিকিৎসার ওণে আমি ভালো হয়ে উঠেছিলাম ঠিকই কিন্তু হারিয়ে ফেলেছিলাম আমার স্মৃতিশক্তি। অনেক চেষ্টায় স্মৃতিশক্তি ফিরল বটে কিন্তু অসুখের সময়ের

স্মৃতি তেমন ফিরল না। তবে এতদিন পর এখন একাগ্র মনে ভাবতে থাকলে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট কিছু মনে পড়ে। কিন্তু সাঁইত্রিশ বছরে পড়লেই ভয়ংকর কোনো ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে এমন সম্ভাবনার কথা কেউ সেদিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল কিনা তা স্পষ্ট মনে পড়ে না।

তবে কেন এই বছরে এই মে মাসটা পড়বার আগেই এত ভয়?

ভয়ের কারণ আছে।

মফঃস্বল শহর। বেশ আরামে থাকি। একলা মানুষ। এক-এক সময়ে খুব নিঃসঙ্গ লাগে—বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলাটা। কিন্তু কীই বা করতে পারি। ইচ্ছে করলেই তো যাকে হোক ডেকে ‘বন্ধু’ পাতানো যায় না।

এ বাড়িতে আমি অনেক দিন আছি—অনেক দিন। তাই এ বাড়ির গলিঘুঁজি আমার নখদর্পণে। এ বাড়ির উঠানের মাঝখানে একটা পুরোনো কুয়ো আছে। খুব দরকার পড়লে সেই জল তুলে ব্যবহার করি। জলটা ভালোই। কুয়োর গায়ে একটা নারকেল গাছ। তার পাশেই একটা পেঁপে গাছ। কুয়োতলা থেকে দু’ধাপ উঠলে একটা রক। রকটা বাঁক ফিরে নেমে গেছে খিড়কির দরজার দিকে। বাইরে যাবার এই খিড়কির দরজাটা আমি বড়ো একটা খুলি না। ওটা খিল আঁটা থাকে।

সেদিন—সন্ধ্যে তখনও হয়নি। পুরোনো এই বাড়িতে এরই মধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে। কুয়োতলার অনেকখানি তফাৎ দিয়ে যাতায়াতের যে পথটা দোতলায় উঠে গেছে, আমি সেই পথ ধরে ওপরে ওঠার জন্যে যাচ্ছি, হঠাৎ মনে হল কুয়োতলায় অন্ধকারে গা মিশিয়ে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে চুপটি করে।

নিশ্চয় চোর!

আমি চৈঁচিয়ে উঠলাম—কে ওখানে?

উত্তর দিল না। তবে ধীরে ধীরে খিড়কির দরজার দিকে চলে গেল।

মরুক গে। চলে তো গেছে।

নিশ্চিত হয়ে ওপরে উঠছিলাম, মনে হল—তাই তো! চলে গেলে খিড়কির দরজা খুলেই তো যাবে। তা হলে দরজাটা বন্ধ করতে হবে। আর তা করতে হবে আমাকেই।

অগত্যা সেই অন্ধকারেই কুয়োতলাটা বাঁ দিকে রেখে রকের ওপর দিয়ে এগোতে লাগলাম। কেমন যেন ভয় করছিল। হাতে একটা লাঠি পর্যন্ত নেই। খিড়কির দরজার বাঁকে যদি চোরটা দাঁড়িয়ে থাকে!

কিন্তু উপায় নেই। খিল বন্ধ করতে যেতেই হবে। পায়ে কী ঠেকল। দেখলাম একটা শাবল। পরশু দিন কুয়োপাড়ে একটা বাঁশ পৌতবার জন্যে মাটি খুঁড়ছিলাম। ভালোই হল। সেটা তুলে নিলাম। হাতে একটা কিছু রইল।

কুয়োতলা থেকে এগিয়ে উঁচু রকটা যেখানে তিনখানা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেছে খিড়কির দরজার দিকে—আমি সেদিকে গেলাম। এখানটায় যেন বড় বেশি অন্ধকার। কিন্তু উপায় কী। আমি আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম। কেবলই মনে হচ্ছিল অন্ধকারের মধ্যে থেকে এই বুঝি কেউ বাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর।

ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেল। তবু পালালে চলবে না। খিড়কির দরজায় খিলটা লাগাতেই হবে।

তাই অনেক চেষ্টা করে কথা বলতে গিয়ে কোনোরকমে একটা চাপা ভাঙা স্বর বেরিয়ে এল—ক্যা—? আর সেই সঙ্গে লোহার শাবলটা মাটিতে ঠুকে জানান দিলাম—জেনে রেখো আমার হাতে শাবল আছে।

যদি কেউ সাড়া দেয় তাই মিনিট দুই চুপ করে অপেক্ষা করলাম। তারপর মনে মনে ‘জয় মা’ বলে এক লাফে থিড়কির দরজার কাছে।

না, কেউ কোথাও নেই।

বুঝলাম যে এসেছিল সুবিধে করতে না পেরে কেটে পড়েছে।

কিন্তু ব্যাপারটা যে এত সহজ নয় তা পরক্ষণেই খিল লাগাতে গিয়ে বুঝলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। দরজা তো খোলাই হয়নি। খিল তো ভিতর থেকে লাগানো।

বিশ্বাস হল না। পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বাললাম। যতবারই জ্বালি অমনি নিভে যায়। মন হল কেউ যেন খুব কাছে দাঁড়িয়ে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিচ্ছে। শেষে পাঁচবারের বার জ্বলল। অমনি ক্ষণিকের সেই আলোয় দেখলাম খিলটা যেমন অনেক দিন থেকে আঁটা তেমনিই আছে। কেউ খোলবার চেষ্টা মাত্র করেনি। মাকড়সার জালগুলো পর্যন্ত ছিঁড়ে যায়নি।

তা হলে কী প্রমাণিত হল?

হল এই—যাকে আমি স্বচক্ষে কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম—তারপর যে গটগট করে থিড়কির দরজার দিকে এগোচ্ছিল সে কিন্তু থিড়কির দরজা খুলে বেরিয়ে যায়নি। কারণ আমি নিজের চোখেই দেখেছি খিল বাড়ির ভিতর থেকে আঁটা।

তাহলে?

তাহলে যিনি ছিলেন তিনি শরীরধারীই হন কিম্বা দেহমুক্তই হন, বাড়ির মধ্যেই কোথাও রয়েছেন। কেমন করে বাড়ির ভেতরে ঢুকেছিলেন জানি না। তবে বেরোতে পারেননি। হ্যাঁ, বাড়ির ভেতরেই কোথাও রয়েছেন!

এ কথা মনে হতেই আমার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। কারণ তিনি যিনিই হন, এই বাড়িতে গোটা রাত্রি তাঁর সঙ্গে থাকা যাবে না।

থাকা যাবে না বললে কী হবে? না থেকে যাব কোথায়? আর সেই তিনি যে কোথায় গেলেন পরের দিন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও হদিস করতে পারলাম না। অগত্যা সব কিছু ভগবান আর ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজের কাজকর্ম নিয়ে ভাবতে লাগলাম।

ভেবেছিলাম ঐ রকম ঘটনা আর ঘটবে না। কিন্তু—

সেদিন সন্দের সময় দোতলার ঘরে বসে লেখালিখির কাজ করছি, হঠাৎ মনে হল কেউ যেন নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়াল। শুধু দাঁড়িয়ে থাকা নয়, একদৃষ্টে যেন তাকিয়ে আছে পিঠের দিকে। সেই মুহূর্তে কী করব কিছুই ভেবে পেলাম না। উঠে পালাব সে উপায় নেই। অগত্যা টেবিলের নীচে ঘাড় গুঁজে রইলাম।

কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম জানি না। এক সময়ে ঘাড় টুন্টুন্ করায় সোজা হয়ে বসলাম। জানলা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস এল এক বলক, সাহস করে পিছন ফিরলাম। কেউ নেই।

এখন কেউ নেই এ কথা যেমন সত্য, তেমনি একটু আগেও কেউ যে ছিল তাও সত্য। কিন্তু কে সে? কী চায়? কেনই বা আমার কাছে এসেছিল? এইসব চিন্তা আমায় বিভ্রান্ত করে তুলল। মন হল ক’দিন আগে কুয়োতলায় যাকে অস্পষ্ট দেখেছিলাম সেও কি তবে অশরীরী ছিল? কী সর্বনাশ!

হঠাৎ এত কাল পর আমার বাড়িতেই এসব উপদ্রব কেন? কী চায়? এই চাওয়ার সঙ্গে এ বছর মে মাসে আমার যে বিপদের কথা—তার সঙ্গে কি কোনো সম্বন্ধ আছে? আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম।

তৃতীয় যে ঘটনাটা মাত্র গতকাল ঘটল সেটা আরও সাংঘাতিক।

বিকেলে প্রায়ই আমি রাস্তায় একটা চক্র দিয়ে আসি। খোলা জায়গায় নির্মল বাতাসে শরীর-মন জুড়িয়ে যায়। কাল আমি বাড়ির পিছনের গলি দিয়ে ফিরছিলাম। গলির বাঁ দিকে গৌর ঘোষের বিরাট নারকেল গাছের বাগান। সেই পথটুকু পার হচ্ছি হঠাৎ একটা গাছের ওপরে সরসর শব্দ হল যেন নারকেল পাতা খসে পড়ল। তারপরই হাওয়ার একটা জোর ধাক্কা। সঙ্গে সঙ্গে খুব চাপা গলায় কে যেন বলে গেল—‘আর মাত্র কিছু দিন!’ সঙ্গে সঙ্গে বাতাসও মিলিয়ে গেল।

আমি চমকে উঠলাম। প্রথমত যে ধাক্কা দিয়ে গেল তাকে দেখতে পেলাম না। হাত থেকে পেনটা পড়তে যতটুকু সময় লাগে তারও কম সময়ের মধ্যে শুধু একটা দমকা হাওয়া ঘুরপাক খেতে খেতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর দ্বিতীয় যে জানে চমকে উঠলাম সেটা হচ্ছে কথাটা যে বলল তার গলাটা যেন চেনা চেনা অথচ কিছুতেই মনে করতে পারলাম না কার গলা। তবে এটা ঠিক, গলার স্বর যারই হোক সে অস্তত এখন জীবিত নয়।

এই শেষের ঘটনায় আমি বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম এ ক’দিন যে সব অস্বস্তিকর অবস্থা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল—সত্যি, মিথ্যে, সন্দেহের দোলায় দোলাচ্ছিল এখন তার নিরসন হল। অর্থাৎ যা ছিল সন্দেহ আজ তা দূর হয়ে গিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিল—ব্যাপারটা নিছক মানসিক নয়। সত্যিই কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

কথাটা আমি মনে মনেই রাখলাম। কাউকে বললাম না। বললেই নানা রকম উপদেশ, পরামর্শ যা কোনো কাজে দেবে না। তার চেয়ে বরং ভেবে দেখতে হবে গলার স্বরটা কার হওয়া সম্ভব। আর সে এমন একজন যে এখন আর পৃথিবীতে নেই।

পৃথিবীতে নেই আমার জানাশোনা এমন বহু লোক বহুদিন আগে থেকে পরলোকগামী হয়ে আছেন। তার মধ্যে থেকে ঠিক এই কণ্ঠস্বরের মালিকটিকে খুঁজে বের করা কঠিন ব্যাপার। এ তো গোয়েন্দাগিরি নয়। তবু আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

কাজেই এখন আমার প্রথম কর্তব্য হল একান্তে বসে মৃত আত্মাদের বাছাই করে ফেলা। কী ভাবে বাছাই করব?

প্রথমে যাদের কথা মনে পড়ে এমন মৃত ব্যক্তিদের একটা তালিকা করা। তারপর সেই লম্বা তালিকা থেকে দশ বছর কি তারও কিছু আগে যারা গত হয়েছে তাদের চটপট বাদ দেওয়া। কারণ এতদিনে তাদের পুনর্জন্ম হয়ে গেছে। এতে তালিকা একটু হালকা হবে।

এইভাবে মৃত আত্মাদের নামের ছাঁটকাট করা তালিকাটি নিয়ে কয়েকদিন পর নিরিবিলিতে একদিন বসলাম।

আমার বাড়ির পরিবেশ খুব শান্ত। কেননা আমি ঝাড়া-হাত-পা মানুষ। অর্থাৎ বিয়ে-শাদি করিনি। আত্মীয়-স্বজনরা আমার খোঁজ-খবর রাখে না। তাই আমিও তাদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষি না। বাড়িতে একাই থাকি। তবে সত্যি কথা বলতে কি মাঝে মাঝে বড্ড একা বোধ করি। বাড়িতেই হোক, বাড়ির বাইরেই হোক কথা বলার মানুষ চাই।

যাই হোক, সেদিন মৃত আত্মাদের তালিকা নিয়ে কাজ করতে করতে অনেক বেলা হয়ে

গেল। হঠাৎ চমকে উঠলাম। কেউ একজন আমার বসার ঘরে ঢুকে পড়ার পর বলল, আসব স্যার?

॥ দুই ॥

তাকিয়ে দেখি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উনিশ-কুড়ি বছরের একটি ছেলে দাঁত বের করে বোকার মতো হাসছে। প্রথম দর্শনে অবাক হয়েছিলাম। কেমন যেন চেনা চেনা মুখ। অনেক দিন আগে কোথায় যেন দেখেছি। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলাম না।

বললাম—কী চাই?

ও কিছুমাত্র সংকোচ না করে বলল—ভাত খাব।

বলে একটু সলজ্জ হাসল।

আমি তখন ওকে বসিয়ে ওর খবরাখবর নিলাম। নাম নকুল। ওর মা-বাবা যখন মারা যায় তখন ওর বয়েস বারো। বাধ্য হয়ে ও ওর মামার কাছে চলে আসে। মামী প্রথমে এই বয়েসের ‘পরের ছেলের’ দায়িত্ব নিতে চায়নি। শেষে মামা-মামী দুজনে ঠান্ডা মাথায় পরামর্শ করে ঠিক করল বাজার-দোকান করা, জল তোলা, বাড়ি-ঘর পরিষ্কার করার মতো ভারী কাজগুলো একে দিয়ে করিয়ে নিলে মাইনে দিয়ে আর লোক রাখতে হবে না।

এই সুবুদ্ধি মাথায় উদয় হতেই মামা-মামী নকুলকে ঠাই দিলেন।

কিন্তু এই সুখ বেচারির বেশিদিন সইল না। মামা-মামীর নির্মম অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে বাঁচল। তারপর নানা জায়গা ঘুরে খেয়ে, না-খেয়ে, অর্ধাহারে খোলা আকাশের নীচে দিনের পর দিন শুয়ে শেষে একদিন এখানে এসে হাত জোড় করে দাঁড়াল।

ওর কথা শুনে কেমন যেন মায়া হল। বললাম—শোনো, আমার বাড়িতে রাঁধার কেউ নেই। আমি নিজেও রাঁধতে পারি না। হোটেলে খাই। কাছেই হোটেল। তুমি ওখান থেকে খেয়ে নাও। বলে একটা দশ টাকার নোট আর কিছু খুচরো টাকা দিলাম। ও ফের হাত-জোড় করে নমস্কার করে চলে গেল।

ভেবেছিলাম একেবারেই চলে গেছে। কিন্তু ঘন্টাখানেক পরেই সে এসে হাজির। তাকে দেখে বেশ তৃপ্ত বলে মনে হল। বললাম, খেয়েছ?

ও ফের হাত জোড় করে বলল, অনেকদিন পর মাছভাত খেলাম। তিনবার ভাত নিলাম। বলে হাসতে লাগল।

বললাম, পেট ভরেছে তো?

হ্যাঁ—বলে মাথা দোলাল।

তারপর প্যাণ্টের পকেট থেকে তিনটে টাকা বের করে আমার টেবিলে রাখল। আমি অবাক হয়ে তাকালাম। ও বলল, এ টাকাটা লাগেনি।

তাই ফেরত দিচ্ছ?

আমার যতটুকু লাগার তাই নিয়েছি।

বললাম, টাকা তিনটে তুমি রাখো।

ও যেন কৃতার্থ হল। টাকা তিনটে তুলে নিয়ে হঠাৎ আমায় প্রণাম করল। বলল, আপনার এই দয়া যতদিন বাঁচব ততদিন মনে রাখব। বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। জিগ্যেস করলাম, কোথায় যাবে এখন?



জানি না স্যার। এ বেলা যা খেয়েছি তাতে দু'দিন না খেলেও চলবে। আর শোওয়া? রাস্তার ধারে খোলা রক তো কতই পড়ে রয়েছে।

চলে যাচ্ছিল, ডাকলাম, শোনো।

ও ফিরে দাঁড়াল।

তুমি আমার কাছে থাকবে?

ও কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর অস্ফুটস্বরে বলল, আমায় বলছেন, স্যার? হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি।

ও তবু যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। বলল, আমি এই বাড়িতে থাকব! দু'বেলা খেতে পাব?

হেসে বললাম, হ্যাঁ, তাই।

আমায় কী করতে হবে?

কিছু না। তুমি চা করতে পার?

তা আর পারি না? কত চায়ের দোকনে তো কাজ করলাম।

তাহলে তো ভালোই। তোমার কাজ হবে আমার সঙ্গে গল্প করা। আর মাঝে মাঝে চা করে খাওয়ানো। আর একটা কাজ—আমার কিছু ধানজমি আছে। সাইকেল আছে। মাঝে মাঝে গিয়ে একটু দেখাশোনা করা।

নকুল এবার আর কোনো কথা বলতে পারল না। হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো আনন্দে একটা পাক খেয়ে নিল। সেই থেকে নকুল হয়ে গেল আমার সঙ্গী।

নকুলকে পেয়ে আমার সুবিধেই হয়েছে। কথায় বলে, 'একা না বোকা'! তা সত্যি একা থাকলে কেমন ভয় ভয় করে। তাছাড়া যত উদ্ভট অবাস্তব কল্পনা মাথায় খেলে বেড়ায়।

হ্যাঁ, উদ্ভট ভাবনা। নকুল আসার পর থেকে সেই পরলোকগত আত্মাগুলির নাম-পরিচয় বাছাই করার মতো পাগলামি বন্ধ ছিল। সেই অদৃশ্য আত্মাটিও আর উৎপাত করেনি। করবেই বা কী করে? চিরকালই তো শুনে আসছি একের বেশি মানুষ থাকলে আত্মাটাত্মা কাছে ঘেঁষে না। এই কথা ভেবে নিশ্চিন্ত আছি।

নকুল বেশ স্বচ্ছন্দেই আছে। বাড়ির সব কাজই করে। বলতে হয় না। তবে একটু বেশি উৎসাহী। তড়বড় করে ঝুল ঝাড়তে গিয়ে সেদিন একটা ছবির কাচ ভেঙে ফেলল। এসব ব্যাপারে সে মোটেই লজ্জিত নয়। আমিও কিছু বলি না। তবু তো বাড়িতে একটা সচল প্রাণী নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।

প্রতিদিন ও কী দোকান-বাজার করল তার একটা ফর্দ দেয়। দুজন মানুষের সামান্য খরচ। তবু ও বোধ হয় নিজের সততার প্রমাণ দেবার জন্যে নিজেই ফর্দ দেয়। আমি মোটামুটি চোখ বুলিয়ে নিয়ে হিসেব বুঝে নিই। একদিন দেখলাম ফর্দের তলায় লেখা 'ইদুর মারার ওষুধ'।

আমার বাড়িটা পুরোনো হলেও আজ পর্যন্ত সাপ, বিছে, ব্যাঙ, ইদুরের উৎপাত হয়নি। তা হঠাৎ ইদুরের এমন উৎপাত হল—কী ব্যাপার?

আমি নকুলকে ডেকে জিগ্যেস করলাম, হঠাৎ ইদুর মারার ওষুধ? বাড়িতে ইদুর দেখা যাচ্ছে নাকি?

ও ওর স্বভাবমতো মাথা চুলকে বলল, আজ্ঞে না। ইদুর দেখা যায়নি বটে কিন্তু মাটি তুলছে খুব।

মাটি তুলছে মানে?

প্রায়ই দেখছি এখানে-ওখানে শুকনো মাটি পড়ে। কত পরিষ্কার করি বলুন তো?

বললাম, ইঁদুর মারার ওষুধে যদি মাটি তোলা বন্ধ হয় তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু তুমি যা বলছ এখানে-ওখানে মাটি উঠেছে তাহলে তো অনেক গর্ত। গর্তগুলো দেখেছ তো?

নকুল বলল, ইঁদুর মারার ওষুধ খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেই কাজ হয়। গর্তের খোঁজ করতে হয় না।

নকুল জিগ্যেস করল, তা হলে ইঁদুর মারার ওষুধ কিনব তো?

বললাম, না কিনে তো উপায় নেই।

ওষুধ কেনা হল। নকুল ঝাঁট দিয়ে ইঁদুরের মাটিগুলো সাফ করে দিল।

তারপর সে ইচ্ছেমতো রুটির সঙ্গে ইঁদুর মারার বিষ মিশিয়ে এমন করে যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে দিল যে আমাকেই সাবধানে বারান্দায় চলাফেরা করতে হল। নকুল সদাজাগ্রত প্রহরীর পাহারা দিতে লাগল কখন ইঁদুর সেই রুটি খাবে। কিন্তু একটিও মরা ইঁদুর দেখা তো দূরের কথা, ধেড়ে ইঁদুর, নেংটি ইঁদুরও রুটি খেতে এল না।

শেষ পর্যন্ত নকুল হতাশ হয়ে বলল, ইঁদুরগুলোও এখন সেয়ানা হয়ে গেছে দাদা। অত রুটি ছড়িয়ে রাখলাম একটা ইঁদুরও ত্রিসীমানায় ঘেঁষল না।

বললাম, না ঘেঁষুক। মাটি উঠলে ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিও। তা হলেই হবে।

নকুল কথা বাড়াল না। চলে গেল।

মেঝেতে আর মাটি উঠেছিল কিনা জানি না, ও বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, তবে নকুল আর ঐ নিয়ে আমার কাছে ঘ্যানঘ্যান করেনি। কিন্তু লক্ষ করছি ও যেন দিন দিন কেমন গভীর হয়ে যাচ্ছে। কথাবার্তা কম বলছে। ও কি কোনো কারণে আমার ওপর রাগ করেছে? জানি না। রাগ করার তো কোনো কারণ নেই। সকলেই জানে আমি কথায়-বার্তায় খুব সংযত। কাউকে রুঢ় কথা কখনও বলি না।

একদিন আর থাকতে না পেরে ওকে ডেকে জিগ্যেস করলাম, নকুল, তোমার কি কিছু হয়েছে?

নকুল গভীর মুখে মাথা নেড়ে জানাল, না।

তাহলে এত গভীর কেন?

ও চুপ করে রইল।

বললাম, শরীর খারাপ?

ও আগের মতো মাথা নেড়ে জানাল, না।

তবে মন খারাপ?

এবার নকুল মাথা নাড়তে নাড়তে ভেতরে চলে গেল।

এই এক নতুন ভাবনা শুরু হল। নকুলের যে কিছু হয়েছে তা স্পষ্ট বুঝতে পারছি। কিন্তু কী হয়েছে তা ধরতে পারছি না। ভাবনা হল—যাও বা একটা ভালো সঙ্গী পেলাম তাও বুঝি আর টেকে না।

যাই হোক, আমি আর নকুলকে ঘাঁটলাম না; ও নিজের মতো করে যে ক'দিন কাজ করতে চায় করুক।

একদিন দেখলাম, দুপুরে যখন কাগজ পড়ছি, নকুল নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল। বললাম, কিছু বলবে?

ও মুখটা করুণ করে বলল, হ্যাঁ।

অভয় দিয়ে বললাম, বলো।

ও যেন দমকা কাশির মতো বলে উঠল, দাদা, এ বাড়িটা খারাপ।

আমি চমকে উঠলাম। ও-ও কি তাহলে কিছু দেখেছে? সামলে নিয়ে বললাম, মানে?

ও নানাভাবে বোঝাতে চাইল যে, ও নাকি প্রায় সন্ধ্যাবেলায় কাউকে ভেতর-বারান্দায় চলে বেড়াতে দেখে। যে চলে বেড়ায় তাকে ডাকলে সাড়া দেয় না। আলো নিয়ে গেলেও দেখা যায় না। নকুল নিশ্চিত যে, দেখা না গেলেও বুঝতে পারে কেউ একজন আশেপাশে রয়েছে।

সর্বশেষে কথা। আমি ভয় পেলাম। বুঝলাম আগে যাকে দেখতাম সে তাহলে যায়নি। এখানেই আছে। ইদানিং আমায় দেখা দেয়নি।

ভয় পেলাম ঠিকই। কিন্তু নকুলের কাছে তা প্রকাশ করলাম না। একটু হেসে বললাম, তাই বুঝি?

উত্তরে নকুল তার বাঁ হাতের তালুতে ঘুঁষি মেরে আমায় বলল, আমায় ভয় দেখানো? আমি কিন্তু ছাড়ব না। এবার দেখা পেলো জাপটে ধরবই।

বাস্তব হয়ে বললাম, ও সব করতে যেও না। কী থেকে কী বিপদ ঘটে যায় তা বলা হয় না। যাকে মনে করছ আছে সে থাকুক না। সে তো ক্ষতি করছে না।

কী যে বলেন দাদা! রোজ দেখছি সন্ধ্যা হলেই গোটা বারান্দায় দাপিয়ে বেড়ায়। সে কি শুধু শুধু? ও আপনার ক্ষতি করবার মতলবেই এখানে আসে। হয়তো ঠিকমতো সুযোগ পাচ্ছে না। আপনি কিন্তু দাদা সাবধান হবেন।

মুখে হাসি টেনে বললাম, কী ভাবে সাবধান হব বলো?

নকুল বলল, আপনি বাড়িতেও একা থাকবেন না। আমাকে ডাকবেন। প্রেতাঙ্কাই হোক আর যাই হোক আমি একাই শায়েস্তা করে দেব। এই বলে ও বীরদর্পে ভেতরে চলে গেল।

মহা সংকটে পড়লাম। প্রেতাঙ্কটি আবার বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভেবেছিলাম তিনি যেমন এসেছিলেন, আবার চলেও গেছেন। ভেবে অনেকটা নিশ্চিত হয়েছিলাম, কিন্তু এখন তো দেখছি নিশ্চিত হবার উপায় নেই। যদিও আমার কাছে আসেননি কিন্তু নকুলকে তো দেখা দিচ্ছেন। উদ্দেশ্যটা কী? তবে কি আমার সাঁইত্রিশ বছর বয়স পূর্ণ হতে যাচ্ছে বলেই—

সেদিন দেখলাম বাজার থেকে একটা মোটা লাঠি নিয়ে এসেছে। বললাম, লাঠি দিয়ে কী হবে?

ও বলল, একটা লাঠি বা বল্লম থাকা দরকার। কখন কী দরকার পড়ে—

বুঝলাম দরকার তো একটাই। কিন্তু লাঠি দিয়ে কি প্রেতাঙ্ক তাড়ানো যাবে? তা অবশ্য যাবে না কিন্তু—এ অবস্থায় কী যে করি! কার পরামর্শ নিই তখনই ভেবে পেলাম না। দেখাই যাক না আর কোনো ঘটনা ঘটে কিনা—ভাবতে ভাবতেই ক’দিন কেটে গেল।

তারপর সেদিন—

রাত তখন ঠিক কত জানি না। ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙার পরও অনেকক্ষণ বুঝতে পারলাম না ঘুমটা কেন ভাঙল। আমার ঘরের উত্তর দিকের জানলাটা খোলাই ছিল। ওদিকে একটা বড়ো পুকুর। পুকুরের ওপারে ঘন ঝোপঝাড়। তার পিছনে বড়ো বড়ো দেবদারু গাছ। গুরুপক্ষের বোধহয় ত্রয়োদশী। ফ্যাকাশে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে পুকুরপাড়ের সুপুরি গাছটার পাতায়। বাতাস নেই তবু পাতাগুলো অল্প অল্প নড়ছে ঠিক যেমন মফঃস্বলে মড়া

নিয়ে যাবার সময় চালিতে শোওয়ানো মৃতের মাথাটা নড়ে এদিক-ওদিক। সুপুরি গাছটার দিকে তাকিয়ে আমার গা-টা কেমন ঘুলিয়ে উঠল। এ তো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, অন্য কিছু।

এমনি সময়ে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেলাম। নকুল আমার পাশের ঘরে শোয়। সেই ঘর থেকেই শব্দটা এল। নকুল কি ঘর থেকে বেরোচ্ছে? কিন্তু অত চুপি চুপি কেন?

নকুলের ঘরের দিকে খড়খড়িওলা একটা জানলা ছিল। জানলাটা বন্ধই থাকত। খোলার দরকার হত না। আমি ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নেমে এগিয়ে গেলাম জানলাটার দিকে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সাবধানে খড়খড়িটা একটুখানি ফাঁক করলাম। ঘরের ভেতর গাঢ় অন্ধকার। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলাম না। তারপর চোখ দুটো সয়ে গেলে কিছু যেন দেখতে পেলাম। কেউ যেন অন্ধকারে নড়ছে।

কী আশ্চর্য! যে নড়ছে সে যদি নকুলই হয় তাহলে সে তো দরজার দিকে যাবে। কিন্তু এখানে চলমান বস্তুটি দরজার দিক থেকে নকুলের বিছানার দিকে যাচ্ছে।...এর মানে কী? কে যাচ্ছে অন্ধকারে গা মিলিয়ে? কোনো চোর? ডাকাত? যুনে?

সে খুব সাবধানে এক পা ফেলেছে আর শব্দ হচ্ছে খট্। আবার এক পা এগোচ্ছে অমনি শব্দ খট্ খট্—

এ কি মানুষের হাঁটার শব্দ? এ তো হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি! কিছু ভাববার আগেই একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

ছায়ামূর্তিটা শূন্যে দু'পা তুলে দু'হাত লম্বা করে যেন প্রচণ্ড আক্রোশে জলে ডাইভ দেবার মতো নকুলের বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে—আমি হুঁশিয়ার করে দেবার জন্যে চেষ্টা করে উঠলাম—ন-কু-ল—

সঙ্গে সঙ্গে একটা আলমারির পেছন থেকে উদ্যত লাঠি হাতে যে ত্বরিত গতিতে এগিয়ে এল সে যে নকুল তা বুঝতে বাকি রইল না।

মাত্র দু-তিন মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেল। ছায়ামূর্তি দু'হাত আরও লম্বা করে শূন্য বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়তেই নকুল সজোরে তার পিঠে লাঠি দিয়ে মারল। অবাক কাণ্ড—

মোটরের টায়ার বাস্ট করলে যেমন শব্দ করে বাতাসটা বেরিয়ে গিয়ে টায়ারটা চুপসে পড়ে থাকে তেমনি একটা শব্দ করে কালো আলখাল্লার মতো কী যেন একটা বিছানায় পড়ল। তার পরক্ষণেই সেই পরিত্যক্ত বস্তুটা শূন্যে ভাসতে ভাসতে সরু হয়ে জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে নকুলও পিছন পিছন ছুটল।

আমি ফের চেষ্টা করে উঠলাম, নকুল—যেও না—

নকুল সাড়া দিল না—ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। আমিও দেরি না করে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়লাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার। সুইচ টিপে আলো জ্বাললাম। পাশেই নকুলের ঘর হাট করে খোলা। আমিও ছুটলাম। কিন্তু কোন দিকে যাব?

কী মনে হল, কেন মনে হল জানি না, আমি সামনের রাস্তা ছেড়ে পিছনের দিকের দ্বারখানা উত্তর দিকের রাস্তা ধরলাম। আমার হাতে একটা লাঠিও নেই। তবু নকুলকে বাঁচাতেই হবে। আমার জন্যে ওকে মরতে দেব না। কিন্তু এই নিশ্চিত অন্ধকারে কোথায় খুঁজব ওকে? ও তো সেই অশরীরীর পিছনে উন্মাদের মতো ছুটেছে।

আমিও ছুটতে লাগলাম। এই গভীর রাতে কেমন এক শিরশিরে বাতাস বইছে। সে বাতাস যেন পৃথিবীর বাতাস নয়। আমি দু'হাত দিয়ে গা আগলে ধরলাম—যেন বাতাসটা সহ্য করতে পারছিলাম না। ছুটতে ছুটতে পুকুরধারে এসে পড়লাম।

এই রকম গভীর রাতে কোনোদিন এই পুকুরের দিকে আসিনি। আসতে সাহস হয়নি। দুর্নাম আছে পুকুরটার। গভীর রাতে এখানে এলে নাকি দেখতে পাওয়া যায় কেউ যেন মাঝ পুকুরে ডুবছে আর উঠছে। অনেকেই পুকুরের মাঝখানে জল তোলপাড় করার শব্দ শুনেছে। কিন্তু কিছু দেখতে পায়নি। ঝুপ করে কে যেন ডুব দিল। তারপর শুধু খানিকটা জল হুস করে উঠল। বাস্ এই পর্যন্ত। ও নাকি দেখা যায় না। আমার সৌভাগ্য এদিন ওরকম কোনো শব্দ শুনতে পাইনি। কিছু দেখতেও পাইনি। তবু যা দেখেছিলাম তাই যথেষ্ট।

পুকুরের পাড়ে মানুষের মতো কী যেন পড়ে আছে। ছুটে গেলাম। দেখি নকুল উবুড় হয়ে পড়ে আছে। মাথার কাছে লাঠিটা পড়ে আছে ভাঙা। হুমড়ি খেয়ে ওর বুকে মাথা রেখে বুঝলাম এখনও বেঁচে আছে।

## ॥ তিন ॥

আমার সৌভাগ্য যে নকুল সে যাত্রায় বেঁচে গেল। কিন্তু উঠে দাঁড়াতে সময় নিল পাক্সা একটি মাস।

তারপর আস্তে আস্তে সুস্থ হল বটে কিন্তু সে রাত্রের ঘটনা কিছুই মনে করতে পারত না। এমন কি অবাক হয়ে আমার কাছে জানতে চাইত অত রাতে পুকুরপাড়ে গেলাম কেন? কী করেই বা গেলাম? আমি অনেক ভাবে প্রকৃত ঘটনাটা মনে করাতে চেষ্টা করেছি কিন্তু ওর কিছুই মনে পড়ত না। বললাম, সে রাতে তুমি বিছানায় না শুয়ে আলমারির পিছনে লুকিয়েছিলে। তুমি কী করে বুঝতে পেরেছিলে সে রাতেই এরকম ঘটনা ঘটবে?

ও শুধু কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। তারপর অন্য দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, জানি না।

বললাম, তুমি যে সেই ছায়ামূর্তির পিছু পিছু তাড়া করে গিয়েছিলে তাও কি মনে করতে পারছ না?

ও শুধু মাথা নেড়ে বলল, না। সব অন্ধকার, দাদা। আমি আর বসে থাকতে পারছি না। ঘুম আসছে।

আমি তখনই ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আমার ঘরে চলে এসেছিলাম। ভাবলাম এই বেলা এগারোটায় ঘুম! তাহলে সুস্থ হল কই?

কিন্তু কী হচ্ছে এইসব? এখন নিশ্চিত হয়েছি—এতদিন যা দেখেছি তা মিথ্যে নয়। কিছু একটা আছেই। সেই অপার্থিব বস্তুটাকে আমি ছাড়া আরও একজন দেখেছে। কিন্তু কে এই ছায়ামূর্তিটা? কেনই বা আমার ঘরেই হানা দেয়? আমার সাঁইত্রিশ বছর বয়েস পূর্ণ হবার সঙ্গে তার কি সত্যিই কোনো সম্পর্ক আছে?

এই জন্যেই অনেক হিসেব-নিকেশ করে মৃতদের একটা তালিকা করতে আরম্ভ করেছিলাম। কাজটা শেষ করা হয়নি। এবার দেখছি আবার এটা নিয়ে বসতে হবে।

ভেবেছিলাম যিনি মাঝে-মাঝে আসছিলেন তিনি হঠাৎ বেশ কিছুদিন আসা বন্ধ করেছিলেন। আবার আসছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এখন তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল আমি নই, নকুল। বেচারি নকুল। সে তো সবে এসেছে। এরই মধ্যে কীভাবে জড়িয়ে গেল আমার জীবনের সঙ্গে যার ফলে সেও অশরীরী ক্রুদ্ধ আত্মাটির আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠল!

আত্মাটি তার ওপর এতই ক্রুদ্ধ যে তাকে খুন করতে পর্যন্ত তার ঘরে ঢুকেছিল। এর কারণ কী?

কোন অলৌকিকতার প্রভাবে নকুলকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল নির্জন পুকুরের পাড়ে? কে ভাঙল তার মজবুত লাঠিটা? কেনই বা অচৈতন্য হয়ে পড়ল নকুল? আর কীসের প্রভাবে সে তার স্মৃতি হারিয়ে ফেলল! ঐ রাত্রির ঘটনা যেন নকুলের মন থেকে একেবারে মুছে গেছে।

এসবই আমাকে আবার ভাবিয়ে তুলল। যতই ভাবি কোনো কুলকিনারা পাই না। অথচ এ এমন ব্যাপার যে লোক ডেকে বলা যায় না। কারণ, এমন কোনো প্রমাণ দেখাতে পারব না যা দিয়ে বিশ্বাস করাতে পারব—এমন কি নকুলের ভাঙা লাঠিটাও অবিশ্বাসীদের কাছে তেমন জোরদার প্রমাণ বলে গণ্য হবে না। অথচ এখন মনে হচ্ছে সব ঘটনা জানিয়ে পরামর্শ নেবার একজন বিশ্বস্ত লোক চাই।

চাই তো বটে কিন্তু পাই কোথায়?

তখন মনে পড়ল পাড়াতেই তো থাকেন পাদ্রী জগদীশ অ্যান্টনি। বয়েস হয়েছে। শান্ত স্বভাবের ভদ্রলোক। কারও সাতে-পাঁচে থাকেন না। উনি নাকি এই সব আত্মা-টান্ধার বিষয় বোঝেন। এ নিয়ে গোপনে ক্রিয়া-কলাপ করেন কিনা জানি না। তবে পড়াশোনা করেন। শুনেছি ওঁর সিন্দুকে নাকি রোমান হরফে লেখা দুস্ত্রাপ্য প্রেতের বই আছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেই বই ব্যবহার করেন গোপনে।

ওঁর কাছেই যাব ভাবলাম। তবু যাব-যাব করেও যেতে উৎসাহ পেলাম না। কারণ আমার মতো আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন কী করে তাঁর কাছে গিয়ে বলবে, ‘আমার বাড়িতে দুষ্ট আত্মার আবির্ভাব হয়েছে। হে পাদ্রী মশাই, আপনি বিধান দিন কী করে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব।’

না, অসম্ভব। এ আমি পারব না। অতএব পাদ্রী-মশাইয়ের কাছে আর যাওয়া হল না। ভাবলাম আর কিছুদিন দেখাই যাক না।

এই ‘কিছুদিনের’ মধ্যেই একটা ঘটনা ঘটে গেল। নকুলের স্মৃতি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা যখন মাইনাস করে দিয়েছিলাম তখনই নকুল একদিন সকালবেলা গজগজ করতে করতে এসে বলল, দাদা, আমি না হয় বেশ কিছুদিন ঘর ঝাঁট দিতে পারিনি, তাই বলে কেউ ঝাঁট দেবে না?

আমি তখমত খেয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ঘর ঝাঁট দেওয়ার কথা কাকে বলছে? কে ঝাঁট দেবে? আমার বাড়িতে তো আর কেউ নেই যে ঘর ঝাঁট দেবে? বুঝলাম নকুলের মাথাটা এখনও পরিষ্কার হয়নি। সে কথা চেপে গিয়ে বললাম, কেন? কী হয়েছে? আবার মেঝে খুঁড়ে মাটি তুলছে?

এর আগেও নকুল এই অভিযোগ করেছিল। আমি গুরুত্ব দিইনি। আজ ভাবলাম, এ তো অদ্ভুত কথা। সিমেন্টের মেঝে। ঘরে এমন অপ্রয়োজনীয় জিনিসের জঞ্জাল নেই যে ইউরুর বাসা হবে। তা হলে?

চলো তো দেখি।

আমার এ কথায় নকুল খুব উৎসাহ পেল। আমার সামনে সামনে বীরদর্পে এগিয়ে চলল।

ওর ঘরে ঢুকে ভালো করে লক্ষ করে দেখলাম টটকা তোলা মাটি নয়। বেশ কিছুদিন আগে উঠেছে। তারপর কিছুদিন মাটিতে পড়ে থেকে থেকে কেমন ভিজে ভিজে ঠেকছে। আমি তখন নিজেই একটা ঝাঁটা দিয়ে মাটিগুলো সরিয়ে দিলাম। কিন্তু ইউর কেন পিপড়ের

গর্তও দেখা গেল না। তখন বুঝলাম মাটিগুলো কোনোদিন উপর থেকে ঝুর ঝুর করে পড়েছে। যেমন পুরোনো বাড়িতে দেওয়াল বা কড়িবরগার পাশ থেকে চুন-বালি খসে পড়ে। এতক্ষণে যেন ব্যাপারটার একটা মানে খুঁজে পেলাম। যদিও একবার মাথা উঁচু করে তাকিয়ে কোনো খসে যাওয়া চুন-বালির চিহ্ন দেখতে পেলাম না।

একে তো ভাবনার অন্ত ছিল না। কে ঐ অশরীরী আত্মাটি? আমার ওপর কেন তার এত রাগ? কী চায় আমার কাছে? বেচারি নকুল এমন কী অপরাধ করল যে, রাতদুপুরে তার জানলা দিয়ে ঢুকে তাকে মেরে দিতে গিয়েছিল! এখন আবার নতুন ভাবনা জুটল হঠাৎ মেঝেতে মাটি এল কোথা থেকে? একবার নয়, কয়েকবার। পাদ্রীবাবার কাছে যাব কি যাব না ভাবতে ভাবতেই দিন চলে যায়।

এমন সময়ে তাঁর কাছে যাবার একটা উপলক্ষ এসে গেল।

জগদীশ অ্যান্টনি প্রতিদিন যখন মিশনে পুরোনো চার্চের দিকে যান তখন পথে আমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়ে যায়। কিন্তু কথা হয় না। সেদিন দেখা হতেই উনি বললেন, এই যে বাবাজীবন, রোজই ভাবি বলব, কিন্তু খেয়াল থাকে না।

আমি নম্র গলায় বললাম, আমি কি আপনার বাড়িতে যাব?

হ্যাঁ বাবা, তা তো যাবেই। তবে একটা বই-এর খোঁজ করছি। পাচ্ছি না। তুমি যদি পার—

কী বই বলুন।

উনি যে বই-এর নাম বললেন তা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। মনে মনে ভবলাম, এ বই আজ কোথায় পাব?

তবু তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, খুঁজে দেখব। যদি থাকে—

তাই দেখো। বড্ড দরকার হচ্ছে। মানে নিতান্তই কৌতূহল। পাও ভালোই। না পাও তবু এসো। তোমাদের মতো আধুনিক মনের ছেলেরদের সঙ্গে কথা বলেও আনন্দ।

এই এক নতুন হাঙ্গামা। উনি ভ্যামপায়ারের ওপর বই খুঁজছেন। সে বই এখানে কোথায় পাব? মনে পড়ল ক্লাস নাইন-টেনে পড়বার সময় প্রথম পড়েছিলাম ভ্যামপায়ার বা রক্তচোষা বাদুড়ের কথা। বইটা জন্মদিনে উপহার পেয়েছিলাম। খুঁজে দেখব যদি পুরোনো আলমারিতে কোথাও থাকে।

দু'দিন পর বইটা পেয়ে বেশ উৎসাহ সহকারেই ওঁর কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা দেখে উনি এমন ভাবে হেসে উঠলেন যে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। বললেন, এ তো ভ্যামপায়ার নিয়ে কিশোর-পাঠ্য গল্পের বই। এ বই নিয়ে কী করব? আমি চাই ভ্যামপায়ারের ওপর তথ্য।

হঠাৎ ভ্যামপায়ার নিয়ে ভাবনা-চিন্তা মাথায় চাপল কেন জিগ্যেস করতে গিয়েও সাহস পেলাম না। শেষে উনি নিজেই বললেন, তুমি অবশ্য ভূত-প্রেত-অশরীরী আত্মায় বিশ্বাসী নও। ও সব নিয়ে মাথাও ঘামাও না। তবু বলছি, সময়ের পরিবর্তনে ভূত-প্রেতদের ঠিকুজি-কুষ্ঠিও বদলে যাচ্ছে। আগে এদের দেখা যেত শ্মশানে, কবরখানায়। কখনও আসশ্যাওড়া গাছে পা ঝুলিয়ে বসে থাকত কিন্তু পোড়ো বাড়ির ন্যাড়া আলসেতে শুয়ে শুয়ে নিশাচর পাখি ধরে চিবোত। তারপর দ্যাখো, আগে স্বন্ধকাটা, কবন্ধভূত, ব্রহ্মদত্তি, শাঁকচুম্মি, গোছোভূত, মেছোভূত কত কী ছিল। এখন তারা পাততাড়ি গুটিয়েছে। তার বদলে দেখা দিয়েছে কালো বেড়াল, মরা বাঁদরের পা, কুকুর প্রভৃতি। কিন্তু বাদুড় কোন গুণে বেশির ভাগ ভূতের কাহিনিতে

জায়গা করে নিল সেটাই জানতে ইচ্ছা করে। সেইজন্য রক্তচোষা বাদুড়ের ওপর লেখা বই পড়ে দেখতে চাই। বুঝতেই পাচ্ছ, বাদুড় যদি ভূত হতে পারে, তাহলে চিল শকুন কাক ইঁদুর ছুঁচোর ভূত হতে বাধা কী?

ওঁর এই শেষের কথাগুলোয় হঠাৎ আমি এমনই চমকে উঠলাম যে পাদ্রীবাবার কাছে ঘটা করে বিদায় না চেয়েই হঠাৎ উঠে পড়লাম।

আজ যাই। বলেই বেরিয়ে পড়লাম। সারা পথ শুধু একটি কথাই মনে হতে লাগল— তাহলে সত্যিই কি বেড়াল, বাদুড়ের মতো চিল, শকুন, কাকের মধ্যে দিয়েও প্রেতাত্মার আবির্ভাব হতে পারে? আর তাই যদি হয়—

হঠাৎ যেন একটা জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তাতে যেমন সাময়িকভাবে স্বস্তি পেলাম, তেমনি নতুন ভয় শুরু হল। ইঁদুর দেখা যায় না, ইঁদুরের গর্তও চোখে পড়ে না। অথচ মাটি পড়ে থাকছে। কে তুলছে এই মাটি? কোথা থেকে তুলছে? যে-ই তুলুক সে যে ঠিক সাধারণ কোনো প্রাণী নয়, জগদীশ অ্যান্টনির মুখের আল্গা একটি কথাতেই তা পরিষ্কার হয়ে গেল। ইঁদুরও তা হলে ভূত হতে পারে।

লোকে শুনলে হাসবে কিন্তু এ ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না, পরের দিনই আমি মিস্ত্রি লাগিয়ে বেডরুম, কিচেন, দালান—সর্বত্র মেঝে খুঁড়িয়ে নতুন করে সিমেন্ট করে নিলাম। যাতে দৃশ্যই হোক আর অদৃশ্যই হোক ইঁদুরের লেজটুকুও দেখা না যায়।

নকুল বললে, এ কী কাণ্ড করলেন, দাদা? গোটা বাড়ি ভাঙবেন নাকি?

রেগে উঠে বললাম, দরকার হলে তাই ভাঙব—‘সমর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ।’ মানে বুঝলে?

নকুল অসঙ্কোচে স্বীকার করল মানে কিছুই বুঝতে পারেনি।

বললাম, এর মানে হল একই বাড়িতে সাপ নিয়ে বাস করলে মৃত্যু নিশ্চিত।

নকুল চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, আবার সাপ এল কোথা থেকে, দাদা?

## ॥ চার ॥

বাস্তবিক জগদীশ অ্যান্টনির মুখের ঐ একটি কথাই আমার মাথা গোলমাল করে দিল। আমি নিশ্চিত জানি বাদুড় কীভাবে ভূত হতে পারে—পাদ্রীবাবা এই তর্ক তুলতে গিয়ে এক নিঃশ্বাসে চিল, শকুন, ইঁদুর, ছুঁচোর কথাও বলে ফেলেছিলেন। বিশেষ করে ইঁদুরের ওপর জোর দেবার কোনো কারণ ছিল না। অথচ দ্যাখো, ইঁদুরের কথাটা কানে আসা মাত্র ওটা খটাস করে ব্রেনে লক্ হয়ে গেল। কেমন বন্ধমূল ধারণা হল বাড়িতে ইঁদুর তো ঢোকেনি, চুকেছে ইঁদুরের শরীর ধরে একটা অশুভ আত্মা।

আমি জানি এটা আর কিছুই নয়, ভৌতিক পরিবেশে বাড়িতে বসে থেকে থেকে মনের মধ্যে এক ধরনের দুর্বলতা তৈরি হয়ে গেছে। ছি ছি, শেষ পর্যন্ত ইঁদুরের ভয়ে গোটা বাড়ির মেঝে চটিয়ে ফেললাম! অথচ একটি ইঁদুরের লেজ পর্যন্ত কোনোদিন দেখা যায়নি। ঠিক করলাম এই দুর্বলতা আমাকে কাটিয়ে উঠতেই হবে। নইলে হয়তো পাগল হয়ে যাব।

আর আশ্চর্য যেদিন এই রকম প্রতিজ্ঞা করলাম সেই রাতেই ঘটল একটা ঘটনা। ঘটনাতা এইরকম—কেউ যেন আমার ঘরের দরজায় আস্তে আস্তে কড়া নাড়ছে—খট্—খট্—খট্—

চমকে উঠে বসলাম। তখনও কেউ কড়া নেড়েই যাচ্ছে—খটাখট্—খটাখট্—খটাখট্—



না, ভুল শোনা নয়। সত্যিই কেউ আমাকে ডাকছে। মশারির মধ্যে বসেই চাপা গলায় জিগ্যেস করলাম, কে?

উত্তর নেই। শুধু একটানা সেই শব্দ—খটাখট—খটাখট—খটাখট—

আশ্চর্য! এত রাত্রে কে ডাকছে? বাইরের কেউ নয়। বাইরের কেউ হলে বাড়ির মধ্যে ঢুকবে কী করে? নিশ্চয় এ বাড়িরই কেউ। সেই ‘কেউ’ নকুল ছাড়া আর কেই বা হতে পারে? চৈতাল্য, এত রাত্রে কী ব্যাপার, নকুল?

উত্তর নেই।

এবার হাঁকলাম, নকুল!

সাদা নেই। ধরার লোক না থাকলে টেলিফোনে যেমন রিং হয়েই যায় তেমনি কড়া নাড়া চলতেই লাগল। আমি প্রচণ্ড রাগে বিছানা থেকে নেমে দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম।

কে-এ-এ?

তখন মনে হল কড়া নাড়ার শব্দটা যেন আর কাছে নেই। আস্তে আস্তে দূরে চলে যাচ্ছে।

অ্যাঁ নকুল—বলে খিল খুলতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আশ্চর্য, খিলটা এতটা উঠে এল কী করে? আমি তো ভালো করে এঁটেই বসিয়েছিলাম। কেউ কি তাহলে বাইরে থেকে খিল খোলবার চেষ্টা করছিল? কিন্তু তাই বা সম্ভব কী করে? না, এ রহস্য আর সহ্য করা যায় না। মনের সমস্ত শক্তি একত্র করে খিলটা খুলে ফেললাম।

আবার সেই গা-হিম করা অন্ধকার বারান্দা। আমি কীসের তীব্র আকর্ষণে এগিয়ে চললাম। সামনে কিছু যেন ভেসে যাচ্ছে.... কী ওটা? একটা সাদা চাদর .... যেমন দেখেছিলাম সেদিন নকুলের ঘর থেকে জানলার ভেতর দিয়ে ভেসে যেতে।

হঠাৎ আমার পিছনে কার পায়ের শব্দ! তারপরই কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর। আমি পড়ে যাচ্ছিলাম—কে যেন আমাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রইল। বেঁচে গেলাম।

পরের দিন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল। সারা দেহে ব্যথা। নকুল এক বাটি গরম দুধ খাওয়ালো। ও যা বলল সংক্ষেপে তা এই—

অনেকক্ষণ ধরেই কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। প্রথমটা ঘুমের ঘোরে বুঝতে পারিনি শব্দটা কোথায় হচ্ছে। পরে নাম ধরে ডাকতেই ধড়মড় করে ওঠে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। দেখল আমি অন্ধকারেই টলতে টলতে চলেছি। আমার সামনে একটা সাদা চাদর বাতাসে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে। বুঝতে পারল আমার বিপদ। তাই আমার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। আমি চাদর লক্ষ করে নাকি শূন্যে লাফ দিয়েছিলাম। আর তখনই নকুল আমাকে আঁকড়ে ধরে ফেলেছিল।

তিন দিন বাড়ি থেকে বেরোতে পারিনি। কিছু চিন্তা করতে গেলেই মাথায় যন্ত্রণা। তাই শুয়ে ঘুমিয়ে, অর্ধজাগরণে বাড়িতে পড়ে রইলাম। ভাগ্য নকুল ছিল। নিজের ভাই-এর মতো ও সর্বক্ষণ আমার বিছানার পাশে। আবার নকুলকে দেখে অবাক হয়েছি। ওর মুখটা এত চেনা চেনা লাগছে কেন?

এক সপ্তাহ পর যখন উঠে বসতে পারলাম তখন প্রথম যে কথাটা মনে হল তা হচ্ছে—এটা কী হল? এতদিন যা হয় একরকম হচ্ছিল। যখন-তখন যেখানে-সেখানে ছায়া দেখা। সে আমার কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা মাত্রও করেনি। শুধু দেখা দিচ্ছিল। যেন ও যে কে

তা জানাতে চাইছিল। এতে শুধু কৌতূহলটাই বেড়েছিল। আর কিছু নয়। তারপর হঠাৎ নকুলকে আক্রমণ। কেন?

তারপর গভীর রাতে আমার বেডরুমে হানা। লুকিয়ে-চুরিয়ে নয় রীতিমতো কড়া নেড়ে। তারপর যেই দরজা খুললাম অমনি পালাল। কীভাবে পালাল? ছায়াশরীরটুকু নিয়েও নয়। হালকা চাদরের মতো শূন্যে ভাসতে ভাসতে। নকুল বলছে, আমি নাকি শূন্যে ভাসমান সেই চাদরটা ধরতে গিয়েছিলাম। আশ্চর্য! এতখানি বোকামি আমি করেছিলাম! আর তার পরিণতিতে সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত।

সে না হয় যা হবার তা হত। কিন্তু প্রেতাত্মাটির আসল ইচ্ছাটি কী? সেটা জানা সহজ হত যদি জানতে পারতাম তিনি কে?

ঠিক করলাম কাল সকাল থেকেই আবার সেই মৃতের তালিকাটি নিয়ে বসব। গত পাঁচ বছরে যারা মারা গেছে তাদের লিস্টটা আগে ফাইনাল করব। অবশ্য সেই সঙ্গে একটা ছোটো তালিকা করব ওদের মধ্যে যাদের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে তাদের। কারণ, প্রচণ্ড স্কোভ না থাকলে কোনো আত্মা বারে বারে এক জায়গায় হানা দেয় না। শুধু এক জায়গাতেই নয় বিশেষ একজনকেই টার্গেট করে আছে।

পরের দিন সকালে চা খেয়ে বাইরের ঘরে বসলাম মৃতের সেই অসমাপ্ত তালিকাটা নিয়ে।

এই ছোটো শহরেই অন্য একটা বাড়িতে আমার জন্ম। সেই বাড়ি থেকেই পড়াশোনা, খেলাধুলা। সেখানেই আসত আমাদের ক্লাসের বন্ধুরা। ক্যারাম খেলা হত। আর একটা খেলা ছিল গোলকধাম। কাজেই গত পাঁচ বছরে এখানকার কারা মারা গেছে তা খুঁজতে অসুবিধা হল না। ঝাড়াই-বাছাই করে দেখলাম ঐ সময়ের মধ্যে এখানকার ন’জন মারা গেছে। তার মধ্যে তিনজন আমার সমবয়সী, কিন্তু ঠিক বন্ধু নয়, পরিচিত। বাকি ছ’জন নানা বয়সের।

আজ পর্যন্ত আমি যা লক্ষ করে দেখেছি তাতে বুঝতে পেরেছি যে আত্মাটি আমাকে বার বার দেখা দিয়েছে (বরঞ্চ বলি হানা দিয়েছে) সে কোনো ধীরস্থির মানুষের আত্মা হতে পারে না। অনুমান—সে কোনো উঠতি বয়সের আত্মা।

এই ভাবে বাছাই করতে গিয়ে তালিকাটা বেশ ছোটো হয়ে গেল। খুশি হলাম। দেখলাম সন্দেহভাজনের এই তালিকায় তিনজনের নাম উঠে আসছে। তিনজনেই আমার জানাশোনা, উঠতি বয়সের। তিনজনেই ছিল একটু রাগী স্বভাবের। কাজেই এদের যে কেউ একজন হতে পারে। তিনজনের মধ্যে একজনই মরেছে অপঘাতে। সাপে কামড়ে ছিল। সাপের কামড়ে মৃত্যুকে অপঘাত বলে কিনা ঠিক জানি না। অবশ্য অপঘাতে মৃত্যু হলেই যে ভূত হবে এর কোনো মানে নেই। স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এমন বহুজনের আত্মা প্রেত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে বহুকাল। অতএব—

আর একটা ক্রু পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে। আমি তো কয়েকবার আত্মাটির আকার লক্ষ করেছি। দেখেছি তার হাইট প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট। এখন যে তিনজনকে আমি শেষ পর্যন্ত সন্দেহের তালিকায় রেখেছি তাদের মধ্যে কার হাইট সাড়ে পাঁচ ফুটের কাছাকাছি চোখ বুজে একটু ভাবলেই ধরতে পারব।

সেই রকম চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনজনের হাইট কীরকম গোলমাল হয়ে গেল। অর্থাৎ রামের হাইট শ্যামের গায়ে, শ্যামের হাইট যদুর কাঁধে। মুশকিলে পড়লাম। কী করব ভাবছি, দরজায় শব্দ। উঃ এখন আবার কে এল? যত বাধা—

কে? বিরক্তিবারা গলায় হাঁকলাম, ভেতরে আসুন।

যিনি ভেতরে ঢুকলেন তাঁকে দেখেই অবাক হলাম। খুশি তো হলামই।

আপনি! আসুন-আসুন। কী সৌভাগ্য! হাসিমুখে ঘরে ঢুকলেন জগদীশ অ্যান্টনি মশাই।

## ॥ পাঁচ ॥

আমাদের এখানে বর্তমানে খ্রিস্টান পরিবার অল্পই। কিন্তু ইতিহাস হচ্ছে এই—১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাঙালির শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার শোচনীয় পরাজয়ের পর ইংরেজরা যখন এই বাংলাদেশের মাটিতেই ঘাঁটি গেড়ে বসল তখন থেকেই মোটামুটিভাবে বলা যায় এ দেশে খ্রিস্টানদের বসবাস শুরু। তারপর ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হল। এই কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল, যেহেতু এ দেশেই সাহেবসুবোধের করে খেতে হবে সেহেতু সর্বাগ্রে দরকার বাংলা শেখা। বাংলা না শিখলে বাঙালিদের সঙ্গে মিশবে কী করে? সেই কারণেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ তৈরি।

একদিকে যেমন ইংরেজরা বাংলা শিখতে শুরু করল, অন্যদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অফিসে চাকরি পাওয়ার তাগিদে বাঙালিদেরও ইংরিজি শেখার তাড়াহুড়া পড়ে গেল। সেই সঙ্গে শুরু হল এ দেশের মানুষের কাছে দয়াল প্রভু যিশু খ্রিস্টের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কাজ।

এই উপলক্ষে দেশের সর্বত্র গির্জা তৈরি হল। নানা জায়গা থেকে আসতে লাগল সংসারত্যাগী পাদ্রীরা। এই পাদ্রীদের মধ্যে অধিকাংশদের জীবন ছিল সংযত, পবিত্র। তাঁদের স্বভাব ছিল ধীর, স্থির, শান্ত। তাঁরা যিশুর মতোই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ছোটোদের কাছে টেনে নিতেন। ফলে সাধারণ গেরস্ত পরিবারগুলি পাদ্রীদের খুব শ্রদ্ধা করত। পাদ্রীদের প্রভাবে এ দেশে বহু দরিদ্র, অল্পশিক্ষিত মানুষ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করল। আশা ছিল, দুঃখ-দুর্দশায় ইংরেজরা তাদের দেখবে। হয়তো খুব বেশি সাহায্য পাওয়া যেত না তবে এই সব দরিদ্র অবহেলিত মানুষদের তাঁরা অনেক কাছে টেনে নিয়েছিলেন।

আমাদের এখানে শহরের প্রায় বাইরে যে প্রাচীন গির্জাটি আছে সেটির প্রতিষ্ঠা করেছিল চার্চ অফ স্কটল্যান্ড মিশন ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে।

চার্চ তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় খ্রিস্টধর্মীরা নিয়মিত ধর্মচর্চার জন্যে নিজেদের মতো করে একটি পবিত্র আশ্রয় পেলেন। দূর দূর গ্রাম থেকেও খ্রিস্টভক্তরা প্রতি রবিবার এই চার্চে প্রেয়ারে যোগ দেবার জন্যে আসতে লাগলেন।

আমরা খ্রিস্টান ছিলাম না। তবু বাবার এই সব স্থানীয় খ্রিস্টান বন্ধুরা খুব সহজেই আমাদের বাড়ি আসতেন। আমরাও খোলা মনে তাঁদের গ্রহণ করতাম। এখানেই প্রথম দেখি একজন লম্বা, কালো স্বাস্থ্যবান মানুষকে যাঁর সঙ্গে বাবা হ্যান্ডশেক করতেন। বাবার এক বন্ধু আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। ঐর নাম ফাদার জগদীশ অ্যান্টনি। সম্প্রতি কৃষ্ণনগর থেকে এখানকার পাদ্রী হয়ে এসেছেন।

তাঁকে প্রথম দেখেই আমার ভালো লাগেনি। কারণ অন্যরা ধুতি-পাঞ্জাবি, শাল গায়ে দিয়েছিলেন, আর উনি সাদা ফুলপ্যাণ্টের ওপর পরেছিলেন কালো লম্বা একটা জোকা। তাঁর গলায় যে রূপোর ক্রসটা ঝুলত সেটাও ছিল পেছায় বড়ো, তা ছাড়া তাঁর চওড়া চোয়াল, চ্যাপ্টা মুখের ওপর ডাবডেবে দুটো চোখ আমার ভয়ের উদ্বেক করত।

জগদীশ অ্যান্টনি তখন থাকতেন, সেই চার্চের পাশে একটি ঘরে একা। সেখান থেকে

বিকলে হাঁটতে হাঁটতে আসতেন গঙ্গার ধারে। কখনও আমাদের বাড়ি বাবার কাছ। ছোটবেলা থেকে তাঁকে দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আর ভয় পেতাম না। চেহারা অসুরের মতো হলেও মানুষটা সত্যিই ভালো।

তিনি বেশ কয়েক বছর আমাদের বাড়ির কাছেই বাড়ি ভাড়া করে আছেন তবু কখন কোথায় যান তা লক্ষ করিনি। লক্ষ করার দরকার হয়নি। তাছাড়া, তখন আমার যৌবনকাল। খেলাধুলা, গানবাজনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। একজন বাপের বয়সী মানুষকে নজরদারি করার মানসিকতা আমার ছিল না। কাজের লোকের কথায় গুরুত্ব দিইনি। এখানে প্রথম এসে পর্যন্ত ঐ চার্চে তিনি থাকতেন। একাই থাকতেন। চারিদিকে জঙ্গল। কাছেই বহু কালের পুরোনো খ্রিস্টানদের কবরস্থান। খুব দরকার না হলে বিকলেও কেউ ওদিকে যায় না। সন্দের পর গা ছম্ছম্ করে তবু তিনি থাকতেন। নিশ্চয় তাঁর ভয় করত না। তিনি বিশ্বাস করতেন তিনি একা নন। তাঁর সঙ্গে অদৃশ্য ভাবে রয়েছেন সদাপ্রভু যিশু। আর গলায় ঝুলছে রূপোর ক্রস। তা সেই বহুদিনের পরিচিত জায়গায় তিনি যখন খুশি, যতবার খুশি যেতেই পারেন। কার কী?

এইরকম সময়ে একদিন একটা ঘটনা স্বচক্ষে দেখে পাদ্রীবাবার ওপর একটা বিশেষ ধারণা তৈরি হয়ে গেল।

সেদিন বিকলে আমার এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম। যেখানে গিয়েছিলাম সেখান থেকে চার্চটা বেশি দূরে নয়। খোয়াওঠা ধুলোভরা মেন রোড থেকে যে পায়ে-চলা পথটা ডানদিকে নেমে আমবাগানের মধ্যে দিয়ে বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে মিশেছে, সেখানেই চার্চটা তার জীর্ণ ভগ্নদশা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার একটু দক্ষিণে এগোলেই দেখা যাবে অনেকগুলো স্বেত পাথরের ফলক মাটিতে পৌঁতা। এগুলোই এখানকার খ্রিস্টানদের কবরে এক-এক জনের স্মৃতিফলক। হঠাৎ মনে হল পাদ্রীবাবা প্রায়ই তো এই সময়ে এখানে আসেন। দেখি না গিয়ে আজও এসেছেন কিনা।

বন্ধুকে নিয়ে গির্জার চত্বরে গিয়ে দাঁড়িলাম। সন্দের অন্ধকার ধীরে ধীরে বাদুড়ের ডানার মতো নেমে আসছে। একটা ঢ্যাঙা দেবদারু গাছের মাথায় সিঁদুরের ছোঁয়ার মতো এক চিলতে রোদ লেগেছিল। পাশের চাঁপাবনের ওপর থেকে একঝাঁক পাখি যেন ভয় পেয়ে পাখা ঝাপটে উড়ে পালাল।

আমরা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম পাদ্রীবাবা নেই। কিন্তু গির্জার পাশেই তাঁর ছোটো ঘরটার জানলার এক পাট খোলা। বুঝলাম উনি এসেছেন। আশ্চর্য! এই সন্কেবেলা কোথায় বেড়াতে গেলেন!

আমি চোঁচিয়ে ডাকলাম, মিস্টার অ্যান্টনি! আমার গলার স্বরে চকিত হয়ে একটা শেয়াল সামনে দিয়ে ছুটে পালাল। আবার ডাকলাম, মিস্টার অ্যান্টনি।

ও! আপনি! এই যে যাই। বলে কবরস্থানার পিছন থেকে পাদ্রীবাবা হাসতে হাসতে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পরনের পাজামা আর গেঞ্জি ধুলোয় ভর্তি। আর হাতে একটা কোদাল।

হঠাৎ এই সন্কেবেলা এখানে! জিগ্যেস করলেন পাদ্রীবাবা।

বললাম, এদিকে বেড়াতে এসেছিলাম। ভাবলাম যদি আপনি এসে থাকেন, একবার দেখা করে যাই।

ভালো করেছেন। তবে দেখা পেতেন না। আমি এতক্ষণ বেরিয়াল গ্রাউন্ডের ঝোপ-জঙ্গল সাফ করছিলাম।

আপনি সাফ করছিলেন কেন? করার লোক নেই?

জানি না। থাকার তো কথা। কিন্তু কাউকেই তো দেখতে পাই না। তাই বাধ্য হয়ে আমাকেই কোদাল, গাঁইতি নিয়ে সাফ করতে হয়।

আপনি তো না করলেই পারেন। আপনি পাদ্রী। আপনার অনেক সম্মান।

পাদ্রীবাবা হেসে বললেন, শুধু সম্মানই নয়, অনেক দায়িত্ব, বাবা। এটা কার কাজ এ নিয়ে তর্ক করা আমার মানায় না। এ জায়গা অতি পবিত্র। সেই পবিত্রতা আমাকেই বজায় রাখতে হবে। কিন্তু আপনারা টর্চ এনেছেন তো, বাবা! বড্ড অন্ধকার। সাপ-খোপের ভয়ও আছে।

বললাম, না, টর্চ না আনলেও ঠিকই চলে যাব। আর সাপের ভয়? আপনি যদি এই অন্ধকারে এখানে-ওখানে চলাফেরা করতে পারেন, তাহলে আমরাই বা পারব না কেন?

উনি কোনো উত্তর দিলেন না। এগিয়ে এসে আমাদের দুজনের মাথায় গলার বড়ো ক্রসটা ঠেকালেন।

আমার গা-টা কেমন শিরশির করে উঠল। একটা হিমশ্রোত বয়ে গেল মেরুদণ্ড দিয়ে।

নিরাপদেই বাড়ি ফিরে এলাম। নতুন করে পাদ্রীবাবার কথা ভাবতে চেষ্টা করলাম। চার্চের এবং বেরিয়াল ফিল্ডের সংলগ্ন জায়গার পবিত্রতা রক্ষা করার দায়িত্ব কি শুধু তাঁর? তিনি যে এত নির্ভর্য তা কি শুধু ঐ পবিত্র ক্রসের প্রভাবে? কিন্তু ঐ ক্রস কি বাঁচতে পারে বিষাক্ত সাপের ছোবল থেকে? পারে হয়তো। না, আমরা কল্পনা করতে পারি না। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে গেল।

তবু—

তবু কাঁটা খচখচ করেই লাগল।

এক নম্বর—তিনি কেন আমাদের অন্যদিন বেলাবেলি আসতে বললেন না একবারও?

দু'নম্বর—সন্দেহ হয়ে গেছে। তবু যে ঘরটায় তিনি বসেন সেটা অন্ধকার। তখনও আলো জ্বালা হয়নি। আলো জ্বালানো হবে তো? নাকি তিনি অন্ধকারেই চলাফেরা করবেন?

আশ্চর্য! অথচ যখন আমাদের পাড়ায় থাকেন তখন আলাদা মানুষ—একেবারে সাধারণ স্বাভাবিক জীবন।

যাই হোক, এ সব ভেবে লাভ নেই। পাদ্রী সাহেব আমার বাবার বন্ধু। পিতৃতুল্য। তাঁকে যেন চিরদিন শ্রদ্ধা করেই যেতে পারি।

## ॥ ছয় ॥

একেবারে ঘরোয়া পোশাকে এসে বসলেন পাদ্রীমশাই। পরনে ধুতি লুঙ্গির মতো করে পরা। গায়ে ফতুয়া।

মন দিয়ে কীসের তালিকা করছেন? নিমন্ত্রিতদের লিস্ট নাকি? দেখবেন আমি যেন বাদ না পড়ি।

হেসে বললাম, এটা যদি নিমন্ত্রিতদের তালিকা হত তাহলে অন্তত আপনি বাদ পড়তেন না। আপনার চেয়ে কাছের মানুষ আমার আর কেউ নেই।

উনি গম্ভীর ভাবে বললেন, আপনি তো এখনও ছেলেমানুষ, অভিজ্ঞতা নেই। তাই জানেন না কাছের মানুষরাই বাদ পড়ে যায়।

এই একটা বদ অভ্যাস ভদ্রলোকের। তাঁর ছেলের মতো হলেও কিছুতেই আপনি ছাড়া কথা বলবেন না। আপত্তি করলে বলেন, আমি তো সেকালের মানুষ। আর কিছুতে না হোক অন্তত কাথায়-বার্তায় ছোটোদেরও সম্মান দেখাতে হয়। কাজেই ‘তুমি’, ‘তোমার’ সঙ্গে যে ‘আপনি’ ‘আজ্ঞে’ করি সেটা ধরবেন না। ওটা আমার মুদ্রাদোষ।

আমি কথা ঘোরাবার জন্যে বললাম, আজ তো রবিবার। সকালে প্রেয়ার ছিল। চার্চে যাননি?

গিয়েছিলাম বৈকি। কাজ শেষ করেই বাড়ি ফিরে এসেছি। হ্যাঁ, বাদুড়ের ওপর বইটার কথা যেন ভুলে যাবেন না, ভাই। ওটা আমার খুব দরকার। আপনি যখন কলকাতায় যাবেন, কলেজ স্ট্রিটে বইটার খোঁজ করবেন। ‘বাদুড়’ নামে হয়তো পাবেন না। ‘প্রাণীজগৎ’—এ ধরনের কোনো বই বাংলাতেই হোক কিংবা ইংরাজিতেই হোক দয়া করে একটু খোঁজ করবেন। বেশি দাম হলেও নেবেন। এই একশো টাকা রাখুন।

বললাম, টাকা এখুনি দিতে হবে না। আমার মনে থাকবে।

তখনই মনে হল পাদ্রীবাবাকে যখন হাতের কাছে পাওয়া গেছে তখন ইঁদুরের ব্যাপারটা জেনে নেওয়া যাক। অন্তত একজন ঠিক ব্যক্তির অভিমত জানা যাবে। মতলবটা মাথায় খেলতেই তাঁকে বিনীতভাবে বললাম—একটা কথা আপনার কাছ থেকে পরিষ্কার করে জেনে নিয়ে ইচ্ছে করছে। যদি বিরক্ত না হন—

উনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, না না, বিরক্ত হব কেন? বলুন।

আমি তখন আমার বক্তব্যটা মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে বলে গেলাম। শেষকালে যোগ করলাম, আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন বাদুড়, কালো বেড়াল-এর মতো ইঁদুরের মধ্যে দিয়েও ভৌতিক খেলা চলতে পারে?

উনি প্রথমে একটু হাসলেন। তারপর বললেন, যে কারণে বাদুড়ের ভূত হওয়া সম্ভব সেই একই কারণে ইঁদুরও ভূত হতে পারে। তবে কোন কোন বৈশিষ্ট্য বাদুড়, কালো বেড়াল শয়তানের চর হয়ে ওঠে সেটা যেমন আমরা জানি না তেমনি ইঁদুর, ছুঁচো, চিল, শকুনের বৈশিষ্ট্যও জানা নেই।

আপনি বলতে চাচ্ছেন ‘ইঁদুর ভূত’ ব্যাপারটা অসম্ভব কিছু না?

এই পৃথিবীতে রহস্যের শেষ নেই ভাই। মানুষ যতই বলুক আমি শেষ দেখবই, সেটা হবে তার মিথ্যে অহংকার। অনেক কিছুই সম্ভব।

একটু থেমে বললেন, কেন ইঁদুর নিয়ে কোনো সমস্যা হয়েছে নাকি?

ছোটো কোনো স্টেশনে অনেকক্ষণ ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকার পর সিগন্যাল পাওয়া মাত্রই গাড়ি যেমন ছুটতে থাকে তেমনি পাদ্রীবাবার সম্মতি পাওয়া মাত্র আমার কথা শতধারায় ছুটতে লাগল। কোথাও যে একটু থামা দরকার তাও খেয়ালও রইল না।

কথা শেষ করে একটু জিরিয়ে নিয়ে বললাম, এই হল ব্যাপার। আজ ক’রাত্রি ভয়ে ঘুমোতে পারি না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে পায়ের চেটোয় হাত বোলাতে বোলাতে পাদ্রীবাবা বললেন, সব কিছুই তো ভয় থেকে উৎপন্ন। তাই—

কিন্তু ভয়েরও একটা কারণ থেকে যাচ্ছে না? শুধু শুধু তো আর ভয় পাচ্ছি না। পাদ্রীবাবা বললেন, তা হয়তো কিছুটা ঠিক, তা বলে মেঝেতে, দালানে মাটি দেখেই যদি ইঁদুর-ভূতের কাণ্ড ভেবে নেন তাহলে বেচারি ইঁদুরের ওপর অবিচার করা হবে। তাহলে?

মাটিটা যেমন সত্য, ইঁদুর না থাকাটাও তেমনি সত্য। মনে হয় মাটির ব্যাপারে অন্য কারও হাত আছে।

বিশ্বয়ের ধাক্কা সামলাতে না পেরে নড়েচড়ে বসলাম।

আবার কার হাত?

সেটাই লক্ষ রাখুন। আচ্ছা একটা অন্য কথা জিগ্যেস করি। আপনি কি আগে গানবাজনা করতেন?

যা বাবাঃ! কী কথা হচ্ছিল, কোন কথায় এসে পড়া গেল। সামলে নিয়ে বললাম, হ্যাঁ। করতাম। সে অনেক দিন আগে। সাবেক বাড়িতে থাকতে। তখন সব ম্যাট্রিক দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে? তখন তো আপনি আমাকে চিনতেন না।

পাদ্রীবাবা একটু হেসে আঙুল দিয়ে দেওয়ালের গায়ে সব থেকে উঁচু তাকটা দেখিয়ে দিলেন। পুরোনো বাড়ি ছেড়ে এ বাড়িতে এসেছি, এক সেট বাঁয়া-তবলা একরকম ‘পরিত্যক্ত’ অবস্থায় কাপড় জড়িয়ে একেবারে চোখের আড়ালে রেখে দিয়েছিলাম। পাদ্রীবাবারই চোখে পড়ল!

সলজ্জ হেসে বললাম, আপনি ঠিক লক্ষ করেছেন তো?

পাদ্রীবাবা হেসেই বললেন, কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি। অবশ্য প্রশ্ন আরও আছে। গানবাজনা যে করতেন তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু ছাড়লেন কেন? তাও ছেড়েছেন যেন আর কোনোদিন ওগুলো ছোঁবেনই না প্রতিজ্ঞা করে। তাই না? সে প্রতিজ্ঞা আজও রক্ষা করে চলেছেন। কী ব্যাপার আপত্তি না থাকলে বলুন।

আমি বোবা হয়ে গেলাম। সত্যি ক্ষমতা আছে পাদ্রীবাবার। আজ হঠাৎ এসেই এমন জায়গায় লক্ষ পড়ল যেখানে আর কেউ তাকায়ওনি। শুধু লক্ষ পড়াই না, উনি একেবারে শেকড় ধরে টানতে শুরু করেছেন। জীবনের যে চ্যাপ্টারটা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলাম, সেই পরিত্যক্ত জীর্ণ পাতাগুলোই পাদ্রীবাবা নেড়েচেড়ে দেখতে চান। কিন্তু—কেন? নিছকই কৌতূহল, না অন্য কোনো রহস্য আছে?

বললাম, কিছুমাত্র না। আসলে গানবাজনা ছেড়ে দেবার পেছনে—

বুঝতে পারছি তীব্র অভিমান আছে।

না, অভিমান, রাগ, দুঃখ এসব কিছু নয়—

তা হলে?

॥ সাত ॥

পাদ্রী জগদীশ অ্যান্টনির কাছে সেদিন আমার গানবাজনা চর্চার ইতিকথা তুলে ধরেছিলাম। আমাদের পরিবারে গানবাজনার চর্চাটা ছিলই। কেউ যে খুব নামকরা গায়ক বা বাজিয়ে হয়ে উঠতে পেরেছিলেন তা নয়। তবে বাড়িতে বসে নির্দোষ আনন্দ করার উপায় ছিল এই গানবাজনা।

আমি ভালো গাইতে না পারলেও মোটামুটি সুরজ্ঞান, তালজ্ঞান ছিল। আমার যেমন গায়ক হবার কথা ছিল না, তেমনি বাজিয়ে হয়ে ওঠবার পেছনেও কোনো কারণ ছিল না। তবে কিনা পুরোনো আলমারির একেবারে নীচের তাকে এক জোড়া বাঁয়া-তবলা দেখে সেটা বাজতে ইচ্ছে করত। কিন্তু যেহেতু সেটা আমার ঠাকুরদার শখের জিনিস ছিল, আর ওতে হাত দিতে সবাই বারণ করত তাই চোখের দেখা ছাড়া হাত দিতে সাহস হত না।

তারপর যখন বড়ো হলাম অর্থাৎ নাইন-টেনে পড়ছি তখন আলমারি খুলে বাঁয়া-তবলাটা দেখে মনে হল—আরে! এমন ভালো জিনিসটা পড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দেখি না যদি বাজানো শিখতে পারি। এতে পরলোকগত দাদু রাগ করবেন কেন?

সেদিনই বাঁয়া-তবলাটা বের করে দাদুর উদ্দেশে প্রণাম করে তবলায় একটা আশ্তে করে চাঁটি দিতেই যেন তবলার ওপর সুরের ঢেউ খেলে গেল। তারপরে যখন প্রথম বোল ‘তেরে কেটে তাক’ বাজাতে পারলাম তখন আমার আনন্দ দেখে কে?

এইভাবে রোজ আধঘণ্টা করে বাজাতে বাজাতে একদিন ভালো তবলা-বাজিয়ে হয়ে উঠলাম। কারো কাছে না শিখেই। কী করে তা সম্ভব হল, জানি না। হয়তো দাদুর আশীর্বাদ। ব্যাপারটা অসম্ভব জানি তবু ...

আমাদের জায়গাটি নিতান্তই ছোটো। কিন্তু গানবাজনা হতই। আর হত স্টেজ বেঁধে থিয়েটার। তখনও মফঃস্বলে সিনেমার চল হয়নি। পুজোটুজো উপলক্ষে ছেলেরা মিলে থিয়েটার করত। আর থিয়েটার মানেই কনসার্ট, বাজনা থাকবেই। এখানে যে ক’জন তবলচি ছিল তাদের মধ্যে আমাকেই সকলে বেশি পছন্দ করত। তবলার ওপর আমার আঙুল যত দ্রুত খেলত তেমন আর কারো নয়। ফলে গানবাজনার আসর বসলেই সবার আগে আমার ডাক পড়ত।

এই রকম একটা ঘরোয়া গানের আসরে আমি প্রথম দেখেছিলাম চারু বিশ্বাসকে। অদ্ভুত ছেলোটা।

সন্ধ্যায় গানের আসর বসেছে। আমরা সাত-আটজন বন্ধু। অখিল বলে একটি ছেলে গাইছিল। আমি সঙ্গত করছিলাম। হঠাৎ দরজা ঠেলে কারও অনুমতি না নিয়ে যণ্ডামার্কী একটা ছেলে এসে একেবারে আমাদের মাঝখানে বসে পড়ল। সে ঢুকেছিল কাঁপা কাঁপা ঘাড় নিয়ে। তার মুখটা যে কী ভয়ঙ্কর না দেখলে বোঝানো যাবে না। নাক আর কপালের মাঝখানটা বসা। যেন বড়ো কোনো অপারেশন হয়েছিল একসময়। ডান দিকের ভুরুটা উঠে আছে কপালের ওপর পর্যন্ত। বাঁ ভুরুটা তলিয়ে গেছে বাঁ চোখের কোণে। গোটা মুখটা যে ক্ষতবিক্ষত তা নয়, অমসৃণ—এবড়ো-খেবড়ো। মনে হল তার মুখের চামড়াটা যেন গোটানো। এরকম ভয়ংকর মুখ এর আগে দেখিনি।

ওকে দেখে এ বাড়ির ছেলেরা ছাড়া আর সবাই হৈ হৈ করে উঠল—কী চাই? কী চাই?

ও মাথা কাঁপিয়ে বলল, আমি গান করব।

ইস্! গান করবে! যা ভাগ। পালা।

ও বাড়ির ছেলে মোহন ইশারায় সবাইকে থামতে বলে চারুকে বলল, তুই ঐ ওখানে গিয়ে বোস।

চারু মাথা গরম করে বলল, আমায় গাইতে দিতে হবে। নইলে—



নইলে কী করবি তুই? আমাদের মধ্যে একজন তেড়ে যাচ্ছিল, মোহন থামিয়ে দিয়ে বলল, ঠিক আছে। তুমি গাইবে। আমি ব্যবস্থা করে দেব। তবে একটার বেশি নয়।

চারু কিছুটা শান্ত হয়ে দূরে চৌকিতে গিয়ে বসল। ঐটুকু যেতেও সে বেঁকে বেঁকে যাচ্ছিল। কী করে যে একা একা পথ হাঁটে কে জানে! চৌকিতে বসে সে ঘাড়টা একবার এদিক একবার ওদিক করতেই থাকল।

মোহনকে নিচু গলায় জিগ্যেস করলাম, কে ও? চেন?

মোহন বলল, ওর বাবা বর্ধমান রাজস্টেটের ম্যানেজার। এরা খ্রিস্টান। এখানে রাজবাড়ির সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে সবে এসেছে। ছেলেটি জড়বুদ্ধি। ওকে নিয়ে ওর বাবার অনেক যন্ত্রণা। তবে গানের গলা আছে।

গান চলতে লাগল। আর চৌকিতে বসে চারু ঘাড় নেড়ে, হাতে তাল দিতে লাগল। হঠাৎ তার খেয়াল হল গানের আসর ভাঙার মুখে। অনেকেই উঠে গেছে। তখনই চৌকি থেকে লাফ দিয়ে হারমোনিয়ামটা কেড়ে নিয়ে বাজাতে লাগল। দু'বার রিড টিপেই গান ধরল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হুকুম করল, বাজাও!

তার বলার ভঙ্গিতে রাগ হল। আমি বাজালাম না।

এরপর যা ঘটল তা বলবার নয়। চারু হারমোনিয়াম ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পা দিয়ে শতরঞ্জি ঠেলে দিতে লাগল। কাপ, ডিশ, গেলাস উল্টে একাকার।

আমাকে ইনসান্ট! অ্যাই মোহন, এই ছোকরা তোদের বন্ধু?

মোহন খুব বুদ্ধিমান আর শাস্ত প্রকৃতির। চারুর হাত ধরে টেনে বসিয়ে বললে, আর্টিস্টদের মাথা গরম করতে নেই!

সাপের মাথায় যেন মস্তপড়া শেকড় পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চারু জল। হেসে বলল, ঠিক বলছ আমি আর্টিস্ট?

মোহন বলল, শুধু আমি কেন? সবাই বলছে তুমি আর্টিস্ট। নাও ঠান্ডা মাথায় গান ধরো।

চারু হারমোনিয়াম টেনে নিল। মোহন ইশারা করে আমাকেই বাজাতে বলল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাজাতে হল।

আসল কথা হচ্ছে, এক-একজন এমন মানুষ আছে যাকে দেখলেই মেজাজ খিঁচড়ে যায়। চারু সেই রকম একজন। ওর মুখটা যে কী ভয়ংকর তা আপনি না দেখলে ভাবতে পারবেন না ফাদার।

মুখটা কি ওর জন্মগত, না জটিল কোনো অপারেশনের ফল? জিগ্যেস করলেন পাদ্রীবাবা। বললাম, জানি না। সেদিনই ওকে প্রথম দেখেছিলাম।

পাদ্রীবাবা একটু ভেবে বললেন, মনে হয় ওটা জন্মগত। জন্মগত বলেই মুখের ছাপ ওর স্বভাবে এসে পড়েছে।

একটু থেমে বললেন, শুধু আমাদের দেশেই নয়, অন্য দেশেও দেখা গেছে মা-বাপের অজান্তে কোনো অশুভ আত্মা জন্ম নেয়। যেমন মহাপুরুষদের ক্ষেত্রে পুণ্যত্বারা এসে পড়েন। কে কখন আসেন সামান্য মানুষ তা জানতে পারে না। বিজ্ঞান এখানে পরাস্ত। আপনাদের চারু বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও তেমনি হয়েছিল। তার জীবনটা চালাচ্ছিল একটি ভয়ংকর অশুভ আত্মা।

আমি বললাম, মোহনের কাছে শুনেছিলাম, ওকে জন্ম দিয়েই ওর মা মারা যান। তারপর যখন ওর বয়েস বছর পাঁচ ওর বাবা আবার বিয়ে করেন। কিন্তু এই ছেলেকে ওর সৎমা মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। নতুন বিয়ের পরই ওঁরা পুরীর রথযাত্রা দেখতে গেলেন। সেখানে ভিড়ে হাত ফস্কে চারু হারিয়ে যায়। কেউ কেউ বলে ওর সৎমা নাকি ইচ্ছে করেই চারুকে ভিড়ের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আসেন। বাবা চাইলেও ওর সৎমা পুলিশকে জানাতে দেননি।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! দিন দশেক পরে ঐ পাঁচ বছরের ছেলে নিজেই বাড়ি ফিরে আসে। ঐটুকু ছেলের এমনই অভিমান যে, কী করে আসতে পারল তা কাউকে বলল না। বাড়ি ফিরে এসে সে আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল। তার সৎমার ওপর রাগ, তার বাবার ওপর রাগ। রাগ সমবয়সী সব ছেলেদের ওপর। আমি যতটুকু জানতে পেরেছিলাম—তা হল ঐটুকুই।

পাদ্রীবাবা গভীর ভাবে বললেন, এই জনোই ওর এই পরিণতি। যাক, আপনার সঙ্গে ওর সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত কী রকম দাঁড়াল বলুন।

বললাম, সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। ছেলেটাকে পছন্দ না করলেও যেমন আমি ওর গান পছন্দ করতাম, তেমনি ও-ও আমাকে পছন্দ না করলেও আমার বাজানোটা পছন্দ করত। ও চাইত ও যখনই যেখানে গান করবে তখনই আমি যেন ওর সঙ্গে থাকি। এ এক ধরনের অর্ডার। মোহনদের বাড়ি গেলে আমরা ভয়ে ভয়ে থাকতাম এই বুঝি ঝড়ের মতো চারু এসে হাজির হল!

ক্রমশ চারু আমার উপর জুলুম শুরু করল। যখনই ও গাইবে তখনই আমাকে বাজাতে হবে। শুধু মোহনের বাড়িতেই নয়, অন্য কোথাও গাইতে গেলে ও ওদের বাড়ির কাজের লোকের হাত দিয়ে চিঠি পাঠাত, ‘অমুক দিন আমার সঙ্গে যাবে। কোনো অজুহাত শুনব না।’

এ তো অনুরোধ নয়, আদেশ! রাগে গা জ্বলে যেত। বেশির ভাগ সময়ে ছলছলো করে এড়িয়ে যেতাম।

এড়িয়ে যেতেন কেন? আপনিও তো আর্টিস্ট। প্রশ্ন তুললেন পাদ্রীবাবা।

বললাম, ও হয়তো মন্দ গান করত না। কিন্তু তার সেই পাথরের মতো খসখসে, উঁচু-নিচু মুখ, সাপের মতো হিম দৃষ্টি আমি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারতাম না। তাছাড়া ওর কুচুটে মনের পরিচয় যে কেউ পেয়েছে সেইই এড়িয়ে চলত। কথায়-বার্তায় এতটুকু নম্রতা ছিল না। নিজেকে যে কী মনে করত তা ওই জানত। আমাদের মনে হত, ও আমাদের ওর বাবার মাইনে করা কর্মচারী মনে করত। তাই কখনও অনুরোধ করত না। করত আদেশ।

আর আমি যখনই ওর ডাকে সাড়া দিইনি তখনই ও আমার বাড়িতে এসে হুমকি দিয়ে গেছে। আপনি ওকে, ‘শিল্পী’ বলে সম্মান করছেন, কিন্তু এই কি শিল্পীর আচরণ?

একটু চূপ করে থেকে পাদ্রীবাবা বললেন, কী করে আপনারা সম্পর্ক ছিল হয়ে গেল সেই কথাটা বলুন।

বললাম, আমি ওকে ছাড়তে চাইলেও ও আমাকে ছাড়তে চাইত না। আমি দেখলাম যেমন করে হোক ওর সঙ্গে বাজানো আমাকে বন্ধ করতেই হবে। তাই একটা ফাংশানে গিয়ে বাজাতে বাজাতে তাল কেটে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ও রাগে ফেটে পড়ল। হারমোনিয়াম ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমার বাঁয়া-তবলা ভেঙে দেবার জন্যে তাড়া করে এল। আমি কোনোরকমে

সে দুটি বুকো আগলে পালিয়ে এলাম। ঠিক করলাম, আর কখনও ওর ত্রিসীমানায় যাব না।

কিন্তু এর পরই একটা ঘটনায় আমি চমকে উঠলাম। সেই সপ্তাহেই একদিন ঘুম থেকে উঠে বাইরের ঘরে ঢুকে দেখলাম জানলার শিকণ্ডলো দুমড়ানো। কী হল? চোর ঢুকেছিল? কিন্তু বাইরের ঘরে কী পাবে? এ বাবা! বাইরের দরজায় খিলও খোলা!

বেশিক্ষণ ভাবতে হল না। হঠাৎ আলমারির মাথায় চোখ পড়ল। কেমন ফাঁকা ফাঁকা। ওপরেই বাঁয়া-তবলাটা তোলা থাকে। চারুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য ওগুলোকে বাড়ি নিয়ে এসে কোনোরকমে আলমারির মাথায় রেখে দিয়েছিলাম। চোর হঠাৎ বাঁয়া-তবলা নিয়ে গেল কেন? তবলা শিখবে নাকি?

হঠাৎ লক্ষ পড়ল আলমারির নীচে একটুকরো কাগজ ভাঁজ করে রাখা রয়েছে। তুলে নিয়ে পড়লাম। চিঠিই বলা যায়। সেটা এইরকম—

তবলচি সাহেব, আমার কথা যারা মান্য করে না তাদের এই রকম শাস্তিই দিই। জানি এক সেট বাঁয়া-তবলা ফের করাতেই পার। কিন্তু এটা যে তোমার ঠাকুরদার জিনিস। মূল্যবান স্মৃতিচিহ্ন! কী বল? তাই এটাই হাতালাম।

পার তো পুলিশকে জানিয়ে এ দুটো উদ্ধার করো।

ইতি

চারু বিশ্বাস।

চিঠিটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে একটা কথাই ছিটকে বেরিয়ে এল—শয়তান! কিন্তু শত্রুকে উপযুক্ত শাস্তি না দিয়ে শুধু বাড়ি বসে গাল পাড়াটা অক্ষমের কাজ। তাই আমি চারুকে শাস্তি দেবার কথা চিন্তা করতে লাগলাম।

শাস্তি দিলেন?

হ্যাঁ, দিলাম বৈকি। তবে একটু অন্যভাবে। যাকে বলে ‘শঠে শাঠাং সমাচরেৎ’।

কী করলেন? পাদ্রীবাবা নড়েচড়ে বসলেন।

বলছি, দাঁড়ান। তার আগে একটু জল খাই। বলেই হাঁক মারলাম, নকুল, একটু ঠান্ডা জল দাও। কথা বলতে বলতে গলা শুকিয়ে গেছে।

নকুল দুজনের জন্য দু’ গেলাস জল নিয়ে এল।

আমাকেও খেতে হবে?

খান। এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন?

দুজনেই জল খেয়ে খালি গেলাস দুটো নকুলের হাতে দিয়ে আবার কথা শুরু করলাম। বললাম, সত্যিই গলা শুকিয়ে যায়নি। নকুলকে ভালো করে দেখাবার জন্যই ডাকলাম।

পাদ্রীবাবা অবাক হয়ে তাকালেন, ভালো করে দেখার দরকার হল কেন?

কারণ আছে। হ্যাঁ, এবার চারু বিশ্বাসকে কীভাবে শাস্তি দিয়েছিলাম বলি। একটু থেমে বললাম, আপনি নিশ্চয়ই জানেন কোনো কোনো ছিঁচকে চোর, দিবিয় ভদ্রসমাজে থেকে যায়। পাবলিক তাদের চেনে। পুলিশও। তবু তাদের ধরে না। নিতান্ত পেটের দায়ে গেরস্ত বাড়িতে কাজ করে। তারপর সুবিধে পেলে ঘটিটা, বাটিটা হাতসাফাই করে সরিয়ে নেয়। কখনও নেয় শাড়ি, ব্লাউজ যা হাতের কাছে পায়। আমরা ছোটবেলা থেকে এদের চিনতাম। হয়তো

পুরোনো শিশি-বোতল কিনতে বাড়ি ঢুকেছে। মা অমনি সবাইকে বলে দিত, সাবধান। অমূল্য এসেছে। শুধু অমূল্য কেন, আরও কয়েকজন ছিল—গোবরা, পটকা, হারু।

যাই হোক চারুকে শাস্তি দেবার জন্যে আমি রাতের অন্ধকারে ডেকে পাঠলাম নতুন পুকুরপাড়ের গোদাকে। যে-কোনো বাড়িতে ও যেমন করে হোক ঢুকবেই। তারপর রাত থাকতে থাকতেই কাজ হাসিল করে আসবে।

আমাদের মতো 'বাবু'দের বাড়িতে লুকিয়ে ডাক পাওয়া ভাগ্যের কথা। গোদা হাত জোড় করে এসে দাঁড়াল। বললাম, গোদা, একটা কাজ আছে। খুব সাবধানে করতে হবে। তবে তোমার পক্ষে কাজটা মোটেই শক্ত নয়।

বলুন হজুর।

ওকে তখন কাজটা বুঝিয়ে বললাম, গোদা, আমি এইটুকু জেনেছি বাঁয়া-তবলাটা চারু ওর পড়ার ঘরে লুকিয়ে রেখেছে। তোমার কাজ হচ্ছে ওখান থেকে ওটা হাতিয়ে এনে আমার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। এর জন্যে তোমাকে কত দিতে হবে বলো? তবে সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে।

গোদা হাত জোড় করে বলল, আমায় সাত দিন সময় দেবেন। চার দিন লাগবে লক্ষ রাখতে কে কখন বাড়িতে যায়, বাড়ি থেকে বেরোয়। তারপর বাকি তিন দিনের মধ্যে কাজ হাসিল করে আপনার জিনিস আপনার কাছে পৌঁছে দেব। তারপর আপনি খুশি হয়ে গরিবকে যা দেন দেবেন।

বলেই আবার আভূমি নত হয়ে প্রণাম করে চলে গেল।

এর অনেক দিন পর নকুল যখন এল আমাদের বাড়িতে তখন ওকে দেখে প্রথমে 'গোদা' বলেই ভুল করে ফেলেছিলাম। আশ্চর্য মিল! আমি নকুলকে জিগ্যেসও করলাম তার কোনো দাদা এদিকে থাকত কিনা। ও জানিয়েছিল ওর আত্মীয়স্বজন কেউ কোথাও নেই।

পাদ্রীবাবা বললেন, এই জন্যেই বুঝি নকুলকে ডেকে আমাকে দেখালেন।

হ্যাঁ, নকুলকে দেখে গোদা সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবেন।

আপনার নির্দেশমতো গোদা কাজ করতে পেরেছিল?

হ্যাঁ, নিখুঁত ভাবে।

পাদ্রীবাবা বললেন, তারপর চারু যখন জানতে পারল তখন কী করল?

ও যে ঠিক জানতে পেরেছিল তা আমিও বুঝিনি। শুধু আমি কেন কেউই খবর রাখিনি। এমন কি ও যে কবে হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল তাও আমরা জানতাম না। আর ধন্য তার বাবা-মা। ছেলে যে না বলে চলে গেছে তার জন্য কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই।

তাহলে আপনার সঙ্গে আপনার বন্ধুর দেখা হল কবে?

অনেকদিন পরে। ততদিনে পুরোনো বাড়ি ছেড়ে এই বাড়িতে এসে গেছি। কোথায় কেন যে এমন গা ঢাকা দিয়েছিল তা আজও জানি না। একদিন রাত্রে হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি চারু দাঁড়িয়ে। আমি তো অবাক। জিগ্যেস করলাম, কী ব্যাপার? কবে এলি?

তার উত্তর না দিয়ে বলল, শোন, আমার শরীর খুব খারাপ। তবু তোকে জানাতে এসেছি আমার ঘর থেকে বাঁয়া-তবলা চুরি করে তুই রেহাই পাবি না। আমি যেখানেই থাকি একদিন তোকে টেনে নেবই। মনে রাখিস। বলতে বলতে সে যেন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। এ আবার কী দেখলাম—কী শুনলাম! পরের দিন মোহনকে বললাম। ও বলল, হ্যাঁ, শুনেছি। কিন্তু ও দেখা করল কী করে? ও তো ক’দিন থেকে জ্বরের ঘোরে রয়েছে। কাল দেখতে গিয়েছিলাম। ডাক্তার রোগ ধরতে পারছেন না। ভুল বকে যাচ্ছে। আমায় দেখে লাল লাল চোখ মেলে দাঁত কড়মড় করে চোঁচিয়ে উঠল, অ্যাঁই শয়তান বন্ধু! চোর কোথাকার! প্রতিশোধ নেবই। আমি বাইচাপ্স খ্রিস্টানের ঘরে জন্মেছি। কিন্তু যিশু ভজি না। শোধ তুলবই। বুঝলাম চিনতে তুল করেছে।

অসুখের মধ্যেও আমার মুড়ু চিবোচ্ছে!

তুমি কি একদিন দেখতে যাবে?

বললাম, সাহস পাই না। আমায় দেখে যদি উত্তেজনায় হার্ট ফেল করে!

তা বটে। মোহন কাজে মন দিল।

যাব কি যাব না করতে করতে ক’দিন গেল। তারপর স্থির করলাম, ঝগড়াই হোক আর মনোমালিন্যই হোক একসঙ্গে এতদিন গানবাজনা করেছি। একবার দেখা করে আসি। এটা কর্তব্য।

কিন্তু মনের মধ্যে খোঁচ থেকেই গেল। সে রাত্রে যখন সে জ্বরের ঘোরে ছিল তখন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল কী করে?

## ॥ আট ॥

শ্রাবণ মাস। সেদিন আবার শনিবার। ভরা অমাবস্যা। বিকেল বিকেল গেলাম। কিন্তু মেঘে মেঘে বিকেল তলিয়ে গেছে অকাল সন্ধ্যার মধ্যে। ভয়ে ভয়ে ঢুকলাম ওদের বাড়ি। ভেবেছিলাম অনেককেই দেখতে পাব। কিন্তু কোথায়? ওর বাবাকে দেখলাম কোট-প্যান্ট পরে দিব্যি হাসিমুখে একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন। আমাকে দেখে বললেন, এসো।

জিগ্যেস করলাম, চারু কেমন আছে?

ভালো না। বলেই তিনি চলে গেলেন। আশ্চর্য! ভালো না—তবু বাবার মুখে দৃষ্টিস্তার ছাপটুকুও নেই। বাড়ির ঠাকুর-চাকরের অসুখ করলে বাড়ির কর্তা ভাবেন। কিন্তু এ যেমনই হোক তবু এ তো নিজের ছেলে।

সংকোচে পায়ে পায়ে ভেতরে ঢুকলাম। কারণ, যার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি সে আমায় মোটেই পছন্দ করে না। এই যে সেদিন গভীর রাত্তি অলৌকিক ভাবে চারু দেখা দিল তখনও তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শাসিয়ে গেল, ‘যেখানেই থাকি তোকে টেনে নেব।’—এ কথার মানে কী? আমার সঙ্গে ওর এমন বন্ধুত্ব নেই যে যেখানেই ও থাকুক আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। আসলে আমাকে শাস্তি দেবার জন্যে। কিন্তু আমার অপরাধটা কী? আমি ওর ঔদ্ধত্য, প্রভুত্ব স্বীকার করতে পারতাম না। ও আমাকে যখন তখন বাজাবার জন্যে হুকুম করত। ভাবত আমি যেন ওর মাইনে করা লোক। এটা সহ্য করতে পারতাম না। এড়িয়ে চলতাম, এটাই তার রাগ। সত্যি কথা বলতে কি ওর ভয়েই শেষ পর্যন্ত বাজানো ছেড়ে দিলাম।

তাই ভাবছিলাম রোগের মধ্যে এ রকম অপছন্দের মানুষকে দেখলে সে কি সহ্য করতে

পারবে? যাই হোক, ভেতরের যে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম—সে ঘরেই একটা চৌকিতে শুয়েছিল চারু। দু'চোখ বন্ধ। যেন ঘুমোচ্ছে। ঘরে ওদের সরকারবাবু আর রামতারণ কবিরাজ মশাই ছাড়া আর কেউ নেই। বৃদ্ধ কবিরাজমশাই খুব মনোযোগ দিয়ে নাড়ি দেখছেন। সরকার মশাই ব্যাকুলভাবে তাকিয়ে আছেন কবিরাজমশাইয়ের দিকে। কী বলবেন কে জানে?

দেখেই বুঝলাম চারু ঘোরের মধ্যে রয়েছে। রুগির এই সঙ্গিন অবস্থাতেও কি বর্ধমান থেকে বড়ো ডাক্তার আনানো যেত না? টাকার তো অভাব নেই। আমি একটু দূরে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসলাম।

অনেকক্ষণ ধরে নাড়ি দেখে কবিরাজমশাই ধীরে ধীরে চারুর হাতটা ওর বুকের ওপর রেখে দিয়ে চাদরটা দিয়ে ভালো করে ঢেকে দিলেন।

কেমন দেখলেন কবিরাজ মশাই? সরকারবাবু জিগ্যেস করলেন।

কবিরাজমশাই বললেন, নতুন ওষুধ দিয়ে লাভ নেই। মকরধ্বজটা যেমন চলছে চলুক। আর হ্যাঁ, আজ আবার ভরা অমাবস্যা। রাতটা সজাগ থাকবেন।

সরকার মশাই বললেন, তেমন বুঝলে কি আপনাকে খবর দেব?

যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও কবিরাজমশাই বললেন, দিতে পারেন। আমার বয়স হয়েছে তো। রাতটাও খারাপ—

কবিরাজমশাই লাঠি ঠক্ঠক করতে করতে গোমড়া মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। পিছু পিছু গেলেন সরকার মশাই। সেই মুহূর্তে রুগির সামনে আমি একা। ঘর অন্ধকার হয়ে এসেছে। একটা লণ্ঠনও কেউ জ্বলে দিয়ে যায়নি। পাশের জানলাটা খোলা ছিল। সেখান দিয়ে যতটা আলো আসছিল তার চেয়ে বেশি ঢুকছিল মশা।

একবার তাকলাম চারুর মুখের দিকে। একেই তো তার মুখটা ভয়ংকর, তার ওপর রোগযন্ত্রণা। মুখটা সাদা। মন হল কেউ যেন শরীরের সব রক্তটুকু শুষে নিয়েছে।

একা বসে থেকে কী করব? কেউ বসতেও বলেনি। তা হলে চলেই যাই। তখনই ভাবলাম যার জন্যে আসা তাকে দেখলাম। কিন্তু সে তো জানতেও পারল না। হয়তো ও জানতে পারল না এটাই ভালো হবে আমার পক্ষে। কিন্তু—মুমূর্ষু রুগিকে একা ফেলেই বা যাই কী করে?

ভাবতে ভাবতে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। ঠিক তখনই কেমন যেন অস্বাভাবিক গলায় চারু ডাকল, বলু!

চমকে ফিরে দেখি একটা মৃতদেহ যেন দু'খানা হাড়িসার হাত ছড়িয়ে দিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসেছে।

চারু হাতের ইশারায় কাছে ডাকল। কাছে যেতেই সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে আমায় বসতে বলল।

আমি কেমন ভয় পেলাম। তবু বসলাম। ও শুয়ে পড়ল। তারপর অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। কী ভয়ংকর দৃষ্টি!

কী দেখছিস অমন করে?

আমার কথা না শুনলে শাস্তি পেতেই হবে। সে শাস্তি যে কী সাংঘাতিক তুই জানিস না।

আমি চুপ করে রইলাম। এ তো পাগলের প্রলাপ। শোনার যোগ্য না হলে ওর কথা শুনতে যাবই বা কেন?

হঠাৎ ওর ভয়ংকর মুখটা অদ্ভুত ভাবে বেঁকিয়ে বলল, সেই কবে খবর দিলাম নিজে গিয়ে। আর এত দেরিতে এলি কেন?

সে রাত্রিতে তুই কেন গিয়েছিলি?

কেন? চালাকি হচ্ছে? আমাকে চিনতে পারিসনি?

পেরেছিলাম—কিন্তু অত রাত্রে—

একদম চুপ!

এমনি সময়ে একজন ঘরে আলো রেখে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

ঘরে আলো আসতেই দেওয়ালে চাদর মুড়ি দিয়ে শোওয়া অবস্থায় চারুর একটা লম্বা ছায়া পড়ল। এত লম্বা ছায়া? এ কি মানুষের ছায়া!

শ্রাবণের মেঘে ঢাকা আকাশে অন্ধকার দানা বেঁধে আছে, সেই অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে চারিপাশের জঙ্গলের পাতায় পাতায়। মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে কাঁপন ধরিয়ে বিদ্যুতের আলো অন্ধকারকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিচ্ছে। হঠাৎ চারু গোঁ গোঁ করে উঠল। চমকে ওর দিকে তাকাতাই দেখি ও জানলার দিকে ভয়াবহ চোখে তাকিয়ে আছে।

চারু! কী হয়েছে?

ও হঠাৎ আমার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরল! উঃ কী ঠান্ডা হাতটা! একি মানুষের হাত!

চারু, ভয় করছে?

বলু, তুই বাড়ি যা।

না, এ অবস্থায় তোকে ফেলে আমি যাব না।

চারু কর্কশ স্বরে বলল, তুই কি কেবলই অবাধ্য হবি? যা বলছি।

কেন?

কথা বাড়াস নে। ঐ দ্যাখ জানলার বাইরে। ওরা এসে পড়েছে। তোকে দেখে খুব রাগ করছে। তুই আছিস বলে আমাকে নিতে পারছে না।

ভয় নেই, আমি তোর সঙ্গেই থাকব। বলে ওকে ভরসা দিলাম।

কিন্তু ও কী বুঝল জানি না। ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, এখন নয়। আগে আমি যাই। তার কুড়ি বছর পর—তুই চলে আসবি। তুই এখন যা। যা বলছি—

কুড়ি বছর পর কেন?

অত প্রশ্ন করিস না। আমি জানি না। সব কিছুই একটা ‘সময়’ আছে। তুই যা—কিন্তু জানলার বাইরে কাকে দেখে ও এরকম করছে?

উঠে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িলাম। অন্ধকারে তেমন কিছুই দেখা গেল না। মনে হল শুধু দু-তিনটে ছায়ামূর্তি বাড়ির কাছে ঘুরছে।

বুঝলাম চোখের ভুল। আর ও স্বপ্নের ঘোরে প্রলাপ বকছে।

বলু—বলু, তুই যা। ওই ওরা আমাকে—

বললাম, তুই যখন চাচ্ছিস আমি আর না থাকি তাহলে বৃষ্টি থামলেই চলে যাব।

যা খুশি কর। বলেই সে বিছানায় নেতিয়ে পড়ল। আর তখনই একটা হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ায় জানলার পাটাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

বুঝলাম চারু আর নেই। চারুর কথা যদি সত্যি হয় তা হলে যারা তাকে নিতে এসেছিল তারা কাজ শেষ করে এই মুহূর্তে চলে গেল।

সারা রাত্রি বাড়ির জন দুই মাত্র লোকের সঙ্গে চারুর মৃতদেহ আগলে বসে রইলাম। অনেক বেলায় অল্প কিছু লোক জমল। মাপে মাপে কফিন তৈরি করা হল। তারপর নিঃশব্দে মৌন মিছিল করে কবরখানায়।

আমি বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠছিলাম। আর পারছিলাম না। কিন্তু তখনও একটি কাজ বাকি ছিল। একে একে সকলে কবরে মাটি দেবার পর আমিও কফিনের ওপর মাটি দিয়ে চলে এলাম।.....

তারপর? জিগ্যেস করলেন জগদীশ অ্যান্টনি।

বললাম, পরের দিন হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান। জ্ঞান ফিরলেও ঘোরের মধ্যে ছিলাম বেশ ক'দিন। তারপর ঘোর কাটলেও অনেক কিছু মনে করতে পারতাম না। কেন হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম ডাক্তার তা বলতে পারেননি। তারপর এই কিছুদিন ধরে চলছে নানা উৎপাত।

চিনতে পারছেন কে উৎপাত করছে?

বললাম, প্রমাণ পাইনি। তবে আন্দাজ করছি।

পাদ্রীবাবা এবার আর কথা বললেন না। একটু চুপ করে থেকে উঠে পড়লেন। তারপর আমার হাতটা চেপে ধরে বললেন, ঘটনার যখন শুরু তখন বোধ হয় আপনার বয়েস ছিল ষোলো-সতেরো। তাই না?

বললাম,—হ্যাঁ।

তারপর কুড়ি বছর কাটল। তাহলে এই মুহূর্তে আপনার বয়েস সাঁইত্রিশ। বড়ো সাংঘাতিক সময় শুরু হয়েছে আপনার জীবনে। এই মুহূর্তে আপনি ঐ অশরীরী আত্মার টার্গেট হয়ে আছেন। বাড়ো সাংঘাতিক আত্মাটি। কিছুতেই ছাড়বে না।

একটু থেমে বললেন, বলুবাবু ভাই, খুব সাবধানে থাকবেন। প্রমাণ না পেলেও আমারও অনুমান আত্মাটি আপনার সেই প্রথম বয়েসের বন্ধুটিরই। যা শুনলাম তাতে বুঝেছি মোটেই ভালো নয়। এরা এক ধরনের দীর্ঘাপরায়ণ, হিংসুটে, গোঁয়ার, সব সময়ে কর্তৃত্ব করতে চায়। মৃত্যুর পরও স্বভাব বদলাতে পারে না। এ নিশ্চয় আবার হানা দেবে।

হ্যাঁ, আর একটা কথা, বাঁয়া-তবলাটা কোথায়?

বাইরের ঘরে। যেখানে ছিল।

যদি পারেন ওটা পুড়িয়ে ফেলুন। নইলে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিন। ওটার ওপর আপনার বন্ধু চারুর বিষদৃষ্টি আছে।

বললাম, তা আমি পারব না। ওটা আমার দাদুর স্মৃতি।

পাদ্রীবাবা আমার এই স্পষ্ট কথা শুনে আর কিছু বললেন না। শুধু আশীর্বাদের ভঙ্গিতে ডান হাতটা একটু তুলে চলে গেলেন।

॥ নয় ॥

আমার সব কথা শুনে সেদিন পাদ্রীবাবা আমাকে সাবধানে থাকতে বলেছিলেন। সে নাকি আবার আমার বাড়িতে হানা দিতে পারে। কিন্তু কীভাবে তা প্রতিরোধ করব তার কোনো উপায় বলে দেননি তিনি। অশরীরী আত্মার আক্রমণ থেকে কোনো মানুষ শুধু বন্দুক দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারে এমন কথা শুনিনি। তাহলে!



সন্ধেবেলা বিমর্ষভাবে এইসব কথা ভাবছি, হঠাৎ ‘দাদা—দাদা—’ করতে করতে ভয়ে উত্তেজনায় নকুল বাইরের ঘরে এসে ঢুকল।

কী হয়েছে?

শীগগির আসুন। আবার সেই—উঃ কী ভয়ংকর মুখ! তেড়ে এসেছিল। কোনোরকমে—

আমি তখনই উঠে পড়ে বললাম, চলো তো দেখি। বলে বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। বেশি দূর যেতে হল না। দেখি দালানে ঢোকার মুখেই সেই ছায়ামূর্তি। এবার আরও স্পষ্ট। হাত দশেক তফাত থেকে দাঁড়িয়ে লক্ষ করলাম। হাইট প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট। মাথাটা নারকেলের মতো লম্বাটে। চুল নেই। এই হাইট দেখেই অনেকটা নিশ্চিত হলাম এ আমার সেই ছোটোবেলার শত্রু চারু, যে আমাকে বারে বারে হুকুম করত, শাসাত। কিন্তু সারা গায়ে এত মাটি কেন? শরীর ছাড়া ছায়ামূর্তিটি সর্বাস্থে এত ধুলো মাখল কোথা থেকে? সে দাঁড়িয়েছিল পিছন ফিরে। কেমন করে যেন বুঝতে পারল আমি এসেছি। তারপর ধীরে ধীরে মুখটা ফেরাল। মুখটা ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ঘরে কোথা থেকে আবছা আলো এসে পড়ল। সেই আলোয় যা দেখলাম তা ভোলবার নয়।

মুখ কোথায়? একটা মড়ার খুলি। চোখ নেই, আছে শুধু দুটো গর্ত। গালে চামড়া নেই, এক চিলতে মাংস মুখে নেই, কিন্তু আছে বড়ো বড়ো হলদে ছোপধরা দাঁতের সারি। সেই দাঁতের সারির ফাঁক দিয়ে একটা অচেনা কর্কশ গলার স্বর শোনা গেল—

‘.....কুড়ি বছর শেষ....যেতে হবে আমার সঙ্গে।’ বলতে বলতে দু’খানা সরু সরু পাইকেল চালাবার মতো বাতাসের মধ্যে দিয়ে প্যাডেল করে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

আমি আঁতকে উঠে দু’পা পিছিয়ে গিয়ে চাঁচিয়ে উঠলাম, না, আমি কোথাও যাব না। খুলিটার মুখ দিয়ে ফ্যাসফেসে একটা হাসির মতো খানিকটা বাতাস সশব্দে বেরিয়ে এল। স্পষ্ট শুনলাম করোটির মধ্যে থেকে আসা কথা, যেতে তোমাকে হবেই।

আমি খুব ভয় পেলাম। বললাম, কোথায় যেতে হবে শুনি।

যেখানে আমি আছি।

বিদ্রূপ করে বললাম, সেটা কোথায়? স্বর্গে না নরকে?

সে শুনে তোমার কী লাভ? তুমি তো আমার সঙ্গেই যাবে। তা যেখানেই হোক। শোনবার দরকার নেই। তোমার গায়ে এত মাটি দেখে বুঝতে পারছি তুমি স্বর্গে থাকই না, নরকেও না। তুমি থাকো মাটির নীচে। অন্ধকারে কবরে। সেই কবর থেকে তুমি উঠে এসেছ।

হ্যাঁ, তাই। এখন আমার সেই কবরেই তোমাকে নেব। কবে থেকে অপেক্ষা করে আছি—কুড়ি বছর। এই কুড়ি বছর পর্যন্ত আমার একটা গিট ছিল। যে গিট পেরিয়ে আমি এখন অনেক স্বাধীন, অনেক মুক্ত। আমার ইচ্ছাশক্তি, ক্ষমতা দুইই অনেক বেড়ে গেছে। চলো শীগগির। বলে আরও এগিয়ে এল।

আমি চিৎকার করে বললাম, তোমার সঙ্গে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। তুমি মৃত। এ সংসারের সঙ্গে তোমার আর কোনো বন্ধন নেই। তুমি যেখানে খুশি যেতে পার, যেখানে খুশি থাকতে

পার, কিন্তু আমি জীবিত। সুস্থ শরীরে বেঁচে আছি। বেঁচে থাকব। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কও ভালো ছিল না। তুমি অনেকবার আমার ক্ষতি করবার চেষ্টা করেছিলে। তাই তোমার সঙ্গে কোথাও আমি যাব না। চলে যাও তোমার কবরে। আমাকে বিরক্ত কোরো না। তাছাড়া তুমি অনেকদিন থেকে নকুলকে ভয় দেখাচ্ছ কেন? ও কী করেছে? আমার মনে হয় তুমি নকুলকে সেই চোর বলে ভুল করে এসেছ যে আমারই নির্দেশে তোমার বাড়ি থেকে বাঁয়া-তবলা উদ্ধার করে এনেছিল। তার নাম ছিল গোদা। নকুলের দুর্ভাগ্য ওকে গোদার মতোই দেখতে। ও কি! ওভাবে আমার দিকে এগোচ্ছ কেন? আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, নকুল! আমাকে বাঁচা!

কিন্তু কোথায় নকুল? সে বোধ হয় ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে।

এদিকে বাতাসে প্যাডেল করতে করতে এক পা এক পা করে চারুর হিংস্র প্রেতাছাা আমার গলা টেপবার জন্যে এগিয়ে আসছে। তার দুই চোখের শূন্য কোটরে দপ্ দপ্ করে জ্বলছে আগুনের শিখা।

এগিয়ে আসছে.....ক্রমেই এগিয়ে আসছে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো। মৃত্যু তাহলে নিশ্চিত এল সাঁইক্রিশ বছর বয়েসেই।

ভয়ে চোখ বুজলাম।

আর তখনই শুনলাম নকুলের চিৎকার—পাদ্রীবাবা, ঐ যে—ঐ যে—স্বক্ষে দেখুন।

আমি চোখ খুললাম। দেখলাম পাদ্রীবাবা গায়ে তাঁর সেই জোঝা চাপিয়ে ক্রসখানি হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছেন চারুর প্রেতাছাার দিকে।

চারুও আমাকে ছেড়ে এক পা এক পা করে পিছোতে লাগল।

নিভীক শ্রোঁচ পাদ্রীবাবাও পবিত্র ক্রসটি হাতে নিয়ে চারুর মুখোমুখি হলেন। তিনি ভেবেছিলেন এই ক্রসটি প্রেতাছাার সামনে ধরলেই অশুভ শক্তি পিছু হটবে।

কিন্তু তা হল না। মৃত্যুর পর কুড়ি বছর ধরে চারু অজেয় হয়ে ওঠার জন্যে কী কঠোর সাধনা করেছিল কে জানে! আমাদের হতচকিত করে দিয়ে সে হঠাৎ হাত দুটোকে দুটো বিরাট কালো ডানায় রূপান্তরিত করে লাফিয়ে ওপরে উঠে গেল। তারপর ডানার ঝাপটায় পাদ্রীবাবাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বাতাসে ভেসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা শব্দ হল।

মনে হল কাছেই কোথাও বাজ পড়ল। কিন্তু কোথায় বোঝা গেল না।

পাদ্রীবাবা উঠে দাঁড়ালেন। বিমর্ষভাবে বললেন, এমন দুর্ঘটনা আমার জীবনে কখনও ঘটেনি। পবিত্র ক্রসকেও মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিল! হাত দুটো ওর জ্বলে গেল না?

একটু থেমে বললেন, নকুল যখন ছুটে ছুটে গিয়ে আমায় সব কথা বলল তখন ভাবতে পারিনি আমাকে এমন একটা দুর্ঘর্ষ আছার মুখোমুখি হতে হবে। তা হলে প্রস্তুত হয়ে আসতাম।

ভয়ে ভয়ে বললাম, তাহলে এখন আমরা কী করব? বাড়িতে তো শুধু আমি আর নকুল।

পাদ্রীবাবা বললেন, সেটা আজ রাত্তিরে ভেবে দেখব। কাল সকালে যা হয় করবেন, তার আগে এখনি চলুন বাজটা কোথায় পড়ল দেখি।

বাজ! নকুল বলল, শব্দ শোনা গেল বাড়ির মধ্যে অথচ রাস্তার কেউ শুনতে পেল না! এ কেমন বাজ?

পাদ্রীবাবা বললেন, চলো তো ভালো করে দেখি। অত জোর শব্দ হল অথচ বাড়ির ক্ষতি হল না। আশ্চর্য!

তখনই দুটো লঠন হাতে নিয়ে ঘরগুলো দেখলাম। না, কোথাও একটা ইটও ভেঙে পড়েনি।

পাদ্রীবাবা হঠাৎ আমার হাত থেকে লঠনটা নিয়ে উঁচু করে তুললেন।

ঐ যে দ্যাখো! ওর আক্রোশ যার ওপর তার ক্ষতি করবেই।

দেখলাম আলমারির ওপর থেকে পড়ে বাঁয়া-তবলাটা ফেটে চৌচির হয়ে পড়ে রয়েছে।

## ॥ দশ ॥

সে রাতে খুব ভয়ে ভয়ে শোবার ঘরে ঢুকে খিল লাগলাম। মনে হল, মৃত চারু আজ যে শক্তি সঞ্চয় করেছে তাতে ঐ কাঠের দরজা দূরের কথা লোহার দরজাও তাকে ঠেকাতে পারবে না।

অমন যে নানা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী পাদ্রীবাবা—তিনিই পারলেন না চারুর সঙ্গে। তিনিই বলে গেলেন চারু হয়তো আবার আসবে আরও ভয়ংকর শক্তি নিয়ে আমাকে শায়েস্তা করতে। অথচ তাকে ঠেকাবার কোনো উপায়ই বাংলাতে পারলেন না। শুধু ভরসা দিয়ে গেলেন কাল সকালে এসে ব্যবস্থা করবেন।

কাল সকাল! তার আগে গোটা রাতটা কাটবে কী করে?

ঘরের মধ্যে উৎকট নাক ডাকার শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি ঘরের এক কোণে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে নকুল। সাধারণত সে আমার পাশের ঘরে শোয়। আজ যে এ ঘরে এসে শোবে তার জন্যে আমার অনুমতি নেওয়াও দরকার মনে করেনি। সন্দের মুখে এই বাড়িতেই প্রেতাত্মার ভয়ংকর হানার পরও কেউ যে একা একটা ঘরে শুতে পারে তা ভাবা যায় না। আমিও ভাবিনি। একবার ভেবেছিলাম নকুলকে ডেকে নেব। তা দেখি নকুল নিজেই এসে বেছে বেছে অপেক্ষাকর নিরাপদ জায়গা হিসেবে টেবিলের আড়ালে বিছানা পেতে নিয়েছে।

ও দেখছি আরও একটি কাজ করে রেখেছে। সব জানলাগুলি বন্ধ করে রেখেছে। এমনকি জানলার ফাঁকগুলোতে কাগজ গুঁজে দিয়েছে।

এতক্ষণে ঘুমে চোখ তুলে আসছিলাম। বালিশের পাশে টচটা ঠিক মতো আছে কিনা দেখে নিয়ে ভগবানের স্মরণ করে চোখ বুজলাম।

কতক্ষণ নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ দড়াম করে একটা শব্দ হল। ধড়মড় করে উঠে বসে টচ জ্বাললাম। দেখি উত্তর দিকের জানলার একটা পাট খুলে গেছে। ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই জানলার পাটটা খুলে গেল কী করে? আপনাআপনি?

নকুলেরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ভয়ে ভয়ে ডাকল, দাদা।

অভয় দিয়ে বললাম, ও কিছু নয়। জানলাটা খুলে গেছে।

মশারির ভেতর থেকেই নকুল বলল, কিন্তু আমি তো দাদা, সন্ধ্যাবেলাতে সব জানলার ছিটকিনি এঁটে দিয়েছিলাম।

তার কোনো উত্তর না দিয়ে বিছানা থেকে নেমে টর্চ জ্বেলে জানলাটা ভালো করে বন্ধ করে দিলাম।

এতক্ষণে মনে হল ঘরটা যেন বড্ড বেশি অন্ধকার। অথচ স্পষ্ট মনে আছে শোবার আগে ডিম লাইটটা জ্বেলে রেখেছিলাম।

সুইচবোর্ডে টর্চের আলো জ্বেলে দেখি সুইচটা অফ করা আছে। কী আশ্চর্য! আমি হলপ করে বলতে পারি ঐ সুইচ আমি নিজের হাতে ‘অন’ করে আলো জ্বেলে তবে শুয়েছি। তাহলে? তাহলে ওটা অফ করে গোটা ঘর অন্ধকার করে রাখল কে? কেনই বা করল? নকুল ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করল, কিছু গোলমাল?

বললাম, না। তুমি ঘুমোও।

সকালে ধড়মড় করে উঠেই যখন দেখলাম আমার হাত, পা, ঘাড়, গলা ঠিক আছে আর নকুল ঘরের জানলাগুলো সাবধানে খুলছে তখনই মনে পড়ল সকালবেলাতেই পাদ্রীবাবার আসার কথা। তাঁর আসাটা যে কতখানি দরকার তা শুধু আমিই জানি। সারা রাত্রি চিন্তা-ভাবনা করে তিনি আজ আমাকে জানাবেন এই ভয়ংকর প্রেতাচার হাত থেকে কী ভাবে নিষ্কৃতি পাব। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে, চা খেয়ে অপেক্ষা করে রইলাম। অপেক্ষা করছি তো করছিই। পাদ্রীবাবার পাশ্চা নেই।

অর্ধৈক্য হয়ে নকুলকে পাঠালাম পাদ্রীবাবার বাড়িতে। কিছুক্ষণ পর ফিরে নকুল জানাল উনি বাড়ি নেই। তালা বন্ধ।

অবাক হলাম। সাধারণত উনি বিশেষ কোথাও যান না। যাবার জায়গাও নেই। তা হলে আজ এই সাত-সকালে দরজায় তালা দিয়ে কোথায় গেলেন?

এমন ভয়ও হল চারু ওঁর কোনো বড়ো রকমের ক্ষতি করে দেয়নি তো?

এইসব আবোল-তাবোল নানা কথা যখন ভাবছি তখন বাড়ির দরজায় একটা রিকশা এসে দাঁড়াল। আর পাদ্রীবাবা হাতে একটা ছোট্ট ব্যাগ নিয়ে হস্তদস্ত হয়ে এসে দাঁড়ালেন আমার কাছে। উত্তেজিত ভাবে বললেন, বলুবাবু ভাই, আর একটা রিকশা নিয়ে চলুন আমার সঙ্গে।

অবাক হয়ে বললাম, এই রোদ্দুরে—কোথায়? আপনি যে বলেছিলেন কী করতে হবে তার পরামর্শ দেবেন।

পাদ্রীবাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, আর সময় নেই। এখনই কবরখানায় গিয়ে আপনার বন্ধুর হাড়গোড় যা পাওয়া যায় তা তুলতে হবে।

সে আবার কী?

পাদ্রীবাবা ধমক দিয়ে বললেন, কথা পরে। ঐ রিকশাটা দাঁড় করান।

নকুল কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। বলল, দাদা, আমি যাব না?

পাদ্রীবাবা বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাবে। দরজা বন্ধ করে চটপট উঠে পড়ে।

ইতস্তত করে বললাম, কিন্তু কবর থেকে মৃতদেহ তুলতে গেলে তো অনেক হাঙ্গামা—পারমিশান-টারমিশান.....

ও নিয়ে ভাববেন না। যা-যা-করার সব করে নিয়েছি। একটা অসুবিধা ছিল চারু'র ফ্যামিলির পারমিশান নেওয়া। ওর সাবেক বাড়িতে গিয়ে জানলাম চারু'র আত্মীয়স্বজন কেউ নেই।

কবরস্থানে এসে যখন পৌছলাম মাথার ওপর তখন মধ্যাহ্নের রোদ গনগন করছে। দেখলাম জিপভর্তি আর্মড পুলিশ আগেই এসে গেছে। চার্চের চত্বরে বসে আছে ঝুড়ি, কোদাল, শাবল নিয়ে জনা চারেক কবর খোঁড়ার লোক। একটু পরেই এসে পড়লেন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান যিনি তাঁর মোটা শরীর আর বিশাল ভুঁড়ি নিয়ে রিকশা থেকে নেমেই একটু বিরক্তির সঙ্গে পাদ্রীবাবাকে জিগোস করলেন, কী ব্যাপার বলুন তো মিস্টার অ্যান্টনি? আজকের দিনেও ভূত-প্রেত বিশ্বাস করতে হবে নাকি?

পাদ্রীবাবা বললেন, এতদিন বিশ্বাস করার প্রশ্ন ওঠেনি। আজই উঠেছে।

হ্যাঁ, যা শুনলাম তা সত্যি হলে তো সাংঘাতিক ব্যাপার মশাই! আবার হানা দেবে নাকি?

পাদ্রীবাবা হেসে বললেন, যাতে আর সে-সুযোগ না পায় তার জন্যেই আজকের এই ব্যবস্থা।

এখন কী করতে চান? জিগোস করলেন চেয়ারম্যান।

পাদ্রীবাবা বললেন, এখানেই একটি কবরে কুড়ি বছর ধরে শুয়ে আছে চারু বিশ্বাস। তার দুরন্ত আত্মা আজও শান্তি পায়নি। এই বলুবাবুর ওপর পূর্বজীবনের রাগ পুষে রেখে তাঁকে মারবার চেষ্টা করছে। এই কবর থেকেই দরকার মতো উঠে এসে হানা দেয় বলুবাবুর বাড়ি। কাল সন্ধ্যাবেলায় আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি তা ভয়ংকর।

চেয়ারম্যান বললেন, হ্যাঁ, শুনেছি। তা কী করবেন?

তার অপবিত্র দেহাবশেষ কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে ফেলব। তাহলেই আর হানা দেবার কেউ থাকবে না।

কিন্তু এমনও তো হতে পারে আপনার ধারণাটা ঠিক নয়। শুধু শুধু একটা সাধারণ দেহাবশেষ তুলবেন। সে কংকালটা চারু বিশ্বাসের হতে পারে। কিন্তু তা যে প্রত্যাশিতপ্রাপ্ত তার প্রমাণ দিতে পারবেন?

পাদ্রীবাবা গভীরভাবে বললেন, কাউকে প্রমাণ দেবার জন্যে আমি নাটক করছি না। আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে যা কর্তব্যবোধ করছি তাই করতে যাচ্ছি। যদি না করি—একদিনও দেরি করি—তা হলে ঐ ভদ্রলোকের প্রাণসংশয় হবেই।

হঠাৎ এই সময়ে আকাশে ধোঁওয়ার মতো মেঘ জমে সূর্যকে ঢাকা দিয়ে দিল।

পাদ্রীবাবা চোঁচিয়ে উঠলেন, কুইক—কুইক—শীগগির কবর খুঁড়ে ফেলো। ও জানতে পেরেছে।

কবর তো খুঁড়বে কিন্তু কোনটা চারু বিশ্বাসের কবর তা তো বোঝবার উপায় নেই। সে সময়ে কবর কেউ বাঁধিয়ে রাখেনি। কুড়ি বছর পর—

হ্যাঁ গো, বলুবাবু, আপনার বন্ধুর কবর কোনটা চিনতে পারেন?

পরপর ধসে যাওয়া মাটির গর্তগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি মাথা নাড়লাম।

বললাম, কুড়ি বছর কম সময় নয়। তাছাড়া এতদিন এখানে আমার দরকার হয়নি। জায়গাটার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। তবে মনে আছে একটা গাছের নীচে—

আসুন দেখি।

পাদ্রীবাবার সঙ্গে ঝোপঝাপ ঠেলে কবরগুলো দেখতে দেখতে চললাম। ওঁর দৃষ্টি কবরের দিকে। আমি লক্ষ করছি ধারে তেমন কোনো পুরোনো গাছ আছে কিনা।

একটা কবরের কাছে এসে পাদ্রীবাবা থামলেন। হেঁট হয়ে মাটি পরীক্ষা করলেন। তারপর গভীর নিশ্চয়তার সঙ্গে বললেন, এইটাই—

আমি অবাক হয়ে পাদ্রীবাবার দিকে তাকালাম। পাদ্রীবাবা হেসে বললেন, কী বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা, পাশাপাশি অন্য কবরগুলো লক্ষ করুন। এর মাটিগুলো ঢিলেঢালা। কেউ যেন মাটিগুলো মাঝে মাঝে সরায়।

শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিল। তাহলে এই কবর থেকে কফিন খুলে, মাটি ঠেলে, উঠে আসে চারু!

চেয়ারম্যানবাবু কখন পিছনে এসে নাকে রুমাল চেপে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

কবরের মাটি ছুলেন, মিস্টার অ্যান্টনি! বলিহারি যা হোক!

পাদ্রীবাবা হাসলেন। বললেন, কবরের মাটি খুবই পবিত্র। শেষ পর্যন্ত ঐখানেই তো আমাদের গতি! আরে! অন্ধকার হয়ে এল যে!

দেখতে দেখতে কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল।

পাদ্রীবাবা ব্যস্ত হয়ে বললেন, মাটি তোলা, আর দেরি নয়। এখুনি ঝড় উঠে সব লণ্ডভণ্ড করে দেবে।

তখনই একসঙ্গে কোদাল, শাবল, গাঁইতি কবরটাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিল। দশ মিনিটের মধ্যেই শাবলের ঘা লাগল কফিনের গায়ে। আর তখনই উঠল ঝড়। চারিদিক ধুলোয় ধুলো।

তোলা কফিন! কুইক!

কফিন তোলা হল।

ভাঙো। যিশুর পবিত্র ক্রস হাতে নিয়ে গভীর গলায় আদেশে করলেন পাদ্রীবাবা।

পুরোনো জীর্ণ উইধরা কফিনের ডানা গাঁইতির এক চাপে ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়ল সবাই।

একটা গোটা কংকাল শুয়ে আছে কফিনের মধ্যে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কোথাও এতটুকু ধুলোমাটি নেই। মনে হল কেউ যেন কংকালটা ধুয়ে মুছে রেখে গিয়েছে।

চোয়ারম্যানবাবু খুব উঁচু থেকে নাকে রুমাল চেপে কফিনের দিকে তাকিয়ে ‘ওরে বাবা! ও যে আস্ত কংকাল!’ বলে দশ পা পিছিয়ে গেলেন।

কফিনটা ওপরে তোলা হয়েছে। হঠাৎ পাদ্রীবাবু ঝুঁকে পড়লেন কংকালের ওপরে।

কংকালের পাঁজরের মধ্যে ওটা কী পাদ্রীবাবা?

সবাই দেখল সমুদ্রের বড়ো কাঁকড়ার মতো কালো একটা কী পাঁজরের মধ্যে যেন বাসা বেঁধেছে।

পাদ্রীবাবা বললেন, বলা যায়, এটাই ভ্যাম্পায়ারের হাট। দাঁড়ান ওটা খুঁচিয়ে ভেঙে দিই।

বলে যে মুহূর্তে পাদ্রীবাবা একটু অন্যমনস্ক হয়েছেন তখনি কংকালটা লাফিয়ে উঠে দু’হাত বাড়িয়ে তাঁর গলা টিপতে গেল। বিচক্ষণ পাদ্রীবাবা যেন বুঝতে পেরেছিলেন এরকম কিছু

ঘটতে পারে। তিনি তাঁর ব্যাগ থেকে একটা হাতুড়ি বের করে অব্যর্থ লক্ষ্যে ঘা মারলেন কংকালের খুলিতে। খুলি ফেটে চৌচির হয়ে গেল। কংকালটা লুটিয়ে পড়ল কফিনে। আরশোলার মতো অনেকগুলো পোকা খুলি থেকে বেরিয়ে কফিনের মধ্যে ছোটাছুটি করতে লাগল।

যাক শান্তি! দু'হাত তুলে বলে উঠলেন পাদ্রীবাবা।

তারপর চেয়ারম্যানের দিকে ফিরে বললেন, চেয়ারম্যানবাবু, আমার কাজ শেষ। এবার আপনার কাজ করুন।

চেয়ারম্যান সে কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, কী সর্বনাশ! আর একটু হলেই তো আপনি মরেছিলেন। চোখের সামনে দেখলাম অত বড়ো গোটা কংকালটা লাফিয়ে উঠে আপনাকে মারতে গেল!

যাক মারতে তো পারেনি। এখন কফিনসুদ্ধ কংকালটা নিয়ে গিয়ে পোড়াবার ব্যবস্থা করুন।

তা করছি। কিন্তু আপনি?

আপনারা যান। আমি সামান্য একটু কাজ সেরে যাচ্ছি।

বলে তিনি আমাকে নিয়ে শূন্য কবরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর ব্যাগ থেকে কিছু অজানা গাছের শুকনো লাল পাতা আর কিছু শুকনো লতাপাতা বের করে কবরের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন।

তারপর নকুলকে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে রিকশায় উঠলাম। তখন ঝড় থেমে গেছে। প্রকৃতি শান্ত।

শারদীয়া ১৪১৪

— সমাপ্ত —





অশরীরী আতঙ্ক

## ভূমিকা

ভূত অনেকেই বিশ্বাস করেন না। কিন্তু ভূতের গল্প পড়তে ছোটো বড়ো কে না ভালোবাসে।

ভালোবাসার কারণ, মানুষ গল্প শোনার মধ্যে দিয়ে একটু ভয় পেতে চায়।

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে ন'টি স্থায়ী ভাব আর শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, আদ্ভুত, শাস্ত—এই ন'টি রস আছে। প্রকৃত কাব্য বা সাহিত্যের মর্যাদা পেতে হলে রচনাকে যে কোনো একটি রসকে অবলম্বন করতে হয় তবেই সেটি হয়ে ওঠে রসোত্তীর্ণ সাহিত্য।

ভূতের গল্পের স্থায়ীভাব হচ্ছে 'ভয়' আর রস হচ্ছে 'ভয়ানক'। তাই যখনই কোনো ভূতের গল্প স্থায়ীভাব 'ভয়'কে অবলম্বন করে 'ভয়ানক' রসে জারিত হয়ে বেরিয়ে আসতে পারলে তখনই তা সাহিত্য-পর্যায়ে উন্নীত হল।

নানা রকমের ভূতের গল্প লেখা হলেও ভয়ই ভূতের গল্পের প্রধান আকর্ষণ। এই ভয়টুকু না থাকলে ভূতের গল্প জমে না।

অনেকে ভূতের গল্পের মধ্যে অবাস্তব গাঁজাখুরি ঘটনা দেখে নাসিকা কুঞ্জন করেন। তাঁদের জানা উচিত—ভূতের গল্প বাস্তব জীবনের কাহিনী নয়। 'ভূত' নামক চরিত্রটি অন্য এক রহস্যময় জগতের বাসিন্দা—যে জগৎ মানুষের জ্ঞানের বাইরে। কাজেই বাস্তব জগতের চরিত্রের সঙ্গে তাদের কার্যকলাপের মিল খুঁজতে গেলে ভৌতিক চরিত্রের ওপর অবিচার করা হবে। ভৌতিক গল্প যে অলৌকিক কিছু, এটা মেনে নিয়েই পাঠককে অগ্রসর হতে হবে। তা না হলে তিনি ভৌতিক কাহিনীর রস উপভোগ করতে পারবেন না।

ভৌতিক কাহিনী—তা যতই অবাস্তব হোক পাঠককে আকর্ষণ করতে পারে লেখকের লেখার গুণে। 'ড্রাকুলা'র মতো 'অতি গাঁজাখুরি' গল্পও শুধু লেখার গুণে তাবৎ পৃথিবীর পাঠককে কাঁপিয়েছে।

বিদেশী সাহিত্যে এইরকম ভালো ভালো ভূতের গল্প বিস্তার আছে। ওসব দেশের সাহিত্যিকরা ভূতের গল্প লেখা সহজ অথবা অগৌরবের মনে করে না। শৈল্পণীয়রই বোধ হয় সর্বপ্রথম অতিপ্রাকৃত উপাদানকে সাহিত্যে টেনে এনেছিলেন। 'হ্যামলেট' কিংবা 'ম্যাকবেথ' তার দৃষ্টান্ত। কোলরিজের হাতে অতিপ্রাকৃত উপাদান কিভাবে কাব্যের মধ্যে দিয়ে রসমূর্তি লাভ করেছে তা আমরা জানি। এডগার অ্যালান পো'র গা-হুমহুম-করা ভৌতিক গল্পের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। আমাদের দেশে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়েই লিখেছেন তাঁর কয়েকটি স্মরণীয় গল্প—'সম্পত্তি সমর্পণ', 'কংকাল', 'মাস্টারমশাই', 'ক্ষুধিত পাষণ', 'নিশীথে', 'মণিহার'। এগুলির মধ্যে 'মণিহার'ই যে যথার্থ ভৌতিক গল্প সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এবার আর একটি প্রশ্ন—ভূতের গল্প সবই কি লেখকের কল্পনা?

তা নয়। লেখকের নিজের অভিজ্ঞতা না থাকলেও অনেক সময়ে নিজের আত্মীয়-বন্ধুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লেখককে সাহায্য করে। আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবনে তেমন অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু আমার অনেক গল্পের পিছনে পরিচিত জনের

বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রেরণা যুগিয়েছে। এই উপন্যাসের মূলেও একটি আছে। নাম-ধাম গোপন রেখে সেই সূত্রটুকু জানিয়ে রাখি।—

আমার দেশেরই একটি মেয়ে আমার খুব অনুগত ছিল। আমি প্রায়ই তাদের বাড়ি যেতাম। মেয়েটি তখন এম. এ. ক্লাসের ছাত্রী। আমি গেলে মাঝে মাঝে সে আমার কাছে পড়া বুঝে নিত। তাকে কথায় কথায় প্রায়ই আমি কুসংস্কারমুক্ত হবার ব্যাপারে উৎসাহ দিতাম। সে শ্রদ্ধাভরে আমার কথা শুনত। মানবার চেষ্টাও করত।

তারপর একদিন তার ভালো ঘরে সুপাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের বছর দেড়েক পরে ওরা কলকাতায় ডিস্ট্রিক্টের কাছে একটা ফ্ল্যাটে এসে ওঠে। তিন তলায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ফ্ল্যাটটি। তখন ওর একটি বাচ্চাও হয়েছে।

এখানে আসার কিছুদিন পরেই গভীর রাত্রে তার ওপর অশরীরী হানা শুরু হয়। সে আতঙ্কে অস্থির হয়ে ওঠে। তার স্বামী ডাক্তার। তিনি স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু একদিন রাত্রে একলা থাকার সময়ে কিছু না দেখলেও তিনি ভয় পেয়েছিলেন।

সেই অশরীরী আত্মাটি মেয়েটিকে ফ্ল্যাট ছেড়ে দেবার জন্যে হুমকি দিত। এমন কি ফ্ল্যাট ছেড়ে না দিলে ছেলের ক্ষতি করবে বলেও শাসাতো। একদিন মেরে ফেলেও গিয়েছিল। তখন বাধ্য হয়ে তাদের ফ্ল্যাট ছাড়তে হয়।

এই ঘটনা মেয়েটি আমাকে নিজে বলেছে। তার সব কথাই উড়িয়ে দিতে পারিনি।

এই সত্যটুকুর জোরেই এই উপন্যাসের সৃষ্টি। এর পরেও আরো একটু ঘটনা ছিল। বেশ কিছুকাল পর মেয়েটি কলকাতায় আর একজনদের বাড়িতে আলাপ করতে গিয়েছিল। সেখানে টেবিলের ওপর একজন মৃত ব্যক্তির ছবি দেখে সে চমকে ওঠে। এ তো সেই অশরীরী আত্মার আবছা মুখের মতোই মুখ!

কি করে এই মিল সম্ভব হল তার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। যায়ও না।

আমার এই উপন্যাসে অবশ্য শেষের ঐ ঘটনাটা লিখিনি।

এই সব প্রায় ষোলো-সতেরো বছর আগের ঘটনা। এর অনেক পরে এই ঘটনা নিয়ে ‘আবির্ভাব’ নামে একটি গল্প লিখি। পরে নবকল্লোল সম্পাদক এবং নিউবেঙ্গল প্রেসের কর্ণধার প্রবীরবাবুর (প্রবীরকুমার মজুমদার) উৎসাহে এটিকে উপন্যাস করি। তাঁরই আগ্রহে ও সহযোগিতায় উপন্যাসটি নবকল্লোল পত্রিকায় ধারাবাহিক ছাপা শুরু হয় কার্তিক ১৩৯৮ থেকে।

আমি আনন্দিত যে এখন লেখাটি বই আকারে প্রকাশ করছেন দেব সাহিত্য কুটির। ধন্যবাদ দিই মাননীয় অরুণচন্দ্র মজুমদারকে। আমার কাজটিকে তিনি সাফল্যের দিকে এগিয়ে দিতে সাহায্য করলেন।

বইটি পড়ে পাঠক যদি ‘ভূতের গল্প’র অতিরিক্ত সাহিত্যরস লাভ করেন তা হলেই আমার উদ্যম সার্থক হবে।

মানবেন্দ্র পাল

আশ্বিন ১৪০২

৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা ৭০০ ০০৯

## প্রথম পর্ব

॥ এক ॥

### অন্ধকার সিঁড়ি

এলাকাটা কলকাতার কালিন্দি-বাসুর-বরাটের কাছাকাছি। যশোর রোড থেকে একফালি রাস্তা হঠাৎ যেন ছুরির বাঁকা ফলার মতো ভেতরে ঢুকে গেছে।

বড়ো রাস্তার দুপাশে যথেষ্ট পরিবর্তন হলেও ফালি রাস্তার ভেতরে এই যে বিস্তীর্ণ জায়গাটা পড়ে আছে সেখানে তেমন পরিবর্তন হয়নি। এখনো সেখানে ঝোপ-ঝাপ, জলা, ডোবা দেখতে পাওয়া যায়। হঠাৎ দেখলে কে বলবে—জায়গাটা কলকাতার মধ্যেই!

এখানে কয়েকটা টালির ঘর ছাড়া একটা বিশেষ বাড়ি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চুন-বালি-খসা জীর্ণ তেতলা বাড়ি। পাঁচিল-ঘেরা কম্পাউন্ড। জায়গায় জায়গায় পাঁচিল ভেঙে পড়েছে। তা পড়ুক। তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই।

কম্পাউন্ডে ঢোকান মুখে লোহার গেট। নামেই গেট। সে-গেট বন্ধ করা যায় না। একদিকের পালাই নেই।

সেই ভাঙা গেট দিয়ে একদিন একটা ট্রাক এসে ঢুকল। ট্রাকভর্তি মাল। সঙ্গে এল একজন ভদ্রলোক, একজন মহিলা, একজন প্রৌঢ়া আর কোলে একটি শিশু।

বাড়ির সামনে পাথরের ভাঙা নারীর নগ্নমূর্তি। তার চারিদিকে খানকয়েক লোহার বেঞ্চি।

তখন বিকেল। এ-বাড়ির বৃদ্ধেরা বেঞ্চিতে বসে গল্প করছিল। ট্রাক ঢুকতে তারা অবাক হয়ে তাকালো।

—নতুন ভাড়াটে বোধহয়।

—হুঁ। তিনতলাটা তো খালি ছিল।

—ভালোই হল। আমরা দলে ভারী হলাম।

—তা হয়তো হলাম। কিন্তু কেমন ফ্যামিলি সেটাই বড়ো কথা।

—দেখে তো মনে হচ্ছে ছোটোখাটো ভদ্র পরিবার। ওরা বোধহয় স্বামী-স্ত্রী।

—বোধহয় কেন, নিশ্চয়ই। আর ওটা ওদের বাচ্চা।

—কিন্তু বুড়িটা?

—হয় মেয়ের শাশুড়ি, নয় ছেলের শাশুড়ি।

—বুড়িটাকে হৃদপতন বলে মনে হচ্ছে। নইলে “ছোটো পরিবার সুখী পরিবার”—এর আদর্শ দৃষ্টান্ত।

প্রৌঢ়ের সরস মন্তব্যে সকলেই হেসে উঠল।

তরুণ ভদ্রলোকটির বোধহয় ভয় ছিল বাড়িটা দ্বীর পছন্দ হবে কিনা। তাই

সসংকোচে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে আসছিল। কিন্তু মহিলাটি কম্পাউন্ডে ঢুকেই বলে উঠল—বাঃ! কতখানি জায়গা! বিকেলে এখানেই বেশ বেড়ানো যাবে। ওমা! কী চমৎকার বুনো ফুল! বলেই ছুটে গেল পাঁচিলের দিকে।

—এই! এসো এদিকে।

শ্রীটা মাল-পত্তর আগলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভদ্রলোক বাচ্চা কোলে করে স্ত্রীর কাছে গেল।

—এগুলো কী ফুল বলো তো? চোখের ভঙ্গি করে জিজ্ঞেস করল মহিলা।

—জানি না।

—ঢোলকল্মী। আমাদের দেশের বাড়ির পুকুরের ধারে গাদা ফুটত। ওমা! কেমন একটা পুকুর!

ভদ্রলোক হেসে বলল—পুকুর তো তোমার কি? চান করবে নাকি?

—দেশের বাড়ি হলে করতাম। ওটা দেখেছ?

বলে ছাতের দিকে আঙুল তুলে দেখালো। কিরকম আদ্ভুত, না?

—হ্যাঁ, গম্বুজের মতো। সেকালের বাড়ি তো।

মহিলাটি মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ গম্বুজটার দিকে তাকিয়ে রইল। বিকেলের পড়ন্ত রোদ গম্বুজটার মাথায় তখন কেমন যেন বিষাদের আলপনা এঁকে যাচ্ছে।

—চলো, ওপরে যাই। জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিতে হবে। ভদ্রলোকটি তাড়া দিল।

মহিলাটি যেন কেমন অনামনস্ক হয়ে গিয়েছিল। সামলে নিয়ে বলল—হ্যাঁ, চলো। আসুন পিসিমা।

ওরা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। উচিত ছিল ভদ্রলোকেরই আগে আগে যাওয়া। কেননা ভদ্রলোক এর আগে এসেছে। কিন্তু ভদ্রমহিলারই উৎসাহ বেশি। সে এগিয়ে এগিয়ে চলেছে—যেন তার চেনা বাড়িতে ঢুকছে।

সিঁড়িটা অন্ধকার। দেওয়ালে হাজার ফাঁক-ফোকর। সিঁড়িগুলোও যেন দাঁত খিঁচিয়ে আছে।

সিঁড়িটা যেন গোটা বাড়ির বুক চিরে ওপরে উঠে গেছে। দুপাশে ঘর। দরজায় দরজায় পর্দা ফেলা। বুঝতে পারা যায় সব ঘরেই ভাড়াটে আছে। কোনো ঘরে রেডিও বাজছে, কোনো ঘরে কিশোরীকন্য়ার গানের রেওয়াজ চলেছে, কোথাও বা দুরন্ত ছেলেকে মা তারস্বরে ধমকাচ্ছে। ঘরে ঘরে জীবনের লক্ষণ।

—অন্ধকার। আস্তে আস্তে ওঠো। ভদ্রলোক স্ত্রীকে সাবধান করে দিল।

চার ধাপ ওপরে দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলা ঘাড় ফিরিয়ে হেসে বলল, ভয় নেই। পড়ব না।

বলেই দু ধাপ উঠে গেল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আত্নাদ করে উঠল—পড়ে গেলাম!

॥ দুই ॥

## সূত্রপাত

রীণা মফস্বলের মেয়ে।

ওখানকার কলেজ থেকেই বি. এ. পাস করে বর্ধমান ইউনিভার্সিটিতে এম. এ. পড়ছিল। পড়তে পড়তেই বিয়ে হয়ে গেল। স্বামী ডাক্তার। স্বশুরবাড়ি বহরমপুরে। কিন্তু ডাক্তারিসূত্রে সঞ্জয়কে প্রথমেই আসতে হল কলকাতায়। রীণা খুব খুশি। কলকাতায় সংসার পাতবে এতখানি সৌভাগ্য কল্পনাও করেনি কখনো। তাছাড়া এখানে তার একটি বান্ধবীও আছে—মাস্ত। তার সঙ্গেও দেখা হবে।

কলকাতায় চাকরি পাওয়া যদিও-বা সম্ভব, বাড়ি পাওয়া সহজ নয়। অনেক চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত এই বাড়িটা পাওয়া গেল। পুরনো বাড়ি। জায়গাটাও গলির মধ্যে। তবুও কলকাতায় সংসার পাতার আনন্দে রীণা খুঁতখুঁত করল না।

তিনতলায় সিঁড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একফালি বারান্দা। তিনতলাটা একেবারেই ফাঁকা।

সামনের ঘরটাকে রীণা করে নিল ড্রয়িংরুম। একটা টেবিল, খান-দুই স্টিলের চেয়ার, একটা মোড়া আর একটা ডিভান—এই নিয়েই ড্রয়িংরুম সাজাল। এরই পিছনে আর একখানা ঘর। সেটা হল ওদের বেডরুম। বিছানায় শুয়ে দু'ঘরের মধ্যের খোলা দরজা দিয়ে তাকালে সিঁড়ি পর্যন্ত দেখা যায়।

দরজা জানলাতে রীণা রঙিন পর্দা লাগাল। টেবিলে পাতল ওরই হাতে তৈরি সুন্দর টেবিল-ক্লথ। ওপরে রাখল পেতলের ফ্লাওয়ার ভাস।

দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিল রবীন্দ্রনাথের একখানি ছবি, আর সুদৃশ্য একখানি ক্যালেন্ডার।

রীণা খুব খুশি। সকালে সঞ্জয় বেরিয়ে যায় হাসপাতালে। দুপুরটা কাটে ঘুমিয়ে। বিকেলে সঞ্জয় ফিরলে ওরা দুজনে বেরিয়ে পড়ে।

পিসিমা এসেছিলেন ওদের নতুন সংসার গুছিয়ে দিতে। গোছানো হয়েছে। এবার তিনি দেশে ফিরে যেতে চাইছেন। রীণা ওঁকে আটকে দিল।

—এখনি যাবেন কি? কালীঘাট দেখলেন না, দক্ষিণেশ্বর দেখলেন না—

ওর আন্তরিকতা অকৃত্রিম। তবু কিছু স্বার্থও আছে। পিসিমা থাকলে পুপুকে রেখে একটু বেরোন যায়।

প্রথম ক'দিন রীণার কাটল সিনেমা-দেখে। একদিন থিয়েটারও দেখল।

তারপরই একদিন ছোটোখাটো একটা অঘটন ঘটল।

সঞ্জয় একদিন বলল, মহাজাতি সদনে দারুণ ম্যাজিক শো হচ্ছে।

রীণা বলল, তুমি যাও। ম্যাজিক আমার ভালো লাগে না।

সঞ্জয় অবাক। সে কী! ম্যাজিক ভালো লাগে না!

রীণা বলল, ছোটোবেলায় একবার ম্যাজিকে নররাফসের খেলা দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। সেই থেকে আর ম্যাজিক দেখি না।

সঞ্জয় হেসে উঠল, ওসব নৃশংস খেলা এখন আর হয় না।

রীণা তবু মাথা নাড়ল, না বাপু, ম্যাজিক দেখে কাজ নেই।

সেদিন আর কথা হল না। তারপর একদিন সঞ্জয় কিছু না বলে দুখানা টিকিট কেটে বাড়ি ঢুকল। রীণা খুশি হল না। তবু যেতে হল।

রবিবার। বেলাবেলি ঋগ্বেদ-দাওয়া সেরে পুপুকে পিসিমার কাছে রেখে দুজনে বেরিয়ে পড়ল।

রীণার উৎসাহ একেবারেই ছিল না। তাকে যেন জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কেমন অন্যমনস্ক। তার তখন ছোটোবেলার কথা মনে পড়ছিল। সেই অন্ধকার টিনের ছাউনি দেওয়া হলঘর। কালো পর্দা। পর্দা উঠল। স্টেজে মিটমিটে আলো। কালো পোশাক পরা কী ভয়ংকর মানুষটা! চুলগুলো ফাঁপানো, দুচোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। সে পাগলের মতো স্টেজের মধ্যে দাপাদাপি করছিল। তার কোমরে দড়ি বেঁধে তিনজন লোক টেনে ধরেছিল।

তারপর রাফসটা যখন জ্যাস্ত মুরগীটাকে ধরল—মুরগীটা পাখা ঝাপটাতে লাগল....মুরগীটা মরণডাক ডেকে উঠল। উঃ! তারপর আর মনে নেই। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।....

সেই ম্যাজিক দেখা, তারপর এই যাচ্ছে। এখন অবশ্য ঐসব ভয়ানক খেলা আর হয় না। তবু ভয় করছে। কিসের যে ভয় রীণা তা ঠিক বুঝতে পারছে না।

শো আরম্ভ হল। হলভর্তি দর্শক। ম্যাজিসিয়ান হাসতে হাসতে পায়ে হুন্দ তুলে স্টেজে ঢুকলেন। খেলা শুরু হল।

কি একটা খেলা দেখাবার পর ম্যাজিসিয়ান তাঁর কালো টুপিটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার নিজের হাতে ধরতে গেলেন, ঠিক তখনই রীণা একটা অশ্বুট শব্দ করে সঞ্জয়ের বুকের ওপর ঢলে পড়ল।

অবশ্য বেশিক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকেনি। জ্ঞান ফিরতেই সঞ্জয় তাড়াতাড়ি ওকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে রীণা চোখে-মুখে জল দিল। একটা কোল্ড ড্রিংক খেল।

—এখন কেমন? সঞ্জয় জিজ্ঞেস করল।

—ভালো। এবার বাড়ি চলে।

সঞ্জয় একটা ট্যাক্সি নিল। ট্যাক্সিতে গা এলিয়ে বসেছিল রীণা। দুচোখ বন্ধ। সঞ্জয় ওর হাতটা তুলে নিল। হাতটা ঠাণ্ডা।

—তুমি আচ্ছা ভীতু তো! সঞ্জয় হেসে রীণার দিকে তাকাল।

রীণা উত্তর দিল না।

—কিন্তু কিসে এত ভয় পেলো? কোনো ভয়ের খেলা তো দেখায়নি।

রীণা এবার মাথাটা একটু নাড়ল। ক্রান্ত গলায় বলল, জানি না।

ট্যান্ড্রি যখন কম্পাউন্ডে ঢুকল তখন সঙ্গে সাড়ে সাতটা। গলিপথটা নির্জন হয়ে গেছে। কম্পাউন্ডেও বুড়োরা কেউ বসে নেই।

আকাশে কৃষ্ণা চতুর্থীর চাঁদ। রীণা হঠাৎ চমকে ট্যান্ড্রি থেকে মুখ বাড়াল।

—কি হল?

—দ্যাখো দ্যাখো গম্বুজটা!

গম্বুজটার ওপর হালকা চাঁদের আলো পড়ে কেমন রহস্যময় লাগছিল। তার চেয়েও রহস্যময়ী লাগছিল রীণাকে। তার মুখটা মনে হচ্ছিল যেন কাগজের তৈরি অন্য একটা যেন মুখ। সে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল গম্বুজটার দিকে।

—কি হল? নামো। সঙ্কয় বলল।

রীণা চমকে উঠল। তারপর সঙ্কয়ের হাতটা আঁকড়ে ধরে ধীরে ধীরে নামল।

॥ তিন ॥

### শেষ-দুপুরে আগন্তুক

ভাই মাস্ত, শেষ পর্যন্ত কলকাতায় এলাম। তুই তো জানিস এ আমার কতদিনের সাধ! সেই সাধ এতদিনে পূর্ণ হল। এবার আশা করছি তোর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হবে। বাসাটা বেশ দূরে হল—বান্দুর-কালিন্দির কাছে। তবু তো কলকাতা। এখান থেকে হাওড়া এমন আর কি দূর? রাস্তাটা চিনে নিলে যে কোনো সময়ে তোর কাছে চলে যেতে পারব।

দু'সপ্তাহ হল এসেছি। এখনো ঠিকমতো গুছিয়ে বসতে পারিনি। পিসিমা এসেছিলেন। তিনি ছিলেন বলে পুপুকে তাঁর কাছে রেখে ক'দিন খুব সিনেমা-থিয়েটার দেখে নিলাম। কিন্তু গোল বাধল ম্যাজিক দেখতে গিয়ে। ম্যাজিক দেখায় আমার বড্ড ভয়। শুনে ডাক্তার খুব হাসে। কিন্তু ওকে বোঝাই কি করে ম্যাজিসিয়ানদের দেখলেই আমার বুকের মধ্যে কেমন করে। কারণ আর কিছুই নয় ছোটবেলায় 'নররাক্ষস' দেখার বীভৎস অভিজ্ঞতা। এই এতদিন পরে ম্যাজিক দেখতে গিয়ে আবার অজ্ঞান হয়ে যাই। ভাবতে পারিনি ম্যাজিক দেখতে গিয়ে এই বয়েসে অজ্ঞান হয়ে যাব। তারপর থেকে শরীরটা দুর্বল। মনটাও অকারণে বিষণ্ণ হয়ে আছে। কেবলই মনে হচ্ছে কি যেন ঘটবে—এমন কিছু যা মোটেই শুভ নয়। এরকম মনে হবার কোনো কারণ খুঁজে পাই না।

যাই হোক বাড়িটার কথা বলি। পুরনো বাড়ি। তিনতলা। বাড়িটা একটা গলির ভেতর। এখানে বড়ো রাস্তার ধারে, আশেপাশে প্রচুর নতুন বাড়ি উঠেছে। আমাদের কপালেই পুরনো বাড়ি জুটল। যাক, তবু তো জুটেছে। একতলায়, দোতলায় মেট চার ঘর ভাড়াটে। আমরা তিনতলায়। তিনতলাটা দেখলেই বোঝা যায় incomplete। কবে কোনকাল থেকে কেন যে এরকম অসম্পূর্ণ হয়ে আছে কে জানে! ছাদের ওপর একটা ভাঙা গম্বুজমতো আছে। সেটাই আমার কাছে কেমন



অদ্ভুত লাগে। ঠিক যেন সেকালের রাজা-রাজড়াদের দুর্গ! সেদিন ম্যাজিক দেখে ফেরার সময়ে চাঁদের আলোয় গম্বুজটাকে দেখেও কেন জানি না বেশ ভয় পেয়েছিলাম।

তবু মন্দ লাগে না। শান্ত পরিবেশ। বাড়ির পিছনে সার সার দেবদারু গাছ। কম্পাউন্ডের মধ্যে অনেকগুলো সুপুরিগাছও আছে। বাড়ির পিছনের দিকটা যেন রহস্যপূর্ণ। এই কলকাতা শহরেও রাত্তিরবেলায় ঝাঁঝ ডাকে!

তুই একদিন চলে আয়। ও হাসপাতালে চলে গেলে সারা দুপুর বড্ড একা লাগে। পিসিমা চলে গেছেন। আমার সঙ্গী শুধু পুপু। ঘুমোতে চেষ্টা করি। ঘুম হলে বেশ ভালো থাকি। ঘুম না হলে কেমন ভয় করে। চোর-ডাকাতির ভয় নয়। আবার বলছি—কিসের ভয় জানি না।

ও হ্যাঁ। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। প্রথম যেদিন মনের আনন্দে সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিলাম, তখন ডাক্তার আমায় সাবধান করে দিল যেন তড়বড়িয়ে না উঠি। পড়ে যেতে পারি। আশ্চর্য! ঠিক তখনই মাথাটা ক্লিককম করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে চার ধাপ নিচে পড়ে গেলাম। ভাগ্যি ও ধরে ফেলেছিল!

কিন্তু তোকে সত্যি কথা বলি। পড়বার আগের মুহূর্তেও ভাবতে পারিনি আমি পড়ে যাব! কি করে পড়লাম কে জানে!

কলকাতায় এসে এরই মধ্যে দুটো ধাক্কা খেলাম। প্রথম সিঁড়ি থেকে পড়া। দ্বিতীয় ম্যাজিক দেখতে গিয়ে....

চিঠি লেখায় বাধা পড়ল। শুনতে পেল সিঁড়িতে জুতোর অস্পষ্ট শব্দ। ওপরে কেউ আসছে। অবাক হল। কেউ তো আসে না।

ঠিক এই সময়ে পুপু ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ কেঁদে উঠল।

চিঠি ফেলে রেখে রীণা বিছানায় গিয়ে পুপুর পিঠে হাত রাখল। কিন্তু কান্না থামল না।

কি হল? কিছু কামড়ালো নাকি? রীণা তাড়াতাড়ি পুপুকে তুলে নিয়ে বিছানা ওলোট-পালোট করে ফেলল। নাঃ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন বিছানা। কোথাও একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত নেই।

পুপুকে কোলে নিয়ে অনেক কষ্টে ঘুম পাড়িয়ে রীণা আবার বাইরের ঘরে এসে বসল। ঘড়ির দিকে তাকাল। পৌনে তিনটে।

যাক, বিকেল হয়ে এল। এর মধ্যে চিঠিটা শেষ করে ফেলতে হবে।

সবেমাত্র একটি শব্দ লিখেছে, অমনি দেখল সুটপরা কেউ একজন যেন সিঁড়ির দিকের জানলার পাশ থেকে চকিতে সরে গেল।

—কে?

সড়া নেই।

রীণা আবার ডাকল—কে?

এবারও উত্তর নেই।

রীণা ভাবল জানাশোনা কেউ দেখা করতে এসেছে। লুকিয়ে একটু মজা করছে।

রীণা উঠে দরজার কাছে গেল। ঠিক তখনই পুপু আবার কঁদে উঠল। তবু রীণা দরজা খুলে দিল।

না, কেউ নেই। শুধু জ্যেষ্ঠের একফালি রোদ দেওয়ালের একটা জায়গায় বর্ষার ফলার মতো এসে পড়েছে।

রীণা বুল-বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নিচের কম্পাউন্ড ফাঁকা। জনপ্রাণী নেই। অল্প দূরে যশোর রোডের ওপর দিয়ে সশব্দে বাস, ট্যাক্সি, লরি ছুটে চলেছে।

রীণা অবাক হল। কে এল এই অসময়ে? গেলই-বা কোথায়?

কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবতে পারল না। পুপু তখনও কঁদছে। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে ঘরে ঢুকে পড়ল।

না, আর কঁদছে না। বিছানার চাদরটা মুঠো করে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

রীণা আবার বাইরের ঘরে এসে বসল। চিঠিটা শেষ করল কোনোরকমে। কিন্তু চিঠি লিখতে লিখতেও ভাবনাটা কিছুতেই সরিয়ে ফেলতে পারছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল—কে ঐ স্যুটপরা ভদ্রলোক? তার মুখ দেখতে পায়নি। দেখেছে শুধু কোটের একটা প্রান্ত। কেনই-বা অসময়ে এল! কেনই-বা চুপচাপ চলে গেল!

ভদ্রলোক কে হতে পারে, রীণা সম্ভব-অসম্ভব অনেকের কথাই মনে করার চেষ্টা করছিল, এমনি সময়ে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

রীণার হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল।

—কে?

এইটুকু উচ্চারণ করতেই গলার স্বর কঁপে উঠল।

—আপনার টেলিফোন।

—আমার টেলিফোন!

রীণা দরজা খুলে দিল। দেখল দোতলার নিখিলবাবুর মেয়ে বন্দনা। বন্দনা বলল, আমাদের ঘরে আপনার ফোন এসেছে।

রীণা একে চেনে।

—কে ফোন করছে? অন্যমনস্কভাবে কথা কটা উচ্চারণ করেই রীণা তাড়াতাড়ি নেমে গেল। ঘরটা খোলাই পড়ে রইল।

কে তাকে হঠাৎ ফোন করতে পারে? ডাক্তার ছাড়া আর তো কেউ এ বাড়ির নম্বর জানে না। ডাক্তারই বা শুধু শুধু ফোন করতে যাবে কেন? তাহলে নিশ্চয় ডাক্তার কাউকে ফোন নম্বর দিয়েছে জরুরি কোনো খবর জানাবার জন্যে। কি সে জরুরি খবর? তবে কি ওর কিছু হয়েছে? অ্যাকসিডেন্ট? হাসপাতাল থেকে করছে? স্যুটপরা ভদ্রলোক কি সেই খবর দেবার জন্যেই এসেছিলেন? নিজে মুখে খবরটা দিতে না পেরে ফোন করছেন?

রীণা ঘামতে ঘামতে রিসিভার হাতে তুলে নিল।

—হ্যালো-হ্যালো—আমি রীণা বলছি। রীণা গুপ্ত—ডাক্তার সঞ্জয় গুপ্তর স্ত্রী—ওপার থেকে হাসি শোনা গেল।

—তুমি যে আমারই স্ত্রী, তোমার কাছ থেকে এই প্রথম শুনতে পেলাম।

ডাক্তারেরই গলা। রীণার বুকটা হালকা হল।

—ও তুমি! বাবাঃ! বাঁচলাম।

—কেমন অবাক করে দিলাম!

—উঃ! যা ভয় পেয়েছিলাম!

—ভয়! কিসের ভয়?

—সে অনেক কথা। তুমি এলে বলব।

—আমার আজ ফিরতে দেরি হবে। চিন্তা কোরো না।

—দেরি? না-না, মোটেই আজ দেরি কোরো না। লক্ষ্মীটি।

—একটা জরুরি কাজ আছে যে।

—তা থাক। আমারও বিশেষ দরকার আছে।

ওপার থেকে এবার চট্ করে উত্তর এল না।

—হ্যা-লো—

ডাক্তার য়দু ধমক দিল।—অত চেষ্টাচ্ছ কেন? আস্তে বলো।

সে কথায় কান না দিয়ে রীণা আবার চেষ্টায়ে উঠল—তাড়াতাড়ি আসছ তো?

—আচ্ছা, চেষ্টা করব। ছেড়ে দিচ্ছি।

রীণাও ফোনটা রেখে দিল। বন্দনার দিকে তাকিয়ে সলজ্জ একটু হেসে বলল,  
চলি।

বন্দনাও একটু হাসল, খুব ভয় পেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। হঠাৎ টেলিফোন পেলে—রীণার মুখটা একটু লাল হল।—চলি। সময়  
পেলে এসো। কেমন?

রীণা তিনতলায় উঠতে লাগল। উঠতে উঠতে কি মনে হওয়ায় আবার নেমে  
এল।

—এই শোনো।

বন্দনা ফিরে দাঁড়াল।

—দুপুরে তুমি বাড়ি ছিলে?

—হ্যাঁ, ইস্কুলের ছুটি।

—কি করছিলে? ঘুমোচ্ছিলে?

—দুপুরে আমি ঘুমোই না। সেলাই করছিলাম।

—কোন ঘরে?

—এই ঘরে।

—আচ্ছা, কেউ একটু আগে—এই তিনটে নাগাদ তিনতলায় গিয়েছিল?

—কই? না তো।

—তুমি তো দরজা বন্ধ করে সেলাই করছিলে। কি করে দেখবে?

বন্দনা বলল, কেউ সিঁড়ি দিয়ে উঠলে জুতোর শব্দ শুনতে পেতাম।

রীণা মুহূর্তখানেক কী ভাবল। জুতোর শব্দ বন্দনা শুনতে পায়নি। কিন্তু সে

নিজে পেয়েছিল। তাহলে ব্যাপারটা কি? ভাবতে ভাবতে বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। কেমন যেন একটা চাপা ভয়—তারপর ‘আচ্ছা চলি’ বলে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এল। বেশ বুঝতে পারল বন্দনা অবাক হয়ে তাকে দেখছে। তারপরই হঠাৎ মনে পড়ল—তাড়াতাড়িতে দরজা খুলে রেখেই এসেছে। ঘরে একা পুপু। তখনই রীণা হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকল।

—না, পুপু নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

রীণা তবু ঘুমন্ত ছেলেকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইল।

আবার মনে মনে সেই চিন্তা—এই যে পুপু একা আছে বলে পড়িমরি করে ছুটে এল—কিসের ভয়ে? শুধু তো ক’ধাপ নেমে দোতলায় গিয়েছিল। এর মধ্যে এমন কি আর ঘটতে পারত? চোর-টোর? তাহলেও তো দোতলার ঘর থেকেই দেখতে পেত।

তাহলে?

তাহলেও সেই এক প্রশ্ন—বেলা পৌনে তিনটে নাগাদ সে যে জুতোর শব্দ শুনেছিল, চকিতের জন্য যার পরনের স্যুট চোখে পড়েছিল সে কে? কেন এসেছিল? কেনই-বা দেখা না করে মুহূর্তে কোথায় চলে গেল?

সঙ্গে হবার আগেই সঞ্জয় ফিরল। কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকে ওপরের দিকে তাকাল। দেখল রীণা পুপুকে নিয়ে ব্যালকনিতে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। যেন তার জন্যেই অপেক্ষা করছে।

সঞ্জয় ডাক্তার মানুষ। স্বাভাবিক নিয়মেই একটু কঠিন। ভয়, ভাবনা, ভাবাবেগ কম। তবু আজ টেলিফোনে রীণার গলার স্বরটা শুনে একটু চিন্তায় পড়েছিল। কেমন যেন ভয়-পাওয়া গলা। কিন্তু কিসের ভয় বুঝতে পারছিল না। এখন হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিশ্চিন্ত হল। সেই সঙ্গে একটু রাগও।

ঘরে ঢুকেই তাই বিরক্ত মুখে জিজ্ঞেস করল—কি ব্যাপার বলো তো?

—বলছি। আগে চা খাও।

সঞ্জয় লক্ষ্য করল রীণার চোখে-মুখে সত্যিই ক্লান্তির ছাপ। কিছু যে ঘটেছে তা বুঝতে পারল।

একটু পরেই রীণা ফিরল দু’কাপ চা আর বিস্কুট নিয়ে। সঞ্জয়কে কাপ এগিয়ে দিয়ে নিজেও একটা কাপ তুলে নিল।

—হ্যাঁ, বলো কী ব্যাপার? সঞ্জয়ের স্বরে কৌতূহল।

রীণা তখন দুপুরের সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলল। শুনে সঞ্জয় খুব খানিকটা হাসল।

—এই কথা শোনার জন্যে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বললে?

রীণা মাথা নিচু করে বলল—কথাটা কি ভাববার মতো নয়?

—পাগল হয়ে গেলে নাকি? বলেই সঞ্জয় উঠে শাট খুলে ফ্যানটা জোরে চালিয়ে দিল।

রীণার মুখ লাল। সে বলল—হ্যাঁ, পাগল বৈকি! আমি নিজে কানে জুতোর শব্দ শুনলাম। নিজে চোখে দেখলাম।

—কি দেখলে? কালো সুটপরা এক সুদর্শন পুরুষ বারান্দার জানলার সামনে দাঁড়িয়ে তোমায় নীরবে নিরীক্ষণ করছেন!

রীণা ধমকে উঠে বলল—বাজে বোকো না তো! আমি কচি খুকি নই যে আজ-বাজে বকব। আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিও না।

—বেশ, এই আমি চুপ করলাম। বলেই ছেলেকে কোলে টেনে নিল।

—এসো তো পুপু সোনা! তোমায় একটু আদর করি। বড়ো হলে তোমায় আমি কালো সুট তৈরি করে দেব। তোমার মামণি কালো সুট খুব ভালবাসে। বলেই রীণার দিকে তাকাল।

রীণা ফুরুর স্বরে বলল, ঠাটা হচ্ছে? বলে হঠাৎ উঠে গিয়ে বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল।

—আরে! এই দ্যাখো! রাগ করে একেবারে শয্যাশায়ী! বলতে বলতে ছেলেকে কোলে নিয়ে উঠে এল সঞ্জয়।

সঞ্জয় পুপুকে শুইয়ে দিয়ে রীণার গা ঘেঁষে বসল। ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে দু'হাত দিয়ে মুখটা তুলে ধরবার চেষ্টা করল।

—আঃ! বিরক্ত কোরো না। বলে রীণা ছিটকে উঠে বসল।

—ঠিক আছে। আমি কাছে থাকলে এতই যখন বিরক্তি তখন বাইরের জরুরি কাজটা সেরেই আসি।

বলে সঞ্জয় উঠে পড়ল। রীণা ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে পথ আগলে দাঁড়াল, যাবে বৈকি!

সঞ্জয় হেসে বলল, তাহলে কুমড়োর মতো একটা গোমড়া মুখের সামনে বসে কি করব?

—কুমড়োর মতো মুখ বৈকি! এই মুখের জন্যেই তো একদিন—পুপুকে দ্যাখো। আমি জলখাবার নিয়ে আসি। বলেই তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

সঞ্জয় একটা জিনিস লক্ষ্য করল—রীণা যেন আজ একটুতেই রেগে যাচ্ছে। ঠাট্টাটুকুও বুঝতে চাইছে না।

তখনকার মতো শান্তি। কিন্তু জের চলল রাতে ঘুমোবার আগে পর্যন্ত।

চুপচাপ শুয়েছিল রীণা। একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল পাখার দিকে। কেমন উন্মনা দৃষ্টি। অথচ অন্যদিন ওর সারাদিনের যত গল্প—সব শোনায় এই সময়। সে সব গল্প এ বাড়ির অন্য ভাড়াটীদের নিয়ে।

—এখনো রাগ পড়েনি?

—কিসের রাগ?

—ঐ যে তখন পাগল-টাগল বললাম কুমড়োর মতো মুখ—

রীণা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুলো—নাগো, রাগের কথা নয়। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করলে না। কিন্তু—আমি কী করে বোঝাব—

—তুমি কি সেই আবির্ভাবটিকে এখনো ভুলতে পারনি?

—কি করে ভুলব? প্রথমে ভেবেছিলাম আত্মীয়দের কেউ দেখা করতে এসেছে। একটু মজা করছে। কিন্তু দরজা খুলে যখন দেখলাম কেউ নেই তখন—

বাধা দিয়ে সঞ্জয় বলল, আরে বাবা, নিশ্চয়ই কেউ ভুল করে তিনতলায় উঠে এসেছিল। তারপর নিজের ভুল বুঝে চুপি চুপি নিচে চলে গেছে। এই তো ব্যাপার। এই নিয়ে—

রীণা এ উত্তরে নিশ্চিন্ত হল না। বলল, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। লোকটা সিঁড়ি দিয়ে নামেনি। আমি এক মুহূর্তের জন্যে লোকটাকে জানলার সামনে দিয়ে বাঁ দিকে যেতে দেখেছি। আর ফিরতে দেখিনি। তুমি নিশ্চয় জান ওদিকটা একেবারে ব্লাইন্ড। ওদিক দিয়ে চলে যাবার উপায় নেই।

সঞ্জয় চুপ করে শুনল।

—তাছাড়া আমি বন্দনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও সারা দুপুর সিঁড়ির সামনের ঘরে বসেছিল। কাউকে উঠতে দেখেনি বা জুতোর শব্দ পায়নি।

রীণার এত কথার পর সঞ্জয় শুধু একটা প্রশ্ন করল, বন্দনা আবার কে?

রীণা বিরক্ত হয়ে বলল, দোতলার নিখিলবাবুর মেয়ে বন্দনাকে চেন না? কত বার এসেছে। দেখেছ।

—আমি নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য মেয়ের দিকে তাকাই না।

—ওঃ! ভারি সাধু—পুরুষদের চিনতে আমার বাকি নেই।

বলে পাশ ফিরে শুলো।

ঘরের মধ্যে হালকা নীল আলো। মাথার ওপর পাখার ঝড়। বাইরে অন্ধকার আকাশে লক্ষ তারার চোখ-টেপা হাসি।

—ঘুমোলে? গাড়িঘরে সঞ্জয় জিজ্ঞেস করল।

—ঘুম আসছে না।

সঞ্জয় পাশ ফিরে ডান হাতটা বুলিয়ে দিল রীণার বুকের ওপর। একটু আকর্ষণ করল। রীণার হালকা দেহটা এসে পড়ল তার নিশ্বাসের মধ্যে।

—এবার ঘুমোও।

—অমন করলে ঘুম হয়? বলে রীণা সঞ্জয়কে আঁকড়ে ধরল।

II চার II

রাত তখন গভীর

নতুন জায়গায় নতুন সংসারে রীণা কিছুটা খাপ খাইয়ে নিয়েছে। তবু বেলা তিনটে বাজলেই ও একটু উৎকর্ণ হয়ে থাকে। একদিন যে এসেছিল সে কি আবার কোনোদিন আসবে? কিন্তু না, বেশ কিছুদিন তো হয়ে গেল আর কাউকে দেখা যায়নি, জুতোর শব্দটুকুও না।

রীণা এখন বেশ নিশ্চিন্ত। কিন্তু ভারি লজ্জা করে সেদিনের কথা ভাবতে। কী যে হয়েছিল—শুধু শুধু ভয় পেয়ে গেল। ছিঃ।

গত রবিবার প্রফেসর রুদ্র এসেছিলেন। ইনি ডাক্তারের ছোটোকাকার বন্ধু। মেডিকেল কলেজে পড়ার সময়ে ওঁর কাছে ওকে প্রায়ই যেতে হতো। তাই সম্পর্কটা খুব ঘনিষ্ঠ।

প্রফেসর রুদ্র কলকাতার এক নম্বর ডাক্তারদের মধ্যে একজন। মানসিক রোগের চিকিৎসা করেন। কলকাতায় এসে পর্যন্ত ডাক্তার ওঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তারপর হঠাৎই গত রবিবার ও প্রফেসরকে নিয়ে এল।

বেশ ভালোই লাগছিল। এই প্রথম একজন চেনাশোনা বিশিষ্ট লোক তাদের বাড়িতে এল। কিন্তু ডাক্তার যখন খুব মজা করে সেদিনের ঘটনাটা প্রফেসর রুদ্রকে বলছিল রীণার তখন লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল।

প্রফেসর অবশ্য কোনো ঠাট্টা করলেন না। হাসলেন একটু।

এখন তাই সেদিনের কথা মনে হলে রীণার ভারি অস্বস্তি হয়।

কিন্তু সেদিন যা দেখেছিল তা কি ভুল? চোখ কি এত বিশ্বাসঘাতকতা করে? হবেও বা। ইংরিজিতে ‘ইলিউসান’ নামে যে একটা কথা আছে তা বোধহয় এইই।

সেদিন হাসপাতাল থেকে ফিরতে সঞ্জয়ের বেশ রাত হয়ে গেল।

ওরা বেশি রাত জাগে না। সাড়ে নটার মধ্যেই রাতের খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়ে। এদিন ওর ফিরতে রাত হওয়ায় রীণা ভয় পাচ্ছিল। হাসপাতাল থেকে ফিরতে সঞ্জয়ের প্রায়ই রাত হয়। কিন্তু কোনোদিন ভয়-টয় করত না। আজ হঠাৎই কেমন ভয় করল। সে কথাটা আর বলল না। খেয়েদেয়ে ওরা শুয়ে পড়ল। রীণা পুপুকে নিয়ে খাটে শোয়। ডাক্তার শোয় মেঝেতে।

অনেক রাতে হঠাৎ রীণার ঘুম ভেঙে গেল। কেন যে ঘুম ভাঙল রীণা ঠিক বুঝতে পারল না। শুনতে পেল যশোর রোড দিয়ে একটা মাতাল চোঁচাতে চোঁচাতে যাচ্ছে। মাতালটা বোধহয় রোজই এই সময়ে যায়। এর আগেও শুনেছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে অশ্রাব্য গাল দিতে দিতে যায়। পরিচিত পরিবেশ। তবু কিরকম যেন গা-হুম্‌হুম করতে লাগল। মনে হল ঘরে বুঝি সে একা! সঞ্জয় বুঝি রুগী দেখে এখনও ফেরেনি। ঘোরটা কেটে যেতেই মনে পড়ল—না, সঞ্জয় অনেকক্ষণ ফিরেছে। ঐ তো মেঝেতে শুয়ে আছে।

এমনি সময় পুপু হঠাৎ কঁদে উঠল। ঠিক এইরকম ভাবেই কঁদেছিল সেই সেদিন বেলা তিনটের সময়ে! কঁদতে কঁদতে পুপু ককিয়ে গেল। রীণা তাড়াতাড়ি পুপুকে কোলে তুলে নিয়ে টর্চ জ্বেলে বিছানা, বালিশের তলা দেখে নিল। না, কিছু নেই।

রীণা তখন পুপুকে বুকে চেপে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করল। পুপু ঘুমের মধ্যেও মাঝে মাঝে কঁদছে। রীণা তখন ওকে শুইয়ে চাপড়াতে লাগল। তখনই হঠাৎ

রীণার মনে হল কোথায় যেন কিসের শব্দ হচ্ছে। অস্পষ্ট শব্দ। মনে হল নিচের তলার কোনো ঘরে কেউ যেন দেওয়ালে পেরেক পুঁতছে।

হবেও বা। হয়তো মশারির দড়িসূঁছু পেরেক উঠে এসেছে কারো ঘরে। তাই পেরেক ঠুকছে। রীণা পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু একটু পরেই আবার শব্দ—এবার সেই হালকা পেরেক পোঁতার শব্দটা ভারী হয়ে উঠছে। কেউ যেন কাঠের জুতো পরে একটা একটা পা ফেলে গুনে গুনে সিঁড়ি ভেঙে তেতলায় উঠে আসছে। রীণা কান খাড়া করে রইল। এত রাতে কে আসছে অমন করে?

হঠাৎ শব্দটা থেমে গেল।

শব্দটা কোথায় এসে থামল দেখার জন্যে ঘাড় ফেরাতেই রীণার শরীরটা হিম হয়ে গেল। দেখল আবছা একটা মূর্তি তাদের বসার ঘরে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরনে যেন কালো কোট, কালো প্যান্ট।

রীণা শুয়ে শুয়েই মানুষটাকে বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল। না, চোখের ভুল নয়। একটা মানুষই। কিন্তু এত আবছা কেন? লোকটা কে হতে পারে?

পুপু আবার কঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রীণা সচেতন হয়ে উঠল।

—ওগো, শুনছ! রীণা চাপা গলায় সঙ্কয়ে ডাকল। ওঠো না। তোমায় বোধহয় কেউ ডাকতে এসেছে।

—আমায়? কোথায়?

—ঐ যে বাইরের ঘরে। টেবিলের কাছে।

অন্ধকারের মধ্যে যতদূর সম্ভব দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে সঙ্কয় তাকাল, কই? কেউ তো নেই।

রীণা বিরক্ত হয়ে বলল, ঐ তো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সঙ্কয় তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে কিসে যেন ধাক্কা খেল। মশারির দড়িটা ছিঁড়ে গেল। অন্ধকারে দেওয়াল হাতড়ে সুইচ নামিয়ে দিল। আলো জ্বলল না। লোডশেডিং।

সঙ্কয় বিছানা থেকে বড়ো টর্চটা নিয়ে জ্বালল। আর ঠিক তখনই কি যেন পড়ে বনবন করে ভেঙে গেল।

টর্চের আলো অন্ধকার দু'ফাঁক করে সোজা সিঁড়ির মুখে গিয়ে পড়ল।

—কই? কোথায়?

—ঐ যে—বাথরুমের দিকে। ঐ যে ঢুকছে—রীণা চিৎকার করে উঠল।

সঙ্কয় টর্চ হাতে সেই দিকে ছুটল।

—যেয়ো না, যেয়ো না—

সে কথায় কান না দিয়ে সঙ্কয় দৌড়ে বাথরুমে ঢুকল।

কিন্তু কোথায় কে? শুধু ফ্ল্যাশের পুরনো ট্যাঙ্ক চুইয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ে যাচ্ছে।

—তোমার যত আজগুবি কাণ্ড! বলতে বলতে সঙ্কয় ঘরে ফিরে এল।



—কী আজগুবি কাণ্ড? কেমন একরকম তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রীণা তাকাল।  
সে দৃষ্টি অস্বাভাবিক। সঞ্জয় সতর্ক হল। আর কিছু বলল না।

সে রাত্তিরে দুজনের কারোরই ভালো করে ঘুম হল না। সঞ্জয় খুবই বিরক্ত।  
বিরক্ত হবার কারণও আছে। সারাদিন হাসপাতালে ডিউটি গেছে। ডিউটির পরও  
রুগী দেখতে ছুটতে হয়েছে। তারপর আবার এই ব্যাপার। রাতিরটুকুতেও যদি  
ঘুম না হয় তাহলে তো আর পারা যায় না।

অন্ধকারেই কোনোরকমে মশারির দড়ি ঠিক করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল,  
ঠিক কি দেখেছ বলো তো?

রীণা তখন অনেকটা স্বাভাবিক। সব ব্যাপারটা বলল।

সঞ্জয় কিছুটা বিরক্তি, কিছুটা বিক্রপের সুরে বলল, আবার সেই ব্ল্যাক সুট!  
কি করে ভাবতে পারলে রাত দুপুরে একজন লোক এসে বাইরের ঘরে ঢুকেছে?  
এটা কি সম্ভব? দরজাটাও তো তুমি নিজে বন্ধ করেছিলে। ঐ দ্যাখো, দরজা  
এখনো বন্ধ। বলেই মশারির ভেতর থেকেই দরজার ওপর টর্চ ফেলল।

রীণা চুপ করে রইল। তারপর শুকনো গলায় বলল, কি একটা পড়ে ভেঙেছে।

সঞ্জয় বলল—হ্যাঁ, সেও তোমার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা। কই আমি তো  
ভাঙার চিহ্নমাত্রও দেখতে পেলাম না।

রীণা কোনো একটিরও উত্তর দিতে পারল না। বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে  
পড়ল।

সঞ্জয় হেসে বলল, নাঃ, তোমার দেখছি নার্ভ ফেল করছে। এরপর মাথাটা  
একেবারে যাবে।

—বিশ্বাস করো—

রীণা মিনতির স্বরে আরো কি বোঝাতে যাচ্ছিল, সঞ্জয় বলল, ও সব কথা  
থাক। এখন একটু ঘুমোও তো। বলে নিজেই পাশবালিশ আঁকড়ে শুয়ে পড়ল।

সকালের রোদ খাটের ওপর পর্যন্ত উঠে এসেছে। সঞ্জয় তখনো ঘুমোচ্ছে।  
হয়তো আরো কিছুক্ষণ ঘুমোত। কিন্তু রীণার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল।

—এ-ই শুনছ!

—উঁ।

—একবার এসো না।

—দূর বাবা, ওখান থেকেই বলো না।

—বললে হবে না। তাড়াতাড়ি এসো।

—উঃ! জ্বালালে! সকাল থেকেই—

ঘুম জড়ানো চোখে সঞ্জয় উঠে এল।

—এসো এইখানে। এটা কি? রীণা আঙুল দিয়ে মেঝেটা দেখাল।

সঞ্জয় দেখল টেবিলের নিচে একটা গেলাস ভেঙে পড়ে আছে।

রীণা দু'হাত কোমরে রেখে বলল, খুব তো বলেছিলে আমি পাগল হয়ে গেছি। এখন নিজের চোখেই দ্যাখো।

সঞ্জয় হেঁট হয়ে কাচগুলো পরীক্ষা করতে লাগল। গেলাসটা উঁচু জায়গা থেকেই পড়ে ভেঙেছে। কেউ যেন টেবিল থেকে গেলাসটা ইচ্ছে করে ফেলে দিয়েছে!

এখন বুঝছ?

সঞ্জয় বাসি মুখেই একটা সিগারেট ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, বলতে চাও ভূতে গেলাস ভেঙেছে?

—আমি আর কি বলব? তুমি নিজেই দ্যাখো।

—টেবিলের ধারে গেলাসটা রেখেছিলে, টিকটিকি-ফিক্‌টিকিতে ফেলে দিয়েছে।

—না কক্ষণো ধারে রাখিনি। গেলাস কেউ টেবিলের ধারে রাখে না।

সঞ্জয় কোনো উত্তর দিল না। খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে সিগারেট খেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে হেসে বলল, এতে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। বেড়ালের কাজ। যাও, এখন বেশ ফাস্ট ক্লাস করে চা করো দিকি। মেজাজটা আসুক। আমি ততোক্ষণ আর একটু শুই। বলে সঞ্জয় আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

রীণা দাঁড়িয়ে রইল জানলার সামনে। উদ্ভ্রান্ত মন। শহর কলকাতা জেগেছে। অতি পরিচিত সকাল। কিন্তু দিনের শুরু থেকেই মনটা ভারী হয়ে রইল।

॥ পাঁচ ॥

একখানি ছবি

হাসপাতালে বেরোবার সময়ে রীণা বলল, সন্দের মধ্যে ফিরবে কিন্তু।

সঞ্জয় হেসে বলল, বাইরে বেশিক্ষণ থাকার তেমন কোনো আকর্ষণ এখনো পর্যন্ত নেই।

—ঠাট্টা রাখো। সন্দেরেলা লোডশেডিং হলে আমার খুব ভয় করে।

জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে সঞ্জয় বলল, খাস কলকাতা শহরে থেকেও ভয়? তাও তো তিনতলার ওপর।

উত্তরের অপেক্ষা না করে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল, রীণা বলল, আমার জিনিসগুলো আনতে ভুলো না।

—না, ভুলব না। তবে তুমিও একটা কথা মনে রেখো, রাণ্ডিরের ব্যাপারগুলো যেন তোমার বান্ধবীটিকে বলো না। এক কান থেকে পাঁচ কানে চলে যাবে। লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

—আমার আবার বান্ধবী কে? রীণার কপালে সুন্দর ভাঁজ পড়ল।

—ঐ যে নিচে—বলে সঞ্জয় আঙুল দিয়ে দৌতলার ঘরটা দেখিয়ে দিল।

—ওঃ! বন্দনার মা। রীণা একটু হাসল, বান্ধবী হতে যাবেন কেন? বয়েসে ডের বড়ো। তবু ওঁরা কাছে থাকেন বলে গল্প করে বাঁচি।

—গল্প যত পারো করো। শুধু ভূতের গল্প ছাড়া।

বলতে বলতে সঞ্জয় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

সন্দের আগেই সঞ্জয় ফিরল। হাতে কিছু জিনিসপত্র ছিল বলে ট্যান্ড্রি করে ফিরতে হয়েছিল। ট্যান্ড্রি থেকে নামতেই মহিমারঞ্জনবাবু নমস্কার করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে আরো কয়েকজন। এঁরা সবাই এ বাড়িরই ভাড়াটে। সকলের সঙ্গে আলাপ নেই। আলাপ করার সময়ও নেই। একজনের সঙ্গেই মাঝেমাঝে কথাবার্তা হয়। তিনি দোতলার নিখিলবাবু-বন্দনার বাবা। এঁদের মধ্যে সঞ্জয় তাঁকে দেখতে পেল না।

—কিছু বলবেন? সঞ্জয় প্রতি-নমস্কার করল।

—কাল রাত্তিরে আপনার ঘরে একটা যেন গোলমাল শুনলাম!

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বললেন, আমরাও শুনেছিলাম। ভেবেছিলাম সকালেই জিজ্ঞেস করব কিন্তু এত ব্যস্ত হয়ে আপনি বেরিয়ে গেলেন যে—

মহিমাবাবু কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, আমার ওয়াইফ তো রাত্তিরেই খোঁজ নিতে যাচ্ছিলেন। বললেন, একই বাড়ির বাসিন্দে। বিপদ-আপদ হলে পাশে দাঁড়াতে হয়। তা আমি বারণ করলাম—এখুনি যেও না। আগে দ্যাখো গুরুতর কিছু কি না। তা ওয়াইফ আর গেলেন না। আমরা দুজনেই অনেকক্ষণ জেগে রইলাম। আর কিছু শুনতে পেলাম না। তখন নিশ্চিন্তে ঘুমুলাম।

সঞ্জয় একটু হাসল। —ধন্যবাদ। ব্যাপার কিছুই নয়। একটা বাজে স্বপ্ন দেখে আমার স্ত্রী ভয় পেয়েছিলেন।

—তাও ভালো। আমরা ভাবলাম বুঝি চোর ডাকাত। যা দিনকাল পড়েছে।

আর একজন বললেন, কিন্তু ঝন্ঝন্ করে একটা কাচের জিনিস ভাঙার শব্দ পেলাম যেন।

—ও কিছু নয়। সঞ্জয় তাড়াতাড়ি এড়িয়ে যেতে চাইল—টেবিলে গেলাসটা ছিল। হলো বেড়াল লাফিয়ে উঠতে গিয়ে—

ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন, হলো বেড়াল! বলেন কি!

মহিমাবাবু মাথা নাড়লেন, এ বাড়িতে তো এতদিন রয়েছে। বেড়াল তো দেখিনি। বিভূতিবাবু কি বলেন?

বিভূতিবাবু সিগারেট খাচ্ছিলেন। একমুখ ঘোঁয়া ছেড়ে বললেন, হলো বেড়াল! আজ পর্যন্ত একটা বেড়ালছানাও তো চোখে পড়েনি, বেড়াল থাকলে তো বেঁচে যেতাম। ইঁদুরের স্বালায় অস্থির।

সঞ্জয় এঁদের অহেতুক কৌতূহলে বিরক্ত হচ্ছিল। কোনোরকমে পাশ কাটিয়ে বলল, তাহলে হয়তো ইঁদুরেই ভেঙে থাকবে। আচ্ছা, আমি এখন যাই। আমার স্ত্রী অপেক্ষা করছেন।

বলেই সিঁড়ির দিকে চলে গেল। মহিমাবাবুরা কেমন একটু অবাক হয়ে সঞ্জয়কে দেখতে লাগল।

—ভদ্রলোক বড়ো অহংকারী।

আর একজন বললে—ডাক্তার কিনা।

খুবই বিরক্ত হয়েছিল সঞ্জয়। কাল রাত্তিরের ব্যাপারটা তাহলে জানাজানি হয়ে গেছে। ব্যাপারটা যে নিতান্তই তুচ্ছ তা ওঁরা যেন মানতে চাইছেন না। আসলে এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা যুক্তির ধার ধারতে চায় না। ভয় পেতে আর ভয় পাইয়ে দিতে ভালোবাসে।

পরক্ষণেই সঞ্জয়ের মনে হল, একটা গৌজামিল কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। সেটা ঐ গেলাস ভাঙা নিয়ে। সত্যিই তো এখানে এসে পর্যন্ত একটা বেড়ালও কোনোদিন চোখে পড়েনি। তাহলে কাল রাত্তিরে হঠাৎ বেড়াল এল কোথা থেকে? এলই যদি তো গেল কোথায়? আর এল এমন সময়ে যখন নাকি রীণা দেখছিল কিছু একটা! নাঃ, এর কোনো মীমাংসা নেই দেখছি।

—বাবাঃ! কী এত গল্প হচ্ছিল ওঁদের সঙ্গে? হাসতে হাসতে রীণা এসে দাঁড়াল দরজার সামনে।

যাক, রীণাকে বেশ স্বাভাবিক লাগছে। মুখে বললে, গল্পই বটে। কাল রাত্তিরের ব্যাপারটা সব জানাজানি হয়ে গেছে। চেষ্টামেচি করে যা একটা কাণ্ড করলে!

—কাণ্ড তো আমিই করেছি! গেলাসটাও আমি ভেঙেছি না?

আবার সেই গেলাস! সঞ্জয় বিষয়টা খেড়ে ফেলবার জন্যে হেসে বলল, খুব খোশ মেজাজ দেখছি। আজ আর বুঝি তিনি দর্শন দেননি?

মুহূর্তে রীণার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

—দোহাই তোমার! আর মনে করিয়ে দিয়ে না। হাত মুখ ধুয়ে নাও। আজ কি জলখাবার করেছি বল দিকি?

—ঘুগনি-স্পেশালিস্টের হাতে ঘুগনি ছাড়া আর কি হবে?

—আহা! ঘুগনি ছাড়া আর যেন কিছু করি না? নিন্দুক আর কাকে বলে? বলতে বলতে রীণা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

একদিন রীণার কথাবার্তা শুনে, মুখ চোখের অবস্থা দেখে সঞ্জয় দৃষ্টিভ্রম পড়েছিল। আজ ওর এই হাসিখুশি ভাব দেখে যেন নিশ্চিন্ত হল।

পুপু শুয়ে শুয়ে খেলা করছিল। সঞ্জয় কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগল।

গত রাত্তিরের আতঙ্ক ভোলার জন্যে আজ রীণা সারা দুপুর নানা কাজে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিল। কিছুক্ষণ দোতলায় নেমে গিয়ে নিখিলবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করেছে। মহিলাটিকে রীণার খুব ভালো লাগে। ওপরে এসে কিছুক্ষণ নতুন-কেনা টেপটা বাজিয়েছে। মেশিনে পুপুর জন্যে একটা জামা সেলাই করতে বসেছিল। সাড়ে তিনটে নাগাদ রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকেছিল কেক তৈরি করার জন্যে।

কেক খেয়ে সঞ্জয় ভারি খুশি।

—আঃ! দারুণ! দাঁড়াও, আমিও কিছু এনেছি তোমার জন্যে। বলে ব্যাগ থেকে কতকগুলো প্যাকেট বার করল। এই নাও তোমার ডালমুট।

খুশিতে রীণার দু'চোখ নেচে উঠল। —বাল নয় তো? পুপু আবার খেতে শিখেছে।

—খেয়েই দ্যাখো। আর—এই পুপুর দুধ। এই চা। এবার খুব ভালো ফ্লেভারওলা চা এনেছি। এই তোমার স্যাটিফিকেটের জেরক্স কপি।

—যাক বাঁচলাম। কি ভাগ্য স্যাটিফিকেটগুলো হারাওনি।

—আমি সময়ে সময়ে হার মানি, কিন্তু চট করে কিছু হারাই না।

—থাক্। হয়েছে। আজ পর্যন্ত কটা ছাতা, কটা টর্চ, কটা পেন হারিয়েছ তার হিসেব দেব? ওটা আবার কি? ব্যাগের মধ্যে!

—ঐ দ্যাখো, একদম ভুলে গেছি। অবশ্য এমন-কিছু নয়। একটা ছবি।

গত কাল হাসপাতাল থেকেই সঞ্জয় গিয়েছিল এক বৃদ্ধ রুগীকে দেখতে। বৃদ্ধ সঞ্জয়ের চিকিৎসায় ক্রমশ উন্নতি করছে।

রুগী দেখা হয়ে গেলে তাঁর বাড়ির লোক অনুরোধ করল এক কাপ কফি খাবার জন্যে। সঞ্জয় খুব টায়ার্ড ছিল। খেতে রাজী হল।

বাইরের ঘরে বসে বৃদ্ধের ছেলের সঙ্গে সঞ্জয় গল্প করছিল। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সে বাড়িটা দেখছিল। পুরনো বাড়ি। সামনে অনেকখানি উঠোন। ওদিকে ভাঙা পুজোদালান। বাড়ির একদিকটা ভেঙে পড়েছে।

সঞ্জয় জিজ্ঞেস করল, গোটা বাড়িটাই আপনাদের?

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, হ্যাঁ।

—পুজোটুজো হতো দেখছি।

—হ্যাঁ, সে-সব বহুকাল আগে। দুর্গাপুজো, কালীপুজো দুইই হতো। শুনেছি একবার বলি বেধে যাওয়ার পর থেকে পুজো বন্ধ হয়ে যায়।

—বাড়িটা কবে তৈরি হয়েছিল?

ভদ্রলোক বললেন, তা বলতে পারি না। ঠাকুর্দা কিনেছিলেন জলের দরে, সেই বর্ষিং-এর সময়ে।

সঞ্জয় কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, আচ্ছা, আগে তখন এই-সব জায়গা কিরকম ছিল?

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, আমি ঠিক বলতে পারব না।

সঞ্জয় একটু লজ্জিত হল। বলল, তা ঠিক। আপনি আর কি করে বলবেন? আসল কথা কি জানেন, এইরকম পুরনো বাড়ি দেখলে আমার কেমন কৌতূহল হয় এর অতীতকে জানার জন্যে।

ভদ্রলোক বললেন, সে-সব জানতে হলে বাবার কাছে চলুন।

সঞ্জয় একটু ইতস্তত করল। রুগীর কাছে ডাক্তার একই সময়ে দু বার গেলে রুগী ঘাবড়ে যেতে পারে।

ভদ্রলোক বললেন, আপনি ভাববেন না। আমি বাবাকে বলে আসছি।

ভদ্রলোক ওপরে চলে গেলেন। একটু পরে এসে বললেন, আসুন।

বৃদ্ধ খাতির করে সঞ্জয়কে বসালেন। বললেন, আপনি কি এ বাড়িটা সম্বন্ধেই কিছু জানতে চান?

সঞ্জয় বলল, না, শুধু এ বাড়িটাই নয়। এরকম বোধ হয় আরো অনেক পুরনো বাড়ি আছে। এই ধরুন আমি যে বাড়িটায় ভাড়া আছি—

—সেটা কোথায়?

—যশোর রোডের ওপরে বাঙ্গুরের কাছে। সে বাড়িটাও খুব পুরনো। তিনতলা বাড়ি। তিনতলাটা ইনকমপ্লিট। ওপরে আবার একটা ভাঙা গম্বুজের মতো আছে।

বৃদ্ধ বললেন, পুরনো বাড়ি সম্বন্ধে আপনার কৌতূহল আছে জেনে খুব ভালো লাগল। কলকাতায়—বিশেষ করে মারাঠা ডিচের ওপাশের জায়গাগুলো একশো-দেড়শো বছর আগে কী ছিল তা কল্পনাই করা যায় না। এ বিষয়ে আমি একজনের নাম জানি, গোটা উল্টোডিঙি এলাকার অর্থাৎ আজ যাকে বলে লেকটাউন, কালিন্দী, বাঙ্গুর, বরাট এ-সব জায়গার ঠিকুজি-কুপ্তী তাঁর কণ্ঠস্থ। তাঁর নাম শিবানন্দ ভট্টাচার্য। থাকেন বাগুইহাটিতে। বয়েস একশো তিন। ইচ্ছে করলে তাঁর কাছে যেতে পারেন।

—একশো তিন বছর বয়েস! সঞ্জয় অবাক হল।

—হ্যাঁ, এখনো তেতলা-একতলা করেন। সারাজীবন জ্যোতিষচর্চা নিয়ে থেকেছেন— জপ-তপ-ব্রহ্মচর্য—ওসব মশাই আলাদা স্তরের মানুষ। দাঁড়ান, ওঁর ছবি দেখাচ্ছি।

এই বলে ছেলেকে ইশারা করলেন। ভদ্রলোক তখনই ভেতরে চলে গেলেন। একটু পরেই ফিরে এলেন। হাতে জীর্ণ একটা খাম। বৃদ্ধ খাম থেকে জীর্ণতর বিবর্ণ একটা ফটোগ্রাফ বের করলেন।

—এই হলেন শিবানন্দ ভট্টাচার্য। আর তাঁর পদতলে আমি।

সঞ্জয় ছবিটা দেখল। পিছনে লেখা রয়েছে—পরম নৈহাম্পদ শ্রীমান কপিলেশ্বর চৌধুরীকে স্নেহোপহার। নিচে তাঁর স্বাক্ষর। সেই সঙ্গে ঠিকানা।

—ছবিটা আপনি নিয়ে যান। বয়েসের জন্যে ওঁর মেজাজটা এখন রুক্ষ হয়ে গেছে। যদি আপনি দেখা করতে যান তাহলে এই ছবিটা দেখিয়ে বলবেন আমি পাঠিয়েছি। তা হলে উনি বোধহয় আপনাকে ফিরিয়ে দেবেন না।

ছবিটা কাল রাত্তিরে আর বের করা হয়নি। বাইরের ঘরে ব্যাগের মধ্যেই ছিল।

ছবিটা রীণা খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখছিল। সঞ্জয় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলল, কি এত দেখছ?

—এত বয়েস কিন্তু চোখ দুটো দ্যাখো যেন জ্বলছে। মনে হচ্ছে যেন ত্রিকালদর্শী কোনো সাধক।

বলতে বলতে রীণার দু চোখও যেন কেমন অস্বাভাবিক হয়ে উঠল।

সঞ্জয় অবাক হয়ে বলল, অমন করে দেখছ কেন?

—এঁকে কোথায় যেন দেখেছি। কোথায়—

—এঁকে আবার দেখবে কি করে? বহুকাল কলকাতার বাইরে যাননি। তুমিও বড়ো একটা কলকাতায় আসনি।

রীণা কোনো উত্তর দিল না। হঠাৎ উঠে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

—কী হল?

—মাথার ভেতরটা কিরকম করছে!

॥ ছয় ॥

## আবার রহস্য

আবার সেই নিঃসঙ্গ দুপুর।

সকালবেলায় সঞ্জয় চলে গেছে। তারপর রীণা পুপুকে স্নান করাল, খাওয়ালো, ঘুম পাড়াল। এক ফাঁকে নিজের নাওয়া-খাওয়াও সেরে নিল। সব চুকতে চুকতে বেলা একটা। এই পর্যন্ত বেশ কাটে। এর পরের চারটে ঘণ্টাই এখন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত দুপুরে একটু ঘুমোত কিংবা বন্দনার মায়ের সঙ্গে গল্প করত। কিন্তু এখন ঘুম তেমন আসে না। দোতলায় যেতেও ইচ্ছে করে না। বন্দনার মা মানুষটি খুবই ভালো। সরল সাদাসিধে। অনেক মহিলার যেমন পরের সংসারের ব্যাপারে অহেতুক কৌতূহল থাকে এঁর সেরকম কিছু নেই। যে যা বলে শুনে যান। নিজের সংসারের সাধারণ ব্যাপার অকপটে বলেন। তাই এঁকে ভালো লাগে। মনে প্যাঁচ নেই। কিন্তু ইদানীং তাঁর কাছেও আর যাচ্ছে না। সঞ্জয় বলে দিয়েছে, সাবধান, ওসব কথা যেন বলে ফেলো না। রীণার ভয়, কথায় কথায় যদি বলে ফেলে!

ফলে দুপুরটা কাটানো এখন সমস্যা হয়ে উঠেছে। অবশ্য নতুন একটা অবলম্বন পেয়েছে শিবানন্দ ভট্টাচার্যের সেই ছবিখানা।

ইচ্ছে ছিল ওটা বাঁধিয়ে রাখবে। কিন্তু পরের জিনিস। হয়তো ফেরত দিতে হবে। তাই বাঁধাতে পারেনি।

না বাঁধালেও ছবিটা টেবিলের কাছে একটা তাকের ওপর রেখে রোজ দুপুরে ফুল-পাতা দিয়ে পূজো করে। কেন পূজো করে তা ও জানে না। তবে ওর কেমন মনে হয় এ মানুষ সাধারণ লোক নয়।

এই নিয়েও সঞ্জয় তাকে খুব ঠাট্টা করে। রীণা চুপ করে থাকে। পুরুষমানুষের সব কথায় কান দিলে চলে না।

কিন্তু নির্বাক ছবি নিয়েই বা কতক্ষণ ভুলে থাকা যায়? এক সময়ে শ্রান্তি আসে। তখনই আবার মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

আজও তেমনি হল। হঠাৎই একটা অস্থিরতা মনের ভেতর যেন কিরকম করছে। মনে হচ্ছে কিছু বুঝি ঘটতে চলেছে। বুঝি এখনই কারো জুতোর শব্দ পাওয়া যাবে সিঁড়িতে। কেউ বুঝি ভারী পা ফেলে ফেলে উঠে আসবে।

রীণা তখনই নিজেকে ঝটকা মেরে ঠিক করে নিতে চায়। এ সব কি আবোলতাবোল চিন্তা? কবে একদিন কী দেখেছিল সেই ভুলটাই শেষ পর্যন্ত পেয়ে বসল নাকি? শেষ পর্যন্ত একটা মানসিক ব্যাধির শিকার হয়ে দাঁড়াবে?

তখনই মনে পড়ল সেদিন রাত্তিরের ব্যাপারটা। সেটাও কি ভুল? সেটাও কি মানসিক বিকার?

ভাবতে ভাবতে রীণার হাত দুটো কিরকম ঠাণ্ডা হয়ে এল। কপালে চিনচিনে ঘাম। ও তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল।

সামনেই যশোর রোড। শেষ আষাঢ়ের মেঘলা আকাশ। বাস ছুটছে উর্ধ্বশ্বাসে। লোক হাঁটছে ফুটপাথ উপচে।

একটা নীল রঙের বাস চলে গেল। ওটা বোধহয় কোনো ইন্সুলের বাস। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কলকাকলি। আঃ! রীণা যেন নিশ্বাস নিয়ে বাঁচল। বাচ্চারা ই সংসার ভরে রাখে, একমাত্র ওরাই পারে শোক-দুঃখ ভুলিয়ে দিতে। তার পুপুসোনাও একদিন এমনি করে বাসে চেপে ইন্সুলে যাবে।

এমনি সময়ে দরজায় শব্দ হলো—ঠুক-ঠুক। কে যেন অতি সন্তুর্পণে দরজার কড়া নাড়ছে। রীণা চমকে উঠল।

—কে? বলে সাড়া দিতে গেল। কিন্তু প্রথমে গলা থেকে স্বর বেরোল না।

তারপর অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ আত্মস্বরে চোঁচিয়ে উঠল—কে?

—আমি বন্দনা।

তাও ভালো। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল হঠাৎ বন্দনা কেন? ও তো বড়ো-একটা ওপরে আসে না। তবে কি কোনো ফোন—কোনো খারাপ খবর—

রীণা দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

—আপনার চিঠি।

চিঠি! চিঠি আবার এখানে কে দেবে? কেন দেবে?

চিঠি নিতে গিয়ে হাত কঁপে উঠল।

—কার চিঠি?

কথাটা স্বগতোক্তি। কিন্তু বন্দনার মনে হল যেন তাকেই জিজ্ঞেস করছে। সে অবাক হয়ে রীণার দিকে একবার তাকাল। তারপর নিচে নেমে গেল।

এবার চিঠি খোলার পালা। কিছুতেই আর রীণা চিঠিটা খুলতে পারছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল কে লিখেছে? কী লিখেছে?

শেষ পর্যন্ত চিঠিটা খুলল। প্রথমেই দেখে নিল নামটা।—ও মাস্ত! বাবাঃ! যা ভয় করেছিল।

চিঠিটা নিয়ে দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসল।

ভাই রীণা,

তোর চিঠি পেয়ে কী যে খুশি হয়েছি তা লিখে বোঝাতে পারব না।



কিছুদিনের জন্যে আমরা সকলে পুরী বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেইজন্যে চিঠির উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেল। জানি আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে কিছু মনে করবি না।

যাক, শেষ পর্যন্ত তুই কলকাতায় এলি। অনেক দিন পর আবার আমাদের দেখা হবে। অনেক গল্প জমে আছে।

কিন্তু তোর চিঠির শেষ দিকটার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারলাম না। কলকাতার মতো জায়গায় নির্জন দুপুরে কিসের এত ভয়? এ তো আর আমাদের দেশের বাড়ি নয়! তবু তো বাঙ্গুরের মতো জায়গায় চট করে বাড়ি পেয়ে গেছিস। ভাগ্য ভালো বলতে হবে।

একটা ভয় অবশ্য আছে, চোর-ডাকাতির। তার চেয়েও ভয় ঠগ-জোচ্চোরদের। কত ছুতো করেই-না ওরা বাড়ি বাড়ি ঢোকে। এসব ভয় এখন সব জায়গাতেই। খুব সাবধান। দরজা সব সময়ে বন্ধ করে রাখবি। সাড়া না নিয়ে দরজা খুলবি না। দরজায় আই-হোল নেই? না থাকলে ব্যবস্থা করে নিবি।

হ্যাঁ, তারপর লিখেছিস ম্যাজিক দেখতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলি। সেটা নিশ্চয় স্বাভাবিক কোনো কারণে। হয়তো তোর লো প্রেসার আছে। কিংবা অন্য কিছু। সে তো ভালো বলতে পারবে তোর নিজের ডাক্তার।

ছোটবেলায় ম্যাজিক দেখতে গিয়ে নররাক্ষসের কথা হঠাৎ এতদিন পর মনে পড়ল কেন? নররাক্ষসের খেলা লুপ্ত আমিও দেখেছিলাম। সত্যিই বীভৎস খেলা...

এই পর্যন্ত পড়েই রীণা আর পড়তে পারল না। শরীরটা কিরকম করে উঠল। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল।

সেই দিনই—

মাঝরাতে হঠাৎ পুপু কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে জেগে উঠল রীণা। এ সেই কান্না। যেন কিছুতে কামড়েছে।

রীণা তাড়াতাড়ি পুপুকে বুকে টেনে নিল। মায়ের বুকে নির্ভয় আশ্রয়ে থেকে কান্নাটা একটু কমল কিন্তু একেবারে থামল না।

রীণা পুপুকে চাপড়াতে চাপড়াতে ঘুম পাড়াতে লাগল বটে কিন্তু কান ছিল সজাগ। প্রতি মুহূর্তে একটা কিছুর প্রতীক্ষা!

কিসের প্রতীক্ষা?

একটু পরেই সেই শব্দ! নিচে কোথায় যেন কার ঘরের দেওয়ালে কে পেরেক পুঁতছে ঠক্-ঠক্-ঠক্—

ক্রমশ সেই শব্দটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। কে যেন—পেরেক নয়—কিছু একটা পুঁততে পুঁততে ওপরে উঠে আসছে।...

তারপরেই সব চুপ।

কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরেই পরিষ্কার শুনতে পেল জুতোর শব্দ। বাইরের বন্ধ দরজার কাছে এসে শব্দটা থামল। সঙ্গে সঙ্গে পুপু আবার চিংকার করে কেঁদে উঠল।

আজ কিন্তু রীণা এতটুকু আত্মহারা হয়ে যায়নি। পুপুর এই যে কান্না এটা যে স্বাভাবিক নয় তা সে বুঝে নিয়েছে। যে এসেছে তার সঙ্গে এই কান্নার যোগ আছে। সে এও জানে বাইরে যে এসে দাঁড়িয়েছে বাইরে থেকেই সে চলে যাবে না। সে ভেতরে আসবেই।

রীণা তাই পুপুর কান্না শুরু হওয়ার পর থেকেই প্রতিটা মুহূর্ত অনুভব করতে পারছিল।

এবার রীণা দূর দূর বৃকে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল। অন্ধকার বাইরের ঘরে প্রথমই যেটা নজরে পড়ল সেটা হচ্ছে দুটো জ্বলন্ত চোখ। অন্ধকারে ভাসছে।

রীণা চোঁচাল না—কিংবা চোঁচাতে পারল না। এক হাতে পুপুকে বৃকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে অন্য হাতে বিছানার চাদর শক্ত করে চেপে রইল।

রীণা দেখছে তো দেখছেই। সেই জ্বলন্ত চোখ দুটো থেকে নিজের চোখ সরিয়ে নেবার উপায় নেই।

একটু পরেই অন্ধকারের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম শরীর ভেসে উঠল। ক্রমে সেই শরীরের ওপর দেখা দিল কোট প্যান্ট। কালো পোশাকটা অন্ধকারে যেন মিশে ছিল। এতক্ষণে ফুটে উঠল।

এই অবস্থাতেও—আশ্চর্য—রীণা তুলনা করছিল আগের রাতে দেখার সঙ্গে আজকের এই দেখা। সেদিন যেন সবই বড়ো তাড়াতাড়ি। সবই যেন অতর্কিতে। আর আজ? আজ যা ঘটছে সব ধীরে ধীরে—সময় মেনে মেনে।

কিন্তু এ দেখাও কি চোখের ভুল?

না, সে স্বপ্ন দেখছে না। জেগে আছে। এই তো পুপু বৃকের মধ্যে মুখ গুঁজেও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এই তো মশারি টাঙানো। মেঝেতে মশারির মধ্যে পুপুর বাবা শুয়ে। ঐ তো রাস্তায় লরীর শব্দ...কোনোটাই তো ভুল নয়। তাহলে?

হঠাৎই দেখল মূর্তিটা টেবিলের কাছে পাক খাচ্ছে। এক বার, দু'বার, তিন বার। তারপরেই জ্বলন্ত চোখ দুটো শূন্যে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসতে লাগল। রীণা আর চুপ করে থাকতে পারল না। চিংকার করে উঠল—ওগো! শু-ন-ছ—

ধড়মড় করে উঠে বসল সঞ্জয়।

—আঁা, কি হয়েছে?

—আবার এসেছে—আবার এসেছে।

বলতে বলতে রীণা কেঁদে উঠল। পুপুও ঠিক তখনই ককিয়ে কাঁদলে লাগল।

মুহূর্তমাত্র।

সঞ্জয় টচ হাতে মশারি তুলে বাইরের ঘরে ছুটে গেল। সুইচ অন করার সময়ও পেল না।

অঙ্ককারের মধ্যে ডাক্তারের হাতের পাঁচ ব্যাটারির টর্চের আলো ছিটকে পড়ল।

—না, কেউ কোথাও নেই।

এবার সঞ্জয় সব ঘরের সুইচ অন করে দিল। দু'খানা ঘর আলোয় ভরে গেল। দেখা গেল দরজা যেমন ভেতর থেকে বন্ধ ছিল তেমনই বন্ধ রয়েছে।

—কই? কোথায় কে? বিরক্তির সঙ্গে বিদ্রূপ ঝলকে উঠল সঞ্জয়ের গলায়। রোজ রোজ এইভাবে Scene create করবে? ঘুম নষ্ট— তাছাড়া লোকেই বা কী বলবে? তোমার বোঝা উচিত—

রীণা শুধু ক্লান্ত স্বরে বলল—ও এসেছিল গো—সত্যিই এসেছিল। তুমি বিশ্বাস করো। উঃ! বুকের মধ্যে এখনো কিরকম করছে।

বলতে বলতে রীণা হঠাৎ মেঝেতে শুয়ে পড়ল।

—কী হল? রীণা—রীণা—

রীণার বুকের ভেতর থেকে একটা ঘড়ঘড়ে স্বর বেরিয়ে এল। তারপর সঞ্জয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ইশারা করল।

সঞ্জয় তাড়াতাড়ি কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে এল। রীণা কোনোরকমে সঞ্জয়কে আঁকড়ে ধরে উঠে বসে গেলাস নিঃশেষ করে জল খেল। তারপর দেহ এলিয়ে খনখনে গলায় বলল, আমি মরে যাব। ও আমাকে মারবে। বেশ বুঝতে পারছিলাম লোকটা চোখে ইশারা করে আমাকে ডাকছিল। আমি জানি ওটা হচ্ছে মরণডাক। আমাকে বোধহয় মরতে হবে।

সঞ্জয় ধমক দিয়ে বলল, কী যা তা বকছ! এরকম করলে কালই তোমায় হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে আসব।

—তোমার যা ইচ্ছে তাই করো, যেখানে খুশি পাঠাও, আমি এখানে আর টিকতে পারব না।

—বেশ, তাই হবে। এখন বলো তো ঠিক কি দেখেছিলে।

সঞ্জয় একটা সিগারেট ধরাল।

রীণা সব ঘটনা বলে গেল।

দৈর্ঘ্য ধরে সঞ্জয় সব শুনে গেল। কথার মধ্যে নিজে একটি কথাও বলেনি।

রীণার কথা শেষ হলে বলল, টেবিলের কাছে ঘুরছিল?

—হ্যাঁ। টেবিল থেকে দেওয়াল। একবার মনে হল যেন দেওয়ালের মধ্যে মিশে গেল। তারপরেই দেখি আবার বেরিয়ে এসেছে। তারপরেই আমার দিকে চোখের ইশারা করতে করতে তাড়া করে এল।

শেষের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে সঞ্জয় শুধু জিজ্ঞেস করল, আগের দিনও টেবিলের কাছে ঘুরছিল না?

—হ্যাঁ।

সঞ্জয় আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। নিঃশব্দে পায়চারি করতে লাগল।

দুটো ঘরেই এমনকি বাতরুমেও আলো জ্বলছিল। তাড়াতাড়ির ঘুম ভেঙে থাকলে

হয় তো ছুটে আসবে। সঞ্জয় তাই তাড়াতাড়ি সব আলো নিভিয়ে দিল। অন্ধকারে শুধু স্বলতে লাগল সঞ্জয়ের সিগারেটের আগুন।

মনে মনে বলল, নাঃ, একেবারে Psychopathic Patient হয়ে গেল! একই জনকে একজনেই প্রায় দেখছে। অথচ আমি দেখতে পাচ্ছি না। শেষ পর্যন্ত কি আমাকে অলৌকিক কিছুতে বিশ্বাস করতে হবে?

পরের দিন সকালে বেশ একটু বেলাতেই ঘুম ভাঙল সঞ্জয়ের। দেখল রীণা তখনো ঘুমোচ্ছে। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে মশারির ওপর। এত বেলা পর্যন্ত রীণা কখনো ঘুমোয় না।

কিন্তু এই কি ঘুমন্ত চেহারা?

মেয়েদের স্বাভাবিক ঘুমের মধ্যেও একটা সুন্দর আকর্ষণী শক্তি থাকে। শোয়ার ভঙ্গিটি, শরীর জড়িয়ে শাড়ির বিন্যাস, শান্ত স্নিগ্ধ মুখের ওপর বন্ধ চোখের নিবিড় পাতা দুটি—কেমন যেন মোহ সৃষ্টি করে। গভীর রাতে এই রীণাই যখন ক্লান্ত, পরিতৃপ্ত হয়ে ঘুমোয় তখন কতদিন সঞ্জয় অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলে নিঃশব্দে লোভীর মতো দেখেছে। আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে।

আর আজ? সেই রীণাই ঘুমোচ্ছে। কিন্তু পাণ্ডুর মুখের ওপর কিসের যেন ছায়া। হঠাৎ দেখলে মনে হবে রীণা যেন তার দেহটা ফেলে কোথায় কত দূরে চলে গেছে।

সঞ্জয়ের বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। ঠিক করল আজই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ডাঃ রুদ্রের সঙ্গে পরামর্শ করবে।

পুপু তখন জেগে। বিছানায় শুয়ে বেচারি একাই খেলা করছিল। তাকে একটু আদর করে সঞ্জয় মুখ ধুতে গেল।

মুখ ধুয়ে এসে চায়ের জল চড়িয়ে দিল। পুপুর জন্যেও দুধ তৈরি করল।

বেলা যখন সাড়ে আটটা—সঞ্জয় যখন হাসপাতালে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, তখন রীণা আলিসিয়া ভেঙে পাশ ফিরল।

—ঘুম ভাঙল? আজ বেশ অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছ। বলে সঞ্জয় এক পেয়ালা চা নিয়ে এল।

—ইস্! কত বেলা হয়ে গেছে! বলে রীণা ধড়মড় করে উঠে বসল।

—চা তুমি করলে?

—তাছাড়া আর কে করবে? ভূতে আর যাই পারুক চা করতে পারে না। দ্যাখো, চিনি ঠিক হয়েছে কি না।

রীণা ধীরে ধীরে গরম চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল।

—তোমার আজ দেরি হয়ে যাবে। আমি এখনি যাচ্ছি।

সঞ্জয় কাছে বসে একটা সিগারেট ধরাল। বলল, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আমি এদিকের সব গুছিয়ে নিয়েছি। তুমি বরং হাত মুখ ধুয়ে আর একটু শুয়ে থাকো।

—হ্যাঁ। শরীরটাও যেন কেমন লাগছে।

—ও কিছু নয়। রাত্তিরে একটা ধকল গেছে। স্নানটান করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কী জানি! বলে চোখ নিচু করে অন্যমনস্কভাবে চা খেতে লাগল।

আধ ঘণ্টা পরে নিচে নেমে সঞ্জয় একবার এদিক ওদিক দেখল। নাঃ, ভাড়াটেরা কেউ চড়াও করতে আসছে না। তখনকার মতো নিশ্চিন্ত হয়ে হাসপাতাল রওনা হলেও মনে মনে অস্বস্তি থেকেই গেল। বিকেলে নিশ্চয় ওরা এসে বলবে, কাল রাত্তিরেও আপনার ঘরে গণ্ডগোল হচ্ছিল ডাক্তারবাবু!

সঞ্জয়ের মনটা কুঁকড়ে গেল। সত্যি! রোজ রাত্তিরে রীণা যা কাণ্ড করতে আরম্ভ করেছে!

বিকеле সঞ্জয় কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকল চোখ কান বুজে। না তাকিয়েও বুঝতে পারছিল মহিমাবাবু-বিভূতিবাবুরা রোজকার মতো লোহার বেঞ্চিতে পা তুলে বসে গল্প করছে। বোধহয় তাকে দেখেওছে। তারপর এখনই হয়তো মধুর সন্তাষণ করবে—ডাক্তারবাবু, নমস্কার। ভালো আছেন তো?

সেই সন্তাষণটুকু কানে পৌঁছবার আগেই সঞ্জয় মুখ নিচু করে হনহন করে সিঁড়িতে গিয়ে উঠল।

যাক, আজকের মতো ফাঁড়া কাটল।

সঞ্জয় জোরে জোরে পা ফেলে ওপরে উঠতে লাগল। রীণা কেমন আছে? আজ দুপুরে আর ভয় পায়নি তো?

ফেরার পথে ডাক্তার রুদ্রের সঙ্গেও দেখা করে এসেছে। উনি ঠিকই বলেছেন—অ্যাডজাস্ট করার স্বাভাবিক শক্তির অভাব থেকেই এটা হচ্ছে। মফস্বল থেকে শহরে কিংবা শহর থেকে মফস্বলে নতুন পরিবেশে এসে পড়লে—সে পরিবেশ যদি মনের মতো না হয় তা হলে বিশেষ করে মেয়েদের নার্ভের ওপর চাপ পড়ে। তা থেকেই এইরকম অনেক কিছু হয়। পরে জায়গাটা অভ্যস্ত হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যায়।

—কিন্তু বাড়িটা তো ওর প্রথম থেকেই পছন্দ হয়েছিল।

ডাক্তার রুদ্র হেসেছিলেন। —ওটা তোমাকে খুশি করার জন্যে।

সঞ্জয় চুপ করে ছিল। কথাটা তার মনঃপূত হয়নি।

ওপরে দরজার মুখেই পুপুকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রীণা।

—কেমন আছ?

রীণা তার উত্তর না দিয়ে একটু ভারী গলায় বলল, কম্পাউন্ডে ঢুকে ওপরে তাকালে না যে?

কথাটার মানে সঞ্জয় প্রথমে বুঝতে পারেনি। যখন বুঝল তখন মনে মনে খুশিই হল। অমেকদিন পর যেন সেই কুমারী রীণাকে দেখছে। সে-সব সময়ে নবদ্বীপে মামার বাড়ি এলে রীণার সঙ্গে একদিনও চোখের দেখাটুকু না হলে

চলত না। মফস্বল শহরে খুব স্বাভাবিক কারণেই রীণার বাড়িতে এই অনাস্থীয় যুবকটির কারণে-অকারণে যাওয়া, গল্প করার কিছুটা বাধার সৃষ্টি হয়েছিল। অগত্যা রাস্তার ধারে দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতে হতো রীণাকে। কখন সঞ্জয় রাস্তা দিয়ে যাবে।

ওই রাস্তা দিয়েই যখন-তখন কারণে-অকারণে সঞ্জয়কেও যেতে-আসতে হতো। তখনই হতো মিষ্টি হাসি-বিনিময়ের সঙ্গে চার চক্ষের গোপন মিলন। নিরুপায় নীরব প্রেমের এই মুষ্টি-ভিক্ষাটুকুই তখন ছিল যথেষ্ট।

একদিন ঠিক ঐ বিশেষ মুহূর্তেই সামনে এসে পড়েছিল পাড়ার চক্রবর্তীমশাই। সঞ্জয় ওপরের দিকে আর তাকাতে পারেনি।

পরের দিন গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে রীণার সঙ্গে নিরিবিলিতে দেখা হয়েছিল। সঞ্জয় স্বভাবমতো হেসেছিল। রীণা কিন্তু হাসেনি। অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে শুধু বলেছিল—কাল তাকালে না যে বড়ো?...

এ-সব অনেক দিনের কথা। তখন রীণা স্কুলে পড়ছে। সঞ্জয় পড়ছিল ডাক্তারি। সেই রীণা বহুদিন পর আজ সেই একই সুরে জিজ্ঞেস করল, ওপরে তাকালে না যে?

সঞ্জয় হেসে বলল, তাকাবার ফুরসত পেলাম কই? নিচে তখন মহিমাবাবুরা আমাকে পাকড়াবার তালে। ধরতে পারলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করত, ডাক্তারবাবু, কাল রাত্তিরে আপনার ঘরে কিসের চোঁচামেটি হচ্ছিল? আগের দিন বেড়ালের ওপর দোষ চাপিয়েছি। আজ আর হাতের কাছে তৈরী কিছু খুঁজে পেতাম না। তাই অধোবদনে কোনোরকমে পালিয়ে এসেছি।

বলেই রীণার কাল থেকে পুপুকে কেড়ে নিল।

রীণার মুডটা ভালো দেখে সঞ্জয় খুশি হয়েছিল। কিন্তু তার এমন সরস বাচনভঙ্গী শুনে রীণা না হেসেই রান্নাঘরে চলে গেল। সঞ্জয়ের ঠিক ভালো লাগল না।

চা-জলখাবারের পাট চুকল একরকম নিঃশব্দেই। মন-মেজাজ ভালো থাকলে এই সময়ে রীণা বেশ গল্প করে। ও একাই বকে যায়। শ্রোতাকে শুধু মাঝে-মধ্যে ‘হুঁ’ ‘হ্যাঁ’ বলে সাড়া দিয়ে গেলেই হল। সেটাও খারাপ লাগে না।

কিন্তু আজ কেমন ব্যতিক্রম। রীণার হঠাৎ এরকম বাকসংযম দেখে সঞ্জয় অবাক হল।

কথা না বললেও রীণার মুখে কিন্তু এক টুকরো হাসি লেগেই ছিল। গল্প করছিল না, কিন্তু পুপুকে আদর করার মাত্রাটা একটু অস্বাভাবিক হচ্ছিল। আদরের সঙ্গে হাসি। শিশুর সঙ্গে এই রকম হাসির অর্থ কী? এই হাসির অন্য মানে আছে। এ একরকম উপেক্ষা।

রীণার এই উপেক্ষা-নীতির সঙ্গেও সঞ্জয়ের পরিচয় ছিল।

মাস্ত রীণার বন্ধু। নবদ্বীপে একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ত। সঞ্জয়ের মামা থাকত রীণাদের বাড়ির কাছাকাছি। সঞ্জয় মাঝেমাঝেই মামার বাড়ি নবদ্বীপে আসত। এই আসা-যাওয়ার সুযোগেই রীণা আর রীণার বান্ধবীটির সঙ্গে আলাপ, ঘনিষ্ঠতা।

বাড়িতে কথা বলার সুযোগ হতো না। তাই রীণাই একদিন সঞ্জয়কে মাস্তুর বাড়ি যাবার জন্যে বলেছিল।

রীণা গিয়েছিল যথাসময়ের অনেক আগে। সঞ্জয়ের যেতে দেরি হয়েছিল। এই হলো তার অপরাধ! ব্যাস! শ্রীমতী রীণা হলেন ভীষণ ক্রুদ্ধ। রাগটা অবশ্য মুখে প্রকাশ করল না। করল বিচিত্রভাবে। চৌকিতে বসে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে অনর্গল কথা বলে গেল মাস্তুরই সঙ্গে। সামনে যে আর একজন বসে আছে—যাকে নাকি বিশেষ করে ডেকে আনা হয়েছে—তাকে যেন চিনতেই পারল না।

রীণার আজকের আচরণটাও অনেকটা সেইরকম। সঞ্জয় যেন কেউ না।

—কী ব্যাপার? আজ যে আমার সঙ্গে বড়ো কথা বলছ না?

রীণার মুখে ফুটে উঠল আবার বিচিত্র হাসি।—আমি রুগী, তুমি ডাক্তার। ডাক্তারের সামনে রুগীকে রুগীর মতোই থাকতে হয়। তাই না? কথাগুলো রীণা বলল যেন দাঁতে কেটে কেটে।

—যা বাবাঃ! আজ হল কী?

—হাসপাতালে—মানে মেন্টাল হাসপিটালে কোনো বেডটেডের ব্যবস্থা করতে পারলে নাকি?

রীণার কথায় যেন বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল।

সঞ্জয় অবাক হয়ে বলল, কার জন্যে?

—সে কি! এরই মধ্যে ভুলে গেলে? তোমার স্ত্রীর জন্যে গো! যার মাথার ব্যামো হয়েছে, নার্ভ ফেল করে। বলেই পুপুকে রেখে রীণা হঠাৎ উঠে চলে গেল।

এক-একটা সময়ে এই-সব মান-অভিমান স্বামীদের ভালোই লাগে। কিন্তু তাই বলে সারাদিন পরিশ্রমের পর বাড়ি ফিরে এই মানসিক কসরৎ আর ভালো লাগে না।

সঞ্জয় একটু রাগ করেই পুপুকে কোলে তুলে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল।

—কোথায় যাচ্ছ?

—পুপুকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি।

—এই সঙ্গেবেলায়?

—কি করব? রুগীর সামনে বসে থাকতে থাকতে সুস্থ মানুষও রুগী হয়ে যায়।

রীণা আবার একটু হাসল। সেই কেমন-কেমন হাসি। নিচে যাবে তো? কিন্তু মহিমাবাবুরা এখনও বসে আছেন।

—মাই গড! সঞ্জয় এক লাফে সিঁড়ি থেকে ঘরে এসে ঢুকল।

—কফি খাবে?

—আবার কষ্ট করে করবে?

—আমিও খাবো। বলেই রীণা চলে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পর দু কাপ কফি নিয়ে এসে বসল। একটা কাপ যেন একটু অতিরিক্ত যত্নে সঞ্জয়ের দিকে এগিয়ে দিল। চোখাচোখি হল।

—তখন থেকে তুমি অল্পন টোঁট টিপে টিপে হাসছ কেন বলো তো।

রীণা হেসেই বলল, বাঃ রে! রুগী বলে কি হাসতেও মানা নাকি?

—তা নয়। হাসিটা যেন কেমন-কেমন লাগছে।

রীণা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে উদাস সুরে বলল, তা হবে। মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ।

কফিতে আরাম করে একটা চুমুক দিয়ে সঞ্জয় সিগারেট ধরাল।

—না, ও হাসি আর যাই হোক মাথা খারাপের লক্ষণ নয়।

—তবে? রীণা খুব হালকা করে কফিতে চুমুক দিল।

—মনে হয় তুমি কিছু বলতে চাইছ। এমন-কিছু যা শুনে আমি অপ্রস্তুতে পড়ি।

—ও মা! সে কী কথা! —ইস্! কফিতে চিনি কম হয়েছে। আমার সত্তা মাথার ঠিক নেই। বলে রীণা হঠাৎই উঠে গেল। তারপর বেশ একটু দেরি করে সুগার-পটটা এনে টেবিলে রাখল। তা থেকে সামান্য একটু চিনি তুলে কফিতে মিশিয়ে নিয়ে বলল, তুমি ডাক্তারমানুষ! তোমায় আমি অপ্রস্তুতে ফেলতে পারি? না হয় আমি মানসিক রুগীই। তা বলে নিজের স্বামীকে অপ্রস্তুতে ফেলা! ছিঃ!

সঞ্জয়ের পক্ষে ধৈর্য ধরা অসম্ভব হয়ে উঠল। বলল, দোহাই তোমার! আর রহস্য কোরো না। ব্যাপারটা কি আমায় খুলে বলো।

—ব্যাপার আবার কি? যথা পূর্ব তথা পরম্।

—সারা দুপুর কি করলে?

রীণা আবার একটু হাসল।—অ-নে-ক কাজ। তুমি চলে গেলে দরজায় ভালো করে খিল দিলাম। তারপর পুপুকে চান করলাম, খাওয়ালাম। নিজে চান করলাম, খেলাম। একটু ঘুমোলাম।

—ঘুম হল?

—হুঁ-উ। বলে আদুরে মেয়ের মতো মাথা দোলাল। তারপর ঘুম থেকে উঠে ট্রানজিস্টারটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলাম।

—ভয়টয় পাওনি তো?

—ভয়? কি জানি। মনে নেই।

—ভেরি গুড! মনে না থাকাই ভালো।

—ততক্ষণে পুপু উঠে পড়েছে। ওকে নিয়ে ঘরে তালা দিয়ে দৌতলায় গেলাম। বন্দনার মায়ের সঙ্গে একটু গল্পও করলাম। তারপর ওপরে এসে জলখাবার করতে বসলাম। জলখাবার হয়ে গেলে পুপুকে নিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর তুমি এলে। বাস্! আমার কথাটি ফুরল, নটে গাছটি মুড়ল। ও হ্যাঁ, এর মধ্যে মাস্তকে একটা চিঠিও লিখলাম।



—কি লিখলে ?

—সে-সব আমাদের প্রাইভেট কথা। তোমায় বলব কেন ? বলে কফির পেয়ালাটা সরিয়ে রাখল।

—অবশ্য তোমার কথাও ছিল। হাসপাতালের ডিউটির পর পেশেন্ট দেখতে গিয়েছিলে। মহিলা পেশেন্ট বোধহয়, নইলে রাত নটা পর্যন্ত থাকবে কেন ? বুক, পেট, তলপেট ভালো করে দেখতে হয়েছিল তো।

—ইস্! এইসব বাজে কথা লিখেছ!

—হঁ-উ। তারপর লিখেছি, কে একজন তোমাকে একটা বুড়োর ছবি দিয়েছিল। সেই ছবির কথাও লিখেছি। সাংঘাতিক চোখ, যেন ত্রিকালদর্শী তান্ত্রিক!

—সেই ছবিটা পূজো করছ লিখেছ নাকি ?

—ইস্! অ্যাসট্রে রয়েছে তবু কাপে ছাই ফেলছ! কী যে বদ অভ্যেস! বলে তাড়াতাড়ি কাপটা সরিয়ে নিল।

—সরি।

—হ্যাঁ, পূজো করছি, ফুলের মালা পরাচ্ছি সবই লিখেছি। বন্ধুর কাছে কিছুই লুকনো উচিত নয়।

—তা বেশ করেছ। কিন্তু ছবিটা নিয়েও তুমি একটু বাড়াবাড়ি শুরু করেছ। ক্রি এমন আছে ছবির মধ্যে ?

—তা দেখার চোখ তোমার নেই। থাকলে একথা বলতে পারতে না।

—ছবিটা নিয়ে এসো তো। ভালো করে দেখি একবার।

—কি হবে দেখে ?

—নিয়েই এসো না।

রীণা চেয়ারে দু'পা তুলে হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকলো।

—তুমি নিয়ে এসো।

—আমি ছুঁলে ছবিটা অশুদ্ধ হবে না তো ? বলে সঞ্জয় হাসতে হাসতে উঠে গেল। রীণা কোনো উত্তর দিল না। হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে রইল।

বাইরের ঘর থেকে সঞ্জয় জিজ্ঞেস করল, ছবিটা কোথায় ?

রীণা উত্তর দিল না।

—এই শুনছ ? ছবিটা তো তুমি তাকের ওপর রেখেছিলে। দেখছি না তো।

—তাহলে নেই।

—নেই মানে ? অন্য কোথাও রেখেছ ?

—জানি না।

সঞ্জয় যেন হেঁচট খেল—জানি না মানে ?

রীণা এবার চেয়ার থেকে নেমে ধীরে ধীরে বাইরের ঘরে গেল—বলো কী বলছ ?

—ছবিটা কোথায় গেল ?

রীণা উত্তর না দিয়ে স্থিরদৃষ্টিতে সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, ওটা আর পাওয়া যাবে না। হারিয়ে গেছে।

সঞ্জয় অবাক হয়ে বলল, হারিয়ে গেছে মানে ?

রীণা ধীর স্থিরভাবে বলল, হারিয়ে গেছে মানে হারিয়েই গেছে।

—অসম্ভব। আগের দিন ছবিটা তাকের ওপর রাখলে, এরই মধ্যে হারিয়ে গেল ? আর হারাবেই বা কোথায় ?

রীণা গভীর গলায় বলল, তাহলে চুরি গেছে।

—চুরি ! কে চুরি করল ? বাড়িতে কে-ই বা আসে ? কেনই-বা চুরি করবে ?

রীণা হালকা মেজাজে টেবিল থেকে ট্রানজিস্টারটা তুলে নিয়ে কাঁটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, গেলাসটা সেদিন কে ভাঙল ! কি করে ভাঙল ?

সঞ্জয় যেন অন্ধকারে চলতে চলতে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে থমকে গেল।

মিনিট কয়েক দুজনেই চুপচাপ। তারপর রীণা ট্রানজিস্টারটা রেখে দিয়ে যেন আপন মনেই বলল, শুধু একটা গেলাস ভাঙা বা ছবি চুরি যাওয়া নয়। আরো কিছু যাবে। তার মধ্যে আমার প্রাণ একটি। অবশ্য তাতে তোমার কিছু এসে যাবে না। পুপুটারই কষ্ট হবে।

—বাজে কথা ছাড়ো তো। ছবিটা কি সত্যিই কেউ নিল ?

—আমায় জিজ্ঞেস করছ ? রীণা এবার পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে সঞ্জয়ের দিকে তাকাল।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ তোমাকে। তুমি ছাড়া এখানে আর কে আছে ?

—তাহলে আমি বলছি—হ্যাঁ, ছবিটা সত্যিই কেউ নিল। যে নিতে এসেছিল সে নিয়ে গেল।

—কিন্তু কেন নিয়ে গেল ?

রীণার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি। —কে নিয়ে গেল ভাবছ না ?

সঞ্জয় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, না হয় ধরেই নিলাম ভূতে নিয়েছে। কিন্তু কেন ? এত জিনিস থাকতে শিবানন্দর ছবিটার ওপরই তেনার দৃষ্টি পড়ল !

রীণা বলল, তুমি বোধহয় ভুলে যাওনি আমি বলেছিলাম—আগের দিনও সে টেবিলের কাছে ঘুরছিল। অসাবধানেই হোক বা ভয় দেখাবার জন্যেই হোক সেদিন গেলাসটা ভেঙেছিল।

এই পর্যন্ত বলে রীণা একটু থামল। সঞ্জয়ও চুপ করে রইল।

—তুমি কি বলতে চাইছ সেদিনও ছবিটা নেবার জন্যেই এসেছিল !

—হ্যাঁ।

—নিল না কেন ?

—বোধহয় ওটা টেবিলে বা টেবিলের কাছে ছিল না।

—হ্যাঁ, ওটা ভুল করে ব্যাগেই থেকে গিয়েছিল।

সঞ্জয় আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বিরক্ত হয়ে বলল, বেশ।

না হয় প্রেতাশ্বাটি ছবিটার জন্যেই এসেছিল। কিন্তু কেন? নিশ্চয় বৃদ্ধের প্রেমে পড়েনি?

রীণা কষ্টে একটু হাসল। বলল, এখনো রসিকতা করতে পারছ! ভাবতে পারছ না, কী সর্বনাশ এগিয়ে আসছে!

সঞ্জয় হাসল না। বলল—আমি যা জানতে চাইলাম ওটা তার উত্তর হল না।

রীণা বলল, ঠিক উত্তর আমিই বা কি করে জানব?

—আচ্ছা, ছবিটার পেছনে কি যেন লেখা ছিল? সঞ্জয় জিজ্ঞেস করল।

—পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান কপিলেশ্বর চৌধুরীকে স্নেহোপহার।

—আরও যেন কিছু লেখা ছিল মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ, শিবানন্দর স্বাক্ষর।

—আর কিছু ছিল না?

—ছিল। শিবানন্দ ভট্টাচার্যর ঠিকানা।

সঞ্জয় হঠাৎ বলে উঠল—তাহলে কি ঠিকানার জন্যেই? কিন্তু ঠিকানা নিয়ে ও কি করবে? শিবানন্দর সঙ্গে দেখা করবে! বলে একটু হাসবার চেষ্টা করল।

রীণা শাস্ত গলায় বলল—অন্যরকমও হতে পারে। তুমি যেন দেখা করতে না পার।

সঞ্জয় বিছানায় একটা ঘুঁষি মেরে বলল—দেখা করি এটাই বা চায় না কেন? তোমার ঐ প্রেতাশ্বাটির সঙ্গে শিবানন্দর সম্পর্ক কী?

রীণা কোনো কথা বলল না। একটা রহস্যময়ী ছায়ার মতো ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ভেতরের ঘরে চলে গেল।

॥ সাত ॥

ঝড়

হাওড়ার পঞ্চাননতলা-কদমতলার মধ্যে ক্ষীরোদতলা। মনেই হয় না এটা কলকাতার লাগোয়া জায়গা। জীবন এখানে ধীরে-সুস্থে, জিরিয়ে, ডিমতোলে চলেছে। বাসিন্দারা সকলেই প্রায় সকলের পরিচিত।

এই ক্ষীরোদতলাতেই একতলা একটা বাড়ি। দরজায়, জানলায় চমৎকার রঙীন পর্দা, গেটের ওপরে মাধবীলতার বাহার। একনজর দেখলেই বোঝা যায় অন্য আর সব বাড়ির মধ্যে এ বাড়িটি একটা উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। আর এটা সম্ভব হয়েছে রুচি আর যত্নের গুণে। বাড়ির গৃহিণী স্বয়ং অক্লান্ত পরিশ্রমে বাড়িটিকে সুন্দর করে রেখেছেন।

বেলা তখন প্রায় সাড়ে চারটে। কাজের লোকের সঙ্গে সে-বাড়ির ছোট্ট মেয়েটি ইস্কুল থেকে গুটিগুটি ফিরল। বইয়ের ব্যাগটা বিছানায় ফেলে দিয়ে বললে, মা, আজ সন্দের পর ভয়ানক ঝড় হবে।

মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে মা বললে, অসময়ে ঝড়! কে বললে?

মেয়েটি চোখ বড়ো বড়ো করে বলল—শ্যামলীদি।

—শ্যামলীদি বলেছে! মা কৃত্রিম গাভীরের সঙ্গে বললে, তবে তো সাংঘাতিক কথা। ঝড় হবেই।

—হ্যাঁ, শ্যামলীদি রেডিওতে শুনেছেন। বলে দিলেন, খবরদার কেউ সঙ্কের পর বাড়ি থেকে বেরিও না।

—ঠিকই তো। ঝড় এলে কেউ কি বেরোয়? আচ্ছা যাও, এখন হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও গে।

মেয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

মেয়েটির বাবা ইজিচেয়ারে শুয়ে টাইমটেবল দেখছিলেন। বয়েস বেশি নয়, কিন্তু ভারি ক্লি চাল। তার ওপর একটু মোটা আর ধুতির সঙ্গে গোল গলা টিলে-হাতা পাঞ্জাবি পরেন বলে একটু বেশি বয়েস মনে হয়। টাইমটেবল ওঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। ভ্রমণের ভারি নেশা। প্রতি বছরই কোথাও-না-কোথাও বেরোন। মাস কয়েক হল সপরিবারে পুরী ঘুরে এসেছেন। এখনই বেরোবার আর সম্ভাবনা নেই। তবুও নতুন কোথাও যাবার জন্যে এখন থেকেই প্ল্যান-পরিকল্পনা করছিলেন।

কলকাতায় ওঁর শৈত্রিক ব্যবসা মদের। এ এমন ব্যবসা যার মার নেই। মদের ব্যবসা কিন্তু জীবনে কখনো উনি ও জিনিসটি আত্মদান করেননি।

ভদ্রলোক টাইমটেবলটি মুড়ে রেখে বললেন, কই? তোমার বান্ধবীটি তো এখনো এলেন না?

মাস্ত মেয়ের ব্যাগ থেকে বইগুলো বের করে গুছিয়ে রাখছিল। বললে, আসবে। বলে ঘড়ির দিকে তাকাল।

—কিন্তু তোমাকে আজ অন্য ঘরে শুতে হবে বলে রাখছি। আমি রীণার সঙ্গে শোব।

ভদ্রলোক যেন বিষমভাবে বললেন, উনি কি আজ থাকবেন?

—আমি তো থাকার জন্যে বলেছি। ও বলেছে, থাকতে পারবে না। তবু যদি থেকে যায়—তাছাড়া সত্যিই যদি ঝড় ওঠে, ফিরবে কি করে?

ভদ্রলোক বিরক্তির ভান করে বললেন, বুঝতে পারছি, মাঝে-মাঝেই এখন তোমার আমার মধ্যে এই তৃতীয় জনটি বাধা হয়ে দাঁড়াবেন।

মাস্ত হেসে বলল, তা ঠিক। ওকে এখন প্রায়ই এখানে এনে রাখব।

ভদ্রলোক গাভীরের ভান করে বললেন, বোধহয় পারবে না। ওঁরও তো একজন দাবীদার আছেন। তিনি আবার ডাক্তার! ডাক্তারদের অনেক এক্সট্রা সুবিধে আছে। বৌকে তাই তাঁরা চট করে কাছ-ছাড়া করতে চান না।

শেষ কথাটার প্রচ্ছন্ন রসিকতা এড়িয়ে গিয়ে মাস্ত বলল, থাকুক দাবীদার। ওকে মাঝে-মাঝে এনে না রাখলে ওর মনটা ঠিক হবে না।

ললিতবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ওঁর ব্যাধিটা কী?

—কে জানে! ছোটবেলা থেকে তো ওকে জানি। একেবারে সুস্থ, হাসিখুশি। কোনোদিন ভারী অসুখ হতে দেখিনি। সেই মেয়েরই কী যে হল!

অসুখ-বিসুখের কথা শুনেতে ললিতবাবুর ভালো লাগে না। তিনি আমোদপ্রিয় মানুষ। মদ না খেয়েও সদাই ফুরফুরে। পাছে মাস্ত তার বান্ধবীর রোগের জের টানে তাই তিনি প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললেন, আর এক কাপ চা sanction করো না!

মাস্ত মৃদু ধমক দিয়ে বললে, একটু আগেই চা খেয়েছ। এখন আর নয়। রীণা তো এখন এসে পড়বে। তখন পাবে। হ্যাঁ, কি বলছিলাম যেন? রীণার কথা। ওর মনটা কিরকম ছিল বলি। একদিন কী একটা উপলক্ষে রীণা, রীণার মা, ঠাকুরার সঙ্গে আমিও যাচ্ছিলাম গঙ্গান্নান করতে। হঠাৎ আমার দাদাও এসে জুটল। রীণা ছিল আমার দাদার খুব ভক্ত। দাদা পাটি করত। পড়াশোনাও ছিল খুব। কিছু মানত না। বলত, বুঝলি রীণা, লেখাপড়া শিখছিস, সংস্কারমুক্ত হবি। ঠাকুর-দেবতা, গুরু-পুরোহিত, ভূত-প্রেত শ্রেয় বোগাস।

শুনে রীণার ঠাকুরা চটতেন। বলতেন, নীরেনই মেয়েটার মাথা খেল।

শ্মশানের পাশ দিয়েই স্নানের ঘাটে যেতে হয়। না তাকালেও বুঝতে পারছিলাম মড়া পুড়ছে। বিস্ত্রী চামসিটে গন্ধ। তার সঙ্গে ফটফট শব্দ—বাবারে! ভাবলে এখনও গা কিরকম করে।

তা দাদা হঠাৎ রীণাকে বলল, পাঁচিলের গায়ে ঐ ছাইগুলো কিসের বলতে পারিস?

রীণা একনজর দেখে নিয়ে বলল, চিতাভস্ম।

—পারিস ঐ ছাই এক মুঠো নিয়ে আসতে?

সবাই চমকে উঠল।—এ আবার কী কথা! ছিঃ!

দাদা নেহাৎ মজা করেই কথাটা বলেছিল। কিন্তু রীণা করল কি—সবাইকে হকচকিয়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে এক মুঠো ছাই নিয়ে এল।

দাদা যে দাদা, সেও তাজ্জব হয়ে গেল। রীণার সাহস দেখে বলল—সাবাস! এই তো চাই।

দাদা তো খুব বাহবা দিল। কিন্তু আর সবার মুখ হাঁড়ি। গঙ্গান্নানের আনন্দ মাথায় উঠল। রীণা সেদিন সবার কাছে খুব বকুনি খেল। দাদা লজ্জায় পালালো।

ভাবতে পারা যায় সেই মেয়েই এখন নাকি রোজ ভূত দেখছে! শুধু ভূত দেখাই নয়—ভূতের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাতে চাইছে!

শুনে ললিতবাবু মস্তব্য করলেন, কলকাতা শহরে ভূত!

—বোঝো, তাহলে ওর মানসিক অবস্থাটা কিরকম হয়েছে! আমি ওকে একটার পর একটা চিঠি দিয়ে, নিজে ওর সঙ্গে দেখা করে বুঝিয়েছি। কিন্তু ওর ঐ এক কথা—না, ভুল দেখি না। মানসিক রোগও নয়। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার!

মাস্ত একটু থামল। তারপর বলল—এই ক'মাসের মধ্যে মূর্তিটা বেশ কয়েকবার নাকি দেখা দিয়েছে। দেখা দেওয়াই শুধু নয়, নাকি হুমকিও দিয়েছে।

—আবার হুমকিও দিয়েছে! বাবাঃ! ললিতবাবু হাসলেন।

মাস্ত রাগ করে বলল, ওর হাজব্যান্ডের মতো তোমারও দেখছি অবিশ্বাস। মেয়েটার জন্যে তোমাদের কারো এতটুকু ভাবনা হয় না!

স্ত্রীর এই তিরস্কার ললিতবাবু নিঃশব্দে হজম করতে পারলেন না। বললেন, ও-সব ভয়ের কোনো মানে হয় না। তাছাড়া যে মেয়ে হাসতে হাসতে মড়ার ছাই মুঠোয় ভরে আনতে পারে সে আবার নররাক্ষস দেখে অজ্ঞান হয় কি করে?

মাস্ত বলল, দুটো আলাদা ব্যাপার না? একটা—বীভৎস জিনিস সহ্য করতে না পারা। আর একটা—কুসংস্কার না মানা। দুটোয় গুলিয়ে ফেললে কি করে হবে?

—কি জানি। তোমার বান্ধবীর মনস্তত্ত্ব বুঝি না। আমার মনে হয় শ্রেফ মানসিক ব্যাধি।

—বেশ! মানসিক ব্যাধি হলেও তো তার প্রতিকার করতে হবে।

—স্বামী যখন ডাক্তার তখন ব্যবস্থা তিনিই করছেন।

—ছাই করছে। শুধু ঠাট্টা আর বিদ্রূপ।

ললিতবাবু আলিস্যি ভেঙে উঠে পড়লেন, যাই একটু ঘুরে আসি।

—ওমা! যাবে কী! এখুনি রীণা এসে পড়বে।

ললিতবাবু উঠছিলেন, বসে পড়লেন। টাইমটেবলটা আবার তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। একসময়ে বললেন, এবার আমরা রাজস্থানের দিকে যাব। কি বলো?

মাস্ত বললে, তার তো এখনো ঢের দেরি। পরে ভাবলেও চলবে। বলে আবার জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নিজের মনেই বলল, সাড়ে পাঁচটা বাজতে চলল। এখনো এল না!

এমন সময়ে পিওন এসে লেটার-বক্সে চিঠি ফেলে গেল।

মাস্ত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে লেটার-বক্স খুলে চিঠিটা বের করে নিয়ে এল। খামে চিঠি। অপরিচিত হাতে ইংরিজিতে ঠিকানা লেখা।

—কার চিঠি?

মাস্ত খামটা ললিতবাবুর হাতে দিয়ে পাশে বসল।

চিঠি পড়ে ললিতবাবু নড়েচড়ে বসলেন। খুশি-খুশি গলায় বললেন, মিস থাম্পিকে মনে আছে?

—খুব আছে। কেন?

—তিনি কলকাতায় আসছেন।

—ওমা! কবে?

—পড়ে দেখো।

মাস্ত চিঠিটা নিয়ে এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলল। মিস থাম্পি লিখছেন, আগামী ২৭ নভেম্বর ম্যাড্রাস মেলে কলকাতা পৌঁছচ্ছেন। সেখান থেকে সোজা ললিতবাবুর

বাড়ি চলে আসবেন। দু-তিন-দিন থাকবেন। কলকাতায় থিওজফিক্যাল সোসাইটি এবং আরও কয়েকটি জায়গায় ঘুরবেন। সেসময়ে এঁদের সাহায্য দরকার হবে। কেন-না কলকাতার রাস্তাঘাট তাঁর ভালো জানা নেই।

মান্ত আনন্দে লাফিয়ে উঠল—মিস থাম্পি তাহলে কথা রেখেছেন!

তারপর ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে বলল, ২৭শে নভেম্বর মানে সামনের বুধবারের পরের বুধবার। ওদিন তোমার কোথাও বেরোনো হবে না।

ললিতবাবু হেসে বললেন, বেরোতে হবে না মানে? বেরোতে আমায় হবেই, অন্তত হাওড়া স্টেশনে ওঁকে রিসিভ করতে।

মান্ত রসিকতাটা বুঝল। এরপর দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। দু'জনেই মিস থাম্পির কথা ভাবছিলেন। অনেক কথাই মনে পড়ছিল।

দু'বছর আগে তিরুপতির পাহাড়ে এই মহিলার দর্শন পান ওঁরা।

তিরুপতি পাহাড়টা ছিল বেশ উঁচু। দীর্ঘ পিচালা বাস-রাস্তাটা ওপরে উঠে গেছে পাহাড়টাকে ঘিরে ঘিরে—মেয়েরা যেমন পাক দিয়ে শাড়ি পরে তেমনিভাবে। রাস্তার দুধারে পাহাড়ে ঝোপ-জঙ্গল। সে-সব জঙ্গলে কেউ বোধহয় কোনোদিন যায় না। যাবার দরকারও হয় না।

কিন্তু পাহাড়ের ওপর উঠে মান্তরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। একেবারে শহর! বকবকে তকতকে রাস্তা। দু পাশে হালফ্যাশানের বাড়ি, বাজার, দোকান। এমনকি বিখ্যাত একটি ব্যান্ড পর্যন্ত।

দু-একদিন আগে কী একটা বিশেষ উৎসব হয়ে গিয়েছে বলে তিরুপতির মন্দিরে তেমন ভিড় ছিল না। তাই তিরুপতি দর্শন হয়ে গেল বেলা তিনটের মধ্যেই। পাহাড় থেকে নামার লাস্ট বাস পাঁচটায়। পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগে নিচে নামতে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে মান্তদের বাস। সেটা ছাড়বে সঙ্গে ছটায়। কাজেই হাতে যথেষ্ট সময়।

মান্তদের সঙ্গে আরো যাঁরা ছিলেন তাঁরা পাহাড়ের ওপরে কেনাকাটা করতে লাগলেন। মান্তরা সামান্য কিছু কিনে জায়গাটা ঘুরতে বেরোল। ললিতবাবুর কি খেয়াল হল টাউন ছেড়ে নেমে এলেন পাহাড়ের ধারে। বললেন, লোকে তো এদিকে বড়ো একটা আসে না, চলো আমরা ওদিকটা দেখে আসি।

একটু নেমেই ওঁদের নজরে পড়ল একটা ছোটোখাটো আশ্রম।

এখানে আবার আশ্রম কিসের!

কৌতূহলী হয়ে ওঁরা একটু এগোতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে ওঁরা ভয় পেয়ে গেলেন। দেখলেন আশ্রমের পিছনে একটা গাছের ডালে অনেকগুলো মড়ার মাথার খুলি ঝুলছে। খুলিগুলো নানা আকারের। সবচেয়ে ছোটোটা হাতের মুঠোয় ধরা যায়। আর সবচেয়ে বড়োটা যে মানুষের মাথা তা ভাবা যায় না।

এঁরা যখন অবাক হয়ে খুলিগুলো দেখছেন তখনই একজন মহিলা আশ্রম-কুটির থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে মান্ত আঁতকে উঠেছিল। কালো লম্বা চেহারা। একটা দাঁত ঠোট থেকে সামান্য একটু বেরিয়ে। পুরু ঠোট। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা

এক মাথা পাকা চুল। পরনে গেরুয়া লুঙ্গি, গায়ে কালো সোয়েটার। গলায় লাল পাথরের মালা। মোটামোটা আঙুলে দামী পাথর। সবচেয়ে যেটা নজর কাড়ে তা হচ্ছে তাঁর বকবাকে চোখ দুটো।

মিস থাম্পি ওদের সাদর অভ্যর্থনা করলেন। এইভাবেই আলাপ হল।

ভদ্রমহিলা ইংরিজিতেই কথা বললেন। জানা গেল, উনি সেখানে আছেন চল্লিশ বছর। একাই থাকেন।

কী করেন জিজ্ঞাসা করলে প্রথমে একটু হেসেছিলেন মাত্র। শেষে তিনি যা বললেন তার অর্থ হলো প্রেতচর্চা!

শুনে তো মান্তর বাক্যবোধ হবার যোগাড়। সে থিওজফিস্টদের কথা শুনেছে বটে কিন্তু কখনো থিওজফিস্ট চোখে দেখেনি। তারা কোথায় থাকে, কীভাবে থাকে, বা তাদের চর্চার বিষয় ঠিক কি জিনিস, সে সম্বন্ধে তার কোনো স্পষ্ট ধারণাই ছিল না। এই প্রথম একজন থিওজফিস্ট-এর সঙ্গে আলাপ হলো।

দেখতে যেমনই হোক, ক্রিয়াকলাপ যাই হোক, মানুষটি ভালো। খুবই অতিথিপরায়ণ। তিনি তাঁদের সাদরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আসন পেতে বসালেন। কফি খাওয়ালেন। মান্তর ইচ্ছে ছিল প্রেতচর্চার ব্যাপারটা একটু শোনে। কিন্তু সাহস করে জিজ্ঞেস করতে পারল না। ললিতবাবুও অবশ্য দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে কেবলই উঠি-উঠি করছিলেন। তাঁরা কলকাতায় থাকেন জেনে ভদ্রমহিলা বললেন, আমার একবার কলকাতা যাবার দরকার হবে।

মান্ত তখনই ঠিকানা লিখে দিয়ে বলল, যদি যান তাহলে অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়ি উঠবেন। আমরা খুশি হব।

—ধন্যবাদ। বলে মিস থাম্পি ঠিকানাটা রেখে দিলেন।

বাস্ এই পর্যন্ত। তারপর আর যোগাযোগ নেই। অমন একজন বিচিত্র মহিলার সঙ্গে কে আর যোগাযোগ রাখতে চায়!

প্রায় আড়াই বছর পর সেই মিস থাম্পি কলকাতায় আসছেন। আর আসছেন কিনা তাঁদেরই বাড়ি! এ খবরে যেমন আনন্দ পেল তেমনি কেমন ভয়-ভয়ও করল। ভূত-প্রেত নিয়ে কারবার তো মহিলাটির!

মান্তদের এক বিশেষ প্রতিবেশীবন্ধু আছে। দক্ষিণভারত থেকে ফিরে এসে মান্ত তাদের কাছে মিস থাম্পির গল্পও করেছিল। মিস থাম্পি সম্বন্ধে তাদেরও খুব কৌতূহল। বলেছিল, কোনোদিন উনি কলকাতায় এলে যেন তাদেরও জানানো হয়। তারা দেখা করবে।

মান্ত ঠিক করল খবরটা ওদের কালই দেবে।

মিস থাম্পি আসছেন। কীভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হবে, কোন ঘরে থাকার ব্যবস্থা করবে—ওঁর খাবার ব্যবস্থাই-বা কিরকম হবে এই নিয়ে অনেকক্ষণ স্বামী-স্ত্রীতে আলোচনা হল। কিছুক্ষণের জন্যে রীণার কথা ভুলেই গিয়েছিল। তারপর হঠাৎই মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মান্তর দুর্ভাবনা বাড়ল—রীণা তো এখনো এল না!

ললিতবাবু বললেন, উনি একাই আসবেন?



—হ্যাঁ, ভালো করে ডিরেকশান দিয়ে দিয়েছি। অসুবিধে হবে না।

—পথ হারিয়ে ফেলবেন না তো ?

—নাঃ। খুব চালাক-চতুর মেয়ে। তাছাড়া একই বাসে বাসুর থেকে টানা হাওড়া। তারপর আবার একটা বাসে হাওড়া স্টেশন থেকে টানা ফীরোদতলা। ভুল হবার তো কোনো কারণ নেই।

ললিতবাবু বললেন, তবে হয়তো কাজে আটকে গেছেন। কিংবা বাচ্চাটার শরীর খারাপ।

মাস্ত আর কিছু বলল না। আবার জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই রইল। তারপর যখন মনে হল আসার আর কোনো সম্ভাবনাই নেই তখন ধীরে ধীরে সোফায় এসে বসল।

ললিতবাবু পরিবেশটা হালকা করার জন্যে বললেন, মাঝখান থেকে আমার বেরোনো হল না।

পাশের ঘরে মেয়ে পড়ছিল। বললে, বেরোবে বৈকি। এখনি না ঝড় উঠবে!

কথা শেষ হতে-না-হতেই হঠাৎ দিক্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে প্রচণ্ড একটা ঝড় শহরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাজ্যের ছেঁড়া কাগজ আর রাস্তার ধুলো যেন মুহূর্তে তাণ্ডব নৃত্যে মেতে উঠল।

॥ আট ॥

রাত নটায় ফোন

হাসপাতাল থেকে ফিরে কম্পাউণ্ডে ঢুকেই সঞ্জয় অভ্যাসমতো ওপর দিকে তাকাল।

না, রীণা আজ আর পুপকে নিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নেই। ঘরে আলোও জ্বলছে না।

এখনো ফেরেনি নাকি ?

সঞ্জয় ওপরে উঠে এল। দরজায় তালা ঝুলছে। ডুম্পিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল।

অন্ধকার ঘরে ঢুকতেই এই প্রথম হঠাৎ ওর গা ছমছম করে উঠল। অন্য কোনো কিছুর ভয়ে নয়, রীণা ফেরেনি বলে।

সুইচ অন করে জামা প্যান্ট না ছেড়েই বিছানায় গিয়ে বসল। মিনিট কয়েক চুপ করে বসে রইল। হিসেব করে দেখল বেলা একটা নাগাদ বেরিয়ে থাকলে আর মিনিট পনেরোর মধ্যে নিশ্চয়ই এসে পড়বে।

সঞ্জয় খানিকটা নিশ্চিত হয়ে নিজেই চায়ের জল চড়িয়ে দিল। মিটসেফ খুলে দেখল রীণা দুখানা পরোটাও করে রেখে গেছে।

ধীরে সুস্থে চা খেতে খেতে সঞ্জয়ের মনে হল কলকাতায় এসে পর্যন্ত এই প্রথম রীণা ঘরে নেই। একটা মানুষের মাত্র কয়েক ঘণ্টার অনুপস্থিতি যে এতখানি

শূন্যতা সৃষ্টি করতে পারে সঞ্জয়ের সে অভিজ্ঞতা ছিল না। সে যেন হাঁপিয়ে উঠল।

সাতটা বাজল! রীণার দেখা নেই।

সঞ্জয় মনকে বোঝাতে লাগল—এত ভাবনা কিসের? হাওড়া তো বিদেশ-বিড়ুই নয়। বাসের নম্বর জানা থাকলে—

তবু অস্বস্তি যায় না। যে কথাটা বার বার তাকে খোঁচাচ্ছিল তা এই যে, রীণা কলকাতায় নতুন। সঙ্গে আবার বাচ্চা। পথ ভুল করতে পারে, এক বাসে উঠতে অন্য বাসে উঠতে পারে। অবশ্য তাতেই-বা এমন আর কি বিপদ হতে পারে! ট্যাক্সি নয় যে ভুলিয়ে কোথাও নিয়ে যাবে। ট্রামে, বাসে কেউ পথ হারায় না। লোককে জিজ্ঞেস করলেই ঠিক রুট দেখিয়ে দেবে। কাজেই বাড়ি ফিরে আসা কঠিন নয়। ভয় একটাই—অ্যাক্সিডেন্টের। রাস্তা পার হওয়ার অভ্যেস নেই—ভিড় বাসে ওঠা-নামা করতেও অনভ্যস্ত। ভয়টা সেইজন্যেই।

সঞ্জয় সময় দেখল—সাদে সাতটা। সকালে বেরোবার আগে সে রীণাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার বন্ধু আটকে দেবে না তো?

—আটকালেও থাকব না। সন্দের আগেই ফিরে আসব।

সন্কে তো কখন উৎরে গেছে!

সঞ্জয় আর ঘরে বসে থাকতে পারছিল না। একবার ভাবল বাস-স্টপেজে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু স্টপেজে গিয়ে দাঁড়ালেই কি রীণা তাড়াতাড়ি এসে পড়বে? তা তো নয়। আসলে মানুষ দৃষ্টিভ্রমে যখন ছুঁফুঁট করে তখন আর হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। সঞ্জয় দরজায় তালা বন্ধ করে নামতে যাচ্ছে এমনি সময়ে ঝড় উঠল।

প্রথমে সঞ্জয় বুঝতেই পারেনি ঝড় উঠছে। নভেম্বরের এই পরিষ্কার আকাশ ফুঁড়ে এমন ঝড় উঠবে এ যে কল্পনার বাইরে! একটা গোঁ গোঁ শব্দের পরই ধুলোয় ধুলোয় চারিদিক ছেয়ে গেল। ব্যালকনি থেকেই দেখতে পেল রাস্তার লোক ছুটছে। আশ্রয় খুঁজছে। বাড়ির দরজা জানালা ফটাফট বন্ধ হচ্ছে।

এবার সত্যিই ভয় হল। রীণা এই মুহূর্তে কোথায় আছে কে জানে! যদি বাসে থাকে তো একরকম। তাও সমস্যা—এই ঝড়ে ঠিক স্টপেজে নামতে পারবে কি না। নামবেই বা কি করে? পুপুটাই বা কি করবে?

আর যদি রাস্তায় থাকে—

সঞ্জয় আর ভাবতে পারল না। ঘরে ঢুকে সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করতে লাগল।

ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য চলল প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে। ঝড় যখন থামল রাত তখন নটা। ভাগ্য ভালো। বৃষ্টি নামেনি।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সঞ্জয় দেখল যশোর রোড একদম ফাঁকা। খাঁ-খাঁ করছে। লোক চলাচল তো নেইই, বাস-ট্যাক্সিও চোখে পড়ল না।

দারুণ দুর্ভাবনায় পড়ল সঞ্জয়। নিশ্চয় রীণার কিছু বিপদ হয়েছে। আর পুপুটা? ভাবতে ভাবতে সঞ্জয় অস্থির হয়ে উঠল।

এখন কি করবে? কোথায় খবর নেবে? পরামর্শ করে এমন কেউ কাছেই মানুষ নেই। একবার ভাবল দোতলায় গিয়ে খবর নেয় নিখিলবাবু ফিরেছেন কিনা। এবাড়িতে যত ভাড়াটে আছেন তাদের মধ্যে নিখিলবাবুই একমাত্র সিরিয়াস লোক। ওঁর সঙ্গেই কথা বলা চলে। তবু সঞ্জয় গেল না। কে জানে ভদ্রলোক কী মনে করবেন!

অনেক ভেবে সঞ্জয় ঠিক করল মাস্তদের বাড়িই যাবে। হয়তো ওকে আটকে দিয়েছে।

কিন্তু মাস্তদের বাড়ি তো চেনে না। ঠিকানা? না, ঠিকানাও জানা নেই।

কি মনে হল উঠে ড্রয়ার টেনে মাস্তর চিঠিগুলো খুঁজতে লাগল।

একটা চিঠি পেল।—ভাই রীণা....

নাঃ, ঠিকানা নেই। শুধু ক্ষীরোদতলা, হাওড়া।

শুধু ক্ষীরোদতলা বললে কি এই রাস্তার কাষে বাড়ি খোঁজ করা যায়? অসম্ভব।

সঞ্জয় আবার চিঠি খুঁজতে লাগল।

আরো একটা চিঠি।—

ভাই রীণা....

আহা, ঠিকানা ছিল কিন্তু খাম খুলতে গিয়ে ঐ জায়গাটা ছিঁড়ে গেছে।

সঞ্জয় পাগলের মতো ড্রয়ার টেনে খুলে সব কাগজ হাতড়াতে লাগল।

এই যে আরো চিঠি রয়েছে।....

নাঃ—কোনোটাতেই পুরো ঠিকানা নেই।

সঞ্জয় যখন একেবারে হতাশ তখন ড্রয়ারের কোণ থেকে বেরোল দুমড়োনো একটা খাম। তাড়াতাড়ি চিঠিখানা বের করল। এইটে বোধহয় মাস্তর প্রথম চিঠি।

হ্যাঁ, এই যে ঠিকানা রয়েছে।

ঠিকানা লিখে নেবার ধৈর্য তখন আর নেই। চিঠিটা পকেটে পুরেই সঞ্জয় ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

দরজায় তালা লাগাচ্ছে, মনে হল কেউ দ্রুত পায়ে ওপরে আসছে।

সঞ্জয় শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়াল। নিশ্চয় কোনো বিপদের—

—কাকু, আপনার ফোন।

সঞ্জয় দৌড়ে নেমে গেল।

## রীণা কি ফেরেনি

সকাল হতে না হতেই মাস্ত কাপড় পরে নিল। কাল সারা রাত রীণার কথা ভেবে ঘুমোতে পারেনি। অমন তো কত জনেই আসবে বলে আসে না বা আসতে পারে না। তখন মোটেই ভাবনা হয় না। রীণা বলেই এত দুর্ভাবনা। প্রথমত, ও কলকাতায় নতুন। কে জানে কোন্ বাসে চড়তে কোন্ বাসে চড়ল। কোথায় আসতে কোথায় গিয়ে পড়ল। দ্বিতীয়ত, ও যেন ঠিক সুস্থ নয়। আর যে-মানুষ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে তার সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

অথচ একথাটা আগে মনে হয়নি। মনে হলে নিশ্চয় একা আসতে বলত না।

ভাবতে ভাবতে মাস্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কী যে হলো মেয়েটার!

ললিতবাবু বললেন, চা খেয়ে যাবে না?

—না। বলেই মাস্ত তখনই বেরিয়ে পড়ল। ওর শরীরের ওপর যেন অসময়ে ভরী গরম কোট চাপানো রয়েছে। খুলে ফেললেই আরাম। কিন্তু খুলব বললেই খোলা যাচ্ছে না। মনের মধ্যে কেবলই খারাপ চিন্তা ঘুরে ফিরে আসছে। গিয়ে কি দেখবে! কি শুনবে!

যদি দেখে, রীণা বাড়ি নেই? যদি শোনে রীণা কাল দুপুরে সেই যে হাওড়া যাবে বলে বেরিয়েছিল এখনো পর্যন্ত ফেরেনি?

তাহলে কি করবে?

যদি দেখে বাড়ির সামনে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে? লোকে ভিড় করে আছে থমথমে মুখে?

তাহলে কি বুঝবে?

কী বুঝবে তা আর কল্পনা করতে হয় না।

মাস্তর বুকের মধ্যে কিরকম করতে লাগল।

একবার ভাবল—গিয়ে দরকার নেই। ফিরেই যাবে। প্রিয়জনের কোনো মর্মান্তিক খবর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে শোনার শক্তি তার নেই।

তারপরেই ভাবল রীণা না হয়ে যদি তার বাড়ির কেউ হতো তাহলে কি পারত পালিয়ে থাকতে?

না, পারত না। কাজেই এখানেও তাকে মুখোমুখি হতেই হবে, যত খারাপ ঘটনাই ঘটে থাকুক না কেন।

মাস্ত এবার যেন মনে জোর পেল।

ক্ষীরোদতলার মোড়ে আসতেই বাস পেয়ে গেল। মিনিট দশেকের মধ্যেই

ময়দানে এসে পৌঁছল। বঙ্গবাসী সিনেমাহলের কাছ থেকে নাগেরবাজারের টানা বাস ছাড়ছিল। বাসটা কালিন্দি, লেকটাউন, বাঙ্গুর হয়ে যাবে। ছুটে এসে হাত তুলে বাস থামিয়ে কোনোরকমে উঠে পড়ল।

এক ঘণ্টার পথ। এত সকাল বলেই বাসে ভিড় ছিল না। জানলার ধারে ভালো সীট পেয়ে গেল। অন্য সময় হলে এইরকম সীটের জন্যে খুশি হতো। কিন্তু আজ মনটাই অন্যরকম হয়ে আছে।

...লেকটাউন, বরাট পার হয়ে গেল। পরের স্টপেজটাই রীণাদের। মাস্ত রড ধরে উঠে দাঁড়াল। পা দুটো তখন ওর কাঁপছে।

বড়ো রাস্তা পার হয়ে সরু রাস্তা। মিনিট পাঁচেক পরেই দেখা গেল ওদের বাড়ির গম্বুজটা। মাস্ত সমস্ত শক্তি নিয়ে হনহন করে কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকল।

## ॥ দশ ॥

### অদৃশ্য মানুষ—দৃশ্য চোখ

সঞ্জয়ের ইচ্ছে ছিল না মাস্তদের বাড়ি রীণা একা যায়। মাস্ত অবশ্য দুজনকেই যাবার কথা বলেছিল। কিন্তু সঞ্জয়ের তো সপ্তাহে একটি দিনই ছুটি। আর সপ্তাহে এই একটি দিন সঞ্জয় কোথাও নড়তে চায় না। তাই ছ'মাসের বেশি হল ওরা এখানে এসেছে, অথচ একদিনও মাস্তর কাছে যাওয়া হয়নি। শেষে মাস্তই একদিন সকালে এসে রীণাকে নিয়ে গিয়ে সেদিনই সন্ধ্যায় পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। দুই সন্ধ্যাতে ঠিক করেছিল—এরপর রীণা একাই যাবে-আসবে। মাস্তও মাঝে-মাঝে আসবে।

এই প্রস্তাব শুনে সঞ্জয় মাস্তকে হেসে বলেছিল—বেশ তো আপনি এসে নিয়ে যাবেন। শুনে রীণা ফোঁস করে উঠেছিল—আহা, আমি কচি খুকি! যেন একা যেতে পারি না।

হয়তো পারে কিন্তু মহাজাতি সদনে সেই ঘটনার পর রীণার সম্বন্ধে সঞ্জয় খুব সতর্ক। একা ছেড়ে দিতে ভরসা পায় না। আবার একটু-আধটু ছেড়ে না দিলে মনটাও ঠিক হবে না। এইসব ভেবে শেষ পর্যন্ত একা ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছিল।

সকালে বেরোবার সময়ে সঞ্জয় রীণাকে বার বার করে বলল, সাবধানে যেও। বাসের নম্বর ভালো করে দেখে উঠো। কোলে বাচ্চা। তাড়াছড়ো করে উঠো না। ভিড় থাকলে সে বাস ছেড়ে দেবে। বাস থেকে নামার সময়ে পেছন দিকে তাকিয়ে নামবে। সাবধানে রাস্তা ক্রশ করবে। আচ্ছা, দাঁড়াও। টাকা কটা রেখে দাও। দরকার হলে ট্যাক্সি করবে। তবে ফেরার সময়ে করো না। তখন সন্ধে হয়ে যাবে। ট্যাক্সিতে—একা—অচেনা—

উত্তরে রীণা মুখ টিপে একটু হাসল। বলল, আমি বোধহয় একেবারে গেঁয়ো মেয়ে নই। লেখাপড়াও জানি একটু-আধটু।

বেরোতে বেরোতে শেষ পর্যন্ত বেলা দেড়টা হয়ে গেল।

নভেম্বর মাস। অল্প অল্প শীত পড়েছে। বেলা দুপুরেও রোদের তাত তেমন অসহ্য নয়। ফিরতে ফিরতে যদি সন্ধে হয়ে যায় ভেবে ব্যাগের মধ্যে পুপুর একটা সোয়েটার আর নিজের একটা শালও ভাঁজ করে নিয়েছে।

রীণা বড়ো রাস্তায় এসে দাঁড়াল। ওর বেশ ভালো লাগছিল। বন্ধুর কাছে যাচ্ছে বলেই নয়, বাড়িটা থেকে বেরোতে পারলেই যেন বাঁচে।

রীণা ফুটপাথ থেকে নেমে বাস-স্টপেজের দিকে চলল। হঠাৎ একেবারে পিছনে গাড়ির শব্দ শুনে এক লাফে ফুটপাথে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে একটা মিনিবাস শাড়ির আঁচল ছুঁয়ে আর-একটা বাসকে ওভারটেক করে বেরিয়ে গেল।

উঃ! হয়েছিল এখুনি! আশ্চর্য, বাসটা হর্ন পর্যন্ত দেয়নি।

ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন পথচারী দাঁড়িয়ে পড়েছে। রীণাকে বললে, খুব বেঁচে গেলেন দিদি! কাউকে কিছু বলার নেই। নিজে সাবধানে যাবেন।

রীণা কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল। মনটা খচ্ছচ্ করতে লাগল—কেন এমন হল?

তারপরেই নিজেকে বোঝাল সাবধানে না চললে দুর্ঘটনা তো ঘটতেই পারে। ফুটপাথ থেকে নামা উচিত হয়নি।

একজন মহিলা স্টপেজে দাঁড়িয়েছিলেন। রীণার হাবভাব দেখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাবেন?

—হাওড়া।

—এই তো চলে গেল হাওড়ার বাস। লক্ষ্য করেননি!

অন্য রুটের একটা বাস এসে পড়ায় ভদ্রমহিলা তাতে উঠে চলে গেলেন।

রীণার মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভদ্রমহিলা তাকে লক্ষ্য করছিলেন কেন? তবে কি সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে? কিছু অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েছে?

ঘড়ির দিকে তাকাল। সোয়া দুটো। অর্থাৎ আধঘণ্টারও বেশি দাঁড়িয়ে আছে। একশো উনিশ নম্বর বাসও এসেছিল। খেয়াল করেনি।

মনটা ঠিক করে নিয়ে রীণা বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পরেই আর একটা একশো উনিশ নম্বর এল। বেশ ভিড়। তবু রীণা উঠল। লেডিজ সীট একটাই খালি ছিল। রীণা বসে পড়ল।

বাস চলেছে। লোক নামছে, উঠছে। যত লোক নামছে তার চেয়ে ঢের বেশি উঠছে। রীণা জানলা দিয়ে দেখতে দেখতে যাচ্ছিল। এসব রাস্তা সে চেনে না। বাসটা কোন কোন জায়গা দিয়ে যাচ্ছে তাও জানে না। শুধু এটুকুই জানে বাসটা হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাবে।

পুপু এতক্ষণ বেশ শান্ত হয়েছিল। এখন দুটুমি শুরু করেছে। তার আর দোষ কী? মায়ের কোলে আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে থাকা কতক্ষণ আর সম্ভব? একবার ও হাত-পা ছুঁতে ছুঁতে কোল থেকে পড়ে যায় আর কি! রীণা জানলা থেকে মুখ ফিরিয়ে সোজা হয়ে পুপুকে জোর করে কোলে তুলে নিল।

সামনে লোক সার সার দাঁড়িয়ে। লেডিজ সীটের সামনেই রড ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্যাসেঞ্জাররা। বাসের ওদিকেও একই অবস্থা।

—বাবাঃ! সবাই হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাবে নাকি? তাহলে ঐ ভিড় ঠেলে পুপুকে নিয়ে নামবে কি করে?

তারপরেই ভাবল অসুবিধে আর কি? সবাই নেমে গেলে ধীরে সুস্থে নামবে।

হঠাৎ রীণা দেখল বাসের সামনের দিকে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে একজন তাকে লক্ষ্য করছে।

কয়েকবারই চোখ পড়েছিল, তখন বুঝতে পারেনি। এখন স্পষ্ট বুঝতে পারল—হ্যাঁ, তাকেই দেখছে। কিন্তু লোকটিকে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না। ভিড়ে আড়াল পড়ে গেছে। এমন-কি মাথা মুখও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন চোখের ভাষায় বলতে চাইছে—“আমায় চিনতে পারছ না?”

রীণারও মনে হল ঐ চোখ যেন তার খুব পরিচিত। কোথায় যেন দেখেছে।

রীণা কয়েক বার তাকাল। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করল লোকটি কে হতে পারে? ঐ চাউনি যে তার খুবই চেনা।

বাসটা প্রথমে বেশ জোরেই চলছিল। তারপর ক্রমশ কেমন টিকিয়ে টিকিয়ে চলতে লাগল। প্যাসেঞ্জারেরা তো চেষ্টামেচি শুরু করে দিল।—বাস চলছে, না গোরুর গাড়ি?

বাসটা একটা বড়ো ক্রসিং-এর স্টপেজে এসে থামল। অনেক প্যাসেঞ্জার নামল, উঠল। কন্ডাক্টর দু’বার ঘণ্টি বাজাল। কিন্তু হঠাৎই বাসটার ইঞ্জিন থেমে গেল। আর স্টার্ট নিল না।

কন্ডাক্টর বলল, গাড়িটা ঠেলার দরকার।

কয়েকজন প্যাসেঞ্জার নেমে গিয়ে কন্ডাক্টরের সঙ্গে গাড়ি ঠেলতে লাগল। গাড়ি একবার স্টার্ট নিল। তারপর আবার থেমে গেল।

গতিক সুবিধে নয় দেখে অনেকেই নেমে পড়ে অন্য বাস ধরতে গেল। কেউ কেউ কন্ডাক্টরের কাছে টিকিটের পয়সা ফেরত চাইতে লাগল। বাস খালি হয়ে গেল। শুধু রীণা চুপ করে বসে রইল। বুঝতে পারছিল না—কি করবে?

কন্ডাক্টর এসে বলল, আপনি বসে আছেন কেন? বাস যাবে না।

রীণা তাড়াতাড়ি পুপুকে কোলে নিয়ে উঠে পড়ল।

কন্ডাক্টরটি বোধহয় হৃদয়বান। বলল, টিকিটের পয়সা ফেরত নিন।

বলে টিকিটটা নিয়ে পয়সা ফেরত দিল। জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন?

—ক্ষীরোদতলা।

—সেটা আবার কোথায় ?

—হাওড়ায়।

পিছনে তখন অনেকগুলো বাস এসে পড়েছিল। কন্ডাক্টর খুঁকে পড়ে একটা বাস দেখিয়ে দিয়ে বলল, ঐ বাসে চলে যান।

রীণা তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল। এক বার সেই লোকটিকে খুঁজে দেখার কথা মনে হল। চারদিকে তাকাল। কিন্তু এমন কাউকে দেখতে পেল না যে তাকে দেখছে। বুঝল—যে দেখছিল সে এতক্ষণে নেমে অন্য বাসে চলে গেছে।

কাছেই বাসটা দাঁড়িয়ে ছিল। রীণা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

এ বাসটাতেও ভিড় কম ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যে ভিড় আরো বেড়ে গেল। সেই ঠাসাঠাসি ভিড়।

বাস যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। পথ যেন আর শেষ হয় না। বসে বসে রীণার ঘুম এল। দু একবার তুলুনি। তার পর কখন একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল ঠিক নেই। পুপুর কান্নায় ঘুম ভেঙে গেল। রীণা পুপুকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে সামনে তাকাতেই দেখতে পেল সেই অদৃশ্য মানুষটার চোখ। আগের মতোই দূর থেকে তাকে একদৃষ্টে দেখছে। এবারও তার মুখ বা দেহ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ভিড়ের আড়ালে অদৃশ্য।

রীণা খুব অবাক হল। লোকটা এ গাড়িতেও উঠেছে! তাহলে আগের বাসটা খারাপ হলে সে যখন নেমেছিল তখন লোকটাকে দেখা গেল না কেন ?

রীণা চোখ সরিয়ে নিয়ে জানলার বাইরে দেখতে লাগল।

একটু পরে বাসটা এক জায়গায় এসে থামল। রাস্তাটা আগের মতো চওড়া নয়। খুব ঘিঞ্জি। একপাশে দোকানপাট। অন্য পাশে বোধহয় মিনিবাস, সাইকেল-রিকশার স্ট্যান্ড। লোকজন ব্যস্ত হয়ে চলাফেরা করছে। মিনিবাসের কন্ডাক্টর কর্কশ গলায় হাঁকছে—ঢাকুরিয়া—পার্কসার্কাস—সন্টলেক। সাইকেল-রিকশাওয়ালা ঘন ঘন হর্ন বাজিয়ে সোয়ারি ডাকছে।

বাস এখানে থামতেই প্যাসেঞ্জাররা নেমে গেল। এখানে সবাই নামল কেন ? এই কি হাওড়া ময়দান ? যাই হোক পুপুকে কোলে নিয়ে রীণাও নামল।

নেমেই হকচকিয়ে গেল। না, এ তো হাওড়া ময়দান নয়, হাওড়া স্টেশনও নয়।

তাহলে ?

তাহলে কোথায় এল ?

ওরই মধ্যে একবার সেই চোখ দুটোকে খুঁজল। না, কেউ তাকে দেখছে না।

রীণার কিরকম ভয় করতে লাগল। সেই অদৃশ্য মানুষটার জন্যে নয়, তার মনে হতে লাগল নিশ্চয় ভুল বাসে উঠে পড়েছিল। নিশ্চয় অন্য কোথাও এসে পড়েছে।



কিস্ত জায়গাটা কি ?

ভাবল কাউকে জিজ্ঞেস করবে! কিন্তু যাকে-তাকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করল। তাছাড়া আনাড়ি মেয়ে ভেবে যদি কেউ তাকে ফলো করে? রীণা ঠিক করল কোনো প্রবীণ মানুষ দেখতে পেল তাকে জিজ্ঞেস করবে।

এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সে দেখতে পেল একটা দোকানের রোয়াকে বসে একজন বৃদ্ধ খবরের কাগজ পড়ছেন।

রীণা পায়ে পায়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বৃদ্ধ চোখ তুলে তাকালেন। রীণা জিজ্ঞেস করল, এটা কোন জায়গা?

বৃদ্ধ বললেন, যাদবপুর।

—যাদবপুর! রীণা থমকে গেল।

রীণার মুখের অবস্থা লক্ষ্য করে বৃদ্ধ বললেন, তুমি কোথায় যাবে মা?

রীণা লজ্জায় সংকোচে ইতস্তত করতে লাগল। বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, এটা যাদবপুর স্টেশন রোড। এখানেই কোনো নম্বর খুঁজ?

রীণা মাথা নাড়ল।

—তবে?

রীণা একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি হাওড়া যাব।

—হাওড়া যাবে! আসছ কোথা থেকে?

রীণা বলল, বাঙ্গুর থেকে।

—বাঙ্গুর মানে?

—লেকটাউন, বাঙ্গুর।

—সেখান থেকে এখানে!

রীণা তখন সব ঘটনা বলল।

শুনে বৃদ্ধ বললেন, তুমি কি হাওড়া স্টেশনেই যাবে?

—না, হাওড়া ময়দান।

—তাহলে তো তুমি অনেকটা এগিয়ে এসেছ মা। যেখানে নেমেছিলে সেখানেই বাস পেতে। তুমি ওখানেই চলে যাও।

রীণা একটু ভেবে বলল, আমি বাঙ্গুরেই ফিরে যাব ভাবছি।

বৃদ্ধ বললেন, সেই ভালো। তুমি নতুন। সন্দের পর হয়তো জায়গা চিনতে পারবে না। অবশ্য এখান থেকে বাঙ্গুর যাবার টানা বাসও নেই। বাস চিনে বদলাতে পারবে?

রীণা মাথা নাড়ল।

বৃদ্ধ বললেন, আমারও তাই মনে হয়।

একটু ভেবে বললেন, তুমি এক কাজ কর। সামনেই যাদবপুর স্টেশন। ওখান থেকে শিয়ালদা চলে যাও। তিনটে স্টেশন—ঢাকুরিয়া, বালিগঞ্জ, পার্কসার্কাস। যেখানে নামবে সেটা সাউথ স্টেশন। সেখান থেকে নর্থ স্টেশনে এসে যে কোনো গাড়িতে উঠলেই উল্টোডিক্সি পৌঁছে যাবে—একটাই স্টেশন। তারপর ওখান

থেকে একটা রিকশা নিয়ে নেবে—আমার ধারণা উল্টোডিক্সি থেকে বাসুর রিকশা যায়।

রীণা খুশি হয়ে বুদ্ধকে নমস্কার করে যাদবপুর স্টেশনে গেল। দুদিকে প্ল্যাটফর্ম। তখন সন্ধে হয়ে গিয়েছে। চারিদিকে আলো জ্বলে উঠেছে। পুপুকে কোলে নিয়ে রীণা আর চলতে পারছিল না। কোনোরকমে শিয়ালদার একটা টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল।

একটু পরেই একটা ট্রেন এল। রীণা গাড়িতে উঠে পড়ল। গাড়িতে এত ভিড় যে রীণা বসার জায়গা পেল না। দাঁড়িয়ে থাকতে হল। একে মানসিক উদ্বেগ,—কত দূরে শেয়ালদা স্টেশন, সেখান থেকে কোন ট্রেনে উল্টোডিক্সি; তারপর কোথায় পাবে বাসুর যাবার রিকশা! এসব চিন্তা তো আছেই, তার ওপর পরিশ্রম। রীণার শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল। তবু অনেক কষ্টে এক হাতে পুপুকে জড়িয়ে নিয়ে অন্য হাতে রড ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

ট্রেন ছুটছে। কোন স্টেশন কখন যাচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না। বুদ্ধ ভদ্রলোক বলেছিলেন, মাত্র তিনটে স্টেশন পরেই শিয়ালদা। তিনটে স্টেশন কি এখনও যায় নি? একজনকে জিজ্ঞেস করতে গেল কিন্তু গলায় ভালো করে স্বর ফুটল না। ট্রেনের মধ্যে গোলমালে কেউ তার কথা শুনতে পেল না। ট্রেনটা একটা স্টেশনে থেমেই আবার চলতে শুরু করল। কেমন একটা দম-আটকানো কষ্ট হচ্ছে। পুপুকেও আর কোলে রাখতে পারছে না। পুপু যেন কোল থেকে পড়ে যাচ্ছে। রীণা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। রড ধরে মেঝেতেই বসে পড়ল...

এক সময়ে তার কানে এল কে যেন বলছে—আপনি কোথায় যাবেন?

রীণা অতিকষ্টে চোখ মেলে তাকাল। দেখল সে একটা বৈষ্ণিতে শুয়ে আছে।

—পু-পু! বলে ধড়মড় করে উঠে বসল।

একজন ভদ্রলোক সম্ভবত তাঁর স্ত্রীকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এই যে এঁর কোলে।

—আমি কোথায়?

—এটা মল্লিকপুর স্টেশন।

—মল্লিকপুর!

—হ্যাঁ, ডায়মন্ড হারবার লাইনে। এর পরেই বারুইপুর। আপনি কোথায় যাবেন?

—শেয়ালদা।

—শেয়ালদা! তো এদিকে এলেন কি করে?

রীণা কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, জানি না।

—আপনি তো উল্টোদিককে এসে পড়েছেন।

রীণা বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ভদ্রলোকের স্ত্রী পুপুকে রীণার কোলে তুলে দিয়ে বললেন, আজ আপনি

আমাদের বাড়ি চলুন। আমরা এখানেই থাকি। কাল সকালে উনি না হয় আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন।

রীণা একটু চুপ করে থেকে ছেলেমানুষের মতো বললে—আমি বাড়ি যাব।

—বাড়ি কোথায় ?

—বাসুর।

তখন ভদ্রলোক বললেন, ঠিক আছে চলুন, আপনাকে বালিগঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।

পরের ট্রেনে ভদ্রলোক রীণাকে নিয়ে বালিগঞ্জ স্টেশনে এলেন। এই সময়ে উঠল প্রচণ্ড ঝড়।

ভদ্রলোক এমনও ভেবেছিলেন রীণাকে না হয় বাসুর পৌঁছে দিয়েই আসবেন। কিন্তু প্রচণ্ড ঝড় ওঠায় এত দেরি হয়ে গেল যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হল না। তিনি রীণাকে নিয়ে এলেন বালিগঞ্জ থানায়।

সেখানে পুলিশ রীণাকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করল। স্বামীর নাম, ঠিকানা। রীণার তখন ঘোর কেটে গিয়েছিল। সব কিছুই বলতে পেরেছিল।

ভদ্রলোক ও. সি.কে বললেন, যদি আপনারা অনুগ্রহ করে এঁকে বাড়িতে পৌঁছে দেন।—

ও. সি. বললেন, অনুগ্রহ কেন বলছেন, এ তো আমাদের কর্তব্য। তবে একটু দেরি হবে। পুলিশ ভ্যানগুলো—

বলেই রীণাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বাড়িতে ফোন আছে ?

রীণা বললে, দোতলায় এক ভদ্রলোকের ঘরে আছে।

—নম্বর ?

—নম্বর ! রীণা মনের মধ্যে হাতড়াতে লাগল।

—মনে নেই ?

রীণা চোখ বুজিয়ে একটু ভাবল। তারপর ভেবে ভেবে খুব আন্তে গুনে গুনে টিল ছোঁড়ার মতো একটি একটি সংখ্যা বলে গেল।

ও. সি. তখনই রিসিভার তুললেন।

মাস্ত দারুণ উদ্বেগে কড়া নাড়তে লাগল। ভেতর থেকে পুরুষের সাড়া পাওয়া গেল।

—কে ?

—আমি মাস্ত—

ব্যাকুল কণ্ঠস্বর যেন স্বচ্ছ দরজার ওপরে আছড়ে পড়ল।

দরজা খুলে দিল সঞ্জয়। ছড়মুড় করে ঘরে ঢুকল মাস্ত। রীণা কোথায় ? ভালো আছে তো ?

উত্তর পাবার দরকার ছিল না। মাস্ত দেখল ম্লান ক্লান্ত মুখে বিহ্বলদৃষ্টিতে রীণা তাকিয়ে আছে।

সঞ্জয় হেসে বলল, আসুন, কাল অনেক রাত্তিরে আপনার বাস্কবীকে উদ্ধার করে এনেছি।

॥ এগারো ॥

মিস থাম্পি

সাতাশে নভেম্বর।

মিস থাম্পি এসেছেন। রীণাও এসেছে। রীণাকে মাস্তাই নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছে। একদিন থাকবে।

আসল উদ্দেশ্য মিস থাম্পির মতো মানুষ যখন আসছেন তখন রীণাকে একবার দেখিয়ে নেওয়া। মিস থাম্পি তো সারাজীবন প্রেতচর্চাই করছেন। রীণাকে দেখলে, তার মুখ থেকে সব শুনলে হয়তো মিস থাম্পি বলতে পারবেন মানসিক ব্যাধি না অন্য কিছু। মাস্তুর উদ্দেশ্যটা রীণাও জানতো না।

এখানে এসেই শুধু এক পেয়ালা কফি খেয়ে বেরোবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মিস থাম্পি। রীণার সঙ্গে আলাপ করার আগ্রহ দেখালেন না। মাস্ত তবু এক নিশ্বাসে পরিচয়টুকু মাত্র দিতে পারল। তাও তিনি ভালো করে শুনলেন বলে মনে হল না।

—চলুন মিস্টার চৌধুরী, আগে পার্ক স্ট্রীটের সিমেট্রিটা দেখে আসি।

বলে তখনই ললিতবাবুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

পার্ক স্ট্রীটের সেই দেড়শো বছরেরও বেশি পুরনো কবরখানাটা মিস থাম্পি অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখলেন। বড়ো বড়ো গাছের ছায়ায় জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা। মিস থাম্পির খুব ভালো লাগল।

কয়েক জায়গায় কয়েকটা কবর পরীক্ষা করলেন। ব্যাগ থেকে একটা শিশি বের করে খানিকটা কবরের মাটি পুরে নিলেন। একটা পুরনো কবরের পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে কান পেতে কী যেন শুনলেন। এমনি করে সারা সকাল কাটালেন।

মিস থাম্পি বেরিয়ে গেলে মাস্ত দু'পেয়ালা কফি নিয়ে রীণার কাছে এসে বসল।

—কী রে! মুখ অমন ভার কেন? মন কেমন করছে বুঝি?

রীণা ন্মান হাসল। বলল, মন বলে বোধহয় আর কিছু নেই। হ্যাঁরে, আমায় কি রাত্তিরে থাকতেই হবে?

মাস্ত হেসে বলল, বরকে ছেড়ে বুঝি একটা রাত্তিরও থাকতে ইচ্ছে করে না?

রীণার ফ্যাকাশে মুখে লালচে আভা ফুটে উঠল।—তা নয়। ঐ বাড়িতে একা থাকা—

—দূর! তুই একটা পাগল! বলে মাস্ত রান্নাঘরের দিকে উঠে গেল।

রাষ্টির সঞ্জয় বাড়িতে একা থাকবে এ দুর্ভাবনা তো রীণার ছিলই, তাছাড়া এখানেও তার ভালো লাগছে না। সে এসেছিল নিরিবিলিতে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে। কিন্তু এদিনই একজন ভি. আই. পি. এসে হাজির। এই মহিলাটিকে রীণার মোটেই ভালো লাগছিল না। যেন কেমন ধারা! একে তো অবাঙালী, চালচলন আলাদা। কথাও কম বলেন। তাছাড়া কিসব প্রেতচর্চা করেন। নিজের ঘরেই নিত্য ভূতের আতঙ্ক তারপর এখানে এসেও—

চিন্তায় বাধা পড়ল। একজন মহিলাকে নিয়ে মাস্ত ঘরে ঢুকল। রীণার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল।

ভদ্রমহিলা মাস্তদের প্রতিবেশিনী। মিসেস লাহিড়ি। ছোটোখাটো হাসিখুশি মানুষটি। ফর্সা রঙ। গোল মুখ। কপালে বড়ো একটা টিপ।

মিসেস লাহিড়ি আলাপ করতে আসেননি। এসেছিলেন অন্য উদ্দেশ্যে। তাই রীণার সঙ্গে আলাপটা হল দায়সারা গোছের।

তারপরেই মাস্তকে বলল, তাহলে বিকেলে গুঁকে নিয়ে যাবেন।

রীণা ভেবেছিল বুঝি তাকেই নিয়ে যাবার কথা বলছেন। না, তা নয়। নেমস্তন্নটা এঁ মাদ্রাজী মহিলাকে।

মাস্ত বলল, হ্যাঁ, নিয়ে যাব। উনি ফিরে এলে বলব আপনি নেমস্তন্ন করতে এসেছিলেন।

বেলা দুটো নাগাদ মিস থাম্পিকে নিয়ে ললিতবাবু ফিরলেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে মিস থাম্পি বসলেন লিখতে।

বিকেল সাড়ে তিনটের সময় এক কাপ কফি খেলেন। তখন মাস্ত খুব বিনীতভাবে মিসেস লাহিড়ির কথা বলল।

আপনার কখন সুবিধে হবে?

মিস থাম্পি প্রথমে একটু অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এর ওর বাড়ি যাবার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। শেষে মাস্তর বিশেষ অনুরোধে রাজি হলেন। বাড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন—

—সাড়ে চারটেয়।

ইতিমধ্যে মিস থাম্পির সঙ্গে রীণার অনেকবারই দেখা হল, কিন্তু তিনি কোনো কথা বলেননি। কোনো আগ্রহই যেন নেই।

মিস থাম্পির এই ব্যবহারে মাস্ত বেশ অস্বস্তিতেই পড়ল। গুঁর কাছে ঘীরে সুস্থে বসে রীণা কথা বলবে এইজন্যেই তো রীণাকে আনা। কিন্তু সবই যেন ভেসে যাচ্ছে। যাই হোক ঠিক সাড়ে চারটের সময়ে মিস থাম্পিকে নিয়ে মাস্ত মিসেস লাহিড়ির বাড়ি চলল। রীণা যেতে চায়নি। মাস্ত জোর করেই নিয়ে গেল।

মাস্তদের দুখানা বাড়ির পরেই মিসেস লাহিড়ির বাড়ি। বাড়ির সামনে উঁচু রোয়াক। দু'পাশে খুবই সাধারণ ফুলের বাগান।

মিস থাম্পি এখানে নতুন অতিথি, তবু তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলে আগে

আগে হাঁটছিলেন। যেন নিজের পরিচিত জায়গাতে যাচ্ছেন। নিজেই গেট খুলে খোশ মেজাজে বাগান দেখতে দেখতে ভেতরে ঢুকলেন।

রোয়াকে দাঁড়িয়েছিলেন কত-গিন্নি অতিথিকে অভ্যর্থনা করার জন্যে। পাশে ওঁদের ছেলে, বছর তেরো বয়েস।

মিস থাম্পি রোয়াকে উঠে একটু দাঁড়িয়ে পড়লেন। কপালে যেন একটু ভাঁজ পড়ল। কিন্তু তা কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

মিসেস লাহিড়িই অভ্যর্থনা করলেন, আসুন। ইনি আমার হাজব্যান্ড—  
ভদ্রলোক নিজেই বাকি পরিচয়টুকু দিলেন।

—নির্মল লাহিড়ি।

মিস থাম্পি গভীর আন্তরিকতায় হ্যান্ডসেক করলেন।

—আমার ছেলে দেবল। ক্লাস এইটে পড়ছে।

মিস থাম্পি হেসে তার চুলের ওপর একটু আদর করে দিলেন।

নির্মলবাবু সবাইকে নিয়ে ভেতরের ঘরে বসালেন। মিসেস লাহিড়ি অস্বস্তিতে পড়লেন—কোন কথা দিয়ে কিভাবে আলাপ শুরু করবেন। বাংলায় বলতে পারলে সুবিধে হতো।

নির্মলবাবুই কথা শুরু করলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল প্রেততত্ত্ব নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু আমল পেলেন না। তিনি একবারই শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন, সত্যি কি আপনি অশরীরী কিছুতে বিশ্বাসী?

মিস থাম্পি একটু হেসেছিলেন। উত্তর দেননি। এতে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ভারি লজ্জিত হয়েছিলেন।

এরপর খাওয়া। কফি আর কেক। সঙ্গে পোটাটো চিপ্‌স। মিস থাম্পি বেশ তৃপ্তি করেই খেলেন। খেতে খেতেই মিস থাম্পি জিজ্ঞেস করলেন, লোডশেডিং হয় কিনা, হলে কি করেন? তারপর হঠাৎই মাস্তকে ইশারায় বললেন, ছেলেটিকে বাইরে পাঠিয়ে দিতে।

মাস্ত হতভম্ব।

মিসেস লাহিড়িও প্রথমে ঠিক বুঝতে পারলেন না তাঁর ছেলেকে ঘর থেকে চলে যেতে হবে কেন? ও তো চুপচাপ একপাশে বসে আছে। কোনোরকম অভদ্রতা করেনি। কিন্তু মিস থাম্পি আবার চোখের ইশারা করতেই দেবলকে উনি বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। একটা অজানা আশঙ্কায় স্বামী-স্ত্রীর বুক কাঁপতে লাগল। মিস থাম্পি গৃহকর্তাকে লক্ষ্য করে হেসে বললেন, মিস্টার লাহিড়ি, আপনি কিন্তু আপনার ফ্যামিলির সকলের কথা বলেননি।

লাহিড়িবাবু মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, আমি তো সকলের সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। সকলে বলতে—আমার মিসেস আর ঐ ছেলে।

মিসেস লাহিড়ি যোগ করলেন, শুধু মেয়েটা এখানে নেই। মামার বাড়ি গেছে।

মিস থাম্পিও হেসে বললেন, কিন্তু আপনাদের সঙ্গেই আছেন এমন একজনকে আপনারা বাদ দিয়েছেন।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মিস থাম্পির দিকে তাকালেন।

মিস থাম্পি বললেন, আমি কিন্তু আপনাদের বাড়ি ঢুকেই তাঁকে দেখতে পেয়েছি। বলে হাসতে লাগলেন।

অবাক নির্মল লাহিড়ি বললেন, আরও একজনকে দেখেছেন?

—হ্যাঁ, আপনারা যখন আমায় রিসিভ করছিলেন, তিনিও পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ছুটে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। আমি ঘরে ঢুকেই তাঁকে খুঁজেছিলাম। কিন্তু তখন আর দেখতে পেলাম না। দেখলাম পরে খাবার সময়ে। টেবিলের অল্প দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। ভারি shy type-এর soft ভদ্রমহিলা।

মিস থাম্পি থামলেন।

সারা ঘর জুড়ে কেমন একটা অস্বস্তি। কেউ সেই মুহূর্তে কোনো কথা বলতে পারল না।

—এখন বলুন ইনি কে?

স্বামী-স্ত্রী একেবারে বোবা হয়ে গেলেন। নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। নির্মলবাবু একটু সামলে নিয়ে বললেন, আর তো কেউ নেই মিস থাম্পি।

—নেই, কিন্তু এক সময়ে ছিলেন। একজন মহিলা। বয়েস বছর কুড়ি-বাইশ। পার্টলা গড়ন। শ্যামবর্ণা। লম্বা চুল—একটু যেন বুঁজো হয়ে হাঁটেন—

শুনতে শুনতে লাহিড়িবাবুর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

—বলুন মিস্টার লাহিড়ি, এইরকম কেউ কি কখনো ছিলেন এ বাড়িতে? মিস থাম্পির গলার স্বরটা কেমন যেন অস্বাভাবিক শোনাল।

কয়েক মিনিট নিরব্দি স্তব্ধতা। তারপর নির্মল লাহিড়ি অস্ফুটস্বরে বললেন, আপনি যে রকম বর্ণনা দিচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে আপনি আমার ফার্স্ট ওয়াইফের কথা বলছেন। কিন্তু সে তো অনেকদিন হল—

কথা শেষ হল না। হঠাৎ মিসেস লাহিড়ি কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপরই অচৈতন্য।

বিমূঢ় নির্মল লাহিড়ি দু হাতে মিসেস লাহিড়ির দেহটা ধরে রইলেন।

—Don't worry! মিস থাম্পি বললেন।—একটু পরেই উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। ওঁকে বলবেন—nothing to fear. এই মহিলা যখন জীবিত ছিলেন তখন আপনাকে খুব ভালবাসতেন। এখনো ভালবাসেন। আর জেনে রাখুন যে spirit ভালবাসতে পারে সে কারো ক্ষতি করে না।

বলে দু'হাত তুলে নমস্কার করে বেরিয়ে এলেন।

বাড়ি ফিরে যাওয়া ললিতবাবুকে সব ব্যাপারটা বলল। ললিতবাবু স্তব্ধ হয়ে শুনলেন। মিস থাম্পি হঠাৎই যেন এদের কাছে সাধারণ সম্মানীয় অতিথি থেকে ভয়-বিস্ময়-শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে উঠলেন। এও একরকম অস্বস্তি। এই-সব মানুষের কোথায় কিসে তুষ্টি কিসে বিপত্তি বোঝা যায়। তাছাড়া অন্য অস্বস্তিও রয়েছে

মাস্তুর। যে জন্যে রীণাকে আনা তা আর কিছুতেই হচ্ছে না। ওকে নিয়ে যে নিরিবিলিতে মিস থাম্পির কাছে বসবে, মিস থাম্পি তার ফুরসতটুকুও দিচ্ছেন না। মিসেস লাহিড়ির বাড়ি থেকে ফিরে এসে আবার খাতাপত্র নিয়ে বসেছেন উনি। হয় তো আরো দু'একদিন থাকবেন। কিন্তু রীণা আর কিছুতেই থাকবে না। ওকে কাল সকালেই পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

রীণার ওপরই মাস্তুর রাগ হল। ও যদি নিজে মিস থাম্পির কাছে গিয়ে সোজাসুজি ওর বিপদের কথা বলত, তাহলে হাঙ্গামা চুকে যেত। কিন্তু ও তো ত্রিসীমানায় ঘেঁষছেই না।

রাত নটা বাজল। মিস থাম্পি তাঁর খাতা নোটবই ব্যাগে পুরে বেরিয়ে এলেন।

—আপনার খাবার ব্যবস্থা করি? মাস্তুর বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল।

—করুন। আজ তাড়াতাড়ি শোব। খুব টায়ার্ড।

খাওয়াদাওয়া চুকে গেল খুব তাড়াতাড়ি আর নিঃশব্দে। যা সচরাচর হয় না। কারণ যাঁর সঙ্গে ওরা গল্প করবে ভেবেছিলেন, তিনিই তো অতিশয় গম্ভীর।

মাস্তুর দেখল আর সময় নেই। খাওয়ার পরই মিস থাম্পি শুয়ে পড়বেন। আর রীণাও কাল সকালে চলে যাবে। কাজেই খাওয়ার পরই রীণাকে নিয়ে ওঁর ঘরে ঢুকতে হবে।

মাস্তুরকে দুর্ভাবনার হাত থেকে বাঁচালেন মিস থাম্পিই।

খাওয়া শেষ করে রীণা খালায় আঙুল দিয়ে আঁক কাটছিল। ইঠাৎ মিস থাম্পি জিজ্ঞেস করলেন—Why you look so pale? রাত্রে ভালো ঘুম হয় না?

রীণা চমকে মিস থাম্পির দিকে তাকাল।

—Are you a victim of any nightmare? রাত্রে কোন্‌না দুঃস্বপ্ন দ্যাখ?

রীণা প্রথমে কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। তার পরই সংকোচ কাটিয়ে বলল, Not dream madam! Something else.

মিস থাম্পি ভুরু কুঁচকে চোখ ছোটো করে তাকালেন।

রীণা বলল, Not only at night—constantly haunted by a feeling of an unknown fear.

মাস্তুর এই সুযোগে বন্ধুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, শুধু রাত্তিরেই নয়, দিনেও খুব ভয় পায়।

—What is that fear?

—That I do not know myself ভয়টা কি ম্যাডাম, আমি নিজেও তো জানি না।

মিস থাম্পি কিছুক্ষণ কী ভাবলেন। তারপর বললেন, আজ আমি খুব টায়ার্ড। কাল সকালে আপনার সঙ্গে কথা বলব। ঠিক সকাল ছটায়।



## ডাক্তার রুদ্র

বাড়িতে রীণা নেই, কাজেই ফেরার তাড়া নেই। রীণাকে ছেড়ে দিতে খুব একটা ইচ্ছে ছিল না ওর। তার কারণ, রীণা যেন ক্রমশ মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে সঞ্জয়ের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ অবস্থায় রীণাকে চোখের আড়াল করার এতটুকু ইচ্ছে ছিল না সঞ্জয়ের। অবশ্য মাস্ত কথা দিয়েছে সে যেমন নিজে রীণাকে নিয়ে যাচ্ছে রাত পোহালেই তেমন নিজেই পৌঁছে দিয়ে যাবে। মাস্ত আড়ালে ওকে মিস থাম্পির কথাও বলেছে। অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মহিলা, প্রেতচর্চাই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। মাস্তর ইচ্ছে রীণাকে একবার তাঁর সঙ্গে কথা বলিয়ে দেয়। এসব হাস্যকর কথা। মহিলাটি কি ঝাড়ফুক করে রীণাকে সুস্থ করে তুলবেন? তবু সঞ্জয় বাধা দেয়নি। ভেবেছে মাস্তর বাড়িতে এক রাত্তির থাকলে রীণার হয়তো ভালোই লাগবে। মাস্তও তাকে বোঝাতে পারবে।

সারাদিন হাসপাতালে কাজের মধ্যে কেটে গেল। রীণা যে বাড়ি নেই এ কথা একবারও মনে হল না। মনে পড়ল বিকেলে হাসপাতাল থেকে বেরোবার পর। ভাবল এখনই গিয়ে কি করবে? বাড়ি তো খালি।

সঞ্জয়ের অবশ্য হুটহাট যাওয়ার মতো জায়গা একটা আছে। সেটা ডাক্তার রুদ্রর বাড়ি। সঞ্জয় ঠিক করল ওখানেই যাবে। রীণার ব্যাপারে একটু কথা বলা দরকার।

ডাঃ অবিনাশ রুদ্রের বাড়ি বেলগাছিয়ায়। গেটের ভেতর মোরাম বিছানো পথ। দক্ষিণ দিকে গ্যারেজ। নিচের ঘরে চেম্বার। সকালে রুগী দেখেন। সন্ধ্যাবেলায় বসেন না। ঐ সময়টা মিটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। মিটিং না থাকলে বই পড়েন।

ডাঃ রুদ্রের এক ছেলে এক মেয়ে। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে লন্ডনে ডাক্তারি পড়ছে। বাড়িতে শুধু স্ত্রী। নির্ঝঞ্ঝাট সংসার।

সঞ্জয় কলকাতায় এসেই ভেবেছিল রীণাকে নিয়ে ডাঃ রুদ্রের বাড়িতে বেড়াতে আসবে। কিন্তু তখন রীণাকে নিয়ে সিনেমা থিয়েটার দেখাতেই দিন কেটে গেল। তারপরই রীণা ভয় পেতে আরম্ভ করল। আর বেরোন হল না। শেষ পর্যন্ত ডাঃ রুদ্রকেই আসতে হল রীণাকে দেখতে। রীণার সঙ্গে সেই তাঁর প্রথম পরিচয়। যাবার সময়ে তিনি বার বার করে বলেছিলেন—সঞ্জয় যেন রীণাকে একদিন নিয়ে যায় তাঁর বাড়িতে। কাকীমা দেখবে।

সঞ্জয় একদিন নিয়ে গিয়েছিল রীণাকে। রীণার মনে অস্বস্তি ছিল ডাঃ রুদ্র হয়তো কাকীমার সামনেই তাকে ঠাট্টা করবেন। কিন্তু ডাঃ রুদ্র ওসব কোনো কথাই তোলেননি। রীণার খুব ভালো লেগেছিল।

মুখে চুরুট, সোফায় গা এলিয়ে ডাঃ রুদ্র বই পড়ছিলেন। সঞ্জয়কে আসতে দেখে বই মুড়ে রেখে সহাস্য অভ্যর্থনা করলেন, এসো এসো।

সঞ্জয় সামনের কোচে বসল।

—কি খবর বলো। রীণা কেমন আছে? বলেই ভেতরের দরজার পর্দা সরিয়ে হাঁকলেন, ওগো, সঞ্জয় এসেছে।

একটু পরেই ডাঃ রুদ্রের স্ত্রী হাসিমুখে এসে দাঁড়ালেন।—রীণাকে নিয়ে এলে না কেন?

সঞ্জয় ইতস্তত করে বলল, আজ আমি হাসপাতাল থেকে আসছি। ছুটির দিনে নিয়ে আসব।

—বোসো। আমি আসছি। বলে তিনি ভেতরে চলে গেলেন।

সঞ্জয় তখন রীণার কথা বলল। প্রথম দিনের ঘটনা ডাঃ রুদ্রের জানা ছিল। সঞ্জয় পরের দিকের সব ঘটনা খুলে বলল। গেলাস ভাঙা, ছবি চুরি থেকে আরম্ভ করে মাস্তুর বাড়ি একা বেড়াতে যাওয়া পর্যন্ত সব। বলল না শুধু মাস্তুর সঙ্গে আজকে যাওয়ার কথাটা। লুকোবার তেমন কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু মিস থাম্পির কথায় উনি হয়তো রাগ করবেন, কিংবা হাসবেন।

সব শুনে ডাক্তার রুদ্র গম্ভীর হয়ে রইলেন।

সঞ্জয় জিজ্ঞেস করল, কেসটা আপনার কিরকম মনে হয়? মানসিক ব্যাধিই?

ডাঃ রুদ্র বললেন, ওর সঙ্গে ভালো করে কথা না বললে বুঝতে পারব না।

সঞ্জয় বলল, মানসিক ব্যাধি ছাড়া আর কি হতে পারে? আপনি কি মনে করেন ও সত্যিই কোনো অশরীরী আত্মাকে দেখে?

ডাঃ রুদ্র কিছুক্ষণ কি ভাবলেন। তার পর বললেন, দ্যাখো, এ সম্বন্ধে চর্চা করে কিছু বলা ঠিক নয়, আমি অলৌকিক ব্যাপার নিজে দেখিনি। তবে রুগী দেখেছি।

—তারা কেউ সেরেছে?

—হ্যাঁ, সবাই। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন চালাচ্ছে।

—নিশ্চয় ঝাড়-ফুক করে নয়?

ডাক্তার রুদ্র বললেন, না। চিকিৎসা করেই। তবে সে চিকিৎসা ওষুধ-ইনজেকশান দিয়ে নয়, পেশেন্টের মনস্তত্ত্ব স্টাডি করে কিংবা জায়গা বদল করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্য উপায়ও নিতে হয়েছে।

ডাঃ রুদ্র কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমার মনে হচ্ছে তোমার ধারণাই ঠিক। রীণা সাইকোপ্যাথিক পেশেন্ট হয়ে পড়েছে।

সঞ্জয় এতেও সন্তুষ্ট হল না। জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ সাইকোপ্যাথিক পেশেন্ট হয়ে পড়ল কেন? তারও তো কারণ থাকবে।

—হ্যাঁ, কারণ তো থাকবেই।

—কিন্তু আমি তো কোনো কারণ দেখছি না।

ডাঃ রুদ্র একটু হাসলেন। বললেন, তুমি আর কত দিন ওকে দেখছ? তিন বছর? চার বছর? তার আগেও তো কোনো ঘটনা ঘটতে পারে যা তুমি জান না। এমনকি ওর মা-বাবাও জানে না। এমনও হতে পারে ব্যাপারটা ওর নিজেরও মনে নেই!

সঞ্জয় অবাক হয়ে বলল, সে আবার কী?

—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। খুব অল্প বয়েসে হয়তো কোনো কিছুতে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল। সেই ভয়ের কারণ বা স্বরূপ আজ আর মনে নেই। কিন্তু ভয়ের তীব্র অনুভূতিটা থেকে গিয়েছে সাব-কনসাস মাইন্ডে।

ডাঃ রুদ্র একটু থামলেন। তারপর সোজা হয়ে বসে বললেন, ছোটবেলায় একবার নররাক্ষসের জ্যাস্ত মুর্গি খাওয়া দেখে ভয় পেয়েছিল, সেদিন তুমি বলছিলে না?

—হ্যাঁ। এবারও মহাজাতি সদনে ম্যাজিক দেখতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সে কথাও আপনাকে বলেছি। কিন্তু তার সঙ্গে এখনকার মানসিক—

এই পর্যন্ত বলে সঞ্জয় একটু থামল। ডাক্তার রুদ্রের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, একটা কারণ খুঁজে পেয়েছি কাকাবাবু। রীণা যাকে দেখে তার পরনে কালো কোটপ্যান্ট। রীণা ছোটবেলায় যে নররাক্ষসকে দেখেছিল সেও আসলে ম্যাজিসিয়ান। আমার বিশ্বাস সেও কালো পোশাক পরত।

ডাঃ রুদ্রের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, ভালো কথা বলেছ। রীণাকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখো দিকি, সেই ম্যাজিসিয়ানের পোশাকটা মনে আছে কিনা।

—করব।

এই সময়ে ডাঃ রুদ্রের স্ত্রী দুজনের জন্য চা, টোস্ট আর ওমলেট নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। প্লেট নামিয়ে কাজ সারতে মিসেস রুদ্র ভেতরে চলে গেলেন।

ডাঃ রুদ্র সোফায় আধ-শোওয়া হয়ে খেতে খেতে বললেন, তবে আমার মনে হয় ওটা ঠিক কারণ নয়। ধরো, সেই ম্যাজিসিয়ানের কালো পোশাকটাই যদি ভয়ের কারণ হয় তাহলে তো যে কোনো কালো কোট-প্যান্ট পরা লোক দেখলেই ভয় হবে। মহাজাতি সদনে ম্যাজিক দেখার আগে কি কখনো কালো পোশাক পরা লোক দেখেনি?

সঞ্জয় চুপ করে গেল। নিঃশব্দে দু'চুমুক চা খেয়ে বলল, ধরেই নিলাম না হয় ছোটবেলার স্মৃতি থেকেই মহাজাতি সদনে ম্যাজিক দেখতে গিয়ে কিংবা ম্যাজিসিয়ানকে দেখে ভয় পেয়েছিল। তার সঙ্গে বাড়িতে ভয় পাবার কারণ কি? আর কলকাতায় এসেই বা এতদিন পর ভয় পেতে লাগল কেন? সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে কাকাবাবু।

ডাঃ রুদ্র চা শেষ করে একটা চুরুট ধরালেন। বললেন, গোলমাল কিছুই নয়। ব্যাপার একটাই—ভয় পাওয়া। সেই সঙ্গে একটা-কিছু দেখা।

সঞ্জয় একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, আপনিও বিশ্বাস করেন ও কিছু দেখে?

—আমি তো আগেই বলেছি, ও বিষয়ে চট্ করে কিছু বলা যাবে না। রোগের বিকারে মানুষ নিজে থেকেই বকে। কিন্তু যা বকে তা ভুল বকা। মানসিক রোগে লোকে নানা কারণে ভয় পায়—কখনো কোনো শব্দ শুনে, কখনো কোনো বিশেষ গন্ধ পেয়ে, কখনো বা কিছু দেখে। অথচ সেই শব্দ, গন্ধ বা বস্তু হয়তো আদর্শেই কিছু নেই।

—তাহলে আপনি সেই আমার কথাতেই আসছেন—রীণা সাইকোপ্যাথির পেশেন্ট?

—হ্যাঁ, তাই।

সঞ্জয় নিজেই কত বার রীণাকেই বলেছে, তুমি মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছ। আর আজ ডাঃ রুদ্রের মুখে ঐ একই কথা শুনে তার মুখটা শুকিয়ে গেল। ম্লান মুখে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে ট্রিটমেন্ট?

—আমিই করব। অবশ্য যদি বুদ্ধি সত্যিই ওর মানসিক রোগ হয়েছে।

এই বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সঞ্জয়ের পিঠ চাপড়ে বললেন, শুনে অবাক হবে, আমি এখন মেসমেরিজম নিয়ে কিছু পড়াশোনা করছি। বলতে বলতে সামনের র্যাক থেকে কতকগুলো ফাইল বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন। বললেন, একসময়ে ওদেশের ডাক্তার ফিসার (Dr Fisher), রিচার (Richer), বিনেট (Binet), ফেরি (Fere), বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানবিদ ডাক্তার লুই আর স্বয়ং মেস্‌মার যিনি মেসমেরিজমের আবিষ্কর্তা এঁরা সকলেই মেসমেরিজমের সাহায্যে কঠিন কঠিন রোগ সারাতে পারতেন। সেই সব খবরের কাটিং এই ফাইলে আছে। কৌতূহল থাকলে একটা ছুটির দিনে এসে পড়ে দেখতে পার। একটু থেমে বললেন এখনও এদেশে বহু জটিল রোগ মেসমেরিজমের সাহায্যে সারানো যায়। আমাদের দেশে ঝাড়-ফুক করে রোগ সারানো হতো। এখনও পল্লীগ্রামে ঝাড়-ফুকের ব্যবস্থা চলে। এই ঝাড়-ফুকও এক ধরনের মেসমেরিজম। তুমি কখনো দেখেছ কি না জানি না ওঝারা রুগীর কাছে বসে রুগীকে না ছুঁয়ে কিংবা তার দেহের ওপর দিয়ে খুব আলগাভাবে হাত চালায়। একে বলে ‘পাস দেওয়া’। মাথা থেকে পা পর্যন্ত এইরকম কয়েকবার ‘পাস’ দিলেই রুগী ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙলে দেখা যায় সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। অনেক মহাপুরুষই তো রোগীর গায়ে হাত বুলিয়ে তাদের রোগমুক্ত করতেন। এটা অস্বাভাবিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আসলে তাঁরা প্রচণ্ড মানসিক শক্তির অধিকারী। ঐ শক্তির বলেই তাঁরা রোগীকে রোগমুক্ত করতে পারতেন। আর মেসমেরিজমের গোড়ার কথাই হচ্ছে ‘প্রচণ্ড মানসিক শক্তি’। বৃথতেই পারছ মানসিক রোগের ক্ষেত্রে এই মেসমেরিজম কত শক্তিশালী চিকিৎসা।

সঞ্জয় বলল, তাহলে কি আপনি রীণাকে হিপনোটাইজ করে সারাবেন?

ডাঃ রুদ্র হেসে বললেন, তাহলে তো খুব ভালোই হতো। কিন্তু হিপনোটাইজ করি সে শক্তি আমার কই? আজকের দিনে ক’জন্যরই বা সে শক্তি আছে? তবে এবিষয়ে আমার ইন্টারেস্ট আছে বলেই তোমাকে এত কথা বললাম।

সঞ্জয় একটু অধৈর্য হয়ে বলল, তাহলে আপনি কিভাবে সারাবেন ?

সঞ্জয় না হয়ে অন্য কেউ এ কথা জিজ্ঞেস করলে ডাঃ রুদ্র হয়তো বিরক্ত হতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি শুধু একটু হাসলেন। বললেন, প্রথমে রোগের সঠিক কারণ খুঁজে বের করতে হবে। দেখতে হবে চাপা কোনো ভয়ের স্মৃতি আছে কিনা? কোনো মানসিক আঘাত পেয়েছে কিনা। অনেক মানসিক আঘাত নিঃশব্দে সহ্য করতে হয়, তার প্রভাবই সবচেয়ে বেশি। এছাড়া অতৃপ্ত যৌন-কামনারও একটা প্রভাব আছে। বিশেষ করে যারা উগ্রবিকৃত যৌন-কামনায় কাতর তাদের মানসিক বিকার জন্মাতেই পারে। বিকৃত যৌন-কামনায় কাতর এমন একটি পেশেন্ট আমিই পেয়েছিলাম।

সঞ্জয় অধৈর্য হয়ে বলল, রীণার ক্ষেত্রে এসবের কোনো প্রভাবই নেই। কলকাতায় আসার আগে পর্যন্ত সে সবদিক দিয়েই সুখী ছিল। এখনও তার কোনো কিছুই অভাব নেই।

ডাঃ রুদ্র নিন্দ্র হেসে বললেন, তা হয়তো ঠিক। তবু তুমি নিজে ডাক্তার। এই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা জেনে রাখা ভালো। সেই পেশেন্টটির কথা শোনো।

ডাঃ রুদ্র একটু থামলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন। দুটি সন্তানও হয়েছে। স্বামীটি সুদর্শন, ভদ্র, মার্জিতরুচি, সলজ্জ প্রকৃতির। স্ত্রীটি মোটামুটি সুন্দরী। পাতলা গড়ন। গাল দুটি একটু বসা। কিন্তু ঝকঝকে চোখ। মোটেই মুখরা নয়, বরঞ্চ স্বল্পভাষী। তাকে দেখেই মনে হয়েছিল তার জীবনের অনেক সুখ-দুঃখের কথা সে যেন ঠোটে কুলুপ এঁটে আছে। দশ বছর শান্ত দাম্পত্য জীবন কাটাবার পর স্ত্রীটি হঠাৎ কিরকম অস্বাভাবিক হয়ে উঠল। কোনো কিছুতেই আনন্দ নেই, উৎসাহ নেই, কারো সঙ্গেই কথা বলতে ভালো লাগে না, এমনকি—এমনকি রাত্রে স্বামীর পাশে শুয়েও পাশ ফিরে থাকত। স্বামীর মনে হতো যেন একতাল বরফ তার পাশে পড়ে আছে। অগত্যা স্বামী তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। প্রথমে স্ত্রী চিকিৎসা করতে রাজি হয়নি। বিরক্ত হয়ে বলত—আমার কি হয়েছে যে চিকিৎসা করাব ?

শেষে অবশ্য রাজি হয়েছিল। গোপন সাক্ষাৎকারের সময় হিতৈষী ডাক্তারের কাছে সে যা বলেছিল তা এই—প্রথম কৈশোর কালেই সে একটা ছেলের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। ছেলেটি শুধু যে উপভোগ করত তা নয়, উপভোগের সময়ে নানা রকম খারাপ কথা বলত, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করত। তাতে মেয়েটি রাগ তো করতই না, বরঞ্চ তার ভালো লাগত। পরবর্তী জীবনে স্বামীর কাছ থেকেও ঐ রকম আচরণ আশা করত। কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে সেরকম ব্যবহার পেত না। শেষ পর্যন্ত—মানে দশ বছর পর তার হঠাৎ এমন অবস্থা হল যে, পাগলের মতো সেই ছেলেটার খোঁজ করতে লাগল। ছেলেটি এই পরিবারের এতই পরিচিত ছিল যে তাকে কেউ সন্দেহ করত না। মেয়েটি এই ব্যাধিরই শিকার।

এই পর্যন্ত বলে ডাঃ রুদ্র একটু থামলেন।

সঞ্জয় জিজ্ঞেস করল—মহিলাটির শেষ পর্যন্ত কি হল ?

—চিকিৎসা শুরু হল। চিকিৎসা কি জান ? চিকিৎসা আর কিছুই নয়, মাস ছয়েকের জন্যে তাকে তাদেরই অতি সাধারণ এক গৃহস্থ যৌথ পরিবারে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তার স্বামীকে বলা হল—এই ছমাসের মধ্যে সে যেন স্ত্রীর কাছে না যায়। শুধু তখনই যাবে যখন তার স্ত্রী তাকে চিঠি লিখে আসতে বলবে। সেই যৌথ পরিবারে গিয়ে বধূটি প্রথম সুস্থ স্বাভাবিক ব্যস্তমস্ত জীবনের আশ্বাদ পেল। তারপর থেকেই তার পরিবর্তন। এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক।

সঞ্জয় কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, রীণার ট্রিটমেন্ট তাহলে কিভাবে করবেন ?

ডাঃ রুদ্র হেসে বললেন, রীণার ক্ষেত্রে কোন ধরনের ট্রিটমেন্ট করব তার সঙ্গে কথা বলার পর ঠিক করব। অবশ্য রীণা যদি সত্যিই সাইকোপ্যাথিক পেশেন্ট হয়।

বড়ো ঘড়িটায় ঢং ঢং করে নটা বাজল। সঞ্জয় উঠে পড়ল। এখন তাকে হোটেলের ছুটতে হবে।

রাত সাড়ে দশটা শহর কলকাতায় এমন কিছু নয়। কিন্তু যশোর রোডের ধারে এই অঞ্চলটা এরই মধ্যে নিঝুম হয়ে গেছে। বিশেষ করে এই বাড়ির একতলা দোতলার ভাড়াটেরা দশটার আগেই খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে। একমাত্র গরমকালে লোড শেডিং হলে অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে এসে বসে।

সঞ্জয় ওপরে উঠে এল। প্যাসেজটা অন্ধকার। বাড়িতে কে আছে যে আলো জ্বলে রাখবে ?

অন্ধকারেই সঞ্জয় তালা খুলে ঘরে ঢুকল। ঢুকতেই গা-টা কেমন হুম্‌হুম্‌ করে উঠল। এর আগেও একদিন এরকম হয়েছিল, যেদিন রীণা একা মানুষদের বাড়ি যাবার জন্যে বেরিয়েছিল। তবে সেদিনের অস্বস্তিটা অন্য কারণে। রীণার জন্যে দুর্ভাবনায়। দুর্ভাবনা আর গা হুম্‌হুম্‌ করা এক নয়।

কিন্তু আজই বা গা হুম্‌হুম্‌ করল কেন ?

সঞ্জয় তাড়াতাড়ি আলো জ্বালল। আলোয় ঘর ভরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গা-হুম্‌হুম্‌নি থেমে গেল। নিজেকে ধমক দিল—ডাক্তার মানুষের অন্ধকারে ভয় ? তাও তেতলার নিজের ঘরে ঢুকতে ?

দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে সঞ্জয় বিছানায় এসে বসল। হোটেলের খেয়ে এসেছে। কাজেই শোওয়া ছাড়া এখন আর অন্য কাজ নেই। কিন্তু শুতে ইচ্ছে করল না। শুলেও ঘুম আসবে না। অগত্যা একটা সিগারেট ধরালো।

ডাঃ রুদ্রের কথাগুলো তার মনে পড়ছিল। আচ্ছা, রীণার প্রসঙ্গে হঠাৎ উনি ঐ মহিলাটির কথা টানলেন কেন ? তিনি কি রীণার ক্ষেত্রেও সেরকম কিছু সন্দেহ করেন ? মানুষ দাদার সঙ্গেও ওর খুব ভাবছিল নাকি—কী জানি বাবা !

পরক্ষণেই অবশ্য সঞ্জয় সে কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পাশ ফিরে শুল। কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না।

তার কেবলই সেইসব রাতগুলোর কথা মনে হতে লাগল যেসব রাতে রীণা ভয় পেয়েছিল। ঐ তো বসার ঘরে টেবিলটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঐ টেবিলের কাছেই রীণা কী যেন দেখেছিল। ঐ টেবিল থেকেই গেলাস পড়ে ভেঙেছিল। আচ্ছা—সেই ছবিটার কি হল? সত্যিই কি কেউ নিয়ে গেছে? কিন্তু কে নেবে? এঘরে তো বাইরের কেউ আসে না।

ভাবতে ভাবতে সঞ্জয়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে জোর করে অন্য দিকে মন সরাবার চেষ্টা করল। কিন্তু মনটা সেই অশরীরী আত্মার মতো টেবিলটার চারদিকেই ঘুরতে লাগল।

কী মুশকিল! ভয় পাচ্ছে নাকি? সঞ্জয় জোর করে নিজেকে সচেতন করার চেষ্টা করল।

কই? অন্য দিন তো ভয় পায় না। ঘরে সঙ্গী তো শুধু রীণা। তাও সে তো নিজেই ভয়ের শিকার!

আশ্চর্য! আজ সেই একটা ভীতু মানুষই কাছে না থাকাতে সঞ্জয়ের মতো ডাক্তারও কেমন ভয় পাচ্ছে।

সঞ্জয় উঠে পায়চারি করতে লাগল। হঠাৎ ও চমকে উঠল। ঘরে কি আর কেউ আছে? তার পিছনে!

নাঃ, ওটা ওর নিজেরই ছায়া।

আশ্চর্য! মেঝেতে নিজের ছায়া দেখেই বুকের মধ্যে কিরকম করে উঠেছিল। বুঝতে পারল, এই জনোই মানুষ বোধহয় জায়গা-বিশেষে একা থাকতে পারে না। সঙ্গী চায়। ঘরে একটা কুকুর থাকলেও যেন অনেক নিশ্চিন্ত।

নাঃ, ঘুমনো যাক। সঞ্জয় মশারি টাঙিয়ে নিল। বিছানায় ঢুকে বেডসুইচ টিপে আলো নিভাতে যাচ্ছিল, কি মনে হল, আবার উঠে দরজাটা দেখে নিল ঠিক মতো বন্ধ হয়েছে কি না। সিঁড়ির দিকের জানলাটা অন্য দিন খোলা থাকে। আজ বন্ধ করে দিল।

বিছানার কাছে আসছিল—ফিরে গিয়ে একবার বাথরুমটা দেখে নিল। তারপর খাটের তলা।

নাঃ, কেউ কোথাও নেই। নিশ্চিন্ত। মনকে বোঝাল—অন্য কিছুই জনো নয়, চোর-ডাকাতির জনোই এত সাবধানতা!

বিছানায় শুয়ে বেডসুইচ অফ করে দিল।

তবু ঘুম আসছে না। তখন সঞ্জয় ডাঃ রুদ্রের সঙ্গে যে কথা হল তাই নিয়ে আবার ভাবতে লাগল। ডাঃ রুদ্র যে কী বলতে চাইলেন সঞ্জয়ের কাছে তা মোটেই পরিষ্কার নয়। উনি কি এই বয়েসে এখন মেসমেরিজম শিখে চিকিৎসা করবেন? পাগল নাকি!

উনি রীণার সঙ্গে ভালো করে কথা বলবেন। তা তিনি হাজার বার বলুন। কিন্তু রীণাকে কোথাও চিকিৎসার জন্যে পাঠানো যাবে না। ও কিছুতেই রাজি হবে না।

তাছাড়া ডাঃ রুদ্র যদিও বলছেন মানসিক রোগ, তবু প্রতিবারই বলেছেন, 'যদি সত্যিই মানসিক রোগ হয়'—

উনি কি তবে মানসিক রোগ ছাড়া অন্য কিছু আশঙ্কা করছেন? ডাঃ রুদ্রের মতো একজন বিখ্যাত সাইকিয়াট্রিস্টও কি অলৌকিক কিছুতে বিশ্বাসী?

এক ঘুমেই রাত শেষ।

ঘুম ভাঙার পরই সঞ্জয়ের মনে পড়ল রীণা নেই। কাজেই চা নিয়ে কেউ আজ মুখের সামনে ধরবে না।

বিছানা থেকে উঠে পড়ল ও। মনটা খুশি খুশি, কাল রাতে কিছু হয়নি। সত্যি কিছু থাকলে তো হবে।

চা খেয়ে, শেভিং-এর কাজ সেরে স্নানের ঘরে যখন ঢুকল তখন বেলা আটটা। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রীণা এসে পড়বে, তবু আজ আর বাড়ির ভাত জুটবে না। ক্যান্টিনেই খেয়ে নিতে হবে। তার আগে সকালে পেটে কিছু পড়া দরকার। সঞ্জয় একটা ডিম সেদ্ধ করে নিল। তারপর কোথায় নুন, কোথায় গোলমরিচ খুঁজতে খুঁজতে হাঁপিয়ে উঠল।

বেলা সাড়ে আটটা। হাসপাতালে যাবার জন্যে সঞ্জয় তৈরি। কিন্তু রীণার পাত্তা নেই। অথচ সকালেই ওর আসার কথা। মাস্তুই পৌঁছে দিয়ে যাবে। কই?

পৌনে নটা হতে চলল।

নাঃ, আর দেরি করা যায় না। সঞ্জয় ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তালা লাগালো। এমনি সময়ে সিঁড়ির মুখে বন্দনা এসে দাঁড়ালো।

—আপনার ফোন।

—ফোন! সঞ্জয় চমকে উঠল। কার ফোন হতে পারে? সেদিন রাতে ফোন এসেছিল থানা থেকে। আজ? আজ নিশ্চয়ই মাস্তু—

বন্দনাদের বসার ঘরে ঢুকে সঞ্জয় রিসিভারটা তুলে নিল।

—হ্যালো!

—কি মশাই! কাল রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়েছিল তো?।

মহিলা কণ্ঠস্বর। কিন্তু কেমন অস্পষ্ট।

—কে বলছেন?

—ও বাবা! এত মিষ্টি করে বললাম, তবু চিনতে পারলেন না? ডাক্তাররা এমনি ভোঁতাই হয়।

সঞ্জয় এবার হেসে উঠল।

—ওঃ শ্রীমতী মাস্তু! বলুন কি খবর? বেরোবার মুখে এমন একটি মধুর স্বর উপহার পাব ভাবতে পারিনি।



—চুপ করুন মশাই! বেশি গলে যাবেন না। পাশেই আপনার অর্ধাঙ্গিনী আছেন। শুনতে পাবেন।

সঞ্জয় জোরে হেসে উঠল।

—হাসিটা এখন তুলে রাখুন। শুনুন—এবেলা যাচ্ছি না। ওবেলা। দু'জন নয়, তিন জন। পুপুকে যদি ধরেন তা হলে সাড়ে তিন জন।

—তিন জন?

—না না এখন কিছু বলব না। ভয় নেই, পুরুষ নন। মহিলাই। একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে চেষ্টা করবেন। জমিয়ে আড্ডা দেব। ছাড়বেন না। রীণা কথা বলবে।

সঞ্জয় রিসিভারটা কান বদল করে নিল।

—হ্যালো! আমি রীণা। কাল ভয়টয় পাওনি তো?

—ভয়? কিসের ভয়? ধুৎ!

—তাড়াতাড়ি ফিরছ তো?

—দেখি। বলে রিসিভারটা রেখে বন্দনার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে তাড়াতাড়ি নেমে গেল। বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

॥ তেরো ॥

### মিস থাম্পির অভিজ্ঞতা

সন্ধ্যাবেলা বাসায় ফিরে সঞ্জয় দেখল বাড়ি সরগরম। হাসি-গল্পে ভরপুর। একে মাস্ত এসেছে সেই সন্ধ্যা এসেছেন সেই ম্যাড্রাসি মহিলা। তিনিও যে আসবেন, মাস্ত ফোনে না বললেও, সঞ্জয় অনুমান করেছিল। রীণা তো এই মহীয়সী অতিথিটির আপ্যায়নে মহা ব্যস্ত।

আজ ওকে দেখলে কে বলবে এই রীণাই এই বাড়িতে এত দিন ভূতের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে ছিল। এমনকি ওর মুখের ওপর যে ফ্যাকাশে ভাবটা ছিল সেটাও যেন আজ আর নেই। রীণা ঠিক আগের মতোই প্রাণচঞ্চল, উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

দেখে সঞ্জয়ের ভালো লাগল। কিন্তু দূর থেকে ঐ মহিলাটিকে দেখে মোটেই ভালো লাগল না। বরঞ্চ তাঁর মুখখানা দেখে কেমন অস্বস্তি হতে লাগল।

সঞ্জয়কে সিঁড়ির মুখে প্রথম দেখল মাস্ত। হাসতে হাসতে এগিয়ে এল সে।

—খুব তাড়াতাড়ি তো এসেছেন মশাই! এদিকে আমরা হোস্টের অপেক্ষায় বসে আছি। আসুন এঘরে। বলে সঞ্জয়কে একরকম টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গেল।

মিস থাম্পির সঙ্গে আলাপের পর্বটা মাস্তই সেরে দিল।

মিস থাম্পি হ্যান্ডশেক করে হেসে বললেন, আপনি ছিলেন না, আপনার বাড়িতে সম্ভবত আমার অনধিকার-প্রবেশ হয়ে গেছে।

সঞ্জয় সসংকোচে বলল, সে কী কথা! আমি না থাকলেও আমার স্ত্রীকে তো আপনার হাতেই দিয়ে গেছি। আপনি অনুগ্রহ করে এদের সঙ্গে এসেছেন এ আমার সৌভাগ্য।

মিস থাম্পি বললেন, আজ সকালে আপনার মিসেসের মুখে সব ব্যাপারটা শুনলাম। শুনে খুব কৌতূহল হল। ভাবলাম জায়গাটা একবার দেখেই আসি।

—ভালোই করেছেন। রীণা, চা-টা দিয়েছ তো?

রীণা ক্ষুভঙ্কি করে বলল, তুমি কি মনে করেছ, তুমি ছিলে না বলে হোস্টের কর্তব্য করতে পারব না?

মিস থাম্পি উত্তরটা শুনে খুব হাসলেন।

মাস্ত, রীণা দুজনেই লক্ষ্য করল এবাড়িতে এসে মিস থাম্পি যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। এমন করে প্রাণখোলা হাসতে দেখা যায়নি। ভালোই লাগল।

—নিম্ন মশাই, গরম চা। খেয়ে দেখুন আমার হাতে কিরকম লাগে। আর এটা কি বলুন তো?

—পাঁউরুটি তো দেখতেই পাচ্ছি। তাছাড়া নিশ্চয় ঘুগনি।

—আশ্চর্য! এতও বোঝেন!

—তা আর এত দিনে বুঝব না? আপনার বান্ধবীটি তো ঘুগনি-স্পেশালিস্ট। সারা জীবনে ঐ একটিই জলখাবার শিখে রেখেছেন!

—উঃ কী মিথ্যুক! রীণা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল—সেদিন অমন নিজে হাতে কেক করলাম! কী বেইমান!

সঞ্জয় ততক্ষণে চামচে করে মুখে দিয়েছে। না, ঘুগনি নয়—মাংসের কিমা। সঞ্জয় আর কোনো মন্তব্য না করে চুপচাপ খেয়ে গেল।

মিস থাম্পি একটা শাল ভালো করে জড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

—আপনারা গল্প করুন। আমি একটু ঘুরে আসি।

মাস্ত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—সঙ্গে হয়ে গেছে। এখন কোথায় যাবেন এই ঠাণ্ডায়?

মিস থাম্পি টচটা নিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, নিচটা একবার দেখে আসি।

রীণা বলল, একাই যাবেন? ওঁকে বলব?

মিস থাম্পি তাড়াতাড়ি বললেন, না না, কাউকে লাগবে না। আমি এই কম্পাউন্ডের মধ্যেই আছি।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই মিস থাম্পি ফিরে এলেন। সঞ্জয় হেসে বললে, কিছু পেলেন?

মিস থাম্পি দাঁতের ফাঁকে একটু হাসলেন। ছেলেমানুষের মতো বললেন, বলব কেন?

কিন্তু সবাই লক্ষ্য করল ওঁর হাতে একটু শুকনো মাটি।

খেতে বসতে একটু রাত হল। একসঙ্গেই সবাই বসল। খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল। রীণা মাস্তকে বলল, মিসেস লাহিড়ির বাড়ির ঘটনাটা একবার ওকে বল। বলে সঞ্জয়কে দেখিয়ে দিল।

সঞ্জয় মুগির হাড় চিবুতে চিবুতে নিম্পৃহ সুরে বলল, কি বলবেন? গল্প? তা বলুন শুনি।

—গল্প নয়, ঘটনা মশাই। আমরা দুজনেই তা স্বচক্ষে দেখলাম। বলে ঘটনাটা রুদ্ধ নিশ্বাসে বলে গেল।

সঞ্জয় শুনে যে কোনো মন্তব্য করল না, মিস থাম্পি তা লক্ষ্য করলেন। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এই ঘরে শুনলাম মাঝে মাঝে কারো আবির্ভাব হয়। আপনি ভয়টয় পান না তো?

সঞ্জয় হেসে বলল, না ম্যাডাম, ভয়টা আমার এমনিতেই কম। ভূত-প্রেতের ভয় তো জীবনে কোনোদিন করিনি। ওসব আমি মানি ও না।

একটু থেমে বলল, তাছাড়া আমি ডাক্তার। বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ছাড়া—

—বিজ্ঞানই কি শেষ কথা? বিজ্ঞানের এস্তিমারের বাইরে কি কিছু থাকতে পারে না?

—থাকতে পারে। তবে তা নিয়ে অকারণে মাথা ঘামাবার মতো যথেষ্ট সময় আমার নেই।

মিস থাম্পি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কি মনে করেন এ বাড়িতে ও-সব কিছু নেই? সবটাই আপনার ওয়াইফের মনের ভুল?

সঞ্জয় সেই দৃষ্টির সামনে তাকাতে পারল না। চোখ নিচু করে উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, এই তো গতকালই সারারাত এঘরে আমি একা ছিলাম। দিব্যি ছিলাম। কোনো কিছুই দেখিনি, কোনো শব্দও না।

মিস থাম্পি বললেন, আপনার সঙ্গে তো তার ব্যাপার নয়। কাজেই আপনাকে শুধু শুধু দেখা দেবে কেন?

সঞ্জয় হেসে অবিশ্বাসের সুরে বলল, তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন আমার স্ত্রীর সঙ্গেই শুধু তার কিছু ব্যাপার আছে। তাই সে তাকে ভয় দেখায়।

—হয়তো তাই।

—কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করব কি করে? বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ কই?

মিস থাম্পি একটু যেন কঠোর সুরে বললেন, এসব জিনিস জনসমক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

রীণা ইশারায় সঞ্জয়কে চুপ করতে বলল। সঞ্জয় চুপ করে গেল।

মিস থাম্পি তাঁর কথার জের ধরে বললেন, প্রমাণ দিতে আমিও পারব

না, হয়তো প্রতিকারও আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে আজ রাত্রে একবার পরীক্ষা করে দেখব বলেই এলাম।

সঞ্জয় বলল, ভালো কথা। আপনি নিজে থেকে দেখুন কোনো ফু পাওয়া যায় কিনা।

তারপর রীণার দিকে তাকিয়ে বলল, তাহলে আজই ‘হ্যাঁ’ কিংবা ‘না’ হয়ে যাচ্ছে। কি বল ?

রীণা কোনো উত্তর দিল না।

সঞ্জয় কথাটা বলল বটে কিন্তু বিশ্বাস না করেই। মিস থাম্পি যদি পরদিন সকালে কফি খেতে খেতে গল্প ফাঁদেন যে তিনিও সেই কালো-সুট-পরা লোকটিকে ‘স্বচক্ষে’ দেখেছেন তা হলেও সে বিশ্বাস করবে না। কেননা তা বিশ্বাস করা যায় না।

খাওয়া অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছিল। শীতের রাতও গভীর হয়ে উঠছিল।

হঠাৎই মিস থাম্পি রীণাকে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, সিঁড়িটা সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা কিরকম? তার মানে আমি বলতে চাইছি সিঁড়ি দিয়ে যখন আপনি ওঠা-নামা করেন তখন কি কিছু ফিল করেন?

রীণা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বলল, না তো!

সঞ্জয় হেসে বলল, রীণার মনে নেই—ওর একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল। প্রথম দিনই বেচারি উঠতে গিয়ে আচমকা গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল।

মিস থাম্পি এক মুহূর্ত যেন থমকে গেলেন। কিন্তু কিছু বললেন না।

রাত সাড়ে দশটা বাজল। তবু কেউ শোবার নাম করছে না। মিস থাম্পিও না। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কলকাতার হালচাল জিজ্ঞাসা করছিলেন।

একসময়ে মাস্ত বলল, মিস থাম্পি, আপনি যদি আপনার অভিজ্ঞতা থেকে দু’একটা গল্প শোনান তাহলে শীতের রাতে বেশ জমবে।

একথায় মিস থাম্পি গভীর হয়ে গেলেন। একটু যেন বিরক্ত হয়ে বললেন, দেখুন আপনারা যাকে ‘গল্প’ বলেন, আমি দুঃখিত, সেরকম কিছু আমার জানা নেই। আমি সারাজীবন দেশ-বিদেশ ঘুরে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছি তা গল্প নয়। তা নিয়েই আমার সাধনা। সেসব আমার নিজস্ব সম্পদ!

মাস্তর মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে গেল। বলল, excuse me! আমি দুঃখিত।

মিস থাম্পি আর কিছু বললেন না। কিন্তু পরিবেশটা ভারী হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ কাটল। তার পর নীরবতা ভাঙলেন মিস থাম্পি নিজেই। হাসতে হাসতে বললেন, আমার কথায় আপনারা ক্ষুণ্ণ হলেন বুঝতে পারছি। আচ্ছা, একটা সত্য ঘটনা বলছি শুনুন, যার মীমাংসা এখনো হয়নি।

মিস থাম্পি একটু থামলেন। সকলেই নড়েচড়ে বসলেন। কেবল সঞ্জয়ের মধ্যে তেমন কোনো চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

—কলকাতা থেকে কাল আমার ভুটান যাবার কথা। ওখানে একটা ঘটনা ঘটেছে বলে খবর পেয়েছি। বলে মিস থাম্পি থামলেন। সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, ডাঃ গুপ্ত, ঘটনাটা আপনার বিশ্বাসযোগ্য না হলেও এঁদের শোনানি। ‘অলৌকিক’ শব্দটা আমরা প্রায়শই শুনে থাকি এবং নানা প্রসঙ্গে ব্যবহারও করে থাকি। ‘অলৌকিক’ অর্থাৎ এমন-কিছু যা বাস্তবজীবনে সচরাচর ঘটে না বা যা বিজ্ঞানসম্মত নয়। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক সাধকই তাঁদের কঠোর সাধনালব্ধ বিভূতি বা অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তন্ত্রমন্ত্রের কথা আপনারা সবাই শুনেছেন। আমাদের দেশের বৌদ্ধ আর হিন্দু তান্ত্রিকেরা নিজনে এমন অনেক কিছু করতেন যা সাধারণ মানুষের জ্ঞানের বাইরে।

মিস থাম্পি একটু থামলেন। তারপর বলতে লাগলেন, অনেকের বিশ্বাস বৌদ্ধ্যই আদি তান্ত্রিক।

এ নিয়ে মতভেদ থাকলেও একটা কথা মনে রাখবেন—এই তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি হিমালয় অঞ্চলে। অর্থাৎ কৈলাস, চীন, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি জায়গায়।

আমার এইসব কথা বলার উদ্দেশ্য অলৌকিকতাত্ত্বে বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা বোধহয় নেপাল, তিব্বত, ভুটানেই বেশি। এই অলৌকিকতত্ত্বের মধ্যে প্রেততত্ত্বও জড়িয়ে আছে।

দুঃখের বিষয় অলৌকিকতত্ত্ব ও প্রেততত্ত্ব এখন ভয়-পাওয়ানো গাঁজাখুরি গল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারও একটা কারণ বোধহয় এই যে, মানুষ ভয় পেতেও চায়। অশরীরী আত্মা আর তথাকথিত ভূত-প্রেত এক কথা নয়। কিন্তু সেকথা সাধারণ মানুষকে বোঝান যায় না। অশরীরী আত্মার অস্তিত্ব আছে। অনেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছে। এমনকি তাদের কথা বলতেও শুনেছে। আশ্চর্য নয় কি? দ্বন্দ্ব এখানেই, আমি বলব আত্মা শরীর ধারণ করতে পারে—যে শরীর দেখা যাবে কিন্তু স্পর্শ করা যাবে না—যে শরীর কোনো চিহ্ন রেখে যেতে পারে না। ডাঃ গুপ্ত বলবেন, অসম্ভব। কিন্তু মিসেস গুপ্ত যাঁকে প্রায়ই দেখেন তিনিও যে ঐরকম কোনো শরীরী আত্মা তা আমি বিশ্বাস করি। কেননা ঐ ধরনের শরীরী আত্মার আমি প্রত্যক্ষদর্শী।

একটু থেমে বললেন, শরীর ধারণ ছাড়াও এই আত্মার আবার অন্যরকম প্রক্রিয়াও আছে। জানেন কি যোগীরা তাঁদের অসাধারণ ক্ষমতায় নিজেদের দেহ থেকে আত্মাকে কিছুকালের জন্যে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারতেন? সেও এক অলৌকিক ব্যাপার—বিজ্ঞান যার ব্যাখ্যা করতে পারেনি।

মিস থাম্পি রীণার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, ঘুম পাচ্ছে?

রীণা তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসে বলল, না। আপনার কথা শুনতে বেশ ভালোই লাগছে।

মিস থাম্পি হেসেই বললেন, ধন্যবাদ।

বেশ, তাহলে প্রথমে যোগীদের দেহ থেকে আত্মাকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করার একটা ‘গল্প’ বলি। বলে সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন।

সঞ্জয় চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বললে, চালিয়ে যান।

—অনেক দিন আগের কথা। এক ইংরেজ দম্পতি ভারতে কার্যরত থাকাকালীন বায়ুপরিবর্তনের জন্যে সিমলা পাহাড়ে গিয়েছিলেন। ইংরেজ ভদ্রলোক ছিলেন বৃটিশ-ভারতের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। দেশ তার ইংলন্ডে।

সিমলায় আসবার আগেই মেমসাহেবের শরীর খারাপ হয়েছিল। অল্প অল্প খর হতো। সেটা খুব খারাপ লক্ষণ। সিমলাতে চেষ্টা এসেও শরীর ঠিকমতো সারল না।

এই সময়েই আবার এক দুঃসংবাদ এল, সাহেবের বাবা লন্ডনে মারা গেছেন। সেই খবর পেয়েই সাহেব চলে গেলেন। মেমসাহেব শরীর খারাপের জন্যে যেতে পারলেন না।

লন্ডনে পৌঁছে সাহেব নিয়মিত চিঠি দিয়ে স্ত্রীর খবর নিতেন। প্রতি চিঠিতেই আশ্বাস—শীগগিরই যাচ্ছি।

মেমসাহেব পথ চেয়ে থাকেন। কিন্তু বেশ কিছুকাল হয়ে গেল—স্বামী আর ফেরেন না। চিঠিপত্রও পান না। তাঁর মন খুব খারাপ।

একদিন ভোর রাত্রে মেমসাহেব ঘুমের মধ্যে কঁদে উঠলেন। ঘরে তাঁর যে খাস-পরিচারিকা ছিল সে ইংরেজ রমণী। তাড়াতাড়ি মেমসাহেবের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?

মেমসাহেব পরিচারিকার সামনে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলার জন্যে লজ্জিত হলেন। বললেন, স্বপ্ন দেখছিলাম সাহেব কঠিন রোগে মৃত্যুশয্যা। তাই তিনি আসতে পারছেন না।

মেমসাহেব খাঁটি ইংরেজ মহিলা। তাই স্বপ্নকে স্বপ্ন বলেই মেনে নিলেন। গুরুত্ব দিলেন না।

কিন্তু গুরুত্ব না দিলেও তাঁর মনটা অত্যন্ত ভার হয়ে রইল।

মেমসাহেবের অন্য যে দাসী, সে ছিল তিব্বতীয়। মনিবের মন খারাপ তারও দৃষ্টি এড়ায়নি। রোজই দেখে—আর ভাবে মেমসাহেবকে জিজ্ঞেস করবে কি হয়েছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না। শেষে খাস-পরিচারিকাকে জিজ্ঞেস করে কারণটা জানতে পারল। তখন সে সসংকোচে তাকে বলল, মেমসাহেব যদি চান তাহলে সাহেবের খবর আজকের মধ্যেই আনিয়ে দিতে পারি।

খাস-পরিচারিকা অবাক হয়ে বলল, কি করে?

তিব্বতী দাসী তখন তাকে তার উপায়ের কথা জানাল।

ইংরেজ দাসী তা পুরোপুরি বিশ্বাস না করলেও এ দেশের অনেক ভোজবাজির কথা ছোটোবেলা থেকে শুনেছে। তাই তিব্বতীর কথা একেবারে উড়িয়ে না দিয়ে মেমসাহেবকে বলল। মেমসাহেব তখনই তিব্বতী দাসীকে ডেকে পাঠালেন। দাসী এলে তাকে বললেন, তুমি যে লোকটির কথা বলছ সে কি করে? কোথায় থাকে?

দাসী বিনীতভাবে জানালো যে, যাঁর কথা সে বলছে তিনি একসময়ে লামা

সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কি কারণে যেন তিনি সেই পদ ছেড়ে দিয়ে এখন লোকচক্ষুর অন্তরালে একটা পাহাড়ের নিচে আত্মগোপন করে থাকেন।

মেমসাহেব সকৌতূহলে জিজ্ঞেস করলেন, আত্মগোপন করে কেন?

দাসী বললে, তিনি এক বিশেষ সাধনায় সিদ্ধ বলে ঈর্ষাকাতর অন্য দল তাঁকে মেরে ফেলতে চায়।

শুনে মেমসাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

—সত্যিই তিনি এত গুণী লোক?

—হ্যাঁ মেমসাহেব, আমি নিজে চোখে তাঁর সেই গুণ দেখেছি।

—কিন্তু তুমি যা বলছ তাতে তো মনে হচ্ছে তাঁকে খুঁজে পাওয়াই মুশকিল।

আর—পেলেও হয়তো আসতে চাইবেন না।

দাসী অনামনস্কভাবে বলল, আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি। যদি পাওয়া যায় তাহলে আজই উনি সাহেবের খবর এনে দেবেন।

মেমসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় কত দূরে—কোন পাহাড়ের নিচে উনি থাকেন?

দাসী বলল, এখান থেকে ফ্রোশ তিন দূরে—ঐ যে ধোঁওয়ার মতো তিনচূড়ে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে ওরই কাছে উনি থাকেন।

মেমসাহেব বললেন, উনি যদি তোমার কথায় আসতে না চান—আমি কি গিয়ে request করব?

দাসী বলল, তার দরকার হবে না। তাছাড়া পথ দুর্গম। গাড়ি চলবে না। আপনার পক্ষে হেঁটে যাওয়াও সম্ভব নয়।

মেমসাহেব চুপ করে রইলেন। দাসী বলল, আর তাঁর কাছে যেতে হলে যেতে হবে গোপনে। কেননা তাঁর শত্রুরা তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

শুনে মেমসাহেব হতাশ হয়ে পড়লেন। তখন দাসী বলল, আপনি অনুমতি করলে আমি নিজে গিয়ে একবার চেষ্টা করতে পারি।

মেমসাহেব সানন্দে অনুমতি দিলেন।

পরের দিন ভোরবেলায় তিব্বতীয় দাসীটি লামার খোঁজে বেরিয়ে গেল। আর সন্ধ্যাবেলা ফিরল লামাকে নিয়ে।

লামা এসেছে শুনে মেমসাহেব খুশি মনে দোতলা থেকে নেমে এলেন। কিন্তু লামার চেহারা দেখে তাঁর ভক্তি হল না। যেমন আমাকে দেখে আপনাদের হয়েছে। বলে মিস থাম্পি একটু হাসলেন।

—যাক, যে কথা বলছিলাম। মেমসাহেব দেখলেন লোকটি বৃদ্ধ। মাথায় দীর্ঘ পাকা চুল, পাতলা পাকা গোঁফ দাড়ি। হাত, পা শীর্ণ। দেহ তো নয়, যেন একখানা কংকাল। দুই চোখ কোটরাগত। চোখের নিচে কালি পড়েছে। তাঁর সারা মুখের চামড়া কুঁচকানো। গলায় নীল পাথরের একটা মালা। অমন গাঢ় নীল পাথর মেমসাহেব কখনো দেখেননি।

লোকটি এমন ক্ষীণ স্বরে জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছিল যে মেমসাহেব তার

একবর্ণও বুঝতে পারছিলেন না। যাই হোক সেই তিব্বতী দাসীর সাহায্যে কথাবার্তাটা এইরকম হল—

মেমসাহেব বললেন, শুনেছি আপনার নাকি এমন ক্ষমতা আছে যে আপনি এখানে বসেই বহুদূরের খবর এনে দিতে পারেন। তাই যদি হয় তাহলে আপনি দয়া করে আমার স্বামীর খবর জানান। তিনি এখন লন্ডনে আছেন। বেশ কিছু দিন খবর পাচ্ছি না। স্বপ্নে দেখলাম তিনি নাকি শয্যাশায়ী। আমি খুবই দুশ্চিন্তায় আছি।

লামা পথশ্রমে ক্লান্ত বলে সেদিনটা বিশ্রাম করে পরের দিন খবর এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কিন্তু মেমসাহেব আর এক দণ্ডও অপেক্ষা করতে চাইলেন না। অগত্যা বৃদ্ধ লামাকে সম্মত হতে হল। তখন শ্রাবণ মাসের বেলা প্রায় শেষ। লামা প্রথমে আনুষঙ্গিক কতকগুলি কাজ শেষ করে নিয়ে সাহেবের ঠিকানা জেনে নিলেন। আর তাঁর একটা ছবি দেখে নিলেন। তারপর খালি গায়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে বললেন, আমি আপনার স্বামীর খবর আনতে চললাম। আমার দেহ এখানে পড়ে রইল। যদি বাধা-বিঘ্ন না ঘটে তাহলে এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব। তবে একটা অনুরোধ—আমার জীবন-মরণের সব দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে।

মেমসাহেব চমকে উঠলেন।—কেমন করে?

লামা বললেন, আমার দেহ যেন কেউ স্পর্শ না করে, এইটুকু দেখবেন।

—নিশ্চয় দেখব। মেমসাহেব প্রতিশ্রুতি দিলেন।

—আরও একটি কথা—আমি যখন এখানে আসছিলাম, বুঝতে পারছিলাম আমার শত্রুরা আমায় অনুসরণ করছে। তারা হয়তো একটু পরেই এখানে এসে হানা দেবে। আমার দেহটা কেড়ে নিয়ে যেতে চাইবে। আপনি দয়া করে বাধা দেবেন। কথা দিন—পারবেন তো?

মেমসাহেব ইংরেজরমণী। অসুস্থ হলেও তাঁর মনের জোর ছিল অসাধারণ। সব দিক ভেবে নিয়ে বললেন, ঠিক আছে। দায়িত্ব নিলাম। আপনি নিরুদ্বেগে গিয়ে আমার স্বামীর খবর নিয়ে আসুন।

এই অঙ্গীকার পেয়ে লামা যোগনিদ্রায় সমাহিত হলেন। সকলেই দেখলেন লামার অসাড় দেহটা মাটিতে পড়ে আছে যেন বহুকালের পুরনো শুকনো একটা মৃতদেহ।

এই সময়ে তিব্বতী দাসীর খেয়াল হল নিচের দরজাটা বোধহয় খোলাই থেকে গিয়েছে। সে নিজেই দেখতে যাবে ভাবছিল কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক লামার দেহ ছেড়ে নিচে যেতে মন চাইল না। তখন সে দরজা বন্ধ করার কথা ইংরেজ পরিচারিকাটিকে নিচু গলায় বলল।

ইংরেজ পরিচারিকা ‘যাচ্ছি’ বলেও সকৌতূহলে লামার নিঃসাড় দেহের দিকে তাকিয়ে রইল। যাবার কথা ভুলে গেল।

আধঘণ্টাও হয়েছে কি না সন্দেহ হঠাৎ নিচে একটা গোলমাল শোনা গেল।



কারা ফেন দারোয়ান-বেয়ারা-বাবুর্চিদের ঠেলে জোর করে ওপরে উঠে আসতে চাইছে।

মেমসাহেব বিচলিত হলেন। কিসের এত গোলমাল? তিনি ইংরেজ দাসীকে ব্যাপারটা কি জেনে আসবার জন্যে পাঠালেন। ইংরেজ দাসী ত্রস্তপদে নিচে নেমে গেল। কিন্তু পাঁচ মিনিট যেতে-না-যেতেই ছুটতে ছুটতে এসে জানালো একদল জংলী জোর করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তারা লামাকে চায়।

—কেন? মেমসাহেবের ভুরুতে ক্রোধের প্রকাশ ফুটে উঠল।

ইংরেজ দাসী উত্তর দেবার আগেই মেমসাহেব দেখলেন কয়েকজন তিব্বতী জংলী দোতলায় উঠে হৈ হৈ করে ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে।

মেমসাহেব রাগে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে উঠলেন—Who are you? What makes you to come here?

তারা মেমসাহেবের কথা বুঝল না। বুঝতে চাইলও না। তাদের সকলের দৃষ্টি তখন লামার দেহের ওপর। বাড়িতে তেমন লোকজন নেই যে সেই উন্মত্ত লোকগুলোকে বাধা দেয়। জংলী লোকগুলো বোধহয় তা বুঝতে পেরেছিল। তাই তারা নির্ভয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

ইংরেজ দাসী তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। সে পুলিশ ডাকার জন্যে জানলার দিকে ছুটে যাচ্ছিল, মেমসাহেব তাকে আটকালেন। কঠিন স্বরে বললেন, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো।

তারপর এক মিনিটের মধ্যে ছুটে গিয়ে ড্রয়ার থেকে গুলিভরা রিভলভারটা এনে দুবার ফায়ার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো যে যেদিকে পারল পালালো।

—যাও! দরজা লাগিয়ে এসো। বলে মেমসাহেব ইজিচেয়ারে বসে হাঁপাতে লাগলেন। তাঁর শরীর একেই দুর্বল, তার ওপর এই উত্তেজনা। রিভলভারটা কিন্তু তখনো তাঁর হাতের মুঠোয়।

তিব্বতী দাসী তখনও লামার দেহের ওপর—তাকে স্পর্শ না করে দু'হাত দিয়ে আগলে বসে ছিল।

এবার সে উঠে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

আরো আধঘণ্টা পরে লামার দেহটা একটু নড়ল। তারপর ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালেন।

মেমসাহেব আনন্দে লামার ওপরে ঝুঁকে পড়লেন। লামা ইশারায় একটু জল খেতে চাইলেন। মেমসাহেব তিব্বতী দাসীকে জল দিতে বললেন।

জল খেয়ে সেই লামা যোগী আস্তে আস্তে উঠে বসলেন। তারপর তার সেই ক্ষীণ স্বরে বললেন, আপনার স্বামী ভালোই আছেন। দেখলাম জিনিসপত্র গোছগাছ করছেন। বোধহয় আজ-কালের মধ্যেই এখানে আসার জন্যে রওনা হবেন।

শুনে মেমসাহেব আনন্দে কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়ে রইলেন।

তারপর লামা ধীরে ধীরে তাঁর ঘরের বর্ণনা দিলেন। শুনতে শুনতে মেমসাহেব

তো অবাক। শেষে লামা বললেন, তবে আপনার বাড়ির দক্ষিণদিকে যে সুন্দর বাগানটা ছিল সেটা সম্প্রতি ঝড়ে তছনছ হয়ে গেছে।

বাগানটাও যোগীর চোখে পড়েছে তা হলে! মেমসাহেব মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

লামা সেই রাত্তিরেই চলে যেতে চাইলেন। কিন্তু মেমসাহেব যেতে দিলেন না। পরের দিন অতি প্রত্যুষে যাবার সময়ে লামা মেমসাহেবের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। মেমসাহেবও চোখ নামাতে পারেননি।

মিনিট দুয়েক পরে লামা বললেন, আপনি এখন রোগমুক্ত। বলে দরজার দিকে পা বাড়ালেন। মেমসাহেব তাঁকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি কিছুই নিলেন না।

মেমসাহেব নিজের মনেই শুধু বললেন—I am grateful to you Indian yogi—I am grateful.

পরের দিনই সাহেবের চিঠি এল। লিখছেন—একটা মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। যাই হোক ঈশ্বরের কৃপায় এখন আমি বিপন্ন। রওনা হচ্ছি।

পুনশ্চ দিয়ে লিখেছেন—খুব আশ্চর্য ব্যাপার হঠাৎ কাল আমার ঘরের সামনে একজন ইন্ডিয়ান যোগীকে দেখলাম। তারপরেই অদৃশ্য। সম্ভবত আমার চোখেরই ভুল।

মিস থাম্পি তাঁর কথা শেষ করে একটু থামলেন। তার পর জল খেয়ে রুমালে মুখ মুছলেন।

—এ কাহিনী আপনাদের শোনাবার উদ্দেশ্য এটাই বোঝানো যে, এও এক ধরনের অলৌকিক ক্রিয়া। কিন্তু এটা ম্যাজিক বা যাদু নয়। এ যোগসাধনা। এই যোগের দ্বারাই আপনি এই মুহূর্তে কী ভাবছেন তা বলে দেওয়া যায়। এই যোগের দ্বারাই আগামী চাবিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনার জীবনে উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটবে কি না জানানো যায়। কঠিন ব্যাধির কারণ ও উৎপত্তিস্থল ধরা যায়।

এই যোগ যাঁর আয়ত্ত তিনি তেমন-তেমন বাড়িতে ঢুকেই বলতে পারেন সেখানে কোনো অশরীরী আত্মার আবির্ভাব ঘটে কিনা। বিজ্ঞানে কিন্তু এর ব্যাখ্যা মেলে না।

অশরীরী আত্মার টের পাওয়া যায়—মিস থাম্পির এই কথায় সকলেই যেন একটু বিচলিত হল।

একটু থেমে মিস থাম্পি বললেন, এরকম অনেক তথ্য রবার্ট ডাল আওয়েল-এর ‘Foot falls on the Boundary of Another World’ বইটিতে পাওয়া যায়। পুরনো কোনো বড়ো লাইব্রেরিতে খোঁজ করে দেখতে পারেন—of course should you be so interested.

মিস থাম্পি থামলেন। ঘড়ির দিকে তাকালেন। সাড়ে বারোটো।

গল্পে গল্পে অনেক রাত হয়ে গেছে। মিস থাম্পি বললেন, তাহলে এবার শুতে যাওয়া যাক ?

মাস্ত বলল, কিন্তু আপনি ভুটানে কেন যাচ্ছেন বললেন না তো ?

—শুনতে চান ?

—নিশ্চয়ই। মাস্ত আর রীণা দুজনেই উৎসাহে বলে উঠল।

—আপনি ? মিস থাম্পি সহাস্যে সঞ্জয়ের দিকে তাকালেন।

সঞ্জয় সলজ্জভাবে বলল, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। কাল সকালেই তো আবার ছুটতে হবে।

রীণা বলল, তুমি তবে ওঘরে গিয়ে শোও গে।

সঞ্জয় অবশ্য গেল না। আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে চোখ বুজে বসে রইল।

মিস থাম্পি বললেন, বিস্তৃত করে বলতে গেলে রাত শেষ হয়ে যাবে। সংক্ষেপে বলি।—ভুটানে যাচ্ছি সেখানকার একটি মেয়েকে স্টাডি করতে। ডাঃ কুমার আমার খুব পরিচিত। তিনি সম্প্রতি সাদার্ন ভুটানের ডিস্ট্রিক্ট টাউন সারভেং-এ গিয়েছেন সেখানকার হাসপাতালের এম. ও. হয়ে। ওখান থেকে তিনি আমায় কয়েকখানা চিঠি লিখেছেন।

ডাঃ কুমার ওখানে কোয়ার্টারে একা থাকেন। রাঁধা-বাড়া করার জন্যে উনি একটি লোক খুঁজছিলেন। অনেক কষ্টে একটি মেয়ে পান। মেয়েটির নাম সুখমতী। বয়েস উনিশ-কুড়ি। মেয়েটি কথা বলে না। কিন্তু সে বোবা নয়। কেননা সে শুনতে পায়। মেয়েটির কোনো অভিব্যক্তি নেই। শুধু যন্ত্রের মতো কাজ করে যায়। সে সারাদিন কোয়ার্টারে থাকে। কিন্তু ঠিক রাত নটা বাজলেই সে বাড়ি চলে যায়। ব্যতিক্রম হয় না।

ডাঃ কুমার হুঁশিয়ার লোক। তিনি যখনই কোনো কাজের লোক লাগান তখনই তার ঠিকানা নিয়ে রাখেন। সুখমতীরও ঠিকানা নিয়েছিলেন।

এদিকে সুখমতী কাজে লাগার দু দিন আগে পাহাড়তলীতে একটা জিপ অ্যাকসিডেন্ট হয়। সেটাও নাকি অদ্ভুত ঘটনা। যাই হোক, জিপে যে-সব লোক ছিল তারা সবাই থেঁৎলে মরে যায়। ওদের মধ্যে একটি যুবতী মেয়ে ছিল। তার লাশ কিন্তু পাওয়া যায়নি। অথচ সেই নিদারুণ অ্যাকসিডেন্ট থেকে কেউ যে বেঁচে পালাবে তাও নাকি অসম্ভব।

যাই হোক, সেদিনের মতো লাশ তিনটে হাসপাতালের ল্যাবরেটরি-ঘরের কাছে রাখা হয়।

একদিন হাসপাতালের দারোয়ান দীন বাহাদুর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ডাঃ কুমারকে বলল, সাব, বক্সী!

—ওদেশে ভূতকে বক্সী বলে।

ডাঃ কুমার অবাক হয়ে বললেন, বক্সী! কোথায় ?

দীন বাহাদুর বলল, ল্যাবরেটরির পাশে যে ঘরে লাশ ছিল সেখানে।

তার বক্তব্য—রাত্রে পাহারা দিতে দিতে ও একটা শব্দ শুনে লাশ-ঘরের দিকে যায়। সেখানে একটা গোঙানি শুনতে পায়। কৌতূহলী হয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে যেখানে তিনটে লাশ ছিল সেখানে একটা মেয়ে শোবার জায়গা করে নিতে চাইছে। কিন্তু যেন কিছুতেই জায়গা পাচ্ছে না। মেয়েটার গায়ে জামা-কাপড় কিছুই ছিল না।

তারপর যে কথাটা দিন বাহাদুর নাকি এতটুকু ইতস্তত না করেই বলে ফেললে তা এই যে—সে মেয়েটি সুখমতী ছাড়া আর কেউ নয়।

ডাক্তার কুমার তো চমকে উঠলেন। তিনি অবিশ্বাস করলেন। দিন বাহাদুর হালপ করে বলল, সে খুব ভালো করে নজর করে দেখেছে সে সুখমতীই।

ডাক্তার কুমার তবু যখন বিশ্বাস করতে চাইলেন না তখন দিন বাহাদুর বলল, ঠিক আছে আজই দেখা যাক, সুখমতী রাত্তিরে কি করে।

সেদিনও সুখমতী ঠিক রাত নটায় কাজ সেরে চলে গেল। দিন বাহাদুর তখন ডাক্তার কুমারের কোয়ার্টারে। সুখমতী যখন চলে যাচ্ছে দিন বাহাদুর তখন ফিস্ ফিস্ করে বলল, সাবু, দেখুন ওর হাঁটাটা কি রকম।

ডাঃ কুমার এতদিন লক্ষ্য করেননি। আজ দেখলেন—হ্যাঁ, হাঁটাটা একটু অস্বাভাবিক। কেমন যেন লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে তার লম্বা হাত দুটো যেন বড্ড বেশি দুলছিল।

রাত দুটোয় ডাক্তারকে নিয়ে দিন বাহাদুর সুখমতীর ঠিকানা খোঁজ করতে বেরোল। বেরোবার আগে একটুকরো ন্যাকড়া ডাক্তারের হাতে দিয়ে বলল, এটা সঙ্গে রাখুন সাবু। অনিষ্ট করতে পারবে না।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর যে ঠিকানাটা ওঁরা খুঁজে পেল সেটা একটা ভাঙা ঘর, একেবারে লোকালয়ের বাইরে।

—সুখমতী—সুখমতী করে ডাক্তার ডাকাডাকি করলেন। কিন্তু কারো সাড়া পেলেন না। তখন দুজনে দুটো টর্চ স্কেলে ভেতরে ঢুকলেন। কেউ কোথাও নেই। শুধু সুখমতীর ছাড়া কাপড়টা পড়ে আছে।....

এই পর্যন্ত বলে মিস থাম্পি থামলেন।

—খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। এ বিষয়ে আপনার কি মনে হয়? মাস্ত্র জিজ্ঞেস করল।

—আগে ভুটানে গিয়ে সুখমতীকে দেখি। নিজে না দেখে, না কথা বলে আমি কোনো কমেন্ট করব না। তবে আমার শুধু একটাই জানার আছে—সুখমতী কেন চাকরি নিল? কেন ডাক্তার কুমারের কাছেই? কিন্তু আর নয়। এবার সবাই শুয়ে পড়ুন।

শীতের রাত। গোটা শহর যেন কন্ডল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে। সামনে দশোর রোড যেন দেহ প্রসারিত করে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। ওদিকে সঞ্জয় বসে

বসেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। মাথাটা হেলে পড়েছে চেয়ারে। শুধু এরা তিন জনই জেগেছিল এতক্ষণ।

এই সময়ে হঠাৎ পুপু কঁদে উঠল। সেই মর্মান্তিক যন্ত্রণায় কঁদে ওঠা। রীণা চমকে উঠে ছুটে গিয়ে পুপুকে বুকে তুলে নিল। ঘুম ভেঙে গেল সঞ্জয়ের। লাফিয়ে ছুটে গেল পুপুর বিছানায়। এ কান্না যে তাদের চেনা।

মাস্ত “কি হল? কি হল?” বলে রীণার কাছে গিয়ে বসল। শুধু মিস থাম্পি স্থির হয়ে বসে পুপুর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কান্না থামে না। দেখতে দেখতে পুপুর সমস্ত মুখটা যেন কি রকম হয়ে গেল। রীণা আতঙ্কিত হয়ে বলে উঠল—কী হবে? কান্না থামছে না যে?

রীণা জানে, এ কান্না থামাবার সাধ্য ডাক্তারের নেই।

মিস থাম্পি উঠে দাঁড়ালেন। একবার ভুরু কুঁচকে খোলা দরজা দিয়ে সিঁড়ির দিকে তাকালেন। তারপর গায়ের চাদরটা ফেলে দিয়ে পুপুর কাছে এগিয়ে গেলেন। পুপু তখন কঁদতে কঁদতে ধনুকের মতো বঁকে যাচ্ছে। রীণা পাগলের মতো মিস থাম্পির হাত দুটো চেপে ধরে কঁদে উঠল। কী হবে? এমন করে তো ও কখনো কঁদে না।

সেই অশরীরীর আবির্ভাব হলেই যে পুপু কঁদে ওঠে, মিস থাম্পি আগে তা শুনেছিলেন। তিনি একদৃষ্টে কিছুক্ষণ পুপুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার পর আস্তে আস্তে একবার তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। রীণাকে বললেন, তুমি এবার ওকে বুকে তুলে নাও।

—ও ঘুমোতে পারবে না। দেখছেন না—

—আমি বলছি, ঘুমোবে। তুমি বুকে নাও। আদেশের সুরে বললেন মিস থাম্পি।

রীণা পুপুকে বুকের কাছে টেনে নিতেই পুপুর কান্না আস্তে আস্তে থেমে গেল। তারপর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

এবার মিস থাম্পি উঠে দাঁড়ালেন। স্থির গভীর স্বরে বললেন, সে বোধহয় এসেছে। আপনারা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ুন।

সঞ্জয়ও কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু সে যে আজ কোথায় শোবে ভেবে পেল না।

মিস থাম্পি বললেন, শোবার ব্যবস্থা আমিই করে দিচ্ছি।

—বাইরের ঘরে এই ডিভানে মিসেস গুপ্ত যেমন বাচ্চাকে নিয়ে শুয়েছেন শোন। আপনি শোন মেঝেতে এইখানে। বলে মাস্তকেও জায়গা নির্দেশ করে দিলেন।

—ডাঃ গুপ্ত, আপনি প্লিজ চলে যান ভেতরের ঘরে। নিশ্চিন্তে ঘুমান গিয়ে।

—আপনি?

মিস থাম্পি একটু হাসলেন।—আমি শোব না। বসে থাকব সিঁড়ির মুখে।

আজকের রাতের মতো আমার কথা অনুগ্রহ করে শুনবেন। বলে নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেউই ঘুমোতে পারল না। কিসের যেন দুঃসহ প্রতীক্ষা! তারপর একসময়ে সকলেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সবার আগে ঘুম ভাঙল মাস্তুর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রীণার। দুজনেই একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। রাত্তিরটা তাহলে নিরাপদেই কেটেছে।

সঞ্জয় তখনো ঘুমোচ্ছে। কিন্তু মিস থাম্পি? তিনি কি এখনও বাইরে বসে আছেন?

তাড়াতাড়ি এরা দুজনে বাইরে বেরিয়ে এল। দেখল মিস থাম্পি নেই। শূন্য চেয়ারটা শুধু পড়ে রয়েছে।

দুজনের মুখ শুকিয়ে গেল।

—উনি কোথায় গেলেন? মাস্তুর গলার স্বর ভয়ে কাঁপছে।

—তাই তো। বলেই রীণা সঞ্জয়কে ঘুম থেকে তুলে সব কথা বলল। সঞ্জয় ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এল।

তখনো ভোর হয়নি। শীতের কুয়াশায় চারিদিক পর্দাঢাকা। বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেরা তখনো সুখনিদ্রায় নিশ্চিন্ত।

সঞ্জয় কি করবে ভাবছে। এমনি সময়ে সিঁড়িতে হালকা চটির শব্দ। মিস থাম্পি ওপরে উঠে আসছেন।

—বাবাঃ! এই কুয়াশায় কোথায় গিয়েছিলেন?

মিস থাম্পি হেসে বললেন, প্রাতঃভ্রমণে। কম্পাউন্ডের মধ্যেই ঘুরছিলাম। বেশ পুরনো আমলের বাড়ি। ফোয়ারার সামনে যে স্ট্যাচুটা—সেটা কোনো অবস্থাপন্নরই কীর্তি। তাঁর রুচিটা পবিত্র ছিল না। চলুন ভেতরে গিয়ে বসি। একটু গরম কফি খাব।

কফি খেতে খেতে সকলেই উদগ্রীব হয়ে মিস থাম্পির দিকে তাকিয়ে রইল কিছু শোনার অপেক্ষায়। কিন্তু মিস থাম্পি একটি কথাও বললেন না।

কফি খাওয়া শেষ হলে মাস্তুরকে বললেন, এবার আমাদের যেতে হবে।

সঞ্জয় আর থাকতে পারল না। বলল, কিন্তু কাল রাত্তিরের experience তো কিছু বলছেন না।

—বললে কি আপনি বিশ্বাস করবেন?

মিস থাম্পি একটু হাসবার চেষ্টা করলেন।

—শুনতে দোষ কি?

—তবে শুনুন। একটা প্রতিহিংসাপরায়ণ হিংস্র আত্মা এ বাড়িতে আছেই। সে ক্ষতি না করে যাবে না। এর চেয়ে বেশি কিছু জানতে চাইবেন না। প্রমাণ দিতে পারব না।

—তাহলে, আপনি বলছেন রীণা যা দেখে তা ঠিক?

—হ্যাঁ। অবশ্যই।

—প্রতিকার?

—আমার মনে হয় বাড়িটা ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

সঞ্জয় মাথা নেড়ে বলল, কিন্তু সে কি করে সম্ভব? আমি নিজে ডাক্তার।  
বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ছাড়া অশরীরী আত্মার অস্তিত্ব মানতে পারি না।

মিস থাম্পি তাঁর বিশেষ হাসিটি একটু হাসলেন। কিছু বললেন না।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই মাস্ত আর মিস থাম্পি প্রস্তুত হয়ে নিল। যাবার সময়ে  
মিস থাম্পি বললেন, ডাঃ গুপ্ত, আপনার সংস্কারমুক্ত মন আর সাহসের প্রশংসা  
করি। কিন্তু আমার একটা কথা মনে রাখবেন—যদি দেখেন আপনার ছেলোটী—  
ক্রমশই অসুস্থ হয়ে পড়ছে তা হলে তদগুই বাড়ি ছেড়ে দেবেন।—বলে হাতে  
ব্যাগটা তুলে নিয়ে নিচে নামতে লাগলেন।

রীণা বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

## ॥ চোদ্দ ॥

### সঞ্জয়ের চ্যালেঞ্জ

কদিন হল মিস থাম্পি চলে গিয়েছেন। মাস্তর সঙ্গেও যোগাযোগ নেই। রীণার  
মনটা তাই একটু খারাপ ছিল। দুঃসময়ে নিজের লোক ছাড়াও প্রকৃত বন্ধুর  
সান্নিধ্য যে কত দরকার হয় মাস্তকে পেয়ে রীণা তা বুঝতে পেরেছে।

বেলা তখন চারটে। পুপুটা ক’দিন ধরে ঘ্যানঘ্যান করছে। শীতটাও বেশ জোরে  
পড়েছে। বিকেলবেলায় কখনো কখনো পুপুকে নিয়ে রীণা নিচে কম্পাউন্ডে নেমে  
আসে। কম্পাউন্ডে বেশি ভিড় থাকলে নিচে নামে না। সংকোচ হয়। তার যেন  
মনে হয় সবাই তাকে একরকমভাবে দেখছে। তাই নিজেকে মনে হয় যেন তাদের  
কাছে অতিপ্রাকৃত জগতের কেউ। তাই সে অনেক সময়ে পুপুকে নিয়ে তিনতলার  
ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকে।

এদিনও দাঁড়িয়ে ছিল। মিনিট দশেক হল লোডশেডিং শুরু হয়েছে। এই  
এক অসহ্য ব্যাপার। রীণার কাছে আবার শুধুই অসহ্য ব্যাপার নয়, ভীতির  
কারণ।

নিচে ছেলেরা খেলা করছে, বৃদ্ধরা বেঞ্চিতে বসে নিশ্চিন্ত মনে সম্ভবত সাংসারিক  
বিষয় নিয়ে গল্প করছে। বন্দনার মা কোথায় বেরিয়েছিলেন, কিছু জিনিস কিনে  
রিকশা থেকে নামলেন।

আচ্ছা, মিস থাম্পি যে এসে এক রাত এখানে কাটিয়ে গেলেন বন্দনা বা  
বন্দনার মা কি তা জানেন?

জানলেও এঁদের সেরকম গায়ে-পড়া কৌতূহল নেই। এটা অবশ্য ভালোই।

বড়ো অদ্ভুত মহিলা মিস থাম্পি। প্রথম যেদিন রীণা ওঁকে দেখে সেদিন ভালো লাগেনি। কিন্তু এ বাড়িতে তাঁকে খুবই ভালো লাগল।

মিস থাম্পি এ বাড়ি সম্বন্ধে কি যেন বললেন? ছেড়ে দেওয়াটাই উচিত। একদিক দিয়ে সে খুশি। আর যাই হোক তার মানসিক রোগ হয়নি। এত দিন তাহলে যা দেখেছে, যা বলেছে সব সত্যি। সঞ্জয় কি এবার তা বুঝতে পেরেছে? তাহলে কি আর একদিনও এ বাড়িতে থাকা উচিত? মিস থাম্পির কথায়—evil spirit আছে যে দুরাত্মা হিংস্রকুটিল। শাসিয়ে যায়।

রীণার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ঠিক তখনই হঠাৎ পুপু কঁদে উঠল আবার।

রীণা ভোলাতে লাগল, না না, কান্না কেন বাবুসোনা? ওই দ্যাখো ছেলেরা কেমন বল খেলছে। তুমিও বড়ো হয়ে বল খেলবে। তোমার বাপী তোমায় বল কিনে দেবে—সুন্দর লাল বল—

পুপুর কান্না তবু থামল না। দ্বিগুণ জোরে কঁদতে লাগল।

রীণা মনে মনে সঞ্জয়ের জন্যে ব্যস্ত হচ্ছিল। সন্ধ্যার সময়ে লোডশেডিং হলে কিছুতেই একলা থাকতে ভালো লাগে না।

কিন্তু পুপু ডুকরে ডুকরে কঁদছে কেন? বঁকে বঁকে যাচ্ছে! এ কান্নাটা যেন...

রীণার বুক কাঁপতে শুরু করল। তাহলে কি এই সন্ধ্যাবেলাতেই....

তখনই রীণার মনে হল ঘরের মধ্যে যেন কিসের চাপা শব্দ! তারপরই হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় ঘরের জানলাগুলো সশব্দে খুলে গেল।

ঘরের দিকে তাকাতেই রীণার মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে একটা হিমশ্রোত বয়ে গেল। দেখল ঘরের মধ্যে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলি মেঝে থেকে ক্রমাগত ওপরে উঠছে! মনে হচ্ছে নিচের তলায় যেন আগুন লেগেছে। মেঝে ফুঁড়ে তারই ধোঁয়া সমস্ত ঘরটাকে গ্রাস করে ফেলছে। ধোঁয়াটা কিসের বুঝতে বুঝতেই ধোঁয়ার মধ্যে থেকে ফুটে বেরোল একটা মূর্তি। সে মূর্তি ওর চেনা। সেই কালো প্যান্ট, কোট আর টুপি। টুপিটা নেমে এসেছে আধখানা কপাল পর্যন্ত। তারপরেই মূর্তিটা দুরন্ত গতিতে ঘুরপাক খেতে লাগল।

রীণা ভয়ে কাঠ হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

ক্রমে মূর্তির চোখে মুখে একটা হিংস্রভাব ফুটে উঠল। রীণা স্পষ্ট বুঝতে পারল মূর্তিটা দাঁতে দাঁত চেপে কি যেন বলছে!

রীণার শুনতে হচ্ছে করছিল না। তার এত ভয় করছিল যে সে থরথর করে কাঁপছিল। তবু ইচ্ছার বিরুদ্ধেই শোনার জন্যে কান পাততে হল। কেউ যেন হুকুম করছে—আমি যা বলি শোনো!

একটা চাপা হিস্‌হিস্‌ শব্দের ভেতর দিয়ে ছেঁড়া ছেঁড়া কয়েকটা কথা বেরিয়ে এল—আগামী শনিবার...রাত দুটো...আমি আসব। তুমি যাবে...নইলে...বলেই মূর্তিটার মর্চে-ধরা লোহার শাবলের মতো দুখানা অদ্ভুত সরু সরু হাত এগিয়ে আসতে লাগল পুপুর দিকে!



পুপু তখন নেতিয়ে পড়েছে রীণার কাঁধে। মুখ দিয়ে লালা ঝরছে। কাঁদবার শক্তিও বুঝি আর নেই।

পালাবার উপায় নেই। সামনেই মূর্তিটা দাঁড়িয়ে। রীণা ব্যালকনির ওপর ঝুঁকে পড়ল। দেখল নিচে ছেলেরা তখনো খেলা করছে, বয়স্করা গল্প করছে।

রীণা চিৎকার করে ডাকতে চাইল, কিন্তু গলা থেকে স্বর বেরোল না।

এদিকে অঙ্ককার ঘরের মধ্যে থেকে সেই অদ্ভুত বিকৃত দু'খানা হাত ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। হাতের চোঁটো দুটো অস্বাভাবিক ছোট!

ঠিক সেই সময়ে একটা ট্যাক্সি এসে ঢুকল কম্পাউন্ডের মধ্যে। সঞ্জয় নামল ট্যাক্সি থেকে। ভাড়া চুকিয়ে ওপর দিকে তাকালো। লোডশেডিং। তিনতলাটা অস্পষ্ট। তবুও যা দেখতে পেল তাতেই সঞ্জয় চমকে উঠল। পুপুকে কোঁলে নিয়ে রীণা যেন ব্যালকনি থেকে ঝাঁপ দেবার চেষ্টা করছে! আতঙ্কে চোঁটিয়ে উঠল সঞ্জয়।—রীণা! পড়ে যাবে—পড়ে যাবে—

রীণা বুঝি মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল। নিচে যারা ছিল সঞ্জয়ের চিৎকারে তারাও ওপর দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই চোঁটিয়ে উঠল—গেল—গেল—গেল!

সঞ্জয় ছুটল সিঁড়ির দিকে। তিনতলায় উঠতে তিন মিনিটও লাগল না। সিঁড়ির মুখে এসে থমকে দাঁড়াল। ঘরের দরজা খোলা কেন? এমন তো কোনোদিন থাকে না!

কিন্তু সেদিকে মন দেবার সময় নেই। দৌড়ে গেল ব্যালকনির দিকে। জাপটে ধরল রীণাকে—এ কি করছিলে?

পুপুকে বুকের মধ্যে দু হাতে আঁকড়ে ধরে সেখানেই বসে পড়ল রীণা। কোনোরকমে বলল, এসেছ?

—হ্যাঁ, লোডশেডিং-এ ভয় পাবে বলে ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলাম।

—সেটা কোথায় গেল?

—কে? কার কথা বলছ?

রীণা আর কথা বলতে পারল না। তার অচৈতন্য দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। চোঁচামেচি শুনে বন্দনার মাও উঠে এসেছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি পুপুকে কোলে তুলে নিলেন।

আর চাপাচাপি রইল না কিছুই। সঞ্জয়ের পিছু পিছু সকলেই ওপরে উঠে এসেছে। ঘরভর্তি লোক। অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে আছে রীণা। সঞ্জয় ওর জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করছে। সকলের মুখেই চাপা প্রশ্ন—কি হল? সুইসাইড করতে যাচ্ছিলেন নাকি? কিন্তু খামোকা আত্মহত্যা করতেই-বা যাবে কেন? দুটি মানুষের সংসার। অশান্তি তো কিছু নেই।

প্রায় পনেরো মিনিট পরে রীণা ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো। কিন্তু সে দৃষ্টি বড়ো স্তিমিত।

—কেমন আছ? সঞ্জয় ঝুঁকে পড়ল রীণার মুখের ওপরে। কি হয়েছিল?

ঘরসুদ্ধ সবাই রীণার দিকে তাকিয়ে।

রীণা কোনো উত্তর দিতে পারল না। কেমন একরকম শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সঞ্জয় কিছুক্ষণ রীণাকে লক্ষ্য করল। তারপর পাল্‌স দেখতে লাগল। এক বার-দু'বার-তিন বার। শেষে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্‌স-বিট মেলাতে লাগল। ওর মুখ গভীর হয়ে উঠল।

একজন জিজ্ঞেস করলেন, কেমন দেখলেন?

—ভালো না। বলেই সঞ্জয় উঠে পড়ল।

বন্দনার মা দূরে দাঁড়িয়ে পুপুকে ভোলাচ্ছিলেন। সঞ্জয় বলল, বৌদি, আপনি এখানে একটু থাকুন। আমি আপনার ঘর থেকে একটা ফোন করে আসি।

সঞ্জয়ের উদ্বেগ দেখে এবার ভিড় কমতে লাগল। সঞ্জয় নিচে নামতেই দেখল বন্দনা মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে।

—কাকীমা?

—ভালো নয়। এখনি আমায় একটা ফোন করতে হবে।

ভাগ্য ভালো। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই লাইন পাওয়া গেল। শুধু লাইন নয়, ডাক্তার রুদ্রকেও।

সংক্ষেপে সব ব্যাপার জানিয়ে সঞ্জয় বলল, কাকাবাবু, আপনি এখনি চলে আসুন। আমি একা ভরসা পাচ্ছি না।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডাঃ রুদ্র এসে পড়লেন। রীণা তখনো মাটিতে চোখ বুজে পড়ে আছে।

ডাক্তার রুদ্র নাড়ী দেখলেন, প্রেসার চেক করলেন। চোখের পাতা ফাঁক করে টর্চ ফেললেন। তারপর সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করলেন—ব্রান্ডি আছে?

সঞ্জয় মথা নাড়ল।

—গরম দুধ?

বন্দনার মা বললেন, আমি এনে দিচ্ছি। বলে তিনি পুপুকে নিয়ে দৌতলায় চলে গেলেন।

ডাঃ রুদ্র ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালেন।

—তুমি বলছ রীণা এখান থেকে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল?

—হ্যাঁ। তখন লোডশেডিং—আবছা অন্ধকার, তবু আমি স্পষ্ট দেখেছি।

—কি দেখেছ?

—রীণা পুপুকে এক হাতে বুকে চেপে ধরে রেলিং-এর ওপর উঠছে।

—তুমি ঠিক জান ঝাঁপ দিতেই যাচ্ছিল? বুকে কিছু দেখছিল না?

—হ্যাঁ, ঠিক জানি। শুধু আমি কেন নিচে যাঁরা বসেছিলেন তাঁরা সবাই “গেল গেল” বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

—তারপর?

—তারপর আমি তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এলাম।

—ঘরে ঢুকলে ?

—হ্যাঁ।

—দরজা বন্ধ ছিল না ?

—না। এটাই আশ্চর্য লাগল।

—কেন ?

—রীণা কখনো দরজা খুলে রাখে না।

—হুঁ, তারপর ?

—আমি ছুটে ব্যালকনিতে গেলাম।

—কি অবস্থায় দেখলে ?

—ও তখন রেলিং ধরে কাঁপছিল। আমি ওকে ধরলাম।

ডাঃ রুদ্র আরও কয়েক মিনিট ব্যালকনিতে রইলেন। তারপর বললেন, ঘরে এসো।

এরই মধ্যে বন্দনার মা গরম দুধ নিয়ে এসেছেন। সঞ্জয় বাটিটা হাতে করে রীণার কাছে গিয়ে বসল।

—দেখি, দুধটা খেয়ে নাও।

ডাঃ রুদ্র বললেন, উঠে বোসো।

রীণা মাথা নাড়ল।

ডাঃ রুদ্র বললেন, ঠিক পারবে। উঠে বোসো।

রীণা দুহাতে ভর দিয়ে কোনোরকমে উঠে বসল।

ডাঃ রুদ্র বললেন, তুমি নিজে হাতে বাটিটা ধরো।

রীণার হাত কাঁপছিল তবু কোনোরকমে বাটিটা ধরল।

—খাও।

রীণা বলল, খেতে ইচ্ছে করছে না।

—তবুও খেতে হবে।

রীণা ধীরে ধীরে বাটিতে চুমুক দিল।

খাওয়া হলে বাটিটা মাটিতে রাখল।

ডাক্তার রুদ্র বললেন, এবার উঠে দাঁড়াতে হবে।

রীণা করুণ চোখে সঞ্জয়ের দিকে তাকাল।

একটু চেষ্টায়ে ডাঃ রুদ্র বললেন, ওঘরে গিয়ে বিছানার শুতে হবে তো।

রীণা বলল, পড়ে যাব।

‘পড়ে যাব’ সামান্য দুটি কথা। কিন্তু ঐ কথা দুটিতেই ডাঃ রুদ্রের দু চোখ ঝকঝক করে উঠল। যেন সঞ্জয়কে লক্ষ্য করেই নিচুগলায় বললেন—তাহলে দ্যাখো, পেশেন্ট পড়ে যেতে ভয় পায়! তারপর রীণাকে বললেন, না, পড়বে না। চেষ্টা করো। ওঠো বলছি!

—সঞ্জয়, help her বলে ডাঃ রুদ্র নিজেই রীণার পিছনে এসে দাঁড়ালেন।  
সঞ্জয়ের কাঁধে ভর দিয়ে রীণা গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

দশ মিনিট পর ডাক্তার রুদ্র সঞ্জয়কে একটা ইনজেকশান দিতে বললেন।  
ইনজেকশান ডাক্তার রুদ্রের কাছেই ছিল। সঞ্জয় ইনজেকশান দিল।

ডাঃ রুদ্র বললেন, এসো। বাইরের ঘরে ঘণ্টাখানেক বসা যাক। ও এখন ঘুমোক।

দুজনে বাইরের ঘরে এসে বসলেন।

—কি রকম বুঝলেন?

—না, সিরিয়স কিছু নয়। হঠাৎ ভয় পেয়েছে। ইনজেকশান দেওয়া হল,  
ঠিক হয়ে যাবে।

সঞ্জয়ের মুখে তবু হাসি ফুটল না।

—কেন যে বার বার এমন হচ্ছে বুঝতে পারছি না।

—তোমার স্ত্রী তো আগে এমন ভয় পেত না?

—কোনোদিন তো শুনিনি।

ডাক্তার রুদ্র চুপ করে রইলেন। একটু পরে বললেন, বাড়িটা না হয় ছেড়েই  
দাও।

সঞ্জয়ের ভুরুতে অসহিষ্ণুতার চিহ্ন ফুটে উঠল—আপনিও একথা বলছেন!  
শেষে ভূতের ভয়ে বাড়ি ছাড়ব!

ডাঃ রুদ্র একটু হাসলেন। বললেন, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি। ভূত  
না অলৌকিক কিছু, নাকি মানসিক ব্যাধি, এসব তর্কে আজ আর যেতে চাই  
না। এখানে থাকলে যদি ওঁর ক্ষতি হয় তাহলে এখান থেকে যাওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত  
নয় কি?

—কিন্তু সেদিন তো আপনিও বললেন, ও সাইকোপ্যাথিক পেশেন্ট?

ডাঃ রুদ্র একটা চুরুট ধরালেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, এসব ক্ষেত্রে  
‘সিদ্ধান্ত’ বলে কিছু নেই। আজ লক্ষণ শুনে যা মনে হবে, কাল রুগীকে  
দেখে অন্যরকম মনে হতে পারে।

সঞ্জয় অসহিষ্ণু ভাবে বলল, তাহলে কি মানতে হবে এ বাড়িতে আসার  
পরই কোনো একটি অশরীরী আত্মা কেবলমাত্র রীণার ক্ষতি করতে চাইছে। সে  
রীণাকে তার সঙ্গে যেতে বাধ্য করবে। But how is it possible and  
why? একটা অশরীরী আত্মা একটা জীবন্ত মানুষকে....

বাধা দিয়ে ডাঃ রুদ্র বললেন, না, জীবন্ত মানুষকে সে চায় না।

—তার মানে ওকে মেরে ফেলবে?

—হয় তো তাই। তার সূচনাও তো আজ কিছুক্ষণ আগে দেখতে পেলো।

সঞ্জয় চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগল।

ডাঃ রুদ্র বললেন, তুমি কি মনে কর রীণা আত্মহত্যা করবে যাচ্ছিল?

—না, কখনোই না।

ডাঃ রুদ্র একটু ভেবে বললেন, আমারও তাই মনে হয়। ওর মতো সুখী মেয়ে সুইসাইড করতে যাবে কেন ?

সঞ্জয় বলল, তবে ফ্রাস্টেশানে ভুগতে ভুগতে নিজেকে অসহায় বলে মনে হলে মানুষ বাধ্য হয়ে আত্মহত্যা করে শাস্তি পেতে চায়।

—ফ্রাস্টেশান বলছ কেন ?

—ঐ যে ওর কথা আমরা কেউ বিশ্বাস করছি না। তাছাড়া পুপুকে নিয়ে রেলিং থেকে ঝুঁকে পড়াটা আত্মহত্যার চেষ্টাই বোঝায়।

ডাঃ রুদ্র মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর অল্প হেসে বললেন, কিন্তু আমি প্রমাণ পেয়েছি ও আত্মহত্যা করতে যায়নি।

অবাক চোখে সঞ্জয় ডাক্তার রুদ্রের দিকে তাকালো।

—হ্যাঁ, অকাটা প্রমাণ পেয়েছি। মনে আছে, রীণাকে যখন উঠে দাঁড়াতে বলেছিলাম তখন ও ভয় পেয়ে বলেছিল ‘পড়ে যাব।’ যে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যাবার ভয় পায় সে কি দেড়ঘণ্টা আগে স্বৈচ্ছায় তিন তলা থেকে ঝাঁপ দেবার চেষ্টা করতে পারে ?

সঞ্জয় থমথমে মুখে ডাঃ রুদ্রের দিকে তাকিয়েই রইল। কোনো উত্তর দিতে পারল না।

ডাঃ রুদ্র বলতে লাগলেন—এই থেকেই প্রমাণ হয় রীণা যা বলেছে তা সত্যি। ভয়ংকর কিছু দেখেছিল যার জন্যে বারান্দার শেষ প্রান্তে গিয়ে অমন সাংঘাতিকভাবে ঝুঁকে পড়ে তার হাত থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার এমন শেষ চেষ্টা করছিল।

সঞ্জয় একটু ভেবে বলল, আচ্ছা, রীণা কি হিস্টিরিয়াম ভুগছে ? হিস্টিরিয়ার রুগীকে লোকে ভূত-পাওয়া বলে। এইসব রুগীদের শক্তি নাকি এতদূর হয় যে জলভর্তি ঘড়া দাঁতে করে তুলে উঠোনের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। কাজেই হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হলে...

ডাঃ রুদ্র বাধা দিয়ে বললেন, তুমি বলতে চাইছ রীণা হিস্টিরিয়ার পেশেন্ট। আচ্ছা, তোমার স্ত্রী তো সারাদিন দরজা বন্ধ করেই থাকে, তাই না ? তাহলে আজ হিস্টিরিয়ার প্রকোপ যখন তার বাড়ল, তখন বুঝি সে তোমার আসার জন্যে দরজা খুলে রেখে ঝাঁপ দিতে গেল ?

সঞ্জয় চুপ করে রইল।

—দরজাটা তা হলে খুলল কে ?

সঞ্জয় তখনও নিরুত্তর।

নিভে-যাওয়া চুরুটটা আবার দুটো কাঠি ধ্বংস করে ধরালেন ডাঃ রুদ্র। বললেন, উত্তরটা আমিই দিচ্ছি। দরজা খুলেছিল সে, যে একদিন রাত্রে ঐ টেবিলের কাছে ঘুরতে ঘুরতে কাচের গ্লাসটা ভেঙেছিল, যে কুলুঙ্গি থেকে শিবানন্দ ভট্টাচার্যের ছবিখানা চুরি করেছিল। সে-ই রীণাকে ওয়ানিং দিয়ে দরজা খুলে রেখে গেল।

একটু থেমে বললেন, অবশ্য তুমি জিজ্ঞেস করতে পার—অশরীরী আত্মাকেও কি দরজা খুলে যেতে-আসতে হয়? তাহলে অবশ্যই আমি চুপ করেই থাকব। কেননা তার উত্তর জ্ঞানের বাইরে।

সঞ্জয় মন দিয়ে সব শুনল। কোনো উত্তর দিল না।

কয়েক মিনিট দুজনেই চুপচাপ বসে রইলেন। পাশের ঘরে রীণা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। বাইরের দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন বন্দনার মা ট্রেতে দু'কাপ চা আর কিছু নোনতা বিস্কুট নিয়ে।

সঞ্জয় একটা কাপ এগিয়ে দিল ডাঃ রুদ্রর দিকে। নিজে নিল অন্যটা। বিস্কুটে কামড় দিয়ে সঞ্জয় বলল, কিন্তু শিবানন্দের ছবি চুরি করার উদ্দেশ্য?

—আত্মাটির ক্রিয়াকলাপ দেখে মনে হচ্ছে তোমার এই প্রশ্নের উত্তর সোজা। তুমি বলেছিলে ছবির পিছনে ঠিকানা লেখা ছিল। স্পিরিট চায় না শিবানন্দের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ হয়। তাই সে ছবিটা সরিয়ে ফেলেছে।

সঞ্জয় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলল, তবে তো শিবানন্দের কাছে আমরা যেতেই হবে। অশরীরী আত্মাটি অনেক কিছুই জানেন, জানেন না যে, ছবি নিয়ে গেলেও ঠিকানাটি আমার মুখস্থ হয়ে আছে।

ডাঃ রুদ্র পেয়ালা নামিয়ে রেখে বললেন, তবে আর কি? একদিন চলে যাও ওঁর কাছে। তবে—তার আগে কিন্তু বাড়টা ছাড়বে।

—এত তাড়াতাড়ি বাড়ি পাব কোথায়?

—এখনি বাড়ি না পাও আমার ওখানে উঠবে। মোট কথা সামনের শনিবারের আগেই তোমরা এ বাড়ি ছাড়বে।

সঞ্জয় ছেলেমানুষের মতো জেদ ধরে বলল, শনিবার পর্যন্ত তো আমি থাকবই।

ডাঃ রুদ্রের মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। তিনি বললেন, তুমি থাকতে চাও থাকো। আমি ওদের নিয়ে যাব।

সঞ্জয় বলল, না। তা হয় না কাকাবাবু। রীণা না থাকলে তিনি তো আসবেন না। ঐ শনিবার আমি সারা দিন রীণাকে পাহারা দেব। দেখব কি করে ওর ক্ষতি করে?

—তাহলে যা ভালো বোঝ করো। এরপর আমার আর কিছু বলার নেই।

তিনি উঠে রীণাকে পরীক্ষা করতে গেলেন। মিনিট পাঁচেক পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।—ভালোই আছে। ওর যদি ঘুম ভাঙে তাহলে রাতের খাবার খাবে। ঘুম যেন ভাঙিও না।

বলে বেরোতে যাচ্ছেন এমন সময়ে বন্দনার মা পুপুকে কোলে নিয়ে চিন্তিত মুখে ঢুকলেন।—পুপুর স্বর হয়েছে দেখছি।

—স্বর! সঞ্জয় চমকে উঠে পুপুর কপালে হাত দিল।—বেশ স্বর। বলে ডাঃ রুদ্রের দিকে তাকালো। ডাঃ রুদ্র পালস্ দেখলেন। কিছু বললেন না।

সঞ্জয় চিন্তিতভাবে তাকালো, কি করব?

ডাঃ রুদ্র হাসলেন, তুমি নিজে ডাক্তার। ছেলের একটু খর হয়েছে। তাতেই ঘাবড়ে যাচ্ছ? বলে সঞ্জয়ের কাঁধে হাত রাখলেন।

—আজকের রাতটা দ্যাখো। কাল খর না ছাড়লে ভাবা যাবে।

ডাঃ রুদ্র ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সঞ্জয় বন্দনার মাকে বলল, আপনি একটু থাকুন। আমি এঁকে এগিয়ে দিয়ে আসছি।

বন্দনার মা বললেন, আমি থাকছি। আপনি একটু বন্দনাকেও পাঠিয়ে দেবেন।

ডাঃ রুদ্র গাড়িতে উঠে ইঞ্জিনের চাবি ঘোরালেন।—কাল সকালেই তাহলে একটা খবর দেবে। কী এত ভাবছ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয় খবর দেব। ভাবছিলাম—আপনিও বাড়ি ছাড়ার কথা বললেন, আর একজনও বলছিলেন।

—কে তিনি?

সঞ্জয় ইতস্তত করে বলল, আপনাকে বলা হয়নি গত সপ্তাহে মিস থাম্পি নামে একজন ম্যাড্রাসি মহিলা আমার এখানে এসেছিলেন রীণার এক বান্ধবীর সঙ্গে। রীণার কথা সব শুনলেন। তিনিও বলছিলেন—

ডাঃ রুদ্র গাড়ির চাবি বন্ধ করে বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, ব্যাঙ্গালোরের বিখ্যাত স্পিরিচুয়ালিস্ট মিস থাম্পি নাকি?

—হ্যাঁ। আপনি চেনেন?

ডাঃ রুদ্র চাবি ঘুরিয়ে ফের ইঞ্জিন চালু করে বললেন, ওঁর সঙ্গে দেখা হলে খুশি হতাম। নেস্টট ডে যখন আসব ওঁর কথা বলব। গুড নাইট।

॥ পনেরো ॥

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে

শীতের বিকেল।

কম্পাউন্ডের মধ্যে লাঠি হাতে বার পাঁচেক পাক দিয়ে অমৃতবাবু বেঞ্চিতে এসে বসলেন।

ওপাশে আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে বেঞ্চির ওপর পা তুলে বসেছিলেন বিভূতিবাবু। পাশে মহিমাবাবু। গায়ে পুরনো একটা অলেস্টার। মাথায় মাংকি-ক্যাপ।

অমৃতবাবু জিঞ্জের করলেন, আচ্ছা, পৌষ সংক্রান্তিটা কবে?

ওদিকের বেঞ্চিতে শচীনবাবু বিকেলের স্নান আলোতেও কাগজ পড়বার চেষ্টা করছিলেন। বয়েস এঁদের চেয়ে কিছু কম। রসিকতা করে তিনি বললেন, পৌষ সংক্রান্তিটা পৌষ মাসের শেষ দিন।

—আহা তা তো জানি। ইংরিজির কত তারিখ?

এবার আর শচীনবাবু উত্তর দিতে পারলেন না।

—তা সংক্রান্তির খোঁজ কেন? পিঠে খেতে ইচ্ছে করছে নাকি? অমৃতবাবুর দিকে মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়ে মহিমাবাবু হা-হা করে হাসলেন।

—হ্যাঁ, কত দিন যে পিঠে খাইনি!

—তা গিল্মিকে বলবেন। পিঠে ভেজে দেবেন।

—তা হলেই হয়েছে। ওসব পাট বহুকাল চুকে গিয়েছে। বৌমাও পিঠে করতে জানেন না।

—যা বলেছেন। বিভূতিবাবু নড়ে চড়ে বসলেন।

—এমন শীতে বেগুন পোড়া কাঁচা লংকা দিয়ে খাব তার উপায় নেই। বৌমাকে বললাম, তো উনি বললেন, গ্যাসের উনুনে বেগুন পোড়াব কি করে? শচীনবাবু বললেন, আমি তো এই জন্যই গ্যাসের উনুন নিইনি।

বিভূতিবাবু বললেন, বেগুন পোড়ানো যাবে না বলেই গ্যাস-উনুন নেননি।

—না, ঠিক তা নয়। তবে অন্যতম কারণ বটে।

—তা বাকি কারণগুলি কি? অ্যাকসিডেন্ট?

—নিশ্চয়। প্রায়ই তো শুনি গ্যাস লিক করে আগুন ধরে গেছে।

—তা কয়লার উনুনে কি অ্যাকসিডেন্ট হয় না? এখন কি-সব শাড়ি উঠেছে—সিঙ্গেটিক না কি ছাইভস্ম—তা সেই সিঙ্গেটিক শাড়ির আঁচলটি একবার উনুনে পড়লেই—

অমৃতবাবু হাসলেন।—ঠিক বলেছেন। একবার আঁচল ধরলেই আর দেখতে হবে না। সঙ্গে সঙ্গে বধূহত্যার দায়ে বাড়িসুদ্ধ সকলের কোমরে দড়ি। তা পুত্রবধূই হন আর নিজের বৃদ্ধা বধূই হন।

—তা বটে। কোনটে যে অ্যাকসিডেন্ট আর কোনটে যে আত্মহত্যার প্ররোচনা, কে বিচার করবে? বাড়ির বৌ মরল তো ধর ছেলেকে আর ছেলের বাপকে।

—অ্যাকসিডেন্ট কি শুধু আগুনে পুড়েই হয়? এ বাড়িতেই সেদিন কী কাণ্ডটা হতে যাচ্ছিল ভাবুন তো। সে তো আমরা চোখের সামনেই দেখলাম।

—হ্যাঁ। ভাগ্যি ঠিক সময়ে ডাক্তারবাবু এসে পড়েছিলেন?

—কিন্তু ছেলেকে নিয়ে ঝাঁপ?

—অশান্তিটা বোধহয় খুবই গুরুতর। নিচুগলায় বললেন বিভূতিবাবু।

—একে ডাক্তার তার ওপর যোয়ান বয়েস। আবার হাসপাতালে নার্সদের নিয়ে কাজ-করবার...!

—কিন্তু উনি কি সত্যিই আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন?

—তাছাড়া কি?

—তাছাড়াও ব্যাপার আছে মশাই, ব্যাপার আছে। আমার ওয়াইফ তো সঙ্গে সঙ্গে ওপরে গিয়েছিলেন। নিজে কানে শুনেছেন—কিছু-একটা দেখে ভয় পেয়ে নাকি ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল।

মহিমাবাবুর কথায় হঠাৎ যেন সবাই থমকে গেলেন। অমৃতবাবু আরও কাছে সরে এসে বললেন, হ্যাঁ, ব্যাপার যে কিছু আছে সে বিষয়ে আমারও সন্দেহ নেই। মনে আছে মাস দেড়েক আগে অনেক রাত্তিরে ওপরের ঘরে চৈচামেচি?

—হ্যাঁ, গেলাস ভাঙার শব্দ?



—ডাক্তার তো বলে দিলেন বেড়ালে ভেঙেছে। কিন্তু আমার খটকা যায়নি।—তা তো বটেই। অবশ্য আর কী-বা হতে পারে? চোর-ডাকাত হলে ধরা পড়ে যেত।

—যাই হোক ব্যাপারটা রহস্যজনক।

—রহস্যজনক বলে রহস্যজনক। পুরনো বাড়ি। কী দোষ আছে কে জানে!

—তুমি থামো বিভূতিবাবু! সন্কেবেলা আর ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে না। মনে রেখো আমরাও এক বাড়িতে থাকি।

—কিন্তু একটা মীমাংসা হওয়ার তো দরকার।

—কিসের মীমাংসা?

—বাড়িতে যদি কোনো দোষ থাকে—

—দোষ থাকলেই কি আমরা বাড়ি ছাড়তে পারব?

সবাই একটু থমকত খেয়ে শচীনবাবুর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শচীনবাবু কাগজটা ভাঁজ করতে করতে বললেন, আমি তো পারব না। এত কম ভাড়া, সেলামী ছাড়া আর কোথায় বাড়ি পাব?

যুক্তি অকাটা। সত্যিই তো। যতই ভূতের উপদ্রব হোক এ বাড়ি ছাড়া যাবে না। ভূতের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, কিন্তু একটা বাড়ি ছেড়ে দিলে বাড়ি পাওয়া দায়।

—শান্তি-স্বস্তায়ন তো করা যায়।

—তা যায়। তবে তার আগে আসল ব্যাপারটা জানা দরকার।

—তাহলে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করতে হয়।

—ডাক্তার কিছু বলবে মনে করছে? দেখছ না লোকটা কারো সঙ্গে মেশে না।

—তা হোক, তবু একবার সবাই মিলে—ঐ তো ডাক্তার ফিরছেন। চলো—চলো—খুব উৎসাহে বিভূতিবাবু সবাইকে বললেন বটে কিন্তু আর নাড়তে চাইলেন না। শেষ পর্যন্ত শচীনবাবু একাই এগিয়ে গেলেন।

—নমস্কার, ডাক্তারবাবু।

—নমস্কার, ভালো আছেন?

—এই চলছে আর কি! আপনার কথাই এতক্ষণ আমরা আলোচনা করছিলাম। আপনার স্ত্রী এখন কেমন আছেন?

—ভালোই আছেন। কেন বলুন তো?

—যাক। নিশ্চিন্ত হলাম। সেদিন যা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল—খুব সময়ে আপনি এসে পড়েছিলেন। তারপরই উনি আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

—হ্যাঁ, নার্সাস ব্রেকডাউন। সঞ্জয় সংক্ষেপ করতে চাইল।

ইতিমধ্যে সকলেই এসে দাঁড়িয়েছেন সঞ্জয়কে ঘিরে। মহিমাবাবু বললেন, এমনি-এমনি কি নার্সাস ব্রেকডাউন হয় ডাক্তারবাবু? নিশ্চয়ই কোনো কিছুতে ভয় পেয়েছিলেন।

—ভয়! না না, ভয় কিসের? কলকাতার মতো জায়গায়—আমরা সকলে মিলে মিশে রয়েছি—একবার চোঁচিয়ে উঠলে পাঁচজনে ছুটে আসবে। এখানে চোর-ডাকাতের সাধ্য কি ঢোকে। না-না, কোনো ভয় নেই। নিশ্চিন্তে থাকুন। বলতে বলতে সঞ্জয় সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

মহিমাবাবুরা কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, দেখলেন তো। আমাদের কিছু বলতেও দিলে না।

ও দিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বিরক্ত সঞ্জয় মনে মনে বলল, এদের জন্যেই দেখছি বাড়িটা ছাড়তে হবে। প্রেস্টিজ বলে কিছু আর রইল না।

॥ সোলো ॥

### মিস থাম্পির জীবনকথা

পুপুর স্বর ছেড়ে গেছে—খবরটা ডাক্তার রুদ্র আগেই ফোনে পেয়েছেন। তবু এদিন সন্ধ্যায় এলেন। এসে রীণাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ?

রীণা স্নান হেসে বলল, ভালো। কি খাবেন বলুন, চা না কফি?

—কফিই করো।

রীণা রান্নাঘরে ঢুকল।

ঘরে ছিলেন বন্দনার মা। রীণা অসুস্থ হবার পর থেকে উনি প্রায়ই আসেন। তিনিও উঠে রীণার সঙ্গে রান্নাঘরে গেলেন। রীণা এখন বেশ সুস্থ। তবু তার চোখের চাউনিতে একটা উদ্ভ্রান্তভাব। ডাঃ রুদ্রের তা লক্ষ্য এড়াননি।

বন্দনার মা রীণাকে বললেন, আপনি গল্প করুন, আমি কফি করছি।

কলকাতায় মাস্ত ছাড়া রীণা এই একজন মানুষকে কাছে পেয়েছে। বাড়ির অন্য ভাড়াটেদের জীরা কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির। কারো পরের সংসারের ওপর মাত্রাতিরিক্ত কৌতূহল, কেউ-বা ঈর্ষাকাতর। বন্দনার মা-ই ব্যতিক্রম। অল্প কথা বলেন, রীণার ওপর তাঁর যেন সত্যিকারের স্নেহ, রীণাও যেন একজন দিদি পেয়েছে।

কফির পেয়ালার চুমুক দিয়ে ডাক্তার রুদ্র বললেন, তোমরা তো মিস থাম্পিকে দেখলে। আমার দুর্ভাগ্য তাঁকে দেখতে পেলাম না। খবর পেলে নিশ্চয় আসতাম। বলে সঞ্জয়ের দিকে তাকালেন।

সঞ্জয় অপরাধীর মতো বলল, আপনি যে ওঁর সম্বন্ধে এত ইন্টারেস্টেড কি করে জানব বলুন। জানলে নিশ্চয় খবর দিতাম।

—আবার যদি কখনো আসেন তাহলে খবর দিতে ভুল না। ইংরিজি একটা ম্যাগাজিনে ওঁর লাইফহিস্ট্রি পড়ে অবাক হয়েছিলাম। ওঁর মতো spiritualist এখন সারা ভারতে নেই। অথচ মজার কথা প্রথম জীবনে উনি ছিলেন নামকরা সম্মোহনবিদ। ওঁর জীবনটাই ইনটারেস্টিং। সম্মোহনবিদ থাকার সময়ে তরুণী বয়েসে তিনি একবার তাঁর সেই শক্তির অপব্যবহার করেছিলেন। অবশ্যই তার একটা কারণ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওঁর অনুশোচনা হয়। অনুশোচনা থেকেই আসে

পরিবর্তন। তিনি হিপনোটিজম্ ছেড়ে দেন। শুরু হয় জীবনের আর এক নতুন অধ্যায় স্পিরিচুয়ালিজমের সাধনা।

ডাঃ রুদ্র একটু থামলেন। তারপর বললেন, সঞ্জয় তুমি তো জান মেসমেরিজম্ নিয়ে আমিও কিছু পড়াশোনা করছি। কাজেই ও সম্বন্ধে আমি যদি কিছু বলি তাহলে নিশ্চয় অনধিকারচর্চা হবে না।

বলে তিনি একটু হাসলেন।

রীণা জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, হিপনোটিজম্ আর মেসমেরিজম্ কি এক? বন্দনার মা চলে যাচ্ছিলেন, রীণা তাঁর হাত ধরে বলল, বসুন না।

বন্দনার মা বসলেন।

ডাঃ রুদ্র বললেন, হ্যাঁ, একই। বাংলায় এর নাম সম্মোহন।

সঞ্জয় বলল, তা হলে ম্যাজিসিয়ানরা যে হিপনোটিজমের খেলা দেখায় সেও কি এই সম্মোহন?

ডাক্তার রুদ্র বললেন, কতকটা। তবে প্রকৃত সম্মোহনবিদরা কিন্তু একটু তাকিয়েই অপরকে সম্মোহিত করতে পারেন। এমন কি গল্প করতে করতেও এ বিদ্যা প্রয়োগ করতে পারেন। এমনও দেখা গেছে, এক জন পাকা সম্মোহনবিদ অনেক দূরের কোনো মানুষকে সম্মোহিত করেছেন। আমাদের দেশের কাপালিক বা ডাইনিরা কতকটা এই জাতীয় একটি বিদ্যায় পটু ছিলেন। তাকে বলে বশীকরণ। মানুষ বশ করতে ওস্তাদ ছিলেন তাঁরা। তবে তার জন্যে যে সাধনার প্রয়োজন তা অনেকের পক্ষেই করা সম্ভব হতো না। অল্পস্বল্প যেক্টুকু শক্তি তাঁরা অর্জন করতেন তার বেশির ভাগটাই প্রয়োগ করতেন ব্যক্তিগত স্বার্থে। এখন তাঁদের কথা থাক। আমার বক্তব্য মেসমেরিজম্।

ফ্রেডারিক অ্যাস্টনি মেসমার এই সম্মোহিনী শক্তির আবিষ্কার। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের লোক। এক বার জাহাজডুবি হয়ে এই জার্মান ভদ্রলোক ভাঙা মাঙ্গল আঁকড়ে ভাসতে ভাসতে অজানা জঙ্গলভরা এক তীরে এসে ঠেকলেন। রাতে আশ্রয় নিলেন একটা গাছে। সকাল হলে দেখেন গাছের নিচে এক বিরাট অজগর মড়ার মতো পড়ে আছে। বুদ্ধিমান মেসমার তখনি গাছ থেকে নামলেন না। তিনি লক্ষ্য করতে লাগলেন। একসময়ে দেখলেন সাপটা পিটপিট করে তাকাচ্ছে আর আকাশ থেকে উড়ন্ত পাখি এসে পড়ছে তার মুখে। মেসমার অবাক হলেন—এ কি করে সম্ভব? সাপের চোখের চাউনিতে এমন কোন শক্তি আছে যাতে আকাশের পাখি ছুটে এসে পড়ছে তার মুখে?

এই ভাবনা থেকে শুরু হল সাধনা। সেই সাধনার ফলশ্রুতি সম্মোহন-বিদ্যা।<sup>৯</sup> তাই এই সম্মোহন-বিদ্যার একটা নাম মেসমেরিজম্। কিন্তু এ তো অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যাপার। তার ডের আগে তিব্বত, চীন, ভারতে এই মহাবিদ্যার চর্চা শুরু হয়েছিল। পশ্চিমী দেশগুলি এই বিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিকিৎসার কাজে লাগিয়েছিল। প্রাচ্যের দেশগুলি তা পারেনি।

এই পর্যন্ত বলে ডাঃ রুদ্র একটু থামলেন। একটা চুরুট ধরিয়ে আবার শুরু

করলেন, মিস থাম্পি প্রথম জীবনে এই সম্মোহনবিদ্যার চর্চা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র দশ বছর, তখন তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল এক জাদুকরী। জাদুকরীটি ঝাড়ফুঁক করত, সম্মোহনশক্তিও ছিল অসাধারণ। তার বোধহয় ইচ্ছা ছিল থাম্পিকে সে উত্তরাধিকারিণী করে যাবে। তাই সেই বালিকা বয়স থেকেই তাকে সম্মোহনবিদ্যায় তালিম দিতে থাকে। বেশ কিছুকাল পরে পুলিশ যখন জাদুকরীর হাত থেকে থাম্পিকে উদ্ধার করে তখন সে একজন পাকা সম্মোহনবিদ।

বাড়ি ফিরে আসার পর মিস থাম্পি পড়াশুনা শুরু করেন পুরোদমে। তিনি যথেষ্ট মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। কিন্তু তার চেয়েও বেশি পরিচিত ছিল ধনীকন্যা বলে। আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতো মিস থাম্পির মনটাও ছিল সংসারী। তিনিও চাইতেন একজন দায়িত্বশীল মমতাময় স্বামী। মিস থাম্পি ভালো করেই জানতেন যে তিনি সুখী নন। তবু তিনি মনে মনে অপেক্ষা করতেন এমন কারও জন্যে যিনি শুধু তাঁর বাইরের চেহারাটাই দেখবেন না, যাঁর উদার হৃদয়ে তাঁর জন্যে ভালোবাসার আসন পাতা থাকবে। কিন্তু বহুদিন অপেক্ষা করেও এমন কাউকেই পেলেন না যিনি স্বেচ্ছায় ভালোবেসে তাঁকে ঘরে নিয়ে যাবেন। ধনী পিতার কন্যা হিসেবে বিবাহের সম্বন্ধ তাঁর অনেক এসেছিল। কিন্তু সে সবই তিনি নাকচ করে দিয়েছিলেন। পাত্রপক্ষের লক্ষ্য যে তাঁর বাপের টাকা তা তিনি বুঝতেন।

এমনি সময়ে মিস থাম্পি এক অধ্যাপকের সান্নিধ্যে আসেন। দর্শনের অধ্যাপক। সুদর্শন, ধীর, স্থির, জ্ঞানদীপ্ত মানুষটি। এই প্রথম মিস থাম্পি দুর্বল হয়ে পড়লেন। কিন্তু অপর পক্ষে তেমন চাঞ্চল্য নেই, অথচ তিনি যে একটু বিশেষ চোখে তাঁকে দেখেন, তাঁকে একটু বিশেষ যত্ন নিয়ে পড়াতে চান থাম্পি তা বেশ বুঝতে পারেন।

থাম্পি যখন বুঝলেন—এই সুপুরুষটির সব গুণই আছে—নেই শুধু এগিয়ে আসার সাহস, তখন তিনি নিজেই অধ্যাপকের কাছে বিয়ের ইচ্ছা জানালেন।

অধ্যাপক সম্মেহে তাঁর মাথায় হাত রেখে বললেন, তুমি আমার ছাত্রী। আমাদের সম্পর্ক সেইরকম হওয়াই উচিত। তা ছাড়া আমার বিয়ে অন্যত্র স্থির হয়ে আছে।

এ কথায় থাম্পির দুচোখ জ্বলে উঠল। তিনি অধ্যাপকের কথা বিশ্বাস করলেন না। যদি অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিকই হয়ে থাকত, তা হলে তাঁর হবভাব অন্যরকম হত। সেরকম তো কিছু লক্ষ্যে পড়েনি।

মিস থাম্পি ক্ষুব্ধ অভিমানে বললেন, মিথ্যে কথা বলে আমায় ভোলাচ্ছেন কেন? বললেই তো পারেন আমাকে আপনার পছন্দ নয়।

অধ্যাপক লজ্জিত হয়ে বললেন, বিশ্বাস কর অন্য একজনের সঙ্গে আমি engaged.

মিস থাম্পি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, একথা আগে আমাকে বলেননি কেন? একটা মেয়ের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা?

অধ্যাপক বললেন, তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, শাস্ত হয়ে ভাবার চেষ্টা করো। আমার দিক থেকে তোমার সঙ্গে এমন কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি বা এমন কোনো কথা বলিনি যাতে তোমাকে ঠকানো হয়।

কিন্তু মিস থাম্পির ধৈর্য ধরে ভাবার অবস্থা ছিল না। তাঁর শুধু একটা কথাই মনে হল অধ্যাপক তাঁকে পছন্দ করেননি। যদি পছন্দ করতেন তা হলে অন্য মেয়েকে ছেড়ে তাঁর কাছেই আসতেন। এনগেজড তো কি হয়েছে? তাকে তো আর তিনি বিয়ে করেননি। পুরুষের জীবনে অমন কত মেয়ে রঙীন স্বপ্নচোখ নিয়ে আসে তার পর একদিন সে স্বপ্ন ছুটে যায়।

এরপর মিস থাম্পি আর অধ্যাপকের সামনে আসেন নি। দূরে দূরে রইলেন। কিন্তু চুপ করে বসে রইলেন না। চেষ্টা করতে লাগলেন অধ্যাপককে জন্ম করবার।

একদিন অধ্যাপক ক্লাস নিতে ঢুকছেন। হঠাৎ তাঁর মাথাটা কিরকম টলে উঠল। চোখে যেন ধোঁয়া ধোঁয়া দেখলেন। তবু ক্লাস করতে গেলেন। কিন্তু লেকচার দিতে গিয়ে সব ঘুলিয়ে ফেললেন। ছাত্ররা তো অবাক। তারা বলল, স্যার, আপনার বোধহয় শরীর খারাপ। চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

বাড়ি এসেই অধ্যাপক শুয়ে পড়লেন। ঘুমে দুচোখ জড়িয়ে এল।

এরপর থেকে রোজই তাঁর লেকচার এলোমেলো হতে লাগল। ছাত্ররা বিরক্ত হয়ে প্রিন্সিপ্যালকে জানাল। প্রিন্সিপ্যাল শেষ পর্যন্ত একদিন আড়ালে দাঁড়িয়ে তাঁর লেকচার শুনলেন। বুঝলেন অধ্যাপক ঠিক সুস্থ মস্তিষ্কে নেই। তিনি তখন তাঁকে ছুটি নিতে বাধ্য করালেন।

এরই মধ্যে একদিন রাত্তিরে হঠাৎ অধ্যাপক মিস থাম্পির বাড়ি গিয়ে হাজির।

মিস থাম্পি কিছুমাত্র অবাক না হয়ে ক্লেশের সুরে বললেন, হঠাৎ কি মনে করে আমার কাছে?

অধ্যাপক ঘুমের ঘোরে উত্তর দিলেন, তুমি যে আমায় ডাকলে।

—আমি ডাকলাম? মিস থাম্পি হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, যদি ডেকেই থাকি তাহলেও কি আমার মতো নগণ্য একটা মেয়ের বাড়িতে এই রাত্তিরে আপনার মতো এক জন বিশিষ্ট অধ্যাপকের আসা উচিত?

অধ্যাপক এর উত্তর দিতে পারেন নি। তাঁর দু'চোখ তখন ঘুমে জড়িয়ে আসছিল।

এমনভাবেই মিস থাম্পি এক নিরীহ অধ্যাপককে সম্মোহিত করে নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠলেন। প্রায় প্রতিদিন গভীর রাত্রে অধ্যাপককে ডেকে নিয়ে আসেন। এক বিকৃত ভোগের খেলায় মেতে থাকেন তিনি। তাঁকে খুশি করেই অধ্যাপক ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম ভাঙলে তাঁর আর কিছুই মনে থাকে না। তিনি শুধু অবাক হয়ে যান। মিস থাম্পির বিছানায় শুয়ে আছেন দেখে তিনি ভীষণ লজ্জা পান। 'ছিঃ ছিঃ এ কী করে সম্ভব' বলতে বলতে ছুটে পালিয়ে যান।

মিস থাম্পি এতে এক ধরনের আনন্দ পান বটে কিন্তু ঠিক সুখ পান না। এ যেন জোর করে কৃত্রিম উপায়ে পুরুষসঙ্গ আদায় করা। তা তো তিনি চান নি। তিনি চেয়েছিলেন ভালোবাসা।

তবু তিনি অধ্যাপককে ছাড়তে পারেন নি। বেঘোর অবস্থাতেও যদি মানুষটা দুটো ভালোবাসার কথা বলেন, যদি কাছে টানেন তাহলে সেইটুকুই লাভ। রক্তমাংসের ঐ দেহটা যে কিছুক্ষণের জন্যেও তাঁরই—অন্য কারও নয়—এইটুকু মনে করেই তাঁর আনন্দ।

একদিন মিস থাম্পি একটা ফন্দি আঁটলেন। অন্য দিনের মতোই অলক্ষ্যে থেকে হিপনোটাইজ করে অধ্যাপককে ডেকে আনলেন। সম্মোহিত অধ্যাপক যখন মিস থাম্পির হাতটা নিজের হাতে নিয়ে প্রেমের কথা বলে যাচ্ছিলেন তখন থাম্পি অধ্যাপকের হাতে একটা কাগজ আর কলম গুঁজে দিয়ে বললেন, আপনি যেসব কথা বলছেন, তা এই কাগজে লিখুন।

সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক লিখলেন—‘I love you dearly and want to have you as my life-partner by marriage.’

লেখাটুকু পড়ে মিস থাম্পির বৃথাই রোমাঞ্চ হল। তবু বললেন, নিচে সই করুন।

অধ্যাপক সই করলেন।

—তারিখ দিন।

অধ্যাপক তারিখ বসালেন।

মিস থাম্পি কাগজটি যত্ন করে রেখে দিলেন।

মাস ছয় পর।

মিস থাম্পি লক্ষ্য করলেন দিন দিন অধ্যাপকের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে।

তা তো পড়বেই। অমন সম্মোহনের চাকরিটা গেল। বেকার জীবন। লোকে তাকে দেখলে হাসাহাসি করে। বলে—পাগলা প্রফেসার।

এ যন্ত্রণা কে আর কতদিন সহ্য করতে পারে?

এদিকে যে মেয়েটির সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা—মিস থাম্পি খবর নিয়ে জানলেন সেই মেয়েটির বাড়ির লোকরাও পাগলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী নন। মেয়েটি কান্নাকাটি করছে।

অধ্যাপকের শরীর আর মনের অবস্থা দেখে মিস থাম্পি চিন্তায় পড়লেন। সম্মোহনের সাহায্যে তাঁকে আবার চাক্ষা করা যায়। কিন্তু সে তো সাময়িক। তাছাড়া একজনের ওপর বার বার সম্মোহন প্রয়োগ করলে বিশেষ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা।

তখন একদিন তিনি প্রফেসারকে ডেকে বললেন, আপনি কি রকম লোক যে একটা কলেজ থেকে চাকরি গেছে বলে অন্য কোথাও চেষ্টা করছেন না?

অধ্যাপক ম্লান হেসে বললেন, সবাই যে বলে আমি অসুস্থ। অসুস্থ লোককে কেউ চাকরি দেয়?

মিস থাম্পি বললেন, না, আপনি অসুস্থ নন। আমি বলছি আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ। লোকে শত্রুতা করে আপনার বিরুদ্ধে লেগেছিল।

অধ্যাপক বললেন, চাকরি করেই-বা কি হবে? আমার জীবনে আর কোনো আনন্দ নেই। আমার সব আশা শেষ হয়ে গেছে।

মিস থাম্পি বললেন, না, কিছুই শেষ হয় নি। আমি বলছি সব ঠিক আছে।

এই বলে শহরের বাইরে একটা কলেজের ঠিকানা দিলেন। —এখানে একজন ফিলজফির প্রফেসার দরকার। আপনি অ্যাপ্লাই করুন।

মিস থাম্পির প্রেরণায় অধ্যাপক দরখাস্ত করলেন। তারপর দু'মাসের মধ্যে সেই কলেজে চাকরি পেয়ে গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পাণ্ডিত্যে আর অধ্যাপনার গুণে ছাত্ররা মুগ্ধ হয়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই অধ্যাপক তাঁর সুনাম আর সম্মান ফিরে পেলেন। অধ্যাপক সুস্থ হয়ে উঠলেন।

মিস থাম্পি সব খবরই রাখেন। যেদিন শুনলেন তাঁর প্রাণপ্রিয় অধ্যাপককে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে সেদিন তিনি গোপনে একটু হাসলেন। কিন্তু তিনি আর কোনো দিন প্রফেসারকে সম্মোহন করে ডাকেন নি।

না ডাকলেও একদিন অধ্যাপক নিজেই হাসিমুখে মিস থাম্পির সঙ্গে দেখা করতে এলেন। এলেন প্রায় এক বছর পর। তবে একা এলেন না। সঙ্গে সুন্দরী একটি মেয়ে। অধ্যাপক আলাপ করিয়ে দিলেন—এরই নাম এলিশ। এর সঙ্গেই আমি engaged ছিলাম। সামনের মাসে আমাদের বিয়ে।

মিস থাম্পি এলিশকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। ওরা চলে যাবার সময়ে মিস থাম্পি প্রফেসারকে বললেন, আপনার সঙ্গে আমার বোধহয় আর দেখা হবে না।

প্রফেসার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

—আমি সব ছেড়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

—কোথায়?

—তা এখনো ঠিক করি নি।

—তুমি যেখানেই থাক আমায় চিঠি দিও।

মিস থাম্পি তার কোনো উত্তর দেন নি। শুধু একটু হেসেছিলেন।

তারপর সুযোগমতো প্রফেসারকে আলাদা করে ডেকে তাঁর হাতে একটা খাম দিয়ে বললেন, এটা পড়ে দয়া করে ছিঁড়ে ফেলে দেবেন। দেখবেন যেন অন্য কারো হাতে না পড়ে।

চিঠিতে মিস থাম্পি সব কথাই খুলে লিখেছিলেন। অকপটে স্বীকার করেছিলেন তাঁর অপরাধের কথা। শেষ দুটি ছত্র এইরকম—কোনো প্রত্যাখ্যাতা মেয়ের মর্মযন্ত্রণা উপলব্ধি করার ক্ষমতা যদি আপনার থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

এই চিঠির সঙ্গেই ছিল আলাদা আর একটুকরো কাগজ। তাতে লেখা ছিল—‘I love you dearly and want to have you as my life-partner by marriage.’...

ডাক্তার রুদ্র থামলেন। ঘড়িতে তখন নটা বেজে পনেরো মিনিট। ডাঃ রুদ্র উঠে পড়লেন।

—তারপর থেকে মিস থাম্পি আর সম্মোহন করার চেষ্টা করেননি। ঐ লাইনটা ছেড়েই দিলেন। তিনি ঘুরতে লাগলেন দেশ-বিদেশ-পাহাড়-জঙ্গল-মঠ-মন্দির-গির্জা। যেখানেই প্রাচীন পুঁথি পান সেখানেই ছোটেন। বিশেষ কোনো মানুষকে চেয়েছিলেন বড় আপন করে। তা তিনি পাননি। তাই শেষ পর্যন্ত খুঁজে বেড়াতে লাগলেন অলৌকিক রহস্য— জীবন-মরণের সীমানা ছাড়িয়ে কোনো কিছু অদৃশ্য অস্তিত্বের সন্ধান।

ডাক্তার রুদ্রকে এগিয়ে দিতে যাচ্ছিল সঞ্জয়। ওরা যখন সিঁড়ির কাছে গিয়েছে তখন হঠাৎই রীণা ব্যস্ত হয়ে সঞ্জয়কে ডাকল, শুনে যাও।

ডাঃ রুদ্র থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সঞ্জয় ঘরে এসে ঢুকল।

—পুপুর চোখ দুটো দ্যাখো কিরকম বসে গেছে না ?

সঞ্জয় টর্চ জ্বলে ভালো করে দেখল। হ্যাঁ, চোখের নিচে কালি। চোখ দুটো হঠাৎ যেন বসে গেছে।

—কি হল ? বলে ডাঃ রুদ্রও এসে দাঁড়ালেন। তিনিও দেখলেন। অনেকক্ষণ ধরেই দেখলেন।

রীণা জিজ্ঞেস করল, ওরকম হলো কেন ?

ডাক্তার রুদ্র বললেন, ও কিছু নয়।

গাড়িতে ওঠার সময়ে ডাঃ রুদ্র জিজ্ঞেস করলেন, ওর কি পেটের অসুখ কিংবা বমি হয়েছিল ?

সঞ্জয় বলল, বিকেলেও এরকম দেখিনি।

আচ্ছা, লক্ষ্য রেখো। আমায় জানিও। ডাক্তার রুদ্রের গাড়ি কম্পাউন্ড ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সঞ্জয় ওপরে উঠতে লাগল। তাকে কেমন চিন্তাচ্ছন্ন মনে হচ্ছিল। হঠাৎ চোখ বসে যাওয়াটা কেমন যেন অস্বাভাবিক।

॥ সতেরো ॥

সংকেত

বৃহস্পতিবার। বেলা তখন তিনটে।

সঞ্জয় একটু আগে রাউন্ড দিয়ে নিজের চেম্বারে এসে বসেছে। হঠাৎ টেলিফোন। সঞ্জয় রিসিভারটা তুলে নিল।

—হ্যালো !

ওপার থেকে ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনা গেল—ডাঃ গুপ্ত ? আমি বন্দনার মা—



—কী ব্যাপার ?

—আপনি শিগগির চলে আসুন। আপনার স্ত্রী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

—এখনি যাচ্ছি। বলে ফোন রেখে সঞ্জয় বেরিয়ে পড়ল।

কম্পাউন্ডে ঢুকে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে সঞ্জয় প্রায় দৌড়ে তিনতলায় উঠল। দেখল বিছানায় শুয়ে আছে রীণা। মুখটা একেবারে সাদা। মাথার কাছে বসে আছেন বন্দনার মা। পুপুকে কোলে নিয়ে ঘুরছে বন্দনা।

রীণার জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু তাকাচ্ছে না। তাকাতে গেলেই কষ্ট হচ্ছে। সঞ্জয় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইল। একবার ডাঃ রুদ্রকে ফোন করার চেষ্টা করল। লাইন পেল না।

বিকেলের দিকে রীণা একটু একটু কথা বলল। কিন্তু কেন যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে তা বলতে পারল না।

—আজও কিছু দেখেছিলে নাকি ?

রীণা অতিকষ্টে বলল, মনে নেই। ভাবতে গেলেই সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

—আচ্ছা, তুমি ঘুমোও।

বলামাত্রই রীণা অতি ধীরে পাশ ফিরে শুলো।

সঞ্জয় আবার ডাক্তার রুদ্রকে ফোন করল। এবারে পেয়ে গেল। ডাঃ রুদ্র সব শুনলেন। একটি কথাও বললেন না। শুধু বললেন,—যাচ্ছি।

সন্দের সময়ে ডাঃ রুদ্র এলেন। রুগীকে দেখে মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। সঞ্জয়ের তা লক্ষ্য এড়ালো না। তবু জিগ্যেস করল, কিরকম বুঝছেন ?

—বিশেষ ভালো না।

একটু থেমে বললেন, আমি তো তোমাকে বার বার বাসা বদলাতে বলেছি। এখনি বাসা না পাও, আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে বলেছিলাম। তা তো শুনলে না। জেদ ধরে রইলে। মনে রেখো, আর একদিন পরেই সেই শনিবার।

নিরুপায় সঞ্জয় বলল, এখন যদি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় তো—

ডাঃ রুদ্র মাথা নাড়লেন—না, এ অবস্থায় ওকে আর নিয়ে যাওয়া যাবে না।

ডাঃ রুদ্রের একটা মিটিং ছিল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। বলে গেলেন মিটিঙের পর আবার আসবেন। যাবার সময়ে জিজ্ঞেস করলেন, পুপু কেমন আছে ?

সঞ্জয় অনামনস্কভাবে উত্তর দিল, ভালো।

—চোখ বসটা ?

পুপুকে নিয়ে বন্দনা বাইরে ঘুরছিল। সঞ্জয় ডাকল। বন্দনা পুপুকে নিয়ে এল। ডাঃ রুদ্র পুপুকে ভালো করে দেখলেন।

—চোখটা কিন্তু তেমনি বসে আছে। চোখের কোণে কালো দাগটা যেন আরো prominent হয়েছে। দেখেছ ?

সঞ্জয় নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিল, হ্যাঁ। তবু ও ভালোই আছে। হাসছে খেলছে।  
—কিন্তু চোখের নিচে কালিটা কিসের, ওটা এখনো আমরা ধরতে পারিনি।  
বলতে বলতে তিনি নেমে গেলেন।

॥ আঠারো ॥

শেষ ছোবল

শনিবার।

সেই শনিবার। বিশ্বাস করুক না করুক, তবু একটা অজানা ভয়ে সকাল থেকেই সঞ্জয় যেন বিশেষ চিন্তিত। তার ওপর রীণার শরীর মোটেই ভালো নয়। বিছানা থেকে ওঠার শক্তিকুণ্ড নেই। কেন যে এমন হল সঞ্জয় কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না। তার ওপর কাল রাত্তির থেকে হঠাৎই পুপুর স্বর হয়েছে। এবার শুধু চোখ নয়, বুড়োদের মতো গাল দুটোও বসে গেছে।

সঞ্জয় ক’দিন বেরোচ্ছে না। সকালেই একবার ডাঃ রুদ্রকে ফোন করেছিল। পায়নি। একটু আগে ফের ফোন করল। এবার পেল। ডাঃ রুদ্র বললেন, সন্ধ্যের সময়ে যাচ্ছি। আর দ্যাখো, আজ যে শনিবার এটা রীণাকে জানিও না।

শেষ বিকেল।

পশ্চিমের জানলা দিয়ে একফালি রোদ দেওয়ালে এসে পড়েছে। কেমন যেন ফ্যাকাশে রোদ। এ যেন এক মন-খারাপ-করা বিকেল। এরকম সময়ে অন্যদিন সে বাড়ি থাকে না। তাই নির্জন ঘরে শীতের বিকেল যে এমন ভারাক্রান্ত হয় সঞ্জয় তা জানত না। এই-সব বিকেলে বেচারি রীণা কি করে যে একা থাকে তাই ভেবে সঞ্জয় আজ বিচলিত হল।

রীণার বিছানার কাছে একটা চেয়ারে বসে সিগারেট খাচ্ছিল। তাবনাটা এবার অন্যদিকে মোড় নিল। আজ রাত্তিরে যদি সত্যিই তেমন-কিছু ঘটে তা হলে সাবধানতার জন্যে যা যা ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করেছে তা যথেষ্ট কি না আর একবার যাচাই করে দেখতে চাইল।

নিজের ছোটো টর্চ ছাড়াও নতুন একটা বড়ো টর্চ কিনে রেখেছে। ছোটো বড়ো দুটো টর্চেই নতুন ব্যাটারি। রুগীর হার্ট ঠিক রাখার মতো প্রয়োজনীয় ওষুধ মজুত রেখেছে। ঘরে কুঁজো-ভর্তি খাবার জল, চা, কফি, দুধ, এক টিন বিস্কুট—তাছাড়া এক বোতল ব্রান্ডি—রাত জাগার জন্যে এসবেরই দরকার। সব কিছুই ব্যবস্থা হয়ে আছে।

সারা রাত তাকে একাই জেগে থাকতে হবে। একবার ভেবেছিল বন্দনার মা-বাবাকে ডাকবে। কিন্তু ভেবে দেখল, কি জন্যে ডাকবে? তাঁদের তো বলা যাবে না যে, আজ রাত্রে অশরীরী হানা দেবে তার ঘরে।

একমাত্র রীণার কিছুটা বাড়াবাড়ি হওয়া ছাড়া আর যে কিছুই ঘটবে না সঞ্জয়

সে সম্বন্ধে নিশ্চিত। কেন না সে জানে ঘরে লোক জেগে থাকলে তেমন-কিছু হয় না।

সঞ্জয় ঘড়ি দেখল। ছ'টা বাজে। পুপুকে ওষুধ খাওয়ালো। কেন কে জানে, ও আজ বড় ঘুমোচ্ছে। এবার রীণাকে দুধ খাওয়াতে হবে। ও তো কিছুই খেতে চাইছে না। শুধু চোখ বুজিয়ে পড়ে আছে। তবু গরম দুধ একটু না খাওয়ালেই নয়।

সঞ্জয় উঠে দুধ গরম করতে গেল।

একটু পরেই রীণার ক্ষীণ ব্যাকুল স্বর শোনা গেল।

—তুমি কোথায় ?

—এই যে দুধ গরম করছি।

—শুনে যাও।

—যাচ্ছি।

হিটার থেকে দুধের সস্প্যানটা নামিয়ে রেখে সঞ্জয় রীণার কাছে গেল। দেখল রীণা চারিদিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছে।

—কি হল ?

—কিছু না। তুমি আমার কাছে বোসো।

—দুধটা আনি ?

—পরে এনো। তুমি এখন বোসো।

—দুধ জুড়িয়ে যাবে। ফের গরম করতে হবে। বলে সঞ্জয় বসল।

—দ্যাখো, আমি যেন কিছুই ভালো করে মনে করতে পারছি না। সব যেন কেমন ঘুলিয়ে যাচ্ছে।

—কিরকম ? রীণার হাতটা সঞ্জয় তুলে নিল নিজের হাতে। একটু চমকালো। হাত দুটো ঠাণ্ডা।

—মনে হচ্ছে আমি যেন কত যুগ ধরে ঘুমোছি। কখনো মনে হচ্ছে আমি যেন আর এই পৃথিবীতে নেই। ক-ত দূরে চলে গেছি। তারপরেই বুঝতে পারছি—না, কোথাও তো যাইনি। এই তো আমার ঘর—এই তো আমার বিছানা—এই তো পুপু সোনা—পুপু কোথায় ?

—বন্দনা নিয়ে গেছে।

রীণা একটু থামল। তারপর চোখ দুটো বড় বড় করে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, আচ্ছা, সেই লোকটা কি আর এসেছিল ?

—কোন লোকটা ?

—সেই যে ম্যাজিসিয়ানের মতো দেখতে। কালো প্যান্ট-কোট—কালো টুপি—

—না তো, কোনো লোকই আসেনি। একটু হেসে আবার বলল, তাঁকে দেখার সৌভাগ্য তো আমাদের হয় না। উনি কেবল তোমাকেই দেখা দেন।

—হ্যাঁ। আমাকেই যে তার দরকার। কি দরকার গো বলো না।

রীণা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সঞ্জয়ের চোখের দিকে।

—উঃ! কী সাংঘাতিক গেছে সেদিনের সেই বিকেলটা। আমি পুপুকে কোলে নিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। হঠাৎ দেখি ঘরের মধ্যে কী যেন ঘুরছে তো ঘুরছেই। ধোঁওয়া—শুধু ধোঁওয়া....

বলতে বলতে রীণা হঠাৎ ছিটকে উঠে বসল। দ্রুত নিশ্বাসে তার বুক ওঠা-পড়া করতে লাগল। দু'চোখে ভয়ের কালো ছায়া।

—কি হল? অমন করে উঠে বসলে কেন?

—আজ—আজ সেই শনিবার না?

—শনিবার! না, না, শনিবার তো কাল গেছে। আজ রবিবার।

রীণা প্রবলভাবে মাথা নাড়ল। কক্ষণো না। আজই শনিবার।

সঞ্জয় হাসল—পাগল! শনিবার হলে আমি বাড়ি থাকি?

রীণার তবু যেন বিশ্বাস হল না। এদিক ওদিক তাকাল।

—এখানে যে ক্যালেন্ডারটা ছিল?

—পেরেকটা খসে গেছে। ওঘরে টাঙিয়ে রেখেছি।

রীণা আর বসে থাকতে পারল না। শুয়ে পড়ল।

—কী জানি, আমার মনে হচ্ছে তুমি আমায় লুকোচ্ছ।

—শুধু শুধু লুকোব কেন?

—আর ভাবতে পারছি না। বলে পাশ ফিরে শুলো। একটু পরে পাশ ফিরেই বলল, সন্ধে হয়েছে?

—না।

—তবু আলোটা জ্বলে দাও। একটু অন্ধকার হলেই ভয় করে।

সঞ্জয় আলো জ্বলে দিল। রীণার চোখদুটো হঠাৎ ঝকঝক করে উঠল।

—এবার তোমার দুধ গরম করে আনি?

—পুপু খেয়েছে?

—হ্যাঁ। বন্দনাই দুধ খাইয়ে নিয়ে গেছে।

—মনে হচ্ছে ছেলেটাকে যেন কত দিন দেখিনি। ওকে একবার নিয়ে এসো না।

—আগে তুমি দুধ খেয়ে নাও। তারপরে আনব।

সঞ্জয় উঠে দুধ আনতে যাচ্ছিল রীণা আবার ডাকল, তুমি বলছ আজ রবিবার?

—হ্যাঁ। কতবার বলব?

—শনিবারের সেই ফাঁড়া তাহলে কেটে গেছে?

সঞ্জয় ধমক দিয়ে বলল—ফাঁড়া আবার কি? কিছুই হয়নি। সবই মনের ভুল।

রীণা হঠাৎ আবার উঠে বসার চেষ্টা করল।

—শোনো শোনো বলে দুহাত বাড়িয়ে সঞ্জয়ের হাত দুটো চেপে ধরল—আচ্ছা, মিস থাম্পি যেমন সেই প্রফেসারকে হিপনোটাইজ করেছিল তেমনি আমাকেও কেউ করছে না তো?

—হিপনোটাইজ! শুধু শুধু তোমায় কেউ হিপনোটাইজ করবে কেন? তাছাড়া ওসব গালগল্প। বলে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দুখ আনতে গেল।

সন্ধের একটু পরে ডাঃ রুদ্র এলেন। মস্‌মস্‌ করে ঢুকলেন রীণার ঘরে।

—কেমন আছ?

—ভালো—নয়। মোটেই ভালো নয়। তবু আপনাকে দেখলে যেন ভরসা পাই।

ডাক্তার রুদ্র একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। তারপর রীণার হাতটা টেনে নিলেন।

লেপের বাইরে হাত রেখে শুয়েছিলে বুঝি?

রীণা বলল, কী জানি। খেয়াল নেই।

ডাক্তার রুদ্র প্রেসার মাপতে লাগলেন। এক বার—দু বার তিন বার। সঞ্জয় ঝুঁকে পড়ল।

—কত? রীণা জিজ্ঞেস করল।

—ঠিক আছে।

রীণা সঞ্জয়কে বলল, ওঁকে কফি দাও।

ডাঃ রুদ্র বললেন, আজ অনেকবার চা-কফি হয়েছে। আর নয়। বরঞ্চ রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করো। বলে রীণার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

রীণা উৎফুল্ল হয়ে বলল, আপনি রাত্তিরে এখানে থাকেন? কী সৌভাগ্য! কিন্তু আমি তো রান্না করে খাওয়াতে পারব না।

কথার শেষে হতাশ ভাব ফুটে উঠল রীণার মুখে।

—ঠিক আছে। তুমি সুস্থ হয়ে উঠলে আবার একদিন না হয় খাব।

রীণা ম্লান হাসল। —মনে রাখবেন কিন্তু।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। বলে ডাঃ রুদ্র চুরুট ধরালেন।

নটা বাজল।

ডাঃ রুদ্র নিচু গলায় বললেন, খুব ভাগ্য এক চাক্ষুশ আমার বাড়ির লাইন পেয়ে গেলে। নইলে বাড়ি ফিরব না এই খবরটুকু দেবার জন্যে আবার বাড়ি ছুটতে হত।

সঞ্জয় কিছু বলল না। অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবছিল।

—কি হল? অমন করে রয়েছ যে?

—ওর অবস্থা কি খুবই খারাপ?

—খারাপ বলব না। তুমি নিজে ডাক্তার। প্রেসার তো দেখলে। ফল্‌ করছে। তাই ভাবলাম রাত্তিরে যদি আরো কিছু হয় তুমি একা নার্ভাস হয়ে পড়বে। সেজন্যেই থেকে গেলাম। তাছাড়া বলা যায় না যদি আজ রাত্রে ও কিছু দেখেটেখে? দুর্বল শরীর—

পাশের ঘর থেকে রীণা ডাকল—একবার আসবে ?

সঞ্জয় তাড়াতাড়ি উঠে গেল।

মুদু আলো জ্বলছে। ধবধবে বিছানায় গলা পর্যন্ত সাদা ওয়াড় পরানো লেপ ঢাকা দিয়ে রীণা শুয়ে আছে। সঞ্জয় কাছে আসতেই রীণা তাকালো—

—কি বলছ ?

—উনি খেয়েছেন তো ?

—হ্যাঁ।

—কিই বা খেলেন ! ভারি লজ্জা করছে আমার।

—লজ্জার কি ! তুমি সেরে উঠলে ভালো করে খাওয়াব।

রীণা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না—উনি রাত্তিরে এখানে থাকবেন কেন ? সত্যি বলো আমার অবস্থা কি খারাপের দিকে যাচ্ছে ?

সঞ্জয় হেসে উঠল। আরে না—না। আগের চেয়ে অনেক ভালো আছ।

—তা হলে উনি থাকছেন কেন ?

—এমনিই। বললেন, বাড়িতে কেউ নেই। বাড়ি যেতে আর ইচ্ছে করছে না।

রীণা অবিশ্বাসের সুরে বলল, বাড়িতে কেউ না থাকলে লোকে কি বাইরে রাত কাটায় ? ডাক্তারের বাড়ি বলে তো চোর-ডাকাতে খাতির করবে না।

সঞ্জয় হাই তুলে বলল, তা হয়তো ঠিক। তবে এও ওঁর একটা খেয়াল। হয়তো স্টকে নতুন কোনো গল্প জমেছে। রাত জেগে শোনাবেন।

কথাটা রীণার মনে ধরল না। বলল, আমার ধারণা—নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে উনি এখানে থাকতে চাইছেন।

রীণা একটু চুপ করল। সঞ্জয় কিছু বলার আগেই বলল, আমার মনে হয় আজই শনিবার। সত্যি করে বলো না গো !

—দূর ! তোমার কেবল সেই এক কথা—শনিবার—শনিবার—সাড়ে নটা বাজল। একটু ঘুমোও তো।

—এত তাড়াতাড়ি ঘুমোব ? যদি মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় ?

—ভাঙবে না। তুমি ঘুমোও।

রীণা ঘুমোবার জন্যে পাশ ফিরল। তারপরেই জিজ্ঞেস করল, পুপু কি করছে ?

—ঘুমোচ্ছে।

—মশারি টাঙিয়ে দিয়েছ তো ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোমার কোনো চিন্তা নেই। এবার তুমি একটু ঘুমোও।

বলে সঞ্জয় তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে চলে এল।

রাত সাড়ে দশটা।

বাইরের ঘরে সঞ্জয় আর ডাক্তার রুদ্র। ডিভানের ওপরে ডাক্তার রুদ্র ব্যাগ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছেন। মাটিতে শুয়েছে সঞ্জয়।

ডাক্তার রুদ্র জিজ্ঞেস করলেন, কী ভাবছ? তুমি অবশ্য আমার সামনে স্বচ্ছন্দে স্মোক করতে পার।

সঞ্জয় সে কথায় সাড়া না দিয়ে বলল, ও তো বেশ সামলে উঠেছিল। হঠাৎ এমন হল কেন?

ডাঃ রুদ্র বললেন, আমি তো তোমায় বলেছি এবাড়ি না ছাড়লে ও কখনো একেবারে সুস্থ হবে না। পুপুও ভালো নেই। কেমন Pale হয়ে যাচ্ছে। কেন?

সঞ্জয়ের বুকটা কঁপে উঠল। উত্তর দিতে পারল না।

—সত্যি হোক মিথ্যে হোক এবাড়ির সঙ্গে ওর মানসিকতার সম্পর্ক এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে ওর subconscious মনে সবসময় একটা আতঙ্ক দানা বেঁধে রয়েছে। তার থেকে ওর নিষ্কৃতি নেই। ওষুধ দিয়ে ওকে আর সুস্থ করা যাবে না।

—আমি ভাবছি, এত দুর্বল হয়ে পড়ল কেন? সঙ্কের সময়ে বলছিল—কিছুই মনে করতে পারছে না। সব যেন খেই হারিয়ে ফেলেছে।

ডাঃ রুদ্র বললেন, শুধু শরীর নয়, মনও অসুস্থ হলে দুর্বল হয়ে পড়বেই।

একটু থেমে বললেন, আচ্ছা, আজ যে শনিবার ও জানে না তো?

সঞ্জয় বলল, না। তবে আজই শনিবার কিনা বার বার জিজ্ঞেস করছিল। ক্যালেন্ডার দেখতে চাইছিল। আমি আগেই সরিয়ে রেখেছিলাম।

ডাঃ রুদ্র বললেন, ভালো করেছ। ও যদি জানতে পারে আজ সেই শনিবার তাহলে একেবারে ভেঙে পড়বে।

—কিন্তু ক্যালেন্ডার সরিয়ে রেখেও নিস্তার নেই। আমায় অনেক জেরা করল।

—কিরকম?

—জানতে চাইল আপনি রাত্তিরে হঠাৎ এখানে থাকছেন কেন? বললাম—কাকীমা এখানে নেই—বাড়ি খালি। তাই যেতে চাইলেন না। ও বিশ্বাস করল না। ওর ধারণা—হয় ওর অবস্থা ভালো নয়, না হয় নিশ্চয় আজ সেই শনিবার বলে আপনি রাতে এখানে থাকছেন।

ডাক্তার রুদ্র গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, এসব চিন্তা ওর মাথায় ঢুকলে তো মুশকিলের কথা।

সঞ্জয়ের মুখটা শুকিয়ে গেল।—মুশকিল কেন বলছেন?

—জান তো ওর হাট কিরকম দুর্বল। প্রেসারও অনেক কম। তার ওপর যদি হঠাৎ ও ভয় পায়—

সঞ্জয় ব্যাকুল হয়ে বলল, তাহলে—

—আমরা তো ওর পাশেই রয়েছি। সব রকম ব্যবস্থাই করে রেখেছ। দেখা যাক।

ঘড়িতে এগরোটা বাজল।

ডাক্তার রুদ্র টেবিল-লাইট জ্বলে একটা বই পড়ছিলেন। বইটা মুড়ে রেখে বললেন, যদি আজ রাত্রে সতিই কেউ আসে তাহলে হাতে অন্তত ঘণ্টা তিনেক সময়।

সঞ্জয় মাটিতে মশারি টাঙিয়ে পুপুকে নিয়ে শুয়েছিল। বলল, ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নেবেন ভাবছেন?

—না, এখনই ঘুমনো নয়। আগে রীণার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। বলে ব্যাগটা নিয়ে ডাক্তার রুদ্র ভেতরে গেলেন।

মিনিট দশেক পরে বাইরে এসে বসলেন। সঞ্জয়কে বললেন, একটা ইনজেকশান দিলাম। গভীর ঘুমের মধ্যে থাকুক। তেমন কিছু ঘটলেও জানতে পারবে না।

বারোটা বাজল।

ডাক্তার রুদ্র বইটা মুড়ে চেয়ারের ওপর রাখলেন। টেবিল থেকে প্রেসার মাপার যন্ত্রটা নিয়ে রীণার ঘরে ঢুকলেন।

পুপু উসখুসু করছিল। পিঠ চাপড়ে ওকে আবার ঘুম পাড়িয়ে সঞ্জয় যখন বিছানা থেকে বেরিয়ে এল ডাঃ রুদ্র তখন রীণাকে পরীক্ষা করে ফিরে এসেছেন।

—কেমন দেখলেন?

—একই রকম। তবে ঘুমোচ্ছে। আচ্ছা, এবার তুমি ওর ঘরের আলোটা নিভিয়ে দাও।

—একেবারেই নিভিয়ে দেব, না নীল বাল্বটা—

—না, একেবারে অন্ধকার করে দাও।

সঞ্জয় একটু অবাক হল। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করল না। আলো নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল।

—এবার চলো আমরা বাইরে গিয়ে বসি।

—বাইরে? কেন?

—শোনো সঞ্জয়, আজ যখন রাত্তিরটা এখানে থেকেই গেলাম তখন একটু বিশেষ করে লক্ষ্য করতে চাই, সতিই কিছু ঘটে কি না!

এত মানসিক দৃষ্টিস্তার মধ্যেও সঞ্জয় একটু হাসল। বলল, কিছু ঘটলেও তো আপনি আমি দেখতে পাব না।

—কি করে জানছ? এর আগে যখনই ঘটনা ঘটেছে তখন তোমরা ঘুমোও। জেগে থাকলে হয়তো কিছু দেখতে না পাও, বুঝতে পারতে।

সঞ্জয় আবার হাসল।—তার জন্যে আমরা রীণাকে, পুপুকে একলা ফেলে বাইরে যাব? সেটা কি উচিত হবে?

—হ্যাঁ, এ ঘরটাও খালি রাখতে হবে।

—এই শীতে আমরা বাইরে কোথায় বসব?



—ব্যালকনিতে, ঐখানেই আমরা বসব। বলে নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বাইরে চলে এলেন। অগত্যা সঞ্জয়কেও আর একটা চেয়ার নিয়ে বসতে হল।

—যাক, সিঁড়ি থেকে রীণার ঘর পর্যন্ত সব ফাঁকা। ডাঃ রুদ্র যেন বেশ খুশি হলেন।

—আপনি কি ভেবে রেখেছেন তিনি এলে আমরা সিঁড়ির মুখেই জাপটে ধরব?

সঞ্জয়ের বলার ভঙ্গিটা বিদ্রূপের মতো শোনাল।

—না, তা নয়। spirit যাতে বিনা বাধায় রীণার কাছে যেতে পারে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

সঞ্জয় গরম চাদরে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে বলল, spirit যদি সত্যি আসতে চায় সে কি কোনো বাধা মানবে? রীণা যখন তাকে দেখেছিল ঘরের দরজা কি ভেতর থেকে বন্ধ ছিল না?

রুদ্র বললেন, সে বাধা অন্য। আমি বলছি ঘরের মধ্যে একাধিক লোক জেগে বসে থাকলে স্পিরিট কিছুতেই আসে না। আমার মনে হয়, মানুষ যেমন প্রেতের ভয় পায়—প্রেতরাও তেমনি মানুষকে ভয় পায়। দুর্বল একাকী মানুষই তাই প্রেতের শিকার হয়। যাক, টচটা নিয়েছ তো?

—হ্যাঁ। বলে বড়ো টচটা রুদ্রের হাতে দিল।

কয়েক মিনিট দুজনেই চুপচাপ। ডাঃ রুদ্র একটা চুরুট ধরালেন। বললেন, এখনকার মতো একটা চুরুট খেয়ে নিই। এরপর আর খাওয়া যাবে না। চুরুটের আগুন এমনকি গন্ধও হয়তো স্পিরিটের আসার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

—আচ্ছা, spirit-এর আসার জন্যে আমরা ব্যাকুলই বা হচ্ছি কেন? সে তো আমাদের আনন্দদান করতে আসবে না।

ডাঃ রুদ্র বললেন, spirit যদি সত্যিই তার কথা রাখে তা হলে যা ঘটবার তা আজই ঘটে যাক। নইলে তো আবার অনিশ্চিত্তে আর একটা দিনের অপেক্ষা করতে হবে।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ ঘরের ভেতরে মনে হল রীণা জেগে উঠেছে।

ও কি ডাকছে? সঞ্জয় গায়ের ব্যাগ ফেলে রেখে ছুটল। পিছনে ডাক্তার রুদ্র।

সঞ্জয় আলো জ্বালল। দেখল রীণা উস্খুস্ করছে আর মুখে অস্বস্তির একরকম শব্দ। লেপটা মাটিতে পড়ে গেছে।

সঞ্জয় লেপটা তুলে ভালো করে গায়ে ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণ রীণার কাছে বসে রইল।

—এবার এসো।

সঞ্জয় উঠে এল।

—আলোটা নিভেও।

অগত্যা সঞ্জয়কে আলো নিভিয়ে দিতে হল। বাইরের ঘরে এসে মশারির মধ্যে টচ ফেলে একবার পুপুকে দেখে নিল সঞ্জয়। না, পুপু নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। দু'জনে আবার বসল।

নিশ্চিন্তি নীতের রাত থমথম করছে। পরিষ্কার নীল আকাশের গায়ে তারাগুলোর রহস্যময় নিঃশব্দ হাসি।

সঞ্জয় বলল, আমি এখনো এসব বিশ্বাস করি না। সত্যি কথা বলতে কি খিল অনুভব করলেও জানি না এমন কেন মনে হচ্ছে যে আমরা বড়োই অসহায়। তার ওপর নিরস্ত্র।

ডাক্তার রুদ্র হেসে বললেন, অশরীরীদের মোকাবিলা করতে রিভলভার কোনো কাজে লাগে না—এই টচই একমাত্র অস্ত্র।

আরও কতক্ষণ কেটে গেল। নিচে কারো ঘরে দেওয়াল-ঘড়িতে ঠং করে শব্দ হল। সঞ্জয় চমকে উঠল।—কটা বাজল? একটা না দেড়টা?

—দেড়টা। বলে ডাক্তার রুদ্র হাতের আড়াল দিয়ে আলগা করে টচের বোতাম টিপে রিস্টওয়াচটা দেখে নিলেন।

—দেড়টা! তা হলে একটা বাজল কখন?

ডাক্তার রুদ্র বললেন, তুমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলে।

সঞ্জয় লম্বা আলিসিয়া ভাঙল।

—সত্যি আমি আর পারছি না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। শুধু শুধু—

সঞ্জয় কথা আর শেষ করল না।

ডাক্তার রুদ্র গভীর স্বরে বললেন, হোক শুধু শুধু। এছাড়া উপায়ও ছিল না। আজ এই শনিবারের রাত্রিটা ছিল রীণার পক্ষে মারাত্মক। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে রীণার এতক্ষণ কী হত বলতে পারি না।

—তা হলে আপনি বলছেন, আমরা পাহারা দিচ্ছি বলে আজ আর কিছু হবে না?

—না হওয়াই স্বাভাবিক। যদি হয়ও মারাত্মক কিছু হবার আগেই আমরা গিয়ে পড়ব।

এমনি সময়ে দূরে বড়ো রাস্তায় একটা খ্যানখেনে বিকৃত গলার চিংকার শোনা গেল।

ডাক্তার রুদ্র চমকে উঠলেন।

সঞ্জয় হেসে বলল, ও কিছু নয়। একটা মাতাল যাচ্ছে। রোজই এই সময়ে যায়।

বলে ব্যালকনির ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

ডাক্তার রুদ্র হেসে বললেন, কি দেখছ? রাতের কলকাতার শোভা?

সঞ্জয় বলল, না। মাতালটার গলা শুনেছি, দেখিনি কখনো। তাই—

—দেখতে পেলো ?

—হ্যাঁ, ঐ যে যাচ্ছে—ঠিক যেন একটা ছায়ামূর্তি।

মাতালটা চলে গেল। সঞ্জয় তবু দাঁড়িয়ে রইল।

নিশ্চল রাত। বাড়ির পিছনে কম্পাউন্ডের গায়ে বনঝোপের মধ্যে রাতকানা একটা পাখির পাখা ঝাপটানো। ও দিকে যশোর রোডের মসৃণ দেহের ওপর দিয়ে গর্জন করতে করতে মাঝেমাঝে ছুটছে লরি। স্ট্রীট-লাইটের আলোয় ঝলমল করছে রাস্তাটা।

গোটা বাড়িটা গভীর রাতে একটা রহস্যপুরীর মতো দাঁড়িয়ে। কত নিশ্চিন্তে নিচের তলায় মহিষাবাবু, অমৃতবাবুরা ঘুমোচ্ছেন। দোতলার ঘরে উদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরীটি কি কোনো সুখস্বপ্ন দেখছে ?

—আচ্ছা সঞ্জয়, বাড়িটার ওপর ওরকম মধ্যযুগীয় গম্বুজটা কেন ভেবেছ কখনো ?

—না। ও আর ভাবব কি ? বাড়িওয়ালার শখ।

সঞ্জয় চেয়ারে বসল।

—কিন্তু কোন যুগের মানুষের এইরকম শখ ছিল ?

—তা বলতে পারব না।

—সঠিক বলতে না পারলেও অনুমান করা যায় এ তল্লাটে এত পুরনো বাড়ি আর নেই। যদিও পরে অনেক অলটারেশান হয়েছে।

—হ্যাঁ, তা হয়েছে। তবে তিন তলাটা এখনো ইনকমপ্লিট। আর সিঁড়িটা—

সঞ্জয় প্রচণ্ড জোরে নিজের গালে একটা চড় মেরে বলে উঠল—উঃ! মশায় অস্থির করে দিল। এ অঞ্চলের মশা! এদের কামড়ই আলাদা।

—আচ্ছা, মিস থাম্পি বাড়িটা সম্বন্ধে কিছু বলেননি ?

সঞ্জয় ইতস্তত করে বলল, হ্যাঁ বলেছেন। তাঁর মতে এখানে কিছু আছে।

—উনি এ কথা বলেছেন ?

সঞ্জয় হাই তুলে হালকা মেজাজে বলল, হ্যাঁ, উনি যেখানেই যান সেখানেই কিছুর সন্ধান পান বোধ হয়। মাস্তুর এক বাস্কবীর বাড়ি গিয়েছিলেন। সেখানেও অশরীরী আত্মা দেখেছিলেন।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। তবে এখানে কিছু দেখার ভাগ্য তাঁর হয়নি। বুঝতে পেরেছিলেন।

ডাক্তার রুদ্র চোখ বুজিয়ে কিছু ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ একসময়ে তিনি চমকে উঠলেন।

—কিছু শুনতে পাচ্ছ ? ডাঃ রুদ্রের স্বরটা কেমন চাপা।

—মশার ঐকতান ছাড়া আর তো কিছু শুনছি না।

ডাক্তার রুদ্র চুপ করে রইলেন। সঞ্জয়ও আর কিছু বলল না। জোর করে একটা হাই তুলল।

আরো কিছুক্ষণ কাটল। ডাক্তার রুদ্র হঠাৎ র্যাগটা খুলে ফেললেন।

—কি হল? এই ঠাণ্ডায় র্যাগ খুললেন কেন?

—কেমন একটা গরম হাওয়া বইছে না?

সঞ্জয় চোখ বুজিয়ে নির্লিপ্ত স্বরে বলল, গরম বা ঠাণ্ডা কোনো হাওয়াই তো পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীটা হাওয়াশূন্য হয়ে গেছে।

—কিন্তু, আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

—যা ঘটছে তা শুধু রাত্রিজাগরণ।

ডাক্তার রুদ্র এবার হাই তুললেন। বললেন, তা বটে। আমারও এখন ঘুম পাচ্ছে।

সঞ্জয় ব্যালকনির পাঁচিলে দু পা তুলে চেয়ারে শরীরের আধখানা বিছিয়ে দিয়ে বলল, ঘুমোন তবে। ঘুমেই আরাম ঘুমেই শান্তি। ঘুমের তুল্য জিনিস নেই।

—আশ্চর্য, এত মনের জোর করেও ঘুম আটকাতে পারছি না। এমন কখনো হয় না। কিন্তু ঘুমোলে চলবে না। কটা বাজল? নিজেই যেন নিজেই প্রশ্ন করলেন রুদ্র। সাবধানে টচের আলোয় ঘড়িটা দেখলেন।

—just two, কিন্তু নিচের ঘড়িতে দুটো বাজল না তো?

সঞ্জয় চোখ বুজিয়েই বলল—বোধহয় শুনতে পাইনি।

—কিন্তু—এইটেই সময়। ঠিক দুটোতেই তো—

রুদ্র উঠে দাঁড়ালেন।

—রীণাকে একবার দেখে আসি।

সঞ্জয়ও উঠে পড়ল।

ঠিক সেই সময়ে ঘরের মধ্যে পুপু ককিয়ে কেঁদে উঠল। সেই কান্না শুনে সঞ্জয়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। চিৎকার করে উঠল—কাকাবাবু, শীগগির—

বলে দৌড়ে ঘরের দিকে গেল।

দুটো ঘরই অন্ধকার। সঞ্জয় যখন বসার ঘরের সুইচ হাতড়াচ্ছে ডাক্তার রুদ্র ততক্ষণে ভেতরের ঘরে ঢুকে পড়েছেন।

ঢুকেই তিনি সুইচে হাত দিলেন। আলো জ্বলল না। দেওয়ালে ধাক্কা লেগে টচটা হাত থেকে কোথায় ছিটকে পড়ল।

—লোডশেডিং! সঞ্জয়, টচটা—শীগগির—

সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জয়ের হাতের টচের আলো ঝলকে উঠল। সেই আলো গিয়ে পড়ল রীণার বিছানায়। দেখল রীণার মাথা থেকে পিঠ পর্যন্ত ঝুলছে খাট থেকে। লেপটা পড়ে আছে মাটিতে।

কয়েক মুহূর্ত....

সঞ্জয়ের পা দুখানা যেন মেঝের সঙ্গে আটকে গিয়েছে।

সঞ্জয়ের হাত থেকে টচটা ছিনিয়ে নিয়ে রুদ্র ছুটে গেলেন রীণার কাছে। এক হাতে টচ। অন্য হাতে কোনোরকমে তুলে ধরলেন মাথাটা।

—তাড়াতাড়ি এসো।

সঞ্জয় এগিয়ে এল। ওর হাত দুটো তখন কাঁপছে।

—পা দুটো ধরো। ওদিক থেকে ধরো—don't get nervous.

সঞ্জয় বিছানার ওপর উঠে রীণার পা দুটো ধরল।

—এবার লম্বালম্বিভাবে শোওয়াতে হবে। দাঁড়াও—বালিশটা দিই—উঃ! আলোটাও এই সময়ে গেল! না, আলো তো দেখছি শুধু এ বাড়িতেই গেছে—ও কী! তুমি ওরকম করছ কেন? সরো। বলে ধমকে উঠলেন।

রীণাকে বিছানায় ঠিকমতো শুইয়ে দিয়ে রুদ্র নিজেই লেপটা তুলে রীণার গায়ে দিয়ে দিলেন।

—লঠনটা জ্বালো। কী হল? দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

—ও বোধহয় আর নেই।

—কী যা-তা বকছ! ধমকে উঠলেন রুদ্র। আমার স্টেথস্কোপটা—লঠনটা জ্বালো না।

লঠনটা কোনোরকমে জ্বেলে দিয়ে সঞ্জয় বাইরের ঘরে গিয়ে পুপুর কাছে বসে রইল।

পুপু তখনো ফুলে ফুলে কাঁদছে।

ডাঃ রুদ্র স্টেথস্কোপ নিয়ে ঝুঁকে পড়লেন।

মিনিটের পর মিনিট কাটতে লাগল। রুদ্রানিঃশ্বাসে সঞ্জয় বসে রইল অন্ধকারে।

রীণা কি বেঁচে আছে?

এটুকু বুঝতে কত সময় লাগে? এত দেরি হচ্ছে কেন?

তবু সঞ্জয় উঠে গিয়ে জানতে পারল না রীণা বেঁচে আছে কিনা।

—সঞ্জয়—please help me! ডাক্তার রুদ্র চৌঁচিয়ে উঠলেন।

—আমার ব্যাগটা—

সঞ্জয় একঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে ব্যাগটা নিয়ে ডাক্তার রুদ্রের কাছে গেল।

—কী দেখলেন ডাক্তারবাবু?

—Thank God! হার্ট বিট পাওয়া যাচ্ছে। তোমার ছেলে কি করছে?

—ঘুমিয়েছে।

—যাক, অল্পর ওপর দিয়ে গেছে। সঞ্জয় বিছানায় বসে পড়ে রীণার হাত দুটো কোলের ওপর টেনে নিল।

—হাত যে একেবারে ঠাণ্ডা।

—ও ঠিক হয়ে যাবে। তুমি একটু সেক দাও।

—হসপিটালে নিয়ে যাব?

—না, এখনই দরকার নেই। তেমন বুঝলে আমি বলব। গাড়ি তো রয়েছেই।

উঃ! আর একটু দেরি হলেই শেষ হয়ে যেত।

সকালবেলা।

দু'জনে দু'কাপ গরম কফি নিয়ে বসেছে। দরজায় শব্দ।

সঞ্জয় চমকে উঠল। এত সকালে কে? তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিল।  
দেখল মাস্ত আর ললিতবাবু শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে।

—কি ব্যাপার?

—সকালেই চলে এলাম। মিস থাম্পি টেলিগ্রাম করেছিলেন। টেলিগ্রামটা পেতে  
একদিন দেরি হয়েছে। বলে টেলিগ্রামটা সঞ্জয়ের হাতে দিল।

টেলিগ্রামের বক্তব্য—যে কোনো প্রকারে আজকেই মিসেস গুপ্তকে আপনাদের  
কাছে এনে রাখুন। জীবন বিপন্ন।

সঞ্জয় টেলিগ্রামটা ললিতবাবুর হাতে ফেরত দিয়ে বলল, ভেতরে আসুন।

## দ্বিতীয় পর্ব

॥ এক ॥

### ডাঃ রুদ্রের ছবিপ্রীতি

মাস তিনেক পর।

অনেক চেষ্টায় মানিকতলার কাছে ওরা দু'খানা ঘর পেয়েছে। মাস্তদের বাড়িতে কিছুদিন থেকে এখন ওরা এই নতুন বাড়িতে এসেছে।

এখানে এসে ওরা নিশ্চিত। রীণা সম্পূর্ণ সুস্থ। ভয়টয় আর পায় না। শুধু তাই নয়, রীণার এখন মনে হয়— যা-সব এতদিন ঘটেছে সব যেন স্বপ্ন। সে বিশ্বাসই করতে পারে না কোনোদিন তার ওপর অশরীরী আক্রমণ হত। পুণ্ডুও সুস্থ আছে। হাসিখুশি প্রাণচঞ্চল শিশু।

শুধু সঞ্জয় মাঝে মাঝে ভাবে—শেষ পর্যন্ত অলৌকিক কিছুর কাছে তাকেও আত্মসমর্পণ করতে হল! হ্যাঁ, আত্মসমর্পণ বইকি। বাড়ি তো বদলাতে হল!

তখনই অবশ্য অন্য যুক্তি দাঁড় করায়—পুপুর শরীর ওখানে টিকছিল না। অন্তত ওর দিকে তাকিয়েও তাকে বাড়ি বদলাতে হত। তাছাড়া নিচের তলার ভাড়াটীদের সঙ্গে বেশিদিন আর মানিয়ে চলতে পারত না। কেবল রীণার দুঃখ বন্দনাদের জন্যে। বন্দনার মাকে ওর খুব ভালো লেগেছিল। অবশ্য এর মধ্যেই বন্দনারা দু'বার ঘুরে গেছে। মাস্ত তো প্রায়ই আসে। বলে—এবার অনেকটা কাছে হয়েছে।

রীণা হাসে।—কই আর কাছে? কোথায় মানিকতলা আর কোথায় হাওড়ার ক্ষীরোদতলা!

মাস্ত বলে, তবু তো যশোর রোড থেকে কাছে।

ডাক্তার রুদ্র প্রায় আসেন। সব মিলিয়ে রীণা এখন বেশ ভালোই আছে।

জুলাই মাস।

একদিন বিকেলে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। ডাক্তার রুদ্র এসেছেন। সঞ্জয়ও রয়েছে। গরম সিঙ্গাড়া আর কফির পেয়ালা সামনে নিয়ে আসার বেশ জমেছে রীণাদের বসার ঘরে।

ডাক্তার রুদ্র কথায় কথায় বললেন, আচ্ছা, সেই ছবিটার কি হল?

—কোন ছবি?

—সেই যে বুড়ো ভদ্রলোকের—যেটা হারিয়ে গেল।

—ওঃ! শিবানন্দ ভট্টাচার্যর?

ডাক্তার রুদ্র মাথা দোলালেন।

—এখানে আসার পর তাঁর কাছে গিয়েছিলে নাকি?

সঞ্জয় বলল, না। যাওয়া হয়নি।

—একেবারে ছেড়ে দিলে ?

সঞ্জয় হাসল—আপনার দেখছি বেশ আগ্রহ রয়েছে।

—তা রয়েছে। রহস্যটা কি জানতে না পারা পর্যন্ত কৌতূহল মিটেছে না।

রুদ্র একটু থামলেন। তারপর বললেন, কয়েকটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ? প্রথমত আত্মার আবির্ভাব হত শুধু তিনতলার ঘরেই। এতদিন ধরে এত কাণ্ড হয়ে গেল কিন্তু বাড়ির একতলা-দোতলায় সবাই নিশ্চিন্ত। তাদের গায়ে আঁচটুকুও লাগেনি।

দ্বিতীয়, আক্রমণ শুধু রীণার ওপরেই। রীণা ছাড়া আর কাউকে দেখা দিত না।

—দেখা দিত না, না রীণা ছাড়া আর কেউ দেখতে পেত না? কথার মাঝখানে সঞ্জয় মন্তব্য করল।

—That's also the point. দেখা দেওয়া আর দেখা পাওয়া এই ব্যাপারটার সমাধান হলে আশা করি অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এই বলে ডাঃ রুদ্র চুপ করে ভাবতে লাগলেন।

সঞ্জয় বলল, কিন্তু আপনি কি মনে করেন শিবানন্দর কাছে গেলেই রহস্যের সমাধান হবে ?

ডাক্তার রুদ্র খুতনিতে হাত বুলিয়ে একটু ভেবে বললেন, সমাধান হবেই এ কথা জোর করে বলতে পারি না। অলৌকিকতার রহস্য কখনো ভেদ করা যায় না। তবে তুমি বলছিলে না বৃদ্ধটি কলকাতার অনেক পুরনো বাড়ির ইতিহাস জানেন ?

—হ্যাঁ, আমার সেই পেশেন্টের বাড়িতে তো তাই শুনেছিলাম।

—তবে চলোই-না একদিন বৃদ্ধের সন্দর্শনে যাই।

—আপনি সত্যিই interested দেখছি!

—Yes, I am. ঠিকানাটা তোমার মনে আছে তো ?

—একেবারে কঠিন। অশরীরী আত্মাটি এখানেই আমার কাছে হেরে গেছেন।

—তবে একটা দিন ঠিক করে ফেলো। দেরি করা উচিত হবে না। বুঝতেই পারছ বৃদ্ধের বয়েস হয়েছে। যে কোনোদিন পৃথিবীর মায়া কাটাতে পারেন।

সঞ্জয় ক্যালেন্ডারের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, সামনের রবিবার হলে আপনার অসুবিধে হবে ?

ডাক্তার রুদ্র ডায়েরিটা খুললেন।

—না, কোনো অসুবিধে নেই। একটা মিটিং আছে সকালে। তা আমরা না হয় বিকেলে যাব।

—তুমিও যাবে নাকি ? সঞ্জয় হেসে রীণাকে জিজ্ঞেস করল।

—গেলে হতো। বৃদ্ধটিকে আমারও দেখবার খুব কৌতূহল হচ্ছে।

ডাক্তার রুদ্র বললেন, তোমার আর গিয়ে কাজ নেই।

দেওয়ালে ঝুলছিল ওদের একটা ছবি। ডাঃ রুদ্র যেন আজই প্রথম ওটা দেখলেন।



—ওটা কি তোমাদের বিয়ের ছবি?

সঞ্জয় হাসল।—হ্যাঁ। এর আগে দেখেননি?

—হয়তো দেখেছি। খেয়াল হয়নি।

তিনি ছবিটার দিকে এগিয়ে গেলেন।

—তোমাদের একটা ছবি রাখতে ইচ্ছে করে।

সঞ্জয় রীণার দিকে তাকিয়ে বলল, বেশ তো নেবেন। আমাদের সম্প্রতি তোলা একটা—

ডাক্তার রুদ্র বাধা দিয়ে বললেন, না না, সম্প্রতি নয়। পুরনো, যত পুরনো হয়। বিশেষ করে রীণারটা।

রীণা অবাক হল।

—পুরনো কেন?

ডাঃ রুদ্র হেসে বললেন, বুঝতে পারছ না কম বয়েসের ছবির আকর্ষণই আলাদা।

সঞ্জয় হো হো করে হেসে উঠল।

—আর এখন বুঝি বুড়ি হয়ে গেছি? রীণা মুখ লাল করে প্রতিবাদ করল।

ডাঃ রুদ্র তাড়াতাড়ি নিজের কথা শুধরে নিয়ে বললেন, না না, সেকথা বলিনি। আমি বলেছি আকর্ষণ—attraction-এর কথা। আমার আজকের ছবির চেয়ে দশ বছর বয়েসের ছবি কি বেশি attractive নয়?

রীণা যেন কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে বলল, কিন্তু সেরকম ছবি কি এখানে আছে? আপনি বরং আমাদের বিয়ের ছবিরই এক কপি নিয়ে যান। বলে উঠে ভেতরে চলে গেল।

॥ দুই ॥

### একশো তিন বছরের সেই বৃদ্ধ

পলেন্সারা-ছাড়ানো দোতলা বাড়িটা। দোতলার জানলায় জানলায় বিবর্ণ পর্দা। পাঁচলিভাঙা ছাদে ফুলগাছের টব।

বেলা চারটে নাগাদ ডাঃ রুদ্র আর সঞ্জয় সেই বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

দরজা খোলাই ছিল। ডাঃ রুদ্র কয়েকবার কড়া নাড়লেন। কিন্তু কারো সাড়া পাওয়া গেল না।

হতাশ হয়ে সঞ্জয় বলল, শুধু শুধুই আসা হল।

—কেন?

—কারো তো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

—ভেতরে ঢুকে দেখা যাক। দরজা যখন খোলা তখন আশা করি অনধিকার-প্রবেশ ঘটবে না।

সঞ্জয়ের ঢোকার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ডাঃ রুদ্র যখন ঢুকে পড়লেন তখন অগত্যা সঞ্জয়কেও ঢুকতে হল। ঘরে ঢুকতেই ধুলোর গন্ধ। সঞ্জয় তাড়াতাড়ি রুমাল বের করে নাকে চাপা দিল। বলল, ঘরে দেখছি ঝাঁটও পড়ে না।

ঘরটা বেশ বড়ো। বৈঠকখানা ঘরের মতো। ঢুকতেই ডান দিকে একটা চৌকি। চৌকির ওপর শতছিন্ন শতরঞ্জি পাতা। শতরঞ্জির প্রায় সর্বত্র দোয়াত-ওঁটানো কালির দাগ। ময়লা ওয়াড়-জড়ানো একটা তাকিয়া দেওয়াল ঘেঁষে পড়ে আছে। ঘরের বাঁ দিকে পাশাপাশি তিনখানা বড়ো আলমারি। মাছাতার আমলের, বইতে ঠাসা। আলমারির বেশির ভাগ কাচই ভাঙা। তবে সবগুলোই তালা লাগানো। যদিও সে তালা বড়ো একটা খোলা হয় না বলেই মনে হয়।

এবার? কারো নাম ধরে ডাকতে হয়। কিন্তু কার নাম ধরে ডাকবে? ভট্টাচার্যমশাই আছেন? একশো তিন বছর বয়েসের বৃদ্ধকে হাঁক দিয়ে ডাকা শোভন নয়। ‘বাবু’ বলেও সম্বোধন করা যায় না।

অস্বস্তির ব্যাপার আরো ছিল। কপিলেশ্বরবাবু বলে দিয়েছিলেন ভট্টাচার্যমশাইয়ের মেজাজ খারাপ। হয়তো দেখাই করবেন না। তখন যেন ছবিটা দেখানো হয়। ছবির নিচে প্রেরকের নাম দেখলেই তিনি খুশি হবেন। কিন্তু সে ছবি তো হারিয়ে গেল। তাহলে?

সঞ্জয়ের ইচ্ছে ছিল না। তবু চৌকির ওপর বসতে হল। আর একবার ঘরটা ভালো করে দেখল। দেওয়ালে তিনটে বড়ো বড়ো ছবি। বহু পুরনো। সম্ভবত শিবানন্দ ভট্টাচার্যের নিকট আত্মীয়দের। ফ্রেমের মধ্যে তিন জনেরই নাম আর জন্ম-মৃত্যুর সাল তারিখ লেখা আছে। কিন্তু অত উঁচুতে টাঙানো বলে পড়া গেল না।

ওদিকের দেওয়ালে ঝুলছে পুরনো কলকাতার একটা ম্যাপ। ডাঃ রুদ্র কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন ম্যাপটি ১৭৯৪ সালে A. Upjohn-এর করা। এতে ১৭৪২ সালের আদি কলকাতা আর ১৭৫৬ সালের বৃহত্তর কলকাতার নকশা করা রয়েছে। এতে উত্তরে বাগবাজারের খাল থেকে দক্ষিণে ‘Governapur’ (গোবিন্দপুর) পর্যন্ত এবং পূবে মারাঠা ডিচ থেকে পশ্চিমে গঙ্গা পর্যন্ত অঞ্চলকে কলকাতা বলে দেখানো হয়েছে।

ডাঃ রুদ্র কৌতূহলী হয়ে দেখলেন ম্যাপে মাত্র একটি রাস্তারই নাম রয়েছে—‘Avenue leading to the Eastward’। রাস্তাটি পশ্চিমে বর্তমান চিংপুর রোড থেকে আরম্ভ করে পূব দিকে মারাঠা ডিচ পর্যন্ত চলে গেছে। এইটেই নাকি বর্তমানে বৌবাজার স্ট্রীট!

• অন্যদিকে একটি তালিকা। কলকাতায় তখনকার দিনে পাকা বাড়ির সংখ্যা। যেমন—১৭০৬ খ্রীঃ—৮টি, ১৭২৬ খ্রীঃ—৪০টি, ১৭৪২ খ্রীঃ—১২১টি, ১৭৫৬ খ্রীঃ—৪৯৮টি।

—কাকে চাইছেন?

ভেতর থেকে গেলি গায়ে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বছর পঞ্চাশ বয়েস।  
সৌম্যদর্শন। মাথার চুল ছোটো করে কাটা।

ডাক্তার রুদ্র নমস্কার করলেন।

—কিছু মনে করবেন না, সাড়া না পেয়ে ঢুকে পড়েছি।

ভদ্রলোক নরম সুরে বললেন, কোথা থেকে আসছেন?

—কপিলেশ্বরবাবুর কাছ থেকে।

—কপিলেশ্বরবাবু! ভদ্রলোক নামটা মনে করবার চেষ্টা করলেন।

ডাক্তার রুদ্র সঞ্জয়ের দিকে তাকালেন। সঞ্জয় তাড়াতাড়ি বলল, বাগুইহাটির  
কপিলেশ্বরবাবু।

—ও আচ্ছা! দাদামশাই! হ্যাঁ, বসুন। ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা করবেন বোধহয়?

—হ্যাঁ, শিবানন্দ ভট্টাচার্যমশাই—

ভদ্রলোক একটু কি ভাবলেন। তারপর বললেন—ঠাকুরদার সঙ্গে কি দেখা করার  
একান্ত দরকার?

ডাক্তার রুদ্র বিনীতভাবে বললেন, একটা বিশেষ দরকারেই আসছি। একটা  
পুরনো বাড়ির ইতিহাস জানার জন্যে।

মনে হল ভদ্রলোক খুশি হলেন। বললেন, এ কথা শুনলে ঠাকুরদা খুবই  
খুশি হবেন। উনি এখনো আমাদের ডেকে ডেকে পুরনো বাড়ির ইতিহাস শোনান।  
কিন্তু মুশকিল কি জানেন? ওঁর বয়েস একশো তিন। বেশি কথা বলা বারণ।  
তার পর একটুতেই চটে যান। হয়তো আপনাদের দুটো কথা শুনিয়া দিতেও  
পারেন।

—তাতে আমাদের কিছু মনে হবে না। বয়োবৃদ্ধ মানুষ—

—ঠিক আছে। একটু বসুন। ওঁকে খবর দিই। তারপর আপনাদের ওপরে  
নিয়ে যাব।

এই বলে ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকছিলেন, ফিরে দাঁড়ালেন।

—আচ্ছা, কিরকম ইতিহাস জানতে চান? বাড়িটা কোন জায়গায়?

ডাক্তার রুদ্র বললেন, কালিন্দি-বরাটের কাছে। একটা পুরনো বাড়ি। Haunted  
house. বাড়িটার বিষয় উনি কিছু জানেন কিনা।

—বুঝেছি। বলে ভদ্রলোক ভেতরে চলে গেলেন। একটু পরেই কাশির শব্দ  
পাওয়া গেল। মাঝে মাঝে কাশতে কাশতে কেউ নেমে আসছেন।

—উনি বোধহয় নিজেই নেমে আসছেন। সঞ্জয় কান খাড়া করে রইল।

—বোধহয়। বলে ডাঃ রুদ্র উঠে দাঁড়ালেন।

মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যে আগের ভদ্রলোকটি একজন বৃদ্ধের হাত ধরে ঢুকলেন।  
পিছনে পিছনে এল একটি মেয়ে। বছর চোদ্দ বয়েস।

বৃদ্ধ এবার নিজেই টোকির ওপর বসে তাকিয়াটা টেনে নিলেন। মেয়েটি দাঁড়িয়ে  
রইল ভদ্রলোকের পাশে।

বৃদ্ধের শরীর শীর্ণ। গাল ঢুকে গেছে। না-কামানো পাকা দাড়ি। কঠনালী ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। গায়ে ফতুয়া। তার ওপর একটা চাদর। ছোটো ছোটো চোখ দুটো এ বয়েসেও কী তীক্ষ্ণ! চোখের দিকে তাকালে মনে হয় বয়েসকালে ভদ্রলোক বোধহয় অনেক নিষ্ঠুর কাজ করেছেন।

বৃদ্ধ একবার কাশলেন। তারপর বিনা ভূমিকায় বললেন, কপিল পাঠিয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—হঠাৎ?

বৃদ্ধ আবার কাশতে লাগলেন।

ডাঃ রুদ্র বললেন, তার আগে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি ডাঃ সঞ্জয় গুপ্ত। ডাক্তারি করা ছাড়াও পুরনো বাড়ির ইতিহাস সংগ্রহের বাতিক আছে।

—বাতিক! বৃদ্ধ যেন আঘাত পেলেন। রূঢ়স্বরে বললেন—বাতিক বলছেন কেন? ইতিহাস সংগ্রহ করা কি বাতুলের কাজ?

বৃদ্ধের নাতি এই সময়ে ইশারায় ডাঃ রুদ্রকে কিছু মনে না করতে অনুরোধ করলেন। বৃদ্ধ তখন বলে চলেছেন—আজকালকার ছেলেদের এই এক দোষ—কোনো সংকাজকেও গুরুত্ব দেয় না।

—তা কটা বাড়ির ইতিহাস পেয়েছেন? খাতাপত্র করেছেন?

ডাঃ রুদ্র প্যাঁচে পড়লেন।

সঞ্জয় সসংকোচে বলল, না, সেরকম কিছু করা হয়নি।

—তাহলে আর কি হল? শুধু লোকমুখে গল্প শোনা? না মশাই, ওতে কোনো কাজ হবে না। এসব ছেলেখেলা নয়। চলুন ওপরে। দেখাব আমি কিভাবে কাজ করেছি।

বৃদ্ধের নাতি তাড়াতাড়ি বললেন, দাদু, এঁরা বিশেষ একটা বাড়ি সম্বন্ধে জানতে চান। বলে তিনি সঞ্জয় আর রুদ্রের দিকে তাকালেন।

ডাঃ রুদ্র বললেন, ইনি কালিন্দির কাছে একটা বাড়িতে ভাড়া এসেছেন—

শিবানন্দ ভুরু তুলে বললেন, কে ভাড়া এসেছেন?

—ডাঃ গুপ্ত। বলে রুদ্র সঞ্জয়কে দেখিয়ে দিলেন।

—কতদিন?

—বছরখানেক হল। এখন অবশ্য ছেড়ে দিয়েছি।

—কেন?

—সেই কথাই বলতে এসেছি।

—কতদিন ছেড়েছেন?

—মাস তিনেক হল।

—কতদিন ও বাড়িতে ছিলেন?

—মাস নয়েক।

—আচ্ছা, তারপর বলুন।

সঞ্জয় তখন কলকাতায় বাসা নেওয়া থেকে শেষদিন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা বলে গেল।

বৃদ্ধের নাতি আর সম্ভবত নাতির মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনল।

শিবানন্দ কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—কালিন্দি-বরাট ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—গোলবাড়ি চেনেন ?

সঞ্জয় মাথা নাড়ল।—আজ্ঞে না।

—সে কী ! কালিন্দি-বরাটে থাকেন গোলবাড়ি চেনেন না ? গম্বুজওয়ালা পুরনো একটা বাড়ি। যুদ্ধের সময়ে আমেরিকান সোলজাররা থাকত। এখন কী অবস্থায় আছে জানি না।

সঞ্জয় বলল, গম্বুজওয়ালা বাড়ি ! ঐ বাড়িটার কথাই তো বলছি।

—তাই বলুন।

বৃদ্ধ একটু থেমে কাশির দমক সামলে বললেন, তখন মানে, আমাদের ছোটবেলায় ঐ বাড়িটাকে ‘গোলবাড়ি’ বলত। একসময়ে জমিদারবাড়ি ছিল। তারপর এক নীলকর সাহেব ওটা দখল করে। কিন্তু সেও ভোগ করতে পারেনি।

এই পর্যন্ত বলে শিবানন্দ একটু থামলেন। তারপর বললেন, তা শেষ পর্যন্ত বাড়িটা ছাড়তেই হল ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রথমে ছাড়তে চাইনি। কিন্তু সবই তো শুনলেন, না ছেড়ে উপায় ছিল না।

বৃদ্ধ কী ভেবে বললেন, আমি যার কথা ভাবছি তার আত্মার তহলে আজও সদগতি হয়নি। কিন্তু—

কথা আটকে গেল। বৃদ্ধ কাশতে লাগলেন। কাশি থামতে বললেন, একটা কথাই ভাবছি। সে তো মরেছে তা পঞ্চাশ-ষাট বছর হল। এত বছরের মধ্যে নিশ্চয় অনেক ভাড়াটে এসেছে। তাদের ওপর কি অত্যাচার হয়নি ? বলে সঞ্জয়ের দিকে তাঁর সেই অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে তাকালেন।

—ঠিক বলতে পারব না।

—পারব না, বললে তো হয় না। খোঁজখবর নিয়ে আসতে হয়। বৃদ্ধ বিরক্ত হয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

ধমকানি শুনে কিশোরীটি ফিক্ করে হাসল।

বৃদ্ধ একটু ভেবে বললেন, বোধহয় আর কেউ ভুক্তভোগী নয়। কেননা বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া দুরাত্মারাও চট করে মানুষের পেছনে লাগে না। আত্মারও কষ্ট হয় জানবেন।

ডাঃ রুদ্র আর সঞ্জয় বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—আমার কথাটা বুঝতে পারলেন কি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ডাঃ রুদ্র বললেন।

—না, কিছুই বোঝেননি।

কিশোরীটি মুখ ঢাকা দিয়ে হাসতে লাগল।

—আমি মনে করি, বিশেষ কোনো কারণে কোনো দুষ্ট আত্মা বিশেষ কোনো একজনের ওপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। এখন দেখতে হবে কার আত্মা, উদ্দেশ্যটাই বা কি?

বৃদ্ধর আবার কাশি উঠল। তিনি বুক চেপে ধরে জোরে জোরে কাশলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা, আপনি কি সপরিবারে ওবাড়িতে থাকতেন? বৃদ্ধ ডাঃ রুদ্রের দিকে তাকলেন।

—আমি না, ইনিই সপরিবারে থাকতেন।

বৃদ্ধ তাঁর সেই অদ্ভুত দৃষ্টিতে এবার সঞ্জয়ের দিকে তাকালেন।

—কি যেন আপনার নাম?

—সঞ্জয় গুপ্ত।

—আপনিই তো ডাক্তার?

—উনিও। বলে সঞ্জয় ডাঃ রুদ্রকে দেখিয়ে দিল।

—একসঙ্গে জোড়া ডাক্তার! বৃদ্ধ ঠোঁট ফাঁক করে বোধহয় একটু হাসবার চেষ্টা করলেন।

—আপনি তাহলে সপরিবারে থাকতেন?

—হ্যাঁ।

—আপনি কোনোদিন কিছু দেখেছিলেন, বা অনুভব করেছিলেন?

—না।

—যে ক’মাস ঐ বাড়িতে ছিলেন তার মধ্যে আপনার বাড়িতে আর কেউ রাত কাটিয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—কারা তাঁরা? আপনার আত্মীয়?

—না, একজন আমার স্ত্রীর বাস্কবী আর একজন মহিলা—মাদ্রাজ থেকে এসেছিলেন।

—তাঁদের অভিজ্ঞতা কি?

—আমার স্ত্রীর বাস্কবী কিছু দেখেননি বা অনুভব করেননি। তবে মিস থাম্পি করেছিলেন।

বৃদ্ধের দু চোখ কুঁচকে উঠল। বললেন—তিনি কী অনুভব করেছিলেন?

—তাঁর মতে ওবাড়িতে কিছু আছেই।

—কিছু না দেখেই বললেন?

—উনি একজন থিওজফিস্ট। সারাজীবন প্রেততত্ত্ব নিয়ে চর্চা করেছেন।

বৃদ্ধ শিবানন্দ চুপ করে কী ভাবতে লাগলেন। তারপর বললেন, এবার আমি নিশ্চিত যে ঐ বাড়িতে যে আত্মাটি আছে তার লক্ষ্য একমাত্র আপনার স্ত্রী।

সঞ্জয় বলল, লক্ষ্য যে আমার স্ত্রী তা আমারও বুঝেছি। কিন্তু কেন? সত্যিই কি ও বাড়িতে কোনোদিন তেমন কোনো ঘটনা ঘটেছিল যাতে আমার স্ত্রী কোনো আত্মার প্রতিহিংসার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল?

শিবানন্দ ভট্টাচার্য একটু চুপ করে রইলেন। তারপর চোখ বুজিয়ে বললেন, হ্যাঁ, ঘটেছিল। আর সে ঘটনার সঙ্গে আমারও কিছু যোগ ছিল। কেননা আমিও তখন থাকতাম ‘গোলবাড়ির’ কাছেই। হ্যাঁ, তা প্রায় ষাট বছর আগের কথা। ঘটনাস্থল ঐ গোলবাড়ি। সেসময়ে কলকাতায় এক বিখ্যাত যাদুকার ছিল।

—যাদুকার! সঞ্জয় চমকে উঠল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, যাদুকার। আপনারা ইংরিজিতে যাকে বলেন—ম্যাজিসিয়ান।

—লোকটা কি কালো কোট, কালো প্যান্ট, কালো টুপি পরত?

শিবানন্দ ধমকে উঠে বললেন, আপনারা যদি কথার মধ্যে কথা বলেন তা হলে আমি আর একটি কথাও বলব না।

ডাক্তার রুদ্র হাত জোড় করে বললেন, ক্ষমা করুন। আমরা অঈর্ষ্য হয়ে পড়েছিলাম, কেননা ঘটনার শুরুতেই এমন অদ্ভুত মিল—

—আরো মিলবে। ধৈর্য ধরুন। বলে বৃদ্ধ কাশতে লাগলেন।

একটু সামলে নিয়ে বললেন, ম্যাজিসিয়ান কালো কোট, কালো প্যান্ট ছাড়া তো ধুতি পাঞ্জাবি পরবে না। কাজেই ওটা নতুন কিছু নয়। পরনে কালো পোশাক, স্টেজের পিছনে কঙ্কাল আঁকা কালো পর্দা, টেবিলের ওপর কালো রুমাল ঢাকা মড়ার মাথা, হাতে কালো একটা লাঠি—ম্যাজিসিয়ান সারা কলকাতায় ম্যাজিক দেখিয়ে দু’হাতে পয়সা লুঠত। তার বেশির ভাগ দর্শক ছিল সাহেব-মেম। অবিনাশ বক্সীর খেলা হচ্ছে শুনলে সাহেব-পাড়া থেকে জুড়িগাড়ি ছুটিয়ে ওরা দলে দলে আসত।

কথার মাঝখানে এবার বাধা দিলেন নাতি ভদ্রলোক। তিনি হেসে বললেন, দাদু, রাগ করো না। মাঝে একটা কথা বলে নিই। বলেই ডাঃ রুদ্রর দিকে তাকালেন।

—দাদু একটা কথা কিন্তু বাদ দিয়ে যাচ্ছেন। সাহেবরা যেমন অবিনাশ বক্সীর খেলা দেখতে ছুঁত তেমনি দাদুর কাছে আসত হাত দেখাতে। দাদু তখন ছিলেন গোটা কলকাতা শহরের মধ্যে নামকরা জ্যোতিষী। শুধু হাতই দেখতেন না—লোকের কপালের দিকে তাকিয়েই তার ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারতেন।

—কিন্তু উনি তো শহরের পুরনো বাড়ির ইতিহাস সংগ্রহ করতেন বলেই জানি।

—হ্যাঁ, জ্যোতিষী ছিল তাঁর জীবিকা আর ইতিহাস সংগ্রহ ছিল তাঁর জীবন।

• কি দাদু, তাই তো?

শিবানন্দ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তাই বটে।

একটু থেমে বললেন, কি জানেন, আপনারা ‘গোলবাড়ি’র কথা জানতে এসেছেন, তার মধ্যে আমার কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

নাতি বললেন, কী যে বল! তোমাকে বাদ দিয়ে কি গোলবাড়ির কথা শেষ হয়? বিশেষ করে অবিনাশ বক্সীর ঘটনা? সে ঘটনা তো এর আগেও তুমি আমাদের বলেছিলেন।

শিবানন্দ উদাসীনের মতো চুপ করে বসে পায়ের চেটোয় হাত বোলাতে লাগলেন।

ডাক্তার রুদ্র মিনতি করে বললেন, সব ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে না বললে আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।

নাতি ভদ্রলোক এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। এবার চৌকির ওপর এসে বসলেন। কিশোরীটি কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল। সে মাঝে মাঝেই গোপনে তাকাচ্ছিল সঞ্জয়ের দিকে। চোখোচোখি হলেই চোখ নামিয়ে নিচ্ছিল।

ভদ্রলোক বললেন, দাদুই সব কথা শোনাবেন। আমি শুধু একদিনের কথা বলি। সেটা দাদুর নিজস্ব ব্যাপার বলে উনি হয়তো বলতে চাইবেন না।

এই বলে ভদ্রলোক একটু থামলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন।

—অবিনাশ বক্সী ছিলেন ম্যাজিসিয়ান। আর দাদু ছিলেন জ্যোতিষী। না, অবিনাশ বক্সীর আরও একটা পরিচয়, তিনি জমিদারপুত্র। বর্ধমান জেলার কোনো গ্রামে তাঁদের জমিদারি ছিল। অবিনাশ বক্সী অবশ্য বেশির ভাগ সময়ই থাকত তাদের পূর্বপুরুষদের এই গোলবাড়িতে। কলকাতা তখন ধনীদের ফুটির আখড়া। এই সময়ে নিজেরই পরিবারের একটি কুমারী মেয়েকে নষ্ট করায় অবিনাশের বাবা ওকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। চন্দননগরে একজন ফরাসী ম্যাজিসিয়ান বক্সীর বন্ধু ছিল। তার কাছ থেকে ম্যাজিক দেখানো শিখে বক্সী নিজেই একটা দল খুলে ফেলল। ম্যাজিক দেখানোই হল তখন তার জীবিকা।

যদিও এক পাড়াতে বাস, তবু দাদুর সঙ্গে বক্সীর কোনো সম্পর্ক ছিল না। না থাকারই কথা। কেননা বক্সী করত পাবলিক শো। আর দাদু ঘরে বসে লোকের হাত দেখতেন, কুস্তী বিচার করতেন। কিন্তু দু'জনেই দু'জনের খ্যাতির কথা জানতেন। দাদুর খ্যাতিটা অবিনাশ যে বিশেষ পছন্দ করত না, তা অবশ্য দাদুর অজানা ছিল না। একদিনের একটা সামান্য ঘটনায় অবিনাশের ঈর্ষা যেন ফেটে পড়ল।

একবার দাদুর কাছে এক মেমকে নিয়ে আসেন দাদুর এক অনুরাগী ব্যক্তি। মেমসাহেব এদেশের অ্যাসট্রোলজারদের নিয়ে একটা বই লিখছে। তাই দাদুর ছবি তুলল। দাদুর জীবনী নিতে চাইল। তার পর হঠাৎ দাদুর সামনে হাত মেলে ধরে বলল, দেখুন তো আমার কন্ডুগাল লাইফ কেমন যাবে?

নিতান্তই হালকা প্রশ্ন। দাদু কিন্তু সিরিয়াসলি মেমের হাতটা তুলে নিয়ে দেখতে লাগলেন। মিনিট তিনেক পরেই হাতটা ছেড়ে দিলেন।

—কি দেখলেন? মেম হেসে জিজ্ঞেস করল।

দাদু বললেন, বিয়ের পর তোমাদের দাম্পত্য জীবন ভালোই হবে।

মেমসাহেব কিছু বলার আগেই অনুগত ভদ্রলোকটি যেন আকাশ থেকে পড়লেন।



—বলছেন কী ভট্টাচার্যমশায়! উনি বিবাহিতা বলেই তো দাম্পত্য জীবনের কথা জানতে চাইছেন।

দাদু হেসে মাথা নাড়লেন। বললেন, না, ওঁর কররেখায় এখনো বিবাহযোগ ফোটেনি। কাজেই বিয়ে হতে পারে না। হবে কিছুদিন পরে।

মেমসাহেব কোনো কথা না বলে লজ্জিত মুখে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

মেম চলে গেলে অনুগত লোকটি বলল, কিন্তু উনি যে স্বামী-স্ত্রীর মতো একসঙ্গে থাকেন।

দাদু বললেন, স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকলেই কি স্বামী-স্ত্রী হয়? বিবাহ অন্য জিনিস।

—তবে ওঁরা বিয়ে করেননি কেন?

দাদু বললেন, তার উত্তর আমি কী দেব? নিশ্চয় কোনো বাধা আছে। আর সে বাধা কাটিয়ে উঠতে আরো কিছু সময় লাগবে।

আড়াই মাস পরে সেই মেমসাহেব একজন সাহেবকে নিয়ে হাসতে হাসতে এসে হাজির। সঙ্গে এক বাস্ক কেক। কি দাদু, তাই তো? আমি বাবার কাছ থেকে যা শুনেছি তাই বললাম।

বৃদ্ধ একটু হেসে মাথা দোলালেন।

—তারপর এই মেমসাহেবের দৌলতে সাহেব-পাড়ায় দাদুর নাম ছড়িয়ে পড়ল। তারা দলে দলে দাদুর কাছে হাত দেখাতে আসতে লাগল।

অবিনাশ ভেবেছিল সেইই একমাত্র বাঙালি যে সাহেবদের কাছে খুব পপুলার। এখন চোখের সামনে দাদুর প্রতিপত্তি দেখে হিংসেয় জ্বলতে লাগল।

একদিন এক সাহেব অবিনাশ বস্ত্রীর বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামল। অবিনাশ ভাবল, বোধহয় ম্যাজিক দেখাবার বায়না করতে এল। সাহেবকে খুব খাতির করে অভ্যর্থনা করল। কিন্তু সাহেব তাকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে দাদুর বাড়ি কোন দিকে জানতে চাইল।

এতেই অবিনাশ একেবারে খাপ্পা হয়ে গেল। বলল, সাহেব, আমি বুঝতে পারি না তোমরা কি করে ওর বুজরুকিতে ভুলে যাও।

সাহেব হেসে বলল, বস্ত্রী, তোমারও যে এত খ্যাতি শুনতে পাই সেটাও কি তোমার বুজরুকির জন্যে নয়?

অবিনাশ তার কী উত্তর দিয়েছিল জানা নেই। কিন্তু তারপর থেকেই দাদুকে পাড়া-ছাড়া করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগল। কিন্তু দাদুও খুব নিজীব মানুষ ছিলেন না। নিজের জেদে জাঁকিয়ে প্র্যাকটিস করতে লাগলেন। কি দাদু, তাই না?

শিবানন্দ সগর্বে মাথা দোলালেন।

—কারো ক্ষতি না করে, এমনকি কারও সাথে-পাঁচে না থেকেও কেমন করে যে নির্বিবাদ মানুষও শত্রু হয়ে পড়ে আমার জীবনে সেই প্রথম অভিজ্ঞতা। বলে শিবানন্দ কাশতে লাগলো।

—এইবার বক্সীকে জন্ম করার জন্যে দাদুও উঠে পড়ে লাগলেন।

বাধা দিয়ে শিবানন্দ বললেন, না, জন্ম করার জন্যে নয়। আসল কথা হচ্ছে, আপনারাও জেনে রাখুন, কেউ শত্রু হয়েছে বুঝতে পারলেই লোকটাকে পুরোপুরি জানবার চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ লোকটার অর্থবল, লোকবল কি রকম, বে-আইনি কোনো কাজ করে কিনা, তার কোনো দুর্বল দিক আছে কিনা, সর্বোপরি তারও কোনো শত্রু আছে কিনা। কেননা শত্রুর শত্রু মানেই বিরুদ্ধপক্ষের মিত্র। মোটামুটি এই ব্যাপারগুলো জেনে নিতেই হয়।

শিবানন্দ একটু থামলেন। তারপর বলতে লাগলেন, যখন দেখলাম বক্সী আমায় সুনজরে দেখছে না তখনই বুঝলাম ও শত্রুতা করবে। তার পরিণতি কী হবে তাও ভেবে নিলাম। পুলিশকে ঘুষ দিয়ে বা গুণ্ডা লাগিয়ে ও আমার ক্ষতি করতে পারে। তাই তার কোথায় উইকপয়েন্ট আছে গোপনে আমি সন্ধান করতে লাগলাম। আর এইভাবে খোঁজ করতে করতেই—

শিবানন্দ কথা শেষ করতে পারলেন না। দমকা কাশিতে স্বর আটকে গেল।

ওঁর নাতি তখন দাদুর কথার জের ধরে বলতে লাগলেন, খোঁজ করতে করতে দাদু জানতে পারলেন ওর টুপে যে সুন্দরী যুবতী মেয়েরা কাজ করে তারা শুধু চাকরিই করে না, বক্সীর সঙ্গে তাদের অন্য সম্পর্কও আছে।

এই সময়ে কিশোরী মেয়েটি হঠাৎ ভেতরে চলে গেল।

—দাদু ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে জানলেন, এই মেয়েরা একসময়ে সকলেই দূর দূর গ্রামের দরিদ্র ভদ্রঘরের ছিল। বক্সী তাদের চাকরির নাম করে নিয়ে এসে তাদের এমন অবস্থা করে দিয়েছে যে তারা আর ফিরে যেতে পারে না।

—না না, সব ক্ষেত্রে চাকরির নাম করেও নয়, জোর করে, বলপ্রয়োগ করে ধরে আনত, যেমন সুনয়নীর কেস। বাধা দিয়ে এইটুকু বলেই শিবানন্দ হাঁপাতে লাগলেন।

ওঁর কষ্ট দেখে ডাঃ রুদ্র বললেন, আজ না হয় থাক। আর একদিন—

—না না, আর একদিন নয়। আজই শুনে যান। সুনয়নীর কথা আপনাদের জানা দরকার। এই বলে শিবানন্দ নাতির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ায় মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

এরপর শিবানন্দ ডট্টাচার্যর নাতি যা বললেন তা এইরকম—

নাম, যশ, অর্থ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইদানীং নতুন মেয়ে সংগ্রহের পদ্ধতিটা বক্সী বদলেছিল। এখন আর মিথ্যে কথা বলে বা ধাধা দিয়ে মেয়ে যোগাড় করত না। যখনই গ্রামগঞ্জে খেলা দেখাতে যেত তখনই নিরীহ, গ্রাম্য কোনো সুন্দরী তার ফাঁদে পড়তই। আর ফাঁদটা অবিনাশ পাতত শেষ খেলার দিন।

শিবানন্দ যেদিন থেকে এই খবরটা জানতে পারলেন সেদিন থেকেই অবিনাশ যখনই বাইরে টুপ নিয়ে যেত তখনই তাকে লুকিয়ে অনুসরণ করতেন হাতে-নাতে ধরার জন্যে। কিন্তু ধরতে পারেননি।

সেবার কলকাতা থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে ত্রিবেণীতে খেলা দেখাতে গিয়েছে। সরস্বতী নদীর ধারে অবিনাশের তাঁবু পড়েছে। শিবানন্দও তাকে অনুসরণ করে ত্রিবেণীতে হাজির।

সকাল থেকে ঘোড়ার গাড়িতে বসে ড্রাম বাজাতে বাজাতে ম্যাজিক-পার্টির লোকেরা শহর থেকে গ্রামে হ্যান্ডবিল বিলি করতে লাগল। মুখে টিনের চোঙা লাগিয়ে চেষ্টাতে লাগল—আসুন দেখুন—যাদুকর অবিনাশ বক্সীর অসাধারণ খেলা! কাচ ভক্ষণ! ছাগলের কাটা মুণ্ডুর ডাক! মুখের মধ্যে জ্বলন্ত আগুন! এর সঙ্গে আছে—কঙ্কালের অটুহাসি! লাস্যময়ী তরুণীদের নৃত্য! কুমারী বালিকার দ্বিখণ্ডিত লাশ! ইত্যাদি।

যথাসময়ে দলে দলে লোকে ম্যাজিক দেখতে এল। মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। প্রচুর টাকার টিকিট বিক্রি হল। কিন্তু—

অবিনাশ বক্সী শুধু টাকা পেয়েই খুশি নয়। তার শরীরে যে উচ্ছৃঙ্খল জমিদার বংশের রক্ত! নিত্য নতুন মেয়ে চাই তার! একবার কোনোরকমে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে গোলবাড়িতে তুলতে পারলেই হল।

সুযোগের জন্যে প্রতিবারের মতো এবারও বক্সীকে অপেক্ষা করতে হল খেলার শেষ দিনের শেষ শো পর্যন্ত।

আজ থেকে প্রায় যাট বছর আগের কথা। গ্রামাঞ্চলে সেসময়ে রাত নটা মানে অনেক রাত। শেষ খেলাটি দেখালেন বিখ্যাত যাদুকর অবিনাশ বক্সী। হাততালিতে তাঁবু কেঁপে উঠল। অবিনাশ বক্সীকে লাগছিল সাহেবের মতো। পরনে কালো কোট-প্যান্ট, মাথায় ফেল্টের টুপি। খেলার শেষে তিনি হাত জোড় করে বিদায় চাইলেন।

আবার তুমুল হাততালি।

এবার তাঁবু থেকে বেরোবার পালা। দলে দলে পুরুষরা বেরোচ্ছে পুরুষদের গেট দিয়ে। মেয়েরা বেরোচ্ছে অন্য পথ দিয়ে। হঠাৎ স্টেজের মধ্যে ভৌতিক চিৎকার! আসলে এও একটা খেলা। কিন্তু লোকে তা বুঝতে পারল না। তারা ভয় পেয়ে দৌড়ে পালাতে লাগল। আর ঠিক তখনই মেয়েদের দিকের ডে-লাইটটা কে যেন সরিয়ে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার। মেয়েরা চিৎকার করে উঠল—আলো—আলো—

কিন্তু কে কার কথা শোনে! মেয়েরা পড়িমরি করে তাঁবুর বাইরে এসে পড়ল। তখন সেখানে ভিড়ে ভিড়। যে যেদিকে পারছে ছুটছে।

মেয়েদের মধ্যে যারা গ্রাম থেকে এসেছিল তারা ত্রিবেণীর পথঘাট কিছুই চেনে না। বাড়ির পুরুষদেরও অন্ধকারে খুঁজে পাচ্ছে না। দিশেহারা হয়ে এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায় ছুটোছুটি করতে লাগল। মাঝে মাঝে বাড়ির লোকেরা মেয়েদের নাম ধরে ডাকছে। চোঁচামেচির মধ্যেও যে কোনোরকমে শুনতে পাচ্ছে সে সাড়াও দিচ্ছে, কিন্তু তাদের মিহি গলা পুরুষদের কানে পৌঁছচ্ছে না।

এমনি সময়ে টর্চের জোরালো আলো এসে পড়ল মেয়েদের মুখে। কে টর্চ

ফেলে কাকে খুঁজছে বোঝা গেল না। শুধু টর্চের আলো এক মুখ থেকে অন্য মুখে সরে সরে যেতে লাগল। যেন কেউ টর্চের আলো ফেলে বিশেষ কাউকে খুঁজছে। শেষে একটি মেয়ের মুখের ওপর আলোটা এসে থেমে গেল।

—এদিকে এসো। তোমার বাড়ির লোকেরা তাঁবুতে তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সরল বিশ্বাসে তরুণী নববধূটি এগোল। সঙ্গে সঙ্গে টর্চের আলোও নিভে গেল।

তারপর ?

তারপর আর কেউ কিছু জানতে পারল না। শুধু একটা মোটরের গর্জন। মুহূর্তে হেডলাইটের আলোয় দুপাশের অন্ধকার ফাঁক করে গাড়ি ছুটল ত্রিবেণী থেকে কলকাতার দিকে।

শিবানন্দ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সবই দেখলেন। পরের দিন সকালে তাঁবু গুটিয়ে অবিনাশ বক্সীর ম্যাজিক পার্টি কলকাতায় ফিরে গেল। এদিকে মহা হৈহৈ কাণ্ড। সকলেই শুনলেন ম্যাজিক দেখতে এসে একটি অল্পবয়সী বৌ হারিয়ে গেছে। কেউ কেউ মন্তব্য করলেন, হারাবে আর কোথায় সুযোগ পেয়ে নাগর জুটিয়ে পালিয়েছে। মেয়েটির স্বামী দুদিন খোঁজাখুঁজি করল। তারপর হতাশ হয়ে গ্রামে ফিরে গেল।

এই পর্যন্ত বলে ভদ্রলোক একটু থামলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন—দাদু সন্ধান করে করে শেষে মগরায় গেলেন। তারপর যে বাড়ির বৌ হারিয়েছিল খোঁজ করে সেই বাড়িতে গিয়ে গৃহকর্তার সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু দাদু আশ্চর্য হলেন যখন দেখলেন গৃহকর্তা অর্থাৎ মেয়েটির স্বশুরমশাইটি একেবারে নির্বিকার।

—পুত্রবধূ সম্বন্ধে আপনি কি ভাবছেন ? দাদু জিজ্ঞেস করলেন।

—কি আর ভাবব ? তার যদি মতিভ্রম হয়ে থাকে তো কে কি করবে ?

দাদু বললেন, মতিভ্রম বলছেন কেন ? তাকে তো দুর্বৃত্তে ধরে নিয়ে গেছে।

স্বশুরমশাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তাহলেই বা কি করতে পারি ? তাকে কি আর খুঁজে পাব ?

—হ্যাঁ, পাবেন। আমি জানি তাকে কে অপহরণ করে কোথায় নিয়ে গেছে।

এ কথা শুনেও গৃহকর্তা কিছুমাত্র উৎসাহ দেখালেন না। চুপ করে রইলেন।

দাদু বললেন, আপনি আমার সঙ্গে চলুন। থানায় ডায়েরি করবেন। আমি নিজে চোখে যা দেখেছি থানায় তা বলব।

গৃহকর্তা অবাধ হয়ে দাদুর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—হ্যাঁ, আমি সত্যি কথাই বলছি। এই দেখুন আমি ব্রাহ্মণ। এই পৈতে ছুঁয়ে বলছি—আপনি আমার সঙ্গে থাকুন আমি আপনার পুত্রবধূকে উদ্ধার করে শয়তানটাকে জেলে পুরব।

গৃহকর্তা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, না মশাই, থানা-পুলিশ আমি করতে পারব না।

দাদু রেগে উঠে বললেন, কেন মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন? আমি তো রয়েছি। তাছাড়া আপনার একটি পয়সাও খরচ হবে না। সব দায়িত্ব আমার।

এবার গৃহকর্তা বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনি তো অনেক উপদেশ বর্ষণ করলেন। কিন্তু আমি স্পষ্ট কথাই বলছি, তাকে আর ঘরে তোলা সম্ভব হবে না।

দাদু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, তাহলে আমার আর বলার কিছু নেই। নিরপরাধ একটা মেয়েকে আপনি পাপের পথেই ঠেলে দিচ্ছেন। দেখবেন ধর্মে সইবে না। বলে দাদু তখনই বেরিয়ে এলেন।

মাত্র কিছুদূর গিয়েছেন, পিছন থেকে কে ডাকল—ঠাকুরমশাই!

দাদু ফিরে তাকালেন। দেখলেন একটি যুবক হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে। যুবকটিকে দাদু গৃহকর্তার ঘরেই দেখেছিলেন। গৃহকর্তার সঙ্গে দাদু যখন কথা বলছিলেন, যুবকটি তখন একপাশে দাঁড়িয়ে শুধু শুনছিল।

—আপনি? দাদু জিগ্যেস করলেন।

যুবকটি হাত জোড় করে বললেন, আজ্ঞে যে নিখোঁজ হয়েছে সে আমারই স্ত্রী। আমি সব শুনলাম। আপনি যদি ওকে উদ্ধার করে দিতে পারেন তাহলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

দাদু কাছে এগিয়ে এসে যুবকের কাঁধে হাত রেখে বললেন, আমি সন্ধান জানি মাত্র। যে দুর্বৃত্ত আপনার স্ত্রীকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে তাকেও আমি চিনি। সে ঐ ম্যাজিসিয়ান। থাকে কলকাতায় আমার বাড়ির কাছে। কিন্তু আপনার স্ত্রীকে উদ্ধার করতে হলে থানার সাহায্য চাই। আর তার জন্যে আপনাকে গিয়ে ডায়েরি করতে হবে।

যুবকটি মাথা নিচু করে কী চিন্তা করতে লাগল।

দাদু ফ্লোভের হাসি হেসে বললেন, বুঝেছি, আপনার বাবার মতের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস আপনার নেই। তাছাড়া উদ্ধার করেই বা কি হবে? তাকে তো আর ঘরে তুলতে পারবেন না।

এবার যুবকটি নিচু গলায় বলল, দেখুন, থানা-পুলিশ করতে পারব না। কিন্তু সুনয়নীকে পেলে আমি তাকে গ্রহণ করবই।

দাদু আবার একটু হাসলেন। বললেন, কি করে?

—দরকার হলে বাড়ি থেকে আমি আলাদা হয়ে যাব।

দাদু খুশি হয়ে যুবকের পিঠ চাপড়ে বললেন, ঠিক আছে। আমি একাই চেষ্টা করে দেখি। তবে মনে রাখবেন তাকে উদ্ধার করতে পারলে আপনি কিন্তু ত্যাগ করতে পারবেন না। কথা দিয়েছেন। দরকার হলে কলকাতায় এসে আমার বাড়িতে থাকবেন।

যুবকটি অঙ্গীকার করে কৃতজ্ঞচিত্তে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল, দাদু ফের ডাকলেন। বললেন, বৌমার কোনো ছবি আছে?

যুবকটি একটু ভেবে বলল, বোধহয় আছে।

—তাহলে আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি। আপনি নিয়ে আসুন। থানায় ছবি দেখাতে হবে।

দাদু দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু পরে যুবকটি একটা ছবি কাগজে মুড়ে দাদুকে এনে দিল।

নাতি ভদ্রলোক একটু থামলেন।

ডাক্তার রুদ্র ব্যস্ত আগ্রহে বললেন, তারপর?

—দাদু এবার তুমি বলবে?

—না, তুমিই বেশ বলছ। বলে যাও ভুল হলে শুধরে দেব।

—তারপর দাদু একাই ত্রিবেণী থানায় গেলেন। থানা অফিসারকে সব কথা বললেন। থানা অফিসার সব শুনলেন। তারপর বললেন, ঘটনাটা আমার থানায় ঘটলেও সেই ম্যাজিসিয়ানের বাড়ি সার্চ করতে পারে একমাত্র কলকাতার পুলিশ। আপনি ওখানকার থানায় জানান। আমিও তাঁদের রিকোয়েস্ট করছি।

দাদু ভেবে দেখলেন কথাটা ঠিক। তিনি কলকাতায় ফিরে এসে নিজেই থানায় সব জানালেন।

কিন্তু তার ফল যে উল্টো হবে দাদু তা ভাবতে পারেননি।

ঠিক দু'দিন পর।

সকালে দাদু একটা বই পড়ছিলেন। এমনি সময়ে বাড়ির সামনে একটা হুড-খোলা গাড়ি এসে দাঁড়ালো।

নিশ্চয় কোনো সাহেবসুবো এসেছে ভেবে তাড়াতাড়ি গায়ে ফুতুয়াটা চড়িয়ে নিলেন। ঠিক তখনই দাদুকে হতচকিত করে সদর্পে ঘরে ঢুকল অবিনাশ বক্সী। পকেট থেকে পিস্তল বের করে বলল, তুমি তো অন্যের ভাগ্যগণনা কর—বলো তো আজ তোমার ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে?

দাদু কোনো উত্তর দিলেন না। একটু হাসলেন।

—হাসছ? শেষ হাসি হেসে নাও। তারপরেই আমার শত্রুতা করার চরম ফল ভোগ করবে। বলে পিস্তলটা উঁচু করে ধরল।

দাদু তখনও অবিনাশের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন।

—তোমার এত বড়ো স্পর্ধা তুমি থানায় জানিয়ে এসেছ ত্রিবেণী থেকে আমি একটি মেয়েকে ধরে নিয়ে এসেছি! হ্যাঁ, এনেছি। সে এখন আমার ঘরে। পুলিশের বাবার সাধ্য নেই তাকে উদ্ধার করে। তারা আমার কেনা। শুধু কেনাই নয়, থানায় যে অফিসারটিকে তুমি জানিয়েছ, সুনয়নীকে প্রথম সেই ভোগ করবে। কিন্তু তুমি যখন জেনেছ তখন তোমার মুখ বন্ধ করতেই হয়। বলতে বলতে দরজার কাছ থেকে দাদুর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

ঠিক সেই সময়ে একটা গাড়ি এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামল একজন সাহেব আর মেম। অবিনাশ চট করে পিস্তলটা লুকিয়ে ফেলল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল—সাত দিন সময় দিলাম। এর মধ্যে কলকাতা ছেড়ে

চলে যাবে। সাত দিন পর আবার আসব। সেদিনও যদি দেখি তুমি রয়েছে তাহলে—

কথা শেষ না করেই অবিনাশ গাড়িতে গিয়ে উঠল।

দাদু এগিয়ে গেলেন দরজা পর্যন্ত। হেসে বললেন, বক্সী সাহেব, সাত দিন কেন আরও অনেক দিন পর্যন্ত এখানেই আমি থাকব। কিন্তু সাত দিন পর তুমি আর থাকবে না। চরম মুহূর্তে চেষ্টা কোরো আমার ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করতে।

বক্সী হা হা করে হেসে উঠল। বলল, আচ্ছা দেখা যাবে কে থাকে। বলেই গাড়িতে স্টার্ট দিল।

শিবানন্দ ভট্টাচার্যের নাতি এই পর্যন্ত বলে থামলেন।

—তারপর? সঞ্জয় জিজ্ঞেস করল।

ভদ্রলোক এবার যেন চাইলেন বাকি ঘটনাটা দাদু বলেন। তিনি শিবানন্দের দিকে তাকালেন।

শিবানন্দ তাকিয়ায় হেলান দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। এবার দুই কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে দেহটাকে কোনোরকমে ঠেলে তুললেন।

—এবার আমিই বলব। যে উদ্দেশ্যে আপনারা এসেছেন এবার তা জানতে পারবেন।

শিবানন্দ কয়েকবার কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন। তারপর ভাঙা ভাঙা গলায় বলতে লাগলেন—

—মগুরার এই মেয়েটির নাম সুনয়নী তা আপনারা জেনেছেন। সেই সুনয়নী একরাত্রি আমার পরিবারের সঙ্গে ছিল। আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। ত্রিবেণী থেকে তুলে আনার পর থেকে যা যা ঘটেছিল তা ও আমায় বলেছিল। সেই ঘটনাটা বলি।

॥ ভিন ॥

### সুনয়নী-উপাখ্যান

গভীর রাত্রে সুনয়নীর মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে অবিনাশ আর তার এক সঙ্গী তাকে মোটর থেকে নামিয়ে বিরাট কম্পাউন্ডওয়াল বাড়ির দোতলার একটা ঘরে আটকে রাখল।

সুনয়নী পড়ে পড়ে গোঙাতে লাগল। কিন্তু কথা বলতে পারল না। মুখ বাঁধা।

সুনয়নী দেখল ঘরটা বেশ বড়ো। কিন্তু অন্ধকার। ঘণ্টাখানেক পরে রাত তখন ঠিক কত জানে না, মনে হল কেউ একজন দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল। তারপর ঝনাৎ করে শেকল খুলে ঘরের ভেতর এসে ঢুকল।

কালো কোট-প্যান্ট-পরা সেই ম্যাজিসিয়ান। হাতে তার খাবার।

ম্যাজিসিয়ান থালা বাটি একটা টেবিলের ওপর রেখে সুনয়নীর মুখের বাঁধন খুলে দিল। সুনয়নী তার দু'পা জড়িয়ে ধরল।

ম্যাজিসিয়ান পা দিয়েই তাকে ঠেলে দিয়ে বলল, খাবার রইল। কুঁজোয় জল আছে। না খেলে লাভ নেই। কেননা তোমাকে এখন নতুন করে বেঁচে থাকতে হবে। কাল রাত্তিরে আবার দেখা হবে।

বলেই ঘরের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দরজার শেকল তুলে দিল।

পরের দিন সকাল, দুপুর, বিকেল কেটে গেল। ম্যাজিসিয়ান আর আসেনি। ঝি আবার খাবার দিয়ে গেল।

—ও মা! সব খাবারই যে পড়ে আছে। কিছুই তো খাওনি। না খেয়ে লাভ নেই বাছা। এসে যখন পড়েছ—

বলে আর এক থালা রেখে দিয়ে গেল।

অনেক রাত্তিরে বাড়ির সামনে মোটর গাড়ির শব্দ। একটা গাড়ি যেন কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকল। তারপর গাড়ির দরজা খোলার আর বন্ধ করার শব্দ।

সুনয়নী ভাবল—নিশ্চয় পুলিশ এসেছে তাকে উদ্ধার করতে। এই মনে করে রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই দরজার শেকল খোলার শব্দ। সুনয়নী চমকে উঠল। দেখল দরজা খুলে ঢুকছে অবিনাশ বক্সী। সঙ্গে পুলিশের পোশাক-পর্য্য একজন ফিরিঙ্গি সাহেব।

—উঠে এসো। অবিনাশ বক্সী কঠিন স্বরে যেন আদেশ করল।

—উঠে এসো বলছি।

—না। বলে চিৎকার করে সুনয়নী ভয়-বিস্ময়িত চোখে তাকিয়ে রইল।

তখন অবিনাশ বক্সী এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরে টানতে গেল। কাছেই ছিল টেবিলটা। সুনয়নী প্রাণপণে টেবিলের পায়া আঁকড়ে ধরে রইল। তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। —আমায় দয়া করে ছেড়ে দিন। এই আমি আপনাদের পায়ে পড়ছি।

অবিনাশ বক্সী লাথি মেরে বলল, হ্যাঁ, ছাড়ছি। নিচে চল।

সুনয়নী হাত জোড় করে বলল, দোহাই আপনাদের। আমি বিবাহিতা। আমার স্বামী আছেন। তিনি এখনও পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

অবিনাশ বলল, তোমার স্বামী তোমাকে নিশ্চয় ফিরে পাবে। তবে সাত দিন পর।

এই সময়ে ফিরিঙ্গি পুলিশ অফিসার বললেন, আজ না হয় থাক মিঃ বক্সী। আগে ও পোষ মানুক।

—না না, এ-সব মেয়ে কোনোদিনই পোষ মানবে না। আজই—

বলে সুনয়নীকে জোর করে টেনে তুলতেই সুনয়নী মরিয়া হয়ে আচমকা অবিনাশকে একটা ধাক্কা মারল। অবিনাশ হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আর সেই ফাঁকে সুনয়নী থালা দরজা দিয়ে বেরিয়ে খাড়া সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।



অবিনাশ তখনই উঠে দাঁড়িয়ে চিংকার করে উঠল—সাবধান!

সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে পিস্তল বের করে ফায়ার করল।

—উঃ মাগো! বলে সুনয়নী সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়ল।

ঠিক তখনই তিনতলা থেকে একটি স্ত্রীলোক ছুটে নেমে এল।

—এ কী করলে! মেয়েটাকে মেরে ফেললে!

সামনে যে একজন ফিরিস্তি পুলিশ অফিসার রয়েছে স্ত্রীলোকটি তা গ্রাহ্যও করল না।

—না, মারিনি। ভয় দেখিয়েছি শুধু। এমন জিনিস কি মেরে ফেলা যায়? কিন্তু ঘর থেকে তুমি বেরিয়ে এলে যে? তোমায় না বারণ করেছিলাম, আমি না ডাকলে তুমি বেরোবে না।

স্ত্রীলোকটি চোঁচিয়ে উঠে বলল, হ্যাঁ জানি। শুধু সাহেব-মেমদের সামনে তোমার স্ত্রী হয়ে দেখা দেওয়া ছাড়া আমার বের হওয়া তুমি চাও না। কিন্তু—কিন্তু কি করব? অসহায় এক-একটি মেয়েকে ধরে এনে তুমি তাদের সর্বনাশ করবে এ আর আমি কতদিন সহ্য করব?

—আঃ পদ্মা! চলে যাও বলছি।

—যাচ্ছি। তার আগে দেখব মেয়েটি বেঁচে আছে কিনা। যদি মরে গিয়ে থাকে তাহলে আমিই তোমায় পুলিশে দেব। আর তুমিই বা কিরকম পুলিশ-সাহেব, চোখের সামনে নিরীহ মেয়েটাকে গুলি করল তবু হাঁ করে দেখছ?

ফিরিস্তি পুলিশ অফিসার তাড়াতাড়ি সুনয়নীর কাছে এগিয়ে গেল। দেখল গুলি লাগেনি।

কোনো কথা না বলে ফিরিস্তি অফিসার মাথা নিচু করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। অবিনাশ ছুটে গেল। হাত জোড় করে বলল—স্যার, আপনি চলে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ, আজ থাক। পরে একদিন—

বলতে বলতে ফিরিস্তি পুলিশ গাড়িতে গিয়ে উঠল।

সেদিনের মতো সুনয়নী বেঁচে গেল।

পরের দিন।

গভীর রাত্রি। অন্ধকার ঘরে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে নিজের ভাগ্যের কথা সুনয়নী ভাবছিল। একদিন ভাগ্যক্রমে রক্ষা পেয়েছে। আজ না জানি কি হয়!

তার মনে পড়ছিল বাড়ির কথা। না জানি তার স্বামী কি করছে? কোথায় খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে! আর বুড়ো স্বশুর? সুনয়নী নইলে যাঁর একবেলা চলত না? না জানি কেঁদে কেঁদে বোধহয় অন্ধ হয়েই গেলেন!

চিন্তায় বাধা পড়ল। দরজায় ঠুক-ঠুক শব্দ। সুনয়নী চমকে উঠল। নিজের অজান্তসারেই আর্তনাদ করে উঠল—না না না—

নিচু গলায় বাইরে থেকে কে যেন বলল, সুনয়নী, ভয় ক্রোই। দরজা খোলো।

ভয় নেই! তবু ভয়ে ভয়েই সুনয়নী দরজা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ছায়ার মতো ঘরে এসে ঢুকল অবিনাশের স্ত্রী।

—আপনি!

পদ্মা ঠোঁটের ওপর আঙুল চেপে ইশারায় বলল, চুপ! শীগগির পালাও।

সুনয়নী যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারল না। অশ্রুটস্বরে বলল, পালাব!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, পালাবে। পালাবে না তো কি মরবে? ছেলেমানুষ তুমি। তোমায় আমি নষ্ট হতে দেব না।

সুনয়নী হাত জোড় করে বলল, কি করে যাব?

পদ্মা গলার স্বর যতটা সম্ভব নিচু করে বলল, সিঁড়ির দরজা খুলে রেখেছি। একটু সাহস করে বেরিয়ে পড়ো।

—কিন্তু তারপর? এই রাতে যাব কোথায়?

পদ্মা বিরক্ত হয়ে বলল, যমের বাড়ি। তোমার কি এখান থেকে যেতে ইচ্ছে নেই?

সুনয়নী কান্না-জড়ানো স্বরে বলল, আমি এখুনি যাচ্ছি। পথ-ঘাট চিনি না। তাই—

বলেই সুনয়নী ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, পদ্মা হাত চেপে ধরল।

—দাঁড়াও। পাগলের মতো যেও না। যা বলি মন দিয়ে শোনো। এইটে রাখো। বলে কাপড়ের ভেতর থেকে একটা পিস্তল বের করে সুনয়নীর হাতে দিল।

—এটা কি? আঁৎকে উঠল সুনয়নী।

—গুলিভরা পিস্তল। এইটে টেনে দিলেই গুলি ছুটে যাবে। অনেক কষ্টে সরিয়ে রেখেছি। এটা আমার জনোই সরিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি তোমার দরকার বেশি।

—কিন্তু—

—না, কিন্তুটিস্তু নয়। ধরো এইভাবে। শক্ত করে ধরো। যদি ও টের পায়—তোমায় ধরতে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারবে। আর তুমি যদি ধরা পড়ে যাও তা হলে আত্মঘাতী হবে। বুঝলে?

সুনয়নী কোনোরকমে মাথা নেড়ে সায় দিল।

—যাও।

পদ্মাকে প্রণাম করে সুনয়নী চলে যাচ্ছিল, পদ্মা পিছু ডাকল। —শোনো। কাল দেখেছিলাম আমাদের পাড়ার জ্যোতিষী শিবানন্দ ভট্টাচার্য কয়েকজনকে নিয়ে বাড়ির সামনে ঘোরাফেরা করছিল। লোকটি ভালো। তোমার সৌভাগ্য হলে আজও হয়তো পথে ওঁকে পাবে। যদি পথে দেখা না পাও তাহলে ওঁর বাড়িতে চলে যাবে। পথের ও পাশে বেলগাছওলা যে একতলা বাড়ি—ওটাই শিবানন্দ ঠাকুরের বাড়ি। যাও। জয় মা শঙ্করী! বলে পদ্মা দু'হাত কপালে ঠেকাল।

সবই হল—শুধু পদ্মাদেবী যদি সঙ্গে একটা টর্চ দিতে পারতেন!

খুব তাড়াতাড়ি সরু আঁকাবাঁকা সিঁড়ি দিয়ে নামছিল সুনয়নী। পা দুটো কাঁপছিল খরখর করে। হঠাৎই কিসে পা বেধে হোঁচট খেল। সঙ্গে সঙ্গে সেটাও শব্দ করে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ল।

সেই শব্দে ঘুম ভাঙল অবিনাশের। নিজের ঘর থেকেই চৌচিয়ে উঠল—কে?

তারপরই শোনা গেল ভারী পায়ের শব্দ। তিনতলা থেকে নেমে আসছে অবিনাশ বক্সী। দু'চোখ স্থলছে হিংস্র পশুর মতো।

—সু-ন-য়-নী—

মৃতিমান বিতীষিকা তাড়া করে আসছে। সুনয়নী তখনো দরজার কাছে পৌঁছতে পারেনি। হোঁচট খেয়ে সেও গড়িয়ে পড়েছিল সিঁড়ি থেকে। অবিনাশ তিন ধাপ উঁচু সিঁড়ি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুনয়নীর ওপর।

—এইবার—

—ছাড়ো, ছাড়ো বলছি—

—হ্যাঁ ছাড়ছি। বলে অবিনাশ আঁচল চেপে ধরতেই সুনয়নীর হাতের পিস্তল গর্জে উঠল।...

শিবানন্দ ভট্টাচার্য থামলেন। দুবার কেশে নিয়ে বললেন, এইভাবেই পিশাচ অবিনাশ বক্সী সুনয়নীর হাতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করল। আগের রাত থেকে আমার লোকেরা অবিনাশের বাড়ির ওপর লক্ষ্য রাখছিল। তারা উদ্ভ্রান্ত সুনয়নীকে আমার কাছে নিয়ে এল। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সুনয়নীকে নষ্ট হতে দেব না। তার স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দেবই। আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়েছে।

বলে বৃদ্ধ শিবানন্দ কাঁপা কাঁপা দুই হাত তুলে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম জানালেন।

—তারপর?

—তারপর কি হতে পারে আপনারা অনুমান করে নিন। অবিনাশের অতৃপ্ত আত্মা নিশ্চয় ঐ গোলবাড়িতে অপেক্ষা করেছিল বছরের পর বছর, কবে সুনয়নীকে পাবে। সে বোধহয় এমনই ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল যে এত বছর পরেও আকর্ষণ করে এনেছিল নতুন প্রজন্মের সুনয়নীকে। কিন্তু সৌভাগ্য—এবারেও চরম ক্ষতি করতে পারল না।

সঞ্জয় আশ্চর্য হয়ে বলল, আপনার মতে কি রীণাই সে সুনয়নী?

—তাই তো মনে হয়। রহস্যময় জন্মান্তরবাদের ওপর কে শেষ কথা বলবে?

—আমি বিশ্বাস করি না।

শিবানন্দের চোয়াল শক্ত হল। উত্তেজিত গলায় বললেন, সেটা আপনার অভিরুচি। এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করব না। আপনারা একটা পুরনো বাড়ির খবর জানতে এসেছিলেন আমি খবরের সঙ্গে একটা বিশেষ ঘটনাও জানিয়ে দিলাম। যে ঘটনার সঙ্গে আমিও জড়িয়ে ছিলাম।

একটু থেমে বললেন, তবে আপনার স্ত্রীকে দেখতে পেলে অন্তত নিজের কাছে নিজে পরিষ্কার হয়ে যেতাম।

ডাক্তার রুদ্র পকেট থেকে সঞ্জয় আর রীণার ছবিটা বের করে বললেন, দেখুন তো এই ছবিটা।

শিবানন্দ ছবিটা হাতে নিয়ে চোখের খুব কাছে ধরে দেখতে লাগলেন। তার পর নাটিকে বললেন, আমার তেরো নম্বর কাগজের বাণ্ডিলটা নিয়ে এসো তো!

ভদ্রলোক তখনি ভেতরে চলে গেলেন। শিবানন্দ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রীণার ছবিটা দেখতে লাগলেন।

মিনিট দশেক পরে নাতি পুরনো দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা ফাইল নিয়ে এলেন।

ধুলো ঝেড়ে শিবানন্দ সেটা খুলে একগাদা কাগজপত্রের মধ্যে থেকে বের করলেন আর এক দম্পতির ফটো। ফটোটোর রঙ হলদেটে হয়ে গেছে। চারিদিকে পোকায় কেটেছে।

ছবিটা একবার দেখে নিয়ে শিবানন্দ দুখানি ছবিই ডাক্তার রুদ্রের হাতে দিয়ে বললেন, এইটে সুনয়নী আর তার স্বামীর ফটো। থানায় যদি দরকার হয় মনে করে সুনয়নীর স্বামীর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলাম। এবার দুটো ছবিই আপনারা ভালো করে দেখুন।

ডাক্তার রুদ্র ছবি দুখানা দেখলেন। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কি ভাবতে ভাবতে ছবিটা সঞ্জয়ের হাতে দিলেন।

কিশোরী মেয়েটি এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। চকিতে একবার সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে শিবানন্দকে বলল, সঙ্কে হয়ে গেছে খাবে চলো।

—হ্যাঁ, চলো।

শিবানন্দ উঠে বসলেন। নাতি এসে কাছে দাঁড়ালেন।

—তবু যদি আপনাদের সন্দেহ থাকে আপনার স্ত্রীকে একদিন নিয়ে আসবেন। তাঁকে কিছু বলবেন না। দেখবেন তিনি আমায় চিনতে পারেন কি না। তা হলেই সত্যাসত্য প্রমাণ হয়ে যাবে। নমস্কার।

বলে নাতির হাত ধরে কাশতে কাশতে ভেতরে চলে গেলেন।

ট্যাক্সিতে সারাক্ষণ দুজনে একটি কথাও বলেননি।

ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে।

নামবার সময়ে সঞ্জয় বলল, তাহলে কালই কি রীণাকে নিয়ে শিবানন্দবাবুর কাছে যেতে বলেন?

—কখনোই না।

সঞ্জয় থমকে গেল।

—কেন? একটা মীমাংসা হয়ে গেলে হতো না? যদিও ছবিতে দুজনের খুবই মিল তবু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

ডাঃ রুদ্র হেসে বললেন, কি দরকার বিশ্বাস করে? ও নিয়ে আর মাথা ঘামিও না। এমনকি, আমার বিবেচনায় রীণার কাছেও এ-সব কথা বলার দরকার নেই। ঐ যে রীণা আমাদের দেখতে পেয়েছে। হাত নাড়ছে।

সঞ্জয়ও ওপরে তাকালো। হেসে হাত নাড়ল।

—আমি এই ট্যান্ডিতেই বাড়ি চলে যাই।

সঞ্জয় বলল, তা কি করে হয়? একটু কফি খাবেন না? ঐ দেখুন রীণা আপনাকে ডাকছে।

ডাঃ রুদ্র হাসতে হাসতে ট্যান্ডি থেকে নেমে এলেন।

---

/

গল্প

## সূচিপত্র

আতঙ্ক

রহস্যময়ী

অলৌকিক ক্যালেন্ডার

বাইসনের শিং

নিষেধ

অন্ধকার সিঁড়ি

ভয় পেয়েছিলাম

নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে

# আতঙ্ক

হঠাৎ কলিংবেল বাজল। খুব আশ্চর্য। বেল বাজানোর ধরন শুনেই বোঝা গেল অপরিচিত কেউ। নিশ্চয়ই ভদ্র, বিনীত। তবু অনাদিবাবু অবাক হলেন। এই অসময়ে কে আসতে পারে?

জায়গাটা কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকার কুঁদঘাট। একসময়ে পরিত্যক্ত ছিল। এখন দিন যত যাচ্ছে ততই লোকবসতি বাড়ছে। তবু এখনো এখানে-ওখানে বাঁশঝাড়, জলা-জঙ্গল। বাইরে থেকে এসে সে সময়ে অনাদিবাবু বুদ্ধিমানের মতো সামান্য টাকায় বাড়িটা করে ফেলেছিলেন। পাড়ার সকলেই পরিচিত।

এখন বেলা দুটো। অনাদিবাবু খেয়েদেয়ে কাগজ পড়ছিলেন। এমনি সময়ে কলিংবেল বাজল কি-রিং।

অনাদিবাবু উঠে দরজা খুলে দিয়ে প্রথমে কিছুটা অবাক হলেন। তারপরেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন, আসুন—আসুন।

সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীকে ডাকলেন, শুনছ? দেখে যাও কে এসেছেন।

ভদ্রমহিলাকে হঠাৎ দেখলে ভয় পেতে হয়। কুচকুচে কালো রঙ, মাথার চুল জট পাকিয়ে গিয়েছে। নাকটা থ্যাবড়া। চোখ দুটো গোল। একটু লালচেও। পরনে গেরুয়া কাপড়। কাছা দিয়ে পরা। হাতের ক্যান্সিসের ব্যাগটা মাটিতে রেখে হাতজোড় করে অনাদিবাবুদের নমস্কার করে ইংরিজিতে বললেন, দেখা করতে এলাম।

অনাদিবাবু আর তাঁর স্ত্রী দুজনেই নমস্কার করে বললেন, আমাদের সৌভাগ্য।

মাদ্রাজী এই মহিলাটির সঙ্গে অনাদিবাবু আর তাঁর স্ত্রীর পরিচয় হয়েছিল বছর তিনেক আগে দক্ষিণ ভারতে তিরুপতির পাহাড়ে। ভদ্রমহিলা দীর্ঘদিন ধরে প্রেতচর্চা করেন। শুধু প্রেতচর্চাই নয়, মনোবিকারগ্রস্ত লোকেদের ওপর প্রচণ্ড শক্তিতে প্রভাব বিস্তার করতেও পারেন।

এঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে অনাদিবাবুরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ফিরে আসবার সময়ে অনাদিবাবু বলেছিলেন, মাতাজি, কলকাতায় যখনই আসবেন, আমার বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দেবেন।

মাতাজি কথা দিয়েছিলেন। গতবার দার্জিলিং যাবার পথে কলকাতায় এসে



দেখা করেছিলেন। এবার যাচ্ছেন কাশ্মীর-পহেলগাঁও। যাবার পথে তাই দেখা করতে এসেছেন।

দুপুরবেলায় বিশ্রামের পর বিকেলে ওঁরা তিনজন বসে গল্প করছেন, শুভা কলেজ থেকে ফিরল। তাকে দূর থেকে দেখেই মাতাজি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। অনাদিবাবু বললেন, আমাদের মেয়ে শুভা, একটিমাত্র মেয়ে।

শুভা ভুরু কুঁচকে মাতাজিকে একবার দেখেই চলে যাচ্ছিল, শুভার মা ডাকলেন, ও কি! চলে যাচ্ছ কেন? প্রণাম করো। সেবার সাউথে গিয়ে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

শুভা কোনোরকমে প্রণাম করে বেজার মুখে দাঁড়িয়ে রইল। মাতাজি যেন কেমন একরকমভাবে শুভাকে দেখছিলেন।

—আপনাদের মেয়ে? তিরুপতিতে তো দেখিনি। আগের বার এসেও দেখিনি।

অনাদিবাবু বললেন, তিরুপতিতে ও যায়নি। আর যেবার আপনি এখানে এসেছিলেন তখন ও ছিল ওর মামার বাড়িতে।

মাতাজি শুভাকে দেখতেই লাগলেন। শুভার মা বললেন, শরীরটা ওর মোটেই ভালো যাচ্ছে না। দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে। খাওয়া একরকম বন্ধ। সব সময়ে কী ভাবে। আর মেজাজ—

মায়ের কথার মাঝখানেই শুভা বিরক্ত হয়ে চলে যাচ্ছিল, মাতাজি সম্মেহে ওর হাতটা চেপে ধরে ইংরিজিতে বললেন, রাতে তোমার বোধহয় ভালো ঘুম হয় না। তাই না?

শুভা এক মুহূর্তের জন্যে অবাক হয়ে মাতাজির দিকে তাকাল। তারপর “জানি না” বলে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল।

শুভার মা খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, দেখলেন তো কিরকম অভদ্র! কিন্তু এরকম ও ছিল না। বছর চারেক থেকে ও যেন কেমন হয়ে উঠছে।

—বছর চারেক? এখন তো ও কলেজে পড়ছে। তাহলে তখন—

—তখন ক্লাস নাইনে পড়ত। পড়াশোনায় খুব ভালো। ধীর, শান্ত—

বাধা দিয়ে মাতাজি বললেন, ইস্কুলে কি ওর কোনো অশান্তি ছিল?

শুভার বাবা বললেন, না, অশান্তি আর কি। পড়াশোনা নিয়েই থাকত। তবে—

এই পর্যন্ত বলে তিনি শুভার মায়ের দিকে তাকালেন।

শুভার মা বললেন, তবে অশান্তি বাধাত একটি মেয়ে—শিখা। গাজিয়াবাদ

না কোথা থেকে নতুন এসেছিল। যেমনি রূপ, তেমনি দেমাক। সে শুভাকে একেবারে সহ্য করতে পারত না। ও পড়াশোনায় ভালো, দেখতে খারাপ নয়, সবাই ওকে ভালোবাসত। আর শিখা হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরত। আশ্চর্য!

মাতাজি হেসে বললেন, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এক ধরনের মানুষ থাকে যারা স্বভাবতই ঈর্ষাপরায়ণ। তারা কাউকে সুখী হতে দেয় না, নিজেও সুখী হতে পারে না।

একটু থেমে বললেন, মেয়েটিকে কি আপনি কখনো দেখেছিলেন?

—হ্যাঁ, একবারই।

—মেয়েটি কি খুব বেপরোয়া?

—খুবই। টিচারদেরও নাকি মানত না।

মাতাজি টেবিলের ওপর একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, হাতে ছড়ি জাতীয় কিছু নিয়ে বেড়াতে ভালোবাসত? পায়ের কাছে ডিল পেলে কুড়িয়ে নিয়ে অকারণে কুকুর, ছাগল মারত?

শুভার মা হেসে বললেন, অত বলতে পারব না। তবে বিরাট একটা কুকুর নিয়ে ঘুরত। একদিন শুভাকে রাস্তায় একা পেয়ে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। ভাগ্যি ঠিক সেই সময়ে মেয়েটার দাদা এসে পড়েছিল। তাই শুভা বেঁচে গিয়েছিল।

—যাক, একটা বড়ো রকমের অ্যাকসিডেন্ট থেকে আপনার মেয়ে বেঁচে গিয়েছে। আচ্ছা, সে কি আপনার মেয়েকে কোনোভাবে টিজ করত?

—নিশ্চয়। তার টিজ করার জ্বালায় তো শুভাকে ইস্কুল ছাড়তে হতো।

—কিরকম টিজ করত একটু বলুন।

—সে আর কত বলব। দল পাকিয়ে ওর বিরুদ্ধে নানা কথা রটাত, অঙ্গভঙ্গি করে ভ্যাঙাত। সিঁড়ি দিয়ে হয়তো নামছে—শিখা ওপর থেকে এসে হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে চলে যেত। এমনি কত। শুভা তো সব বলত না।

মাতাজি মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন—মেয়েটি এখন কোথায়? নিশ্চয়ই এখানে নেই?

শুভার মা বললেন, ঠিকই বলেছেন। ওরা এখন আর এখানে নেই। ইস্কুল ছেড়ে দেবার পরই চলে যায়।

—ইস্কুল ছেড়ে দিল কেন?

—সেও এক কাণ্ড। একদিন শিখা টিফিনের সময়ে আর একটা মেয়ের বই চুপি চুপি নিয়ে শুভার ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে চোর সাজাবার চেষ্টা করে।

মেয়ে তো কেঁদেকেটে অস্থির। এই নিয়ে তুলকালাম। একটি মেয়ে বুঝি শিখার কাণ্ডকারখানা দেখে ফেলেছিল। সেই সব ফাঁস করে দেয়। শিখা ছুটে গিয়ে সেই মেয়েটার গলা টিপে ধরে। মেরেই ফেলত। ভাগ্যজোরে বেঁচে যায়। হেডমিস্ট্রেস শিখার গার্জনের কাছে কড়া ভাষায় চিঠি লিখলেন। ব্যস! তারপরই শিখা ইস্কুল ছেড়ে দিল।

মাতাজি বললেন, কিন্তু তাতেও অশান্তি ঘুচল না, কি বলুন?

—ওরে বাবা! অশান্তি ঘুচবে কি, আরো বেড়ে গেল। উড়ো চিঠি আসতে লাগল—পড়াশোনা না ছাড়লে শুভাকে মরতে হবে। কী সাংঘাতিক কথা ভাবুন তো!

মাতাজি বললেন, শুভা নিশ্চয়ই ইস্কুল ছাড়েনি?

—সে মেয়েই নয়।

—উড়ো চিঠির কথা পুলিশে জানিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। কিন্তু ওরা তখন এ তল্লাট থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে পালিয়েছে।

মাতাজি চুপ করে ভাবতে লাগলেন।

শুভার মা বললেন, মেয়ের যে তারপর কী হলো—হাসি নেই—আনন্দ নেই—দিন দিন যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে।

মাতাজি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আমি একবার আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা বলব। আমি নিজেই যাচ্ছি ওর কাছে। আপনারা এখানেই থাকুন।

টেবিলের ওপর দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে বসেছিল শুভা। মাতাজি ঢুকেই বললেন, রাত্তিরে তোমার ঘুম হয় না। নিশ্চয় তুমি ভয় পাও?

শুভা বিরক্ত হয়ে মুখ তুলে তাকাল।

মাতাজি বলতে লাগলেন, আমি জানি যখনই তুমি একা থাক তখনই কিছু দেখতে পাও। ঠিক কিনা?

শুভা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

—উত্তর দাও?

এবার শুভা নিজের অজান্তেই উঠে দাঁড়াল। কোনোরকমে বলল, হ্যাঁ।

—কি দ্যাখ, পরিষ্কার করে বলো।

শুভা একটু চুপ থেকে বলল, তেমন কিছু নয়, ঘরে হয়তো একা পড়ছি, বাড়িতে কেউ নেই, মনে হলো কেউ যেন চট করে সরে গেল। কখনো মনে হয় পিছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। রাতে প্রায় কিরকম একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে যায়। দেখি ঘরের মধ্যে কি যেন নড়ে বেড়াচ্ছে। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে যাই। বুকের মধ্যে কিরকম করে।

—মা-বাবাকে এ কথা বলেছিলে ?

—না।

—কেন ?

—কেউ বিশ্বাস করবে না। উল্টে ঠাট্টা করবে। নইলে বলবে মানসিক ব্যাধি। আমি সায়েন্স-পড়া মেয়ে। আমি নিজেকে বুঝি। জানি এ আমার ব্যাধি নয়। কেউ একজন আমাকে মারবার চেষ্টা করছে।

মাতাজি শাস্ত গলায় বললেন, কে মারবে তোমায় ?

শুভার মুখটা হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল। বলল, তা জানি না। তবে যে আমাকে রোজ ভয় দেখাচ্ছে সেই-ই আমায় মারবে।

মাতাজি চুপ করে তাঁর নিজের আঙটির মস্তবড়ো পাথরটা অকারণ নাড়তে লাগলেন। তারপর বললেন, আমি শুধু আর একটা কথা জিগ্যেস করব। তুমি কি এর মধ্যে কোনোদিন তোমার ইস্কুলের সেই মেয়েটিকে—শিখা যার নাম—স্বপ্নে কিংবা অন্য কোনোভাবে দেখেছ ?

শুভা অবাক হয়ে বলল, তা কি করে দেখব! ও তো আর এখানে নেই। কোথায় আছে তাও জানি না।

মাতাজি একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, তাও হয়তো শীগগির জানতে পারবে। তবে আমার একটা কথা—কিছুতেই ভয় পেও না। মনে রেখো দুট্ট আত্মা ভয় দেখাতেই পারে, সজীব মানুষের কোনো ক্ষতি করতে পারে না, যদি না জীবিত মানুষ নার্সাস হয়ে পড়ে।

—কি-স্ব—দুট্ট আত্মার কথা বলছেন কেন ? শুভার গলা কঁপে উঠল। শিখা কি তবে—

—ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। আমি আজ যাচ্ছি। পরে আবার দেখা হবে। বলে শুভার মাথায় হাত রাখলেন।

সঙ্গে সঙ্গে শুভার শরীরটা কেমন করে উঠল। যেন ইলেকট্রিকের শখ খেল।

তারপর একদিন।

গভীর রাত। আকাশে মেঘ থমথম করছে। শুভার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। কেবলই এপাশ-ওপাশ করছে। পাশের ঘরেই বাবা ঘুমোচ্ছেন। এখান থেকেই নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। শুভার মনে হলো সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষই বুঝি ঘুমোচ্ছে। জেগে শুধু সে একা।

ভাবতে ভাবতে কখন একসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল কতকগুলো কুকুরের ডাকে। কুকুর তো ডাকতেই পারে। অমন কত দিন কত রাত্রে কত কুকুর ডেকে গেছে। কিন্তু আজকের ডাকটা যেন কেমন। যেন প্রচণ্ড ভয়ে কুকুরগুলোর গলা কাঁপছে। কুকুরের ডাকটা ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল। আর তারপরেই শুভার ঠিক মাথার জানলাটায় শব্দ হলো খট্-খট্-খট্। সেই সঙ্গে ঝড়ের গোঙানি।

ঝড়েই কি জানলা খট্খট্ করছে?

শুভা ধড়মড় করে হাতের ওপর ভর দিয়ে মাথা তুলে জানলার দিকে তাকাল। কি যেন দেখল। সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত দেহটা অবশ হয়ে গেল। একটা ছায়ামূর্তি। ঠিক যেন—ঠিক যেন—

—কিরে চিনতে পারছিস? জানলার গ্রিলটা ধরে বাইরে ঝুলছে শিখা। ঝোড়ো হাওয়ায় তার লম্বা চুলগুলো উড়ছে। মুখটা ভালো দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু গলার স্বর পরিষ্কার। চিনতে না পারিস তো মনে করিয়ে দিই। আমি তোদের সেই শিখা। তোর জন্যেই আমাকে ইস্কুল ছাড়তে হয়েছিল। তোর জন্যেই অনেক অপমান। প্রতিশোধ তখন নিতে পারিনি। এখন নেব। আজ আমার মৃত্যুদিন। তাই দেখা করে গেলাম।

শিখা একটু থামল। জানলার গ্রিলে মাথাটা রেখে কেমন একরকম চোখ বের করে তাকাল। তারপর বলল, আজ থেকে সাত দিনের মধ্যে তোকে মারবই। কথাটা জাণিয়ে গেলাম।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো। সেইটুকু আলায় শুভা দেখল কী যেন একটা হাওয়ায় সাঁতার কেটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শুভা চিৎকার করে উঠল।

ব্যাপারটা সবাই শুনল। এটা যে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। তবু সাতটা দিন সবাই শুভাকে সাবধানে থাকতে বলল। শুভা বিমর্ষ গলায় বলল, কী আর সাবধান হবে?

ছটা দিন কেটে গেল। এতটুকু অশুভ ছায়া নেই। রাত্তিরে সেই যে কুকুরের ডাক শুনেছিল, সে ডাকও আর শোনা যায়নি। এমন কি ঘুমেরও ব্যাঘাত হয়নি। কিন্তু পরের দিন—

দিনের বেলা। ঘড়িতে তিনটে বাজল। রোজকার মতো শুভা দোতলার ছাদে উঠল শুকনো কাপড় তুলতে। একমনে কাপড় তুলে যাচ্ছিল। লক্ষ্য

পড়ল, কয়েকটা বাড়ির পরে যে বাড়িটা, তার ছাদে দাঁড়িয়ে তারই বয়সী একটি মেয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। মেয়েটিকে শুভা চিনতে পারল না। কোনোদিন দেখেছে বলেও মনে হলো না। সে একটা একটা করে শাড়ি, ব্লাউজ, খুতি আলসে থেকে তুলতে লাগল। কিন্তু মুশকিল হলো বাবার গেঞ্জিটা নিয়ে। গেঞ্জিটা উড়ে পড়েছে কার্নিসের ওপর। একটু জোর বাতাস পেলেই পড়বে রাস্তার নর্দমায়। অথচ আলসে থেকে ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়ালেও নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। শুভা একটা লাঠি বা লম্বা কাঠি খুঁজল। কিন্তু তেমন কিছু পেল না। নিচে গিয়ে কিছু একটা নিয়ে এলেই হয়, কিন্তু শুভার আর নিচে নামতে ইচ্ছে করল না। ঠিক করল গেঞ্জিটা নিয়ে তবে যাবে।

কিন্তু নেবে কি করে? ওটা যে নাগালের বাইরে। নিতে গেলে তাকে আলসে টপকে ঐ সরু কার্নিসের ওপর নামতে হয়। আর ওখানে নামা মানেই হয় কার্নিস ভেঙে, না হয় মাথা ঘুরে একেবারে রাস্তায় পড়ে যাওয়া। পড়লে আর রক্ষে নেই।

শুভা আলসের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেঞ্জিটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল। তার মনে হলো পড়ে যাওয়া কি এতই সোজা? সার্কাসে সে শূন্য দোল খাওয়ার কত খেলা দেখেছে। তারাও তো তারই মতো মেয়ে। তারা কি পড়ে যায়? তারা যদি অমন মারাত্মক খেলা খেলতে পারে তাহলে সে কেন কার্নিসে নেমে সামান্য একটা গেঞ্জি তুলে আনতে পারবে না?

কী করবে ভাবছে হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল সেই মেয়েটার দিকে। সে হাসছে আর আশ্চর্য—হাত দিয়ে ক্রমাগত ইশারা করছে কার্নিসে নামার জন্যে। এবার শুভা আর কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। লোকে যেমন করে ঘোড়ায় চাপে তেমনি করে পরনের শাড়িটা গুটিয়ে আলসের ওপর চেপে বসল। সে যে কী অদ্ভুত দৃশ্য! তারপর যেই ডান পা-টা বাড়িয়ে দিয়েছে মরণ-ফাঁদের দিকে অমনি কে যেন কঠিন স্বরে ডাকল, শুভা! নেমে এসো শীগগির!

শুভা চমকে উঠে দেখল ছাদে কখন বাবা উঠে এসেছেন। বাবাকে দেখে তার যেমন আনন্দ হলো তেমনি ভয় হলো। তার মনে হলো সে যেন ইচ্ছে করে কত বড়ো অপরাধ করতে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি আলসে থেকে নেমে মাথা নিচু করে নিচে নেমে গেল।

ক’দিন মোটামুটিভাবে কাটল। শুভার মানসিক অবস্থার কিন্তু উন্নতি নেই।

বরং আরো একটু খারাপ হয়েছে। যখন-তখন ছাদে যাচ্ছে। সেই মেয়েটাকে আর একবার দেখতে চায়। অনাদিবাবু শেষে বাধ্য হয়ে ছাদের সিঁড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন।

সেদিন গভীর রাতে আবার সেই কুকুরের ডাক। শুভার ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকার ঘর। তার কিরকম ভয় করল। পাশেই মা শুয়েছিলেন। শুভা অন্ধকারে মাকে একবার ছুঁলো। একটু পরে মাথার কাছে জানলায় ঠুক ঠুক শব্দ। কে যেন বন্ধ জানলাটা খুলতে বলছে। শুভার দেহ হিম হয়ে গেল। মাকে ডাকতে গেল। স্বর বেরোল না।

—খুব বেঁচে গেলি সেদিন!

শুভা চমকে উঠল। শিখার গলা।—একেবারে ঘরের মধ্যে!

—ভাগ্যি তোর বাবা এসে পড়েছিল! কিন্তু এবার আর কারো সাধ্য নেই বাঁচায়। কালই তোকে মারব। বলতে বলতে স্বরটা যেন ফ্যানের হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

পরের দিন। সকাল থেকেই শুভা মা-বাবার কড়া পাহারায়। শুধু মা-বাবাই নন, পাড়া-প্রতিবেশীরাও বারে বারে আসছে-যাচ্ছে। কেবলই লক্ষ্য রাখছে শুভার ওপর। এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার! অথচ উড়িয়ে দিতেও পারছে না। শুভা কিন্তু বিরক্ত হচ্ছে। সে কী চিড়িয়াখানার নতুন কোনো জন্তু যে সবাই তাকে দেখে যাচ্ছে? রাগ করে সে ঘরে খিল দিল।

বেলা তখন প্রায় একটা। অনাদিবাবু পুরনো খবরের কাগজ বিক্রি করছিলেন বাইরের ঘরে বসে। শুভার মা বাথরুমে। হঠাৎ অনাদিবাবু শুনলেন রাস্তায় একটা হৈচৈ—গেল—গেল—গেল—

তিনি একলাফে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন দুটো ট্যাক্সি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আর সেখানে লোকের ভিড়। একটু পরেই কারা একটি মেয়েকে ধরাধরি করে নিয়ে এল।

—শীগগির একটু জল!

না, শুভা মরেনি। দুটো ট্যাক্সির মুখে পড়েও আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেছে।

জ্ঞান ফিরে আসার পর শুভা অল্প দু’-একটা কথা যা বলল তা এই—

খিল বন্ধ করে জানলায় দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ দেখল সেদিনের সেই মেয়েটা খুব সেজে রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হি-হি করে হাসছে। কে এই মেয়েটা, কোথায় তার বাড়ি, কেনই বা তাকে দেখলেই হাসে

জানার জন্যে সে তখনি খিড়কির দরজা দিয়ে ছুটে গিয়েছিল। তারপর আর কিছুই মনে নেই।

কয়েকটা মাস বেশ ভালোভাবেই কাটল। আর কোনো উপদ্রব নেই। শুভা ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। আজকাল সবার সঙ্গে গল্প করে, হাসে। ওকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে ওর মা এখন ওকে সংসারের টুকিটাকি কাজ দেন।

সেদিন বেলা তখন সাড়ে এগারোটা। অনাদিবাবু বললেন, শুভা, একটু চা করো তো। বলে নিচে নেমে গেলেন। শুভার মা গেলেন ঠাকুরঘরে। দোতলাটা একেবারে ফাঁকা। নিস্তব্ধ। শুভা রান্নাঘরে এসে স্টোভ জ্বালিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে দিল। একটু পরে তার শরীরটা কেমন করে উঠল। মনে হলো যেন দুর্বল হয়ে পড়ছে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। শুভা উঠে দাঁড়াল। রান্নাঘরের সামনের বারান্দাটার দিকে তাকাল—খাঁ খাঁ করছে। সামনের ঘরগুলোও ফাঁকা। এরকম তো রোজই ফাঁকা থাকে। কিন্তু আজ কেন এত ভয় করছে? মনে হচ্ছে যেন বাড়িতে কেউ নেই। সবাই তাকে ফেলে পালিয়ে গেছেন। মনে হচ্ছে এটা যেন কোনো ভুতুড়ে বাড়ি।

শুভা কেমন যেন ভয় পেয়ে গোঙাতে লাগল। মনে হতে লাগল এখনি সে বুঝি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে।

আর ঠিক সেই সময়ে সে স্পষ্ট দেখল তার সামনে শিখা দাঁড়িয়ে। রান্নাঘরের দোরগোড়ায়। দু'চোখে আগুন-ঝরা দৃষ্টি। একরাশ কালো চুল বাতাসে উড়ছে।

—দু'বার ঘেঁচে গেছ। এবার রেহাই নেই। বলে শিখা দু'হাত বাড়িয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল। আর শুভা পিছোতে লাগল জ্বলন্ত স্টোভের দিকে। ক্রমশ আগুনের তাত তার গায়ে লাগল। তবু পিছোচ্ছে শুভা। না পিছিয়ে উপায় নেই। শিখা রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে।

চিৎকার করতে গেল শুভা, পারল না। ঠিক এই মুহূর্তে বাইরের ঘরের দরজায় কলিংবেল বাজল—কি-রিং-কি-রিং—

শুভা শুনতে পেল বাবা দরজা খুলে দিলেন। শুনতে পেল, কাকে যেন সাদর অভ্যর্থনা করছেন—আসুন—আসুন।

সেই সঙ্গে আরো শুনতে পেল কোনো মহিলার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, শীগগির আমায় ওপরে নিয়ে চলুন।



সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দ। কে যেন হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসছে। শুভা যেন জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে। দেওয়াল ধরে সামলে নিল কোনোরকমে। না, শিখা নেই। শুভা তবু ভয়ে ভয়ে তাকাল। দেখল সামনে ক্যান্সিসের ব্যাগ হাতে মাতাজি দাঁড়িয়ে।

মাতাজি হেসে বললেন, ভয় নেই। ও আর কোনোদিন আসবে না। আজ ওর আত্মা মুক্তি পেয়ে গেল।

ততক্ষণে শুভার মা-বাবাও এসে পড়েছেন। তাঁরা অবাক হলেন, রান্নাঘরের কাছ থেকে ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভুরভুর করে আসছে।

---

# রহস্যময়ী

সে দিন বাসে একটি মেয়েকে দেখলাম। সুন্দরী মেয়ে। মুখ-চোখ নিখুঁত। রঙ ফর্সা। কিন্তু—

লক্ষ্য পড়ল ওর বাঁ হাতের কজির ওপর। অনেকখানি জায়গা জুড়ে কালো জরুল। আর সেই জরুল থেকে কয়েকটা কালো কালো লম্বা লোম বাতাসে শুঁয়োপোকাকার মতো নড়ছে।

দেখে চমকে উঠলাম।

মেয়েটির জন্যে দুঃখ তো হচ্ছিলই—আহা, অত সুন্দরী মেয়ে—তারও কী সাংঘাতিক খুঁত। তবু যে চমকে উঠেছিলাম তার কারণ আছে।

সেদিন ঐ মেয়েটিকে দেখে হঠাৎ মনে পড়ে গেল কয়েক বছর আগের একটি ঘটনা। ঘটনাটা শুনেছিলাম সত্যব্রতর মুখেই। শোনার পর বেশ কয়েক রাত ঘুমোতে পারিনি। কেবলই মনে হয়েছিল—এ কি সম্ভব?

সেই ঘটনার কথা বলি।

সত্যব্রত তখন সবে ডাক্তারি পাস করেছে। বড়লোকের ছেলে। টাকার অভাব নেই। ছোটোবেলা থেকে তার ইচ্ছে ছিল—ডাক্তার হবে। আর ডাক্তার হয়ে কলকাতায় বসবে না। বসবে কোনো পল্লীগ্রামে। কলকাতায় তো বড়ো ডাক্তারের অভাব নেই। কিন্তু পল্লীগ্রামে বড়ো ডাক্তার নেই। বড়ো ডাক্তাররা সহজে শহর-বাজার ছেড়ে গ্রামে যেতে চায় না। কেননা গ্রামে নাকি পসার জমে না। রুগীর অভাব হয় তো হয় না কিন্তু টাকা? গ্রামের সাধারণ লোক ভারি গরিব। তারা ডাক্তারকে বেশি পয়সা দিতে পারে না।

আজকাল মানুষের মনটাই বদলে গেছে। টাকা ছাড়া মানুষ আর কিছু ভাবতে পারে না। যেখানে যত বেশি টাকা সেখানেই পাগলের মতো ছোটো।

কিন্তু সত্যব্রতর মনটা ছিল অন্যরকম। সে ভাবত টাকা নেই বলেই তারা বড়ো ডাক্তার দেখাতে পারবে না? এরকম হওয়া উচিত নয়।

তাই সত্যব্রত একদিন মা-বাবাকে প্রণাম করে একটা বেডিং, আর একটা সুটকেস নিয়ে রানীচকে চলে এল।

এখানে তার বাবার ছোটোবেলার এক বন্ধু থাকতেন। তিনিই উৎসাহ করে সত্যব্রতকে গ্রামে এনে বসাতে চেয়েছিলেন।

সেখানে একটা ছোটোখাটো ডিসপেন্সারি ছিল। তিনি বললেন, বাবা সত্য, এসবই তোমায় দিলাম। তুমি শুধু এখানে থাকো। গ্রামের লোকদের বাঁচাও।

বাড়িটা পুরনো। দোতলা বাড়ি অবশ্য। ওপরে দু'খানা ঘর। নিচে দু'খানা। সে আমলের খড়খড়ি দেওয়া জানলা। ছাদের নিচে বড়ো বড়ো মোটা কড়ি। দেওয়ালে নোনা ধরেছে। হয়তো বা বর্ষায় ঘরের মধ্যে জলও পড়ে একটু-আধটু। আলসের কোণ ফুঁড়ে একটা অশখগাছের চারা দিবি মাথা তুলেছে।

এ রকম পুরনো নির্জন বাড়িতে সত্যব্রতর থাকা অভ্যেস নয়। তার ভারি মজা লাগল। ভাবল মন্দ কি! নতুনত্ব আছে। মানুষকে তো সবরকম অভ্যেসের মধ্যে দিয়ে চলতে হয়। নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই মানুষ বড়ো হয়। এও একটা অভিজ্ঞতা।

সত্যব্রত দেখল, ডিসপেন্সারিতে ওষুধপত্তর নেই বললেই হয়। যাও বা আছে সব পুরনো। এখন কত নতুন নতুন ওষুধ বেরিয়েছে, তার কিছুই নেই।

সত্যব্রত একটা লিস্ট করে নিজেই টাকা দিয়ে সেসব ওষুধ আনিয়ে নিল।

দেখতে দেখতে সত্যব্রতর হাতযশ ছড়িয়ে পড়ল। শুধু রানীচকই নয়—পাশাপাশি গ্রাম থেকেও রুগী আসতে লাগল। তারা সাধ্যমতো যা দেয় সত্যব্রত খুশি হয়ে তাই নেয়। সবাই বললে, এমন ডাক্তার হয় না।

শহর-বাজারেই রাত-বিরেতে ডাক্তার ডাকলে আসতে চায় না। গ্রামে তো কথাই নেই। রুগী মরে যাচ্ছে শুনলেও ডাক্তারবাবুরা আসবেন না। তাঁদের অনেক অজুহাত। গরমে বলবেন—সাপ, বর্ষায় বলবেন—জলকাদা, শীতে বলবেন—ঠাণ্ডা। আবার কেউ কেউ অন্য ভয়ও পান। সে কথা থাক।

সত্যব্রত এসবই জানত। রুগীদের বললে, গুরুতর কেস হলে তোমরা আমার কাছে এসো। যত রাতই হোক আমি যাব। গ্রাম-বৃদ্ধরা দু'হাত তুলে সত্যব্রতকে আশীর্বাদ করলেন।

তার পর থেকেই সত্যব্রতর রাতের ঘুম ছুটে গেল। কেবল রুগীর বাড়ি থেকে ডাক আসে। কখনো দূর দূর গ্রাম থেকেও।

সন্ধ্যার সময় গ্রামের দু'-চারজন প্রৌঢ় সত্যব্রতর ডিসপেন্সারিতে এসে বসেন। বয়েসে সত্যব্রত তাঁদের চেয়ে অনেক ছোটো। হলেও ডাক্তার তো। তাঁরা গল্পগুজব করেন। জ্বরজ্বালা হলে বিনা পয়সায় ওষুধও নেন।

তাদের মধ্যে একজন একদিন কথায় কথায় বললেন, বাবাজি, তুমি যে রাত-বিরেতে ‘ডাক’ এলেই ছুট করে ছোটো এতে তোমার উঁচু মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে কিনা নিজের জীবনটা বাঁচিয়ে।

সত্যব্রত ভাবল, উনি বুঝি তার বেশি পরিশ্রমের কথা বলছেন। তাই হেসে বললে, এ বয়েসটা তো পরিশ্রম করারই বয়েস চরণকাকু।

—না না, পরিশ্রমের কথা নয় বাবাজি। আমি বলছি অন্য কথা।

তারপর একটু থেমে বললেন, তুমি আজকালকার ছেলে—কলকাতার ছেলে—ওসব মানবে কিনা জানি না, তবে মনে রেখো পাড়াগাঁয়ে এখনো নানারকমের অলৌকিক ভয় আছে।

সত্যব্রত উৎসাহে নড়েচড়ে বসল। হেসে বলল, অলৌকিক ভয়! সেটা কিরকম?

—হাসছ বাবাজি? হাসির কথা নয়। এই তো সেবার—তোমারই মতো একজন নতুন ডাক্তার এলেন। তার পর একমাসও কাটল না হঠাৎ একদিন সকালে দেখা গেল ঐ রানীসায়রে তাঁর দেহ ডাসছে।

—আত্মহত্যা করেছিলেন?

—না। রাত্রে নিশি ডেকে নিয়ে জলে ডুবিয়ে মারল।

একটু থেমে বললেন, পালদের বড়ো নাতি অপূর্ব কলকাতার কলেজে পড়ত। ছুটিতে এল গ্রামে আম খেতে। গরমের জন্যে ছাদে শুত। একদিন সে দেখল—একটি ছেলে তাকে ডাকছে। ভারি সুন্দর দেখতে ছেলেটিকে। অপূর্বর কৌতূহল হলো। সে উঠে গেল। দিব্যি ছেলেটির পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে নামল, খিল খুলল, তারপর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। ছেলেটি চলেছে আগে আগে—যাচ্ছে রানীসায়রের দিকে। তারপর—ব্যস!

শুনে সত্যব্রত জোরে হেসে উঠল।

চরণকাকু বিরক্ত হয়ে বললেন, এটা হাসির কথা নয়।

—তা ছাড়া কি! একেবারে গাঁজা।

—গাঁজা! আমি মিথ্যে কথা বলছি? শুধোও তো চাটুজ্যোমশাইকে। কী চাটুজ্যোমশাই?

চাটুজ্যোমশাই মাথা দোলালেন—ঠিক।

—মিস্তিরমশাই?

মিস্তিরমশাই বললেন, অত কেন? গোকুল হালুইকরের বোটা মরল কি করে? ঐ রানীসায়রে—

সত্যব্রত বলল, আপনারা রাগ করবেন না, অপূর্ব পালের যে ঘটনাটা বললেন তা অনেকখানিই অতিরঞ্জিত—বাড়িয়ে বলা।

—কি রকম?

—অপূর্ব তো ছাদে একলা ঘুমোচ্ছিল। তাকে যে একটি সুদর্শন ছেলে ডাকল—অমনি অপূর্ব যে গটগট করে নেমে গেল—রাস্তা দিয়ে ছেলেটির পিছুপিছু চলল এসব আপনারা জানলেন কি করে? আপনারাও সেই সুন্দর ছেলেটিকে দেখেছিলেন নাকি?

বৃদ্ধের দল চুপ করে গেল।

সত্যব্রত বললে, দেখুন, অলৌকিক ব্যাপার সম্বন্ধে সব দেশেরই অধিকাংশ মানুষের একটা প্রচণ্ড দুর্বলতা আছে। তারা মানতে চায় বলেই খুব ঘটা করে রঙ চড়িয়ে গল্প বলে।

চাটুজ্যোমশাই কী বলতে যাচ্ছিলেন এমনি সময়ে একটা হাত-ভাঙার রুগী এল। প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল।

সত্যব্রত রুগী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বৃদ্ধরা আস্তে আস্তে যে যার বাড়ি চলে গেলেন।

সত্যব্রত দোতলাতে একাই থাকে। একটি অল্পবয়সী ছেলে তার রান্নাবান্না করে দেয়। তার পর সেও সন্ধ্যার পর বাড়ি চলে যায়। তখন সত্যব্রতর মনে হয় বড্ড একলা। একটু গল্প করারও লোক নেই। তখন ঘুম না আসা পর্যন্ত ডাক্তারি বই পড়ে।

এক-একদিন বিকেলে ছাদে পায়চারি করে। ছাদ থেকে গ্রামের অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। ঐ যে নিমগাছটা ওটা কত কালের কে জানে! ঐ যে বিরাট অশ্বখ গাছটা আকাশের আধখানা জুড়ে একটা মস্ত ছাতার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে, রোজ রাতে বোধহয় এরই কোনো ডালে বসে কালপাঁচা বিক্রী শব্দ করে ডাকে। ওর পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। দু'পাশে বাঁশঝাড়। তারপর খাঁ-খাঁ মাঠ। এক-একদিন রাতে ঐ মাঠের ওপর দিয়ে দমকা বাতাস হা-হা করে ছুটে আসে। সেই শব্দে মানুষের ঘুম ভেঙে যায়। এখানকার লোকে ঐ হাওয়াকে বলে 'খারাপ হাওয়া'। দুট্টু আত্মা নাকি ছুটে বেড়াচ্ছে।

ঐ মাঠের পরে বিরাট রানীসায়র।

রানীসায়র নাম হয়েছিল কেন কে জানে! হয়তো কোনো রানীর নামে। রানী তো আর একালে কেউ হয় না। হয় তো অতীতের কোনো জমিদারগৃহিণীর নামে সরোবরের নাম হয়েছে রানীসায়র।

ঐ সরোবরেই নাকি ডুবে মরেছিল কোন্ এক ডাক্তার। তারপর অপূর্ব পাল। তারপর গোকুল হালুইকরের বৌ। ডুবে মরেছিল এটা হয়তো ঠিক। কিন্তু নিশির ডাক? তাও কি আজকের দিনে বিশ্বাস করতে হবে?

ক'দিন পর।

রাত তখন কত কে জানে—টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। সমস্ত রানীচক গ্রামটা ঘুমে অচেতন। হঠাৎ সত্যব্রতের ঘুম ভেঙে গেল। কেউ যেন তাকে ডাকছে—ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু—

সত্যব্রত বুঝল রুগীর বাড়ি থেকে ‘কল’ এসেছে। তাড়াতাড়ি উঠে জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালো—কে?

দেখল, রীতিমতো একজন ভদ্রলোক। পরনে ট্রাউজার, গায়ে হাওয়াই শার্ট। ছাতা মাথায়।

দেখে অবাক হলো। রানীচকের মতো গ্রামে এরকম কেতাদুরস্ত লোক তো দেখেনি কখনো।

—কি চাই?

—একটু যেতে হবে। একজন পেসেন্ট—

সত্যব্রত বড়ো টচটা নিয়ে নিচে নেমে এল। লণ্ঠন জ্বালল। ডিসপেন্সারির দরজা খুলে ভদ্রলোককে ভেতরে ডাকলো—আসুন।

ভদ্রলোক ঢুকলেন। সত্যব্রত লণ্ঠনটা টেবিলের ওপর রেখে চোয়ারে বসল।

—বসুন।

—না, বসবার সময় নেই। এখনি আপনাকে একবার যেতে হবে।

—কোথায়?

—মদনহাটি।

—মদনহাটি! সে আবার কোথায়?

—নদীর ওপারে।

সত্যব্রত চুপ করে রইল। একে বৃষ্টি পড়ছে। তার পর এত রাত্রে নদী পেরিয়ে—

—কী ভাবছেন ডাক্তারবাবু? আপনাকে যেতেই হবে। নইলে আমার স্বশুরমশাই বাঁচবেন না।—ভদ্রলোক মিনতি করে বললেন।

—কিন্তু—

—না—না, কিন্তু-টিস্তু নয়—আপনাকে যেতেই হবে।

ব্যস। সঙ্গে সঙ্গে সত্যব্রতের মন গলে গেল। উঠতে যাচ্ছে এমনি সময়ে

ঘরে ঢুকলেন একজন মহিলা। চব্বিশ-পঁচিশ বয়েস। রীতিমতো সুন্দরী। কালো শাড়ির সঙ্গে কালো ব্লাউজ, কাঁধ থেকে ঝুলছে ফোমের কালো ব্যাগ, হাতে কালো লেডিজ ছাতা! এই রাত্রেও কালো কাচের চশমা পরেছেন।

তাঁর ফর্সা ধবধবে রঙে কালোর এই সমারোহ বড়ো সুন্দর মানিয়েছিল।

ভদ্রলোক পরিচয় করিয়ে দিলেন।—ইনি আমার স্ত্রী। এঁরই বাবা—

সত্যব্রত একটু অবাক হলো। যার বাবা মুমূর্ষু সে বাবাকে ফেলে এত সেজেগুজে ডাক্তার ডাকতে আসতে পারে!

ভদ্রলোক বোধহয় সত্যব্রতর মনের কথা আঁচ করতে পেরেছিলেন। বললেন, আপনি পাছে না আসেন সেইজন্যে ও নিজেই ছুটে এল।

সত্যব্রত কি করবে ভাবছিল—মহিলাটি টেবিলের কাছে এসে হাত জোড় করে বললে, আপনাকে যেতেই হবে ডাক্তারবাবু। যত টাকা ফি চান—

—টাকার লোভ আমার নেই। ও কথা দয়া করে বলবেন না।

—ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনি না গেলে আমার বাবা—বলতে বলতে ভদ্রমহিলার গলার স্বর ভারী হয়ে উঠল।

—আগে কেসটা কি বলুন শুনি। তারপর যাওয়া দরকার কিনা ভেবে দেখব।

বলে পেনটা খুলে টেবিলে রাখতে গেল—পেনের ক্যাপটা পড়ে গেল মাটিতে।

সত্যব্রত হেঁট হয়ে অঙ্ককারেই ক্যাপটা খুঁজতে লাগল—পেন না। তখন সে টচটা নিয়ে আবার খুঁজতে লাগল। হঠাৎ টচের আলো গিয়ে পড়ল মহিলাটির পায়ে—আর সঙ্গে সঙ্গে সত্যব্রত একেবারে আঁৎকে উঠল। দেখল মহিলাটির পা থেকে গোড়ালি বেয়ে লম্বা লম্বা লোম গোল গোল হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

এইরকম লোম যে কোনো মানুষের হতে পারে কল্পনাও করা যায় না। সেই অমানুষিক লোম দেখে মুহূর্তের জন্যে বুঝি সত্যব্রতর মাথাটা বিম্বিম্ব করে উঠেছিল। কিন্তু সে ঐ মুহূর্তের জন্যেই। তখন দুর্বল হয়ে পড়লে আর রক্ষা থাকবে না।

সত্যব্রত তখন নিজেকে সামলে নিল। কলমের ঢাকাটা তুলে নিয়ে চেয়ারে সোজা হয়ে বসল।

কক্ষবসনা সুন্দরী তখন চশমার ভেতর দিয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে।

সত্যব্রতর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মহিলাটি অধৈর্য হয়ে বললে, দেরি করবেন না। চলুন। ভোর হয়ে যাবে।

—কিস্ত কিসে যাব?—সত্যব্রতর মাথায় তখন বুদ্ধির প্যাঁচ খেলছে।

—আমাদের সঙ্গে একটু কষ্ট করে হেঁটেই যেতে হবে।

—হাঁটতে তো পারব না। পায়ে ব্যথা।

—কিস্ত হেঁটে না গেলে উপায় কি? এই পাড়াগাঁয়ে—

—এক কাজ করুন। পাশেই গোয়ালপাড়া। ওখানে গিয়ে আমার কথা বলুন। ওরা গাড়ি দেবে।

অগত্যা ওদের গোরুর গাড়ির সন্ধানে যেতে হলো।

যেইমাত্র তারা দরজার বাইরে বেরিয়েছে অমনি সত্যব্রত ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে খিল এঁটে দিল। তারপর সোজা দোতলায়। দোতলার দরজাগুলোতেও খিল দিতে ভুলল না।

মুহূর্তের পর মুহূর্ত। মিনিটের পর মিনিট। তার পরই শুরু হলো নিচের দরজায় দুমদাম করে শব্দ। দরজা বুঝি ভেঙে পড়ে। সত্যব্রত দু'হাতে কান চেপে বসে রইল যতক্ষণ না ভোর হয়।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ থেমে গেল।

---



# অলৌকিক ক্যালেন্ডার

লোকটিকে প্রথম থেকেই আমার বেশ মজার লেগেছিল। কুচকুচে কালো রঙ। একমাথা রুক্ষ চুল। লম্বা নাক। চোখ দুটো জ্বলজ্বলে। পাতলার ওপর গড়ন। দেখলে মনে হয় গম্ভীর প্রকৃতির। কিন্তু আলাপ হয়ে গেলে বেশ সহজ মানুষ বলেই মনে হয়।

এই মানুষটির সঙ্গে কিন্তু যে অবস্থায় আলাপ হয়েছিল তা বেশ সুখকর ছিল না।

সেবার পূজোর ছুটিতে দক্ষিণাত্য ভ্রমণে গিয়েছিলাম। রামেশ্বরম, মহীশূর, কন্যাকুমারিকা দেখে শেষে তিরুপতি দর্শনে এসেছিলাম। বেশ উঁচু উঁচু পাহাড়। পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি হয়েছে। সেই আঁকাবাঁকা পথে বাসে করে পাহাড়ে উঠতে হয়। পাহাড়ের ওপর উঠেই অবাক! রীতিমতো শহর। যাই হোক এখান থেকে কিছুদূর হাঁটলে বা রিকশায় গেলে তিরুপতির মন্দির।

বেজায় ভিড়। দর্শনপ্রার্থীদের লম্বা লাইন। পূজো দিতে দিতে বিকেল হয়ে গেল। তারপর জায়গাটা ভালো করে দেখতে লাগলাম। পশ্চিম বাংলা থেকে এত দূর আসা তো আর বার বার হয় না। হয়তো এই প্রথম—এই শেষ।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি নামার জন্যে বাসস্ট্যান্ডে এলাম। কিন্তু হায়! লাস্ট বাস পাহাড় থেকে নেমে গিয়েছে। আজ আর নিচে নামার উপায় নেই।

মহা দুশ্চিন্তায় পড়লাম। কী করব এখন? এদিকে আলো জ্বলে উঠেছে। কিন্তু ওদিকে—অর্থাৎ পাহাড়ের দিকে জমাট অন্ধকার। ঐ অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ নেমে গিয়েছে। দু'পাশে পাহাড়ী জঙ্গল। দেখলেও ভয় করে।

তাহলে? বললাম বটে জায়গাটা শহরের মতো, কিন্তু গেরস্তবাড়ি বিশেষ নেই। দোকানপাট, ব্যাঙ্ক, পোস্টাপিস এই সবই বেশি।

গেরস্ত লোক যদি বা থাকে তাহলেও কি এই অজানা অচেনা একজন বাঙালিকে কেউ আশ্রয় দেবে?

কী করব ভাবছি। এই সময়ে ঐ মানুষটির আবির্ভাব। ও যেন দেখেই আমার অবস্থা বুঝতে পেরেছে। হেসে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল, বাস ফেল করেছেন ?

এই রকম একটা জায়গায় ঐ রকম চেহারার মানুষের কাছে বাংলা কথা শুনব আশা করিনি। বিনীতভাবে বললাম, হ্যাঁ। লাস্ট বাস কখন জানতাম না।

—তা হলে এখন কি করবেন ভাবছেন ?

—কিছুই তো ভেবে পাচ্ছি না।

লোকটি হাসল।—তবে চলে আসুন এই গরিবের কুটিরে।

তাই যেতে হলো।

কুটিরই বটে! চারিদিকে পাহাড় আর জঙ্গল। তারই মধ্যে পাথর দিয়ে ঘেরা ঘরের মতো। মাথা গোঁজার আস্তানা। ভেতরে পিলসুজের ওপর মস্ত এক পেতলের প্রদীপ জ্বলছে। তারই ঘোলাটে আলোয় গুহাটা দেখলাম। একপাশে একটা খাটিয়া। একটা কবুল আর তেলচিটে বালিশ। একটা দড়ি টাঙানো। তাতে গোটা দুয়েক ময়লা প্যান্ট—একটা ছেঁড়া তোয়ালে।

গুহার ওদিকে একটা কালো পর্দা টাঙানো—যেন থিয়েটারের স্টেজের স্ক্রিন।

লোকটি বলল, তিরুপতি তো দর্শন করলেন। আমার ঠাকুর দেখবেন না ?

বলে পর্দাটা সরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে যা দেখলাম তাতে আমার গা শিউরে উঠল। ফুল-পাতা ভরা একটা পুরনো কাঠের গামলার মধ্যে একটা মড়ার খুলি বসানো। খুলিটা সিঁদুরে সিঁদুরে লাল হয়ে গেছে।

এই রকম সিঁদুরমাখা খুলি আমি সাধুসন্ন্যাসীদের কাছে অনেক দেখেছি। এর জন্যে গা শিউরে ওঠেনি। শিউরে উঠেছিল অত বড়ো খুলি কখনো দেখিনি বলে।

এ কি মানুষের খুলি ?

লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

—কি ভাবছেন ?

—এত বড়ো খুলি কোথায় পেলেন ? এ কি মানুষের ?

লোকটি আবার হাসল। বলল, দানিকেন পড়েছেন তো ? সেই অতিমানবের কথা ?

আশ্চর্য হলো। এ লোকটা দানিকেনও পড়েছে!

মুখে বললাম, হ্যাঁ, ওঁর সব কথানা বইই আমার পড়া।

লোকটি বলল, আমিও ওঁর মতে বিশ্বাসী। তা ছাড়া এই খুলিটাই তো একটা মস্ত প্রমাণ। নয় কি?

—এটা পেলেন কোথায়?

এবারও এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বলল, তবে দানিকেনের চেয়ে আমি আরো কিছু গভীর তত্ত্ব খুঁজে বেড়াচ্ছি। বলে মৃদু হেসে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। আমিও আর কৌতূহল দেখালো না।

সেদিন পাহাড়ের গুহায় কলা, চিঁড়ে আর দুধ খেয়ে খাটিয়ায় শুয়ে রাত্রিবাস হলো। বেশ ভালো করেই আলাপ জমল। লোকটির নাম কেশব রাও। জন্ম অনন্তপুর জেলায় পেনুকোণ্ডা শহরের কাছে। দীর্ঘকাল দেশ ছাড়া। এখন বাস তিরুপতির এই পাহাড়ে। লোকটির বিষয়ে আমি প্রথমে বলেছিলাম বেশ মজার লোক কিন্তু পরে মনে হয়েছে লোকটা বোধহয় একটু বিশেষ ধরনের পাগল।

প্রায় সারা রাত ধরে সে এমন সব কথা শোনালো যা পাগলামো ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

সে বললে, দানিকেনের মতে বহু সহস্র বছর আগে ভিন্ গ্রহ থেকে যে অতিমানবেরা পৃথিবী প্রায় আবিষ্কার করেছিল, এক সময়ে তারা আবার তাদের নিজেদের গ্রহেই ফিরে গিয়েছিল। এটা আমার মতে অ্যাবসার্ড—অসম্ভব।

কেশব রাও একটু হাসল। তারপর বলল, আমি মনে করি তারা কেউ ফিরে যায়নি। পৃথিবীতেই ছিল—পৃথিবীতেই আছে—যে কোনো আকার নিয়ে।

তারপর ও বলল, তার এখন অনেক কাজ। সারা পৃথিবী ঘুরতে হবে। এইরকম খুলি আর কোথায় পাওয়া যায় দেখতে হবে।

একটু থেমে বলল, শুধু খুলি বা কঙ্কাল নয়। আমি বিশ্বাস করি তাদের আত্মাও এখনো বিশেষ বিশেষ জায়গায় আছে।

আমি আবার শিউরে উঠলাম।

এরপর সে যেন নিজের মনেই বলল—সবচেয়ে আগে যাওয়া দরকার ইস্ট ইউরোপে। কার্পাথিয়ান রেঞ্জ—ট্রানসিলভেনিয়া—মোন্ডাভিয়া—বুরো-ভিনা—বিসট্রিজ—

এ সব কথা শুনে আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। তবু কিছু বলা উচিত মনে করেই বললাম—জায়গাগুলোর নামও তো শুনিনি।

কেশব রাও সরু করে হেসে বলল, ড্রাকুলা পড়েননি? ব্রাম স্টোকারের ড্রাকুলা? সেই যে রক্তপায়ী পিশাচ—যারা কত কাল ধরে—অ-মৃত অবস্থায় কবরে থাকে। কিন্তু রাত হলেই মানুষ-শিকারে বেরোয়!

আমি বললাম, হ্যাঁ পড়েছি। কিন্তু সে তো গল্প।

—গল্প! কেশবের চোখ দুটো গোল গোল দেখালো।—আমি যদি তার প্রমাণ দেখাতে পারি?

সর্বনাশ! বললাম, না—না, প্রমাণে দরকার নেই।

—সেসব জায়গায় আমায় যেতে হবে। কিছু যে একটা আছে তা খুঁজে বের করতে হবে।

আমি নীরবে মাথা নেড়ে সায় দিলাম। কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলাম না।

এইভাবে সেই পাথরের গুহায় রাত কাটল। আমি খাটিয়ায় আর কেশব মাটিতে একটা বহু পুরনো বাঘছাল পেতে শুয়ে রইল।

সত্যি কথা বলতে কি সারা রাত বেশ ভয়ে ভয়েই কেটেছে। ভয়টা কেশবকে না তার ঐ অদ্ভুত ঠাকুরটিকে না অন্য কিছুতে বুঝতে পারিনি।

ভোর হলে প্রথম বাসটাই ধরার জন্যে যখন বিদায় নিচ্ছি তখন ভদ্রতার খাতিরে কেশবকে বললাম, যদি কখনো কলকাতায় আসেন তো দয়া করে আমার বাড়িতেই আতিথ্য গ্রহণ করবেন।

কেশব তখনই বলল, হ্যাঁ, কলকাতায় একবার আমায় যেতে হবে। বলে ঠিকানাটা দুর্বোধ্য ভাষায় লিখে নিল।

অনেক দিন কেটে গিয়েছে, কেশবের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন আমাদের কসবার বাড়িতে কেশব এসে হাজির। ওকে দেখে প্রথমটা চিনতেই পারিনি। কি করে চিনব? কুচকুচে কালো রঙ, মুখে চাপ দাড়ি—যা আগে ছিল না—পরনে দিব্যি শার্ট ও ট্রাউজার—চোখে বিদ্যুটে কালো সানগ্লাস। বাঁ হাতে একটা বড়ো পুঁটলি আর ডান হাতে সুটকেস। কেশব রাও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাসছে।

যখন ও পরিচয় দিল তখন আমি সত্যিই খুশি হলাম। আমার মনে পড়ল সেই রাত্রে আশ্রয় দেওয়ার কথা। আশ্রয় না পেলে কী হতো বলতে পারি না। সেই আশ্রয়দাতা আজ এসেছে আমার অতিথি হয়ে। এ কী কম সৌভাগ্য!

তা ছাড়া তিরুপতি থেকে ফিরে এসে এই কেশবের কথা বাড়িতে সবার কাছে গল্প করেছিলাম। ভাইপো-ভাইবীরা তো কেশবের কথা শুনে রোমাঞ্চিত। কবে কেশব আসবে তার জন্যে পথ চেয়ে থাকত। এত দিন পর শেষ পর্যন্ত সে সশরীরে হাজির।

ছেলেমেয়েরা বেশ আগ্রহ করেই ওর সঙ্গে আলাপ করতে এল। কিন্তু কী জানি কেন ওকে দেখে প্রথমেই ছেলেমেয়েরা কেমন ভয় পেয়ে গেল। সে কি ওর কুচকুচে কালো রঙের জন্য না কি ওর বিদ্যুটে চশমাটার জন্যে?

যাই হোক দিন দুয়ের মধ্যেই ছেলেমেয়েরা ওর সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলল। ভাবটা ওদের সঙ্গে এমন জমল যে আমাকে যেন আর ওর দরকারই হয় না।

তবু দরকার হতো।

একদিন বলল, কলকাতায় পার্ক স্ট্রীট বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে নাকি খুব পুরনো কালের কবর আছে?

সর্বনাশ! এখানে এসেও যে কবরখানার খোঁজ করে!

মুখে বললাম, হ্যাঁ, তা আছে। তবে খুব আর কি পুরনো? মাত্র শ' দু' আড়াই বছর আগের।

—তাতেই হবে। আপনি একদিন নিয়ে চলুন।

অগত্যা কেশবকে নিয়ে একদিন—যা কখনো করিনি তাই করলাম। কবরখানায় ঢুকলাম। সার্কুলার রোড আর পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে গাছপালায় ঢাকা সেই পুরনো কবরখানা। ঢুকতেই গা হম্‌হম্ করে উঠল। কিন্তু কেশবের এসব কিছুই হলো না। সে মহা আনন্দে বাঁধানো কবরগুলো দেখতে লাগল। তারপর একটা খুব পুরনো ভাঙাচোরা কবরের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পর ও উবু হয়ে বসল। তারপর তার হাতের লাঠিটা চালিয়ে দিল কবরের মাটির নিচে। এক সময়ে লাঠিটা সরিয়ে নিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল।

আমি তো ভয়ে কাঁটা। সাপে কামড়াবে যে! পাগল আর কাকে বলে!

কিছুক্ষণ কবরের মাটি হাতড়াবার পর ও উঠল। আমার দিকে তাকিয়ে খুশ মেজাজে বলল, ঠিক হ্যাঁ।

কি 'ঠিক হ্যাঁ' তা আর জিজ্ঞেস করার প্রবৃত্তি হলো না।

এবং সে জানতে চাইল পুরনো কবরখানা আর কোথায় আছে। হুগলিতে ডাচদের সময়ের অনেক কবর আছে শুনে সেখানে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

এদিকে বাড়িতে যেন কেমন একটু গোলমাল শুরু হয়েছে। ছেলেমেয়েদের তো পড়াশোনা মাথায় উঠেছে। তারা কেশবকে আঙ্কেল বলে ডাকে। আর গল্প শোনে। সবই ভূতের গল্প। কেশব লোকটার এই একটা গুণ—নির্জন পাহাড়ে দেশের লোক হলেও সে বেশ মিশতে পারে। ছেলেদের সঙ্গে এই মেশবার ক্ষমতা কোথা থেকে পেল কে জানে! গুহায় বাস করে এমন শার্ট-প্যান্টই বা পায় কোথা থেকে কে বলবে!

যাই হোক রোজ সন্ধ্যার সময়ে ছেলেমেয়েরা ওকে ঘিরে ধরত।—গল্প বলো আঙ্কেল। ভূতের গল্প। তোমার নিজের চোখে দেখা ভূতের গল্প।

আঙ্কেল অমনি গল্প শুরু করে দিত। এক-একদিন শুনতাম দানিকেন-ড্রাকুলাও এসে পড়েছে। মনে মনে হাসতাম।

কিন্তু নিছক হাসির ব্যাপার যে ছিল না তা সপ্তাহ খানেক পর থেকেই টের পেতে লাগলাম।

আমার ঘুমটা বরাবরই খুব পাতলা। একটু শব্দেই ঘুম ভেঙে যায়।

ক’দিন থেকেই রাত দুপুরে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। আর শুনতে পাচ্ছি নিচের যে ঘরে কেশব থাকে সেই ঘরে ঠুন ঠুন করে কিসের যেন শব্দ। ঠিক যেন কে ঘণ্টা নেড়ে পূজো করছে।

একদিন দিদিমাও সেই শব্দ শুনলেন। পরের দিন সকালে বললেন, তোর ঐ কেশবের ঘরে ঘণ্টা বাজাচ্ছিল কে?

আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম।—খোৎ, অত রাতে খামকা ঘণ্টা বাজাতে যাবে কে?

উড়িয়ে দিলাম বটে কিন্তু মনে খটকা বিঁধে রইল। কেশবই কি গভীর রাতে পূজো করে? কার পূজো? তবে কি ও ওর ঠাকুর—সেই বিকট খুলিটা এখানে নিয়ে এসেছে!

ভাবতেও গা শিউরে উঠল। কিন্তু এসব কথা কেশবকে জিজ্ঞেস করার উপায় নেই। ও বলবে না। উল্টে চটে যাবে।

সেদিন আর এক কাণ্ড! দুপুরবেলা বাড়িতে কেউ ছিল না। কেশবের ঘরে তালা বন্ধ। ওকে নিয়ে হুগলির একটা গ্রামে গিয়েছিলাম। বলা হয়নি—ইদানিং ও ধরেছিল গ্রাম দেখবে। গ্রাম দেখবে না ছাই! খুঁজবে গ্রামের পুরনো কবরখানা।

যাই হোক, বাড়িতে কেউ নেই। ছেলেমেয়েরাও ইস্কুলে। মা নিচে নামছিলেন। দিদিমা তো ঘুমোচ্ছেন। কেশবের ঘরের কাছে আসতেই উনি থমকে দাঁড়ালেন। স্পষ্ট শুনলেন সেই বন্ধ ঘরের মধ্যে খট্ খট্ করে কী যেন চলে বেড়াচ্ছে।

মায়ের মুখে এ কথা শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

আমার স্থির বিশ্বাস হলো কেশব সেই খুলিটা এখানে নিয়ে এসেছে।

পরের দিনই—কেশব যখন স্নান করতে গিয়েছে তখন চুপি চুপি ওর ঘরে ঢুকলাম। আমার সন্দেহ ছিল ওর পুটলিটায় কিছু আছে। সেটা খুলে ফেললাম। দেখলাম ভেতরে কালো কাপড়ে জড়ানো কী রয়েছে! আমার হাত কঁপে উঠল। কোনো রকমে পুটলিটা বেঁধে বেরিয়ে এলাম।

তারপর মনে মনে কেবলই চিন্তা করতে লাগলাম লোকটা কবে এখান থেকে যাবে।

আমি ওর চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হলে কী হবে? ছেলেরা ওকে ছাড়তে চায় না। ওরা কেবল জেদ ধরে—আস্কেল, সত্যি ভূত বলে কিছু আছে? সত্যি তুমি ভূত দেখেছ? তা হলে আমাদের ভূত দেখাও।

এই ভূত দেখাবার কথা হলেই ওদের আস্কেল কিন্তু সত্যি সত্যি চটে যায়। ধমকে উঠে বলে, ছেলেমানুষি নাকি? ভূত দেখাব বললেই দেখানো যায়? নাকি দেখব বললেই দেখা যায়?

কথাটা একটু ধমকানির সুরেই বোধহয় বলেছিল যার জন্যে আমার যে ভাইঝিটি ওকে সবচেয়ে ভালোবাসত সে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। বলে গেল, আস্কেল, তোমার সঙ্গে আড়ি—জন্মের মতো আড়ি। আর কখনো তোমার কাছে গল্প শুনব না।

আচ্ছা জেদী মেয়ে এই রুণা। তারপর কতবার কেশব সাধ্যসাধনা করেছে, ও আর আস্কেলের কাছে আসেনি। ভূত দেখতেও চায়নি।

এর ক’দিন পরেই কেশব হঠাৎ বলল, চললাম।

আঃ! এর চেয়ে সুখবর বুঝি আর কিছু হয় না!

মুখে বললাম, এরই মধ্যে যাবেন কেন?

কেশব বললে, অনেক দিন তো থাকলাম। আর নয়।

—কোথায় যাবেন? ইস্ট ইউরোপ?

—না, আগে নেপাল।

কেন হঠাৎ নেপাল যাবেন তা আর জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না।

যাবার দিন বিদায়ের পালা। ছেলেমেয়েদের চোখ ছিলছিল। রুণাও এসেছে। কেশব ওকেই বোধহয় সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত। তাই একটু আদর করল।

ওর চোখেও জল। রুণা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, আঙ্কেল, তুমি আবার আসবে তো?

কেশব তার স্বভাব মতো হাসল—আমার ওপর রাগ পড়েছে তো দিদিমণি?  
—বা, তুমি তো ভূত দেখালে না?

কেশবের মুখটা শুকিয়ে গেল। বিমর্ষ হয়ে পড়ল। ভূত কি কাউকে দেখানো যায়? এ কি সম্ভব?

আমি রুণাকে একটু বকলাম। রুণা মুখ ভার করে রইল।

—আবার আসবে তো? ছেলেরা জিজ্ঞেস করল।

কেশব কি ভেবে বলল, কথা দিচ্ছি না। তবে আসবার চেষ্টা করব যদি মরে না যাই।

আমার ভাগ্নেটি একটু ডেঁপো। বলে উঠল—তুমি মরে গেছ কিনা জানব কি করে? আমরা তো তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব।

কেশব কী ভাবল। তারপর হঠাৎ ঘরে গিয়ে পুঁটলি খুলে কি একটা গোল করা কাগজ এনে আমার হাতে দিল। সেটা খুলে দেখি—একটা ক্যালেন্ডার। ক্যালেন্ডারের ছবিটা অঙ্কিত। ছাপা নয়। কেশবই বোধহয় নিজে হাতে গোটা-কতক ছক কেটে ক্যালেন্ডারের সঙ্গে এঁটে রেখেছে।

ক্যালেন্ডারটা হাতে নিয়ে আমি বললাম, এটা নিয়ে কি করব?

ও বলল, দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখবেন। যেদিন দেখবেন ক্যালেন্ডারটা উল্টে গেছে সেদিন বুঝবেন আমি আর নেই।

এ আবার কী কথা! অবাক হব, না হাসব, না ভয় পাব বুঝে উঠতে পারলাম না।

বছর দুই-তিন কেটে গেছে। কেশবের কথা ভুলেই গেছি। ছেলেমেয়েরাও ইতিমধ্যে বেশ বড়ো হয়ে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বাইরের ঘরে ওরা পড়াশোনা করছে। আমি একটা ম্যাগাজিন পড়ছি। হঠাৎ মনে হলো কে যেন দরজার সামনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে। চমকে তাকিয়ে দেখি—কেশব রাও। দরজায় দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে।

ওকে প্রথমে চিনতে পারিনি। সেই কুচকুচে কালো রঙ আর নেই। কেমন যেন ফ্যাকাশে। মুখটা শুকনো। ঘন কালো দাড়ির বদলে পাতলা পাতলা বিবর্ণ দাড়ি ঝুলছে। চুল এলোমেলো। সবচেয়ে অবাক হলাম—ওর হাতে সুটকেসও নেই—সেই পুঁটলিটাও নেই।



—রাও সাহেব না?

কেশব রাও একটু হেসে আমায় নমস্কার করল।

—আসুন—আসুন। স্বাগতম।

ছেলেমেয়েরাও আনন্দে লাফিয়ে উঠল—আঙ্কেল এসেছে—আঙ্কেল এসেছে!

তারপরই ওরা ধরল—আঙ্কেল গল্প—অনেক গল্প—

আমি ওদের ধমকে শান্ত করলাম।

—আজ উনি ক্লান্ত। দেখছ না ভালো করে দাঁড়াতেও পারছেন না।

আসুন মিস্টার রাও।

যেতে যেতে জিপ্তেস করলাম—আপনি কি এখন নেপাল থেকেই এলেন?

কেন জানি না রাও তার কোনো উত্তর দিল না।

তারপর কেশবকে সেই ঘরে নিয়ে এলাম। বললাম, খাওয়া-দাওয়া করে আজ বিশ্রাম করুন। কাল সবাই মিলে গল্প শুনব।

কেশব কিন্তু কিছুই খেতে চাইল না। বলল, আমি একটু ঘুমোতে চাই।

আমি ওখানেই ওর শোবার ব্যবস্থা করে দিলাম।

সকালে ঘুম থেকে উঠে অবাক। কেশব নেই। ঘর খালি। কিরকম হলো?

এত সকালে গেল কোথায়?

বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখলাম—যেমন ফর্সা চাদর পেতে দিয়েছিলাম তেমনই আছে। কেউ যে শুয়েছিল তা মনে হয় না। গেলাসে জল দিয়েছিলাম। সেটাও ঠিক তেমনি ঢাকা পড়ে আছে। অর্থাৎ ঘরে যে কেউ ছিল তার চিহ্নমাত্র নেই।

মনে মনে যেমন অবাক ছলাম তেমনি দুঃখও পেলাম—কেশবের এমনি ভাবে পালিয়ে যাওয়াটা ঠিক হয়নি।

এমনি সময়ে কে যেন এসে আমায় দ্বিগুণ অবাক করে দিয়ে বলল, পালিয়ে যাবে কি বাইরের দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধই রয়েছে।

এইবার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে আবার কী!

এ রহস্যের ধীমাংসা আমরা কেউ করতে পারলাম না। তবে সেইদিনই খবরের কাগজের এক কোণে একটা ছোট্ট খবর ছিল। পার্ক স্ট্রীটের পুরনো কবরখানায় এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া গেছে। তার সঙ্গে ছিল একটা পুঁটলি। পুঁটলির মধ্যে পাওয়া গেছে একটা অস্বাভাবিক মড়ার মাথার খুলি! মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। পুলিশ তদন্ত করছে।

আমার হাত থেকে কাগজটা পড়ে গেল। বুঝতে বাকি রইল না অজ্ঞাতপরিচয়

মানুষটি কেশব রাও ছাড়া আর কেউ নয়। তার বডি পাওয়া গেছে কাল সকালে। তাহলে কাল রাত্তিরে আমার বাড়ি কে এল ?

তবে কি ও নেপাল থেকে ফিরে কলকাতাতেই ছিল ? তাহলে—

কেনই বা শুধু এক রাত্তিরের জন্যে এল ? আর—আর তার মৃত্যু হঠাৎ কবরখানাতেই বা হলো কেন ?

সবই রহস্যময়।

তখনই কী মনে হলো ছুটলাম পাশের ঘরে। দেখি রুণা কখন এ ঘরে এসে ক্যালেন্ডারটার দিকে জলভরা চোখে তাকিয়ে রয়েছে। ক্যালেন্ডারটা এত দিন পর কে যেন উল্টে দিয়েছে।

---

# বাইসনের শিং

কলকাতার রাস্তায় শীতের মরশুমে প্রতি বছর ভুটানিরা দল বেঁধে সোয়েটার, টুপি, মাফলার বিক্রি করতে আসে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ধারে যারা বসে তাদেরই একজনের কাছ থেকে প্রতিবার কিছু না কিছু কিনি। লোকটি বৃদ্ধ। চোখে-মুখে সরলতার ছাপ আছে। ওর কাছে দাম সস্তা বলেই মনে হয়। জিনিসও খারাপ দেয় না।

এবারও একটা মাফলার কিনেছিলাম। সঙ্গে খুচরো টাকা ছিল না। ও আমার বউবাজারের বাসা চিনত। বলেছিল, এক সময়ে বাসায় এসে টাকা নিয়ে যাবে।

শীত শেষ হতে চলল, ভুটানিরা ফিরে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। এখনও লোকটি দাম নিতে এল না কেন ভাবতে ভাবতে তালা খুলে ঘরে ঢুকতেই আমি রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম। দেখলাম ঘরের একটা জানলা একদম খোলা। আর দুপুরের দমকা হাওয়ার সঙ্গে যে এক পশলা শেষ মাঘের বৃষ্টি হয়েছিল তাতে আমার টেবিলের কাগজপত্র চারিদিকে ছড়িয়ে ভিজে একসা হয়ে গেছে।

আমি কয়েক মিনিট দরজার কাছে বিভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। জানলা খোলা থাকলে বাতাসে কাগজপত্র উড়ে যাবেই—বৃষ্টির ছাটে ভিজেও যাবে। এ তো জানা কথা। কিন্তু জানলা তো খোলা ছিল না। এই ঘরটাতে আমি একাই থাকি। এবং যখনই বেরোই তখনই সব জানলা ভালো করে বন্ধ করে যাই। এটা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

জুতোটা দোরগোড়ায় খুলে আমি জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িলাম। দেখলাম জানলার একটা পাল্লা তখনও বন্ধ রয়েছে। অন্য পাল্লার লোহার ছিটকিনিটা তোলা। ভেতর থেকে কেউ যেন একটা পাল্লা খুলে ফেলেছে। এরকম অসম্ভব ঘটনা কি করে ঘটল তা ভেবে পেলাম না।

জামাকাপড় না ছেড়েই অবসন্ন দেহে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। একবার ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। না, বৃষ্টি বা ঝোড়ো বাতাসে আর কিছু এলোমেলো হয়ে যায়নি। হ্যাঙ্গারে শার্ট দুটো ঝুলছে, খবরের কাগজটা দেয়ালের উপরে যেমন ভাঁজ করা ছিল তেমনিই আছে। দেওয়ালে অনেকগুলি দেব-দেবীর

ছবি। সেগুলো সব যেমন ছিল তেমনটিই আছে। ওপাশে দামী কাঠের ওপর মাউন্ট করা বাইসনের শিং জোড়াটাও এতটুকু নড়েনি।

দেব-দেবীর ছবিগুলো আমার নয়। ওগুলো বাড়িওয়ার। আমি সরিয়ে নিতে বলেছিলাম, বাড়িওয়ালা রাজী হননি। অগত্যা থেকেই গেছে। বাইসনের শিং জোড়াটাই আমার।

কিছুদিনের জন্যে নেপালে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফিরেছি গত সপ্তাহে। এখানে ফিরে পর্যন্ত লক্ষ্য করছি প্রায় প্রতিদিনই কিছু অস্বস্তিকর ঘটনা ঘটছে। এতই সামান্য ঘটনা যে লোককে ডেকে বলার বা দেখাবার কিছু নেই। যেমন প্রথম দিন অফিস থেকে ফিরে তালা খুলতে গিয়ে দেখি তালা কিছুতেই খুলছে না। এমন কোনোদিন হয় না। শেষে রাস্তা থেকে কোনোরকমে একজন চাবিওয়ালাকে নিয়ে এলাম। সে আমারই চাবি নিয়ে তালায় ঢোকানো মাত্র তালা খুলে গেল। আশ্চর্য!

চাবিওয়ালা একটু হেসে চলে গেল।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে টাইমপীসটার দিকে তাকাতে দেখি ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। অবাক হলাম। কেননা প্রতিদিন সকালে উঠেই আমি সব আগে ঘড়িতে দম দিই। একবার পুরো দম দিলে তা অন্তত দুপুর পর্যন্ত চলে। কিন্তু সেদিনই দেখলাম ব্যতিক্রম। ভাবলাম, নিশ্চয় পুরো দম দেওয়া হয়নি। যাই হোক, নতুন করে দম দিতে লাগলাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই স্প্রিংটা কটু করে কেটে গেল।

কী ঝঞ্ঝাট! এখন ছোটো ঘড়ির দোকান। উটুকো খরচা তো আছেই, তার চেয়ে ঢের অসুবিধে, এখন বেশ কিছুদিন ঘড়িটা পাব না। রিস্টওয়াচ একটা আছে ঠিকই কিন্তু চোখের সামনে ঘড়িটা না থাকলে আমার চলে না। আসলে আমি একা থাকি। ঘড়িটাই যেন আমার সঙ্গী। রাতদুপুরে হয়তো ঘুম ভেঙে গেল। এই কলকাতা শহরেও নিঝুম রাতে সরু গলির মধ্যে চুন-বালি-খসা পুরনো ঘরটার মধ্যে কেমন গা হুম্‌হুম্‌ করে। তখন টাইমপীসটার টিক্‌টিক্‌ শব্দ শুনলে যেন মনে হয়—যাক, সচল কিছু একটা আমার ঘরে আছে।

আমি রোজ স্নানে যাবার আগে দাড়ি কামাই। রোজ দাড়ি না কাটলে চলে না। সেদিন খবরের কাগজ পড়তে পড়তে দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সেফ্‌ট্রেরজার নিয়ে শেভ করতে গিয়ে দেখি ব্লেড নেই। এমন কখনও হয় না। ব্লেড ফুরোবার আগেই নতুন এক প্যাকেট ব্লেড কিনে রাখি।

যাক গে, হয়তো ভুলেই গেছি। তাড়াতাড়ি লুঙ্গির ওপর শার্ট চড়িয়ে ব্লেন্ড কিনতে বেরোলাম। ব্লেন্ড কিনে ফিরে এসে দেখি ব্লেন্ডের একটা গোটা প্যাকেট আয়নার সামনেই রয়েছে।

ইস্! এমন চোখের ভুলও হয়!

যাই হোক, দেরি হয়ে গেছে বলে তাড়াতাড়ি দাড়ি কামাতে বসলাম। দুটো টান দিয়েছি, অমনি থুতনির নিচেটায় খচ করে কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল।

একে নতুন ব্লেন্ড, তার ওপর তাড়াতাড়ি হাত চলছিল—কেটে যাওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু রক্ত কিছুতেই আর বন্ধ হয় না। আমি তখন এমন নার্তাস হয়ে গেলাম যে কোনোরকমে তুলো দিয়ে জায়গাটা জোরে চেপে ধরে শুয়ে রইলাম। ডাক্তারখানায় যাব সে শক্তিকটুকুও ছিল না।

এসব ঘটনা কাউকে জানাবার নয়, তবু আমার কাছে রীতিমতো অস্বস্তিকর। সেদিন রক্তপাত দেখে ভয় পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল কিছু একটা অশুভ ঘটনা যেন ঘটতে চলেছে। আজ খোলা জানলা দেখে আরো ঘাবড়ে গেলাম। মনে হলো অশুভ কিছু একটা প্রতিদিন যেন এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে। অথচ কী যে করব ভেবে পাচ্ছি না।

ক'দিন পর।

কোথা থেকে একটা বেড়াল এসে জুটেছে। সাদা লোমে ঢাকা বেড়ালটা দেখতে বেশ সুন্দর। খুব আদুরে। এসেই আমার পায়ে লুটোপুটি খেতে লাগল। বুঝলাম কারো বাড়ির পোষা বেড়াল। ভুল করে এখানে চলে এসেছে। এসেছে যখন থাক। দু'বেলা আমার পাতের এঁটোকাঁটা খেয়ে ও থেকে গেল। ভাবলাম ঘড়িটা তো দোকানে। এখন বেড়ালটাই আমার সঙ্গী হোক।

আমাদের এই গলির মুখে কতকগুলো রাস্তার কুকুর রাস্তিরে আড্ডা জমায়। অচেনা লোক দেখলেই এমন ঘেউ ঘেউ করে ওঠে যে বাছাধন পালাতে পথ পায় না। ফলে চোর-টোরের ভয় থাকে না।

রাত তখন কত জানি না। হঠাৎ কুকুরের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। এত রাত্রে কুকুরগুলো অমন করে ডাকছে কেন?

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। প্রথমে অন্ধকারেই দেখলাম সাদা বেড়ালটা পাগলের মতো একবার খোলা জানলাটার দিকে যাচ্ছে, একবার খাটের তলায় ঢুকছে। ওদিকে রাস্তার কুকুরগুলো ক্রমাগত চিংকার করে যাচ্ছে। কিন্তু এ চিংকার অন্যরকম। অচেনা লোক দেখে তাড়া করে যাওয়া নয়—এ যেন কিছু একটা দেখে আতঙ্কে আতঁনাদ করে ওঠার মতো।

আশ্চর্য! কুকুরগুলো এত রাত্রে এই গলির মধ্যে এমন কী দেখল যে ভয়ে অমন করে ডাকছে!

তাড়াতাড়ি উঠে আলো ছেলে জানলা দিয়ে মুখ বাড়লাম। আলো আর সেই সঙ্গে পরিচিত মুখ দেখে কুকুরগুলো শান্ত হলো।

পরের দিন পাড়ার লোকদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তাঁরা রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছেন। আজ দিন দশ-পনেরো ধরে প্রতি রাত্তিরেই নাকি কুকুরগুলো ঐরকম বীভৎস সুরে ককিয়ে ককিয়ে ডাকে। কেন যে অমন করে ডাকে কে জানে! নিশ্চয় ভয়ানক কিছু দ্যাখে, কিন্তু সেটা কী বস্তু?

আমি বুঝলাম, অন্য দিনের ডাক আমি শুনতে পাইনি।

আমার ঘরটা পুরনো, ভাঙাচোরা। রাতের বেলা আরশোলা, উচ্চিৎড়ে প্রভৃতি নানারকম পোকামাকড় ওড়ে। মাকড়সাগুলো তো রীতিমতো ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলেছে।

কি একটা জিনিস যেন পড়ে গেল—সেই শব্দে হঠাৎ গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। আলো ছেলে দেখি আলমারির গায়ে ছাতাটা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, সেটা পড়ে গেছে। আর অমন ধীর শান্ত বেড়ালটা হঠাৎই বীর বিক্রমে বাইসনের শিং ধরে ঝুলছে।

শুধু ঝোলাই নয়, তার দুটো থাবা থেকে সরু সরু আটটা বাঁকানো তীক্ষ্ণ নখ বের করে বাইসনের মুখটা আঁচড়াচ্ছে।

নিশ্চয় দেওয়ালে পোকামাকড় ধরবার জন্যে লাফাতে গিয়ে বাইসনের শিং-এ আটকে গিয়ে ঝুলছে—তা বলে নেপাল থেকে কেনা আমার অমন শখের বাইসনটার মুখ আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেবে?

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। উঠে, হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে ছাতাটা তুলে নিয়ে বেড়ালটাকে দু'-চার ঘা দিয়ে ঘর থেকে দূর করে দিলাম।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই চোখ পড়ল বাইসনের মাউন্ট করা মুখটার দিকে। হতভাগা বেড়ালটা মুখটাকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। একে বীভৎস মুখ, তার ওপর বেড়ালের নখের আঁচড়ে আঁচড়ে এখন ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।

বাইরে থেকে নেপালে যাত্রা কেড়াতে যাত্র তারা যে শুধু ইম্পোরটেড গুড্‌স অর্থাৎ বিদেশী জিনিসপত্র, যেমন ছাতা, টর্চ, সেক্টিরেজার, লাইটার, রেকর্ড-প্লেয়ার কেনে তা নয়, কিউরিও থেকেও দুষ্প্রাপ্য পুরনো আমলের জিনিস কেনার দিকেও ঝোঁকে।

নেপালে যে হোটেলের ছিলাম সেখানে সবার মুখেই শুনলাম, এখানে

কোথাও বাইসনের মাউন্ট করা শিংসুদু মাথা পাওয়া যায়। দুর্দান্ত জিনিস। ভক্তপুরে নেয়ারি রাজাদের ঘরে নাকি বহুকাল ছিল। তারপর এখন নেপালের কিউরিও সপে তার গতি হয়েছে।

কিন্তু কোন কিউরিওর দোকানে পাওয়া যায় তা সঠিক কেউ জানে না।

জিনিসটা যে কী, কেনই বা দুর্দান্ত, কিসের জন্যেই বা লোকের এত আকর্ষণ কিছুই জানি না। শুধু ওটা কেনার জন্যে পাগল হয়ে উঠলাম। নানা মঠ, মন্দির, প্যাগোজ দেখতে দেখতে একদিন একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে ভক্তপুরে চলে এলাম।

‘ভক্তপুর’ নাম থেকেই বুঝতে পারা যায় এক সময়ে জায়গাটায় ভক্তরা থাকতেন। তাঁরা হিন্দু কি বৌদ্ধ তা জানি না। তবে কাছাকাছি হিন্দুদের অনেক পুরনো মন্দির দেখতে পেলাম।

ভক্তপুর জায়গাটা নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু থেকে পূর্ব দিকে আট মাইল দূরে। এখানেই এক সময়ে দুশো বছরেরও আগে নেয়ারি রাজারা বাস করতেন। তাঁদের রাজপ্রাসাদ এখনো আছে।

ঘুরতে ঘুরতে এখানে একটা কিউরিওর দোকান পেলাম। ভেতরে ঢুকে দেখি, নানারকমের পুরনো পুঁতির মালা, রুদ্রাক্ষের মালা, কারুকর্মকরা বড়ো বড়ো ছোরা, দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখার জন্যে ভীষণদর্শন মুখ, এমনি অনেক জিনিস রয়েছে। আমি কৌতূহলী হয়ে এদিক-ওদিক কিছু খুঁজছি দেখে দোকানি জিজ্ঞেস করল—কী চাই?

আমি একে বিদেশী, তার ওপর এদেশের কিছু জানি না—সসংকোচে বাইসনের শিং-এর কথা জিজ্ঞেস করলাম।

দোকানদার আমার মুখে বাইসনের শিং-এর কথা শুনে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, আপনি কিনবেন?

এমনভাবে বলল যেন ও জিনিস কেনার অধিকার আমার নেই।

বললাম, দামে শোষালে আমি কিনব। তার আগে জিনিসটা দেখতে চাই।

লোকটি তখন একজন কর্মচারীর হাতে একগোছা চাবি দিয়ে আমাকে কোথাও নিয়ে যেতে বলল।

দোকান থেকে বেরিয়ে গলি-ঘুঁজি দিয়ে শেষে একটা বিরাট প্রাসাদের মস্ত কাঠের দরজার কাছে লোকটা এসে দাঁড়াল। এ চাবি ও চাবি দিয়ে গোটা পাঁচেক দরজা খুলে শেষে সুন্দর একটা সাজানো-গোছানো ঘরে এনে দাঁড় করাল।

ঘরটি পুরনো কালের রাজা-রাজড়াদের জিনিসপত্রে ভর্তি। রাজসিংহাসন, রাজার মাথার ছাতা, বিরাট ঢাল, বাঁকা তরোয়াল, গোলাপপাস, আতরদান, ঝাড়লণ্ঠন এমন কত কী! হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে বিরাট এক মোষের মাথা। দেখেই বুঝলাম এইটেই সেই বাইসন!

বাইসন হচ্ছে আমেরিকার এক জাতীয় বুনো মোষ। মোষ যে এরকম ভয়ংকর হয় তা জানা ছিল না। চোখ দুটো লাল—যেন ক্রোধে জ্বলছে। মোটা মোটা দুটো বাঁকানো শিং।

বোঝা যায়, কোনো এককালে কোনো রাজা দুর্ধর্ষ এই জীবটিকে শিকার করেছিলেন। তারপর তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ কীর্তিটাকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে গোটা মাথাটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে যেমন ছিল তেমনি রেখে হরতনের আকারে একটা কুচকুচে কালো কাঠের ফ্রেমে মাউন্ট করে রেখেছেন। এর বিশেষত্ব হচ্ছে, শিংগুলো এমন কিছু দিয়ে রং করা যা দেখলে যে কেউ মনে করবে এটা বুঝি সোনার।

একটা কথা ভেবে আশ্চর্য হলাম—আমেরিকার বাইসনের নাগাল নেপালের রাজা পেলেন কি করে!

সে কূটতর্ক থাক। জিনিসটা দেখে আমার এত পছন্দ হলো যে টাকার মায়া না করে কিনে ফেললাম।

হোটেলের সবাই এই দুপ্রাপ্য মহামূল্যবান জিনিসটা দেখে ঈর্ষায় ফেটে পড়ল। শুধু হোটেলের ম্যানেজার আমায় বললেন, বাবু, এটা তো কিনলে কিন্তু রাখবে কোথায়?

বললাম, কেন? আমার ঘরে।

ম্যানেজার হেসে বললেন, এ বাইসন যে সে ঘরে থাকে না। রাজপ্রাসাদ চাই। কত জনে নিয়ে গেছে, শেষে বিনা পয়সায় ফেরত দিয়ে বেঁচেছে।

আমি কোনো উত্তর দিইনি। বুঝলাম ম্যানেজার আমায় ঠাট্টা করছে।—আমার ঘর-বাড়ি যত ভালোই হোক, এ জিনিস মানাবে না।

কুসংস্কারে বা অলৌকিকত্বে আমার এতটুকু বিশ্বাস নেই। আমি ওটিকে কলকাতায় এনে আমার সেই ভাঙাচোরা ভাড়াটে ঘরে সযত্নে টাঙিয়ে রেখেছিলাম। তারপর থেকেই যে সব ছোটোখাটো ঘটনা ঘটছিল তা অস্বস্তিকর হতে পারে কিন্তু অস্বাভাবিক বা অলৌকিক বলে মনে করিনি। আজ বেড়ালটার নখের আঁচড়ে আঁচড়ে বাইসনের অমন মুখটা বিকৃত হয়ে যাওয়ায় দুঃখ পেলাম।



কয়েক দিন পর।

অফিস-ফেরত ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দিকে গিয়েছিলাম সেই ভুটানিটার সন্ধানে। দেখি ওরা এ বছরের মতো পাততাড়ি গোটাচ্ছে। আমি যে লোকটির কাছ থেকে মাফলার কিনেছিলাম সে লোকটিও রয়েছে। কিন্তু সে তখন তার দেশীয় লোকদের সঙ্গে কি একটা বিষয় নিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় এমনই তর্ক করছিল যে আমায় দেখে লজ্জা পেল। আমি কিছু বলার আগেই সে ইশারায় আমায় বাড়ি চলে যেতে বলল। একটু পরে সে নিজেই গিয়ে টাকা নিয়ে আসবে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তার ওপর লোডশেডিং। শেষ মাঘে হঠাৎ শীতটা যেন জাঁকিয়ে বসেছে। সর্বান্তে চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে অঙ্ককার গলির মধ্যে দিয়ে সাবধানে হেঁটে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িলাম। পকেট হাতড়ে চাবি বের করে তালা খুললাম। সঙ্গে সঙ্গে গা-টা কেমন যেন ছম্ছম্ করে উঠল। এমন তো কোনোদিন হয় না।

আমি চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে জুতোটা খুললাম। দু' হাতে দরজার দুটো পাল্লা ছড়িয়ে দিলাম। এবারে অঙ্ককারে মেঝেতে পা ফেলতেই যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল। মেঝেতে সাদা মতো কি একটা পড়ে আছে। আর তার সামনে দুটো স্বলস্ত চোখ। শুধু স্বলস্ত নয়, জীবন্ত।

সেই জীবন্ত চোখ দুটো যেন অঙ্ককারের মধ্যেও আমাকে চেনবার চেষ্টা করছে।

আমি ভয়ে চিৎকার করতে গেলাম। কিন্তু স্বর বেরোল না। আমার মাথা ঘুরতে লাগল, পা টলতে লাগল। বুঝতে পারলাম আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি...আর ঠিক সেই সময়েই কে যেন বাইরে থেকে ডাকল—বাবুজি!

কেমন করে তারপর দশ-পনেরো মিনিট কেটেছে জানি না। হঠাৎই দেখলাম কারেন্ট এসে গেছে। আর ভুটানি লোকটি একদৃষ্টে মেঝের ওপর লক্ষ্য করছে। বেড়ালটা রক্তাক্ত অবস্থায় মরে পড়ে আছে—তারই পাশে বাইসনের শিংসুন্ধু মাথাটা কাঠ থেকে খুলে পড়েছে।

ভুটানি জিজ্ঞেস করল, বাবুজি, এ জিনিস কোথায় পেলেন?

দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্তস্বরে সব ঘটনাই বললাম।

ও বলল, বাবুজি, এ জিনিস ঘরে রাখবেন না।

বললাম, কি করব?

সে বলল—আমি ব্যবস্থা করব। তবে এখন নয়, রাত বাড়লে। আর বাবু, আজকের রাতটা আপনি এখানে থাকবেন না। আমি একাই থাকব।

অগত্যা প্রাণের দায়ে এক অচেনা অজানা ভুটানির হাতে ঘর ছেড়ে দিয়ে আমি এক আত্মীয়ের বাড়ি চলে গেলাম।

পরের দিন সকালে এসে দেখি ঘরের সামনে লোকের ভিড়। বাড়িওলা তোরে উঠে দেখেন ঘর খোলা অথচ আমি নেই। বুঝলেন চোর এসেছিল। তারপরই লোক ডাকাডাকি করেছেন। আমায় দেখে তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, কি মশাই! কাল কোথায় ছিলেন? এদিকে—

আমি সব কথাই চেপে গেলাম। শুধু বললাম, বিশেষ দরকারে কাল রাত্তিরে এক আত্মীয়ের বাড়ি থাকতে হয়েছিল।

—দেখুন দেখি! আর সেই সুযোগেই চোর এসে হানা দিল। কুকুরগুলোও ডাকল না মশাই! আশ্চর্য!

বাড়িওলা আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, কি কি জিনিস চুরি গেছে, ঠাণ্ডা মাথায় একটা লিস্ট করে ফেলুন। থানায় জানাতে হবে তো। বলে তিনি শশব্যস্তে ওপরে চলে গেলেন।

লিস্ট করার দরকার হয়নি। কেননা আমি ভালো করে দেখেছি, কিছুই চুরি যায়নি। যাবার মধ্যে গেছে বাইসনের শিংওয়ালা মাথাটা আর নিখোঁজ সেই ভুটানি লোকটি।

তাকে ধন্যবাদ সে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

---

# নিষেধ

কেন যে হঠাৎ সুদূর দিল্লি থেকে মধুপুরে মিসেস অ্যান্টনিকে চিঠি লিখে বসলাম সে কথাটা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই।

লিখলাম—দিন দশেকের জন্যে নদীর ধারে মিস্টার গুহর সেই বাড়িটা ভাড়া পাওয়া যাবে কি ?

উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই পেলাম। মিসেস অ্যান্টনি লিখছেন—চেঞ্জে আসবে তো ? তা ওটা কেন ? ভালো বাড়ি আমার হাতেই আছে। মিস্টার গুহর বাড়িটা সংস্কারের অভাবে প্রায় অব্যবহার্য হয়ে গেছে।

উত্তরে লিখলাম—ঠিক চেঞ্জে যাবার জন্যে নয়। ঐ বাড়িটার সঙ্গে আমাদের পরিবারের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। হঠাৎই বাড়িটা একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। আপনি অনুগ্রহ করে জানান কত ভাড়া লাগবে। টাকাটা পাঠিয়ে দেব। আর বাড়িটা মোটামুটি বাসোপযোগী (অন্তত একটি ঘর—কেননা আমি একাই যাব) করতে যা খরচ লাগবে তাও পাঠিয়ে দেব। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা করবেন। আমি আবারও বলছি—হঠাৎই যাবার খেয়াল হয়েছে। দেরি হলে হয়তো মত বদলে যাবে।

মিসেস অ্যান্টনিদের সঙ্গে আমাদের পরিবারের যোগ অনেক দিনের। আমরা যতবারই মধুপুর চেঞ্জে গিয়েছি, মিসেস অ্যান্টনিই বাড়ি ঠিক করে দিতেন। গুহসাহেবের বাড়িটাই আমাদের বেশ পছন্দ হয়েছিল। নদীর ধারে বাড়িটা। লোকের কোলাহলও নেই। শান্ত পরিবেশ। বাড়িটাও বেশ বড়ো। অনেকগুলো ঘর। চারিদিক ঘিরে বিরাট কম্পাউন্ড। তার অনেকটাই ঝোপজঙ্গলে ভর্তি হয়ে থাকত। গুহসাহেব কলকাতায় থাকেন। এখানে বড়ো একটা আসেন না। বাড়িটা দেখাশোনার ভার মিসেস অ্যান্টনিকেই দিয়ে রেখেছেন।

আগেই বলেছি, এ বাড়িতে আমরা সপরিবারে অনেকবার এসেছি। মাঝে কয়েক বছর আসা হয়নি। শেষ এসেছিল শুধু দিদি আর জামাইবাবু অসীমদা। মাসখানেক ছিল। তারপর কী যে হয়ে গেল! আর কেউ এমুখো হতে চায় না। মধুপুরের কথা উঠলেই বাবা গম্ভীর হয়ে যান। মা নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে। আমিও ঠিক করেছিলাম আর কখনও এখানে আসব না। ব্যস!

মধুপুরের সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ। তারপর হঠাৎই কী হলো, মধুপুরে সেই বাড়িতে যাবার জন্যে মনটা ছটফট করে উঠল।

টান্ধা থেকে যখন বাড়িটার সামনে নামলাম তখন শীতের বেলা মিইয়ে এসেছে। মাঘের শীত বেশ জেঁকে বসছে। মিসেস অ্যান্টনি হাসতে হাসতে ওঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। আমাদের সকলের কুশল সংবাদ নিয়ে চাবিটা দিয়ে বলে গেলেন—জলটল সব রেডি আছে। হাতমুখ ধুয়ে নাও। চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

গেট ঠেলে কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকলাম। এই সেই বাড়ি। তাহলে আবার এখানে আসতে হলো।

তখন সূর্য ডুবছে। বাড়ির সামনে দীর্ঘ ইউক্যালিপ্টাস গাছের মাথায় পড়ন্ত সূর্যের ম্লান আলো। এমনি পড়ন্ত রোদ এর আগেও এই বাড়িরই কার্নিসে কার্নিসে, টানা বারান্দার পশ্চিমদিকের মেঝের ওপর কতবার দেখেছি। কিন্তু এমন মনকেমন-করা ভাব কখনো হয়নি।

তালা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। এটাই এবার আমার বেডরুম। কিছু কিছু প্লাস্টারের কাজ হয়েছে, হোয়াইট ওয়াশও হয়েছে। জানলায়, দরজায় নতুন ছিটকিনি লাগানো হয়েছে। একটা চৌকিরও ব্যবস্থা হয়েছে দেখে খুশি ছলাম। বিছানাপত্রও নিশ্চয় মিসেস অ্যান্টনিই দিয়েছেন। ঘরের কোণে জলভর্তি কুঁজোটি পর্যন্ত।

একটু পরে মিসেস অ্যান্টনির বাড়ি থেকে ডিমের ওমলেট, দু'-স্লাইস পাউরুটি আর চা এল। খুবই খিদে পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি প্লেটটা টেনে নিলাম।

দু'বেলা খাওয়ার ব্যবস্থাও মিসেস অ্যান্টনির বাড়ি। কাজেই শুধু উদ্দেশ্যহীন বেড়ানো আর মিসেস অ্যান্টনির বাড়ি আড্ডা দেওয়া ছাড়া আমার আর অন্য কাজ ছিল না।

দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেল। কোনো অসুবিধে নেই। অত বড়ো বাড়িতে একা থাকি, তাতেও ভয় পাই না। কিন্তু একটা কথাই বারে বারে মনে হচ্ছিল—কেন হঠাৎ এলাম? এমন কি আমার আসার খবর পর্যন্ত দেশের বাড়িতে জানাইনি। জানাইনি তার প্রধান কারণ—কেন এলাম তা তো পরিষ্কার করে কাউকে বোঝাতে পারব না।

সাত দিন কেটে গেল। আর মাত্র তিন দিন থাকব। কিন্তু আমার কেবলই

মনে হচ্ছিল আমার এই আসাটা একেবারে নিরর্থক নয়, নিশ্চয় কিছু একটা ঘটবে। কিন্তু কী ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না।

মিসেস অ্যান্টনির বয়স হয়েছে। ছেলে, ছেলের বৌ, নাতি-নাতনি নিয়ে তাঁর বেশ বড়ো সংসার। ওঁদের বাড়ি গেলেই মিসেস অ্যান্টনি পুরনো দিনের কথা তোলেন। জিজ্ঞেস করেন—মা কেমন আছেন, বাবার বয়েস কত হলো, হাঁটাচলা করতে পারেন কিনা। তারপরেই স্মৃতি হাতড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন—তুমি বোধহয় এখানে লাস্ট এসেছিলে যখন তোমার দিদি-জামাইবাবু এখানে ছিলেন।

কথাটা এড়িয়ে যাবার জন্যে সংক্ষেপেই উত্তর দিই—হ্যাঁ।

—তোমার জামাইবাবু মানুষটাও বেশ ভালোই ছিলেন। যেমন হ্যান্ডসাম চেহারা, তেমনি হৈচৈ করতে ভালোবাসতেন।

বললাম—অসীমদা সত্যিই খুব চমৎকার মানুষ। আমি তো যে ক’দিন এখানে ছিলাম—

বাধা দিয়ে মিসেস অ্যান্টনি বললেন—তবে উনি বোধহয় একটু ফ্রেজি টাইপের ছিলেন।

—ফ্রেজি! অস্বাভাবিক প্রকৃতির? না-না—

—আমি দুঃখিত। ফ্রেজি বলাটা আমার ঠিক হয়নি। আসলে কিছু কিছু ছেলেমানুষি ছিল।

আমি হেসে বললাম—যত বয়স্কই হোক না কেন, সবার মধ্যেই অল্পবিস্তর ছেলেমানুষি থাকে।

—তা বলে নির্জন দুপুরে কোনো বয়স্ক মানুষ একা একা ইঁদুরের ল্যাজে দড়ি বেঁধে ঘোরায় না। বলে মিসেস অ্যান্টনি তাঁর সামনের পড়ে যাওয়া দাঁত দুটোর ফাঁক দিয়ে হাসলেন।

বললাম—সে হয়তো দিদিকে ভয় দেখাবার জন্যে। ইঁদুর, আরশোলা, মাকড়সায় দিদির খুব ভয় ছিল।

—তোমার দিদির হাটের ট্রিটমেন্ট জামাইবাবু করিয়েছিলেন?

মিসেস অ্যান্টনির এই ধরনের জেরা আমার ভালো লাগছিল না। তবু একটু উঁচু গলাতেই বললাম—দিদির যে হাটের অসুখ ছিল তা আমারাই কখনও জানতাম না।

—তা বটে। বলে মিসেস অ্যান্টনি একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

—এই দ্যাখো না আমার অবস্থা। একদিন মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। তবে না জানা গেল আমি হাই প্রেসারের রুগী হয়ে আছি। সে থাক, তোমার সেই সুন্দরী বোনটির খবর কি? কি যেন নাম?

—আমার পিসতুতো বোনের কথা বলছেন? মিষ্টু?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। ওর বিয়ে-থাওয়া হয়েছে?

বললাম—না, চেষ্টা চলছে।

পিসেমশাই, পিসিমা মারা যাবার পর সেই কোন ছোটবেলায় মা-ই ওকে নিজের কাছে এনে রাখে। সেই থেকে ও আমাদের সংসারেই রয়েছে। দিদির চেয়ে বেশ কয়েক বছরের ছোটো হলেও দিদি ওকে খুব ভালোবাসত। যখনই কোথাও যেত মিষ্টুকে সঙ্গে নিয়ে যেত। দুই বোন ম্যাচ করে একই রকম শাড়ি-ব্লাউজ পরত। শুতোও দুজনে একসঙ্গে। এক কথায় ওরা শুধু দু'বোনই নয়, যেন দুই বন্ধু। দিদির বিয়ে দিতে গিয়ে বাবা প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন। এখন দুর্ভাবনা মিষ্টুকে নিয়ে।

ন'টা দিন কেটে গেল। কাল চলে যাব।

মিসেস অ্যান্টনি বললেন, পুরো একমাসের ভাড়া গুনলে, আর কটা দিন থেকে যাও। এই সময়টাই তো চেঞ্জের পক্ষে ভালো।

বললাম—না মাসিমা, ছুটি ফুরিয়ে গেল। কাল যেতেই হবে।

মিসেস অ্যান্টনি বললেন, এত তাড়াতাড়িই যদি যাবে তাহলে দিল্লি থেকে এত খরচ করে মাত্র দশ দিনের জন্যে শুধু শুধু এলে কেন?

কি উত্তর দেব? শুধু একটু হাসলাম। সে প্রশ্নের উত্তর আমিও তো খুঁজছি।

রাত তখন ন'টা।

শীতের রাত। এমনিতেই পল্লীটা নিঝুম। এখন এই রাত ন'টাতেই মনে হচ্ছে যেন একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ জেগে নেই। মনে হলো যেন আমি কোনো মৃতের রাজ্যে বাস করছি।

মৃতের রাজ্য কথাটা মনে হতেই গা-টা কেমন হুমহুম করে উঠল। এই ন'দিনের মধ্যে কোনোদিনই আমার এমন ভয় করেনি। হঠাৎ আজই বা কেন এইরকম একটা বিলম্বিত অস্বস্তি হচ্ছে বুঝতে পারলাম না।

আমি একটা বই পড়ছিলাম। বইটা বন্ধ করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব

বলে উঠে দাঁড়লাম। আলো নেভাবার আগে দরজাটায় ঠিকমতো খিল দিয়েছি কিনা দেখে নিলাম। জানলাগুলোও দেখে নিলাম ভেতর থেকে বন্ধ।

আলো নেভাতে যাচ্ছি—হঠাৎ মনে হলো এই মুহূর্তে ঘরে আমি একা নই। এতক্ষণ ঘরের মধ্যে যে বন্ধ বাতাসটা ছিল, হঠাৎ তার তাপমাত্রাটাও কেমন কমে গেল অস্বাভাবিক মতো। আমি শীতে কঁকড়ে গেলাম। আর তখনই দেখলাম কেউ একজন প্রায় নিঃশব্দে আমার বিছানার দিকে এগিয়ে আসছে।

আমার সর্বাঙ্গ ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

তারপরই যা দেখলাম তাতে একই সঙ্গে ভয়, কিস্ময়, আনন্দ আমাকে একেবারে অভিভূত করে দিল।

দেখলাম—আমার দিদি, যে কয়েক বছর আগে এই বাড়িতেই হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছিল, সে আমার বিছানার এক কোণে তার সেই চিরঅভ্যস্ত ভঙ্গিতে বসে রয়েছে।

দিদির সেই সুন্দর মুখখানি এক স্বর্গীয় আভায় আরও সুন্দর লাগছিল। তাকে বাড়িতে যে প্রিয় শাড়িখানি পরে প্রায় ঘোরাফেরা করতে দেখতাম সেই শাড়িখানাই পরা, তার এলো খোঁপা ঠিক আগের মতোই কাঁধের ওপর যেন ভেঙে পড়েছে।

কয়েক মুহূর্ত আমি দিদির দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি ভুল দেখছি কিনা মেলাবার জন্যে খুবই সচেতনভাবে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লক্ষ্য করতে লাগলাম।

না, ভুল নয়। ভুল হতে পারে না। তার যে হাতখানি কোলের উপর রাখা তা কঙ্কাল নয়, জীবন্ত মানুষেরই হাত। তার চুড়ি, বিয়ের আংটি, কানের দুল সবই ঠিক ঠিক। শুধু গলায় কালো কারের সঙ্গে পাথরের যে লকেটটা সবসময়ে পরে থাকত সেই লকেটটা নেই। আছে শুধু কালো কারটা। পরিবর্তনের মধ্যে দিদি যেন একটু মোটা হয়েছে। কেননা ওর মেরুন্ন রঙের ব্লাউজটা গায়ে টাইট হয়ে এঁটে আছে—যেমন কালো কারটা বৈষ্ণবীদের কষ্টীর মতো গলার সঙ্গে লাগা।

এবার স্পষ্ট করে দিদির দিকে তাকলাম। দিদি একটু হাসল। কিন্তু বড়ো স্নান সে হাসি। তারপরই স্পষ্ট দেখলাম দিদি ধীরে ধীরে হাতটা তুলে কারটা একবার ছুঁলো, যেন খোলবার চেষ্টা করল।

—দিদি! বলে আমি চেষ্টা করে উঠলাম। কিন্তু দিদি উত্তর দিল না।

আমি পাগলের মতো দিদিকে হোঁবার জন্যে ছুটে গেলাম আর তখনই

আলোটা নিভে গেল। বোধহয় লোডশেডিং হলো। আমি অন্ধের মতো এগোতে গিয়ে অন্ধকারে দেওয়ালে দেওয়ালে ঠোঁকর থেতে লাগলাম। কোনোরকমে বিছানায় গিয়ে টচটা নিয়ে আললাম। কিন্তু দিদি তখন অদৃশ্য।

দিল্লি যাওয়া হয়নি। পরের দিনই সোজা চলে গেলাম দেশের বাড়িতে। এত বড়ো খবরটা মা, বাবা, মিষ্টিকে না দিলেই নয়। দিদির অকাল, অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর পর থেকে ওদের মানসিক অবস্থা যাকে বলে অবর্ণনীয়, তাই।

যে উত্তেজনা নিয়ে খবরটা দিতে গিয়েছিলাম, বাড়ি ঢুকেই আর একটা খবরে উৎসাহটা যেন মিইয়ে গেল।

প্রথমেই দেখা বাবার সঙ্গে। বাবা হেসে বললেন, এই যে তুমি এসে পড়েছ! আজই তোমায় সুখবরটা লিখতে যাচ্ছিলাম।

যাক—তবু সুখবর।

বাবা বললেন, শেষ পর্যন্ত অসীমের সঙ্গেই মিষ্টুর বিয়ে ঠিক করলাম। রীণা চলে যাবার পর থেকে এ ক'বছর ও তো পাগলের মতো কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মিষ্টুকেই চাইল। বলল, আমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

সুখবর বৈকি! অসীমদার মতো ছেলে দেখা যায় না। দিদির নিতান্ত দুর্ভাগ্য—এমন স্বামী পেয়েও এক বছরের বেশি ঘর করতে পারল না। চলে গেল হঠাৎই। সেই অসীমের সঙ্গে যদি মিষ্টুটার—

—তবে তোমার মায়ের তেমন ইচ্ছে ছিল না। ওর যে কী অদ্ভুত ধারণা! তা যাক। এখন উনি রাজী হয়েছেন।

একটু পরে চা-জলখাবার খেয়ে সকলের সামনেই মধুপুরের ঘটনাটা হুবহু বলে গেলাম। বাবা ওঁর চিরাচরিত অবিস্বাসী মন নিয়ে ঠাট্টার হাসি হেসে ইজিচেয়ারে গিয়ে শুলেন। কিন্তু মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল। আর দু'চোখ দিয়ে অবঝোরে জল পড়তে লাগল।

তারপর যখন গলায় লকেট ছাড়া কারটার কথা বললাম তখন মা হঠাৎ চমকে উঠল।

—লকেটটা ছিল না?

—না।

—কেন? শাড়ি থেকে আংটি পর্যন্ত সব রইল আর লকেটটা নেই! শুধু কারটা?



—হ্যাঁ। আর সেটাও আবার বোধহয় মোটা হবার জন্যে, গলায় আঁট হয়ে বসেছিল। দিদি একবার হাত তুলে সেটা খোলবার চেষ্টাও করল যেন—তখনই লোডশেডিং হয়ে গেল।

—ওগো শুনহ! বলেই মা হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল।

মায়ের অবস্থা দেখে বাবা চমকে উঠলেন।

—আমি যা ভয় করেছিলাম তাই। তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করনি, কিন্তু আজ এতদিন পর নিজে দেখা দিয়ে যা ঘটেছিল তা জানিয়ে গেল।

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

মা যেন উদ্ভ্রান্তের মতো ড্রয়ার হাতড়াচ্ছে। অনেক খুঁজে একটা ইনল্যান্ড খাম পেল। সেটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

—তোমার বাবাকে দেখিয়েছিলাম। হেসেছিল। এখন তুমি পড়ে দ্যাখো।

চিঠিটা মধুপুর থেকে লেখা। বিশেষ কিছু নয়। শুধু কয়েক ছত্র।

—মাগো, খুব ভয় পেয়ে এই চিঠি গোপনে তোমায় লিখছি। এখানে এসে দেখছি মাঝে মাঝে ও যেন কিরকম হয়ে যায়—বিশেষ গভীর রাতে। আমায় কিরকম ভয় দেখায়। আমি প্রথম প্রথম ভাবতাম মজা করছে। কিন্তু কাল রাত্তিরে যা করল—কোথা থেকে একটা বেড়াল ধরে এনে তার গলায় ফাঁস—

আর লেখা হলো না। ও আসছে।...

অর্ধেক লেখা চিঠিটা পড়েই আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। মনে পড়ল মিসেস অ্যান্টনির কথা।—নির্জন দুপুরে অত বড়ো মানুষটা ইস্তুরের ল্যাঞ্জে দড়ি বেঁধে ঘোরাতে। তবে কি—

মা বললে, তখনই বলেছিলাম পোস্টমর্টেম করাও। কিন্তু তোমরা কেউ শুনলে না। আমি মা বলেই তার সব কথা বুঝতে পেরেছিলাম। আমার একটা মেয়ে গেছে, আর একটাকে কিছুতেই যেতে দেব না।

সেদিনই বাবা সন্মতি জানিয়ে অসীমদাকে চিঠি লিখে রেখেছিলেন। শুধু পোস্ট করার অপেক্ষা। মায়ের ওপর রাগ করে বাবা চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিলেন।

দিল্লি ফিরে এসেছি।

মাস কয়েক পর কাগজে একটা খবর পড়ে চমকে উঠলাম। কলকাতায় কোন এক অসীম চৌধুরীকে পুলিশ খুনের অপরাধে গ্রেপ্তার করেছে। সে

নাকি তার নব বিবাহিতা স্ত্রীকে গলায় কালো কারের ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করেছে। হত্যার কারণ জানা যায়নি। ছবিটাও দেখলাম। এ আমারই অতি প্রিয় জামাইবাবু।

আজ এক এক সময় ভাবি, মিষ্টুর সঙ্গে যাতে বিয়ে না হয় সেই কথাই কি দিদি সেদিন রাত্তিরে ইঙ্গিতে জানিয়ে গেল? সেই কথা তাড়াতাড়ি জানাবার জন্যেই কি অদৃশ্য এক শক্তি সুদূর দিল্লি থেকে আমায় মধুপুরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল?

---

# অন্ধকার সিঁড়ি

সে আজ বেশ কিছুদিন আগের কথা। এই কলকাতা শহরেই আমার জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যা মনে পড়লে এখনও ভয়ে গায়ে কাঁটা দেয়।

তখন আমার বয়েস কতই বা হবে? একুশ-বাইশ? বি. এ. পাস করে চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কোথাও চাকরি পাই না। তখন একদিন পিসেমশাইয়ের বাড়ি গিয়ে দেখা করলাম। পিসেমশাই একটা বড়ো কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। সব শুনে তিনি আমায় ওঁর অফিসে দেখা করতে বললেন। তাঁর কথা মতো একদিন ওঁর অফিসে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলাম।

দিনটা খুবই বাজে ছিল। একে পৌষ মাসের শেষ, তার ওপর অসময়ে দু’তিনদিন ধরে চলছে টিপ টিপ করে বৃষ্টি। হাড়-কামড়ানো কনকনে ঠাণ্ডা। দু’দিন পর বৃষ্টিটা সেদিন ছেড়েছিল। কিন্তু আকাশটা ছিল গোমরা মুখের মতো মেঘলা করে। মাঝে মাঝেই ঝোড়ো বাতাস। ঠাণ্ডা বাতাসে মুখচোখে যেন ছুঁচ বিঁধছিল। কান দুটো যেন কেউ বরফের ছুরি দিয়ে কেটে দিচ্ছিল। সেই অবস্থায় বেরোচ্ছিলাম, আমার ছ’বছরের ভাইপোটা সোয়েটার, কোট, মাংকি-ক্যাপ পরে সামনে এসে দাঁড়ালো। মাংকি-ক্যাপ পরে তাকে কেমন দেখাচ্ছিল সেটা জাহির করার জন্যে সে আমার সামনে এসে হাত-মুখের নানা ভঙ্গি করতে লাগল। আমি ওকে আদর করে বেরোতে যাচ্ছিলাম, ও বললে, তোমার মাংকি-ক্যাপ নেই কাকু?

তা তো বটে। আমার মাংকি-ক্যাপটা তো ট্রান্সে পচছে। বড়ো একটা ব্যবহার করা হয় না। আজকের ওয়েদারেও যদি ওটা ব্যবহার করা না হয় তাহলে আর কবে হবে? আমি তখন আবার ফিরে গিয়ে মাংকি-ক্যাপটা বের করে সাইডব্যাগে নিলাম। খুব দরকার হলে পরব।

পিসেমশাইয়ের অফিসটা পার্ক স্ট্রীট আর ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের মুখে। মস্ত বাড়ি। আর পুরনো। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। দিব্যি ঘষা-মাজা। শুধু খুব উঁচুতে ১৮৮০ লেখা দেখে বোঝা যায় বাড়িটা ঐ সময়ে তৈরি।

বাড়িটার নিচের তলায় সব দোকান। আর পার্ক স্ট্রীটের দোকান মানেই বড়ো বড়ো কৈতাদুরন্ত ব্যাপার। বাড়িটার ওপরতলাগুলোতে যে নানা ধরনের অফিস রয়েছে রাস্তা থেকেই তা বোঝা যায়। ওদেরই মধ্যে ছ'তলায় পিসেমশাইয়ের অফিস।

কিন্তু ঢুকব কোন দিক দিয়ে বুঝতে পারলাম না। আষ্টেপৃষ্ঠে শুধু দোকান—আর দোকান।

অনেক খোঁজ করে বাড়ির প্রায় পিছন দিকে লিফ্টের সন্ধান পেলাম। কিন্তু—হায়! লোডশেডিং চলছে! লিফ্ট অচল। কাজেই সিঁড়ির দিকে এগোলাম। ডান দিকে একটু এগিয়েই সিঁড়ি। এই সিঁড়ি ভেঙে ছ'তলায় উঠতে হবে।

লিফট যখন বন্ধ তখন সিঁড়িতে ভিড় হবার কথা। কিন্তু আমি ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী নেই দেখে অবাক হলাম। অবশ্য অবাক হবার কিছুই ছিল না। কেননা এই বিজ্ঞী আবহাওয়ায় কেউ বাড়ি থেকে বেরোয়নি। নিতান্তই দায়ে পড়ে যারা এসেছিল তারা নিশ্চয় লোডশেডিং হবার আগেই ওপরে উঠে গেছে। যাই হোক সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আরম্ভ করলাম।

সিঁড়ি যে এত অন্ধকার তা প্রথমে বুঝতে পারিনি। খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে ওপরে উঠতে লাগলাম। সিঁড়িগুলো কাঠের আর বেশ চওড়া, তাই রক্ষা। হোঁচট খাবার ভয় ছিল না। প্রথমটা অন্ধকারে উঠতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। পকেট থেকে দেশলাই বের করে লাঠি স্থালতে স্থালতে উঠছিলাম। তারপর অন্ধকার ক্রমে চোখ-সওয়া হয়ে গেল। পনেরো-কুড়ি ধাপ ওঠার পরই খানিকটা সমতল মেঝে। এটুকু বেশ হাঁটা যায়। তারপর আবার খাড়া সিঁড়ি। বুঝলাম সমতল মেঝেগুলো এক-এক তলা বোঝায়।

আমি ধীরে ধীরে উঠছি। বাঁদিকে লিফ্টের অন্ধকার খাদ। অবশ্য পড়ে যাবার ভয় নেই। লোহার শিকের জাল দেওয়া। ডান দিকে নিরেট দেওয়াল। দেওয়ালটাকে মনে হচ্ছিল যেন পাহাড়ের গা। কোথাও কোনো ফাঁক-ফোকর নেই।

আমি উঠছি তো উঠছিই।

সিঁড়িটা একে অন্ধকার তার ওপর নির্জন। ভাবলাম এরকম জায়গায় তো কাউকে ভুলিয়ে এনে দিবা খুন করা যায়।

ভাবতেই গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল।

এমনি কতক্ষণ উঠেছি, হঠাৎ খেয়াল হলো ক'তলা উঠলাম তা তো হিসেব করিনি। ছ'তলা পার হলে যাইনি তো? একথা মনে হতেই আবার নামতে লাগলাম। কী গেরো! নামছি তো নামছিই। শেষে গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে, দম নিয়ে আবার উঠতে শুরু করলাম।

এবার খুব হিসেব করে সিঁড়ি ভাঙতে লাগলাম।—এই হলো দোতলার মেঝে।

আর কিছুক্ষণ পর—এই হলো তিনতলার মেঝে।—এ-ই চারতলা—উঃ! এরই মধ্যে হাঁপিয়ে গিয়েছি।

কিন্তু এতক্ষণেও কাউকে সিঁড়ি ভাঙতে দেখছি না কেন? কেউ না উঠুক, নামবেও না? তবে কি অন্য দিক দিয়ে আর কোনো সিঁড়ি আছে? আমি কি তবে ভুল করে পরিত্যক্ত কোনো সিঁড়ি দিয়ে উঠছি?

এ কথা মনে হতেই মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল।

হঠাৎ এই সময়ে সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পেলাম। কেউ যেন ভারী ভারী পা ফেলে ওপর থেকে নেমে আসছে। অবাক হয়ে তাকাতেই দেখি সুট-টাই-পরা একটা সাহেব নামছে। তার টুপিটা নেমে এসেছে কপালের নিচে পর্যন্ত। দু'হাত কোটের পকেটে গোঁজা।

কলকাতায় এখন বড়ো একটা সাহেব-মেম চোখে পড়ে না। আজ হঠাৎ সামনে সাহেব দেখে অবাক হলাম।

সাহেব তখন একেবারে আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে। অথচ পাশে যথেষ্ট নামার জায়গা।

যেহেতু আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক সেজন্যে সাহেব দেখে ভয় পেলাম না। রীতিমতো বিরক্ত হয়ে বললাম—সাহেব, লোকের ঘাড়ে এসে পড়ছে যে! দেখে শুনে নামো।

সাহেব আমার দিকে ফিরে তাকালো। উঃ! কী ভয়ংকর দৃষ্টি! আর চোখ দুটো? তা কি মানুষের চোখ? আমি কোনোরকমে পাশ কাটিয়ে দৌড়ে তিন ধাপ ওপরে উঠে এলাম। তারপর আন্দাজে তলা হিসেব করে ওপরে উঠতে লাগলাম। কিন্তু মনটা কিরকম বিভ্রান্ত হয়ে গেল। হঠাৎই মনে হলো এই মাত্র যাকে দেখলাম সে যেন ঠিক স্বাভাবিক মানুষ নয়। এমন কি—এমন কি বোধহয় মানুষও নয়। মানুষ নয়—কেননা, যে পায়ের শব্দটা সামনে থেকে পেয়েছিলাম, আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় সে শব্দটা আর পাইনি। সাহেবটা যেন বাতাসে ভর করে নেমে গেল।

এ কথা মনে হতেই আমার গা-টা কেঁপে উঠল। আর তখনই মনে হলো এই অন্ধকার সিঁড়িতে আরও কিছু মারাত্মক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে।

ভাবতে ভাবতে মাত্র পাঁচ-ছ' ধাপ উঠেছি, হঠাৎই আমার পা দুটো যেন সিঁড়ির সঙ্গে আটকে গেল। আমার দু'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম। দেখি মাত্র কয়েক ধাপ ওপরে একটা লোক দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে সিঁড়িতে দু'পা ছড়িয়ে ঘাড় কাৎ করে বসে রয়েছে। আর গলা থেকে রক্ত পড়ছে।

এ দৃশ্য দেখেই আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। কিন্তু আমার চিৎকার শুধু নিশ্চিহ্ন দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল।

এ তো রীতিমতো খুন! আর এ খুনটা যে সাহেবটাই করে গেছে তাতে সন্দেহ মাত্র রইল না।

আমি ভাবতে লাগলাম এই মুহূর্তে আমার কর্তব্য কী। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা কাজের কাজ নয়, উচিতও নয়। সাহেবটা তো পালিয়েছে। এখন লোক ডেকে একে হাসপাতালে দেওয়া উচিত।

এ কথা মনে হতেই আমি তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। আমার পায়ে যে এত জোর তা আমি ভাবতেও পারিনি। আমি কখনো কখনো একসঙ্গে দু' তিন খাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে নামছিলাম।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একতলায় এসে পৌঁছলাম। দিনের আলো দু'চোখ ভরে দেখলাম। আমি এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে “খুন-খুন—” বলে চিৎকার করতে করতে দোকানগুলোয় খবর দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ করে লোক বেরিয়ে এল। তারা আমার ভয়ানক মুখ দেখে বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারল। উদ্ভট উদ্বেজনায জিজ্ঞেস করল—কোথায় খুন?

আমি আঙুল তুলে সিঁড়িটা দেখিয়ে দিলাম। ওরা হৈ হৈ করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

এবার আমি কি করব ভাবতে লাগলাম। নাঃ, এখানে থাকা উচিত নয়। এখুনি পুলিশ আসবে। কে প্রথম দেখেছিল তাই নিয়ে খোঁজ-তল্লাশ হবে। আমি শুধু শুধু জড়িয়ে পড়ব। তার চেয়ে কেটে পড়াই ভাল।

এই ভেবে তাড়াতাড়ি পার্ক স্ট্রীট ক্রশ করে সামনের ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়লাম।

এর পরেই হলো আমার মতিভ্রম। বাড়ি চলে গেলেই হতো। তা নয়, কেবলই মনে হতে লাগল খুনটা নিয়ে শেষ পর্যন্ত কী হলো দেখলে হয়।

এই ভেবে আবার রাস্তা পার হতে এগোচ্ছি—মনে হলো এটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। কারণ আমাকে দেখলেই কেউ না কেউ চিনে ফেলবেই। আর তখন জেরার মুখে পড়তে হবে—কখন কী অবস্থায় খুন হতে দেখেছিলাম, খুন করে কাউকে পালাতে দেখেছিলাম কি না! আমিই যে খুন করিনি তার প্রমাণ কী?

তবু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কী হলো জানার জন্যে এমনই কৌতূহল যে আমি আবার রাস্তা পার না হয়ে পারলাম না। তবে হঠাৎ আমার মাংকি-ক্যাপটার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। আমি ব্যাগ থেকে টুপিটা বের করে মাথা, মুখ, গলা ঢেকে নিলাম। চোখ দুটো শুধু বেরিয়ে রইল।

সিঁড়ির মুখে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। কিন্তু আশ্চর্য—ডেডবডিটা কোথাও নেই, খুনীকে ধরা তো দূরের কথা। পুলিশও আসেনি। অথচ লোকগুলো মারমুখো। কাউকে যেন খুঁজছে।

একটু কান খাড়া করে থাকতেই শুনলাম একজন আর একজনকে বলছে—কোথায় খুন? সব মিথ্যে।

আমি অবাক হলাম। কেউ খুন হয়নি? কিন্তু আমি যে দেখলাম একজন সিঁড়িতে পা ছড়িয়ে দেওয়ালে মাথা গুঁজে পড়ে রয়েছে!

তারপরেই যে কথাগুলো কানে এল তা শুনে রক্ত হিম হয়ে গেল। সবাই উত্তেজিত হয়ে বলছে—সব মিথ্যে। সেই ধান্নাবাজ ছোকরাটাকে একবার পেলে হয়।

আমি তখন বেপরোয়া হয়ে একজন বুড়ো গোছের লোককে জিজ্ঞেস করলাম—কী ব্যাপার মশাই?

সে বললে—একটা ছোকরা হঠাৎ ওপর থেকে নেমে এসে রটিয়ে দিল—সিঁড়িতে একজন খুন হয়েছে। শুনে সবাই ছুটল। কিন্তু কোথাও কিছু নেই।

মনে মনে ভাবলাম তাহলে তো কেউ খুন হয়নি। তাহলে কি দেখলাম?

কিন্তু তা নিয়ে তখন মাথা ঘামাবার আর সময় ছিল না। উত্তেজিত এক দল লোক কেবলই চোঁচাচ্ছে—কোথায় সেই ধান্নাবাজটা? ধরো তাকে। নিশ্চয় বেশিদূর পালাতে পারেনি।

আর একজন বললে—ধরতে তো লোক ছুটেছে। কিন্তু চিনবে কি করে?

—খুব চেনা যাবে। একজন উৎসাহী মস্তান চোঁচিয়ে উঠল।—আমি দেখেছি তার কপালে মস্ত একটা আঁচিল আছে।

সর্বনাশ! তাড়াতাড়ি মাংকি-ক্যাপটা ভালো করে টেনে সরে এলাম। পালাতে হবে।

কিন্তু পালাব কোথায়? গলির মুখ থেকে ফুটপাথ পর্যন্ত ভিড়। তারা বলছে—ধান্না দেবার কারণ কি? নিশ্চয় কোনো বদ মতলব আছে। পাকড়াও। কিন্তু কোন দিকে গেল?—ঐ দিকে—ঐ দিকে।

আমার হাত-পায়ের তখন প্যারালিসিসের রুগীর মতো অবস্থা। এখনও যে একেবারে ওদের মধ্যে থেকেও ধরা পড়িনি তা শুধু এই মাংকি-ক্যাপটার জন্যে।

কিন্তু লোকগুলো যেভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে যেন আমাকেই সন্দেহ করছে। মাংকি-ক্যাপটা যদি একবার তুলে নেয়, তাহলেই গেছি।

এই শীতেও সোয়েটার ভিজিয়ে ঘামছি। কি করে পালাব? চারিদিকে ক্ষিপ্ত লোক।

আমার চোখ-মুখের যা অবস্থা—আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম কেউ ভালো করে নজর করলেই ধরে ফেলবে আমিই সেই।

হঠাৎ দেখলাম কয়েকজন লোক আমার দিকেই আসছে। কি করব—কোথা দিয়ে—কেমন করে পালাব ভাবছি এমনি সময়ে কারেন্ট এসে গেল। আমি তাড়াতাড়ি লিফটের কাছে গিয়ে দাঁড়লাম। একটু পরেই লিফট চালু হলো। আমি লিফটে উঠে পড়লাম। আমার সঙ্গে এবার উঠল আরও কয়েকজন ভদ্রলোক। সোজা চলে গেলাম ছ'তলায় পিসেমশাইয়ের নিশ্চিত হেপাজতে।

ঘটনাটা এখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল। তা যে হয়নি সে শুধু আমার কপালদোষে।

সাত দিন কেটে গেছে। এই সাত দিন ধরে শুধু একটা কথাই মনে হয়েছে - সে দিন অন্ধকার সিঁড়িতে যা দেখেছিলাম তা সবই কি ভুল? সেই যে সাহেব যার কপাল পর্যন্ত ঢাকা টুপি, হিংস্র ভয়ানক চোখ—সেই যে ঘাড়-কাৎ-করে-পড়ে-থাকা মৃতদেহ—সব ভুল?

শেষ পর্যন্ত আবার সেই সর্বনেশে কৌতুহল ঘাড়ে চেপে বসল। ঠিক করলাম আবার একদিন ঐ সিঁড়ি দিয়ে উঠব। দেখি তেমন কিছু চোখে পড়ে কিনা।

যেমনি ভাবা তেমনি কাজ।

আবার একদিন সেই সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়লাম। আজ লোডশেডিং নয়। চারিদিকে আলোয় আলো। লিফটও চলছে। কিন্তু আমি সিঁড়ি দিয়েই উঠতে লাগলাম।

সিঁড়ি আজও নির্জন। লিফট থাকতে কে আর কষ্ট করে সিঁড়ি ভাঙে! শুধু আমিই একা উঠছি। সিঁড়ির প্রতিটি বাঁকে আলো।

একতলা-দোতলা-তিনতলা করে উঠতে লাগলাম। পাঁচতলার কাছে যেতেই থমকে দাঁড়লাম। কি করে, কেমন করে যেন মনে হলো এই সেই জায়গাটা। ভালো করে বোঝার জন্যে দেওয়ালটার দিকে এগোচ্ছি আর ঠিক তখনই সব আলো নিভে গেল।

আমি নিশ্চিত জানি এটা লোডশেডিং ছাড়া কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়, কিন্তু তবু কেন যেন সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এক মুহূর্তে মনে হলো আমি অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে। আর ঠিক তখনই একটা কনকনে হাওয়া বন্ধ সিঁড়িতে আর্তনাদ করে আছড়ে পড়ল। তারপরেই



একটা বরফের মতো কঠিন ঠাণ্ডা হাত যেন আমার মুখটা চেপে ধরবার চেষ্টা করল। আমি চিৎকার করতে গেলাম, কিন্তু পারলাম না।

তারপর কি করে যে নিচে নেমে এসেছিলাম বলতে পারব না।

বাইরে তখন শেষ-পৌষের মিষ্টি রোদ ঝলমল করছে।

পরে পিসেমশাইয়ের কাছে শুনেছিলাম, আমি একাই নই—ঐ দৃশ্যটা আরও দু' চারজন দেখেছে। তবে একটি বিশেষ দিনে, বিশেষ সময়ে। আমার দুর্ভাগ্য সেই বিশেষ দিন আর বিশেষ সময়েই আমি সেদিন অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলাম। কিন্তু পরের একদিনকার ঘটনাটা—ঐ যে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া, বরফের মতো ঠাণ্ডা হাত...ব্যাপার কী! না, বুদ্ধিতে সব কিছুই ব্যাখ্যা চলে না।

---

# ভয় পেয়েছিলাম

বহুদিন পর নানা তীর্থস্থান ঘুরে শেষে আবার কী হলো মৃগেন্দ্রনারায়ণ ফিরে এলেন নিজের দেশের জঙ্গলমহলের পরিত্যক্ত বাড়িতে।

ফেরার ইচ্ছে ছিল না। জীবনে যে কয়েকটি নৃশংস কাজ ধীরে-সুস্থে পূর্ণজ্ঞানে করেছেন তারই প্রায়শ্চিত্তের জন্যে—আর নিশ্চয় পুলিশের ভয়েও তিনি নিজের দেশ, রাজপ্রাসাদতুল্য বাড়িঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। প্রায় ত্রিশ বছর বাইরে বাইরে ঘুরে আবার কি এক অদৃশ্য টানে তিনি স্বস্থানে ফিরে এলেন। না ফিরলেই বোধ হয় ভালো হতো।

যাই হোক এই তিরিশ বছরে তাঁর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এক মুখ দাড়ি, সন্ন্যাসীর মতো জটা, মসৃণ তেল-চুকচুকে ত্বকের জায়গায় খস্খসে চামড়া, পরনে গেরুয়া আলখাল্লা। তিনি তাঁর বিরাট মহলে ঢুকে একবার চারিদিকে তাকালেন। সব খাঁ খাঁ করছে। অবশ্য এ শূন্যতা নতুন নয়।

বাড়ি ফিরে এসে কোমরে বাঁধা চাবি দিয়ে অনেক কষ্টে মর্চেরা তাল খুলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। জানলাগুলো বন্ধ। ভ্যাপসা গন্ধ। একটা বেড়াল ঘরে আটকা পড়ে মরে পচে গিয়েছিল। তার কিছু লোম আর শিরদাঁড়াটা পড়েছিল, মৃগেন্দ্র বাঁ হাতে করে সেটা তুলে নিয়ে চোখের কাছে এনে দেখলেন। দেখে যেন খুশি হলেন। তারপর সেটা জানলা খুলে বাইরে ফেলে দিলেন।

ঘরের একপাশে বিরাট একটা আয়না। মৃগেন্দ্র আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। নিজের চেহারা দেখে নিজেই আঁৎকে উঠলেন। বোধহয় ভাবলেন—কী ছিলেন—আর কী হয়েছেন!

তারপরেই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ভাবলেন—যা হয়েছে তা ভালোই হয়েছে। কেউ আর চট করে চিনতে পারবে না। যদি বা কেউ সন্দেহ করে তাহলেও তারা বুঝবে সেই নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণ মৃগেন্দ্র আর নেই। তার বদলে এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ফিরে এসেছে।

তিনি বড়ো একটা বাড়ি থেকে বেরোন না। সারা দিন মহলের শূন্য ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ান। তাঁর মনে পড়ে কত সুখের দিনের কথা—সেই সঙ্গে কত দুঃখের দিনের স্মৃতি। ভাবতে ভাবতে তাঁর দু'চোখে কখনও জল ভরে ওঠে, কখনও আগুন জ্বলে ওঠে।

এখানে ফিরে এসে এক মাসও কাটল না, মৃগেন্দ্রনারায়ণ ছুটফুট করতে লাগলেন। এই শূন্য বাড়িটার মধ্যে মৃত আত্মারা যেন তাঁকে কেবলই ধিক্কার দিয়ে বলে—“এরই মধ্যে প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেল? সব ভুলে আজ তুমি সাধু হয়েছ? ছিঃ!”

মৃগেন্দ্র তাঁর হাত দুটোর দিকে একবার তাকালেন। তাই তো! হাত দুটো কি ঠুঁটো হয়ে গেল?

তারপর থেকেই আবার তাঁর খুনের নেশা জেগে উঠল। হিসেব করে দেখলেন পাঁচটা খুন করেছেন। এখনও অন্তত একটা বাকি। তা হলেই পুরোপুরি প্রতিশোধ নেওয়া হয়।

কিন্তু যাকে-তাকে খুন করলে তো হবে না। সাহেব হওয়া চাই। অথচ সাহেব মেলা ভার। দেশ স্বাধীন হবার পর সাদা চামড়ার দল তল্লিতল্লা গুটিয়ে পালিয়েছে সাগরপারে।

তবে একেবারেই কি দেশ সাহেবশূন্য হয়ে গেছে? না, তা হয়নি। দু’-একটা নিশ্চয়ই আছে। খুঁজে বার করতে হবে। মৃগেন্দ্র সেই আশায় পথ চেয়ে রইলেন।

সুযোগ একদিন মিলেও গেল।

সেদিন মৃগেন্দ্র বেরিয়েছিলেন চাল-ডাল কিনতে। ইচ্ছে করেই দুপুরের দিকে বেরিয়েছিলেন যাতে রাস্তায় লোকজন কম থাকে। শটকাট করে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখলেন একটি উনিশ-কুড়ি বছরের ফর্সা ধবধবে মেয়ে—ছেলেদের মতো চুল কাটা, কটা চুল, পরনে ফুলপ্যান্ট, গায়ে শাট—একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে বসে ছবি আঁকছে।

এই তো একটা ক্ষুদ্রে মেম! মৃগেন্দ্রের দু’ চোখ ঝিকিয়ে উঠল। তিনি খুব সম্ভবপণে মেয়েটির কাছে এসে দাঁড়ালেন। মেয়েটি তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাল। মৃগেন্দ্র দেখলেন মেয়েটির কটা চোখে এতটুকু ভয় নেই। কেমন অবাক হয়ে দেখছে।

—তুমি যোগী? মেয়েটি ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে সশ্রদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ, মেমসাহেব, আমি যোগী আছি।

মেয়েটি তখনই উঠে দাঁড়িয়ে মৃগেন্দ্রকে অভিবাদন করল।

—তুমি এখানে কি করছ?

—আমি আর্টিস্ট। জঙ্গলের ছবি আঁকছি।

—কই দেখি।

বলেই মৃগেন্দ্র ধপ্ করে মেয়েটির পাশে বসে পড়লেন। তারি সুন্দর

সেন্টের গন্ধ মেয়েটির গায়ে। একবার ভাবলেন, এখুনি গলাটা টিপে ধরেন। অতিকষ্টে লোভ সামলালেন। না—না খুন-খারাপির কাজ এরকম খোলামেলা জায়গায় করা ঠিক হবে না। তিনি অর্ধেক-শেষ হওয়া ছবিটা হাতে তুলে নিলেন।

—বাঃ! চমৎকার হচ্ছে।

প্রশংসা শুনে মেয়েটির দু' চোখ চক্‌চক্‌ করে উঠল।

—আপনার একটা ছবি আঁকতে দেবেন?

—আমার ছবি! মৃগেন্দ্র হা-হা করে হেসে উঠলেন।

—হ্যাঁ, আমার অনেক দিনের ইচ্ছে একজন ইন্ডিয়ান যোগীর ছবি আঁকি।

—বেশ এঁকো।

—তা হলে দয়া করে বসুন। এক ঘণ্টার মধ্যে হয়ে যাবে।

মৃগেন্দ্র বললেন—এখন পারব না। বাজার যাচ্ছি। তুমি বরঞ্চ কাল আমার বাড়িতে এসো দুপুর দুটোর সময়ে। ঐ যে আমার বাড়ি—‘জঙ্গলমহল’।

মেম রাজি হলো। মৃগেন্দ্র হেসে বললেন—আসবে কিন্তু। ঠিক দুটোয়।

—নিশ্চয় যাব।

—আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব।

ঘটনাটা বলছিলেন Jungle View Hotel-এর মালিক সুন্দর শীল। বয়েস ষাট-পঁয়ষট্টি। গাঁট্রাগোড়ো চেহারা। মাথার তিন দিক ঘিরে টাক। খুব গল্প করতে পারেন।

আমি এসেছিলাম জঙ্গলের মাপজোখ করার কাজে। শুনলাম জঙ্গল এখন আর তেমন নেই। থাকবে আর কি করে? গাছ কেটে কেটে সাফ করে দিচ্ছে।

এখানে এসে যে এমন একটা হোটেল পাব ভাবতে পারিনি। বিরাট বাড়ি। বড়ো বড়ো ঘর। বোঝাই যায় সাবেক কালের বাড়ি। সারিয়ে-সুরিয়ে ভাড়া দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এত বড়ো হোটেল। কিন্তু প্রায় বেশির ভাগ ঘরই ফাঁকা। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে চার-পাঁচ জন। আমি সরকারি কাজে এসেছি জেনে একটু বিশেষ খাতির করে যে ঘরটি দেওয়া হয়েছে সেটি একেবারে একটেরে—আলাদা। অ্যাটাচড বাথ। দক্ষিণ খোলা। পশ্চিমের জানলা খুললেই দেখা যায় সেই বিরাট জঙ্গলটা। রাতের অন্ধকারে মনে হয় যেন কোনো অজানা রহস্য বুকে করে রুদ্ধ নিশ্বাসে কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

ঘরটায় যে-সব আসবাবপত্র তার কোনোটাই হালফ্যাশানের নয়। দেখলেই বোঝা যায় সাহেবী আমলের—এমনকি বিরাট আয়নাটা পর্যন্ত।

হোটেলের মালিক সুন্দরবাবু বারেবারেই খোঁজ নিচ্ছিলেন আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা।

—অসুবিধে আর কি! আমি বলি, সন্ধ্যার পর থেকে একেবারে চুপচাপ একা। গল্প করার লোক নেই।

সুন্দরবাবু বিনয়ে গলে গিয়ে বলেছিলেন—আপনাদের মতো মানুষের সঙ্গে গল্প করা কি সবার সাধ্যে কুলোয়?

যাই হোক, সারাদিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বিভিন্ন গাছের নাম আর সংখ্যা ডায়েরিতে লিখে সন্ধ্যার ঢের আগেই হোটেলে ফিরে এসে নিজের ঘরটিতে ঢুকলাম। এখন হাতে কোনো কাজ নেই। তাই চুপচাপ ঘরটা দেখি। বড়ো বড়ো জানলা। কাচের শার্শি, নকশা কাটা মেঝে, উঁচু শিলিং। না জানি এ ঘরে কোন সাহেব বা কোন জমিদার বিলাসে ডুবে থাকত! এই যে বিরাট আয়নাটা—এটাই কি কম পুরনো? এইসব ভাবতে ভাবতে রাত নটা বেজে যায়। হোটেলের ঠাকুরটি গরম গরম মাংস-ভাত দিয়ে গেল। সাড়ে নটার মধ্যেই খাওয়া শেষ।

এরই মধ্যে চারিদিক থমথম করছে। জন-মানুষের সাড়া নেই। শুধু মাঝে মাঝে জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে কি একটা পাখির অদ্ভুত ডাক। শুনলে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়।

দশটা বাজতেই আমি জানলা-দরজা বন্ধ করে মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়লাম। ভাবলাম—যা নির্জন জায়গা—মানে মানে কটা দিন কাটলে বাঁচি।

সবে পাশ ফিরে শুয়েছি, দরজায় ঠুক ঠুক শব্দ।

চমকে উঠলাম। জায়গাটা যেরকম তাতে গভীর রাতে যে কোনো ঘটনাই ঘটতে পারে। ভূতের আবির্ভাবও অসম্ভব নয়। ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

আবার কড়া নাড়ার শব্দ।

—কে?

—স্যার, শুয়ে পড়েছেন নাকি?

—না। যাই। বলে চটিতে পা গলিয়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম।

—এলাম একটু গল্প করতে।

—আসুন ভালোই হলো।

—আপনি তো দেখছি মশারি টাঙিয়ে—

—কি করব? মুখটি বুজে—তার ওপর যা মশা—

সুন্দরবাবু আমার বিছানায় পা তুলে বসে খোশগল্প শুরু করলেন। প্রথমে আমার ঘর-বাড়ির খোঁজখবর নিলেন—তারপর বমি করার মতো হড়হড় করে নিজের কীর্তি-কলাপের একঘেয়ে ফিরিস্তি দিয়ে গেলেন; শেষে আমি যখন এই বাড়িটার কথা জানতে চাইলাম তখনই শুরু হলো আসল গল্প।

তিনি যখন জাঁকিয়ে বসে এ বাড়ির কথা শুরু করতে যাচ্ছেন, আমি তখন তাড়াতাড়ি বললাম—ভূতের ব্যাপার-ট্যাপার নয় তো?

উনি হ-হা করে হেসে উঠলেন।

—আপনার বুমি ভূতের ভয় খুব?

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম—তা নয়, এ জায়গাটাই এমন যে গা হুম্‌হুম করে।

উনি অভয় দিয়ে বললেন—না, মেটেই ভূতের গল্প নয়। তা ছাড়া এখানে কেউ কোনোদিন ও জিনিসটি দেখেনি।

এই বলে উনি এ বাড়ির ইতিহাস শুরু করলেন। বাড়িটায় শেষ পর্যন্ত যিনি ছিলেন তিনি হলেন এক পাগলা জমিদার। পাগল অবশ্য হয়ে গিয়েছিলেন যেদিন একদল মাতাল ইংরেজ হঠাৎ তাঁর বাড়ি আক্রমণ করে বাড়ির ছ'জনকে গুলি করে মেরে টাকাপয়সা লুট করে পালিয়েছিল। তারপর থেকেই শুরু হয় প্রতিহিংসা নেওয়া। একটির পর একটি করে পাঁচজন সাহেব মেরে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন। বহুকাল পর সন্ন্যাসী হয়ে ফেরেন। ভেবেছিলেন মনের পরিবর্তন হয়েছে। আর রক্তপাতে রুচি নেই। কিন্তু—

বেলা দুটোয় মেমটির আসবার কথা ছবি আঁকতে। মৃগেন্দ্রনারায়ণ তাঁর ঘরে অপেক্ষা করছেন। কি ভাবে খুন করবেন সে পরিকল্পনাও হয়ে গেছে। কোনো হাঙ্গামা নয়, শুধু একটুকরো কাতার দড়িতেই নিঃশব্দে কাজ শেষ হয়ে যাবে। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত হবে না।

তারপর অবশ্য আর একটা কাজ থাকবে—লাশ সরানো। সেটা কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। বাড়ির পিছনে অটেল পোড়ো জমি। কোদালও আছে একটা। এ বয়েসেও গায়ে যথেষ্ট শক্তি। সন্ধ্যার অন্ধকারে মাটি কুপিয়ে মেয়েটাকে পুঁতে ফেলবেন। ব্যাস্! কারও সাধ্য নেই ধরে।

দেওয়ালে গির্জের মতো সাবেকি ঘড়িতে দেড়টা বাজল। মৃগেন্দ্রনারায়ণ

ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত। খুন করার জন্যে আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারছেন না। হাতে কাতার দড়ির ফাঁস তৈরি। ঘরে ঢুকলেই—

পৌনে দুটো। রাস্তার দিকের জানলাটা একটু ফাঁক করে দেখতে লাগলেন।

কই? এখনও তো আসছে না? আসবে তো শেষ পর্যন্ত?

ওঁর খুব জলতেষ্টা পেল। চৌকির নিচ থেকে কুঁজো টেনে নিয়ে ঢকঢক করে এক গেলাস জল খেয়ে নিলেন। তাঁর কাঁচা-পাকা দাড়ি বেয়ে খানিকটা জল গড়িয়ে পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখটা মুছলেন। ঘড়িতে টং টং করে দুটো বাজল। আর ঠিক তখনই দরজায় মৃদু কড়া নাড়ার শব্দ।

মৃগেন্দ্রনারায়ণের দু' চোখ হিংস্র বাঘের চোখের মতো জ্বলজ্বল করে উঠল।

—যাক, এসেছে তা হলে। মেয়েটা তো খুব পাণ্ডুচুয়াল। হাজার হোক সাহেব-বাচ্চা তো!

মৃগেন্দ্রনারায়ণ সন্তুর্পণে দরজা খুলতে এগিয়ে গেলেন।

ঘটনাটা শেষ করে সুন্দর শীলমশাই জোরে কয়েকবার হুকোয় টান দিলেন।

—এই হলো এ বাড়ির এক সময়ের মালিক, প্রাক্তন জমিদার—পাগল মৃগেন্দ্রনারায়ণের কাহিনী।

অনেকক্ষণ চুপ করে আছি দেখে শীলমশাই নিস্তব্ধতা ভাঙলেন।—কিছু বলছেন না যে?

—কি আর বলব? লোকটা ধরা পড়ল?

—সেও একটা ব্যাপার। পুলিশ মোটেই সন্দেহ করেনি মৃগেন্দ্রনারায়ণকে। কিন্তু মেয়েটির জুতোর ছাপ দেখে বুঝেছিল যে কোনো কারণেই হোক মেয়েটি এই বাড়িতে ঢুকেছিল। পুলিশও ঢুকল। দেখল সব ঘরই বন্ধ—ব্যবহার করা হয় না। শুধু একটি ঘরে বিছানা পাতা। পুলিশ তালা ভেঙে সেই ঘরে ঢুকল। হত্যার কোনো চিহ্নই নেই। হতাশ হয়ে পুলিশ ফিরে আসছিল—ইন্স্পেক্টর নিশ্বাস টেনে বললেন—ভারি সুন্দর সেন্টের গন্ধ তো ঘরে! সাধুবাবা সেন্টেটেন্ট মাখতেন নাকি?

তখনই খটকা বাধল। মৃত মেয়ের মাকে এই ঘরে আনা হলো। তিনি বললেন—হ্যাঁ, এই সেন্টটাই আমার মেয়ে মাখত।

তখনই পুলিশ বুঝল, মেয়েটি এই ঘরে এসেছিল। তারপর আর সে ফিরে যায়নি। কিন্তু—সাধুবাবা কোথায়?

তাকে আর খুঁজতে হলো না। তিনি তখন থানায় গিয়ে নিজেই ধরা দিয়েছেন।

—ধরা দিয়েছেন? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—হ্যাঁ, বড্ড দেরিতে মৃগেন্দ্র জানতে পেরেছিলেন মেয়েটি মোটেই ইংরেজ নয়, একেবারেই ইন্ডিয়ান। পাঞ্জাবী মেয়ে। এখানকার এক অফিসারের কন্যা। সেই অনুতাপে ধরা দিলেন মৃগেন্দ্রনারায়ণ। তারপর সব ঘটনা বলে গেলেন—যাকে বলে স্বীকারোক্তি।

এই পর্যন্ত বলে সুন্দর শীল থামলেন। আমিও চুপ করে রইলাম।

একটু পরে সুন্দরবাবু হেসে বললেন—ঘটনাটা বোধ হয় আপনার মনঃপূত হলো না। কি করা যাবে—সত্যি ঘটনা তো তাই রঙচঙ নেই। একটু থেমে বললেন—আর যাই হোক, এর মধ্যে ভূত-প্রেত অলৌকিকতার বালাই নেই। তাই না?

—তা বটে। কিন্তু—কিন্তু ঘটনাটা অবিশ্বাস্য।

—কেন? সুন্দরবাবুর ভ্রদুটো লাফিয়ে উঠল।

—কেননা আপনি এমন অনেক কথা বললেন যা কারও জানার কথা নয়।

—যেমন?

—যেমন নিজের ঘরের মধ্যে যখন মৃগেন্দ্র মেয়েটির জন্যে অপেক্ষা করছে তখন তার মনের ভাব—জল খাওয়া—জানলা দিয়ে দেখা—এসব কি কেউ স্বচক্ষে দেখেছে?

—আরে মশাই, এসব তো মৃগেন্দ্র নিজেই পুলিশের কাছে বলেছেন। তার পর তো—বুঝতেই পারছেন—লোকমুখে মুখে ছড়িয়েছে।

আমি হেসে বললাম—ঘটনাটা যা শুনলাম সে তো বোধহয় ১৯৪৮-৪৯ সালের কথা। অর্থাৎ আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগের ব্যাপার। এত কাল ধরে যা জনশ্রুতি তাতে অনেক রঙ চড়েছে। কাজেই আমি বিশ্বাস করি না।

সুন্দর শীল একটু বিরক্ত হয়ে বললেন—তা আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন তাতে কিছু এসে যায় না।

এই বলে শীলমশাই হুকো হাতে উঠে পড়লেন।

ভদ্রতা করে ওঁকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। ওঁর রাগ ভাঙবার জন্যে হেসে বললাম—বাক, তবু ভূতের গল্প শোনাননি এর জন্যে ধন্যবাদ। সত্যি



কথা বলছি শীলমশাই, ভূতের গল্প শুনলে এ বাড়িতে একা রাত কাটাতে পারতাম না।

শীলমশাই উত্তর দিলেন না। চটির শব্দ করতে করতে নিচে নেমে গেলেন।

রাত গভীর। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। মাথার ওপর শুধু পুরনো ফ্যানটা একটা বিদ্রী়ী শব্দ করে ঘুরছে।

শীলবাবুর মুখে ঘটনাটা শুনে বিশ্বাস না করলেও অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারিনি। কেবলই সেই অচেনা না-দেখা মেয়েটির কাল্পনিক মুখ চোখের সামনে ভাসছিল। কিছুতেই মন থেকে ঘটনাটা দূর করতে পারছিলাম না।

আচ্ছা স্বাভাৱন! যত গাঁজাখুরি গল্প শুনে এ তো হলো ভালো!

মনে মনে গজগজ করতে করতে পাশ ফিরে শুলাম আর ঠিক তখনই দরজায় শব্দ হলো খুট-খুট। কেউ যেন খুব আস্তে কড়া নাড়ছে।

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। এত রাত্রে আবার কে এল? শীলমশাই নাকি?

না, আর শব্দ নেই। শোনার ভুল মনে করে শুতে যাচ্ছি—আবার সেই শব্দ খুট-খুট-খুট—

—কে?—একটা বিদ্রী়ী খ্যাস্থেসে স্বর গলা থেকে বেরিয়ে এল।

নিশ্চয় শীলমশাই নয়, তাহলে সাড়া দিতেন।

অগত্যা উঠতে হলো। দেওয়াল হাতড়ে সুইচ অন করলাম। ভোলটেজ ডাউন। কোনোৱকমে একটুখানি আলো জ্বলল। এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে। খিল খুললাম। কি একটা অজানা ভয়ে বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছে।

দরজাটা খুলে দিলাম। কেউ কোথাও নেই। শুধু অন্ধকারে ঢাকা সিঁড়িটা থম্‌থম্‌ করছে।

আমার সৰ্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। শব্দটা তো আমি নিজে কানে শুনেছি। একবার নয়, তিন তিন বার। তা হলে?

তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে ঘরে এসে ঢুকলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম—সেটের গন্ধ। সারা ঘরে সেটের গন্ধ ভুরভুর করছে। মনে হলো এই মুহূর্তে দরজা দিয়ে কেউ সেট মেখে ঘরে ঢুকেছে। ঢুকে এই ঘরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমি মশারির মধ্যে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কাঠ হয়ে বসে রইলাম।

বসেই রইলাম সকাল হওয়া পর্যন্ত যতক্ষণ সেন্টের গন্ধটা ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

চমক ভাঙল দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে। উঠে দরজা খুলে দিলাম।

দেখি হাসিমুখে শীলমশাই দাঁড়িয়ে।

—কি ব্যাপার! এত বেলা পর্যন্ত বিছানায়! ঘুম হয়েছিল তো?

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম—হ্যাঁ।

কিন্তু সেইদিনই আমি জঙ্গলমহল ছেড়ে ফিরে এসেছিলাম।

---

# নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে

সেবার পুজোর সময়ে পুরী যাব বলে অনেক আগেই ট্রেনের রিজার্ভেশান করে রেখেছিলাম। কিন্তু পরে হোটেল বুক করতে গিয়ে কোথাও জায়গা পেলাম না। মহা মুশকিল!

তবু বেহেতু টিকিট কাটা হয়ে গেছে তাই ‘জয় জগন্নাথ’ বলে হাওড়া থেকে জগন্নাথ এক্সপ্রেসে চেপে বসলাম। আশা—পুরীতে নেমে পাণ্ডাদের ধরে কোথাও-না-কোথাও একটা জায়গার ব্যবস্থা করে নিতে পারব।

পাণ্ডারা ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু সেসব জায়গা পছন্দ হলো না। আমি এখানে অন্তত এক মাস থাকব। জায়গাটা সমুদ্রের কাছে না হলেও চলবে। কিন্তু ফাঁকা হওয়া চাই। এর আগে অনেক বারই পুরী এসেছি। সমুদ্রের ধারে অনেক হোটেলেই থেকেছি। কাজেই সব সময়ে সমুদ্র না দেখলেও চলবে। চাই একটু নতুনত্ব।

তা পুরীর এক পাণ্ডা আমার জন্যে একটা বাসা ঠিক করে দিল। বাসাটা পুরী টাউন থেকে কানার্কের দিকে দু’ কিলোমিটার মতো দূরে।

জায়গাটা আমার বেশ পছন্দ হলো। যেরকমটি চেয়েছিলাম সেইরকম নিরিবিলা। সামনে দিয়ে কানার্ক যাবার কংক্রিটের রাস্তা। মাঝে মাঝে কাজুবাদামের গাছ। বেশ কিছু বাংলা প্যাটার্নের বাড়িও আছে।

আমার বাসাটিও একতলা। দুখানি ঘর। ছিমছাম। সঙ্গে একটি কাজের লোক। সকালে-বিকালে দু’ মাইল রাস্তা হেঁটে সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে আসি। হাতে থাকে ছড়ি আর টর্চ।

দিন সাতেকের মধ্যেই পাড়ার কয়েক জনের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। সকলেই বাঙালী। একজন শুধু ওড়িয়া। তিনিও ভালো বাংলা বলতে আর বুঝতে পারেন। ভদ্রলোকের নাম মহেশ্বর মহাপাত্র। আমি কলকাতা থেকে আসছি আর একজন রিটার্ড অধ্যাপক জেনে তিনি খুব খাতির করলেন। তাঁর বাড়িতেই রোজ সন্ধ্যাবেলা আড্ডা বসত। সকলেই বাঙালী প্রতিবেশী। সেখানে আমারও একটা চেয়ারের ব্যবস্থা হলো।

প্রতিদিনই নানারকমের আলোচনা হতো। মহাপাত্রমশাই-ই এখানকার পুরনো বাসিন্দা। বাঙালী প্রতিবেশী পেয়ে খুব খুশি। কিন্তু এমন এক-এক জন

উটকো লোক পাড়ায় এসে পড়ে, তাদের তিনি মোটেই সুনজরে দেখেন না। যেমন—

বলেই একটু থামতেন। বাকিটা শেষ করতেন অন্যরা।

ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা পিছনের দিকে ঠেলে কোনো একজন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে কেউ বলতেন—ওঁর কথা বলছেন তো? উনি তো একটা পাগল!

আর একজন বললেন—পাগল কেন হতে যাবে! আসলে সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ তো। তাই ওঁদের জীবনধারণ সঙ্গ্রে আমাদের মেলে না। সেইজন্যেই কারো সঙ্গ্রে মেশেন না।

অমনি আর একজন ফোঁস করে ওঠেন—সাধু না আরও কিছু! সাধুর বেশে নিশ্চয় কোনো চোর-ডাকাত। যে-কোনোদিন দেখবেন আমার-আপনার বাড়ি ডাকাতি হয়ে যেতে পারে।

ডাকাতির কথা শুনেই সবার মুখ চুন। কেননা ডাকাত পড়লে বাঁচবার কেউ নেই। এখানে কাছেপিঠে কখনো পুলিশ দেখা যায় না। ওঁদের কথাবার্তা শুনে যেটুকু বুঝলাম তা এই—মাস কয়েক হলো কাছেই একটা বাড়িতে একজন স্বামীজি গোছের লোক এসেছেন। যে বাড়িটি তিনি ভাড়া নিয়েছেন সেটা একটা পরিত্যক্ত বাড়ি। চারিদিকে ঘোপজঙ্গল। এত জায়গায় এত বাড়ি থাকতে ঐ বাড়িটাই কেন যে তাঁর পছন্দ হলো এটাই রহস্য। বাড়িটা আবার নিজের পয়সায় সারিয়ে-সুরিয়ে বাসযোগ্য করে নিয়েছেন। কোনো ভাড়াটে নিজের গ্যাঁটের পয়সা খরচা করে এমন করে সারায় নাকি?

রোজ ভোর আর সন্ধ্যাবেলায় কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে তিনি পূজো করেন। কি পূজো করেন কে জানে!

তিনি বড়ো একটা বাড়ি থেকে বেরোন না। সারা দিন একা একা কি করেন কেউ জানে না। যদিও বা এক-আধবার বেরোতে দেখা যায়—তা তিনি কারও দিকে ফিরে তাকান না। এমনি দান্তিক!

এ হেন একজন লোককে নিয়ে যে নানা কথা উঠবে তা তো স্বাভাবিক।

কয়েক দিন পর আরও কিছু রটনা কানে এল। অনেকেই নাকি ঐ পথ দিয়ে যেতে যেতে শুনেছেন দিনে দুপুরে বা রাত্তিরে স্বামীজি কারো সঙ্গ্রে ইংরিজিতে কথা বলছেন। কি কথা বলেন তার দু'-একটা শ্রোতাদের কণ্ঠস্থ। যেমন—

—No no don't go out.

—Don't open the window.

—No fear. I am here.

মজার ব্যাপার এই কথাগুলো তিনি একাই বলেন। কারও উত্তর শোনা যায় না।

এই থেকে অনেকের ধারণা হয়েছে লোকটা সত্যিই পাগল। কিংবা—অন্য কোনো ব্যাপার।

অন্য ব্যাপার আর কি হতে পারে যখন, যার সঙ্গে তিনি কথা বলছেন সে অদৃশ্য!

শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

—কি বলতে চাইছেন মহাপাত্রমশাই? আমি জিজ্ঞেস করি।

উনি উত্তেজিত হয়ে বলেন, কি বলতে চাই এখনো বুঝতে পারছেন না? উনি কোনো তাত্ত্বিক কিংবা ওঝা। বাড়িতে ভূত পুষে রেখে দিয়েছেন। দরকার বুঝলেই আমার-আপনার পিছনে ভূত লেলিয়ে দেবেন।

সবাই শুনে স্তম্ভিত। এতটা কেউই ভাবেননি।

আমি অবশ্য কিছু না বলে হাসলাম। ভূত কুকুর-বেড়াল কিনা যে ঘরে পুষে রাখবে!

যাই হোক, খুব কৌতূহল হলো। ঠিক করলাম একদিন স্বামীজির সঙ্গে দেখা করবই।

ঝোপের মধ্যে প্রায়-লুকনো পুরনো একতলা ছোট্ট বাড়িটা দেখেই মনে হলো, এ বাড়িতে যিনি শখ করে থাকতে পারেন তিনি আর যাই হোন সাধারণ মানুষ নন।

তখন বিকেল চারটে। এরই মধ্যে জায়গাটা যেন রহস্যময় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

দরজায় কড়া নাড়তেই স্বামীজি দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়ালেন।

লম্বা, ফর্সা চেহারা। শক্ত শরীর। বড়ো বড়ো সুন্দর চোখ। ন্যাড়া মাথা। গায়ে গেরুয়া ফতুয়া, পরনে গেরুয়া রঙে ছোবানো ধুতি লুঙ্গির মতো করে পরা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। পায়ে কাঠের খড়ম।

এক নজর ঘরটা দেখে নিলাম। দেওয়ালের কোলঙ্গায় পর্দার মতো লাল সালুর আড়ালে তাঁর ছোট্ট ইষ্ট দেবতা। সে দেবতা কে দূর থেকে তা বোঝা গেল না। সামনেই ঘণ্টা, শাঁখ। ওদিকের দেওয়ালের কোণে মস্ত একটা ঝকঝকে ত্রিশূল। দেখে ভয় হয়। ঐ ত্রিশূল দিয়ে স্বচ্ছন্দে মানুষ মারা যায়।

স্বামীজিকে বিনম্র নমস্কার করলাম। তিনিও গম্ভীরভাবে প্রতি-নমস্কার করলেন।  
আমায় দেখে এতটুকু অবাক হলেন না।

গুরুগম্ভীর স্বরে ‘আসুন’ বলে তিনি আমায় ঘরে নিয়ে এসে আসন পেতে বসতে দিলেন।

দেখলাম এ ঘরে তেমন কোনো আসবাবপত্র নেই শোবার চৌকিটি ছাড়া।

—তা হলে আপনিই শেষ পর্যন্ত আমার কাছে এলেন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আমাকে এর আগে দেখেছেন নাকি?

উনি একটু হাসলেন। বললেন, সবাইকেই দেখি, সবাইকেই চিনি। কে কি বলে তাও জানি। আপনার নাম তো অনিমেঘ চৌধুরী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কলকাতা থেকে আসছেন? রিটার্ড প্রফেসার?

আমি তো স্তম্ভিত।

উনি একটু হেসে বললেন, অবাক হবার কিছু নেই। আমি ঘর থেকে কম বেরোলেও মোটামুটি পাড়ার খবর রাখি।

একটু থেমে বললেন, আপনি জানতে এসেছেন সত্যিই এখানে ভূত আছে কিনা। তাই তো?

আমতা-আমতা করে বললাম, লোকে নানা কথা বলে। তাই—

—ভালোই করেছেন। আড়ালে গুজগুজ-ফুসফুস না করে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করাই উচিত। আপনার ভদ্রতা, আপনার সংসাহসের প্রশংসা করি। দাঁড়ান, আসছি।

বলে তিনি ভেতরে উঠে গেলেন।

একটু পরে একটা সাদা পাথরের গেলাসে বেলের সরবৎ নিয়ে এলেন।

—আমার এখানে চায়ের পাট নেই। সামান্য একটু—

বলে গেলাসটা আমার সামনে রাখলেন।

সরবৎ খাওয়া হলে তিনি বললেন, তাহলে আপনি আমার কথা সত্যিই শুনতে চান?

—যদি অনুগ্রহ করে বলেন, তাহলে কৌতূহল মেটে।

—অবশ্যই বলব। তবে একটা শর্ত—

—বলুন।

—যে কথা বলব তা এখানে কারো কাছে গল্প করবেন না। কথা দিন।

—দিলাম।

তারপর উনি শুরু করলেন ওঁর কথা। প্রথমেই বললেন, আমি বরাবরই যে সাধুজীবন যাপন করছি তা নয়। আমিও একদিন ঘোর সংসারী ছিলাম। তারপর শোকে-তাপে বিপর্যস্ত হয়ে সব ছেড়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

শুনে অবাক হবেন, তীর্থ দর্শনের চেয়ে দেশে যেখানে যত বড়ো বড়ো কবরস্থান আছে সেসব জায়গাতেই যেতে পছন্দ করতাম।

জিজ্ঞেস করলাম—কেন? আপনি কি ভূত-প্রেত নিয়ে গবেষণা করেন?

উত্তরে উনি হাসলেন একটু। বললেন—না। ভূত-প্রেতে আমার কোনো বিশ্বাসই ছিল না। আমি শুধু কবরের গায়ে লাগানো পাথরের ফলকের ওপর খোদা লেখাগুলো পড়তাম। কার কি নাম, কবে, কোথায় মারা গেছে ইত্যাদি। পড়তাম আর কল্পনা করতাম—কতজনকে কাঁদিয়ে এরা একদিন চোখ বুজেছিল। আবার, যারা সেদিন কাঁদেছিল তারাও হয়তো আজ আর কেউ নেই।

স্বামিজি আবার একটু থামলেন। তারপর বললেন, আসল কথা কি জানেন অনিমেম্বাবু? আমি নিজে শোকার্ত স্বামী, শোকার্ত পিতা। তাই অন্যের শোক অনুভব করতে পারতাম। তা সে চেনাই হোক আর অচেনাই হোক।

একটু থেমে বললেন, কলকাতায় গেলে আমার সবচেয়ে বেশি আকর্ষণের জায়গা ছিল পার্ক স্ট্রীটের পুরনো সিমেট্রিটা। ঐ পুরনো কবরখানাটা আপনি দেখেছেন?

—দেখেছি। বাইরে থেকে।

—বাইরে থেকে কিছু বোঝা যাবে না। ভেতরে যাবেন। পাঁচিল ঘেরা বিরাট জায়গা জুড়ে কত-না গাছ। বোধহয় আমগাছই বেশি। তারই ঠাণ্ডা ছায়ার নিচে নানারকমের মনুমেন্ট। তারই তলায় ঘুমিয়ে আছে কত মানবাত্মা। তারা ওখানেই শুয়ে আছে প্রায় দেড়শো বছর ধরে। অদ্ভুত জায়গা। যদি যান দেখবেন শান্তি পাবেন।

তা আমি সেখানে প্রায়ই যেতাম। আর ঘুরে ঘুরে পাথরের মনুমেন্টের গায়ে লেখাগুলো পড়ে মনে মনে সেই মৃত মানুষদের সঙ্গে আলাপ করে নিতাম। উঠে আসতে ইচ্ছে করত না। কিন্তু পাঁচটার পরই গেট বন্ধ হয়ে যায়। ওখানে তখন আর কারও থাকার অধিকার নেই। এখন অবশ্য মানুষের ভয়-ডর-বিবেকবোধ কমে যাচ্ছে। তাই নিষ্ঠুর, লোভী এক শ্রেণীর মানুষ রাতের অন্ধকারে পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকে কবরের ওপরের দামী দামী পাথরের ফলক ভেঙে নিয়ে যায়। প্রচুর টাকায় সেগুলো বিক্রি করে।

আমি খুব দ্রুত কথা বলছি, আপনার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না তো ?

—কিছুমাত্র না। আপনি বলে যান।

—এখানে প্রায়ই আসতে আসতে সিমেন্টের দারোয়ানের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছিল। লোকটি খুব ভালো। তবে মাঝে মাঝে ওর কাছে একজন অন্যদেশীয় লোক আসত। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া চেহারা। তার পরনে থাকত কালোরঙের কুর্তা আর ঢিলে পাঞ্জাবি। মাথায় পাগড়ী। চোখদুটো ছিল সাপের চোখের মতো হিংস্র। তাকে আমার মোটেই ভালো লাগত না। সেও যে আমায় পছন্দ করত না তা তার চাউনি দেখেই বুঝতে পারতাম। কিন্তু কেন লোকটা আমায় পছন্দ করত না তা আমি জানি না।

একদিন কবরখানায় ঘুরতে ঘুরতে একটা মনুমেন্টের কাছে এসে তার গায়ে লেখাটা পড়লাম।

১৮০১ সালে মেরিয়া লুইসা নামে কোনো একটি চোদ্দ বছরের মেয়ে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল। তার বাবা এখানে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন।

মাত্র চোদ্দ বছরের মেয়ে! আহা!

সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের মেয়েটার কথা মনে পড়ল। সেও চোদ্দ বছর বয়েসে মারা গিয়েছিল। আমার মনে হলো আমার মেয়েই যেন এখানে শান্তিতে শুয়ে আছে।

তারপর থেকে কলকাতায় এলেই আমি মেরিয়া লুইসার কবরের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতাম।

স্বমীজি এবার উঠে ঘরে আলো জ্বেলে দিলেন।

তারপর বলতে লাগলেন—একদিন বসে থাকতে থাকতে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সামান্য একটু শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম সুন্দরী একটি মেয়ে কবরের ফলকের আড়ালে দেখা দিয়েই মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কী ব্যাপার!

তখনই উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে খুঁজলাম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না।

অথচ—আমি তাকে পরিষ্কার দেখেছি। ফর্সা টকটকে রঙ, কাঁধ পর্যন্ত পশমের মতো নরম কটা চুল, পরনে স্কাট, বয়েস বছর চোদ্দ। মুখে করুণ হাসি।

কে এই মেয়ে? মেরিয়া লুইসা নয়তো? এককাল পরেও তার আত্মা কি নতুন দেহ ধারণ করেনি?



এ কী রহস্য!

স্বামীজি একটু থামলেন। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি নড়ে চড়ে বসলাম।

—তারপর থেকে যখনই আমি পার্ক স্ট্রীটের ঐ কবরখানায় আসি, ওখানেই আমি ব্যাকুল হয়ে বসে থাকি, যদি আর একটিবার তার দেখা পাই।

স্বামীজি আবার একটু থামলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, অনিমেষবাবু, আপনার শুনতে ইচ্ছে করছে তো?

বললাম—নিশ্চয়।

—একদিন অমনি বসে আছি, হঠাৎ পিছনে শুকনো পাতার ওপর খসখস শব্দ। কেউ যেন এদিকে আসছে।

চমকে ফিরে দেখলাম সেই ভিনদেশী ভয়ংকর লোকটা আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমায় কর্কশ গলায় হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল—তুমি এখানে রোজ কি করতে আস?

তার বলার ভঙ্গিতে আমারও রাগ হলো। বললাম—আমি কেন আসি তা তোমায় বলতে যাব কেন?

ও বলল, তোমার মতলব আমি বুঝি। তবে তুমি যা ভাবছ তা হতে দেব না। সাবধান!

বলে সে চলে গেল।

আমি তো অবাক। আমার আবার মতলব কি? আমি শুধু মেয়েটিকে দেখতে চাই।

ওখান থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে দারোয়ানকে সব কথা বলে জিজ্ঞেস করলাম—লোকটা কে হে?

দারোয়ান বলল, কিছুদিন ধরে আসছে। আমার সঙ্গে গল্প করে। ভেতরে ঘুরে বেড়ায়। ওঝার মতো ভূত-প্রেত নামায়, বশ করে।—এইসব তো বলে। আমার বিশ্বাস হয় না। তবে লোকটাকে আমারও ভালো লাগে না।

—তা হলে লোকটাকে ঢুকতে দাও কেন?

দারোয়ান খৈনী টিপতে টিপতে বলল, কি করব? যে কেউই তো ঢুকতে পারে। তবে পাঁচটা পর্যন্ত।

তারপর আর কয়েক দিন এসে কলকাতার বাইরে চলে যাই। অনেক দিন আর আসা হয়নি।

এই পর্যন্ত বলে তিনি থামলেন। বললেন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমার নিত্যকর্মটি সেরে নিই।

স্বামীজি উঠে গেলেন। তারপর প্রায় পনেরো মিনিট ধরে শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়ে পূজো করে ফিরে এসে আবার বলতে শুরু করলেন।

তিনি এরপর যা বলে গেলেন তা এইরকম—

প্রায় বছরখানেক পর স্বামীজি আবার একদিন সেই সমাধিক্ষেত্রে এলেন। শীতকাল।

বেলা তখন প্রায় দুটো। রোদের তেমন তেজ নেই। দারোয়ান সে সময়ে ছিল না। হয়তো বিড়ি-টিড়ি কিনতে গিয়েছিল।

স্বামীজি তাড়াতাড়ি মেরিয়া লুইসার সমাধির কাছে এগিয়ে গেলেন। লুইসাকে দেখার জন্যে তিনি ব্যাকুল। কিন্তু যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষুস্থির! সমাধিটা ভেঙে তছনছ। দামী পাথরের ফলক উধাও।

তিনি তখনই ছুটে এলেন দারোয়ানের কাছে। তখন দারোয়ান ফিরে এসেছে। তাকে জিজ্ঞেস করে স্বামীজি জানলেন—কয়েকদিন আগে রাত্রে চোর এসে সমাধি ভেঙে পাথর নিয়ে চলে গেছে।

স্বামীজি বিমর্ষমুখে আবার সেই ভাঙা সমাধির কাছে এসে বসলেন।

কতক্ষণ বসে রইলেন। তারপর ক্রমে সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ল। একে শীতকালের বেলা, তার ওপর গাছে ঢাকা সমাধিক্ষেত্র। দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে এল। তিনি উঠব-উঠব করছেন, হঠাৎ দেখলেন সেই মেয়েটি একটা গাছের আড়াল থেকে চোখ মুছতে মুছতে তাঁর দিকে আসছে। অল্প ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে কাউকে যেমন আবছা দেখা যায়, একেও তেমনি দেখা যাচ্ছিল।

—লুইসা!

মেয়েটি খুব নিচু গলায় ইংরিজিতে অল্প কয়েকটি কথা বলল।

—থাকবার জায়গা ভেঙে দিয়েছে।

—ঘুরে বেড়াচ্ছি।

—একটা শয়তান আমার পিছনে লেগেছে।

—ভয় পাচ্ছি...

স্বামীজি স্পষ্ট তার কথা শুনে অবাক। একটু সামলে নিয়ে বললেন, আমি ছিলাম না...আজই এসেছি...কালই তোমার জায়গা নতুন করে গাঁথে দেবার ব্যবস্থা করব।

এমনি সময়ে দারোয়ান হাঁকল—বাবুজি! পাঁচটা বাজল।

—হ্যাঁ, যাই। স্বামীজি চৌচিয়ে সাড়া দিলেন।

—শোনো লুইসা, ভয় পেও না। আমি কালই ব্যবস্থা করব।

উত্তরে মেয়েটি বোধহয় নিশ্চিত হতে পারল না। দুবার মাথা নেড়ে যেন বোঝাতে চাইল—এখানে আর থাকতে পারবে না। তারপর মিলিয়ে গেল।

সিমেট্রি থেকে চিন্তিত মনে বেরিয়ে এলেন স্বামীজি। হঠাৎ একটা কনকনে বাতাস মুহূর্তের জন্যে তাঁকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। তিনি অবাক হলেন। যদিও এটা পুরোদস্তুর শীতকাল তবু মুহূর্তের জন্যে এমন ঠাণ্ডা বাতাস বইল কেন?

তিনি হাঁটতে লাগলেন পার্ক স্ট্রীট ধরে। পার্ক স্ট্রীট থেকে ঢুকলেন রডন স্ট্রীটে।

জায়গাটা খুবই নির্জন। স্বামীজি হনহন করে হাঁটছেন তাঁর বাসার দিকে। এরই মধ্যে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। হঠাৎ মনে হলো কেউ যেন তাঁর পিছন পিছন আসছে। তিনি তখনই ঘুরে দাঁড়ালেন।

না, কেউ নেই।

কেন কে জানে তিনি একটু সাবধান হলেন।

এরকম হলো আরও দু'বার। তিনি স্থির বুঝলেন, কেউ তাঁর পিছু নিয়েছে। কিন্তু তাঁর মতো নিঃস্ব মানুষ—যাঁর টাকাপয়সা কিছুই নেই, তাঁর পিছু নেবার কারণ কি?

আবার সেই পায়ের শব্দ—এবার বেশ স্পষ্ট। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘাড় ঘোরালেন। দেখলেন বেশ দূরে একটা লম্বা মতো লোক। হ্যাঁ, কবরখানার সেই লোকটাই সতর্কভাবে তাঁকে অনুসরণ করছে।

কিন্তু...সে তো বেশ দূরে রয়েছে। খুব কাছে পরপর তিন বার—সেটা তবে কার পায়ের শব্দ?

তিনি আর ভাবতে পারলেন না। তাঁর মতো মানুষেরও কিরকম ভয় করতে লাগল। তিনি আরও জোরে হাঁটতে লাগলেন যাতে তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছতে পারেন।

এক সময়ে তিনি বাড়ি এসে পৌঁছলেন। তাড়াতাড়ি তালা খুলে ভেতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলেন। আলো জ্বাললেন। জানলাগুলো খোলা ছিল, চটপট বন্ধ করে দিলেন।

তারপর রাত ন'টার পর সামান্য কিছু খেয়ে যখন মশারি টাঙিয়ে শুতে যাবেন, দেখলেন মশারির বাইরে ছায়া-ছায়া মূর্তি নিয়ে মেয়েটি দাঁড়িয়ে।

স্বামীজি চমকে উঠে বসলেন।

আরে সর্বনাশ! ও কি করে এখানে এল? তা হলে কবরখানা থেকে

বেরিয়ে সেই যে কয়েকবার হালকা পায়ের শব্দ পাওয়া গিয়েছিল সেটা এরই।

—তুমি এখানে?

—তোমার সঙ্গে সঙ্গেই তো আসছি।

—কেন?

—বাঃ রে! আমি থাকব কোথায়? ওখানে চোরে আমার ঘর ভেঙেছে, শয়তান ফাঁদ নিয়ে আমায় ধরার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি ছাড়া আমার তো আর কেউ নেই!

স্বামীজি মাথা চুলকে বললেন, কিন্তু তুমি মৃত, আমি জীবিত। একসঙ্গে থাকা সম্ভব কি করে?

মেয়েটি একটু হাসল। বলল—No problem uncle.

—তবু—স্বামীজি চিন্তা করতে লাগলেন।

—বেশ, তবে থাকো। কিন্তু থাকবেটা কোথায়?

তার উত্তর না দিয়ে কিশোরীটি রিন্‌রিনে গলায় বলল, আমাকে নিয়ে থাকতে তোমার কি ভয় করবে?

স্বামীজি টোক গিলে বললেন, না—না, তোমাকে আর ভয় কিসের? তুমি তো আমারই মেয়েটার মতো।

—না আঙ্কেল, মৃত আত্মাকে সকলেই ভয় পায়। আমি আমার দাদাকে খুব ভালোবাসতাম। মরে গিয়েই দাদাকে দেখা দিলাম। ও তখন কাঁদছিল। কিন্তু আমাকে দেখেই ভয়ে অস্ত্রান হয়ে গেল।

স্বামীজি তখন বোধ হয় অন্য কথা ভাবছিলেন। সেই একই সমস্যার কথা তুললেন।

—তুমি থাকবে কোথায়?

—আমার শোবার জায়গা আমি করে নিচ্ছি। বলে মেয়েটি সুরুৎ করে চৌকির নিচে চলে গেল।

এ এক অদ্ভুত অবস্থা। যে চৌকিতে স্বামীজি শুয়ে রয়েছেন তারই নিচে একটি প্রেতাত্মা! হোক সে কিশোরী তবু তো সে মানুষ নয়। তার দাদাও বোনকে দেখে ভয় পেয়েছিল।

অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারেননি স্বামীজি। বারে বারেই চৌকির নিচে উঁকি দিয়ে দেখেছেন। না, কিছু নেই। ফাঁকা—যেমন ছিল। শুধু জায়গাটা বরফের মতো ঠাণ্ডা।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন খেয়াল ছিল না। হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে

গেল। শব্দটা আসছে মাথার দিকের জানলার কাছ থেকে। তিনি মশারির ভেতর থেকেই টর্চ জ্বাললেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীরের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল।

দেখলেন কবরখানার সেই ভয়ংকর লোকটা দু'হাতে জানলার শিকগুলো উপড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে...

স্বামীজি লাফ দিয়ে উঠে দেওয়ালের কোণ থেকে তাঁর ত্রিশূলখানা নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন। জানলার শিকে লেগে ত্রিশূলটা বন্‌বন্ করে মাটিতে পড়ে গেল। আর ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ করে লোকটা ছুটে পালাল।

এরপরেও বার তিনেক ঐ ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করেছিল লোকটা—যাকে লুইসা বলে শয়তান। কিন্তু ঘরে ঢুকতে পারেনি। সবসময়ে স্বামীজি বাড়ি পাহারা দিয়েছেন।

ক'দিন পর স্বামীজি কলকাতা থেকে চলে এলেন বর্ধমান। বর্ধমান থেকে রানীগঞ্জ, আসানসোল, গোমো, তিনপাহাড়। যেখানেই তিনি লুইসাকে নিয়ে পালাচ্ছেন সেখানেই শয়তানটা ধাওয়া করছে। লুইসাকে সে ধরবেই। কি করে সে সন্ধান পাচ্ছে সেটাই আশ্চর্য!

শেষে এখন পুরীর এই নির্জন জায়গায় আত্মগোপন করে আছেন স্বামীজি। তাঁর আশা—শয়তানটা এখানে ওঁদের কিছুতেই খুঁজে পাবে না।

কথা শেষ করে স্বামীজি থামলেন। আমি বিন্ময়ে স্তম্ভিত।

—মেয়েটি কি এখনও এখানে আছে?

স্বামীজি একটু হাসলেন। বললেন, আছে বৈকি। তার তো আর কোথাও যাবার জায়গা নেই।

—কোথায় আছে?

—ঐ ঘরে। বলে আঙুল দিয়ে পাশের ঘরটা দেখিয়ে দিলেন।

আমি ঘরটার দিকে তাকলাম।

—দেখতে চান ঘরটা?

বিনীতভাবে বললাম—খুব ইচ্ছে করছে।

স্বামীজি নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। ঘরটা সঙ্ক্যার পরও অন্ধকার।

আমার মনের কথা আন্দাজ করে স্বামীজি বললেন, ও অন্ধকারেই থাকতে ভালোবাসে।

তিনি ঘরে ঢুকেই সবুজ আলোটা ছেলে দিলেন। আমি এক পা এগোতেই ধূপের গন্ধের সঙ্গে এক ঝলক কনকনে বাতাসের ধাক্কা খেলাম। বুঝলাম, সে আছে।

একটা চৌকিতে সাদা ধবধবে চাদর পাতা। চাদরটা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে মেঝে পর্যন্ত।

—এগিয়ে আসুন।

আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। আমার হাত দুটো আপনা থেকেই শ্রদ্ধাঙ্গাপনের জন্যে জড়ো হয়ে গেল।

—লুইসা, জেগে আছ?

কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতা। তারপর বিছানার চাদরটা একটু কেঁপে উঠল।

—লুইসা, আমার এক নতুন বন্ধু তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।  
ইনি খুব ভালো লোক।

সঙ্গে সঙ্গে বিছানার চাদরটার ওপর দিয়ে যেন ঢেউ খেলে গেল।

স্বামীজি নিচু গলায় বললেন, আপনি দেখতে এসেছেন জেনে ও খুব খুশি।

কিন্তু তারপরেই চাদরটা যেন এক অদৃশ্য ঝড়ের ধাক্কায় এলোমেলো হয়ে গেল।

স্বামীজি সভয়ে বলে উঠলেন—কি হলো লুইসা?

উত্তর শোনা গেল না বটে কিন্তু চাদরটা ওলোট-পালোট হয়ে গেল।

লক্ষ্য করলাম স্বামীজির মুখে ছায়া নেমেছে।

বললেন, যে কোনো কারণেই হোক ও ভয় পেয়েছে। কিন্তু বুঝছি না  
হঠাৎ কিসের ভয়?

আমি আর দেরি না করে বিদায় চাইলাম।

স্বামীজি বললেন, টর্চ এনেছেন তো?

বললাম—হ্যাঁ।

—আমি আপনাকে এগিয়ে দিতে পারছি না বলে দুঃখিত। বোধ হয়  
সেই শয়তানটা এখানেও এসেছে। কাছেই কোথাও আছে। সাবধানে যাবেন।

খুব ভয়ে ভয়েই সেদিন নিজের আস্তানায় ফিরে এলাম।

পরের দিন বেলা দশটা নাগাদ স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।  
কালকের ব্যাপারটা ভুলতে পারিনি। একবার খবর নেওয়া দরকার।

গিয়ে দেখলাম স্বামীজি খুবই ব্যস্ত। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করছেন। আমায়  
দেখে হাসলেন একটু।

—আসুন।

—কি ব্যাপার?

—এখান থেকেও উঠতে হলো।

—সে কী!

স্বামীজি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, ঐ লোকটির সঙ্গে যে আমি পেরে উঠব না কাল রাত্তিরে তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। লোকটি শুধুমাত্র একজন ওঝা বা ঐ ধরনের কিছু নয়। আমার ধারণা যদি ভুল না হয় তাহলে সে রীতিমতো প্রেতসিদ্ধ। এদের অসীম ক্ষমতা। এরকম লোক আগে দেখা যেত। তাদের পিশাচসিদ্ধও বলা হতো। শ্মশানে, গোরস্থানে ঘুরে বেড়াত মৃত আত্মার সন্ধানে। এরা আত্মা চালান পর্যন্ত করতে পারত।

আমি অবাক হয়ে বললাম—সেটা আবার কি জিনিস?

—আমিও সঠিক জানি না। যতদূর জানি, এইসব প্রেতসিদ্ধরা একজনের মৃতদেহে অন্যের আত্মা ধরে এনে ঢুকিয়ে দিতে পারত। মৃতদেহ বেঁচে উঠত। চেহারাও এক মানুষ—কিন্তু মনে-প্রাণে অন্য। সে এক বিস্ত্রী ব্যাপার।

একটু থেমে বললেন, আমার মনে হয় এ লোকটাও সেই সম্প্রদায়ের। এত দিন পরেও লুইসার আত্মা নতুন জন্ম পায়নি, এটা স্বচক্ষে দেখে ওকে ধরবার জন্যে পিছু নিয়েছে। মেয়েটাও খুব ভয় পাচ্ছে। এখন তো দেখলাম লোকটা তার দুর্দান্ত শক্তির বলে এখানেও আমাদের সন্ধান পেয়েছে। কাজেই পালাতে হচ্ছে। জানি না শেষ পর্যন্ত কোথায় এমন নিরাপদ আশ্রয় পাব যেখানে লোকটা মাথা গলাতে পারবে না।

বৈশিষ্ণু থাকিনি। চলে আসবার সময়ে স্বামীজিকে আমার দেশের ঠিকানা দিয়ে এলাম। বললাম—যদি সম্ভব হয় মাঝে মাঝে চিঠি দিয়ে আপনার আর লুইসার খবর জানাবেন।

উনি সম্মত হলেন।

বছর তিনেক কেটে গেছে।

মাঝে মাঝে স্বামীজির চিঠি পাই। তিনি লুইসাকে নিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন কান্দীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত। কিন্তু পিছনে লেগেই আছে সেই প্রেতসিদ্ধ লোকটা। যেখানে স্বামীজি যাচ্ছেন, সেখানেই সে। তাই স্বামীজির চিঠির ছত্রে ছত্রে শুধু ভয়—কি করে, কোন নিরাপদ আশ্রয়ে গেলে মেয়েটা রক্ষা পাবে।

স্বামীজির কথা রেখেছি। কাউকে বলিনি তাঁর কথা। তা ছাড়া কেইবা বিশ্বাস করবে—কেউ একজন একটি কিশোরীর বিদেহী আত্মা সঙ্গে করে পথে পথে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন উদ্ভ্রান্ত হয়ে?

তারপর একদিন—

ব্যান্ডেল চার্চে বেড়াতে গিয়েছি। হঠাৎ দেখা স্বামিজির সঙ্গে।

উনি আমায় আবেগে জড়িয়ে ধরলেন।

বললাম—আপনি এখানে?

উনি বললেন, চলুন গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি।

দুজনে নিরিবিলি গঙ্গার ধারে এসে বসলাম। উনি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, লুইসাকে আজ এতদিন পর ছেড়ে দিলাম।

আমি চমকে উঠলাম।

উনি শান্তভাবে বললেন, ভেবে দেখলাম এভাবে চলতে পারে না। সেই লোকটা আমাদের দুজনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। লুইসাও ভয় পাচ্ছিল। ও বুঝতে পারছিল, আমার কাছেও ও নিরাপদ নয়। তাই অনেক ভেবে আজ ওকে মা মেরীর কাছে সমর্পণ করে এলাম। মা মেরী তো শুধু যীশুখ্রিস্টের মা নন, চরাচরে সমস্ত মানুষের মা। তাঁর কোলের চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় আর তো কোথাও নেই অনিমেষবাবু। লুইসাও খুব খুশি।

এই বলে স্বামিজি চুপ করলেন। আর একটি কথাও বললেন না।

সঙ্ঘ্যার অঙ্ককার ঘন হয়ে এল।

আমি ডাকলাম—স্বামিজি!

—বলুন।

—এবার আমি উঠি। অনেক দূর যেতে হবে।

—আসুন। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন স্বামিজি।

—আপনি উঠবেন না?

—না। কোথায় আর যাব? ভাবছি এখন থেকে এখানেই কোথাও পড়ে থাকব। তবু তো মেয়েটার কাছাকাছি থাকতে পারব।

বলতে বলতে উনি হাত দিয়ে চোখের জল মুছলেন।

---



